নামভূমিকায়

শ্রীপান্থ

বাক্‌-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো ॥ কলিকাতা-৯

শ্রীযুক্ত অশোককুমার সরকার

করকমলেষু

নামভূমিকার ভূমিকা

'নাম-ভূমিকায়', 'পাদপ্রদীপ', 'শিরোনাম'—এই নিয়ে কত নামকরণই যে হল! সংকলনে কিন্তু আদি নামটিই ফিরে এল।

সংবাদ যদি বেদাদির মত অপৌরুষেয় হত, তবে কথা ছিল না। কিন্তু সংবাদের পিছনে সচরাচর ছায়া থাকে—কোন না কোন পুরুষের। কর্তা ছাড়া কেবল কর্ম নয়, খবরও হয় না।

খবরের কাগজে, অতএব, শিরোনামায় নানা নাম উঁকি দেয়। চেনা, অচেনা দুই-ই থাকে। কেউ কেউ ঘুরে ঘুরে ফিরে আসেন, কেউ বা বারেক দেখা দিয়েই চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন। 'নাম-ভূমিকায়' এমনই অনেকের আলেখ্য-লহরী।

পাঠকদের এই ধরনের আলেখ্য-দর্শনের সুযোগ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'ই যে প্রথম দিয়েছে তা নয়, তবে বাংলা সংবাদপত্রে নানা ব্যাপারের মত এ ব্যাপারেও তাকে অগ্রণী বলা চলে। কয়েক বছর আগে সংবাদ-পাঠকের একটি সমীচীন কৌতূহল মেটাতে বিভাগটির যখন প্রবর্তন হয় তখন লেখার দায় গ্রহণ করেছিলেন ছদ্মনামী 'শ্রীপান্থ'। ছদ্মতর 'সাংবাদিক' নামে।

কুশলী পটুয়া নিপুণ কিন্তু সংযত কয়েকটি টানে যে চরিত্র-চিত্রাবলী এঁকেছেন, তা ঠিক "হু'জ হু" নয়। অর্থাৎ জন্ম বিবাহ ইত্যাদি বিধাতার

খাসমহলভুক্ত বিষয়গুলির ফর্দ কিংবা সাল-সার বৃত্তান্ত নয়। দরকারী খবর লেখক দিয়েছেন, কিন্তু শুধু তাই দিলে জিনিসটা চিত্র-পরিচিতি হত মাত্র, চিত্র বাদ যেত। তিনি তা হতে দেন নি। মানুষগুলিকেও এঁকেছেন, এবং এ কাজে প্রকাশ্য এবং নেপথ্য উভয়বিধ তথ্যই কাজে লেগেছে।

এই মানুষেরা হাসেন, কাঁদেন, ভালবাসেন। স্বভাববশে কেউ কেউ হয়ত হাসানও। ফলে যিনি বিরাট তাঁকে কখনও কখনও ছোট্ট দেখিয়েছে, আবার আপাতবিচারে সামান্য অনেকের মাথা আকাশ ছুঁয়েছে। অন্তরঙ্গতাই এই চরিতাবলীর বৈশিষ্ট্য। নখে-আঁকা মুখগুলি জীবন্ত। আর, উপলক্ষ যেহেতু সংবাদ সুতরাং ছাঁচ গড়ায় সম-সময়ের ছাপ নিশ্চয় পড়েছে। প্রতিটি রচনার নীচের তারিখে পাঠকেরা 'কে'র সঙ্গে 'কবে' আর 'কেন'র জবাবও পাবেন।

সংগ্রহটি অনবদ্য হয়েছে কি না সে-বিচার পাঠকের। সূত্রধার হিসাবে আমি শুধু বলতে পারি, স্বকাল সম্পর্কে উৎসাহী, উৎসুক এবং জিজ্ঞাসু মাত্রের পক্ষেই বইটি দরকারী। রেফারেন্সের কাজে লাগবে। তবে গত কয়েক বৎসরের 'নাম-ভূমিকায়' কম নায়ক তো অবতীর্ণ হন নি, পাদপ্রদীপে অগণিত মুখ দেখা গিয়েছে। 'তারকা'-তালিকার কাকে ছেড়ে কাকে রাখি, লেখকের পক্ষে এই বাছাইয়ের কাজ কঠিন ছিল। গ্যালারিতে এমন অনেকের ছবি বিধৃত, যাঁরা বিগত। আবার সদ্য-আগত অনেককেও দেখা যাবে।

তা ছাড়াও কেউ কেউ আছেন, এক অর্থে যাঁরা অনাগত,—ইতিহাসের মঞ্চে চকিতে দেখা দিয়েছিলেন বটে কিন্তু এখনও উইংস-এর আড়ালে। বস্তুত আলাদা-আলাদা করে ছবিগুলি দেখাই ভুল। বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন তাঁদের জীবনী, তবুও সব মিলিয়ে যোগফল একটি দশকের কথা ও কাহিনী। ভৌগোলিক ভাগাভাগিতে ভারত স্বভাবতই বেশি জায়গা নিয়েছে।

রচনা-সংগ্রহটি প্রকাশ করে বাক্-সাহিত্য পাঠককুলের ধন্যবাদার্হ হলেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা
কলিকাতা

সন্তোষকুমার ঘোষ

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সৌজন্যে

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বন্ধু ও সহকর্মীদের সহযোগিতা ছাড়াও এই বই প্রকাশে যাঁর কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ পেয়েছি তিনি শ্রদ্ধেয় শ্রীকানাইলাল সরকার। পাণ্ডুলিপি তৈরীতে সাহায্য করেছেন শ্রীঅমলেন্দু চৌধুরী ও শ্রীমীরা সরকার। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

—লেখক

সূচীপত্র

ফ

ব

ভ

ম

স

হ

আ

আইরিণ, [রাজকুমারী]

নিষ্ঠুর এপ্রিল!

বাড়িতে মুখ দেখানোর উপায় নেই। বাবার সঙ্গে দেখা করতে হল ব্রাসেলস্-এ,—এক বন্ধুর বাড়িতে। মেয়ে বাবার পা জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল, মা যেন অন্তত একবার আসেন। বাবা বললেন—সেটা অসম্ভব।

পাত্রীপক্ষে কেউ উপস্থিত ছিলেন না। তবুও বিয়ে হয়ে গেল। গতকাল রোমনগরীতে মালা-বদল সম্পূর্ণ।

সেও এক রাজ-কাহিনী। য়ুরোপীয় রাজতরঙ্গিণীতে এ কাহিনীর শিরোনামা—জনৈকা রাজকুমারীর মৃত্যু।

নায়িকা আইরিণ পৃথিবীর তাবৎ নায়িকাদের মত। তিনি রূপসী, বিদুষী, লজ্জাবতী, এবং তৎসত্ত্বেও যা না থাকলে সাচ্চা নায়িকা হওয়া সম্ভব নয় সেটিও তাঁর আছে,—অর্থাৎ তিনি দুঃসাহসিনীও বটে। চার বোনের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী আইরিণ সাহসে, বলতে গেলে, য়ুরোপের রাজকুলে মিস য়ুরোপ। মার্গারেট, আলেকজান্দ্রা প্রমুখারা তাঁর কাছে কোন তুলনাই নন। বস্তুত আইরিণের সাহসিকতাই এই রূপকথার প্রকৃত বনিয়াদ। বাকীটুকু প্রসঙ্গকথা মাত্র।

আইরিণের সব ছিল। ন'শ বছরের প্রাচীন বংশ, বার্ণার্ডের মত বাবা, রানী জুলিয়ানার মত মা এবং তদুপরি হল্যাণ্ডের মত দেশ, এক কোটি কুড়ি লক্ষ মানুষের আনুগত্য। সত্য বটে মায়ের পরে সিংহাসনে বসবেন দিদি বিয়াত্রিক্স, কিন্তু আইরিণও তালিকায় দ্বাদশ নন, তিনি দ্বিতীয়। তা সত্ত্বেও মেয়েটি যেভাবে কে. এল. এম-এর প্লেনটিতে চড়ে বসেছিল তা সত্যিই দেখবার মত।

*　　*　　*

গত ফেব্রুরারী মাসের কথা। সঙ্গে সাতাশটি স্যুটকেস আর কিছু স্ত্রী'র সাজসরঞ্জাম। আইরিণ যেদিন দেশ ছেড়ে বেড়াতে বের হন সেদিন কাকপক্ষীটিও ঘুণাক্ষরে জানে না—রাজকুমারী অভিসারে বের হচ্ছেন। মা-বাবার তরফ থেকেও সতর্কতার অন্ত ছিল না। মাসেক আগেই বাবা

ছাওয়া তৈরীতে নেমেছিলেন। সাংবাদিকদের কাছে খেদ করে তিনি বলেছিলেন, মেয়েরা যে কোন বাপ-মায়ের কাছেই সমস্যা,—এও এলাস, দেয়ার আর মোর ক্যাথলিক ছ্যান প্রোটেস্টাণ্ট প্রিন্সেস! য়ুরোপের অন্যতম বনেদীঘর হাউস অব অরেঞ্জ-এর কুলপতি প্রিন্স বার্নার্ড যেন সেদিন বাংলা দেশের কোন মধ্যবিত্ত পিতা। রাজার উক্তিতে প্রজাদের মনে পড়েছিল প্রাসাদে এখনও চার চারটি অবিবাহিত কন্যা এবং তাঁরা ধর্মত প্রোটেস্টাণ্ট। উড়োজাহাজ রাজকুমারীকে নিয়ে ক্যাথলিকদের দেশ স্পেনে নেমেছে শুনে স্বভাবতই তারা কৌতুহলী হল। এ কৌতুহল সন্দেহে পরিণত হল, যখন শোনা গেল মাদ্রিদের এক গীর্জায় প্রোটেস্টাণ্ট রাজকুমারী পিতৃধর্ম ত্যাগ করে ক্যাথলিক হয়েছেন। খবরটা গোপন রাখাই ছিল রাজবাড়ির বাসনা। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন একজন ফটোগ্রাফার। তিনি ঘটনাটা ক্যামেরায় ধরে ফেলেছিলেন। ফলে মাকে কৈফিয়ত দিতে নামতে হল। জুলিয়ানা বললেন—আমার মেয়ে ভেবে-চিন্তেই এ কাজ করেছে। প্রজারা বলল—কেন? তারা প্রকাশ্যে সম্ভাব্য ক্যাথলিক নায়কের খোঁজে বের হল।

* * *

অবশেষে জল্পনা-কল্পনা শেষ হল। প্রজারা অবাক হয় দেখল তাদের চব্বিশ বছরের দুঃসাহসী রাজকুমারী যাঁকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরলেন তেত্রিশ বছরের সেই সুদর্শন রাজকুমারটি ধর্মে যে শুধু ক্যাথলিক তাই নয়—তিনি 'রাজনৈতিক রাজকুমার'ও বটে। স্পেনের সিংহাসনের তিনি একজন দাবিদার। অবশ্য ফ্রান্সে প্রবাসজাত রাজকুমার কার্লস নানা গুণসম্পন্ন যুবক। অক্সফোর্ডে তিনি ভাল ছাত্র ছিলেন, ভাল খেলতে পারেন, ভাল উড়োজাহাজ চালাতে পারেন এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য কার্লস-এর জীবনের এই সম্ভাবনাটুকুও আইরিণের পক্ষে বিপজ্জনক। কেননা, দেশে নিয়ম—বাইরের কোন 'রাজনৈতিক ব্যক্তির' সঙ্গে কোন ডাচ রাজকুমারীর বিয়ে চলবে না। কারণ, হল্যাণ্ডের রাজবংশ রাজনীতির অনেক ওপরে। তার চেয়েও শঙ্কার কথা—কার্লস শত্রুর দেশের রাজকুমার। একদা ষোড়শ শতকে স্পেন হল্যাণ্ডের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ চালিয়েছিল।

এই আইরিণেরই পূর্বপুরুষ, পিতৃভূমির গৌরব উইলিয়াম দি সায়লেণ্ট সেদিন স্প্যানিশ আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। স্থতরাং—। তারপরও কি পার্লামেণ্টের তিন ভাগের দুই ভাগ সদস্য এই বিয়েতে মত দিতে পারবেন? সেটা অসম্ভব। তবে কি দেশের শাসনতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করে ফুটফুটে প্রাণচঞ্চল এই মেয়েটিকে আইনত 'মৃত' বলেই ঘোষণা করা হবে?

মন্ত্রিসভা সেদিন কার্যত তাই করেছিলেন। আইরিণও জানিয়েছিলেন সিংহাসনের ওপর দাবি তো বটেই, তিনি পিতৃভূমি পর্যন্ত ত্যাগ করতে রাজি! রানী জুলিয়ানা আবার ছুটে বেরিয়ে এসেছিলেন। মেয়েকে আড়াল করার জন্য মা, রাজকর্তব্য পর্যন্ত ভুলতে সম্মত হয়েছিলেন। সকলে আশা করেছিল মায়ের সেই মহান ভূমিকার পর বিয়েটা অন্তত ভালোয় ভালোয় সম্পন্ন হবে, রাজোচিত হবে। কিন্তু সে আশা ধুলিসাৎ হয়ে গেছে দু'সপ্তাহ আগে। কারণ এবারও, আইরিণ। আইরিণ বলল—আমি চার্চে বিয়ে চাই এবং সে বিয়েতে তামাম ইউরোপকে নেমন্তন্ন করতে চাই। ছেলেরও একই দাবি। মা বললেন—প্রোটেস্টাণ্ট-এর দেশে সে কি করে সম্ভব? সঙ্গে সঙ্গে—ড্রাইভার গাড়ি বের কর!—আইরিণ আবার উধাও। এবার কার্লসকে নিয়ে সোজা রোম, পোপের দরবার।

আবার 'স্কুপ' ছবি, আবার মায়ের কান্নাকাটি। আইরিণ তবুও নাছোড়বান্দা। কার্লস দাবি তুলেছে—তাঁর ২৮৪ লক্ষ ডলার বরপণ চাই। তদুপরি স্পেনের সিংহাসনে তাঁর দাবিকে সরকারীভাবে সমর্থন করতে হবে, তাঁর ভবিষ্যৎ পত্নীকে রাজনীতিতে অধিকার দিতে হবে,—ইত্যাদি ইত্যাদি। আইরিণেরও তাই মত। জুলিয়ানা বাধ্য হয়েই আবার 'রানী' হলেন। তিনি বললেন—এ অসম্ভব। প্রজারাও দিক বদল করল। তারা বলল—এ ব্ল্যাকমেল। মন্ত্রিসভা ঘোষণা করল—আইরিণ এবার থেকে আইরিণই; তিনি সরকারী গাড়ি পাবেন না, পুলিস পাবেন না, তাঁর কথা কোন সরকারী মূল্য পাবে না।

রাজকুমারীর 'মৃত্যু' সম্পূর্ণ হল। তারপরেই স্বদেশ থেকে দূরে রোমের গীর্জায় এই মালাবদল। রাজকুমারী রিণ যদি 'মরে' গিয়ে থাকেন,

তবে গতকাল রোমের কোন এক গীর্জায় আইরিণ নামে একটি মেয়ে নতুন করে জন্মলাভও করেছেন বোধ হয়!—নয় কি? ৩০.৪.৬৪

আইকেডা, হোয়াতো

ওঁর সারা গায়ে কি এক রোগ হল। চর্মরোগ। ডাক্তাররা বললেন—এ ব্যাধি আমাদের অবিদিত। মা বললেন—ওষুধটা আমার জানা। তুমি এক কাজ কর, একটু ধর্মকর্ম কর।

আইকেডা তীর্থভ্রমণে বের হলেন। সর্বাঙ্গে তাঁর দগদগে ঘা। দামী পোশাকের নীচে — ওষুধমাখা ব্যাণ্ডেজ। ঘুরতে ঘুরতে হিরোশিমার মানুষ হাজির হলেন এসে ওসাকি দ্বীপে। বৌদ্ধ মন্দিরে প্রণাম জানালেন। কোথা থেকে কি হল, দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হয়ে গেল। আইকেডা ভক্ত হয়ে ঘরে ফিরলেন। সে তিরিশ বছর আগের কথা। আইকেডার বয়স তখন তিরিশ। এখন ষাট। সেই থেকে এখনও তিনি দিনে দুবার স্নান করেন, নিরামিষ খান এবং নিয়মিতভাবে প্রার্থনা করেন।

নিষ্ঠাবান মানুষ। লোকে বলে—শক্তও। জাপানের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হোয়াতো আইকেডা তখন (৫১) যোশিদা মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী। তাঁর মন্ত্রণায় ভেতো-জাপানীদের অন্নকষ্ট হল। আইকেডা বললেন—কেন, বার্লি নেই দেশে? পরের বছর আইকেডা কালোবাজারে হাত বাড়ালেন। সমস্ত ব্যবসায়ী আপত্তি জানালেন। আইকেডা বললেন,—আমার আচরণ দেখে যদি কোন ব্যবসায়ী আত্মহত্যা করেন তবে আমি সে পাতকের ভাগী হতে রাজী।

সেবার মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের জাপান সফরের কথা। সমগ্র দেশে মার্কিন বিরোধী আন্দোলন। কিসির মন্ত্রিসভায় চোদ্দ-জন মন্ত্রী। সকলে সমস্বরে বললেন—আইক-এর পক্ষে এবার না আসাটাই সঙ্গত হবে। একজন বললেন—না, সেইটাই হবে জাপানের পক্ষে সবচেয়ে অসঙ্গত কাজ। এই লোকটি আর কেউ নন, বাণিজ্যমন্ত্রী আইকেডা।

আইকেডা এখন জাপানের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। লোকে বলে লোকটি আইকেডা বলেই ইলেকশনটা জিততে পারলেন। কেননা চারশ ছিয়ানব্বুইয়ের মধ্যে তিনশ দুই পেতে কমপক্ষে তাঁর খরচা হয়েছে—আটাশ

লক্ষ ডলার! নিন্দুকের রটনা নয়। জাপানের লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টিতে এগুলো আজ হামেশাই ঘটনা।

সেই কুবের-পার্টিতে ডেমোক্র্যাট আইকেডা অন্যতম বিত্তবান পুরুষ। ছ'পুরুষ ধ'রে তাঁদের মস্ত ব্যবসা। মদের কারবার। আইকেডা মদ খান না। তিনি গলফ খেলেন, আর গেইসার হাতে চা খান। প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন এবার থেকে তাও করবেন না। কারণ, দেশের সাধারণ লোক তা করতে পারে না। তারা গলফও খেলতে পারে না, গেইসাও পুষতে পারে না।

আইকেডা অনেককাল ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেছেন, দু' দু'বার দেশের অর্থমন্ত্রী হয়েছেন। সুতরাং, দেশের সাধারণ মানুষের ঘরের খবর তাঁর অজানা নয়। তবে তরুণ জাপানের মনের খবরটা তাঁর সঠিক জানা আছে কি না সেটা অবশ্য আগামী দিনই বলতে পারে।

২৮. ৭. ৬০.

আইখম্যান, এডলফ

'এবার আমি হাসতে হাসতে কবরে লাফিয়ে পড়তে পারি। কেননা এখন আমি তৃপ্ত পুরুষ। পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের আত্মা আমার তহবিলে।'

তবুও প্রতিশোধ যখন মৃত্যুর সমন হাতে বের হল আইখম্যান তখন এগিয়ে এসে ধরা দিতে সাহস পেল না। সে প্রাণের মায়ায় পড়ল। জাল কেটে পালাল। পথে মার্কিন সৈন্যরা ওত পেতে ছিল। '৪৫ সনে অস্ট্রিয়ায় তাদের হাতে ধরা পড়ল আইখম্যান। কিন্তু এবারও হাত ফস্কে পালিয়ে গেল সে। সুতরাং, নুরেমবার্গ আদালতে আর তাকে দাঁড় করান গেল না। এদিকে স্বয়ংমৃতের ভীড়েও খুঁজে পাওয়া গেল না ওকে। নিশ্চিন্ত ইউরোপ স্বাভাবিক সিদ্ধান্তে এল: আইখম্যান মৃত।

পনের বছর পরের কথা। গেল মাসের তেরই। মাঝরাত্তিরে ইসরাইলের পক্ককেশ প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে এসে আছড়ে পড়ল এক টুকরো কাগজ। একটা কোড-মেসেজ। তাতে একটি মাত্র ছত্র: দি বিস্ট ইজ ইন্ চেইন।

ক'দিন পরেই শোনা গেল বেন-গুইরণ তাঁর দেশবাসীকে সগর্বে জানাচ্ছেন, খুনী আইখম্যান এখন খাস ইহুদিভূমিতে। অচিরেই তার বিচার হবে।

আইখম্যান

ঘটনাটা নাটকীয়। মূল নাটকটা আরও। আজকের পঞ্চান্ন বছরের লোলচর্ম এডলফ আইখম্যান তখন নবীন 'আর্য' সন্তান। জন্ম রুর-এ। সুতরাং জীবনটা সুরু হল ইঞ্জিনিয়ারীং দিয়েই। কিন্তু নাৎসী আইখম্যান লাইন পাল্টালেন। তিনি গেস্টাপো সাজলেন। ক্রমে, তাদের ইহুদি বিভাগের কর্তা। সেদিনের আইখম্যান মানব ইতিহাসের বীভৎসতম জল্লাদ। কি করে কম সময়ে, কম শ্রমে এবং কম খরচে বেশী ইহুদি নিধন করা যায়, এছাড়া দ্বিতীয় কোন চিন্তা ছিল না তাঁর মাথায়। তবে নিজের প্রাণের চিন্তাটা ছিল। সুতরাং, যুদ্ধ যেদিন বিপক্ষে রায় দিয়ে ক্ষান্ত হল আইখ-ম্যান সেদিন দপ্তর ছেড়ে পালাল।

অস্ট্রিয়া থেকে প্রথমে উত্তর জার্মানী। খুনী আইখম্যান সেখানে ফরেস্টার সাজল। কিন্তু বেশীদিন বনবাস সম্ভব হল না। মৃত্যুভয় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল মাতৃভূমি থেকে আরও দূরে। প্রথমে স্পেনে এবং অবশেষে '৫২ সনে আর্জেন্টিনায়।

ভুয়া নামে ইতালীয় রেডক্রসের একখানা রিফিউজি কার্ড জোগাড় করে আইখম্যান আর্জেন্টিনায় নামল। কিছুদিন কাটল একটা ইঞ্জিনিয়ারীং ফার্মে। কিছুদিন কাটান গেল ব্রেজিল, প্যারাগুয়ে এবং বলিভিয়ায় ঘুরে। শেষে একদিন তিনটে ছেলেমেয়ে সহ স্ত্রী এসে হাজির। বাধ্য হয়েই এবার সংসারী হতে হয়। আইখম্যান বুয়েনাস আইরেস-এ সংসার পাতল। ছদ্মনামী খুনীর সংসার। কিন্তু সুখের সংসার। কর্তা কাজ করেন একটা মোটর ফার্মে। মাইনে ভাল, বাড়িটাও ভাল। এয়ার পোর্টের কাছে।

সেদিন তেরই মে। বেন-গুইরণ যখন মেসেজটা পড়ছেন তার কয়েক মিনিট আগের কথা। আপিস থেকে বাড়ি ফিরছিল আইখম্যান। এমন সময় হঠাৎ একটা মোটর এসে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল ওকে। মাঝ-রাত্তির অবধি স্ত্রী এখানে ওখানে টেলিফোন করল। হাসপাতালে খোঁজ নিল। কোথাও যখন কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না তখন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সেও নিখোঁজ হয়ে গেল। কেননা, গেস্টাপো-প্রধানের ঘরের বৌ হিসাবে তার জানতে বাকী নেই আইখম্যান কোথায় গেছে। নিয়তি যে নাৎসীকেও ছাড়ে না!

আর্জেন্টিনা আইখম্যানকে নিয়ে বিতর্কে নেমেছে। তেল আভিভ-এও জোর বিতর্ক চলছে। একদল বলছে,

শয়তানকে ফাঁসি দেওয়া হক ! অন্যদল বলছে না, ফাঁসি নয়। সে ত সাধারণ স্বাভাবিক মৃত্যু। ওকে ঠিক সেভাবেই মারা হক—পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে সে তিলে তিলে যে ভাবে মেরেছে, ঠিক সেইভাবে। মরবার আগে ও জেনে যাক মৃত্যু কাকে বলে। দশ লক্ষ জীবন্ত ইহুদি নারী পুরুষের বদলে দশ হাজার ট্রাক সাবান আর চা কিনতে চেয়েছিল একদিন আইখম্যান। কিন্তু হায়, আজ যেন এক ফোঁটা চোখের জলেও কেউ কিনতে চায় না ওকে !

১৮.৬.৬০

[দীর্ঘ বিচার শেষে আইখম্যান-এর ফাঁসি হয় ১৯৬২ সালের ১লা জুন।]

আইসেনহাওয়ার, ডুইট, ডি,

সাত বছর আগে ছিল একটু হলদেটে। এখন ধবধবে সাদা। মাথায় রেশমের মত চিকণ সামান্য ক'টি সাদা চুল—হাসলে টোল পড়ে মুখে। না হাসলে—গভীর কয়টি রেখা। গেল অক্টোবরে উনসত্তরে পড়েছেন —আইসেনহাওয়ার। এখনও কিন্তু নিউইয়র্কের অষ্টাদশী মার্কিন তরুণী বলে—'আই লাইক আইক !' কুড়ি বছর পরে রিপাব্লিকান দলের সমর্থনে আইকের নাম-লেখা জামা পরেছে তারা। কানে পরেছে, 'আই লাইক আইক' ডিজাইনের কানবালা।

দু' দু'বার মার্কিন দেশের প্রেসিডেণ্টের সম্মান লাভ করেছেন আইক। পুরো নাম তাঁর ডুইট ডেভিড আইসেনহাওয়ার। জন্ম ১৮৯০ সনের ১৪ই অক্টোবর। জন্মস্থান —ডেসিন, টেক্সাস। লেখাপড়া—ওয়েস্টপয়েণ্ট-এর মিলিটারী একাডেমি এবং ক্যানসাসের জেনারেল স্টাফ স্কুল। সেখানকার স্নাতক আইসেন-হাওয়ার ১৯২৭ সন থেকে সৈনিক। ১৯৪১ সনের ৭ই ডিসেম্বরে পার্ল-হারবারে যখন বোমা পড়ে তিনি তখন ওয়াশিংটনের অপারেশন ডিভিসনে একজন ডিভিসনাল চীফ অব স্টাফ। তারপর কখনও তিনি উত্তর আফ্রিকার মিত্রশক্তি বাহিনীর প্রধান, কখনও ইউরোপের সর্বাধিনায়ক, কখনও 'নাটো'র। আইক সামরিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৫২ সনে। সে বছরেই তিনি প্রেসিডেণ্ট পদে আসীন হন।

রুজভেল্টের পরে আইসেনহাওয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় মার্কিন প্রেসিডেণ্ট। ভোট গুনলে হয়ত "এফ আর ডি"-ও জনপ্রিয়তায় তাঁর পিছনে। শুধু

উআং সাং

আমেরিকায় নয়, ইউরোপেও রীতিমত জনপ্রিয় জেনারেল আইসেনহাওয়ার। লর্ড এলেনব্রুক অবশ্য লিখেছেন—আইসেনহাওয়ার স্ট্র্যাটেজি বুঝতেন না। তিনি লড়াই জানতেন। ইউরোপ জানে, সে 'ক্রুসেডের' খবর। মন্টি চিনতেন—সেদিনকার জেনারেলটিকে। ভাল করেই জানতেন—রাশিয়ার জুকভ। আজ হয়ত—কিঞ্চিৎ জেনেছেন ক্রুশ্চেভও। স্ট্র্যাটেজিস্ট 'হাওয়ারের নিমন্ত্রণ এসেছে তাঁর দেশ থেকে।

আমেরিকানরা বলেন—আইসেন-হাওয়ার একমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি এ বয়সেও সমসাময়িক দৃষ্টিতে বৃদ্ধ অপবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আইসেনহাওয়ার আজও তরুণের মত হাঁটেন, সৈনিকের মত কাজ করেন। তিনি ছবি আঁকেন, বই লেখেন, মাছ ধরেন, গলফ খেলেন। জর্জ ওয়াশিং-টনকে অবশ্য বছরে সাতাশটা আইন পাশ করলেই চলত। কিন্তু আজকের মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কমপক্ষে ৭৫০টি বিল পাশ করতে হয়, কংগ্রেসে চল্লিশ হাজার প্রমোশনের দরখাস্ত পাঠাতে হয় এবং তদুপরি উপস্থিত করতে হয় গড়ে এগারশ' পাতার বাজেট। তৎসহ: স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বহুবিধ দায়িত্ব।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট একদিন পরাধীন ভারতবর্ষকে দূত পাঠিয়ে সমর্থন জানিয়েছিলেন—প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার নিজেই এলেন আজ স্বাধীন ভারতকে মুক্ত-দুনিয়ার সহ-যোগিতার সংবাদ জানাতে। কুড়ি হাজার মাইল আকাশ ডিঙিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই প্রথম ভারত আগমন নিঃসন্দেহে তাই ঐতিহাসিক ঘটনা। ১০. ১১. ৫৯

[আইসেনহাওয়ার ১৯৬১ সনের জানুয়ারী পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের আসনে ছিলেন। সেবারকার নির্বাচনে তিনি প্রার্থী ছিলেন না। তাঁর পরবর্তী প্রেসিডেন্ট—জন কেনেডি।]

আউঙ সাং (মিসেস্)

বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। লাবণ্যোজ্জ্বল সুঠাম চেহারা। প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশ থেকে যে মেয়েটি ভারতে রাষ্ট্রদূত হয়ে এলেন, নাম বললে তাঁকে চিনবেন না। মস্ত নাম: মাহা থিরি থুঢাম্মা দাউ খি নকিয়ি।

কিন্তু যদি বলি ইনিই মিসেস আউঙ সাং তবে নিশ্চয় চিনতে পারবেন ওঁকে। কেননা ব্রহ্মদেশকে যাঁরা জানেন, তরুণ জেনারেল আউঙ সানকেও তাঁরা চেনেন।

সেদিন ১৯শে জুলাই, ১৯৪৭ সন। রেঙ্গুনে ব্রহ্মের স্বাধীন মন্ত্রীসভার বৈঠক চলছে। এমন সময় সহসা মৃত্যু এসে হানা দিল ঘরে। তিনটে স্টেনগান রাশি রাশি গুলী ছড়িয়ে যখন চলে গেল তখন দেখা গেল ব্রহ্মের ইতিহাসটা যেন চলতে চলতে সহসা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। একই মৃত্যুশয্যায় পাশাপাশি পড়ে আছেন সাতজন মন্ত্রী। তাঁদের মধ্যে একত্রিশ বছরের আউঙ সাঙও।

দেশে অপূরণীয় ক্ষতি, ঘরে অফুরন্ত শোক। কোলে একটিমাত্র শিশু কন্যা। ওকে জড়িয়ে ধরেই অনেক কাঁদলেন মিসেস আউঙ সাঙ। তিনি রাজনীতির মানুষ নন। তরুণ আউঙ সাঙ-এর সঙ্গে তাঁর যখন প্রথম দেখা তখন তিনি প্রাণচঞ্চলা একটি তরুণী। হাসপাতালে নার্সের কাজ করেন। আউঙ সাঙকে দেখে ভাল লেগেছিল ওঁর। তরুণ জেনারেলও ভাল বেসে-ছিলেন এই মেয়েটিকে। তাই এই সংসার। নিষ্ঠুর রাজনীতি এবার তা ভেঙে চুরে একাকার করে দিয়ে গেল।

বিধবা আউঙ সাঙ-পত্নী স্থির করলেন তিনি স্বামী-ব্রত উৎযাপন করবেন, রাজনীতিতে নামবেন। দেখতে দেখতে ব্রহ্মদেশে নানা প্রতিষ্ঠান এবং পদের সঙ্গে জড়িয়ে গেল তাঁর নাম। মাদাম আউঙ সান ব্রহ্মের গণপরিষদের সদস্যা নির্বাচিত হলেন, এবং অবশেষে মনোনীত হলেন ভারতে ব্রহ্মের রাষ্ট্রদূত। বহির্বিশ্বে তিনিই ব্রহ্মের প্রথম মহিলা রাষ্ট্র প্রতিনিধি।

১১. ৬. ৬০

আও. ডঃ পি. শিলু

আঙ্গামীদের নেতা ফিজো একবার ওঁকে ডেকেছিলেন। সে '৪৬ সনের কথা। নিজে আও-দের ঘরের ছেলে। তবুও বিনা দ্বিধায় পাশে গিয়ে বসে-ছিলেন। কারণ, প্রস্তাবটা সত্যিই আনন্দের। নাগাদের জাতীয় পরিষদ গঠিত হচ্ছে।

কিন্তু এক বছরের বেশী পাশাপাশি থাকা গেল না। কেননা, পর্বত কন্দরে বসে রচিত সেই পৃথিবীর চেহারাটা সত্যিই অত্যন্ত ছোট। অনেকটা আঙ্গামী বা আও-দের গাঁয়ের মত। তেমনি ষড়যন্ত্রপূর্ণ। অথচ, পৃথিবী ত ক্রমেই আরও বড় হওয়ার কথা।

সুতরাং আরও অনেকের মত অপেক্ষা করতে হ'ল তাঁকেও। তবে পি, শিলু আও-এর সেই প্রতীক্ষা নেহাৎ কালহরণ নয়, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়।

আকিহিতো

মিশনারীদের বদান্যতায় বি. এ পাশ করেছিলেন। সুতরাং, ফিজোকে হারিয়ে অরণ্যে হাতড়ে বেড়াতে হল না। আসাম সরকার ডেকে ঘরে জায়গা দিল। আও তাদের অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার নিযুক্ত হলেন। বিরাট চাকরী, কঠিন দায়িত্ব।

তের বছর একটানা সে আসনে প্রতীক্ষা, দিনে দিনে ভবিষ্যতের শিক্ষা। অভিজ্ঞতা অনেক হল, কিন্তু সুযোগ তবুও আসে না। আসামের সমতলে দাঁড়ালে এখনও যেন কানে আসে বেআইনী রাইফেলের আওয়াজ, কখনও কখনও চোখে ভাসে কুয়াশার মত ধোঁয়া। কে জানে, গৃহযুদ্ধে কোন গাঁ হয়ত পুড়ছে। —হয়ত, আও-দেরই কোন পল্লী।

অবশেষে ধোঁয়া কাটল। এবং ডাক এল। দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তকে দিল্লী ডাকছে।

এর জন্যেই প্রতীক্ষা। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন আও-নায়ক পি. শিলু আও। নতুন ভারতের সঙ্গে এক টেবিলে বসে আলাপ হল, আলোচনা হল, সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। ভারতের নবীনতম রাজ্য নাগাভূমির নাম ম্যাপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসে উঠল পি. শিলু আও নামক তেতাল্লিশ বছর বয়স্ক আও নায়কের নামটিও। তিনি নাগাভূমির অন্তর্বর্তি-কালীন "মন্ত্রিসভা", তথা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের পঞ্চ সদস্যের একজন,—প্রধানতম সদস্য। তিন বছর পরেও যদি থেকে যান তবে আমরা তাঁকে বলব—মুখ্যমন্ত্রী। ৬. ৪. ৬১

[১৯৬৩ সনের ১লা ডিসেম্বর ভারতের নতুন অঙ্গরাজ্য হিসাবে নাগাভূমির উদ্বোধন হয়। শিলু আও সে রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী।]

আকিহিতো [জাপানের যুবরাজ]

জালের এদিকে দু'জন, ওদিকে দু'জন। কিন্তু আসলে এদিকে একজন, ওদিকেও একজন। খেলা শেষ হল। আকিহিতো হেরে গেলেন। রেজাল্ট সিক্স টু ওয়ান! তা হ'ক। জাল ডিঙিয়ে এপারে চলে এলেন রাজকুমার। বললেন—ওয়াণ্ডারফুল!

মিচিকো মাথা নোয়ালেন। লজ্জায় একটু হাসলেনও। রাজকুমার বললেন—দাঁড়াও ক্যামেরাটা নিয়ে আসি। ক্লিক!—ক্লিক! পর পর ছবি উঠল কয়খানা। জনৈকা জাপ তরুণী মিচিকো সোডা'র ছবি। তুললেন, জাপানের যুবরাজ আকিহিতো।

যুবরাজের বয়স পঁচিশ, মেয়েটির—চব্বিশ।

যথাসময়ে সোডা'র নামে খাম এল একখানা। মিচিকো ত্রস্ত হাতে এনভেলাপটা খুললেন। কিন্তু ভেতরে চিঠি নেই, ছবি। তাঁর নিজের ফটোগ্রাফ। পাঠিয়েছেন—আকিহিতো। ছোট্ট নোটটি পড়ে জানা গেল, প্রাসাদের বার্ষিক প্রদর্শনীতেও এই ছবিটিই ঝুলছে। মিচিকো হাসলেন। নিজের ফুটফুটে ছবিটা দেখে, না ছবিতে ফটোগ্রাফারের মনটা দেখে, বোঝা গেল না।

যাওয়ার কথাও নয়। দু' বছর আগে কানের কাছে আকিহিতোর নামটা শুনে সোডা হেসে বলেছিলেন—ভালবাসতে হয়ত পারতাম, রাজকুমার যদি আর এক আধ ইঞ্চি উঁচু হতেন। সোডা নিজে পাঁচ ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি, আকিহিতো পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি।

রাজপ্রাসাদের ঘটকেরাও সেই লম্বা ফর্দটি থেকে কেটে বাদ দিয়েছিলেন মিচিকোর নামটি। তবে সে অন্য কারণে। সোডা সুন্দরী, সুলক্ষণা, সুশিক্ষিতা। সে টোকিও'র বিখ্যাত 'সেক্রেড হার্ট 'স্কুলের ছাত্রী। সেখানে মেয়েদের নাম ডাকতে গেলে জাপানের সমুদয় শিল্পপতিদের নাম মুখে আনতে হয়। বিখ্যাত ধনপতির কন্যা সোডা সেখানে পড়ে। মাস্টাররা বলেন—মেয়েটার একমাত্র ক্রটি, ওর কোন ক্রটি নেই। কুলজীকাররা বললেন—ওর আসল ক্রটি ওর পিতৃকুলে 'কাজকু' রক্ত নেই। অর্থাৎ, ওরা কুলীন নয়।

এগুলো নেপথ্যের ঘটনা। টেনিস কোর্ট-এর ঘটনা একটু অন্য রকম। পরের বছর (১৯৫৮) গরমের ছুটিতে আবার কারুইজাউয়া বেড়াতে এসেছেন মিচিকো। ক'দিন বাদে সপারিষদ আকিহিতোও। আবার সেই টেনিস কোর্ট, আবার সেই খেলা। তবে এবারে আর দু' জন জালের দুদিকে নয়। ওঁরা একদিকে, অন্যদিকে যে খুশি! খেলার আগে আকিহিতোর র‍্যাকেটখানা বয়ে নিয়ে এলেন মিচিকো, খেলার শেষে তিনি তোয়ালে দিয়ে যুবরাজের ঘাম মুছিয়ে দেন।

বিদায় নেওয়ার আগে যুবরাজ নিমন্ত্রণ পাঠালেন মিচিকোর বাড়ি। পার্টি শেষ হল। আকিহিতো ইসারা করলেন। পার্শ্বচর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ওরা দু'জনে নাচলেন। নাচের শেষে গান। মিচিকো সেদিন

রাত এগারোটা অবধি যুবরাজের অতিথি।

সুতরাং, যা হওয়ার তাই হল। রাজপুত্রের হৃদয় হারাবার কথাটা দিকে দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। দেশে ঝড় উঠল। পক্ষে—তুমুল, বিপক্ষেও মন্দ না। মিচিকো পালাতে চাইলেন। তিনি দেশ ভ্রমণে বের হলেন। যুবরাজের চিঠি তাঁর পেছনে পেছনে দেশে দেশে ছুটতে লাগল।

সোডা ফিরে এলেন। মেলব্যাগ ভারী হয়ে উঠল। তৎসহ, প্রত্যহ টেলিফোন কল। অবশেষে তারেই সম্মতি জানাতে হল। ৩রা নভেম্বর, ১৯৫৮। তারের একপ্রান্ত থেকে 'সাধারণ মেয়ে' মিচিকো সোডা বিশ্বের অন্যতম অসাধারণ রাজবংশের উত্তরাধিকারীকে জানালেন—'যুবরাজ যদি আমার পাণিপীড়নে আগ্রহী হয়ে থাকেন তবে এ অধীনার তাতে আপত্তি নেই।'

১০ই এপ্রিল ১৯৫৯। রাজপ্রাসাদের একটি নির্জন ঘরে সেই 'অসম্ভব' সাধিত হল। জাপ সম্রাট হিরোহিতোর পুত্র ভবিষ্যতের মিকাডো আকিহিতো জনৈকা মিচিকো সোডাকে ধর্মপত্নী হিসাবে গ্রহণ করলেন। বৃদ্ধ সম্রাট তাঁদের আশীর্বাদ জানালেন, প্রজারা—অভিনন্দন। কিন্তু ঐতিহ্য মনে মনে আফশোষ করল, এবং নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইতিহাস। কেননা, ঘটনাটা সত্যিই তার বাঁধা সড়কটার বাইরে পড়ে।

পৃথিবীতে যত রাজবংশ আছে জাপান তাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো। এত পুরনো যে এই বংশের আদি কে কেউ তা জানে না। সম্রাটেরা বলতেন আদি—ঈশ্বর। তাঁরা বলতেন ঈশ্বর যা জাপ সম্রাটও তাই। সুতরাং, প্রজারা তাদের দেখা পেত না। যদি কারও সে সৌভাগ্য (!) হ'ত তবে তৎক্ষণাৎ সে আত্মহত্যা করত। কেননা, সাক্ষাৎ ভগবানকে যে দেখেছে তার আর বেঁচে থাকার দরকার কি?

ইতিহাস এই অবিশ্বাস্য ঐতিহ্য নিয়েই খৃষ্টপূর্ব ৬৬০ অব্দ থেকে ১৯৪৬ সন অবধি চলছিল। '৪৫-এর আগস্টে হিরোসিমায় বোমা পড়ল। '৪৬-এ হিরোহিতো বললেন—আমি ভগবান নই, মানুষ। এতদিন ভুল হয়ে গেছে আমার! সম্রাট পথে বের হলেন। কিন্তু কেউ তাকাতে চায় না তাঁর মুখের দিকে। ঘৃণায় নয়—ভয়ে। ভগবান কি কখনও নিজে বলেন তিনি

ভগবান ?—অথচ, হিরোহিতো কি করে প্রমাণ করেন তিনি মানুষ !

স্কুলে স্কুলে সম্রাটের প্রতিকৃতি। ছেলেমেয়েরা তা দেখতে পায় না। ছবিগুলো কালো কাপড়ে ঢাকা। তারা তাঁর সামনেই সোজা হয়ে দাঁড়ায়, মাথা নুইয়ে প্রণাম করে। মিচিকো যখন এগার বছরের কিশোরী তখন সেও তাই করত !

আগামী শীতে আমাদের মান্য অতিথি আকিহিতো সেই দেশের যুবরাজ ! সুতরাং তাঁর পক্ষে 'সাধারণ মেয়ের' ছবি দিয়ে টেবিল সাজানটাও জাপানের ইতিহাসে সহজ ঘটনা নয় বৈকি !

এত বড় একটা ঘটনা যে কারণে সম্ভব হল সেটা যদি শুধু মাত্র যুবরাজের তরুণ হৃদয়টিই হত তাহলে —আকিহিতো হয়ত আজ গৌরবটা পেতেন ঠিকই, কিন্তু মর্যাদাটা হারাতেন। কিন্তু তা হয়নি—বিবিধ কারণে। প্রথমত সেটা ছিল ১৯৫৯ সন। অর্থাৎ ম্যাকআর্থার রচিত শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার এক যুগ পরের ঘটনা। দ্বিতীয়ত, এ-যুগে সম্রাটের চেয়ে 'সম্রাট' নামীয় প্রাসাদবাসী বিজ্ঞ বা ভদ্রজনদের যে বেশি জনপ্রিয়তা সে-কথা তাঁকে নিজে শিখিয়েছেন সম্রাট হিরোহিতো। তৃতীয়ত, আকিহিতো জীবনে এমন একজন শিক্ষক পেয়েছিলেন যিনি খেলায় হেরে গেলে যেমন ছাত্রকে মৃদু ভর্ৎসনা করেন, তেমনি প্রতিপক্ষে মেয়েটি যে সত্যিই রুচিশীলা সে-কথা বলতে ভোলেন না।

আকিহিতো ছেলেটি কেমন সে সম্পর্কে তাঁর মতামত শোনা যাক। জাপানের যুবরাজ ভাল ঘোড়ায় চড়তে পারেন, ভাল সাঁতার কাটতে পারেন, ভাল টেবিল টেনিস এবং ভালো (?) লন টেনিস খেলতে পারেন। তিনি ধূমপান করেন। তবে, খুব না। মদ খান। কিন্তু—নাম মাত্র। তার চেয়েও বড় সংবাদ—তিনি ইতিহাস পড়তে ভাল বাসেন। কিন্তু জাপ-সম্রাটদের চেয়ে ইংরেজ রাজদের বেশী, এবং যুদ্ধের চেয়ে রাজ-রাজড়ার টুকিটাকি খবর অধিকতর। বিশেষ—সেই জায়গাটা, পঞ্চম জর্জের জীবনী যেখানে লিখেছে :

'King George preferred a quiet evening at home when he could read aloud to the queen.'

তবে ইদানিং সময় পেলে যুবরাণীর ছোট্ট ছেলেটিকে আদর করাও তাঁর নেশা।

আগা খাঁ

ছেলেরা ওর নামে গান গায়। মেয়েরা ওর নামে টাকা পাঠায়। ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে ওঁর নামে 'জিন্দাবাদ' তুলে দল বেঁধে কোর্টে যায়। খেলনাওয়ালা ওর নামে পিস্তল বেচে, কাগজওয়ালা বাড়তি বিশ কপি। ১৫. ৯. ৬০

আগা খাঁ, করিম

আমাদের 'কে'র কথা বলছ! —কেমন ছেলে বলব? —এক কথায় অভাবিত। ওঁর পোশাক কী ছিল জান? বুকখোলা একটা সার্ট, একটা বাদামী রঙের চামড়ার জ্যাকেট, ইস্ত্রিহীন প্যাণ্ট, আর জুতো? বোধহয় কোনদিন পালিশ পড়ত না ওতে। তাই ত বলছি অভাবিত, একদম ডাঁট নেই!—সাক্ষী দিয়েছিল হাভার্ড-এর রুম-মেট জন,—স্টীভেনসনের ছোট ছেলে।

স্বচক্ষে দেখবার পর কলকাতারও সাক্ষ্য তাই,—একদম দেমাক নেই। অথচ অনায়াসে তা থাকতে পারত। কারণ, 'কে' মানে ক্রুশ্চফ নয়,—কেনেডি নয়, করিম। হিজ হাইনেস করিম অল হুসানী শাহ, যিনি হজরত মোহম্মদের কন্যা ফতিমাবিবির সাক্ষাৎ উনপঞ্চাশত্তম পুরুষ, বিখ্যাত আগা খাঁ যাঁর দাদু, আলী খাঁ পিতা এবং নিজেও যিনি আগা খাঁ,—ইসমাইলী-দের পয়গম্বর চতুর্থ আগা খাঁ। তাঁর অনুরাগী সংখ্যা কম করে দুই কোটি, টাকা কোটি কোটি; পারিবারিক ঐতিহ্য রহস্যরোমাঞ্চ উপন্যাসোপম এবং তার চেয়েও বড় তথ্য, করিম শাহ'র বয়স মাত্র পঁচিশ বছর!

জন্ম—জেনেভায়। দেশ কোথায় সেভাবে বলা শক্ত। পারস্যের শাহ'র সঙ্গে ঝগড়া করে দ্বিতীয় আগা খাঁ একদিন চলে এলেছিলেন ভারতে। তৃতীয় প্রধানত ভারতীয় হিসেবেই রাজনৈতিক জীবন যাপন করলেও ঠিকানা ছিল তাঁর সুইজারল্যাণ্ড; বাবা আলি খাঁন শেষ জীবনে ছিলেন পাকিস্তানী চাকুরে। পিতামহের তিরোভাবের পর চতুর্থ আগা খাঁ করিমের অভিষেক হয়েছিল দার-এস-সালামে [১৯৫৭]। তারপর একই অনুষ্ঠান নানা দেশে। সুতরাং, পরিচয়টা অন্যভাবেই দেওয়া ভাল।

করিমের মা ছিলেন—বিখ্যাত ইংরেজ ব্যারণ চার্সটন দুহিতা জন বারবারা গিইনেস। তের বছর পরে আলি খাঁর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের সময় আদালত স্থির করেছিল তাঁর ছেলে দুটি বাবার হেফাজতেইথাকবে।

করিম তবুও মাকে ছাড়েন নি। প্রতিটি ছুটি তাঁর লণ্ডনের ইটন স্কোয়ারে মায়ের কাছেই কেটেছে। এখনও লণ্ডনই তাঁর স্থায়ী ঠিকানা।

যেমন মাতৃভক্ত, তেমনি নিজ সম্প্রদায়ের অনুরক্ত। গরীব ইসমাই-লীদের সাহায্যে আসতে পারেন এই ভাবনায় হার্ভার্ডে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে চেয়েছিলেন। কেমেস্ট্রিতে ফেল করায় তা আর হয়নি, প্রাচ্য ইতিহাসেই ডিগ্রি নিয়েছেন। কিন্তু তরুণ আগা খাঁর আসল খ্যাতির হেতু তাঁর সারল্য। ছ' ফুট উঁচু, সুন্দর চেহারা. প্রখর তরুণ। কিন্তু পঁচিশ বছরের এই ধর্মনায়ক আজও হেডলাইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে! তিনি মদ খান না, সিগারেট খান না ;—কিন্তু বৈঠকে তবুও হারেন না। কেননা, যে দেশের যা বুলি সব তাঁর মুখস্ত। —মায় উর্দ্‌ পর্যন্ত। ৪.১০.৬২

অদোলা, সিরিল

নাটক এখন শেষ অঙ্কে।

দেশ রক্তাক্ত, মুমূর্ষু ; অনুরাগী আত্মীয়রা ক্লান্ত, বিদেশী দর্শকেরা বিরক্ত। [অবশ্য সকলে নহে !]

শেষ অঙ্কে কঙ্গোর রঙ্গমঞ্চে নতুন নায়ক এসেছেন। [—এসেছেন কিংবা আনা হয়েছে ?] তিনি—লাফান না, ঝাঁপান না, মদ খান না, হাসেন না। স্বভাবতই, তাঁকে ঘিরে কঙ্গোর অনেক প্রত্যাশা। অন্য কথায়, কঙ্গোর তিনিই শেষ ভরসা।

নাম—সিরিল আদোলা। বয়স —উনচল্লিশ। পরিচয়—এককালে লুমুম্বার সহচর। তবে আপাতত প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবুর দোসর। আদোলা তাঁরই চেষ্টায় কঙ্গোয় সর্বশেষ প্রধান মন্ত্রী।

নতুন প্রধান মন্ত্রী বটে, কিন্তু পুরনো রাজকর্মচারী। এককালে আদোলা ছিলেন ব্যাঙ্ক কর্মচারী। ফলে, লোকে বলে, বক্তৃতাটা কম জানলেও তিনি খাতা পত্রটা বোঝেন। তাছাড়া, ধর্মে রোমান ক্যাথলিক বলেই আফ্রিকান গোষ্ঠীতন্ত্র কি বস্তু তাও তিনি কিছু কিছু জানেন। সুতরাং সকলের আশা, শাসকহীন দেশে, জাতি এবং গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের রাজ্যে—এই ছোটখাট মানুষটি সত্যিই এক ভরসা।

ভরসার কথা আদোলাও শুনিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন : সকলে কি তাঁকে মেনে নিয়েছেন ?

সাকুল্যে একচল্লিশজন মন্ত্রী নতুন মন্ত্রী সভায়। তাঁদের সকলের মনের

খবর কেউ বলতে পারে না। কেউ সঠিক জানেনা ঠিক এই মুহূর্তে কি ভাবছেন—মবুটু কিংবা গিজেঙ্গা? আর চোম্বে?

বলা বাহুল্য, যতক্ষণ তাঁদের সকলের শেষ সিদ্ধান্তের কথা জানা না যাচ্ছে, ততক্ষণ কেউ বলতে পারেন না—শেষ অঙ্ক এখানেই শেষ কিনা!

১৭.১.৬১

আদেন্যুর, কনরাড

বয়সে চার্চিলের চেয়ে দু'বছরের ছোট। হয়ত বা ব্যক্তিত্বের মাপে এবং জগতের পরিধিতেও। কিন্তু একালের শ্রেষ্ঠ অ্যাংলো-স্যাক্সন চার্চিল বলেন—আদেন্যুর এ যুগের শ্রেষ্ঠ জার্মান। তিনি দ্বিতীয় বিসমার্ক।

তারও বেশী। বিসমার্ক তবুও একটি দেশ হাতে পেয়েছিলেন। তহবিলে তাঁর একটি জাতি ছিল। কিন্তু চৌদ্দ বছর আগে ১৯৪৯ সনের শরতে 'গ্রাণ্ড ওল্ড ম্যান অব দি রাইন', রাইনের-বুড়ো আদেন্যুর যে জার্মানীকে নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কী ছিল তার? সতের বছরের তরুণী তখন ট্রেনে দেশ ছেড়ে পালাতেচাইছে,—ইউরোপের পথে পিতৃহারা জার্মান তরুণ আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—মানুষ দেখলে দু'হাতে মুখ ঢেকে চেঁচিয়ে উঠছে—না, আমি জার্মান নই। পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, বিধ্বস্ত জার্মানী সেদিন শুধু দেহে নয়, মনেও রিক্ত! তার সামনেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন সেই 'ডার আলটে'—বৃদ্ধ। কোলন-এর এক কেরানী তনয়। নগরের ভূতপূর্ব মেয়র। জার্মানী সবিস্ময়ে তাঁর স্নেহাতুর চোখ দুটোর দিকে তাকিয়েছিল।

চৌদ্দ বছর পরে আজ সেই একই বিস্ময় বিশ্বের চোখে। বৃদ্ধ যেন যাদুকর। তাঁর হাতের ছোঁয়ায় জার্মানী বিশ্বমানচিত্রে আজ শুধু আবার একটি ভৌগোলিক অস্তিত্বই নয়,—সেখানে পূর্ণ গণতন্ত্র, পার্লামেণ্টারী শাসন,—পরিপূর্ণ যৌবন, জীবন। মৃত জার্মানী শিল্পে আজ বিশ্বে তৃতীয়, বাণিজ্যে প্রবল। তদুপরি ফরাসী দেশ এবং পশ্চিমের সঙ্গে তার আন্তরিক বন্ধুত্ব। ৩ লক্ষ ৮৫ হাজারের বাহিনী নিয়ে পশ্চিম জার্মানী আজ 'নাটো'র অন্যতম বল। যে কোন জার্মান জানে, এ অবিশ্বাস্য যিনি সম্ভব করেছেন তিনি সেই বৃদ্ধ, নাম যাঁর কনরাড আদেন্যুর। চার্চিলের মত আজকের জার্মানীতে একমাত্র তিনিই বলতে পারেন—'নেভার হ্যাজ সো মাচ

বিন ও'ভ টু, বাই সো মেনি, টু সো ফিউ!' জার্মানীতে সে 'কতিপয়' একমাত্র তিনিই।

স্বভাবেও যেন দ্বিতীয় চার্চিল। চার্চিল ঝগড়া করতেন তাঁর জেনারেলদের সঙ্গে ; চ্যান্সেলার ধৈর্য-হীন তাঁর দল এবং মন্ত্রীদের প্রসঙ্গে। মন্ত্রীরা তাঁর কাছে যেন স্কুলের বালক। আদেন্যুর বলেন—কী করব, ঈশ্বরের দোষ।...তিনি আমার মাথা নানা বদ-আইডিয়ায় ভরে দিয়েছেন! চার্চিলের মতই হাসতে জানেন আদেন্যুর। জনৈক সাংবাদিকের একটি প্রশ্ন শুনে তিনি উত্তরে বলেছিলেন—তুমি যদি ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসে কাজ করতে তা হলে এতক্ষণে তোমার চাকরী খেয়ে দিতাম আমি।

এবার সেই দুর্ধর্ষ চ্যান্সেলার নিজেই কর্মহারা। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই রাজনীতি থেকে বিদায় নিচ্ছেন তিনি। কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন, জার্মানীর ইতিহাস থেকে নয়। আদেন্যুর সেখানে অনিবার্যভাবেই চিরকাল একটি বিশেষ 'যুগ।'

জাতি যাঁর কর্মশালা, অবসরে কী করে সময় কাটাবেন সেই বিশ্বকর্মা? আদেন্যুর সেখানেও দ্বিতীয় চার্চিল। হিটলারের আমলে দুবার কারাগারে গিয়ে সময় কাটিয়েছিলেন তিনি। তারপরও যে সময়টুকু হাতে ছিল তা কাটিয়েছিলেন ডিটেকটিভ বই আর কবিতা পড়ে, ক্লাসিক্যাল গান শুনে, নয়ত বাগান করে। সে পুরনো অভ্যেস এখনও কিছু রয়ে গেছে। বিদায়ী রাজনীতিক এবার তা-ই করবেন। চার্চিল যদি ছবি কিছু আঁকেন, তবে তিনি কবিতা পড়বেন,—গোলাপ বাগান করবেন।

১০. ৫. ৬৩

আল্ড্রিক, ইভো

বৃদ্ধ অস্ট্রিয়ান অধ্যাপক। বিস্তর পড়াশুনা করেছেন, অনেক জ্ঞানগর্ভ বইও লিখেছেন। সেবার স্ত্রীকে নিয়ে যুগোস্লাভিয়ায় এসেছেন তিনি ছুটি কাটাতে।

দক্ষিণ যুগোস্লাভিয়ার সমুদ্র-সৈকত। সীমাহীন তরঙ্গায়িত তরল, দক্ষিণী সূর্য,—জরাগ্রস্ত জ্ঞানী বৃদ্ধ। ...হঠাৎ একটা সামুদ্রিক পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। চমকে অধ্যাপক উঠে দাঁড়ালেন। শরীরের তন্তুতে তন্তুতে যেখানে যতটুকু প্রাণ-বিন্দু অবশিষ্ট ছিল তাঁর সব যেন এক সঙ্গে জমায়েত হল,—শান্ত মানুষটা ঝড়ের সমুদ্র হয়ে গেলেন। তিনি

হারিয়ে গেলেন। চিরকালের মত উধাও হয়ে গেলেন!

আর সেই ভৌতিক পাখিটা?—কি নাম ছিল তার? লেখক বলেন—বার্ড অব জয়—আনন্দের পাখি!

কিংবা, আর একটা :

এক ছিলেন কেরানী। জীবনে তাঁর শুধু অপমান আর অপমান। কোথাও একবারের জন্যেও মানুষের মর্যাদা পেলেন না তিনি!

কিন্তু একদিন পেলেন। কেরানী সেদিন সম্রাট হয়ে উঠলেন। তিনি হো হো হাসছেন, ওপরওয়ালাদের যাচ্ছেতাই গালমন্দ দিচ্ছেন, নির্ভীকের মত তাঁদের নির্বোধ বলছেন,—শাস্তি দিচ্ছেন!

সে কবে জানেন? বছরের একটি বিশেষ দিনে, তাঁর জন্মদিনে। কেরানী সেদিন ইচ্ছেমত মদ খাওয়ার সুযোগ পান! ফলে, প্রতি বছর এই একটি দিনেই তিনি নিজের ভেতরে যে মর্যাদাবান মানুষটি, তার দেখা পান!

সে যেন সম্পূর্ণ অন্য জগৎ, অন্য কলম, অন্য ধ্যান। লেখক বলেন—এ গল্প দুটো তাঁর অন্যতম নিকৃষ্ট গল্প। কিন্তু যুগোস্লাভিয়ার পাঠকেরা চোখ বুঁজে বলে দিতে পারেন—এ তাঁদের আন্দ্রিকের গল্প। ওঁরা বলেন, আন্দ্রিক আমাদের আর কারও মত নয়। [যুদ্ধের পরে গেল পনের বছর এক নাগাড়ে তিনি যুগোস্লাভিয়ায় 'বেস্ট সেলার']। সমালোচকেরা বলেন—আন্দ্রিক মনুষ্য স্বপ্নের নিপুণ বাস্তুকার, তিনি দ্রষ্টা কবির মত। [সম্মানে—তিনি যুগোস্লাভিয়ায় শোলকফ-এর মত। তিনি যুগোস্লাভ রাইটার্স ইউনিয়নের সভাপতি] সুইডিস একাডেমি বলেন—আন্দ্রিকের উপন্যাস মহাকাব্যের মত!

[তাঁর 'ব্রীজ অন দি দ্রিনা'ই নোবেল পুরস্কার বিজয়ী।]

বয়স উনসত্তরে পড়েছে। কিন্তু তবুও পূর্ব ইউরোপের সেই ছেনিতে-কাটা দেহ, খাড়া নাক, জলপাইয়ের মত মসৃণ চামড়া, দীঘল ভ্রূ, কালো গভীর দুটো চোখ। নাম—ইভো আন্দ্রিক।

আন্দ্রিক পেশাদার লেখক ছিলেন-না। পরবর্তীকালে তাঁর যেমন পরিচয় দাঁড়ায় কূটনীতিক, তেমনি কলম হাতে নেওয়ার সময় লোকেরা জানত তিনি রাজনীতিক। সে তিরিশের যুগের কথা। আন্দ্রিক তখন জেলে!

বাবা দরিদ্র কারুজীবী ছিলেন। তাছাড়া আন্দ্রিক ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর

মাত্র দু' বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। তবুও ছেলেটির পড়াশুনা আটকায়নি, কারণ মা উদ্যোগী ছিলেন। তিনিই ওঁকে অস্ট্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস আর দর্শন পড়িয়েছিলেন। [ওঁর দর্শনের ডক্টরেটটা প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের] সেখানেই রাজনীতির সংক্রমণ, —সক্রিয় যুব আন্দোলন এবং অবশেষে কারাবাস।

জেলেই লেখার হাতেখড়ি। বিষয় —জেল জীবন। 'লিখতাম ছাপার জন্যে নয়, সময় কাটানোর জন্যে।'

ছাপাবার যখন সময় হল আন্দ্রিকের তখন লেখার বিশেষ সময় নেই। তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করেন। কর্মস্থল—হিটলারের বার্লিন। আন্দ্রিক সেখানে যুগোস্লাভিয়ার রাজদূত।

নিষ্ফল দৌত্যে মাঝপথে বিরাম দিয়ে রাজদূত যখন স্বদেশে ফিরলেন, বুদাপেস্টে তখন ঝুর ঝুর করে বোমা পড়ছে; কোথায় ফরেন আপিস, কোথায় কে? আন্দ্রিক কলম হাতে দরজায় খিল দিলেন। সকালের মধ্যে শহরতলীর সেই ঘরে লিখতে হল বিজয়ী উপন্যাস—'দি ব্রীজ অন দি দ্রিনা।' তারপর দেখতে দেখতে এল 'বসনিয়ান স্টোরি', 'দি স্পীনস্টার' বা 'মিস' এবং '৫৪ সনে—'দি কার্সড্ কোর্টইয়ার্ড'। যুগোস্লাভিয়া এক-বাক্যে স্বীকার করল—আন্দ্রিক আমাদের শ্রেষ্ঠ লেখক! ইউরোপ বলল—আন্দ্রিক যুদ্ধপর ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। সুইস একাডেমি ওঁকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দিয়ে জানালেন—আন্দ্রিক অতঃপর অমর লেখকও।

আন্দ্রিক এখন আর 'রাজনীতি' করেন না। যদিচ পার্লামেণ্টে তিনি নিজের এলাকার প্রতিনিধি তবুও তাঁর একমাত্র পরিচয় এখন—লেখক। যুগোস্লাভিয়ার সেরা লেখক। তাঁর শেষ বই বেরিয়েছে গেল মে মাসে। বইটির নাম—'ক্যারেকটারস।' সমালোচকেরা বলেন—'তুলনায় এটি একটু নিকৃষ্ট।' কিন্তু পাঠকেরা কিনে কিনে জানিয়েছেন—'বুড়ো আন্দ্রিকই এখনও বেস্ট সেলার!'

২.১১.৬১

আবুবকর, তাফাওয়া বালেওয়া

রাজত্ব বিদেশীর। দেশ আমীর আর সর্দারদের। বাবা গরিব 'তালা কাওরা'। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ। সুতরাং জীবনে সম্ভাবনা বলতে যা ছিল তা খেতখামারে কাজ—কিংবা

কোন খনিতে। তবুও তাফাওয়া-বালেওয়া গাঁয়ের কালো কুচকুচে হাড্ডিসার ছেলেটির নামের আগে যে একটা 'স্যর' এবং পরে একটা কে.বি.ই' জুটে গেল সে শুধু আবুবকরের বরাত!

আবুবকরের বরাত ভাল যে সে ইস্কুলে গিয়েছিল। মাথাটা ভাল ছিল। সুতরাং কলেজে যাওয়ারও সুযোগ মিলল। গাঁ থেকে বহুদূরে উত্তর অঞ্চলে একমাত্র কলেজ। আবুবকর সেখানে ভর্তি হল। সেখান থেকে চলে গেল বিলাতে। আবুবকর লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের টিচার ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের পাশ করা ছাত্র।

কিন্তু নাইজেরিয়ায় আলহাজী স্যর আবুবকর তাফাওয়া বালেওয়া কে. বি. ই. আজ স্কুল-টিচার নন, তিনি নাইজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী। নাইজেরিয়া পশ্চিম আফ্রিকার মস্ত দেশ। পাঁচটা রাজ্য, প্রচুর লোক, অনেক জাত, অনেক ভাষা সেখানে। [লোকসংখ্যা সাড়ে তিন কোটি, জাতি সংখ্যা ২৫০, ভাষা-৪০০] আবুবকর সেই দেশের প্রধান মন্ত্রী। সেও যেন বরাত!

রাজনীতিতে আবুবকর হাল আমলের মানুষ। বয়স তাঁর মোটে সাতচল্লিশ। প্রতিদ্বন্দ্বীরা বলেন, কিন্তু ধ্যান ধারণায় দু'শ সাতচল্লিশ। রাজনীতিতে নামবার আগে আবুবকর 'হাজী' হয়েছেন। তার চেয়েও আশ্চর্য কথা, 'স্বাধীন হতে চাই না' স্লোগান নিয়ে তিনি জনতার আসরে নেমেছেন। আবুবকর বলতেন—ইংরেজ যদি চলে যায় তবে দেশ দেখবে কে? দক্ষিণ পশ্চিমে না হয় লোক আছে, কিন্তু আমার উত্তর এলাকায় মানুষ কৈ? সুতরাং ইংরেজের চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না। যদি তাঁরা যেতেই চান, তবে জেহাদ ঘোষণা করব আমি!

তবুও ইংরেজরা চলে গেলেন। জেহাদ হল না এবং স্বাধীন নাইজেরিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন আবুবকর নিজেই। ইংরেজরা কেন গেল সে অন্য কথা। স্যর আবুবকর কিভাবে প্রধান মন্ত্রী হলেন সে কথাই বলি। এককথায় তার উত্তর—সংখ্যার বলে। আবুবকর উত্তর অঞ্চলের মানুষ। এলাকাটা পঞ্চরাজ্যের ফেডারেশনে সবচেয়ে বড়, লোকও সেখানে সবচেয়ে বেশী। জাতিতে তারা মুসলমান এবং আবুবকর তাদের কাছে যুগপৎ স্যর এবং হাজী। ফলে ১৮৪টি আসনের মধ্যে ৮২টি তাঁর দখলে।

নিষ্ঠাবান হাজী হলেও আবুবকর একেবারে একালের স্পর্শরহিত মানুষ নন। অন্তত লাগস-এর প্রধান মন্ত্রী-ভবনটি ঘুরে এসে লোকে তাই বলে। সাজানো হারেম। পর পর চারটে ঘর। কিন্তু তিনটি শূন্য। '৩৪ সন থেকে আবুবকর একটি মাত্র পত্নীকে নিয়েই ঘর করেন। ৬.১০.৬০

আবদুল্লা, শেখ মোহম্মদ

কখনও সংশয়, কখনও শঙ্কা; কখনও উদ্দীপনা, কখনও আশা। একটি মানুষকে উপলক্ষ্য করে কোটি কোটি মানুষের মনে নানা বিপরীত চিন্তা।—কোন্‌টি সত্য হবে?—কোন্‌ পরিচয়ে এবার সামনে এসে দাঁড়াবেন তিনি? নাটক এখন চূড়ান্ত মুহূর্তে। ড্রপ সিন উঠেছে। গতকাল বিকেলে জম্মুর সেই সুন্দর বাড়িটা থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন একালের যথার্থ রীতিমত-নাটকের নায়ক, মুখে বিজয়ীর প্রসন্ন হাসি। ছ'ফুট চার ইঞ্চি উঁচু সেই বিশাল দেহী মানুষটির পেছনে বন্দী শিবিরের বন্ধ ফটক, সামনে ডাইনে বাঁয়ে একাধিক পথ। কোন্‌ দিকে পা বাড়াবেন তিনি?—কোন্‌ পথে?

নাম শেখ মোহম্মদ আবদুল্লা। ওঁরা বলেন,—শের-ই-কাশ্মীর, কাশ্মীরের বাঘ। কোন কোন বিদেশী রহস্য (!) করে বলতেন—'কিং আবদুল্লা'; অর্থাৎ 'কাশ্মীর রাজ'। 'রাজা' না হলেও রাজ-তরঙ্গিণীর দেশে কাশ্মীরে আবদুল্লা এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব,—ডোগরারাজের আমল থেকেই তিনি অধিকাংশ কাশ্মীরীর হৃদয়ের রাজা।

জন্ম—১৯০৫ সনের ডিসেম্বরে। শ্রীনগর থেকে সামান্য দূরে সৌরা নামে এক গাঁয়ে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। বাপ-ঠাকুর্দার পেশা ছিল শালের কারবার। আবদুল্লা বাবাকে দেখেননি। তাঁর জন্মের আগেই কারিগর লোকান্তরিত হয়েছেন। ছেলের হাতে সূঁচ তুলে না দিয়ে মা ইচ্ছে করেই এই সন্তানটিকে স্কুলে পাঠালেন। বাড়িতে আরও পাঁচ ভাই ছিলেন। তাঁরা খরচপত্রের ব্যবস্থা করলেন। উদ্যম বিফল হল না। শ্রীনগর থেকে তরুণ আবদুল্লা যথা সময়ে এনট্রান্স পাশ করলেন। ওঁরা তাঁকে এবার জম্মুর প্রিন্স অব ওয়েলস কলেজে পাঠালেন। আবদুল্লা সেখান থেকে আই-এ পাশ করলেন। তারপর লাহোর কলেজ থেকে বি-এ। সে

১৯২৭ সনের কথা। শেখের বয়স তখন মাত্র বাইশ বছর। সুতরাং আরও পড়তে আপত্তি নেই। লাহোরের ডিগ্রী নিয়ে আবদুল্লা চলে গেলেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে দু'বছর পরে শেখ যখন শ্রীনগরে ফিরে এসেছেন তখন তিনি শুধু এম এস সি ডিগ্রীটাই সঙ্গে নিয়ে আসেননি, রাজনীতিতেও মোটামুটি পোক্ত হয়ে এসেছেন।

অবশ্য শেখ আবদুল্লার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা বলতে গেলে লাহোরেই। ছাত্রাবস্থায়ই ১৯২৭ সনে সেখানে তিনি কাশ্মীরী মোটবাহী শ্রমিকদের নিয়ে একটি ইউনিয়ন গড়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল: স্ব-রাজ্যের প্রবাসী শ্রমিকদের জীবনভার লাঘব করা। আলিগড়ে এসে ক্ষেত্র আরও ব্যাপক হল। আবদুল্লা এখানে এসে মহাত্মা গান্ধী, মোহম্মদ আলি, সওকৎ আলি, কিচলু প্রভৃতি দেশবরেণ্য মানুষের প্রভাবে পড়লেন। কলেজ ইউনিয়নের সুযোগে বক্তৃতা মঞ্চের সঙ্গেও পরিচয় ঘটল। সুতরাং পুরোপুরি রাজনৈতিক মানুষ হিসেবেই এবার শ্রীনগরে তাঁর আবির্ভাব ঘটল।

আবদুল্লা তখন 'মাস্টার আবদুল্লা'। তিনি শ্রীনগরের গভর্নমেণ্ট হাইস্কুলে বিজ্ঞান পড়ান। অবসরে সহকর্মী তরুণ মুসলিম শিক্ষকদের নিয়ে দল পাকান। ওঁরা তার উৎসাহে 'ফতে কাদাল' নামে একটি রিডিং রুম করলেন, তারপর লাহোর থেকে দুটি কাগজ প্রকাশের ব্যবস্থা করলেন এবং অবশেষে প্রকাশ্যভাবেই আন্দোলনের পথে পা বাড়ালেন। সেই আন্দোলনে শেখের অন্যতম সহযোগী ছিলেন তাঁর স্ত্রী, বেগম আবদুল্লা। রক্তে তিনি আধা কাশ্মিরী, আধা বৃটিশ। বাবা তাঁর শ্রীনগরের এক ইংরেজ হোটেল মালিক, মা কাশ্মিরী গুজুর দুহিতা। সেই আন্দোলনের সূত্র ধরেই ১৯৩২ সনে প্রতিষ্ঠিত হল মুসলিম কনফারেন্স বা কাশ্মীরের মুসলিম লীগ। শেখ আবদুল্লা শুধু তার প্রেরণা নন, তিনিই তখন এই প্রতিষ্ঠানের অদ্বিতীয় নায়ক।

* * *

লীগপন্থী হিসেবে জীবন শুরু করলেও মুসলিম লীগের আদর্শ শেখ আবদুল্লার মনে যে কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি সেটা বোঝা গেল ক'বছর পরে, ১৯৩৮ সনে। শেখের উদ্যোগেই মুসলিম কনফারেন্স

সে বছর নাম নিল ন্যাশন্যাল কনফারেন্স। সেখানে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলের অবারিত দ্বার। এবং শেখ আবদুল্লা সেই থেকেই শুধু কাশ্মীরে নয়, ভারতেও অন্যতম জনপ্রিয় নায়ক। মহাত্মা তাঁকে স্নেহ করেন, নেহরু তাঁর জন্যে আইন অমান্য করে শ্রীনগর অবধি ছুটে আসেন। এই বন্ধুত্ব যে মিথ্যা ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় সেটা আরও প্রমাণ হল ১৯৪৫ সনে। সেবার জিন্না গিয়েছিলেন কাশ্মীর ভ্রমণে। তাঁর সম্বর্ধনায় আবদুল্লাও যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাষণ দিতে উঠে নির্দ্বিধায় তিনি ঘোষণা করেন—আপনাকে আমি অভ্যর্থনা জানাচ্ছি বিখ্যাত একজন ভারতীয় নায়ক হিসেবে, মুসলিম নেতা হিসেবে নয়। জিন্না ক্রুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন—আমার যদি কোন পরিচয় থাকে তবে সেটা এই যে আমি মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট!

সেদিনই বোঝা গিয়েছিল আবদুল্লা জিন্নাকে সম্পূর্ণ নিরাশ করেছেন। জিন্না সেই আশাভঙ্গের উত্তর দিয়েছিলেন দু'বছর পরে, ১৯৪৭ সনের অক্টোবরে কাশ্মীরে হানাদার ছেড়ে দিয়ে আর সেই ঐতিহাসিক লড়াইয়ে অবিশ্বাস্য মেরুদণ্ডের পরিচয় দিয়েই 'শের-ই-কাশ্মীর' হয়েছিলেন আবদুল্লা। সেদিন উদ্যত পাকিস্তানী রাইফেলের সামনে দাঁড় করিয়েও বন্দী কাশ্মিরী তরুণের মুখ দিয়ে বের করা যায় নি পাকিস্তান জিন্দাবাদ!

*　　*

স্বাধীনতার পরেও আবদুল্লা 'শের-ই-কাশ্মীর'। তিনি নির্মম রাজতন্ত্রের হাত থেকে স্বাধীনতা কেড়ে এনেছেন। নানা আন্দোলনে তিনি মোট সাত দফায় ন' বছর জেলে কাটিয়েছেন। কাশ্মীরকে তিনি বর্বর পাকিস্তানী আক্রমণের মুখে নির্ভীক নেতৃত্ব দিয়েছেন। গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের পাশে দাঁড়িয়ে লেকসাকসেসে [মার্চ, ১৯৪৮] তিনি নির্দ্বিধায় ভারতভুক্তির স্বপক্ষে সওয়াল করেছেন, কাশ্মীরের সংবিধান থেকে শুরু করে 'নিউ কাশ্মীর' পরিকল্পনা তথা রাজ্যের ব্যাপক আর্থিক সংস্কার সর্বত্র তিনি স্পষ্ট আদর্শবাদী নায়ক। কিন্তু হায়, তারপরেই সহসা কুসুমিত উপত্যকায় বিচ্ছেদের কীট সঞ্চার। '৫০ সনে কাশ্মীর গণপরিষদের উদ্বোধনী ভাষণে শেখ সাহেব কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার পর ঘোষণা করেছিলেন ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের

অন্তর্ভুক্তিই একমাত্র পথ। '৫২ সনে শোনা গেল তিনি অন্য পথও বিবেচনা করছেন। '৫৩ সনে সে বাসনা আর গোপন করা সম্ভব হল না। ফলে আগস্টে অবধারিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, নবজন্মের পর থেকে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কারারুদ্ধ হলেন। সাত বছর পরে '৫৯ সনে জানুয়ারীতে মুক্তি পেয়ে শেখ জানালেন তিনি এখনও তাঁর সেই পুরনো সুখ-স্বপ্নে মগ্ন। ফলে এপ্রিলে আবার কারাগার। বহু দিন পরে গতকাল শেখজী সেখান থেকে উন্মুক্ত অঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছেন।—এখনও কি মনে মনে তিনি তথাকথিত 'স্বাধীন কাশ্মীরের' স্বপ্ন দেখেন ?—চেনারের বনে এখনও কি তিনি স্টীভেনসন—ট্যালবটের ফিস ফিস প্রেমসঙ্গীত শুনতে পান ?

ইতিমধ্যে ঝিলামের বুক বেয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। গেল দুটি মাস বাদ দিলে আবদুল্লা-হীন কাশ্মীর দীর্ঘ দশ বছরের প্রতিটি রাত্রি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছে। বনে বনে এবং শালের কোণে তেমনি ফুল ফুটেছে, ক্ষেতে ক্ষেতে তেমনি রাশি রাশি জাফ্রান। সন্দেহ নেই 'শেরে'রও বয়স হয়েছে। তীক্ষ্ণ তলোয়ারের মত সেই তরুণটি এখন পরিণত বয়স্ক। তিনটি পুত্র এবং *দুটি কন্যার জনক আজ কারও পিতা-*মহ, কারও মাতামহ। ৯.৪.৬৪

আব্বাস, ফেরহাত

অদ্ভুত গল্প।

গল্পটার নাম দেওয়া যেতে পারে —'একটি মানুষের জন্ম।'

ঠাকুর্দা মস্ত ভূস্বামী ছিলেন। জাতিতে তিনি কি ছিলেন, আরব অথবা স্থানীয় আদিবাসী, নাতি তা বলতে পারবে না। সে শুনেছে ১৮৭১ সনে খুব বড় রকমের একটা বিদ্রোহ হয় তাদের এলাকায়। ফরাসীদের বিরুদ্ধে দেশীয়দের বিদ্রোহ। সে অবাধ্যতার জরিমানাস্বরূপ ঠাকুর্দার সম্পত্তি খোয়া গেল এবং ক বছর পরে [১৮৯৯] ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটি ফুটফুটে নাতি ঘরে এল। আদর করে তার নাম রাখা হল আব্বাস। ফেরহাত আব্বাস।

দশ বছরের ছেলে আব্বাস সারাদিন গরীব মেষ পালকদের সঙ্গে ঘোরে, কিন্তু যখন ঘরে ফেরে, তখন সে পাক্কা সাহেব। ফরাসীদের সঙ্গে বাবার খুব দোস্তি কিনা তাই। বাবা মস্ত রাজ-কর্মচারী। সুতরাং, ছেলেও পড়তে চলল সেরা সরকারী স্কুলে। সে স্কুলের ভাষা ফরাসী, আদবকায়দা

ফরাসী এবং অধিকাংশ ছাত্রও ফরাসীদের ছেলে। তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে মুসলমানের বাচ্চা সুরু করল ইতিহাস পড়া—'আওয়ার এ্যানসেস্টারস, দি গল'স্'—

স্কুলের পড়া শেষ হল। আব্বাস এবার কলেজে চললেন। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি চিকিৎসা বিদ্যার ছাত্র। যথাসময়ে এ বিদ্যা আয়ত্তে এল। সঙ্গে সঙ্গে পুরনো শিক্ষাটাও এবার জোরাল হল। আলজিরিয়ার একটা মফঃস্বল শহরের নবীন ডাক্তার আব্বাস অনেক ভেবে সিদ্ধান্তে এলেন—আলজিরিয়াকে ভালবাসা তাঁর কর্তব্য নয়।

'But would not die for an Algerian fatherland, because that fatherland does not exist.'

প্যারীর কাফেতে বসে আফ্রিকার অন্যান্য তরুণ নায়কদের সঙ্গে তর্ক করেন আলজিরিয়ার ছাত্রনেতা আব্বাস। তাঁর বক্তব্য আলজিরিয়ান জাতি বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। সুতরাং, ইউ ক্যানট বিল্ড সামথিং অন দি উইণ্ড! অন্যরাও নাছোড়-বান্দা। সুতরাং অবশেষে রফা হল। আব্বাস ঘোষণা করলেন; আল-জিরিয়াকে আর উপনিবেশ করে রাখা চলবে না। আমরা তাকে ফ্রান্সের প্রদেশ হিসেবে দেখতে চাই।

এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। আব্বাস সৈন্য বাহিনীতে নাম লেখালেন। বিদায় বাণীতে বললেন—'ফ্রান্সের জয় হক, আলজিরিয়ার জয় হক।'

যুদ্ধ শেষ হল। ফ্রান্স অবাক হয়ে শুনল আব্বাসের মুখে এক নতুন বাণী। তিনি বলছেন, আলজিরিয়ার মুসলমান আলজিরিয়ার মুসলমান থাকতে চায়। আজ থেকে আলজিরিয়ার তাই দাবী।

'এফ এল এন' আন্দোলনের সশস্ত্র সৈনিকদেরও দাবী এই। সুতরাং মধ্যপন্থার পথিক আব্বাস ধীরে ধীরে তাঁদের দিকে এগিয়ে চললেন। ১৯৫৪ সনে এরা ফরাসী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। '৫৬ অবধি উদভ্রান্তের মত দুই পক্ষের রক্তারক্তি দেখলেন আব্বাস। আপোষ মীমাংসার চেষ্টাও করলেন অনেক। কিন্তু বৃথা। প্যারিস যেন ক্রমেই আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল। সুতরাং, অগত্যা আব্বাসকেও তাই করতে হল। তিনি তাঁর দল ভেঙে দিলেন, দেশ ছাড়লেন, তারপর 'এফ এল এন'-এর রক্তমাখা পতাকাটাই হাতে তুলে নিলেন।

আমীর

আব্বাস এখন বিদ্রোহী। আলজিরিয়ার সশস্ত্র বিদ্রোহের নায়ক। তিনি অস্থায়ী আলজিরিয়া গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রীও বটে। তাঁর রাজ্য গোটা আলজিরিয়া। রাজধানী কায়রোর একটা ছ'তলা বাড়ীর একখানা ফ্ল্যাট। এখান থেকেই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মরণ-পণ লড়াই চালিয়ে চলেছেন আলজিরীয় মুক্তি-যুদ্ধের নায়কেরা। আব্বাস তাঁদেরও নায়ক।

'এফ এল এন' মন্ত্রিসভা স্থির করেছেন তাঁরা জেনারেল দ্য গল-এর নিমন্ত্রণ রক্ষা করবেন। তাঁদের হয়ে আব্বাস তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ-বিরতির সর্ত আলোচনা করবেন। সংবাদটা সুসংবাদ। ছয় বছরের বিরামহীন লড়াইয়ে আলজিরিয়া আজ ক্লান্ত। ক্লান্ত তার নায়কেরাও। বিশেষ করে আব্বাস। ফেরহাত আব্বাস গেরিলা যুদ্ধের মানুষ নন। বন্ধুরা বলেন তিনি ঘুমের মানুষ। আব্বাসের সবচেয়ে বড় বিলাস নাকি ঘুম। তবে শত্রুরাও স্বীকার করেন—সে ঘুমেও আব্বাস আলজিরিয়া ছাড়া আর কিছু স্বপ্ন দেখেন না।

২.৭.৬০

আমীর, ফিল্ড মার্শাল আবদুল হাকিম

জীবনটা যদি অন্যরকম হত তাহলে বলার কিছু ছিল না।

সামালাউট জেলার আস্তাল গাঁ নিবাসী বাবা ছিলেন একজন সম্পন্ন চাষী। এক ভাই আইন পড়তেন। আর এক ভাই পড়তেন কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগে। বাবার ইচ্ছে ছিল—ছোটটি ডাক্তারি পড়ে। কিন্তু মেডিকেল কলেজে ভর্তি করান গেল না। সুতরাং দিয়ে দেওয়া হল কৃষিবিদ্যার কলেজেই। '—চাষীই যদি হয় তবে হাল আমলের চাষীই হ'ক!'

সেখানেই পড়তেন। হঠাৎ লেবরেটারীতে বন্ধু আব্দুল কাদের বলল—'জানিস, আমি কলেজ ছেড়ে দিচ্ছি।'

'—কেন?'

'—আমি মিলিটারিতে যাচ্ছি।'

'—তবে আমিও যাব।'

সেটাই ছিল দরখাস্তের শেষ তারিখ। তা হক। সেদিনই দরখাস্ত পড়ল। দরখাস্ত মঞ্জুর হল এবং কোনমতে মেডিকেল পরীক্ষার ঝামেলাটাও

'রুশো'র সঙ্গে সেখানেই একদিন আকস্মিকভাবে পরিচয় হয়ে গেল নাসেরের। সেদিন সন্ধ্যায় জনৈক অফিসারের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছেন আমীর। তাঁর বাড়িতেও এমনি অনেকে আসেন। কিন্তু এবার ঘটনাটা একটু অন্যরকম হয়ে গেল। আদর্শবাদী নাসেরকে আমীরের ভাল লেগে গেল। এবং আমীরকে নাসেরের। ওঁরা সেদিনই বন্ধু হয়ে গেলেন।

তারপর অনেকবার দেখা হয়েছে দুই বন্ধুর। সুদানে, খার্টুমে, কায়রোতে,—প্যালেস্টাইনের রণ-ক্ষেত্রে। নাসের তীক্ষ্ণ চোখে ছেলেটিকে পর্যবেক্ষণ করে গেছেন সর্বত্র। সুদান উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাগারাগি করে একবার কাজে ইস্তফা দিয়ে দিয়েছিলেন আমীর কিন্তু নাসের বললেন—'না, এখনও সময় হয়নি, তুমি বরং ট্র্যান্সফার নাও!'

বন্ধুত্ব, উৎসাহ, পরামর্শ সব দিয়ে-ছিলেন সেদিন ওঁকে নাসের কিন্তু তবুও তিনি আমীরকে তাঁর ফ্রি অফিসারস অর্গেনাইজেশনের খবর দেন নি। আমীর সেটি পেয়েছিলেন মাত্র প্যালেস্টাইন যুদ্ধের পরে। কিন্তু খবরটা কানে আসামাত্র নাসেরকে ভালোয় ভালোয় ঢুকে গেল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে চাষীর ছেলে আব্দুল হাকিম আমীর 'শিক্ষিত চাষী' হতে হতে হঠাৎ মিলিটারী হয়ে গেল।

সেই ছেলেটিই এখন মিশরের বিখ্যাত সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল আমীর। ফিল্ড মার্শাল আমীর এখন শুধু সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের প্রধান সেনাপতি নন, ঐ নামের রাষ্ট্রটির তিনিই উপরাষ্ট্রপতি।

যেমন নাসের, তেমনি আমীর। গোড়া থেকে সৈন্যদের প্রিয় সেনাপতি। মিলিটারী একাডেমীতে নবীন শিক্ষার্থী আমীর ছিলেন সকলের প্রিয় 'কর্পোরাল আমীর'। তিনি কখনও চড়াগলায় কথা বলেন না, কখনও ভ্রূ কুঞ্চিত করেন না, কখনও রুটিন নিয়ে অত্যধিক ঘাঁটাঘাঁটি করেন না।

আঠার মাস পরে ১৯৩৯ সনে—কমিশনড হওয়ার পর বাতানার পদাতিক বাহিনী তাঁদের তরুণ অফিসারের [জন্ম—১৯১৯ সনের ডিসেম্বর] নাম দিল—'কমাণ্ডার রুশো'। কেননা, সদাচারী সদালাপী, নিয়মনিষ্ঠ আদর্শবাদী আমীর তখন রীতিমত রুশো ভক্ত। কথায় কথায় তিনি রুশো 'কোট্' করেন।

তিনি জড়িয়ে ধরেছিলেন। তারপর ১৯৫২ সনের সেই স্মরণীয় ২৩শে জুলাই অবধি প্রতি পদক্ষেপে তিনি নাসেরের সঙ্গী। আজও তিনি তাই আছেন।

'৫৩ সনের মার্চে মিশর প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল। সঙ্গে সঙ্গে আমীরের নাম ঘোষিত হল নবীন প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রধান সেনাপতি হিসাবে। '৫৬ সনে সুয়েজ যুদ্ধে তিনি ছিলেন মিশর, সিরিয়া, সৌদি আরব এবং ইয়েমেনের সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি। '৫৯ সনের মার্চ থেকে তিনি সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের উপরাষ্ট্রপতি।

উপরাষ্ট্রপতি আমীর দশ দিনের জন্যে ভারতে এসেছেন। এবার প্রজাতন্ত্র দিবসে বন্ধুর দেশ মিশর থেকে তিনি আমাদের অতিথি। তাঁকে স্বাগত।

উপসংহারে ফিল্ড মার্শাল আমীরের আর একটু পরিচয়। সেনানায়ক হলেও আমীর একজন দুর্লভ শ্রেণীর পাঠক এবং যুগপৎ একজন বিশিষ্ট খেলোয়াড়ও। তিনি চমৎকার দাবা খেলেন। তবে তার চেয়েও ভাল খেলতেন ফুটবল। উপ-রাষ্ট্রপতি এখনও তাঁর নিজের দেশের ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি।

২৫. ১. ৬২

আরলেণ্ডার, টেজ

সুকর্ণের জন্মের বছরই মিঃ আরলেণ্ডার-এর জন্ম (১৯০১)। তাঁর বাবাও ছিলেন স্কুল শিক্ষক। কিন্তু সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী আরলেণ্ডার হলেন শিক্ষামন্ত্রী। ১৯৪৫ সাল থেকে সুইডেনে লেবার মন্ত্রিসভা। সে বছর থেকেই প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞানের কৃতি ছাত্র আরলেণ্ডার সুইডেনের শিক্ষামন্ত্রী। এই দপ্তরে তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বঃ সুইডেনে বাধ্যতা-মূলক ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন। আরলেণ্ডারের বিধানে — সু ই ডি স ছেলেমেয়েরা আজ নয় বছর বাধ্যতা-মূলক স্কুলে পড়ে। পাঁচ বছর ইংরেজী পড়ে!

'৪৫ সালে মন্ত্রী মনোনীত হলেও টেজ' আরলেণ্ডার তাঁর ছাত্র জীবন থেকেই রাজনৈতিক। ১৯৩২ সালে শ্রমিক দলের সদস্য হিসাবে প্রথম পার্লামেণ্টে আসেন তিনি। তারপর থেকে আজ অবধিও অনড় আছে তাঁর আসন।

সুইডেনে নানা সমাজ সংস্কারক বিধি বিধানের সঙ্গে আরলেণ্ডার-এর নাম আজ অচ্ছেদ্য। পপুলেশন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে '৪১

সালে তিনিই প্রথম সন্ধান করেছিলেন একটি ছেলে বা মেয়ের ভরণপোষণে কত খরচ পড়ে তার মা বাবার! এবং সেদিন থেকেই আইন হয়েছে ওদেশে যে, মা বাবার আয়ে আর সন্তানদের পিছে ব্যয়ে যা ব্যবধান তা পূরণ করবে সরকার!

সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সুইডেন আজ আরও সুখী। কারণ, ১৯৪৬ সাল থেকে সোস্যালিষ্ট আরলেণ্ডার তার প্রধানমন্ত্রী। তিনি তার দেশের মানুষকে জানেন। তাঁর দেশও দীর্ঘকালের পরিচয়ে তাঁকে জানে। আলভিকের একটা তিন-কামরার ফ্ল্যাটে সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী স্ত্রী আর দুটি ছোট ছেলেকে নিয়ে বাস করেন। সকালে স্বামী পার্লামেণ্টের পথে বেরিয়ে যান। তাঁর পেছনে পেছনেই বের হন আইনা। তাঁরও স্কুল আছে। সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী স্টকহলমে মেয়েদের স্কুলে কেমেষ্ট্রি পড়ান। ২৪.১২.৫৯

আরিফ, আবদুল সালাম মহম্মদ

হাতটা চেপে ধরলেন কাসেম,—একী, কী মতলব তোমার সালাম? তুমি কী আমাকে খুন করবে?

হাতের পিস্তল হাতেই রইল। ডুকরে কেঁদে উঠলেন আরিফ,—না, না, আমি কাউকে খুন করব না,—আমি নিজেকে খুন করতে চাই!—আমি আত্মহত্যা করতে চাই!

—এবারও আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম আরিফ, সন্দিগ্ধ কাসেম আরিফের মুখের দিকে তাকিয়ে হাতটা ছেড়ে দিলেন।—কিন্তু আমার কথা রাখতেই হবে তোমাকে,—বাইরে যেতেই হবে। তোমার জন্যে আজ আমাদের দেশ দুভাগ হতে চলেছে,—আই ওয়াণ্ট টু কীপ ইউ এওয়ে ফ্রম ইভিল পিপল। নিজে গিয়ে এক গ্লাস দুধ নিয়ে এলেন কাসেম,—নাও, খাও। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় বল—রাজী?

রাজী হয়েছিলেন আরিফ। মাঝ রাতে সহকর্মীকে বিদায় জানিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে শোবার ঘরে ঢুকেছিলেন কাসেম। পরদিন সত্যিসত্যিই দেশের সহকারী প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ ছেড়ে রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র নিয়ে পশ্চিম জার্মানী যাত্রা করেছিলেন আরিফ। সে '৫৮ সনের অক্টোবরের কথা। অর্থাৎ, 'বিপ্লবের' মাত্র চার মাস পরের।

তিন সপ্তাহও কাটল না। হঠাৎ বিনা খবরে বন থেকে বোগদাদে ফিরে

এলেন আরিফ। এবার আর ক্ষমা নয়। পার্শ্বচরদের পরামর্শে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন কাসেম। কমিউনিস্টদের তৎপরতায় সামরিক আদালত সেজেগুজে বসেই ছিল। ডিসেম্বরে 'বিপ্লবের দুষমনের' বিচার হয়ে গেল। রায়: প্রাণদণ্ড। ফায়ারিং স্কোয়াড নিশানা তাক করে দাঁড়াল। কী ভাবলেন কাসেম, বললেন—সবুর। ওরা আবার ব্যারাকে ফিরে গেল, আরিফ নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে।

পুরো ১৯৫৯ গেল, '৬০ গেল। আরিফের মৃত্যুদণ্ড আর কার্যকর হল না। অধৈর্য কমিউনিস্টরা ঘুরে ঘুরেই আসে, চরম আদেশ চায়। কিন্তু কাসেম তবুও মনস্থির করতে পারেন না। কে শত্রু, কে মিত্র এখনও যেন তিনি ঠাহর করে উঠতে পারছেন না। যখনই আরিফ সম্পর্কে কথা ওঠে তখনই তাঁর এক কথা,—সবুর! '৬১ সনের জুলাইতে আরও যেন নরম হয়ে গেলেন কাসেম, বিপ্লবের তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে আরিফকে তিনি ছেড়ে দিলেন। হতবাক কমিউনিস্টরা প্রমাদ গুনলেন, বলে কয়ে তাঁরা আরিফকে যাতে অন্তত আরও কিছু দিন অন্তরীণ রাখা হয় তার ব্যবস্থা করলেন।

সেই ব্যবস্থাতেই ছিলেন আরিফ। বোগদাদের উপকণ্ঠে একটি বাড়িতে নিঃসঙ্গ বন্দীজীবন যাপন করছিলেন। গেল বছর মে মাসে—একবার শুধু মক্কা গিয়েছিলেন তীর্থ করতে। নয়ত সেই বন্দীশালাই ছিল—'৫৮ সনের ঐতিহাসিক বিপ্লবের পরে তাঁর একমাত্র প্রাপ্য, একমাত্র স্থায়ী পুরস্কার।

কিন্তু হারুনল রসীদের দেশে কোন কিছুই বোধহয় স্থায়ী নয়। আরব্য রজনীর শেষ কাহিনীটাই শেষ নয়। বন্দীশালা থেকে আবার দিনের আলোয় ফিরে এসেছেন ইদানীং অশ্রুতপ্রায় ইরাকী নায়ক কর্নেল আবদুল সালাম মহম্মদ আরিফ। সংবাদ, নব নেবুচাদনাজার কাসেমের শূন্যে ঝুলন্ত উদ্যানের কবরের ওপর বোগদাদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে নব গণতন্ত্রের সৌধ, কর্নেল আরিফ নির্বাচিত হয়েছেন তার প্রধান। বন্দীশালা থেকে পরিত্যক্ত যোদ্ধা আবার ফিরে এসেছেন তাঁর প্রাপ্য আসনে। এ বিপ্লবের কৃতিত্ব অবশ্যই টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস তীরের গণতন্ত্রী মানুষের চেতনা, কিন্তু ইরাকবাসী জানেন—এই আনন্দক্ষণে আরিফকে যে তাঁরা সঙ্গে পেলেন—সে শুধু কাসেমের জন্যে।

কাসেম বলতেন—আমার পুত্র, আমার ছাত্র,—আমার ভাই! আরিফ আমার সব! কাসেমের কথা বলতে গেলেই চোখে জল আসত আরিফের। তিনি বলতেন—কাসেম আমার বাপ!

সেই ঐতিহাসিক দিনে জুলাইয়ের তের তারিখে জর্ডানের বদলে বোগদাদের বাদশাহের প্রাসাদের দিকে যাত্রা করেছিল যে বাহিনীটি সেটি এই আরিফেরই ২০নং ব্রিগেড। সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য শিষ্য আরিফের ওপরই প্রাসাদ আক্রমণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন কাসেম। সে দায়িত্ব যে তরুণ সৈনিক নিষ্ঠাভরে পালন করে-ছিলেন—তার প্রমাণ হাসেমাইট বংশের কবর। পরদিন কাসেম এসে জড়িয়ে ধরেছিলেন আরিফকে, বলে-ছিলেন, সাবাস! এবার থেকে আমরা সহোদর! কাসেম প্রধানমন্ত্রী হলেন, আরিফ মনোনীত হলেন সহকারী প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু সেই সহোদরী আবহাওয়া অচিরেই সাহারা হয়ে গেল। বিপ্লবের অব্যবহিত পরে দামাস্কাসে নাসেরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আরিফ নাসেরী হাওয়া নিয়ে দেশে ফিরলেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনাহীন যোদ্ধা কাসেম যেন ভূত দেখলেন। তিনি কী চান তা তিনি এখনও জানেন না বটে, কিন্তু তাই বলে কী নাসের? আরিফকে তিনি হুঁসিয়ার করে দিলেন।

পারদের মত স্পর্শকাতর আরিফ উষ্ণ হয়ে উঠলেন। বোগদাদের পথে পথে তিনি তপ্ত হাওয়া ছড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন। কেনই বা নয়? তেল-জল সব আছে ইরাকের, কিন্তু তবুও আদি মানুষের প্রথম পতনক্ষেত্র বাইবেলের ইডেন ইরাক এখনও শ্মশান,—দলীয় লালসায়—দেশের যত রস সব খেজুর গাছের মত উপরতলায়, বিশেষ এক মহল্লায়। নির্দোষ জনতার খুন ঝরছে, বসরার গোলাপ আরও লাল হচ্ছে,—কমিউনিস্টরা বাহার দেখাবার মতলব করছে। শঙ্কিত কাসেম নিষ্কৃতির পথ খুঁজলেন। 'সহোদরের' শূন্যস্থান পূরণ করেছিল যারা, সেই কমিউনিষ্টরা পথ দেখাল—দেশান্তরী কর, বাইরে পাঠাও। সেই প্রস্তাব শুনেই কোমর থেকে পিস্তল টেনে নিয়েছিলেন—আরিফ! অবশ্য ঘরে ফিরেছিলেন—চোখে জল নিয়ে।

আজ 'পিতার' আসনে ফিরে আসার ক্ষণেও চোখে তাঁর মমতার জলবিন্দু দেখা যাচ্ছে কিনা আমরা জানি না। না দেখা গেলেও বিস্ময়ের

কিছু নেই। কেন না, মধ্যপ্রাচ্য, বিশেষত ইরাকে সেটাই দেশাচার। ১৯৩৩ সন থেকে ১৯৫৮ সন অবধি কমপক্ষে তিন জন 'আবুহোসেন' খুন হয়েছেন সেখানে। এবং কেউ 'পরের' হাতে নয়। মনে রাখতে হবে নারীর বেশে পালাতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নূরি-এস-সৈদ, কিন্তু কাসেম তাঁকে ক্ষমা করেন নি ; এবং যে ফয়জলের রক্তমাখা দেহ ছিল নয়া জমানার অভিষেক-প্রতীক, কাসেম ছিলেন সেই ফয়জলের বিশ্বস্ত সেনাপতি !

১৪. ২. ৬৩

আলভা, ভায়োলেট

কাগজটার নাম—'ফোরাম।' প্রবন্ধটার নাম ছিল—'সেটলিং অ্যাকাউন্টস।' অর্থাৎ, ইংরেজের সঙ্গে শেষ হিসাব-নিকাশ। আজকের মত তখনও 'ফোরাম'-এর সম্পাদক শ্রীজোয়াকিম আলভা। সুতরাং, যদিও তিনি তখন নিয়মিত লেখিকা তা হলেও রাজদ্রোহমূলক এই বিখ্যাত নিবন্ধটি (১৯৪৩) তাঁরই লেখা কিনা বলা শক্ত। তবে সেই অকুতোভয় সম্পাদকেরই স্ত্রী। সুতরাং, লেখার চেয়েও কঠিন কাজে যে তাঁর অভ্যেস ছিল সেটা জানা গিয়েছিল সে বছরই। পাঁচ মাসের শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে ভায়লেট সেদিন সানন্দে জেলে ছুটেছিলেন।

অনেক উপলক্ষ্যেই অনন্যা। কখনও দক্ষিণের ইতিহাসে, কখনও নিজের এলাকা তথা আঞ্চলিক ভূগোল ছাপিয়ে গোটা ভারতে। নাম ছিল—ভায়লেট হ্যারি। ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন (১৯০৮) দক্ষিণের সাধারণ একটি খ্রীষ্টান পরিবারে। কিন্তু বোম্বাইয়ের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে এবং পরে ল' কলেজে তিনি এক অসাধারণ মেয়ে। প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি সংবাদ। সে সংবাদ শিরোনামা হল, যেদিন এম এ এবং এল এল বি উত্তীর্ণা ভায়লেট কালো গাউন চাপিয়ে বোম্বাই হাইকোর্টে সওয়াল করতে অবতীর্ণা হলেন। কেননা, সেখানে তিনিই প্রথম মহিলা অ্যাডভোকেট।

আইন ব্যবসা, সাংবাদিকতা,—জেলে যাওয়া-আসা ভায়লেট আলভা পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতে তখন থেকেই সুপরিচিত নাম। '৪৬ সনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বোম্বাই কর্পোরেশনে কাউন্সিলারের আসনে বসেছেন, '৪৭ সনে বোম্বাই বিধান পরিষদে সদস্যা হয়েছেন, '৫২ সনে নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্মেলনে প্রথম মহিলা হিসাবে স্ট্যাণ্ডিং

কমিটিতে স্থান পেয়েছেন এবং কোথায় নয়? কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দল, কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সার বোর্ড, পাবলিক একাউণ্টস কমিটি, '৫২ সন থেকে নয়াদিল্লীতেও ভায়লেট আলভা একটি বিশিষ্ট নাম। '৫০ সনে প্রথম মহিলা প্রতিনিধি হিসাবে তাঁকে সংবাদপত্র-সেবীদের দল নিয়ে মিশরে পাঠান হয়েছে, '৫৪ সনে ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের নেত্রী হিসেবে তিনি রাশিয়া সফর করেছেন, 'য়ুনো'র সেমিনারে যোগ দিয়েছেন, সিংহল সফর করেছেন এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং শ্রীমতী আলভা আন্তর্জাতিক মহিলা আইনবিদ্‌দের সংস্থার সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন শুনে আজ তাঁকে নিয়ে লিখতে বসেছি বটে, কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন, সেটা উপলক্ষ্য মাত্র। বিশেষ করে মনে রাখতে হবে ১৯৫৭ সনের এপ্রিল থেকে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্র দপ্তরে ডেপুটি মন্ত্রী ছিলেন এবং এবছর এপ্রিল থেকে তিনি রাজ্যসভার সহকারী চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ চালাচ্ছেন।

সুতরাং, নতুন করে আর কাজের কথা না বলে উপসংহারে আজকের ভারতীয় রাজনীতিতে অন্যতমা এই মহিলাটির দুটো ঘরের খবরই বলি।

ব্যক্তিগত জীবনে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং নানা সভার সভানেত্রী, সহ-সভানেত্রী আলভা এক সুখী সংসারের কর্ত্রী। স্বামী জোয়াকিম আলভা বোম্বাইয়ের বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় কংগ্রেস-নায়ক, এ্যাডভোকেট, সম্পাদক, লেখক এবং পার্লামেণ্টের সদস্য। একদা সহপাঠী ভায়লেটের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর ১৯৩৭ সনে। বয়সে এক বছরের ছোট হলেও, লেখাপড়ায় ভায়লেট ছিলেন তাঁর ওপরে। বি এ পড়েই ল' কলেজে নাম লিখিয়েছিলেন জোয়াকিম। ভায়লেট এল এল বি হয়েছিলেন এম এ পাশ করে!—

ওঁরা দুটি পুত্র ও এক কন্যার পিতামাতা।

আলি, মোহাম্মদ

ছাত্রজীবন কেটেছে এই কলকাতা শহরেই। প্রথমে আলিপুরের হেস্টিংস-হাউসে, তারপর ওয়েলেসলির মাদ্রাসায়, তারপর ইসলামিয়া কলেজে এবং অবশেষে প্রেসিডেন্সীতে। উনি কলকাতারই বি. এ., বি. এল।

যৌবনেও অনেকদিন কলকাতাতেই ছিলেন। দুপুরে রাইটার্স বিল্ডিংস, বিকেলে ফুটবল, হকি

কিংবা টেনিস মাঠ, সন্ধ্যায় কলকাতার প্রথম শ্রেণীর ক্লাবের মজলিস,—ওঁর মত প্রাণোচ্ছল যুবা কলকাতায় তখন মাত্র কয়েকজন। প্রাণ-খোলা হাসি, খৈ-ফোটা কথা, স্পীডওয়ালা গাড়ি—দেখে কে বলবে মুখ্যমন্ত্রীর এই পার্লা-মেণ্টারী সেক্রেটারীটি মফঃস্বলের ছেলে।

অবশ্য এ খবরটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল ক'দিনের মধ্যেই। বিশেষ করে পরের বছর (১৯৪৬) তিনি যখন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী থেকে বাংলার অর্থমন্ত্রী হয়ে গেলেন তখন কারও জানতে বাকী রইল না যে সুরাবর্দী সাহেবের এই প্রিয় দোসরটির নাম মোহাম্মদ আলি এবং বাড়ী তাঁর বগুড়ার ধানবাড়ী।

বগুড়ার ওঁরা সেকালেও বিখ্যাত পরিবার। ঠাকুর্দা নবাব বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলী ছিলেন বাংলার প্রথম মুসলিম মন্ত্রী। তস্য পুত্র নবাব আলতাফ আলির সাত সন্তানের একটি এই মোহাম্মদ আলি। কলকাতায় তিনি যখন সবে খ্যাতির মুখে, ঐ তরুণ বয়সে বগুড়ায় কিন্তু ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা কো-অপারেটিভ, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল বোর্ড—জেলা মুসলীম লীগ সব হয়ে গেছে তাঁর। বাকী যা ছিল কিছু তার পূর্ণ হল কলকাতায় এবং অবশিষ্ট করাচীতে।

'মোহাম্মদ আলি অব বগুড়া' পাকিস্তানের জন্মদিন থেকেই করাচীতে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। সুগঠিত দেহ। উচ্চতা—পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি, ওজন—একশ' পঁচাত্তর পাউণ্ড। বয়স তখন চল্লিশও হয়নি। (এখন তিপ্পান্ন) সুতরাং গণপরিষদের এই উজ্জ্বল সদস্যটি প্রথমে ('৪৮) প্রেরিত হলেন ব্রহ্মদেশে পাক-রাষ্ট্রদূত হিসেবে। তারপর তিন বছরের জন্যে কানাডায় এবং অবশেষে '৫২ সনে খাস আমেরিকায়। মোহাম্মদ আলি সে সময়েই কিছুদিনের জন্যে পাকি-স্তানের প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন! সুতরাং এটা বোধহয় মোটেই বিস্ময়-কর নয় যে, দীর্ঘকাল রাজনৈতিক জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত এই প্রাণোচ্ছল রাজনীতিকটি সুযোগ পাওয়া মাত্র আইনের শাসনের প্রশ্ন তুলবেন। সংবাদ: মোহাম্মদ আলি তাই করেছেন। জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই তিনি আয়ুবী শাসনতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করেছেন, তিনি জানতে চেয়েছেন—আইনের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে না কি?

উল্লেখযোগ্য, ছ' বছর আগে এই অধিকারের প্রশ্নেই একদিন জনমতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী 'বগুড়ার মোহাম্মদ আলিকে'।

প্রশ্নটা বেগম হামিদা বানু বা তাঁর দুই পুত্র হাম্মাদ এবং হামদে তোলেন নি। তুলেছিলেন—করাচীর কুড়ি হাজার মহিলা। তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন—কাজটা কি ঠিক হল ? স্ত্রী হামিদা বানু বেঁচে থাকতেই প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এভাবে একান্ত সচিবকে বিয়ে করা কি সঙ্গত হল ? স্ত্রী হিসেবে মেয়েদের কি কোন অধিকারই নেই ?

উত্তরে : পাকিস্তান সরকার সেদিন একটা কমিশন বসিয়েছিলেন। তাঁরা দেশবাসীর কাছে যথারীতি প্রশ্নপত্রও পাঠিয়েছিলেন। উত্তরে প্রতি ছ'জনের পাঁচজনই জানিয়েছিলেন—না, এতে কোন দোষ নেই। ইসলামে চারটে বিয়েও অনায়াসে চলতে পারে!

কমিশন সিদ্ধান্ত করেছিলেন—তবে আজকের দিনে দুটো চলাই সঙ্গত!

ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রীর জানা উচিত তাঁর সেই কমিশনে যাঁরা ছিলেন তাঁরাই আজ আয়ুবের শাসনতন্ত্র রচয়িতা,—বিশেষজ্ঞ!

আয়েঙ্গার, অনন্ত শয়নম্

সাব, আই বেগ টু মুভ লীভ টু ইনট্রডিউস দি বিল...

—মোশান মুভড : দ্যাট লীভ বি গ্রানটেড টু ইনট্রডিউস দি বিল...

একের পর এক বিল উঠছে লোকসভায়, পাঁচ বছরে তিনশ। প্রত্যেকটি তার গুরুত্বপূর্ণ, কোন কোনটা যুগান্তকারী। প্রতিবারই উঠে দাঁড়িয়েছেন সেই প্রবীণ মানুষটি। তিনি সম্মতি দিলে তবে আলোচনা। প্রতিটি বিলের প্রথম পাতায় তাঁর স্বাক্ষর। তাঁর সই না পেলে কোন বিল—আইন হওয়ার দাবী তুলতে পারে না। লোকসভার সম্মতি পেলেও না।

শুধু বিল নয়, সংশোধনী, মুলতুবী প্রস্তাব, প্রশ্ন ; লোকসভা পরিচালনা থেকে সদস্যদের নিরাপত্তা, তাঁদের চা খাওয়ার ব্যবস্থা সব তাঁর দায়িত্ব। অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পথে কোন সদস্য রাস্তায় 'বাধা' পেলেন—তবে তিনিই দায়ী হবেন। কেননা, লোকসভার পথঘাট নির্ঝঞ্ঝাট রাখাও তাঁরই কর্তব্য।

আশ্চর্য এই, ১৯৫৬ সনের ৮ই মার্চ থেকে ১৯৬২ সনের ৩০শে মার্চ পর্যন্ত

যিনি সগৌরবে এই বিচিত্র কর্তব্য ত্রুটিহীনভাবে সম্পন্ন করলেন—তিনি একজন একাত্তর বছরের বৃদ্ধ। ভারতের ঐতিহাসিক দ্বিতীয় লোকসভার ততোধিক ঐতিহাসিক বিলগুলোর প্রথম পাতায় [অর্থ সংক্রান্ত হলে শেষ পাতায়ও] চির-কালের জন্য লিখিত রয়ে গেল সেই ঐতিহাসিক পুরুষের স্বাক্ষর: এম অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার।

জন্ম—১৮৯১ সন। জন্মস্থান—চিত্তুর জেলার হিরুচালুর। লেখাপড়া—মাদ্রাজ।

মাদ্রাজের বি-এ, বি-এল শ্রীআয়েঙ্গার এক সময়ে পেশায় ছিলেন অ্যাডভোকেট। স্বভাবতই আইনের শাসনের সঙ্গে পরিচয় ছিল তাঁর। কিন্তু তবুও স্বীকার না করে উপায় নেই লোকসভার স্পীকার হিসাবে যে যোগ্যতা তিনি দেখালেন, তার পেছনে বেআইনী জীবন।

জেলা কংগ্রেস থেকে শুরু করে অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, হরিজন সেবক সংঙ্ঘ ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত শ্রী আয়েঙ্গার পুরনো স্বদেশী! ফলে, বহুকাল কেটেছে তাঁর জেলে।

তবুও আইন অমান্যকারী শ্রী আয়েঙ্গোর পরবর্তীকালে বিখ্যাত 'কমিটিম্যান' হতে পেরেছিলেন, তার কারণ তিনি আমাদের চরম লক্ষ্যটার কথা জানতেন। জানতেন—মেনৎ হু আর টু লিভ টুগেদার পীসফুলি মাস্ট বি এবল টু আগু´ টুগোদার পীসফুলি। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড, ক্রিমিন্যাল ট্রাইবস এনকোয়ারী কমিটি, এষ্টিমেট কমিটি, বার এসোসিয়েশন, গণপরিষদ, কমনওয়েলথ পার্লামেণ্টারী কনফারেন্স ইত্যাদি বহুতর কমিটি এবং কনফারেন্স-অভিজ্ঞ শ্রী আয়েঙ্গার তাই যেদিন প্রথম লোকসভায় ডেপুটি স্পীকারের পদে বসেছিলেন, সেদিন তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে কোন মহলেই কোন প্রশ্ন ওঠেনি। '৫৬ সনে মবলঙ্করের আকস্মিক তিরোভাবের পরে যখন স্পীকারের আসনটি বাড়িয়ে দেওয়া হল তখনও না। উল্লেখযোগ্য, যদিও চল্লিশ বছর ধরে একটানা ভোটে নির্বাচিত জীবন গড়ে তুলেছিলেন শ্রী আয়েঙ্গার, স্পীকার নির্বাচনের দিনে তাঁর কোন প্রতিযোগী ছিল না।

এবার আর তার সম্ভাবনাটুকুও রইল না। কেননা, আয়েঙ্গার এবার অবসর নিলেন। জনতায় নিমজ্জিত জীবনের পথে সেটা নিঃসন্দেহে

আনন্দের ঘটনা নয়। শ্রীআয়েঙ্গার হাসতে পারেননি। চশমার পুরু কাঁচও শেষ দিন গোপন রাখতে পারেনি তাঁর চোখের জল কিন্তু সগৌরব বিরতিও বোধহয় তেমনি গর্বের। বিশেষ, এই বয়সে। তদুপরি, শ্রী আয়েঙ্গার সেখানে অবসরেও কর্তব্য গ্রহণ করছেন! সংবাদ, তিনি বিহারের রাজ্যপাল হচ্ছেন।

আমরা আশা রাখি, আইনসভায় বিঠলভাই প্যাটেল, মবলঙ্কর প্রভৃতি স্বনামধন্য স্পীকারদের যে ঐতিহ্য তিনি রক্ষা করেছেন, বিহারের নতুন রাজ্যপাল তাঁর নতুন আসনেও তেমনি ঐতিহ্য গড়ে তুলবেন।

ইঞ্জিনীয়ার, এম. [এয়ার মার্শাল]

একত্রিশ বছর আগেকার কথা।

আমরা উড়তে শিখেছি মোটে পঞ্চাশ বছর। স্বভাবতই, আজকের মত আকাশে তখন এমন ভীড় ছিল না। রাশি রাশি রকমারী উড়োজাহাজ ছিল না, মাটি ছেড়ে শূন্যে পা বাড়াবার মত হাজার হাজার তৈরী জোয়ান ছিল না, সেদিনের কাহিনী।

ছোট্ট একটি সাধারণ 'জিপসি' বিমান। সতের বছরের এক তরুণ বৈমানিক। একা এই বিমানে সে ইংলণ্ড যেতে চায়। বন্ধুরা জয়ধ্বনি দিলেন। আত্মীয়রা দুরু দুরু বক্ষে ফেরার পথ চেয়ে বসে রইলেন।

যথাসময়ে ফিরে এল সেই 'জিপসী'। ককপিট থেকে হাসতে হাসতে নেমে এলেন তরুণ ভারত সন্তান। নির্বিঘ্নে তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে ঘুরে এসেছেন নিজের দেশে। দেশ সাগ্রহে অভিনন্দন জানাল তাঁকে। 'আগা খাঁ' পুরস্কার পেলেন তিনি। ভারতীয় আকাশ যাত্রার ইতিহাসে সে ঘটনা আজও কাহিনী।

নাম—আস্পি মেরোয়ান ইঞ্জিনীয়ার। জন্মস্থান—বোম্বাই। ভারতের অন্যতম প্রধান বৈমানিক শ্রী ইঞ্জিনীয়ারের বয়স এখন মোটে আটচল্লিশ।

নাতিদীর্ঘ জীবন। কিন্তু দীর্ঘ সার্ভিস-বুক। প্রথমে পাঁচগনি, তারপর করাচীর ডি জে সিন্ধ. কলেজ, রাইট ভ্রাতৃযুগলের সাফল্য ইঞ্জিনীয়ারের ছাত্রজীবনের ঘটনা। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ইঞ্জিনীয়ার মনে মনে সঙ্কল্প করলেন, তিনিও উড়বেন।

করাচী থেকে বিদেশে। কর্ণওয়ালের বিমান বিদ্যালয় থেকে বৈমানিক হয়ে দেশে ফিরলেন তরুণ

ইঞ্জিনীয়ার। সদ্য বিমানবহর গঠিত হয়েছে দেশে। আই এ এফ এর ১নং স্কোয়াড্রনে যোগ দিলেন তিনি। কর্মস্থল—ওয়াজিরিস্থান।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, কাশ্মীর, ইঞ্জিনীয়ার যেখানেই—সার্ভিস বুক গৌরবান্বিত করে পরবর্তী ষ্টেশনে ফিরেছেন। '৪২ সনে তিনি ছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। সেবার মিলল 'ডি এফ সি' [ডিষ্টিংগুইশড ফ্লাইং ক্রস]। '৪৫ সনে ছিলেন কোহাটে। সেবার পর পর ছ'বার পদোন্নতি। প্রথমে—গ্রুপ ক্যাপ্টেন, পরে—এয়ার কমোডোর। '৪৮ সনে কাশ্মীরে হানাদার। ইঞ্জিনীয়ার তখন বিমান বাহিনীর সদর দপ্তরে এয়ার অফিসার-ইনচার্জ। সেপ্টেম্বরে ফ্রণ্টে ডাক পড়ল তাঁর। 'অপারেশনাল গ্রুপের' অধিনায়কত্ব গ্রহণ করলেন তিনি। ফলে—জিজিলা গিরিপথকে দরজা খুলতে হল। কারগিল থেকে পিছু হটতে হল হানাদারদের এবং কাশ্মীরের রঙ্গমঞ্চ নতুন পটভূমিতে স্থাপিত হল। সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে তার অনেকখানি কৃতিত্ব ইঞ্জিনীয়ারের।

কাশ্মীরের পর কিছুকাল কাটল ইম্পিরিয়াল ডিফেন্স কলেজে, তারপর বিমান বাহিনীর সদর দপ্তরে বিভিন্ন কাজে। '৫২ সনে তিনি নিযুক্ত হলেন ভারতীয় বিমানবহরের সহকারী অধ্যক্ষ এবং ক'বছর পরে '৫৮ সনের মে মাস থেকে বাঙ্গালোর বিমান কারখানার সর্বাধ্যক্ষ—ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রবীণতম অফিসার এয়ার মার্শাল ইঞ্জিনীয়ার আজ থেকে ভারতীয় বিমান বাহিনীর অধ্যক্ষ। এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জির শূন্য আসনে বসছেন মুখার্জির অন্যতম সহযোগী। স্বভাবতই আশা করি, চিরকালের মত এবারও তাঁর হাতে আমাদের আকাশ নিরাপদ।

ইনমু, ইসমেত

আতাতুর্কের নাম যাঁরা জানেন, তাঁরা ওঁকেও চেনেন। কেন না, কামালের সহযোদ্ধা—কামাল পাশার পরেই তুরস্কে তাঁর নাম। বাইরেও।

কামালের সহপাঠি, কামালের ব্যক্তিগত বন্ধু,—কিন্তু চরিত্রে ঠিক তাঁর উল্টো। ইসমেত ইনমু সেদিনও শান্ত, সমাহিত অধ্যয়নশীল বিবেচনাশীল,—বহু ধার্মিক মুসলমান। অর্থাৎ কামাল যা ছিলেন না তিনি ছিলেন তাই। ছ'জনের মিল ছিল শুধু এক জায়গায়, দুজনেই দুর্ধর্ষ। বিশেষত শত্রুর সঙ্গে মোকাবেলায়।

ইনমু ইসমেত

ইনমু ওঁর নাম নয়, পদবী।

কামাল বললেন—নামের পর সকলকে উপাধি নিতে হবে একটা। দেশের সবাইকে।

ইনমু বললেন—আমাকেও ?

'—হ্যাঁ।'

'—তবে আমি উপাধি নিলাম ইনমু !'

ইনমু একটা গাঁয়ের নাম। এখানেই কামালের দুর্ধর্ষ সেনাপতি ইসমেতের কাছে দু'দুবারই পরাজয় স্বীকার করেছিল গ্রীকরা। এ নাম সেই দুরন্ত দিনেরই স্মারক। যৌবনের স্মৃতি।

বাবা রসিদ বিচারপতি ছিলেন। ছেলে বারো বছর বয়সে প্রেরিত হয়েছিলেন ইস্তাম্বুলে গোলন্দাজদের স্কুলে। সেখান থেকে তেহরাণে জেনারেল স্টাফ-এর কলেজে। আতাতুর্কও তখন সেখানে। ইসমেতের চেয়ে তিনি মাত্র দু'বছরের সিনিয়র। তা হক, তবুও দু'জনের বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

ফলে কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে বের হওয়া মাত্র ইসমেতের কাজ জুটে গেল। তিনি 'ক্যাপ্টেন' নিযুক্ত হলেন। তারপর ক্রমগত পদোন্নতি। ইসমেতের বয়স যখন মাত্র একত্রিশ তখন তিনি—কর্ণেল।

প্রথম মহাযুদ্ধে সেনাপতি ইসমেত বীরত্ব সহকারে প্যালেস্টাইনে লড়াই করলেন ইংরেজদের সঙ্গে, পরে আতাতুর্কের প্রধান সেনাপতি হিসাবে রুশদের সঙ্গে। কামালের পাশে এই ছোট্টখাট চেহারার সেনাপতিটি তখন অন্যতম বল।

'২৩ সনে কামাল পাশার মুখে ঘোষিত হল—গণতন্ত্রের জন্মসংবাদ। সেনাপতি ইনমু নিযুক্ত হলেন এবার গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী। এখন তিনি আর যোদ্ধা নন, কূটনীতিক। জন গান্থারের ভাষায় 'একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কূটনীতিবিদ।' তাঁরই নির্দিষ্ট পথে চলে তুরস্ক একদিকে যেমন বাহিরের শত্রুতা থেকে মুক্ত হল, অন্যদিকে তাঁরই যত্নে 'ইউরোপের রুগ্ন মানব' নামে কথিত দেশটি দেখতে দেখতে প্রাচ্যের মধ্যযুগীয় পোশাক পাল্টে আধুনিককালের ইউরোপে পরিণত হল। লোকে বলে, এ পরিবর্তনের পেছনে কামালের চেয়েও বেশী দান—ইনমুর।

চৌদ্দ বছর একটানা প্রধান মন্ত্রীত্বের পরে সহসা '৩৭ সনে পদত্যাগ করলেন ইনমু। ইচ্ছে ছিল—আর কোনদিন ফিরবেন না। কিন্তু পরের বছর মারা গেলেন—কামাল।

লোকেরা আবার ধরে এনে বসাল তাঁকে। এবার স্বয়ং কামালের জায়গায়। তুরস্ক একবাক্যে জানাল —আগামী চার বছরের জন্যে ইনন্থই কামালের উত্তরাধিকারী!

চার দশ পেরিয়ে গিয়েছিল। '৫০ সন অবধি তুরস্কের রাষ্ট্রপতির আসনে আসীন ছিলেন প্রবীণ রাজনীতিক ইনন্থ। তারপর দীর্ঘ বিরতি অন্তে অবশেষে আবার ফিরে এলেন এবার, ১৯৬১ সনে। গুরুসেল-এর আহ্বানে পিপলস রিপাবলিকান পার্টির নায়ক ইনন্থই এবার গঠন করছেন তুরস্কের সর্বশেষ মন্ত্রীসভা!

বয়স—সাতাত্তরে [জন্ম —১৮৮৪] পৌঁছেছে। সাদা চুলগুলো বিরলতর হয়ে এসেছে। এমন সময়ে এই অস্থির দেশের রাজনীতিতে কেন আবার ফিরলেন ইনন্থ। সম্ভবতঃ—দেশের অস্থিরতাই তাঁর পেছনের কারণ। কেননা, ইনন্থ চিরদিন সুস্থির হিসেবে খ্যাত রাজনীতিক। এবং শৌখিন হিসেবে।

তিনি ঘোড়া পছন্দ করেন, তিনি ব্রিজ, বিলিয়ার্ড এবং দাবা খেলেন, তিনি অর্কেস্ট্রা শোনেন এবং যুদ্ধ বিগ্রহের চেয়ে শান্তিপূর্ণ গৃহস্থের সংসারই বেশী ভালবাসেন। উল্লেখযোগ্য বহু বিবাহে মত থাকলেও ইনন্থ নিজে বিয়ে করেছেন একটিই। এবং স্ত্রীকে তিনি ভালবাসেন। ছেলে [২], মেয়ে [১]।

ইব্রাহিম, হাফিজ মহম্মদ

১৯৫৮ সনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মৌলানা আজাদের শূন্য আসনটি উপলক্ষে যখন নামটা প্রথম ঘোষিত হয় তখন কোথাও কোন চমকের ঢেউ জাগেনি। কেননা, মাপে মৌলানার সমান না হলেও—নামটা অজানা ছিল না। অনেকের কাছেই অজানা ছিল যে তথ্যটা সেটা হচ্ছে ১৮৮৯ সনে এলাহাবাদে আনন্দভবনে বিখ্যাত দেশনায়ক পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর যখন জওহরলাল নামক পুত্র সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হন, সে বছরই উত্তর-প্রদেশের বিজগর জেলায় নাজিনা নামক একটা গাঁয়ে জনৈক অভিজাত মুসলিমের ঘরে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তিনি। এবং তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য খবর স্বরাজ্য-দলের নায়ক যখন নিজপুত্রকে দলে টানতে ব্যর্থ বিফল-মনোরথ, তখন এই উত্তর-ভারতে তাঁর মান রাখতে এগিয়ে এসেছিলেন পুত্রের বয়সী সেই অজ্ঞাত তরুণটিই। আলিগড়-এলাহাবাদ থেকে আইনের

ডিগ্রি নিয়ে হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম তখন মোরাদাবাদে এক অখ্যাত তরুণ উকিল।

বাইশ বছর আইনব্যবসা করেছেন। কিন্তু হাফিজ মহম্মদের খ্যাতি সে কারণে নয়, তিনি ১৯২৬ সন থেকে উত্তরপ্রদেশে নিষ্ঠাবান রাজনীতিক। '২৬ থেকে '৫৮—একনাগড়ে বত্রিশ বছর তিনি সেখানে আইনসভায় সদস্য —জনতার প্রতিনিধি।

'২৬ সনে স্বরাজ্য-দলের কর্মী হাফিজ মহম্মদ রাজ্য আইনসভায় এসেছিলেন নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে। পরবর্তী দশ বছরব্যাপী পরিচয় ছিল তাঁর—বিরোধী দলের প্রাণ-পুরুষ।

'৩৬ সনে তৎকালীন জাতীয়তা-বাদী মুসলিম প্রার্থীদের নিয়মে তিনিও নতুন করে বিধান সভায় এসেছিলেন মুসলিম লীগের টিকিট হাতে নিয়ে। কিন্তু তবু ও প্রথম পন্থ-মন্ত্রিসভায় স্থানাভাব হয়নি তাঁর। হাফিজ মহম্মদ সে সম্মানের জবাব দিয়েছিলেন ইস্তফা দিয়ে নতুন করে কংগ্রেস টিকিটে আবার নির্বাচন লড়ে। তারপর থেকে বরাবরই তিনি লড়িয়ে কংগ্রেসকর্মী।

'৩৯ সনে দলের সঙ্গে পদত্যাগ, '৪০-'৪১সনে সত্যাগ্রহ এবং কারাবরণ; '৪২ সনে আবার বন্দী-জীবন। বলা নিষ্প্রয়োজন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারি বোর্ড বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হাফিজ মহম্মদের আজকের প্রতিটি পদ স্বোপার্জিত। '৩৬ সন থেকে '৫৮ সন অবধি উত্তরপ্রদেশে এমন কোন মন্ত্রিসভা ছিল না যেখানে তিনি ছিলেন না, এমন কোন আন্দোলন-উত্তেজনা ছিল না—যেখানে তিনি সরিক ছিলেন না। তবে উত্তরপ্রদেশে হাফিজ মহম্মদের সবচেয়ে অবিস্মরণীয় কীর্তি যদি হয়,—ওয়াকফ আইন, তাহলে সর্ব-ভারতীয় রাজনীতিতে নিঃসন্দেহে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান—মুসলিম মজলিস। ১৯৪৪ সনে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের এই সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানটির তিনিই প্রথম উদ্যোক্তা।

শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সেচ এবং বিদ্যুৎমন্ত্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম হয়ত কোন রাজ্যের রাজ্যপাল হচ্ছেন। খবরটায় বলা নিষ্প্রয়োজন, গুজবের প্রবণতাই বেশী। কেন না, সব দিক বিবেচনা করলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সত্যিই হাফিজ মহম্মদের এই মুহূর্তে 'অপচয়' করতে পারেন না। তবুও যদি তিনি রাজধানী থেকে বিদায়

নেন, তবে জানবেন কারণ তাঁর কর্ণফুলি বাঁধ নয়, বাৎসরিক বন্যা নয়, দিল্লির 'পাওয়ার-ফেলিওর' নয়—একমাত্র সম্ভাব্য কারণ হতে পারে তাঁর তিয়াত্তর বছরের বার্ধক্য।

২৮, ৩. ৬২

[কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম ১৯৬৩ সনের মে মাসে উত্তর প্রদেশের আমরোহা কেন্দ্রে এক উপ-নির্বাচনে পরাজিত হন। ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। ১৯৬৪ ফেব্রুয়ারী মাস থেকে তিনি পাঞ্জাবের রাজ্যপাল।]

ইস্‌লাম, কাজী নজরুল

'……আর এই নিয়েই বছরের পর বছর কেটে গেলো বাংলা কবিতার; অন্য কিছু চাইল না কেউ, অন্য কিছু সম্ভব বলেও ভাবতে পারলো না—যতদিন না 'বিদ্রোহী' কবিতার নিশেন উড়িয়ে হৈ হৈ করে নজরুল ইসলাম এসে পৌছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্র-নাথের মায়জাল ভাঙলে'-(বুদ্ধদেব)।

বাংলা সাহিত্যের আসরে নজরুলের আবির্ভাব এবং তিরোভাব দুই-ই সমান আকস্মিক, সমান অপ্রত্যাশিত। বর্ধমানের অখ্যাত চুরুলিয়া গ্রামের ততোধিক অজ্ঞাত ফকির আমেদ সাহেবের এই দুরন্ত ছেলেটি যে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যে বিদ্রোহ আনবে তা কেউ ভাবতে পারেননি কোনদিন।

আট বছর বয়সে বাবা মারা গেলেন। নজরুল স্বাধীন হলেন। সেই তাঁর জীবনে যদৃচ্ছতার দীক্ষা। মক্তব পাশ করে হাই স্কুলে ঢুকেছিলেন বটে, কিন্তু পড়ার চেয়ে বেশী মন ছিল গানে; স্কুলের চেয়ে যাত্রার আসরে। সুতরাং পরীক্ষার বদলে সৈন্যবাহিনীই লোভনীয় ঠেকল তাঁর কাছে। বর্ধমানের গাঁয়ের ছেলে নজরুল ১৯১৬ সনে ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে দূর দেশে লড়িয়ে সৈনিক। ক'বছরের মধ্যে ৪৯নং বাঙ্গালী পলটনের হাবিলদার।

'২১ সনে আবার নিজের দেশে ফিরলেন তিনি। এবারও তিনি সৈনিক। তবে হাতে তাঁর তলোয়ার। কবিতা লিখে জেল খাটলেন, অনশন ধর্মঘট করলেন। অবশেষে খ্যাতির শীর্ষে উঠে গৃহস্থও হলেন। '২৫ সনে বিয়ে করলেন তিনি। কিন্তু '৩৭ সন থেকেই আশালতা দেবী (সেনগুপ্তা) অসুস্থা। আর '৪২ সন থেকে কবি স্বয়ং।

'অগ্নিবীণা'র কবি নজরুলের আসন বাংলা দেশের হৃদয়জোড়া। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তাঁর স্থান নির্দিষ্ট। এবার গোটা ভারত সরকারীভাবে সম্মান জানাল তাঁকে। অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ সাধারণ-তন্ত্রী ভারতের রাষ্ট্রীয় সম্মান তালিকায় এবার লিখিত হয়েছে তাঁর নাম।

'নজরুল ইসলাম নিজে জানেননি যে তিনি নতুন যুগ এগিয়ে আনছেন' —মন্তব্য করেছিলেন একজন তীক্ষ্ণধী সমালোচক। দুর্ভাগ্য আমাদের, কলকাতার মন্মথ দত্ত রোড নিবাসী সত্তর বছরের বৃদ্ধ কবি—এবারও জানলেন না বাংলা দেশকে এগিয়ে নিয়ে কোথায় তিনি তুললেন।

বিয়ের আগে নজরুল ইসলামের স্ত্রীর নাম এবং পদবী কি ছিল?—দুলী। সেন। পরে প্রমীলা ইসলাম। জেলা এবং গ্রামের নামই বা কি?—কান্দিরপাড়, কুমিল্লা। ৩০, ১. ৬০

উইলসন, জেমস হ্যারল্ড

'ম্যাক মানে কী?

শুনতে শুনতে আজ কান ঝালা-পালা বলেই সবাই জানেন—ম্যাক-মিলান; ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু অনেকেই জানেন না হ্যারল্ড ম্যাক-মিলানকে এই নামটি যিনি দিয়েছিলেন তিনি কোন 'মেল', 'হ্যারল্ড' বা ট্রিবিউনের কোন কিপ্টে বার্তা-সম্পাদক নন,—আর এক হ্যারল্ড—বিধি বাম না হলে, অথবা আরও বাম হলে আগামীতে যিনি নির্ঘাৎ এই হ্যারল্ডকে গদীচ্যুত করছেন!

বলম বল, তথা আসল অবশ্যই —দল। দ্য-গল-পোলারিস-স্কাই বোল্ট সব মিলিয়ে ম্যাকমিলানের দলের মাথায় এখন বাজ পড়েছে—শ্রমিকদল 'ফাইট এণ্ড ফাইট' 'এণ্ড ফাইট' আওয়াজ নিয়ে শনৈঃ শনৈঃ করে ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; এমতাবস্থায় যেকোন জেনারেল লড়তে পারতেন। তবুও যে 'এস্টাব্লিস্‌মেন্টের' আপন হ্যারল্ড বিরুদ্ধ শ্রমিক দল ইয়র্কশায়ারের হ্যারল্ডের কাঁধেই নিজেদের পতাকাটি তুলে দিলেন তার কারণ দল পরিচয় ছাড়াও সদ্য নির্বাচিত শ্রমিক দলপতি জেমস হ্যারল্ড উইলসনের কিছু ব্যক্তিগত বল আছে, এবং সেগুলো আজকের ইংল্যাণ্ডে খুব সুলভ নয়।

যথা, প্রথমত—জ্ঞানগরিমা। ইয়র্ক শায়ারের জনৈক কেমিষ্ট তনয় উইলসন যে শুধু অক্সফোর্ড থেকে রাজনীতি অর্থনীতি এবং দর্শনে ফার্স্ট ক্লাস

অনার্স আদায় করেছেন তাই নয়, গাঁয়ের পাঠশালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথটা শুধু হিচহাইক করে পাড়ি নিয়েছেন, অর্থাৎ প্রতিটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম হয়েছেন এবং বৃত্তির টাকায় পরবর্তীটির জন্যে বই কিনে আবার পড়তে বসেছেন। মধ্যবিত্ত ভোটারের কাছে বিলেতেও নাকি এহেন মেধাবীদের খাতির যথেষ্ট। উইলসনের খাতির আরও বেশী, কারণ মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি অক্সফোর্ডের 'ডীন'-এর আসনে বসেছেন, নিউ কলেজে ইকনমিক্স পড়িয়েছেন—যা কদাচ শোনা যায়নি।

দ্বিতীয়ত, উইলসনের অভিজ্ঞতা। ১৯৪০ সন থেকে ডাউনিং স্ট্রীটে তাঁর গতায়াত। প্রথমে 'ওয়ার ক্যাবিনেট' একজন অ্যাসিস্টেট হিসেবে, তারপর '৪৫ সনে নির্বাচনের পর সোজা এটলী ক্যাবিনেটে। উইলসন মন্ত্রী হয়েছিলেন মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে। উইলিয়াম পিটের পর একশ পঁয়ষট্টি বছরে ইংল্যাণ্ডে তাঁর মত কম বয়সে কেউ কোন দিন মন্ত্রী হতে পারেন নি। শুধু চেয়ারে বসা নয়—ইতিপূর্বেই কমাণ্ডার-ইন-চীফ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস-এর 'ফিল্ড জেনারেল' হিসেবে খ্যাত দন সেদিন চমৎকার শাসক,—চাঞ্চল্যকর মন্ত্রী। তিনি ঐ বয়সে (এখন বয়স সাতচল্লিশ) বোর্ড অব ট্রেডের চেয়ার-ম্যানের পদে বসেছেন, মস্কোয় বসে ঝানু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দর কষাকষি করেছেন, কয়লা নীতি সম্পর্কে এমন একখানা চটি পুঁথি লিখেছেন যা তৎকালে লেবার দলে নাকি 'বাইবেল' বিশেষ! সুতরাং ট্রাডিশনের দেশ বিলেতে এই অতীতের কিছু মূল্য আছে বৈ কি!

পালামেণ্ট-গত-প্রাণ ইংরেজ সন্তানদের কাছে তার চেয়েও অমূল্য উইলসনের বাগ্মিতা, তাঁর ক্ষুরধার রসনা। '—ইট হ্যাজ বীন কোয়াইট এ উইক স্যার রয় হ্যাজ কাম এণ্ড গন—অল উইণ্ড এণ্ড নো চেঞ্জ! (—তবে না মহোদয়গণ আফ্রিকায় 'উইণ্ড অব চেঞ্জ' বইছে?) —তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, প্রয়োজন মত রসিকতা, নির্ভুল তথ্য—হাউস অব কমনস-এ উইলসনের বক্তৃতা শুধু শোনবার মত নয়, অন্যতম দ্রষ্টব্য। টোরী সহেবেরাও স্বীকার করেন—মেকলের পর ওঁর মত স্মৃতিশক্তি বৃটিশ পার্লামেণ্টে কেউ কখনও দেখেনি; শুধু পৃষ্ঠাঙ্ক নয়, কখনও প্যারা, কখনও হু-বুহু বাক্যটি কখনও তারিখ,—'৪০ সন থেকে ঘোরতর সংসারী দুই পুত্রের জনক

উইলসন এখনও সকালে বা সন্ধ্যায় শীতে বা বসন্তে সমান নির্ভুল!

তদুপরি মুখে তাঁর সব সময় পাইপ এবং (ধোঁয়া নয়) আগ্নেয় মতাবলী। তিনি কমন মার্কেটের ধার ধারেন না, কিউবা প্রসঙ্গে কেনেডিকে সমালোচনা করতে ছাড়েননা এবং স্কাই বোল্ট-পোলোরিস তর্কেও কোন চেনা সুরে কথা বলেন না। সন্দেহ কী অর্থে বিত্তে প্রতাপে-প্রতিপত্তিতে জরাগ্রস্ত বৃটানিয়ার কাছে এই হ্যারল্ডই মনের মানুষ হবেন।

উইলসনের সম্ভাবনা আরও বেশী কারণ তাঁকে অনেকে 'লিটল হ্যারল্ড'ও বলে থাকেন। কেননা, বাঁয়ের লোক হ্যারল্ড দরকার হলে দক্ষিণেও ঘেঁষতে পারেন। ভবিষ্যতে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হবেন যিনি, বলা নিষ্প্রয়োজন—এক্ষুদ্রতা তাঁর পক্ষে অপরিহার্য। শুধু বিদ্রোহী নয়,—গেরস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন অধিনায়কই বোধহয় অদ্যকার ইংল্যাণ্ডে আবশ্যক! ২১. ২. ৬৩

উদয় শঙ্কর

পিকাসো যদি গান গাইতেন কিংবা বিটোফেন যদি নৃত্যশিল্পী হতেন, তবে কিছুই করণীয় ছিল না আমাদের। সুতরাং বেনারস এবং বোম্বাই আর্ট কলেজের ছাত্র ছবি আঁকায় হাত পাকাতে লণ্ডনে এসে যে নৃত্যবিদ্যায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন—তাও আকস্মিক ঘটনা। তবে আমাদের স্বপক্ষে। কেননা, উদয়শঙ্করকে না পেলে—বোধ হয় ভারতের নাচের ঐতিহ্য বলতে অজন্তার গুহাচিত্র এবং এখানে ওখানে কিছু প্রস্তরীভূত দেবদাসীর পায়ের ভঙ্গীকেই সেদিন আমাদের ক্রমাগত ভাঙ্গাতে হত। বিশ্ববিশ্রুত মাদাম পাবলোভার প্রিয় ছাত্র শঙ্কর সেদিক থেকে এ-কালের ভারতের সংস্কৃতি-বাণিজ্যে অন্যতম রপ্তানি সম্পদই নন, —তাঁর পায়ে ভর করে বিদেশের বহু বরণীয় বস্তুও আজ আমাদের ঘরে সুপরিচিত। তাই মনে হয়, শঙ্করের সাম্প্রতিক রাষ্ট্রীয় সম্মানলাভ কিঞ্চিৎ যেন পিছিয়ে-পড়া ঘটনা। এর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে সম্মানিত করার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু উদয়শঙ্করের স্থায়ী সম্মানে সেও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। অন্তত শঙ্কর বলা মাত্র যাঁকে দেশবিদেশে লক্ষ লক্ষ লোক চেনে তাঁদের পক্ষে তিনি সরকারী কোন্ সংস্কৃতি বিভাগের কোন শাখার কর্তা তা মনে আনা

সত্যিই কষ্টকর। তবুও শঙ্করের এই সম্মানে আমরা আনন্দিত। কারণ, প্রাপ্য মিটাবার উদ্যোগটুকু অবশ্যই এতে বিদ্যমান।

উদয়শঙ্কর বাংলার ঘরের ছেলে। আদি নিবাস তাঁদের যশোরের কালিয়া গ্রামে। অবশ্য শঙ্করের জন্ম—বাবার কর্মস্থলে,—উদয়পুরে। সংস্কৃতির নানা শাখায় এই পরিবার শঙ্কর ছাড়াও একাধিক উল্লেখযোগ্য নামের অধিকারী। যথাঃ দেবেন্দ্রশঙ্কর, রবিশঙ্কর। পত্নী এবং সহযোগী শিল্পী অমলাশঙ্কর তাতে নতুন যোজনা। ১৯৪২ সন থেকে তিনি শঙ্করের সহধর্মিণী। দুইটি সন্তানের পিতা উদয়শঙ্করের বয়স এখন ষাট। কিন্তু এখনও তিনি যখন আসরে আবির্ভূত হন—লোকে বলে—তিরিশ বছর আগেকার শঙ্কর যেন এলেন। শঙ্কর এখনও তেমনি প্রাণচঞ্চল বটে, তবে স্বভাবতই আরও প্রাঞ্জল। ৯. ৪. ৬০

উ থাণ্ট

স্থান মাহাত্ম্য!

ও বাড়ীতে ভোর দেখে যেমন দিনের খবর বলা যায় না, তেমনি মুখ দেখে মনের খবরও না। অন্তত যাঁদের সেখানে নিয়মিত আনাগোনা তাঁদের যেন তা-ই ধারনা। কিন্তু কখনও কখনও এমন মানুষও মিলে যায় ক্লাবে, করিডরে, এমনকি তর্কাতর্কির আসরে যাঁরা কথায় বার্তায় চালচলনে তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেন যে,—এ সব ধারণা আসলে ডিপ্লোম্যাটদের শুচিবাই!

"—কাকে চাই? —আমাকে? —আসুন, বসুন!"

"—কি চাই? —এক্সক্লুসিভ ইণ্টারভিউ?—কাইণ্ডলি কাল ভোরে একবার আসুন!"

"—কি হে 'হাঙ্গেরী'—সভায় মন বসছে না যে! —'হাঙ্গেরী' বুঝি? চল যাই, বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি!" অথচ সবাই জানে, আর ক'ঘণ্টা পরেই হাঙ্গেরী নিয়ে তর্ক হবে এসেম্বলিতে।

তা হক! তাতে কিছু আসে যায় না। উ থাণ্ট ত, ভয় নেই, কেউ কিছু ভাববে না। না আফ্রো—এশিয়া না পশ্চিম-পূর্ব। কেননা, সবাই জানে তিনি এ ধরনেরই মানুষ। কাঁচের মানুষ। কাঁচের মত ঠুনকো নয়—স্বচ্ছ। স্বচ্ছ এবং পরিচ্ছন্ন।

পরিচ্ছন্ন মুখে তথাগত সুলভ হাসিটি লেগেই আছে। পাশে কালো কুচকুচে একটা ছোট্ট চুরুট!

বলে দিতে হয় না, দ্বিতীয় বার তাকান মাত্রই জানা যায়—এ মানুষ এসেছেন বার্মা থেকে।

'—ইয়েস বার্মা! —চুরুটটাও বার্মিজ। —ভয় নেই, দেখতে যত ভয়ঙ্কর আসলে তত কড়া নয়! —হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স! ওঁর হাতে বার্মিজ চুরুটের স্বাদ না চেখেছেন এমন মানুষ 'উনো'তে একজনও নেই!

স্বদেশে বিখ্যাত বন্ধুবৎসল। তবে তার চেয়েও বেশী খ্যাতি যোগ্য এবং বিশ্বস্ত কর্মী হিসেবেই।

ধর্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ পরিবারের সন্তান। জন্ম—আজ থেকে বাহান্ন বছর আগে। লেখাপড়া—প্রথমে ব্রহ্মের বিখ্যাত পানতানাউ স্কুলে—তারপর রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে। উ থাণ্ট দু'জায়গায়ই সমান কৃতী ছাত্র।

এখনও পড়াশুনার মানুষ। সুযোগ পেলেই বই নিয়ে বসেন। ফাঁকে ফাঁকে লেখেনও। ইতি-মধ্যেই অনেক বই লিখে ফেলেছেন। তার কয়েকটি 'ডেমোক্রাসি ইন এডুকেশন', 'টুওয়ার্ড এ নিউ এডুকেশন,' 'দি লীগ অব নেশানস', এবং 'সিটিজ এণ্ড দেয়ার স্টোরিজ'!

বইয়ের নামগুলি থেকে যা মনে হয়—ঠিক তাই। শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহী মানুষ। কর্ম জীবনও সুরু করেছিলেন—শিক্ষা দপ্তরেই।

প্রথম ছিলেন—শিক্ষক, নিজের ছেলে বেলার সেই স্কুলটিতেই—সিনিয়ার টিচার। '৪২ সনে ব্রহ্মে যখন শিক্ষা-পুনর্গঠন কমিটি বসল তখন তাঁকে নিযুক্ত করা হল—সেক্রেটারী। সাময়িক কাজ। পরের বছরই আবার স্কুলে ফিরে এলেন তিনি। এবার—হেডমাস্টার। '৪৭ সন অবধি সে পদেই বহাল ছিলেন উ থাণ্ট।

'৪৭ সনে 'এণ্টি ফ্যাসিস্ট পিপলস ফ্রীডম লীগ'-এর সঙ্গে আলাপ পরিচয় নিবিড় হল। ওঁরা তাঁকে দলে ডাকলেন। উ থাণ্ট স্কুল ছেড়ে লীগে যোগ দিলেন। শিক্ষক সেই থেকে রাজনীতিক। তিনি লীগের প্রচার সচিব।

এল স্বাধীনতা। প্রধানমন্ত্রী উ নু আবাল্য বান্ধব, পাশাপাশি গ্রামের ছেলে, একই স্কুলের ভূতপূর্ব ছাত্র এবং শিক্ষক—দলের বিচক্ষণ প্রচার সচিব নিযুক্ত হলেন—সরকারী প্রেসডাইরেক্টার। ক্রমে সেখান থেকে ডাইরেক্টার অব ব্রডকাস্টিং এবং অবশেষে সেক্রেটারী অব দি মিনিস্ট্রী অব ইনফরমেশন। তারপর, ১৯৫৭

উ ন্যু

সন থেকে উ থান্ট 'য়ুনো'য় বার্মার স্থায়ী প্রতিনিধি, এবং প্রতিনিধি দলের প্রধান।

শোনা যাচ্ছে, বার্মার প্রতিনিধি প্রধান একান্ন বছর বয়স্ক প্রবীন কূটনীতিক উ থানট হয়ত এবার বিশ্বের সেরা সিভিল সার্ভেন্টের পদ (বার্ষিক মাইনে—সাড়ে তিন লাখ টাকা। এবং কোন ট্যাক্স নেই) রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের আসনে বসছেন। যদি হন তবে খবরটা নিশ্চয় আনন্দের। আর যদি না হন? উ থানট কিন্তু তবুও হাসবেন। কেননা, বন্ধুরা বলেন—'মানুষটার ধরনই ঐ!'

[১৯৬১ সনের সেপ্টেম্বরে তৎকালীন সেক্রেটারী জেনারেল দাগ হ্যামারশীল্ড রহস্যজনকভাবে উত্তর রোডেসিয়ায় এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন। উ থান্ট তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন নভেম্বরে। সেক্রেটারী জেনারেলের কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। সেই হিসাবে তাঁকে অবসর নিতে হবে ১৯৬৬ সনের নভেম্বরে।] ১২.১০.৬১

উ ন্যু

য়ুনিভারসিটিতে দর্শনের ছাত্র কবিতা লিখতেন। প্রধানত, প্রতিযোগী ফুটবল টীমের জন্যে ব্যঙ্গ-সঙ্গীত। পাশ করে স্কুল শিক্ষকের চাকরী নিলেন। এবার শুরু হল নাটক লেখা। মনস্তাত্ত্বিক নাটক। ফ্রয়েডিয়ান থীম্। আর চলল সনেট-এর পর সনেট। তার লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্য দুই-ই যে স্কুলবোর্ড চেয়ারম্যানের রূপবতী কন্যাটি তা যখন বোঝা গেল উ ন্যু তখন মিয়া ই-কে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন।

স্বপ্ন ছিল বার্নার্ড শ হবেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শ'। কিন্তু আইন পড়তে দ্বিতীয়বারের মত য়ুনিভারসিটিতে এসে হয়ে গেলেন—'থাকিন'। 'থাকিন' মানে মাষ্টার, প্রভু। 'আমরা ব্রহ্মসন্তানেরা'—প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা প্রভু বলে স্বীকার করতেন না ইংরেজদের। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের থাকিন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অন্যান্য থাকিন-দের মত থাকিন ন্যুও স্বাগত জানালেন জপানীদের। ফল—কারাবাস। জাপানীরা এসে জেলখানা থেকে মুক্ত করল তাঁকে। থাকিন ন্যু মনোনীত হলেন—ব্রহ্মের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। কিন্তু কপালে চড়চড় করতে লাগল 'মেড ইন জাপান' ছাপটা। ফলে '৪৪ সনে জাপ বিরোধী বিদ্রোহ হল এবং সেই

সঙ্গে ব্রহ্মের পুনর্মুক্তি। '৪৬ সনে তরুণ নায়ক আউঙ্গ সাঙ-এর নেতৃত্বে গঠিত হল স্বাধীন ব্রহ্মের প্রথম মন্ত্রিসভা। পরের বছর স্পীকার থাকিন নু ছাড়া আততায়ীর ষড়যন্ত্র একসঙ্গে কেড়ে নিয়ে গেল আউঙ্গ সাঙ এবং তাঁর ছয়জন সহ-কর্মীকে। বাধ্য হয়েই হাতের কলমটি নামিয়ে রেখে এগিয়ে আসত হল ভবিষ্যতের বার্নার্ড শ'কে। তখনও নাটক লেখাই তার পছন্দ; আইন লিখতে তাঁর মাথা ধরে।

উ নু নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ। তেতাল্লিশ বছর বয়স থেকে তিনি ব্রহ্মচারী। তাঁর বয়স তিপান্ন। প্রতিদিন তিনি ধ্যান করেন। মাঝে মাঝে ভিক্ষুও সাজেন। রাজনীতির চেয়ে এখনও তার বেশী আকর্ষণ ধর্মে এবং সাহিত্যে। হালে লিখিত তাঁর নাটক —'ম্যান, দি উলফ অব ম্যান' এবং আরও একটি বই রীতিমত জনপ্রিয় ব্রহ্মদেশে। কিন্তু ব্রহ্মবাসীরা জানে নাটক লিখলেও উ নু আইনের মানুষ। সাদা-পতাকা আর লাল-পতাকা—দুই বর্ণের কমিউনিস্ট, জাতীয়তাবাদী চীনা সৈন্য, বাহিনী-ত্যাগী দেশী লড়িয়ে এবং খৃষ্টান কারেণ বিদ্রোহী—যুগপৎ পঞ্চশক্তির আক্রমণের মুখে আইনের মর্যাদাকে রক্ষা করেছেন উ নু। এবং সমাজ-তান্ত্রিক উ নু তা করেছেন—কোন শিবিরে নাম না লিখিয়েই। '৪৮ সন থেকে উ নু ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী। '৫৬ সনে কিছুদিনের জন্যে তিনি নেমে এসেছিলেন। কারণ, পার্টিকে বলবান করার জন্য তা দরকার ছিল। '৫৮ সনের অক্টোবরে আবার দেশকে সৈনাবাহিনীর হাতে গুঁজে দিয়ে সরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। কেননা, ব্রহ্মে তা অপরিহার্য ছিল। এবার আবার ফিরে এসেছেন তিনি। জনপ্রিয়তায় উ নু এখনও ব্রহ্মদেশের একমাত্র নায়ক। প্রসঙ্গত বলা দরকার নাট্যকার উ নু ডেলকার্নেগির 'হাউ টু উইন ফ্রেণ্ডস এণ্ড ইনফ্লুয়েন্স পিপল' বইটিরও অনুবাদক।

[দ্রষ্টব্য : উইন, নে] ১৩.২.৬০

উলব্রিখ্‌ট্‌, ওয়াল্টার

অনেক নাম।

এই শতকের দ্বিতীয় দশকে পার্টির বুদ্ধিজীবিরা নাম দিয়েছিলেন ওঁকে—'কমরেড সেল।' কেননা, মস্কোর নির্দেশে পার্টি ঝাড়াই বাছাই করে তিনিই বার্লিনে 'সেল' গড়ার দায়িত্বটা হাতে নিয়েছিলেন।

উলব্রিখ্‌ট্, ওয়াল্টার

তিরিশের যুগে পশ্চিম ইউরোপের কমিউনিষ্ট মহলে কানাকানিতে নাম ছিল তাঁর 'দ্বিতীয় স্ট্যালিন'। কেননা, নাৎসী জার্মানী থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর,—প্রাগ, প্যারিস এবং মাদ্রিদে স্ট্যালিনের হয়ে তিনিই নেমেছিলেন ট্রটস্কি অনুচরদের খুঁজে বের করতে।

এক ফোঁটা দয়া নেই, মায়া নেই। যুদ্ধের দিনে মস্কোর হোটেল-লাক্সে তিনি যখন বান্ধবী লোটি কুহ্‌ন (Lotte Kuhn) সহ স্ট্যালিনদের প্রিয় অতিথি, শত শত জার্মান কমিউনিষ্ট নাকি তখন আদর্শগত বিচ্যুতির জন্যে শিবিরে শিবিরে শ্রমিক। বন্ধুরা তাই সেদিন দুঃখে নাম দিয়েছিলেন ওঁকে 'কমরেড উডেন হেড'। বিখ্যাত জার্মান কমিউনিষ্ট নেত্রী ক্লারা জেটকিন লিখেছিলেন—'মে এ বেনভলেণ্ট ফেট প্রিভেণ্ট দিস ম্যান ফ্রম এভার রাইজিং টু দি টপ অব দি কমিউনিষ্ট পার্টি!'

কিন্তু উলব্রিখ্‌ট্‌কে তবুও ঠেকান যায় নি। সকল কাঁটা তুচ্ছ করেই দরজীর ছেলে (এবং নিজেও একদা ছুতোর মিস্ত্রী!) ওয়াল্টার উলব্রিখ্‌ট্ আটষট্টি বছর বয়সে আজ শুধু পার্টির প্রধান নন, একটা 'দেশের'ও অন্যতম ভাগ্য বিধাতায় পরিণত হয়েছেন। 'দুই জার্মানীর' একটি তাঁর হাতে। —হ্যাঁ, কাঁটা তারের বেড়া থেকে শুরু করে স্যোসালিস্টিক বিবাহ-বিধি, স্যোসালিস্টিক অন্নপ্রাশন, নাম-করণ, কৃষি এবং শিল্প সংগঠন—জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের ভাল-মন্দের অনেক খানিই তাঁর হাতে।

২২ তম কংগ্রেসের পর এখানেও নাকি প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছেঃ এ হাত পরিবর্তন আবশ্যক। কেননা, মৃত স্ট্যালিনকে যদি ক্ষমা করতে না পারা যায় তবে পূর্ব জার্মানীর এই স্ট্যালিনটিকেই বা কেন দেওয়া হবে এই অবাধ রাজত্বের ছাড়পত্র? প্রশ্নটা সঙ্গত। কারণ, উলব্রিখ্‌ট্ যে স্ট্যালিনের বিশেষ বন্ধুজন সে কথা সুখ্যাত। এমন কি এককালের বান্ধবী এবং বর্তমানে (বিয়ে হয় ওঁদের ১৯৫১ সনে) মিসেস উলব্রিখ্‌ট্ লোটিও যে ক্রুশ্চফ পন্থী নন তার প্রমাণও অফুরন্ত। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই মাহিলাটি কমিউনিস্ট শাস্ত্রে 'প্রাকটি-সিজম' নামে একটি বিশেষ ধরণের পাপ বা স্খলনের আবিষ্কারক!)

তবুও বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন, —উলব্রিখ্‌ট্-এর পতন অবধারিত নয়। কেননা, পূর্ব জার্মানী নামে

আজ যে দেশটি, উলব্রিখ্‌ট্‌কে বাদ দিয়ে স্ট্যালিন বা জুকফের পক্ষে তা কোন কালে সম্ভব ছিল না! পার্টিকে দিয়ে দিনে আঠার ঘণ্টা বিরামহীন কাজ করিয়ে তবে এই রাজ্য গড়ে তুলে-ছিলেন সেদিন দুর্ধর্ষ উলব্রিখ্‌ট্‌। অথচ, বহু বছর রুশদেশে প্রবাস জীবনের পর দেশে তখন তিনি সম্পূর্ণ নবাগত। তবুও দেখতে দেখতে কর্মীরা যে তাঁকে ঘিরে চার পাশে এসে দাঁড়াল সে শুধু উলব্রিখ্‌ট্‌-এর স্মৃতি শক্তির টানে। প্রায় কুড়ি বছর পরেও তাঁর মনে ছিল কোন্‌ গলিতে কোন্‌ কমরেড বাস করেন, কি তাঁর ঠিকানা এবং কে কোন্‌ কাজ ভাল জানেন।

তাছাড়া আরও একটা মস্ত গুণ আছে কমরেড উলব্রিখ্‌ট্‌-এর। তিনি হাওয়া চেনেন। ২০তম কংগ্রেসে স্ট্যালিনের নতুন পরিচয় শুনে তিনিও ক্রুশ্চফের সঙ্গে মাথা নেড়েছিলেন। ইউরোপ অবাক হয়ে সেদিন শুনেছিল স্ট্যালিন-বন্ধু উলব্রিখ্‌ট্‌ বলছেন—'ওয়ানক্যান-নট রেকন স্ট্যালিন অ্যামঙ্গ দি ক্লাসিক মার্ক্সিস্টস!'

৩০. ১১. ৬১

এটলী, ক্লিমেন্ট রিচার্ড

'দরজায় এসে থামল একটা খালি দামী গাড়ি;—কিন্তু এ কি!—ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন মহামান্য এটলী!'

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বৃটেনে তখন রকমারী রসিকতা। ছোটখাট মানুষ (লম্বায়—পাঁচ ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি, ওজন—একশ' চল্লিশ পাউণ্ড),—'ঠাকুর্দার মত' চেহারা। চোখভরা লজ্জা, মাথা ভরা টাক। তদুপরি কথা বলেন—গুনে গুনে, কানে কানে। সুতরাং, সহসা যেন চোখেই পড়ে না। ককটেল পার্টিতে মাত্র দু'গজ দূরে বলাবলি করে মেয়েরা—ওহ্‌, বুড়ো এটলী আজ যদি থাকত!

কেউ বলে—এটলী মরিসনের মত বিচক্ষণ নন। কেউ বলে এটলী বিভানের মত বক্তা নন। কারও মতে ব্যক্তিত্বে আরও উজ্জ্বল ক্রীপস, কারও রায়—নেতৃত্বে আরও মজবুত ছিলেন—আর্নেস্ট বিভান। এটলীকে ঘিরে নানা জনের নানা মত। এবং সম্ভবত একারণেই এই একটি মানুষ সম্পর্কে ইংল্যাণ্ড একমত। তার সিদ্ধান্ত: এটলী এটলী-ই। তিনি কারও মত নন; সম্পূর্ণত তাঁর নিজের মত,—এটলী ক্লিমেন্ট রিচার্ড এটলীর মত।

পার্লামেন্ট মথিত করে বক্তৃতা হচ্ছে। কিন্তু সরকারী বেঞ্চের প্রখর আক্রমণের সামনে চুপচাপ বসে

এটলী, ক্লিমেণ্ট রিচার্ড

আছেন নির্বিকল্প শ্রমিক নেতা। বক্তৃতা যতই এগুচ্ছে যতই উত্তেজিত হয়ে উঠছে সভাকক্ষ, ততই যেন নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ছে তাঁর মাথাটা। ক্রমে, সভা যখন উত্তেজনার শীর্ষে তখন দেখা গেল টেবিলের ওপর জেগে আছে শুধু একটি কেশশূন্য মাথা। আসনে হারিয়ে আছেন বিরোধী দলের নেতা।—এটলী কি ঘুমোচ্ছেন?—না। ডেস্কে তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলোর চলাফেরা যাঁরা লক্ষ্য করছেন তাঁরা জানেন—এটলী তাঁর উত্তরের জন্য তৈরী হচ্ছেন। সে উত্তরে এমনও হতে পারে যে টোরীরা একটা নির্বাচনে হেরে যেতে পারে। যেমন গিয়েছিল '৪৫ সনে!

দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটে তুমুল কর্মব্যস্ততা। মন্ত্রিসভার বৈঠক। কে একজন কমবয়েসী মন্ত্রী হাত পা ছুঁড়ে কি একটা বোঝাতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রীকে। অন্য মন্ত্রীরা অবাক হয়ে দেখছেন—এটলী আপন মনে সামনের সাদা কাগজটায় আঁকি-বুকি কাটছেন। তিনি ছবি আঁকছেন। তাই বলে কি সহ-কর্মীর কোন কথাই শুনেননি তিনি? প্রমাণ পাওয়া গেল মিনিট কয় পরেই, প্রধানমন্ত্রী যখন জানালেন প্রস্তাবটি তিনি সমর্থন করছেন, তবে এই এই সংশোধনী সহ—। হিসেব নিয়ে দেখা গেছে—যুদ্ধের সময়কার কোয়ালিশান মন্ত্রিসভায় যেদিন সভাপতিত্ব করতেন প্রধানমন্ত্রী চার্চিল সেদিন সময় লাগত বেশী, কাজ হত কম। আর যেদিন দায়িত্ব নিতেন তাঁর ডেপুটি এটলী সেদিন ঠিক তার উল্টো। কাজ হত বেশী, সময় লাগত কম। এইজন্যেই এটলী,—এটলী।

মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। বাব ছিলেন আইন ব্যবসায়ী। থাকতেনও পুটনি এলাকায়। ন' বছর অবধি লেখাপড়া বাড়ীতেই। প্রথমে মায়ের কাছে, তারপর জনৈকা মিস হাচিন-সনের কাছে। হাচিনসন বলতেন—এ ছেলে ত রীতিমত ঠাণ্ডা। আমা: আর একটি ছাত্র যা ছিল! কে সে? জানতে চাইতেন বালক এটলী। গৃহ শিক্ষিকা হেসে বলতেন—তুমি চিনবে না বাপ, তার নাম—চার্চিল!

বাড়ী থেকে স্কুল। স্কুল থেকে অক্সফোর্ড। এটলী 'মডার্ন হিস্টরী'র ছাত্র। বেপরোয়া এবং শক্ত রাজা বাদশাদের বড্ড ভাল লাগে তাঁর; কিন্তু নিজে তিনি নরমের নরম।

কলেজের পড়া শেষ হল আইনে উপাধি নিয়ে বাবার ব্যবসায়ে যোগ

দিলেন তরুণ এটলী। কিন্তু সে মাত্র কিছুদিনের জন্যে। একদিন এক বন্ধু এসে ডেকে নিয়ে গেলেন লাইমহাউস এলাকায়, হাইলেবারি হাউসে। সেই যে গেলেন—ও এলাকা থেকে আর ফেরা হল না তাঁর। দু'দিনেই লাইম হাউস-এর দারিদ্র্য সোস্যালিস্ট বানিয়ে দিল তাঁকে। ১৯০৭ সন থেকে এটলী পাকা সোস্যালিস্ট। তিনি ফেবিয়ান সোসাইটির অন্যতম কর্মী, ইনডিপেণ্ডেণ্ট পার্টির অন্যতম সদস্য।

এটলী এখন দিনে অক্সফোর্ডে ট্রেড ইউনিয়ান আইন পড়ান, রাতে ফেবিয়ানদের সঙ্গে আড্ডা দেন। অক্সফোর্ড থেকে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস। সেখানে তিনি সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক। কিন্তু আসলে তিনি সমাজসেবক। স্কুলের চেয়ে অনেক বেশী আকর্ষণ তাঁর লাইমহাউস পাড়ায়। পার্টির জন্যে ওপাড়ায় এক বছরে একশ পনেরটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেদিন লাজুক এটলী! একটি কাঠের বাক্স পিঠে করে তিনি ঘুরে বেড়াতেন গলিতে। লোকজন দেখা মাত্র তাঁর কাজ হত বাক্সটা মাটিতে পেতে তার উপর দাঁড়িয়ে যাওয়া!

এল প্রথম মহাযুদ্ধ। বক্তৃতা থামিয়ে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলেন এটলী। লাইমহাউস থেকে মেসোপটেমিয়া, ফ্রান্স,—নিজের হাতে লড়াই। চার বছর পরে যখন লাইমহাউসে ফিরে এলেন এটলী তখন তিনি একজন মেজর, তাঁর দেহের দুই জায়গায় যুদ্ধের স্মারক,—গভীর ক্ষত।

'২২ সনে লাইমহাউস পার্লামেণ্টে পাঠাল তাঁদের মেজর সাহেবকে। সেই থেকে '৫৫ সনে অবসর গ্রহণ অবধি—এটলী বরাবর লাইমহাউসের প্রতিনিধি। পার্লামেণ্টে ১৯৩৫ সন থেকে '৫৫ অবধি লেবার পার্টির নায়ক ক্লিমেণ্ট এটলী যে যে সরকারী পদ অলংকৃত করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : আণ্ডার সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ওয়ার (১৯২৪), পোস্টমাষ্টার জেনারেল (১৯৩১), সহকারী প্রধানমন্ত্রী (১৯৩৬) এবং প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৫—৫১)।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটলীর রাজত্বকে কেউ বলেন—'সোস্যালিজম', কেউ কেউ—'ফেয়ার শেয়ারস ফর অল'। চার্চিল বলতেন—'কিউটাপিয়া (Queuetapia)! কেননা, তাঁর মতে এটলীর অন্যতম কৃতিত্ব দেশময়—'কিউ'! তবে বিপক্ষে

এডওয়ার্ড, অষ্টম

ভোট দিলেও ইংরেজরা স্বীকার করেন—সেই 'কিউ'-এর মুখ 'ওয়েলেফেয়ার স্টেট'-এর জানালার দিকে। এবং এই জানালাটা খুলেছেন যাঁরা তাঁদের অন্যতম,—সেই মানুষটিই। আটাত্তর বছরের বৃদ্ধ সমাজতন্ত্রী আর্ল এটলী আমাদের দেশে এসেছেন আজাদ-বক্তৃতা দিতে। অবশ্য, এদেশে তিনি এই প্রথম নয়। '২৭ সনে 'সাইমন ফিরে যাও' বলে যাঁদের মুখের ওপর কালো নিশান উড়িয়েছিলাম আমরা, মনে করলে দেখা যাবে সেই দলে ছিল আজকের বৃদ্ধেরই তরুণ মুখটি। এটলীকে সেদিন আমরা চিনতাম না। আজ চিনি। শুধু আমরা নয়, সমগ্র বিশ্ব চেনে।

২৩. ২. ৬১

এডওয়ার্ড, অষ্টম (ডিউক অফ উইণ্ডসর)

'আমিদুঃখিত।—আপনি আমাকে হতাশ করলেন স্যার!'

'—কেমন করে?' চোখে চোখ রেখে জানতে চাইলেন যুবরাজ। ভদ্র-মহিলাকে আজই তিনি প্রথম দেখলেন কিনা!

'—আমেরিকা থেকে যে মেয়েই আসে সবাইকে এই একই কথা বলে থাকেন আপনারা!—আই হ্যাড হোপড ফর সামথিং মোর অরিজিন্যাল ফ্রম দি প্রিন্স অব ওয়েলস।'—চোখ দুটো তেমনি না নাড়িয়ে উত্তর দিলেন মিসেস সিম্পসন!

কে জানত এই একটি বাক্যই চিরকালের মত কেড়ে নিয়ে যাবে, রাজ্য, রাজত্ব, সিংহাসন, 'সম্ভ্রম'। নিতান্তই ঘটনাচক্রে দেখা। সে ১৯৩১ সনের শীতের সময়ের কথা। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ফিরে ভবঘুরে যুবরাজ ভাই জর্জকে নিয়ে শিকারে গিয়েছেন গ্রামাঞ্চলে। সেখানেই মেল্টন মাউব্রের বাড়িতে আলাপ। স্বামীর সঙ্গে মিসেস সিম্পসনও ছিলেন ভোজের টেবিলে। যুবরাজকেই প্রথমে কথা বলতে হয়। সুতরাং প্রিন্স বললেন—আমেরিকা থেকে এসেছেন ঘরে উনুন রাখা আপনাদের স্বভাব, নিশ্চয় আপনাদের অসুবিধে হবে।' তারই উত্তর—'আপনি আমাকে হতাশ করলেন স্যার! প্রিন্স অব ওয়েলস-এর কাছ থেকে নতুন কিছু আশা করেছিলাম!'

'ডেভিড' তাঁর প্রিয় 'ওয়ালি' সেই আশা আজও পূর্ণ করে চলেছেন রাজ্য-রাজত্ব-সিংহাসন—সব ছেড়ে ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম এডওয়ার্ড আ

দেশত্যাগী প্রেমিক ডিউক মাত্র। মিসেস সিম্পসন তাঁর স্ত্রী—ডাচেস অব উইণ্ডসর। তাঁদের প্রণয় কাহিনী আজ জগৎ বিখ্যাত। কিন্তু জগৎ জানে না পাঁচ বছর পরে মাত্র দশমাস রাজত্ব শেষে সেই ঝড়ের দিনগুলোতে উইণ্ডসর আর বাকিংহাম প্রাসাদে কি অসহ্য যন্ত্রণায় ইংলণ্ডেশ্বরকে প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত করতে হয়েছে। মা, প্রধানমন্ত্রী বলডুইন, বিশপ ডঃ ব্লাণ্ট, এবং পার্লামেণ্টের কথা বাদই দেওয়া গেল। বিশ্বের সংবাদপত্র, বিশেষ করে সেদিনের ফ্লিট স্ট্রীট যে নিগ্রহে নিক্ষেপ করেছিলেন ওঁকে সেও কি কম ? ওঁর নিজের জবানীতেই বলি :

বিকেলে মাক্স বিভারব্রুককে টেলিফোন করলাম বাকিংহাম প্যালেসে। 'জেণ্টলম্যানস এগ্রিমেণ্ট' ভেঙ্গে পড়ার লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ফ্লিট স্ট্রীট মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত এতক্ষণে নিশ্চয় জেনে গেছে।······মাক্সকে জিজ্ঞেস করলাম—'হোয়াট ডু য়ু ইনটেণ্ড টু ডু ইন দি এক্সপ্রেস ?'

উত্তর হল—'স্যার, দি এক্সপ্রেস, উইল···রিপোর্ট দি ফাক্টস। ইট ইজ আওয়ার ডিউটি টু ডু সো।'

কিংবা—

খবরের কাগজ সরিয়ে দিয়ে আমি আমার বেতার বক্তৃতা লিখতে বসেছি। ড্রয়িং রুমে ওয়ালি এসে হাজির। তাঁর হাতে লণ্ডনের একটা সচিত্র কাগজ। '—তুমি কি এটা দেখেছ ?' ওয়ালি আমাকে জিজ্ঞেস করল। 'হ্যাঁ······অত্যন্ত বাজে !'—আমি উত্তর দিলাম। কাগজটায় ওঁর মুখটাই মস্ত করে ছাপা ছিল।

অ্যাটলাণ্টিকের দুই তীরে তখন—চাঞ্চল্যকর সংবাদ ওঁরা। সুতরাং, আরও চাঞ্চল্য খুঁজে বেড়ান ছাড়া আর বিশেষ কিছু কাজ ছিল না সেদিনের সাংবাদিকদের। অসহায় সম্রাট তাই শরণাপন্ন হয়েছিলেন লণ্ডনের একটি ছোট্ট সাপ্তাহিকের।—'নিউ স্টেটসম্যান এণ্ড নেশন'-এর সম্পাদক কিংসলে মার্টিনের কাছে অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন বিষয়টা একটু গভীর ভাবে ভাবতে।—বহুদিন পরে মার্টিন সে গোপন অনুরোধটা এবার জগৎকে জানিয়েছেন। ভিস্তিওয়ালা আর বাদশার মতই খবরটা বোধহয় রোমাঞ্চকর। কেননা, 'ফোর্থ এস্টেট' নামে হলেও স্বয়ং সম্রাটের পক্ষে এতখানি মর্যাদাদানের খবর বৃটিশ-প্রেসে অনেক নেই। তারপরেও কি ডাচেস বলতে পারেন—ডিউক তাঁকে হতাশ করেছেন ! ৩১. ৫. ৬২

এনক্রুমা, ডঃ কোয়ামে

'গভর্ণর তাঁর হাতটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। তারপর বললেন—প্রধানমন্ত্রী, আজকের দিনটা তোমার কাছে নিশ্চয় একটা দিনের মত দিন। কেননা, যে দিনটির জন্যে তোমার এতদিনের সংগ্রাম আজ সেই দিন।

'আমার নয়, আমাদের সংগ্রাম বলুন স্যর চার্লস,—আমি শুধরে দিলাম তাঁকে!'

যিনি শুধরে দিলেন তাঁর নাম ডঃ কোয়ামে এনক্রুমা। এবং ভুলটা যাঁর হয়েছিল তাঁর নাম স্যর চার্লস আর্ডেন-ক্লার্ক। স্বভাবতই, দুজনের পক্ষে সেই উল্লেখযোগ্য দিনটা ১৯৫৭ সনের ৬ই মার্চ। অর্থাৎ গোল্ড কোষ্ট বা ঘানার জন্মদিন।

ঘানার জন্ম আর তার আজকের প্রধানমন্ত্রী এনক্রুমার জীবন প্রায় অচ্ছেদ্য। এনক্রুমা তাই তাঁর আত্মজীবনীটির নাম দিয়েছেন 'ঘানা'।

স্কুল পেরিয়ে কলেজে এসে হৃদয়বান শিক্ষকের মুখে এনক্রুমা শুনলেন —'হারমোনিয়াম নামক বাদ্যযন্ত্রটিতে —সাদা এবং কাল দুই রংয়ের 'কী' দেখেছ? বাজাতে চাইলে দুটোই বাজে। কিন্তু যাকে বলে সুরসঙ্গত তা পেতে হলে দুটোই একসঙ্গে বাজান চাই।' কথাটা এনক্রুমার মনে লাগল। কিন্তু চোখের সামনে থেকে সমস্যাটা দূর হল না। কলেজ থেকে বের হয়ে স্কুলে শিক্ষকতা সুরু করলেন। দেশের সমস্যাটা স্পষ্টতর হল। বাবা ধনবান ছিলেন না। কাকা ছিলেন সচ্ছল। তিনি টাকা দিলেন। এনক্রুমা চলে এলেন আমেরিকায়। নিগ্রোদের বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত লিঙ্কন য়ুনিভারসিটিতে ভর্তি হলেন। সে '৩৭ সনের কথা। সঙ্গে চলল—নিগ্রো রাজনীতি। এটা '৩৭ সনের কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ('৪৫) এনক্রুমা দ্বিতীয়-বারের মত বিদ্যার্থে বিদেশ যাত্রা করলেন। এবার লণ্ডন। বাড়ীওয়ালী চেহারাটা দেখবা মাত্র দরজা বন্ধ করে দেয় বটে, কিন্তু ল্যাস্কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজনীতি বুঝান। সুতরাং লণ্ডনে বসেই এনক্রুমা বের করলেন তাঁর বিখ্যাত কাগজ—'নিউ আফ্রিকান।' গোল্ড-কোষ্ট-এ সে কাগজ নিষিদ্ধ।

দেশে আসা মাত্র এবার সুরু হল রাজনীতি। '৪৯ সনে প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'কনভেনশান পিপলস পার্টি'। এই দলের নায়ক হিসাবেই '৫১ সনে এনক্রুমার ভাগ্যে

সেদিন জুটেছিল কারাবাস এবং আজ এল প্রধানমন্ত্রিত্ব।

কমনওয়েলথ পরিবারের সন্তান ঘানা। তার নায়ক একান্ন বছর বয়স্ক এনক্রুমা স্বভাবতই রাজনীতিতে চরম-পন্থী নন। মার্কস—এঙ্গেলস—লেনিন থেকে সুরু করে ভারতের গান্ধী, আমেরিকার মার্কাস গার্ভে অনেকের মত এবং পথের সঙ্গে পরিচিত এনক্রুমা মধ্যপন্থারই পথিক। তবে লোকে বলে সম্প্রতি যে পথ ধরেছেন তিনি তার পরিণতি যেন একনায়ক-তন্ত্রের দিকে। আগামী মাসে দেশ-বাসীর কাছে এনক্রুমা পেশ করছেন তার অনুমতিপত্রের প্রার্থনা। ঘানার নূতন শাসনতন্ত্রকে তখন গণভোটে দেবেন তিনি। যদি সে পরীক্ষায়, তিনি উত্তীর্ণ হন তবে ঘানা যে শুধু প্রজাতন্ত্র হবে তাই নয়, সকলের প্রত্যাশা কোয়ামে এনক্রুমাই হবেন তার সেই ক্ষমতাবান প্রথম রাষ্ট্রপতি।

১১. ৩. ৬০

এমবয়া, টম

'Our friends in Algeria and South Africa are not interested in Philosophy. They want to know what are you going to do for them.'

সভাস্থল ছিল আক্রা। স্বাধীন আফ্রিকার সভা। উদ্যোক্তাদের নাম—পজিটিভ এ্যাকশান কমিটি। বক্তার নাম টম এমবয়া। স্বদেশ—আফ্রিকা। অবশিষ্ট, আফ্রিকার হয়ে টম আফ্রিকাকে ডেকেছেন—পনরই এপ্রিল গোটা মহাদেশে 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করা চাই।

কেনিয়াট্টা হীন কেনিয়ার নায়ক টম এমবয়া আজ আফ্রিকার অন্যতম জননেতা। আজ এই উনত্রিশ বছরের কাল ছেলেটি যখন স্নান করেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের কলোনিয়াল সেক্রেটারী তখন তাঁর বৈঠকখানায় অপেক্ষা করেন। ক'বছর আগেও লণ্ডনের গুটিকয় শ্রমিক নেতা ছাড়া কেউ নাম জানত না তাঁর। কিন্তু এমবয়া আজ সকলের চেনা কালো-আফ্রিকার মুখপাত্র। বাবা ছিলেন—শিশল ক্ষেতের শ্রমিক। ছেলেরও তাই হওয়ার কথা। কিন্তু বাবা মিশনারীদের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন ওকে। সে স্কুলে ব্ল্যাকবোর্ড নেই, এমবয়ার শ্লেটও নেই। ফলে বালিতে অঙ্গুলে এ বি সি ডি লিখে বিদ্যারম্ভ হল। সেখান থেকে হাইস্কুল

ভাল করে ধরতে না ধরতেই কানে এল জমো কেনিয়াট্টার ডাক। এমবয়া তখন পয়সার অভাবে স্কুল ছেড়ে হেলথ ট্রেনিং-এ ঢুকেছেন। তিনি সব শুনলেন, সব বুঝলেন—কিন্তু খাতায় নাম লেখালেন না। তাঁকে আগে বাঁচতে হবে। সেনিটারী ইনসপেক্টার-এর চাকরী মিলল। মাসে মাইনে দেড়শত টাকা। ভাল মাইনে। কিন্তু একই কাজে সাহেবেরা পান—সাতশ কুড়ি টাকা। ওঁরা আপিসের মোটরে ঘুরেন। তাঁকে চলতে হয় সাইকেলে। তরুণ এমবয়া বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে আরও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ হল তাঁর। তিনি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব বরণ করলেন। একদিকে জমো কেনিয়াট্টা আর মাউ মাউ আন্দোলন, অন্যদিকে এমবয়ার মজবুত শ্রমিক সভা। কেনিয়া তখন স্বাস্থ্যবান সংগ্রামী। কিন্তু সহসা একদিন ওরা কেড়ে নিয়ে গেল কেনিয়াট্টাকে। এমবয়া কেনিয়াট্টার আফ্রিকান ইউনিয়নের শূন্য স্থানটি পূর্ণ করতে নির্ভয়ে এগিয়ে গেলেন। '৫৫ সালে আফ্রিকান ইউনিয়ন বে-আইনি হয়ে গেল। অতঃপর এমবয়াকে তাঁর শ্রমিক ফেডারেশনাটকেই আরও প্রসারিত করতে হল। আজ কেনিয়ায় তা বৃহত্তম রাজনৈতিক সংস্থা। এবং এই প্রতিষ্ঠানের নায়ক হিসাবেই টম এমবয়া আজ কেনিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ।

ক'বছর আগে ('৫৪) এমবয়া কলকাতা ঘুরে গেছেন। আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন তিনি। অনেকেই সে খবর জানেন না। আজ তাঁর লণ্ডন ভ্রমণ বিশ্বে প্রথম পাতার সংবাদ। লণ্ডন গোলটেবিলে কেনিয়া মোটামুটি আপসের পথ খুঁজে পেয়েছে। বিজয়ীর গর্বে মাতৃভূমিতে ফিরেছেন—এমবয়া। কিন্তু জমো কেনিয়াট্টা যতক্ষণ কারাগারে, দক্ষিণ আফ্রিকায় যতক্ষণ—অনুক্ষণ মানবতা মরে, ততক্ষণ আফ্রিকা কি স্বাধীন?—অবশ্যই না। এমবয়া তাই ঘোষণা করেছেন—পনরই আফ্রিকার 'স্বাধীনতা দিবস।' ১৬. ৪. ৬০

এলিজাবেথ, রাণী

রানী আসছেন।

আমাদের নয়, ভিন দেশের রানী। রানী এলিজাবেথ। 'হার মোষ্ট এক-সেলেণ্ট ম্যাজেষ্টি এলিজাবেথ দি সেকেণ্ড বাই দি গ্রেস অব গড, অব দি

ইউনাইটেড কিংডম অব গ্রেট বৃটেন অ্যাণ্ড নর্দার্ন আয়র্ল্যাণ্ড এণ্ড অব হার আদার রেলমস এণ্ড টেরিটোরিস, কুইন, হেড অব দি কমনওয়েলথ, ডিফেণ্ডার অব দি ফেইথ,—রাজেশ্বরী। ক'টা বছর আগে হলেই বলতে হত রাজরাজেশ্বরী,—ভারতেশ্বরী!

ভারতেশ্বরী হতে পারতেন যিনি, প্রথম ভারতেশ্বরী যাঁর সাক্ষাৎ ঠাকু'মার ঠাকুর্মা সেই ইংলণ্ডেশ্বরী আসছেন। সঙ্গে আসছেন রানীর একত্রিশ সহচরী, আর একশ তিন বছরের স্মৃতি।

অবশ্য ইংলণ্ডেশ্বরীর বয়স এখনও চল্লিশও ছোঁয়নি। বয়স মোটে পঁয়ত্রিশ। দেখায়—আরও কম।

মসৃণ চামড়া। গায়ের রং, প্রজারা বলে—'স্প্রীং ইন ইংল্যাণ্ড!' ঢেউ খেলান বাদামী চুল, সোনালী রং, নীল চোখ। পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি উঁচু এলিজাবেথ যদি অনুচ্চ জুতো পরে টুইডের গাউন চাপিয়ে পথে হাঁটেন তবে কে বলবে—এলিজাবেথ রানী!

অথচ খবরের কাগজের আধা-কলমে প্রোফাইলটা দেখে দুনিয়া তাই বলে। বলে—এই মেয়েটি ইংল্যাণ্ডের রানী।—কটি ছেলেপুলে জানি ওঁর?

এলিজাবেথ রানী হয়েছেন সম্প্রতি। মাত্র ১৯৫৩ সনে। কিন্তু সংবাদ হয়েছেন তার বহু আগে। '৪৭ সনের জুলাইয়েরও আগে।

কত বয়েস হবে তখন আর তাঁর? বোধ হয় তের। সতের বছরের প্রবাসী গ্রীক রাজকুমারকে ঘিরে তখন থেকেই রাজকন্যা দেশ আলোড়নকারী সংবাদ।

'ফিলিপ দি গ্রীক' ওরফে নাবিক তথা প্রিন্স ফিলিপ সতের থেকে পঁচিশে পৌঁছালেন, রাজকুমারী তের থেকে কুড়িতে। রাজকুমারীর টেবিলে নাবিকের বেশে ভিনদেশী রাজকুমারের ছবি। খিল বন্ধ স্নানের ঘরে ফিলিপের হাতে ভবিষ্যৎ ইংলণ্ডেশ্বরীর চিঠি, খবরের কাগজে হেড লাইন—'হু আসক্‌ড হুম?'

ষষ্ঠ জর্জ বাদ সাধলেন। বললেন—আমার মত নেই। এলিজাবেথ কাঁদলেন। স্বপক্ষে রাজার কাছে দরবার করলেন মা এবং বৃদ্ধা ঠাকুরমা। রাজা মাউণ্টব্যাটেনকে তলব করলেন। বললেন—তোমরা বোঝ। ফিলিপ ওঁদের আত্মীয়, তদুপরি মাউণ্টব্যাটেন ডান বাঁয়ের মতিগতির সন্ধান জানেন। একটা কাগজ ভোটাভুটি করে ফেলল। তারা বলল—স্বপক্ষে শতকরা চৌষট্টি!

এলিজাবেথ, রাণী

সুতরাং, বিয়ে হয়ে গেল। সে ১৯৪৭ সনের জুলাইয়ের কথা।

বিয়ের পর মাল্টায় নাবিকের বৌ হিসেবে গৃহস্থের সংসার। নাচের আসর, ছেলেমেয়ে ইত্যাদি এবং অবশেষে '৫৩তে এসে সিংহাসনে স্থিতি।

সিংহাসনে বসা এলিজাবেথকে দেখে সকলে একবাক্যে স্বীকার করলেন—এ মেয়ে জুগ্যি বটে! মেরী, অ্যানি, এলিজাবেথ, ভিক্টোরিয়া—ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে যে ক'জন রানী সিংহাসনে বসেছেন—এলিজাবেথ দ্বিতীয় তাঁদের কারও চেয়ে অল্প-লক্ষণা নয়।

গেল ক' বছরে বোধ হয় সত্য প্রমাণিত হয়েছে কথাটা। এলিজাবেথ চিরকাল জনতা দেখেছেন জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে, কিন্তু গেল ক' বছরে ('৫৩-'৫৯) এত মানুষ দেখেছেন তিনি যা সম্ভবত পৃথিবীর কোন রাজা কোন দিন দেখেননি। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া—ক' বছরে আশি হাজার মাইলের বেশী ঘুরেছেন তিনি। অসংখ্য দেশ দেখেছেন,—অগণিত মানুষ।

ঘরে যখন থাকেন এলিজাবেথ তখন সুখী গৃহস্থ। রাজ্য পরিচালনার জন্য হার ম্যাজেষ্টির মন্ত্রীরা রয়েছেন। পার্লিয়ামেণ্ট রয়েছে। স্বয়ং রানীর কৃত্যগুলো কথঞ্চিৎ লাঘব করার জন্যে রয়েছেন—প্রিন্স ফিলিপ।

এলিজাবেথ তাই এগার বছরের ছেলে প্রিন্স চার্লস আর ন' বছরের মেয়ে প্রিন্সেস অ্যানির মধ্যে বাইসিকল-পলো খেলা দেখেন (অবশ্য ওদের ছুটির সময়ে).—কিংবা প্রিন্স এণ্ড্রুর হাত-পা ছোঁড়া!

তাঁর অন্য নেশা—ঘোড়দৌড় এবং টেলিভিসন। তবে সবচেয়ে ভাল লাগে যেটা সে সব সময় রানীভাবে থাকতে হয়।

একদিন প্রাসাদের এক কর্মচারী এলিজাবেথের সামনে একটা কিসে একটু হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছেন, 'হার ম্যাজেষ্টি' সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন—'আপনি কি ক্লান্ত?'

—'না ম্যাডাম, কেন বলুন ত?'

ইংলণ্ডের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ উত্তর দিলেন—'বিকজ আই থিঙ্ক ইউ স্যুড ষ্ট্যাণ্ড আপ ষ্ট্রেইট হোয়েন ইউ আর টকিং টু দি কুইন!'

মানুষটি তৎক্ষণাৎ আনত মস্তকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

২২.৯.৬০

[আবার অন্য রকম হয়। অবশ্য প্রত্যহ নয়, কখনও কখনও।]

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে স্মরণীয় ক্ষণ অনেক। সে মাল্যে বিন্দুর মত আরও একটি মূহূর্ত যুক্ত হল। গৌরবের সাত-নরী হারে অকিঞ্চিৎকর সেই মূহূর্ত ক'টি তবুও যে এত দূব থেকে চোখে পড়ছে তার একমাত্র কারণ বিন্দুটি কৃষ্ণবর্ণের। বৃটেন স্মরণকালে নাকি এমন ঘোরকৃষ্ণ ক্ষণ চোখে দেখেনি।

স্থান ছিল লণ্ডনের বিখ্যাত অল্ডউইচ থিয়েটার। কাল—১০ই জুলাই, বুধবার। ইংলণ্ডেশ্বরী রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ সে রাত্তিরে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর প্রিন্স ফিলিপ, গ্রীকরাজ পল এবং তদীয় পত্নী রানী ফ্রেডারিকা। ফেরার পথে আলোকের সেই ঝরণা ধারা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিল। মহামান্যা ইংলণ্ডেশ্বরী অবাক হয়ে শুনছিলেন তাঁরই প্রজাবর্গ তাঁকে টিটকারি দিচ্ছে! এ অন্ধকাব এলিজাবেথ ইতিপূর্বে দেখেননি। তিনি রাগে কাঁপতে লাগলেন।

তারপর কাউকে কিছু না বলে সোজা নিজের গাড়ীতে গিয়ে বসলেন। পরদিন সকালে প্রভাতী কাগজে ঘটনার বিবরণ পড়ে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ স্তম্ভিত। এমন কি, আমাদের মত দূরবর্তী শ্রোতারা পর্যন্ত। কেননা, রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ সেই ইংল্যাণ্ডের রানী যার সম্পর্কে মিশর-রাজ একদা বলেছিলেন—ডায়মণ্ড, হার্টস, স্পেড এবং ক্লাব-এর পর যদি কোথাও রাজ-মর্যাদা থাকে তবে সে বৃটেন! শুধু তাই নয়, এলিজাবেথ সেই বৃটেনের রানী যেখানে রানীর পুত্রলাভের আনন্দে সাধারণ কারখানা শ্রমিক পর্যন্ত 'পাবে' বাড়তি শিলিংগুলো উড়িয়ে দেয়। খবরের কাগজে চিঠি আসে রাজপুত্রের এমন নাম রাখা চাই যাতে 'এক্সট্রাঅর্ডিনারী মিরাকল অব এ রয়াল বার্থ' যেন নামের কারণে চাপা না পড়ে যায়!

বিশেষত রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথকে তাঁর রাজত্বের সূচনা দিন থেকেই (১৯৫২) প্রজারা অনুরাগ দেখিয়েছিল কারণ ষষ্ঠ জর্জ জনপ্রিয় রাজা ছিলেন। এবং তিনি নাকি মৃত্যু শয্যা থেকে বলেছিলেন—আমার এই মেয়েটি অনাথাই রয়ে গেল।—সি উইল বি লোনলি অল হার লাইফ। প্রজারা হর্ষধ্বনিতে সে ভবিষ্যৎবাণীকে বিফল করতে চেয়েছিল। মনে আছে, সেদিন তারা সগৌরবে রানী প্রথম

এলিজাবেথকে উল্লেখ করেছিল। গুণে গুণে হিসেব করেছিল—প্রথম এলিজাবেথও সিংহাসনে বসেছিলেন পঁচিশ বছর বয়সে। সেদিনটিতেও ইংল্যাণ্ডের ভাগ্যাকাশ ঘিরে এমনি নানা দুর্যোগের লক্ষণ ছিল। তারই মধ্যে শেক্সপীয়র, বেন জনসন, যুদ্ধ,—তিরিশ বছরের টানা শান্তি! এ এলিজাবেথ আরও সুলক্ষণা, সিংহাসনে বসার আগেই তিনি মা হয়েছেন! সুতরাং, সেদিন জয়ধ্বনি উঠেছিল—লং লিভ দি কুইন!

আজ এগার বছর পরে কেউ কি বলতে পারে এলিজাবেথ ব্যর্থ রানী? অবশ্য নয়। রানী বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন। রানীর আমল এভারেষ্ট জয় করেছে। রানী টেলিভিসনে দর্শকদের মনোজয় করেছেন। এবং কি নয়? কথা আছে তিনি 'সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দিতে পারেন, অফিসারদের চাকরী খতম করে দিতে পারেন, যুদ্ধ জাহাজ বেচে দিতে পারেন,…যত স্পীডে খুশী মোটর চালাতে পারেন,' এবং আরও অনেক কিছু। কিন্তু সেগুলো কথার কথা। বেগহট (Bagehot) যিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের এই অধিকারগুলো তালিকাবদ্ধ করেছিলেন, ভিক্টোরিয়া তাঁকে বলতেন—'দুষ্ট' ('হোয়াট এ উইকেড ম্যান টু রাইট সাচ এ স্টোরি!') কার্যত যা করা সম্ভব ছিল এলিজাবেথ সম্ভবত সবই করেছেন। এমন কি ফিলিপের পরামর্শ মত তিনি নাকি মদ, আলু এবং মিষ্টি ছেড়ে দিয়েছেন। কেননা, নয়ত এই সাঁইত্রিশ বছর বয়সে প্রজারঞ্জক অবয়ব রাখা যায় না। তাহলেও দ্বিতীয় এলিজাবেথকে ১০ই রাত্রে পথের মানুষ কালো মুখ দেখাল কেন?

প্রশ্নটা গুরুতর।

কেননা, সেদিন সাক্ষাৎ নিজের কর্ণে শুনলেও এলিজাবেথ জানেন তাঁর জীবনে এই প্রথম টিটকারি নয়। পাশে তবুও সেদিন ফ্রেডারিকা ছিলেন, কারণটা তাই অজ্ঞাত ছিলনা। কিন্তু সেই লিখিত টিটকারিগুলো?

যতদূর মনে পড়ছে ইষ্টক খণ্ডের চেয়েও প্রবল প্রথম টিটকারিটি নিক্ষেপ করেছিলেন তরুণ লর্ড অ্যালটিঙ্কহাম। তিনি লিখেছিলেন (ন্যাশনাল এণ্ড ইংলিশ রিভিউ, ১৯৫০) রানীকে দেখলে মনে হয় তিনি যেন 'এ প্রিগিশ, স্কুল গার্ল, 'ক্যাপটেন অব দি হকি টিম্'…ইত্যাদি। তাঁর কথা বলার ভঙ্গী যেন 'গলায় কোন ব্যথা সঞ্জাত'।

তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন—রানীর বয়স হচ্ছে, প্রজার ভালবাসা পেতে হলে তাঁকে এখন এমন কিছু বলতে হবে যা তারা মনে রাখতে পারে, এমন কিছু করতে হবে যা দেখে তারা নড়েচড়ে বসতে পারে! দ্বিতীয় অবাধ্য প্রজা ম্যালকম ম্যাগারেজ। তিনি লিখেছিলেন (স্যাটারডে ইভিনিং পোষ্ট, ১৯৫৮) রাজতন্ত্রের মহিমা আমার কাছে 'একান্তভাবেই রসাত্মক!' টেলিভিসনের রানীকে তিনি নাম দিয়েছিলেন—'ফিলিম স্টার'। তৃতীয় সমালোচক দল—লিখিয়ে রাগী-ছোকরারা। তাঁদের মুখপাত্র জন অসবর্ণের ভাষায় ইংল্যাণ্ডের রাজতন্ত্র হচ্ছে—'দি গোল্ড ফিলিং ইন এ মাউথ ফুল অব ডিকে!' সবশেষ প্রশ্ন তুলেচেন কিংসলে মার্টিন ('দি ক্রাউন এণ্ড দি এস্টাব্লিসমেণ্ট') 'টেলিভিশনী রাজতন্ত্র' বিষয়ে মার্টিনের তত আপত্তি নেই, আপত্তি তার খরচ নিয়ে। রানীর সংসারে পাঁচশ দাস দাসী, ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউণ্ড তাঁর বার্ষিক খরচ। তার উপর 'রানীর স্বামী'কে দিতে হয় বছরে ৪০ হাজার পাউণ্ড, ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ বাবদে দিতে হয় ১ লক্ষ পাউণ্ড! তারপরও মার্গারেটের সংসার আছে, অন্যরা আছেন।—এগুলো কি বাড়াবাড়ি নয়?

ইংলণ্ডেশ্বরী নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন তাঁর এধরনের খুঁত-ধরা প্রজাদের শায়েস্তা করার জন্যে শুধু 'এস্টাব্লিসমেণ্ট' নয়, প্রজারাও তাঁর পেছনে আছেন। অ্যালট্রিঙ্কহাম সম্পর্কে রায় দিয়েছিলেন আর্গিল-এর ডিউক 'ওকে ফাঁসী দেওয়া আবশ্যক।' ম্যাগারিজের কাহিনী সুবিদিত, তাঁর বাড়ীতে পর্যন্ত হামলা হয়েছিল। অন্যরাও গালমন্দ লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন কম নয়। তাছাড়া, মহামান্যা ইংলণ্ডেশ্বরী নিশ্চয় জানেন—প্রকৃত গৌরবের পক্ষে ঢিল পাটকেলটি আবশ্যক। তাঁর আগে যে পাঁচজন রানী ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই কখনও না কখনও কম বেশী তা ভোগ করেছেন। এমন যে রানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে স্বকর্ণে একাধিকবার শুনতে হয়েছে প্রজারা গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে—'মিসেস মেলবোর্ণ!—মিসেস মেলবোর্ণ।'

১৮. ৭. ৬৩

ওয়েলনস্কি, স্যার রয়

বক্সিং।

দিন রাত শুধু বক্সিং আর

বক্সিং। তখন তিনি একজন মস্ত বক্সিং লড়িয়ে। দেশের-হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান।

কেরানী, কশাই, রুটি কারিগর—বক্সিং খেলা—কি কাজ না করেছেন তিনি? দুই দশক আগেও যদি কেউ উত্তর রোডেসিয়ায় যেতেন তবে হয়ত দেখতেন সেই শ্বেতাঙ্গ তরুণটি এঞ্জিন চালাচ্ছেন। তখন যে তিনি রেল-শ্রমিক!

শ্রমিক থেকে শ্রমিক নেতা। তারপর দেখতে দেখতে ক্রমে 'দেশনায়ক'। রোডেসিয়া এবং নিয়াসাল্যাণ্ড ফেডারেশনের প্রধানমন্ত্রী রয় ওয়েলনস্কির উত্থান-কাহিনী সত্যিই যেন এক রহস্য-কাহিনী।

বাবা ছিলেন রুশ আর পোলিশ মিলিয়ে একধরনের ইউরোপীয় ইহুদি। বাস করতেন—আমেরিকায়। ফার-এ কারবার। কারবারে মন্দা দেখে তরুণ ইহুদি আমেরিকা ছেড়ে চলে গেলেন আফ্রিকার দক্ষিণ দিকে। কেননা, তিনি শুনেছেন ওখানেই হীরে পাওয়া যায় বেশী! রোনাল্ড যখন ভূমিষ্ঠ হলেন নানা অঞ্চল ঘুরে তিনি তখন রিক্ত হস্তে রোডেসিয়ায়।

আধা আফ্রিকান, আধা ইউরোপীয় স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে দক্ষিণ রোডেসিয়ার সেলিসবারীতে তাঁর গরীবের সংসার।

ছেলে বাবার চেয়েও দুর্ধর্ষ। জ্ঞান হওয়া মাত্র সে 'রোনাল্ড' ছেঁটে 'রয়' হল। তারপর চৌদ্দ বছর বয়সে স্কুল ছেড়ে বের হল দিগ্বিজয়ে।

প্রথমে এ-কাজ, সে-কাজ। তারপর—রেল। ১৯২৩ সনের কথা। রোডেসিয়ায় রেল-শ্রমিক হলেন ওয়েলেনস্কি। দশ বছর কাজ করে এলেন শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় পরিষদে। তারপর '৩৮ সনে উত্তর রোডেসিয়ার আইন পরিষদে। পরিষদে এসেই মনের মত করে নিজের একখানা দল গড়লেন ওয়েলেনস্কি। নাম—লেবার পার্টি। বাইরের লোক পরিচয় নিতে গিয়ে বুঝলেন—সে পার্টি যতখানি শ্রমিকদের জন্যে তার চেয়েও বেশী যেন একজনের জন্যে। তিনি রয় ওয়েলেনস্কি। আফ্রিকানরা যাঁকে তখনও নিজেদের লোক ভেবে ডাকত—'ওম রয়!'

উত্তর আর দক্ষিণ রোডেসিয়া। তৎসহ নিয়াসাল্যাণ্ড। ওম রয় স্থির করলেন—তিনে মিলে এক রাজ্যের আমীর কিংবা ওমরাহ হতে পারলে তবেই না কর্তৃত্ব! যুদ্ধের সময় চমৎকার কাজ করেছেন 'জনশক্তি'র

তহবিলদার বা ম্যানপাওয়ার ডাইরেক্টার হিসাবে। সুতরাং সরকারী মহলে জনপ্রিয়তা ছিল। তারই সুযোগে '৪৮ সনে ফেডারেশনের প্রস্তাব যে শুধু গৃহীত হল তাই নয়, ওয়েলেনস্কি 'স্যার' হলেন এবং সেই সঙ্গে রাজ্যের যোগাযোগ ও পরিবহণ মন্ত্রী। '৫৬ সন থেকে সেই কুখ্যাত ফেডারেশনের তিনি প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী ওয়েলেনস্কিকে নিয়ে ইউরোপে আজ তুমুল তর্ক। ঘরেও চারপাশ ঘিরে বিদ্রোহের ধূমায়িত আগুন। কেননা, ওয়েলেনস্কির শাসন আসলে সেই খারিজ করে দেওয়া শ্বেতাঙ্গ শাসন। অথচ দেশ কৃষ্ণাঙ্গের।

'২৫ সন থেকে '২৮ সন পর পর দেশের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ান ছিলেন রয়। আশা ছিল চতুর্থবারও হবেন। কিন্তু অসংখ্য দর্শককে হাসিয়ে সেবার জনৈক আফ্রিকান খেলা জমতে না জমতেই নক-আউট করেছিল তাঁকে। জানি না, রোডেসিয়ার ইতিহাসে এটা কোন্ রাউণ্ড চলছে!

৯. ৩. ৬১

ক

করিম, বেল কাসেম

ইতিহাসে নাম যার 'শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ' তারও অভিজ্ঞতা ছিল ফরাসী দেশের। কিন্তু মাত্র সাড়ে সাত বছরে আফ্রিকার এক নগণ্য অঞ্চলে যে যুদ্ধ তাদের দেখাল 'সৌখিন' মুসলিম লড়িয়েরা, ইতিহাসে সত্যিই তার তুলনা নেই।

সাড়ে সাত বছরে কুড়ি হাজার ফরাসী সৈন্য প্রাণ দিয়েছে সুদূর আলজেরিয়ার মাটিতে। সাম্রাজ্যবাদ বদলী নিয়েছে সাড়ে তিন লক্ষ মুসলমান মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করে। কিন্তু তবুও স্তব্ধ করা সম্ভব হয়নি সেই ভয়ঙ্কর রণধ্বনি,—'য়ূ! য়ূ! য়ূ!' যখনই ফরাসীরা জয়ধ্বনি তুলেছে—'আল-জেরি ফ্রান-সাইজ',—তখনই পাহাড়ে পাহাড়ে উত্তর প্রতিধ্বনিত হয়েছে—'য়ূ! য়ূ! য়ূ!', মৌন সাহারা সায় দিয়েছে—'য়ূ! য়ূ! য়ূ!'

শুধু রক্ত নয়, হৃদপিণ্ড পর্যন্ত।

করিম, বেল কাসেম

দুই দুইবার খাস ফরাসী সৈন্যদলে বিদ্রোহের কারণ হয়েছে এই যুদ্ধ, এই যুদ্ধ পতন ঘটিয়েছে ইউরোপের সেই বিখ্যাত রাজশক্তিকে, নাম ছিল যার ফোর্থ রিপাবলিক। দ্য গল যে এলেন—তার অন্যতম কারণ আলজেরিয়া। থেকে থেকে তাঁর পঞ্চম রিপাবলিক যে কেঁপে কেঁপে উঠছে তারও কারণ এই আলজেরিয়া। সুতরাং, রিপাবলিকের নামেই আদেশ দিলেন জেনারেল—হেলিকপ্টার পাঠাও!

পঞ্চম রিপাবলিকের হেলিকপ্টার থেকে যে দীর্ঘকায় মানুষটি হাতে একখানা পোর্টফোলিও নিয়ে ধীরে ধীরে নেমে এসেছিলেন এভিয়ানে তিনি যে রিপাবলিকের একজন ঘোরতর শত্রু সে খবরটা প্রহরারত প্রত্যেকটি ফরাসী সৈন্যই নিশ্চয় জানতেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন না এই মানুষটিও একদিন তাঁদের মত ফরাসী সৈন্যদলেই ছিলেন। সেদিন পরিচয় ছিল তাঁর ফরাসী পদাতিক বাহিনীর একজন কর্পোর‍্যাল।

দ্য গল-এর আলজেরিয়া বিভাগের মন্ত্রী ম'লুই জোস এগিয়ে এসে মাননীয় শত্রুর সঙ্গে করমর্দন করলেন। কিন্তু তিনি কি জানতেন—যে মানুষটির সঙ্গে তিনি শান্তি আলোচনা করতে চলেছেন—তিনি বহুকাল আগেই মৃত? একবার নয়, আলজেরিয়ার আদালত পাঁচ-পাচবার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে করিমকে। কিন্তু আসামীকে একবারও হাতে পাওয়া যায়নি। এবং সম্ভবত তা পাওয়া যায়নি বলেই এভিয়ানে এই শান্তি আলোচনা সম্ভব হল। কারণ, যোদ্ধা হলেও করিম যুদ্ধের লক্ষ্য কি তা জানেন। শোনা যায় শান্তির প্রশ্নে এফ-এল-এন-দলে তিনি আগাগোড়াই মডারেট ছিলেন।

পুরা নাম—বেল কাসেম করিম। বয়স—মাত্র চল্লিশ। জন্ম—আলজেরিয়ার একগ্রামে। গ্রামের জনৈক চৌকিদার-এর পুত্র যৌবনেই দেশকে ভালবেসেছিলেন। তারপর তাঁর পিতৃভূমির কোন স্মরণীয় ইতিহাস নেই শুনে নিজেই একদিন রাইফেল হাতে বেরিয়ে পড়েছিলেন তা গড়ে তুলবেন বলে। ফরাসী সৈন্যবাহিনী ত্যাগী করিম তখন দ্রা-এল-মিজেন-এর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সেক্রেটারী। এখন তিনি অস্থায়ী আলজিরীয় সরকারের সহ-সভাপতি এবং পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই পদোন্নতি একদিনে সম্ভব হয়নি।

১৯৫৪ সনে যে নয়জন মানুষ ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন দ্রা-এল-মিজেন-এর মুক্তিযোদ্ধা করিম ছিলেন তাঁদের একজন। এবং যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর তিনিই নিযুক্ত হয়েছিলেন কাবিলিতে কমাণ্ডার।

১৯৫৭ সনে যে পাচজনের কমিটি মুক্তি যুদ্ধের পরিচালনা গ্রহণ করেন এই করিম ছিলেন তাঁদের অন্যতম। চীন, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েৎনামে তিনিই সেদিন সাহায্যের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। আলজিরিয়ায় সেবার যখন সাধারণ ধর্মঘট তখন তিনিই একমাত্র এফ-এল-এন নায়ক যিনি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন! তারই পুরস্কার হিসেবে '৫৮ সনে কায়রোতে তাঁকে বরণ করা হয় যুদ্ধ-মন্ত্রীর পদে।

তবে এই সাড়ে সাত বছরের যুদ্ধে করিমের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব একবারও তিনি কোথাও ধরা পড়েননি! এবার এভিয়ানে বারোদিনব্যাপী আলোচনায় বেল কাসেম করিম আরও একটা কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। অবশেষে দ্য গল-এর সঙ্গে সন্ধি করে তিনি বোধ হয় জানালেন—যুদ্ধটা সত্যিই তিনি বোঝেন!

২৩. ৩. ৬২.

কাউণ্ডা, কেনেথ

গলায় ঝোলান তকমাটাতে স্পষ্ট লেখা আছে—'শ্বেতাঙ্গের কুকুর', তবুও মেয়েটি বলল,—'সাবধান, এ কুকুর কিন্তু সাদাদেরও কামড়ায়!'

'—কেন?' মালিকের সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র জানতে চাইলেন শ্বেতাঙ্গ আগন্তুক।

'—কারণ, এই ভয়ঙ্কর দেশে তা ছাড়া উপায় নেই!'

কৃষ্ণাঙ্গরাও তাই বলেন। তারা বলেন—অন্তত পঞ্চাশজন কালো মানুষের রক্ত ভিন্ন উত্তর রোডেসিয়ার মুক্তি নেই!

আশ্চর্য, কাউণ্ডা তবুও বলেন 'শান্ত হও, শান্ত হও।—মুক্তি প্রেম ভিন্ন সম্ভব নয়!'

নাম—কেনেথ কাউণ্ডা (Kenneth Kaunda)। জাতি—আফ্রিকান। হৃদয়বান ইংরেজরা বলেন তিনি লিভিং-স্টোন,—ইউরোপীয়ান। আফ্রিকানরা বলেন—তিনি গান্ধী,—ইণ্ডিয়ান।

ইণ্ডিয়ান নন বটে, তবে সত্যিই তিনি গান্ধী। আফ্রিকান গান্ধী। কাউণ্ডা মদ খান না, মাংস খান না। প্রতিজ্ঞা করেছেন দেশ যতদিন স্বাধীন না হচ্ছে, ততদিন চা খাবেন না, কফি

ছোঁবেন না। তবে তার চেয়েও কঠিন সংকল্প তাঁর—তিনি কিছুতেই হিংসার পথে পা বাড়াবেন না। কেননা, তিনি খ্রীষ্টানের ঘরে জন্মেছেন এবং গান্ধীজীর লেখা পড়েছেন। পরে কাউণ্ডা জেনেছেন—ম্যাকলিওড, ওয়েলেনস্কির হৃদয়েও ঈশ্বর আছেন। কিন্তু এখনও তিনি আছেন কি? যদি থাকতেন তবে উত্তর রোডেসিয়ার নামে আজ তিনি নিশ্চয় ভাবিত হতেন। কেননা, সংবাদ—আফ্রিকার গান্ধী তাঁর সরকারী পরিচয় পত্রখানা পুড়িয়ে ফেলেছেন এবং বলেছেন—'আমার অভিধানে অতঃপর ধৈর্য বলে আর কোন কথা রইল না।' সংবাদটা সকলের পক্ষে চিন্তার কারণ। কারণ অনেকের অনুমান এটা গান্ধীজীর 'করেঙ্গেইয়ে মরেঙ্গের'-ই পূর্বলক্ষণ।

দুর্লভ ব্যক্তিত্ব। অস্বাভাবিক ধৈর্য। কাউণ্ডার গান্ধী-লক্ষণ গান্ধীজীর কথা ভাল করে বুঝবার আগেই। বাল্যে।

বাবা ছিলেন নিয়াসাল্যাণ্ডের জনৈক আফ্রিকান মিশনারী। ধর্ম প্রচারার্থ একদিন তিনি পা বাড়িয়ে ছিলেন এদিকে, রোডেসিয়ায়। সেখানেই লুবওয়ার মিশন বাড়িতে একদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল কেনেথ। সে ১৯২৪ সনের কথা।

আট বছর বয়সে বাবা চলে গেলেন। অনাথ বালক সেই তমসাচ্ছন্ন জগতে যেন পুনর্বার জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি সাদা এবং কালোর পার্থক্য বুঝলেন।

মিশন স্কুলে পড়া শেষ করে তিনি শিক্ষকতায় ট্রেনিং নিলেন। তারপর কাজ নিলেন একটা স্কুলে। হেড-মাস্টারের কাজ। এ কাজে অভিজ্ঞতা আরও বাড়ল এবং অবশেষে তা সম্পূর্ণ হল একবার দক্ষিণ রোডেসিয়ায় বেড়াতে গিয়ে। কাউণ্ডা জানলেন—রাজনৈতিক মুক্তি ছাড়া কৃষ্ণাঙ্গের কোন ভবিষ্যৎ নেই।

'৪৮ সন। শিক্ষক কাউণ্ডা রাজনৈতিক কর্মী হলেন। তিনি এবং তাঁর বন্ধুরা মিলে 'আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস' গড়লেন। কাউণ্ডা তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, নেতা।

'৫৩ সনে ওঁরা ফেডারেশন তৈরী করলেন। '৫৮ সনে কাউণ্ডা প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁর স্বতন্ত্র দল। সে দলের নাম—জাম্বিয়া আফ্রিকান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস। পূর্বতন কংগ্রেসের চেয়ে তারা আরও প্রগতিবাদী। অগৌণে তাঁরা স্বদেশের শাসন ব্যাপারে যোগ্য প্রতিনিধিত্ব চান। (৭০ হাজার ইউরোপীয়ানের জন্যে সেখানে আইন

সভায় আসন আছে ১৪টি, কিন্তু ২৫ লক্ষ আফ্রিকানের জন্যে মাত্র ৮টি!)

প্রস্তাবটা ফেডারেশনের প্রভুদের কাছে আপত্তিজনক। ফলে, নতুন কংগ্রেস বে-আইনী ঘোষিত হল। এবং তার নায়ক কারাগারে প্রেরিত হলেন।

কেউ কেউ ওঁকে জেলে পাঠাতে আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ বললেন—না, তা হয় না। কারন, লোকটি—গান্ধী।

সে বছর যে শুধু গান্ধীজীর দেশ ভারতই ঘুরে এসেছেন কাউণ্ডা তাই নয়, পুলিস তাঁর ঘরে এমন বই পেয়েছিল—যা অহিংসা বিষয়ক। এবং সেগুলোর লেখক—গান্ধীজী স্বয়ং।

২৪.৮.৬১.

কাটজু, কৈলাসনাথ

অবশ্য বই আছে কয়েকটা। কিন্তু পেশাদার লেখক নন। পেশা—গভর্নরশিপ।

লাটসাহেব হাতের কাগজগুলো আন্দোলিত করে বললেন—লেখা আছে কয়েকটা, ছাপবেন কেউ?

একসঙ্গে অনেকে হাত বাড়ালেন।

লেখক বললেন—তাঁকেই দেব সবচেয়ে বেশী দাম দিতে পারবেন যিনি।

লেখার নীলাম?—হ্যাঁ, তাই। হয়েছিল এই কলকাতায়ই। নীলাম-কারী ছিলেন—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল স্বয়ং। ক্রেতা—কলকাতারই কয়েকটি কাগজ। হাজার টাকা করে দক্ষিণা দিয়েই সেদিন তাঁরা লাটবাহাদুরের কয়েকটি রচনা কিনেছিলেন। কেননা, সেগুলো ডঃ কৈলাশ নাথ কাটজুর রচনা। এবং রাজ্যপাল বলেছেন—এ টাকা যাচ্ছে যক্ষ্মারোগীদের সাহায্যার্থে।

লেখায় ডঃ কৈলাশনাথ কাটজুর পরিচয়—তিনি সুলেখক, সুরসিক এবং আইনজ্ঞ। কিন্তু বলাবাহুল্য, ডঃ কাটজুর তা সম্পূর্ণ পরিচয় নয়।

জন্ম কোথায় বাইরের লোক অনেকেরই তা জানবার উপায় নেই। জানা গেল সেদিন (১৯৫৭) কাটজু যেদিন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। সাধারণে সেদিনই প্রথম জানল, আজীবন ইউ পি-বাসী কাটজু আসলে উত্তরপ্রদেশে প্রবাসী।

জন্মের পর থেকেই প্রবাসীর জীবন। মধ্যপ্রদেশের স্কুলেই বাল্যশিক্ষা হয়েছিল বটে, কিন্তু কলেজের খোঁজে আসতে হল প্রথমে লাহোরে এবং অবশেষে এলাহাবাদে। কাটজু এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ.,এল. এল. ডি, ডি. লিট। ডক্টরেট থিসিসটি

অবশ্য এস. সি দাসের সহযোগে লেখা।

জীবন সুরু হয়েছিল আইন ব্যবসা নিয়ে। কিন্তু বে-আইনী কাজেও দীক্ষা হল। ফলে, কানপুরের প্রসিদ্ধ উকিল এবং এলাহাবাদের প্রতিষ্ঠিত এ্যাডভোকেট ডঃ কৈলাশনাথ কাটজু যথাসময়ে জেলে গেলেন। ইতিমধ্যে এলাহাবাদে তিনি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, প্রয়াগ মহিলাবিদ্যাপীঠের চ্যান্সেলার, এলাহাবাদ জিলা কৃষক সমিতির সভাপতি এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফলে, ছাড়া পেয়ে কাটজু মন্ত্রি-সভায় এলেন। প্রথম দফা শেষ হল '৩৯ সনে। দ্বিতীয় দফা—'৪৬ থেকে '৪৭ সন। দুইবারই কাটজু ছিলেন ইউ পি'র আইন এবং শিল্পমন্ত্রী।

আইন এবং শিল্প খুব কাছাকাছি বিষয় নয় বটে, কিন্তু কাটজুর জীবনে যেন কোন বিষয়ই দূরবর্তী নয়। '৪৭ সনে তিনি গভর্নর নিযুক্ত হলেন ওড়িষায়। '৪৮ সনে এলেন পশ্চিমবঙ্গে। '৫১ সনে তাঁর দিল্লিতে ডাক পড়ল। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন কাটজু। তৎসহ আইনমন্ত্রী!

পরীক্ষার যেন আরও বাকী ছিল। '৫৫ সনে ডঃ কাটজু নিযুক্ত হলেন ভারতের দেশরক্ষামন্ত্রী। এবং অবশেষে '৫৭ সনে আবার সেই মধ্যপ্রদেশ। কাটজু এখন তাঁর বহুকাল ছেড়ে আস আপন ঘরের মুখ্যমন্ত্রী। এখন তাঁর বয়স—তিয়াত্তর।

তিয়াত্তর বছরের জীবনে কোনদিন কোন কাজেই নিজেকে অযোগ্য প্রমাণ করার সুযোগ দেননি কাটজু গেল ক'বছরের মধ্যপ্রদেশ বলে—একাজেও নয়। সুতরাং, এবার যদি সত্যিই পদত্যাগ করেন তিনি, তবে আর যার যাই হ'ক, মধ্যপ্রদেশ নামক প্রদেশটির বোধহয় সেটা মন্দভাগ্যই হবে। ২০.১০.৬১

কাদার, জানস

"আবশ্যক। হাঙ্গেরীর জন্যে অগৌণে একজন প্রধানমন্ত্রী আবশ্যক। যোগ্যতাবলী: (১) নিজস্ব কোন আদর্শ থাকা চলিবে না, (২) মেরুদণ্ড থাকা চলিবে না, (৩) লিখিতে বা পড়িতে না পারিলেও চলিবে বটে, কিন্তু অন্যের রচিত দলিল দস্তাবেজে সহি করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। ইত্যাদি। দরখাস্ত পাঠাইবার ঠিকানা মেসার্স বুলগানিন-ক্রুশ্চফ এণ্ড কো মস্কো।"

রহস্য নয়, সত্য ঘটনা। '৫৬

সনের নভেম্বরে নাগিকে বাতিল করে কাদার যখন বসলেন এসে প্রধানমন্ত্রীর আসনে তখন নাকি সত্যি সত্যিই বুদাপেস্টের দেওয়ালে দেওয়ালে দেখা গিয়েছিল—এই বিচিত্র পোস্টারখানা। বহ্নিমান সেই শহরে যদি কেউ জানতে চান—'কাদার ক্ষমতায় এলো কি করে?' সঙ্গে সঙ্গে নাকি উত্তর দেয় অন্যরা—'সোবিয়েত ট্যাঙ্কে চড়ে!'

হয়ত কার্য-কারণে সেই বিশেষ দিনে এইটেই ছিল ঘটনা, কিন্তু চিরকাল তা নয়। কেননা, তার ক'বছর আগেও ('৫১ সনে) যদি কেউ হাঙ্গেরী নেমে জানতে চাইতেন—'কাদার কোথায়' তা হলে কি উত্তর হত জানেন? 'তিনি জেলে আছেন।' কোন্ জেলে কেউ জানে না। কারণ, দেশের স্তালিনপন্থী শাসকেরা তখন ওঁকে নিত্য জেল-ফিরি করে বেড়াচ্ছেন। —অপরাধ? পাতক, ঘাতক কাদার টিটোপন্থী, কাদার গুপ্তচর··· ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই বলছিলাম —সোবিয়েত ট্যাঙ্ক অনেক পরের কথা, চিরকাল কাদার নিজ বলেই হাঙ্গেরীতে—মহাশয়।

জন্মেছিলেন—যুগোশ্লাভ সীমান্তে এক গরীব চাষীর ঘরে (১৯১২ সনে)। নাম ছিল তাঁর তখন 'কাদার' নয়,—সারমান্‌ক। 'কাদার'টা আসলে ছদ্মনাম,—অনেক পরে নেওয়া।

বাবার পয়সা ছিল না। সুতরাং পড়াশুনা করার সুযোগ পাননি। কিশোর এবং যৌবনের প্রথম দিককার দিনগুলো কেটেছে তাঁর নানাবিধ কাজে। কিছুদিন ছিলেন এক কারিগরের কাছে শিক্ষানবীশ, কিছুদিন—তালা-সারাইওয়ালা। এমন কি, কিছুদিন তিনি বুদাপেস্টে বাস-কণ্ডাক্টারের কাজও করেছেন!

পেশায় শ্রমিক ছিলেন। সুতরাং প্রথম মহাযুদ্ধ অন্তে দেখা গেল, বাস-কণ্ডাক্টার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনা করছেন। শোনা গেল,—তিনি গোপনে বে-আইনী কমিউনিস্ট যুব সংঘেও নাম লিখিয়েছেন।······ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাকোসি, গেরো সহ হাঙ্গেরীর পঞ্চ-বৃহৎ কমিউনিস্ট নায়কের পাঁচজনই যখন মস্কো থেকে দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন, কাদার তখন টিটোর মত মরিয়া হয়ে স্বদেশের মাটিতে নাৎসীদের সঙ্গে লড়াই করছেন! গেস্টাপোরা অবশ্য একবার ধরেও ফেলেছিল ওঁকে। কিন্তু রাখতে পারেনি। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন দুর্ধর্ষ কাদার। (এ খবরটা জানতেন

বলেই রাকোসি এত জেল বদল করাতেন!)

যুদ্ধের পর দেশে ফিরে এলেন দেশনায়কেরা। তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন অখ্যাত যোদ্ধা কাদার। সব শুনে একবাক্যে তাঁরা ওঁকে 'সাবাস' দিলেন। কাদার পার্টির অন্দরমহলে ছাড়পত্র পেলেন। তিনি পলিট ব্যুরোর মেম্বার হলেন,—তৎসহ সহকারী পুলিস প্রধান। ক্রমে আভ্যন্তরীণ বিভাগের মন্ত্রী, পার্টির ডেপুটি সেক্রেটারী, এবং পুলিস বিভাগের সর্বেসর্বা।

'৫১ সনে হঠাৎ দুর্বিপাক। কাদার কারারুদ্ধ হলেন। ছাড়া পেলেন—'৫৩ সনে। সেই থেকে শুরু হল তাঁর ক্রম উত্থান। সেই বিচিত্র কাহিনীতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য '৫৬ সনের সেই ঝড়ের দিনে 'সোবিয়েত ট্যাঙ্কে চড়ে' তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব।

দেশে শান্তি স্থাপিত হওয়ামাত্র সে আসন থেকে নেমে এসেছিলেন কাদার। অনেকেই ভেবেছিলেন অতঃপর তিনি নীচেই থাকবেন। কেননা শত্রুমুক্ত, অন্তর্বিরোধহীন পার্টির প্রধান হিসেবে তিনি নিশ্চয় জানেন যে, আসলে তিনি উপরেই আছেন। কিন্তু সংবাদঃ মুনিঘকে সরিয়ে আবার নিজেই প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসেছেন জানস কাদার! কেন, একমাত্র কাদারই তা জানেন। এমন কি, (পশ্চিমীদের মতে) সম্ভবত তাঁর ঘরের মানুষটিও না। কেননা, যদিও সবাই জানেন কাদার বিবাহিত, সাংবাদিকেরা খেদ করে বলেন,—'আজ অবধি মিসেস কাদারের একখানা ফটো পর্যন্ত আমরা দেখতে পেলাম না!' ২১.৯.৬১.

কানুনগো, নিত্যানন্দ

যদি আদি পরিচয় জানতে চান, তাহলে বলতে হয়—চাষী। বাবা গৃহস্থ ছিলেন। নিজেও। সম্ভবত বর্ণাশ্রম অনুযায়ীও তাই হওয়ার কথা।

যদি পেশাগত পরিচয় জানতে চান, তাহলে বলতে হয়—আইনবিদ। অবশ্য নামে মাত্র। র‍্যাভেনশ কলেজে ভাল ছাত্র ছিলেন। সুতরাং বি. এ পাশ করেই কলকাতায় চলে এলেন। এবং যথাসময়ে উকিল হয়ে ঘরে ফিরলেন।

ঘরে তখনই সংসার। বিয়ে করেছিলেন মাত্র বাইশ বছর বয়সে। সুতরাং স্ত্রী শৈলবালা ছাড়াও গৃহস্থের ঘরে তখন একাধিক নতুন মুখ। নিত্য নব নব দায়িত্ব।

কিন্তু আশ্চর্য এই, নিত্যানন্দকে তবুও ঘরে রাখা গেল না। গান্ধীর ডাকে চার ছেলে দুই মেয়ের বাপ পথে নামলেন।

সাংগঠনিক কাজ। মহাত্মার আঠার দফা কার্যক্রম। দিনরাত শ্রম।

সে পরিশ্রম আরও বেড়ে গেল '৩৭ সনে। কেননা, কংগ্রেস স্থির করেছে তারা ভেতর থেকে ভাঙবে, মন্ত্রিত্বও করবে। স্বভাবতই নিত্যানন্দেরও মন্ত্রী হতে হবে। কারণ, তাঁকে বাদ দিলে ওড়িষায় তখন মন্ত্রিসভা গড়া যায় বটে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ বস্তু হয়না।

পুরো নাম—নিত্যানন্দ কানুনগো। জন্ম—১৯০০ সন। প্রথম মন্ত্রীত্ব—১৯৩৭। নিত্যানন্দ সেই থেকে মন্ত্রী। হয় কটকে কিংবা দিল্লিতে।

ওড়িষায় প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছিল '৩৯ সনে। দ্বিতীয় পর্যায়—'৪৬ থেকে '৫২। মাঝে দু'বছর রাজধানীর বিবিধ কাজ। এবং তারপর '৫৪ সনে আবার সেই মন্ত্রিত্ব। এবার অবশ্য কেন্দ্রে।

ভূমি, রাজস্ব, কৃষি, শিল্প, পূর্ত—ইত্যাদি নানা সময়ে ওড়িষার নানা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীনিত্যানন্দ কাননগো। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলেন শিল্প এবং বাণিজ্য দপ্তরে সহকারী মন্ত্রী হিসেবে। এরপর অনেকবার ফোলিও বদল করে তিনি এখন ('৫৭ সনের এপ্রিল থেকে) ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রী। শুধু দপ্তর গৌরবে নয়, ক্রমবর্ধমান কৃতিত্বেও শ্রীকানুনগো এখন ভারতীয় মন্ত্রিসভার একজন বিশিষ্ট সদস্য।

এবার কানুনগো আরও খ্যাতিমান হলেন। সংবাদ : জাতিসংঘের এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন তাঁকে সভাপতি নির্বাচন করেছেন।

আন্তর্জাতিক সভায় নিত্যানন্দ নতুন নন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকায় নানা সভায় নানা সময়ে তিনি স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এবার ক্ষেত্রটা আরও বাড়ল মাত্র। এবং সেই সঙ্গে সমস্যার পরিমাণও। কিন্তু যাঁরা ওঁকে জানেন তারা বলেন—নিত্যানন্দ যে শুধু সমস্যাই ভালবাসেন তাই নয়, ওড়িষার সন্তান হিসেবে সমুদ্রেও সাঁতরাতে জানেন!

তাছাড়া, আরও একটি পরিচয় আছে তাঁর। ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্যা হলেও নিত্যানন্দ একজন কলারসিক। তিনি যে শুধু সেকালে ওয়ার্ধার লোক-নৃত্য পরিষদের কর্তা ছিলেন

তাই নয়, এখনও তিনি সঙ্গীত নাটক একাদেমীর কার্যকরী পরিষদের একজন সক্রিয় সদস্য। ২৩.৩.৬১.

কাইরণ, সর্দার প্রতাপ সিং

লোহার-মানুষও ভাঙ্গে। এবং সর্দার প্রতাপ সিং কাইরনও পদত্যাগ করেন!

মনে হয়েছিল সেটা কোনদিন হবার নয়। কেননা, পঞ্চনদীর তীরে এই একটি মানুষকে ঘিরে 'বিদ্রোহ' যেমন গতকালের ব্যাপার নয়, তেমনি আক্রমণকারীদের ব্যূহে 'মেমোরিয়ালিস্ট' তথা আর্জিকারীরাই একক ছিলেন না। আপনদল, বিরোধীদল, রাজ্যপাল, স্পীকার, সেক্রেটারিয়েট, গৃহস্থঘর মিলে কার্যত সে এক দুর্দ্ধর্ষ চতুরঙ্গ-বাহিনী। কিন্তু তাহলেও আঘাত বার বার প্রত্যাঘাত হয়েই ফিরে এসেছে—কাইরন নামধেয় সেই দুর্ভেদ্য দুর্গটিতে ক্ষণেকের জন্যেও কোন চিড়ের লক্ষণ দেখা যায়নি, যন্তর মন্তরের মন্ত্রণা, কামরাজি-দাওয়াই কিছুই তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। কাইরন তবুও কাইরন—তেমনই 'ইনডেষ্ট্রাক্টেবল', তেমনই বেপরোয়া।

অবশেষে দাশ-কমিশন সে অসাধ্য সম্ভব করলেন। তাঁর রিপোর্ট হাতে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে চণ্ডীগড়ের সেই "লৌহ স্তম্ভ" ধুলায় লুটিয়ে পড়েছেন; কাইরন পদত্যাগ করেছেন।

লোহার-মানুষও ভাঙ্গে। কেননা, বলা বাহুল্য, কখনও কখনও লোহায়ও খাদ থাকে!

খাদের কথাটা পরে, আগে লোহার পরিমাণটাই শোনা যাক।

জন্ম—১৯০১ সনে। জন্মস্থান অমৃতসরের কাইরন নামেই নাম যার এমন একটি গাঁ। লেখাপড়া—অমৃতসরের খালসা কলেজে এবং পরবর্তীকালে সুদূর আমেরিকায়।

পাঞ্জাবের সন্তান কাইরণ আমেরিকায় এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। রুজি-রোজগারের ফাঁকে ফাঁকে তাই পড়াশুনাতেও কামাই ছিল না। অমৃতসরের গ্র্যাজুয়েট তখন এ বেলা ফোর্ডের মোটর কারখানায় কাজ করেন, ওবেলা মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিদ্যা পড়েন। শুধু পড়ায় মন ভরে না। চঞ্চল তরুণ তৎসহ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতেও দীক্ষা নিলেন। তৎকালে আমেরিকায় প্রবাসী বিখ্যাত গদর-পার্টিতে তিনি একজন সক্রিয় এবং বিশিষ্ট কর্মী হলেন।

কাইরণ, সর্দার প্রতাপ সিং

ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দেয় চণ্ডীগড়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাইরন বিফলমন্ত্রী এমন অপবাদ তাঁর শত্রুরাও দেন না। বিভক্ত পাঞ্জাবকে শুধু স্থিতি এবং সংহতি নয়, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সাম্প্রদায়িক শান্তি এবং আরও কিছু কিছু আকাঙ্ক্ষিত জিনিষ তিনি দিয়েছেন। অকালীদল তাঁরই বিরাম-হীন আক্রমণে আজ বহুলাংশে অবশ, —পাঞ্জাবী-সুবা আন্দোলনও তাঁর কৌশলেই প্রায়-জব্দ। তাছাড়া চীনা আক্রমণের মুখে তাঁর নেতৃত্বে পাঞ্জাব যেভাবে সাড়া দিয়েছিল সেটাও স্মরণীয়। চোখের নিমেষে ৩ মণ ২৪ সের সোনা নিয়ে দিল্লি হাজির হয়েছিলেন কাইরন। তদুপরি এক মাসের মধ্যেই ৫ কোটি ৬৭ হাজার টাকার প্রতিরক্ষা তহবিল, ১০ লক্ষ টাকার কম্বল, ১ লক্ষ টাকার শীতবস্ত্র, ২০ লক্ষ নতুন জওয়ান দানের প্রতিশ্রুতি, এবং আরও কত কি! কাইরন বরাবরের মত সেদিনও অবিশ্বাস্য। তিনি চোখের নিমেষে পাঞ্জাবের ১৩৪০০ পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটিতে দেশরক্ষী দল গড়ে ফেলছেন, নির্দয় হাতে একত্রিশ পুতুলের মন্ত্রিসভাকে ছেঁটে 'নব-রত্নে' আদিতে এ লোহা, বলা নিষ্প্রয়োজন, অতএব, নকল ছিল না।

বিদেশ থেকে এম. এ পাশ করে ঘরে ফিরেছিলেন কাইরন। কিন্তু রাজনীতি ছাড়া অন্যকিছু করার চিন্তা একবারও তাঁর মনে উদিত হয়নি। ১৯২৯ সন থেকে তিনি কংগ্রেসে আছেন। আইসভায় আছেন—'৩৬ সন থেকে। মন্ত্রিসভায় '৪৭ সন থেকে। এবং মুখ্যমন্ত্রীর আসনে আছেন ১৯৫৬ সনের জানুয়ারী থেকে। কংগ্রেসেও তিনি পাঞ্জাবের অন্যতম পুরানো নাম। ১৯৩৯ থেকে '৪৬ সন পর্যন্ত এক-নাগাড়ে সাত বছর রাজ্য কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন; ৫০ থেকে '৫৯ সন পর্যন্ত টানা ন'বছর ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি। তদুপরি ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম পুরানো সদস্য, পাঞ্জাবের বিখ্যাত কিষণনায়ক কাইরন বহুবার জেল খেটেছেন, বহু বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়াই করে রাজ্যে কংগ্রেসের ইজ্জত রক্ষা করেছেন। সুতরাং, সুদূর আমেরিকায় কোন এক মোটর কারখানা থেকে কেবলমাত্র ভাগ্যবলে তিনি পাঞ্জাবের ভাগ্যবিধাতায় পরিণত হয়েছিলেন এমন অপবাদও বোধ হয় দেওয়া চলে না।—লোহায় তখনও জং ধরেনি।

পরিণত করছেন। তার ওপর তাঁর আরও নানা অভিনব পরিকল্পনা!

তবুও এ কাজের মানুষটিকে যে শেষ পর্যন্ত সিংহাসন ছেড়ে নেমে আসতে হল, তার কারণ তাঁর হাতে সম্পাদিত অকাজের তালিকাটিও রীতিমত দীর্ঘ। অভিযোগ ছিল অবশ্য মাত্র বত্রিশ দফা, কিন্তু সেগুলোই শেষ বক্তব্য নয়। কাইরনের পাঞ্জাবে আইন নেই, মুখ্যমন্ত্রী যেন দ্বিতীয় রণজিৎ সিং —তাঁর ইচ্ছাই সব। যাঁরা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে—সমস্ত রীতিনিয়ম ভঙ্গ করে তিনি যেমন তাঁদের বিনাশে মত্ত হন, তেমনি যাঁরা তাঁর অনুগৃহীত তাঁদের কাছে তিনি কল্পতরু সাজেন। আপন আত্মীয়-পরিজন থেকে সুরু করে এ মহলে কাইরন যেন এক উদার সম্রাট। বলাবাহুল্য, গণতন্ত্রে এ জাতীয় দাক্ষিণ্য এখনও ঠিক প্রকাশ্যে 'চল নয়।

তবুও বছরের পর বছর ধরে এ ব্যাপার দিল্লির অদূরে চলেছিল। কারণ সম্ভবত আমরা ভুলে গিয়েছিলাম লোহায়ও জং ধরতে পারে—'পাওয়ার করাপ্টস, অ্যাণ্ড অ্যাবসলিউট পাওয়ার ··।'

১৮. ৬. ৬৪

কামরাজ, কুমারস্বামী

আবার সেই প্রবাদ-প্রায় বাক্য: পাক্কালাম!—আচ্ছা দেখা যাবে। প্রতি দু'মিনিট অন্তর একজন করে দর্শনার্থী। প্রত্যেকের হৃদয় ভারাক্রান্ত, প্রত্যেকেই উত্তেজিত। তাঁরা কংগ্রেস সভাপতিকে আপন অভিমত জানাতে এসেছেন। কেউ বলে গেলেন ইংরেজীতে, কেউ হিন্দিতে, কেউ দক্ষিণ ভারতীয় ভাষার কোন একটিতে। সঙ্গে কোন দোভাষী নেই, হাতে কোন খাতা পেন্সিল নেই। কামরাজ কান পাতছেন, পরক্ষণেই বিদায় জানাচ্ছেন,—পাক্কালাম!—আচ্ছা, দেখা যাবে। ঘরে ততক্ষণে আবার নতুন আগন্তুক। এসেই তিনি বললেন—আমি অন্ততপক্ষে পনের মিনিট সময় চাই! এবারও সেই এক উত্তর—পাকালাম!—আচ্ছা দেখা যাবে! নব্বুই সেকেণ্ড পরেই দেখা গেল পনের মিনিটের দাবিদার বেরিয়ে আসছেন। কেননা '—বলার আর কিছুই ছিল না!'

হাতে সময় ছিল সাকুল্যে ছত্রিশ ঘণ্টা। কিন্তু তাও লাগল না। তারই মধ্যে প্রায় আড়াইশ' কংগ্রেস এম-পি, রাজ্যসমূহের মুখ্যমন্ত্রীগণ এবং শ্রবণ-

যোগ্য সকলের মতামত শোনার কাজ সমাপ্ত। সভাপতি শুধু যে আপন ঘরে বসেই হাওয়ার গতি নিরূপণ করেছেন তাই নয়,—স্থানবিশেষে নিজেও ঘর ছেড়ে, বাইরে ছুটেছেন—কেউ যেন না ভাবেন তাঁকে অবহেলা করা হল। ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই—৩০শে ওয়ার্কিং কমিটির মুখ' থেকে দায়িত্ব গ্রহণ, ৩১শে যাচাই,—১লা রায়। মোরারজী উৎকণ্ঠিত ভারতকে জানালেন—বেশী কথা বলেন না উনি, শুধু বললেন—লালবাহাদুর শাস্ত্রী!

ভারত ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এ এক স্মরণীয় ঘটনা। সাতদিনও লাগল না; বিশ্বের উৎকণ্ঠা শেষ, জাতির শঙ্কা, দুশ্চিন্তা, উধাও—জওহরলালের প্রত্যাশা পূর্ণ, ভারত তার উত্তরাধিকারী বেছে নিল। আনায়াস ভঙ্গীতে, অতি স্বচ্ছন্দে এ দুরূহ কর্তব্য যে সম্পাদিত হল তার কারণ সেই রহস্যময় পুরুষ, নাম যাঁর—কামরাজ।

চিরকাল সেই এক কথা—পাক্কালাম!—আচ্ছা, দেখা যাবে! বৈঠকখানার দরজা খোলাই থাকত। লোকেরা আসত। আগে থেকে বলে কয়ে আসার প্রয়োজন নেই। কেননা, সেক্রেটারী আর্দালীর ঝামেলা নেই। লোকেরা আসছে, নিজেদের দুঃখের কথা পেশ করছে। দীর্ঘকায় মানুষটি একমনে তাদের কথা শুনছেন। বক্তব্য শেষে পিঠে হাত রেখে বলছেন, পাক্কালাম!—আচ্ছা, দেখা যাবে!

ছোট্ট একটি শব্দ। কিন্তু এই তামিল বাক্যটি যদি শুধু কথার কথা হত তা হলে মাদ্রাজের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী কামরাজ বোধ হয় আজ সমগ্র ভারতের চোখের সামনে এভাবে অবলীলাক্রমে গৌরবের চূড়ান্ত শিখরে পৌছাতে পারতেন না। বৈঠকখানার দরবার সাঙ্গ হওয়া মাত্র দেখা যেত ঘাড়ে খাদির 'অঙ্গবস্ত্রম'টি ফেলে চপ্পল পায়ে মুখ্যমন্ত্রী সেক্রেটারিয়েটের দিকে ছুটছেন। সেখানে পৌছেই তাঁর প্রথম কাজ সকালে শোনা অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখা। দরকার হয় মধ্যরাত্রি অবধি কাজ করবেন তিনি, কিন্তু পরের দিনের জন্যে কিছুই তবু ফেলে রাখা চলবে না। মাদ্রাজের সেই মুখ্যমন্ত্রীই আজ কংগ্রেস সভাপতি!

সঙ্কল্পে দ্বিতীয় সর্দার প্যাটেল। অনেকটা চেহারায়ও। তবে গরমিলও কম নয়। দক্ষিণী নাডার ঘরের সন্তান কামরাজ জন্মে এবং শিক্ষায় মৃত্তিকার আরও কাছাকাছি। বাবা সাধারণ একজন গ্রাম্য ব্যবসায়ী ছিলেন।

মা এখনও বেঁচে আছেন,—এখনও তিনি সনাতন গ্রাম্যজননী। কামরাজ কৈশোর থেকেই ‘স্বদেশী’। সুতরাং চলতি অর্থে ‘লেখাপড়া’ বলতে যা তার সুযোগ জীবনে তাঁর আসেনি। চেহারায়ও সর্দারের সঙ্গে মিল তাঁর কম। কামরাজ আরও দীর্ঘদেহী আরও বিশালকায়। বয়স বাষট্টিতে পড়েছে। কিন্তু এখনও চোখে তাঁর তরুণের চাঞ্চল্য,—উজ্জ্বল মুখে প্রাণখোলা হাসিতে গ্রামীণ উদ্দামতা। কামরাজ তবুও দক্ষিণে দ্বিতীয় সর্দার প্যাটেল ছিলেন। কেননা, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, রামস্বামী আয়েঙ্গার, সত্যমূর্তি, রাজাজী —মাদ্রাজের এই সব স্বনামধন্য নামের মধ্যে লৌহদৃঢ় ব্যক্তিত্বে তিনিই ছিলেন যথার্থ ‘সর্দার’। তাঁর বিচক্ষণতায় তৎকালের মাদ্রাজ যেমন দলাদলি মুক্ত, তেমনি তাঁর নায়কত্বই ছিল সেদিন কংগ্রেসের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান ঐশ্বর্য। সম্ভবত কামরাজই একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী যিনি আপন রাজ্যের প্রতিটি তালুক, প্রত্যেকটি গ্রাম নিজের চোখে দেখেছেন। মাটির সঙ্গে এই যোগের ফলেই কামরাজ সেদিন ‘সর্দার’।

‘সর্দার’ অতঃপর তিনি ভূ-ভারতেও। গত বছর আগস্টে হঠাৎ যখন ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে তাঁর আবির্ভাব ঘটে—তখন হয়ত অনেকের মনে সংশয় ছিল। ভুবনেশ্বরের কংগ্রেস সভাপতি কামরাজও হয়ত সে সংশয় সম্পূর্ণ দূর করতে পারেন নি। কিন্তু নেহরু-পর ভারতের জীবনে আজ তিনি আপন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর দুলভ অধিনায়কত্ব ছিল বলেই যে একটি দুরূহ জাতীয় সমস্যার সহজ মীমাংসা সম্ভব হল শুধু তাই নয়,—যন্তর-মন্তর রোডের সেই বাড়িটি তাঁরই দৃঢ়তায় আবার যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হল। এ কৃতিত্ব অবশ্যই ঐতিহাসিক।

৪.৬.৬৪.

কাম্পমান, ওলফার্ট ভিগো

তিন বছর আগেও ভদ্রলোক প্রতি সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরতেন। স্ত্রী ইভা অপেক্ষা করে থাকতেন। ডোরিট, উলা, ইডা—মেয়ে তিনটি অপেক্ষা করত। তিনি আসতেন, বিশ্রাম করতেন, তারপর সাতাশ ভল্যুমের সেই বইটা থেকে একটা টেনে নিতেন। তিনি পড়তেন, ওঁরা সবাই শুনতেন।

বইটা ছিল জুলে রোমানিস-এর লেখা। নাম ‘হোমেসডে বন ভলান্তে’। মানে—‘দি মেন অব গুডউইল’। দিনের পর দিন বাড়ীর কর্তা উচ্চৈস্বরে

সে বই পড়েন, গোটা সংসার গালে হাত দিয়ে তা-ই শোনে। ওঁরা তখন সত্যিই সুখী গৃহস্থ। স্ত্রী কাজ করেন একটা বিজ্ঞাপনের কোম্পানিতে। সেখানে তিনি কপি লেখেন। স্বামী কাজ করেন সরকারী আপিসে।

—আর আজ?

মাত্র দু' দিন আগে ওঁরা কলকাতা ঘুরে গেলেন। কিন্তু কেউ কি ঘুণাক্ষরেও সেকথা ভাবতে পেরেছিলেন? ভাবতে পেরেছিলেন যে বাহান্ন বছরের এই প্রবীণ মানুষটি রাজনীতিতে নেমেছেন মাত্র তিপান্ন সনে এবং তাঁর ঐ সদাহাস্যোজ্জ্বল গৃহিণীটি কাজ ছেড়েছেন মাত্র গেল বছর! ভাবা যায় না। কারণ, ভারতে এবং কলকাতায় পরিচয় ছিল ওঁদের —ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী ও তস্য পত্নী।

নাম ওলফার্ট ভিগো কাম্পমান (Olfert Viggo Kampmann)। বাবা ছিলেন সৈনিক। পুত্র বরাবরই অর্থনীতিবিদ।

বি.এ পাস করার আগেই সরকারী পরিসংখ্যান বিভাগে কাজ নিয়েছিলেন কাম্পমান। '৩৫ সনে পরীক্ষার ফল বের হওয়া মাত্র চলে গেলেন একটা ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে। সেখানেই কেটেছে তাঁর কর্মজীবনের দীর্ঘতম অংশ,—একটানা এগার বছর।

তারপর '৪৭ সন থেকে '৫৩ সন পর্যন্ত কেটেছে তাঁর অর্থ সংক্রান্ত নানা সরকারী কাজে। কখনও দেশের ট্যাক্স কমিশনে, কখনও অর্থদপ্তরে, কখনও বা রাজকীয় ব্যাঙ্কের ডিরেক্টারের পদে। '৫০ সনে একবার দেশের অর্থমন্ত্রীও নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সে মাত্র দিন কয়েকের জন্যে।

'৫৩ সনে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা ধরে পড়ল। কারণ রাজকর্মচারী হলেও অর্থ বিষয়ে দেশে কাম্পমানের অসাধারণ খ্যাতি। কাম্পমান রাজী হলেন। ফলে—নির্বাচনে নামতে হল। সেই প্রথম রাজনীতি।

নির্বাচনে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা জিতলেন। বিজয়ী হলেন কাম্পমানও। ওঁরা তাঁকেই অর্থমন্ত্রী করলেন। অ্যাটমিক এনার্জি, ন্যাশনাল পেনসান অ্যাক্ট, ইত্যাদি কয়টি চমৎকারী বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে তিনি জনচিত্তেও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। তারপর থেকে ডেনমার্কের রাজনীতিতে কাম্পমান আজও অকম্পিত ব্যক্তিত্ব। একাধিক প্রধানমন্ত্রীর অধীনে তিনি অর্থমন্ত্রীর কাজ করেছেন, একবার

অস্থায়ীভাবে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাজ চালিয়েছেন এবং বার-দুই প্রধানমন্ত্রীর কাজও।

'৫৯ সনে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট নেতা হানসেন-এর মৃত্যু হল। সঙ্গে সঙ্গে কাম্পমান-এর ওপর অনিবার্য-ভাবেই ন্যস্ত হল দলের দায়িত্ব। আপাত-অনভিজ্ঞ হলেও সে দায়িত্ব তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করলেন। ইউরোপের পর্যবেক্ষকরা সেদিন মন্তব্য করেছিলেন—'অবশেষে ডেনমার্কের রাজনীতিতে সত্যিই একজন লেখাপড়া জানা লোকের আবির্ভাব ঘটল।'

অনেকে ভেবেছিলেন শ্রমিকের সঙ্গে সংশ্রবহীন এই মানুষটিকে হয়ত ডেনমার্ক বরদাস্ত করবে না। কিন্তু '৬০ সনের ফেব্রুয়ারীতে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেই নভেম্বরে আবার নির্বাচনে পরীক্ষা দিতে রাজী হয়ে গেলেন কাম্পমান। ফল বের হলে দেখা গেল—তিনিই বিজয়ী। কাম্পমানই সকলের পছন্দের প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী কাম্পমান সস্ত্রীক ভারত পরিদর্শন করে গেলেন। তার ফলে দুই দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতাই শুধু বৃদ্ধি পাবে না, সম্ভবত উভয় দেশে আনাগোণাটাও এবার থেকে আরও বাড়বে। কারণ, কাম্পমান শুধু অর্থ-নীতিবিদ নন, তিনি দেশের ট্যুরিস্ট অ্যাসোসিয়েশনেরও সভাপতি।

১. ২. ৬২

কার্দেলি, এডওয়ার্ড

'অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় যে যুদ্ধ সমাজবাদী প্রগতির সহায়ক ত নয়ই, পরন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই তার ফলে লাভবান হয়।...সুতরাং একমাত্র আক্রমণের আত্মরক্ষা প্রয়াসী যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধকেই ন্যায়-যুদ্ধ বলা যায় না।...'প্রায় আড়াই'শ পাতা জুড়ে 'যুদ্ধ ও সমাজতন্ত্রের' চুল-চেরা বিচারের পর যে মানুষটি এই সিদ্ধান্ত টেনে মাওকে আজ চীনেমাটির বাঘের মত ভেঙ্গে খান খান করে দিয়ে সহাবস্থানের নীতিকে আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন ইউরোপে চীনের সেই 'এক নম্বর শত্রু' যুগোশ্লাভিয়ার ভাইস-প্রেসিডেন্ট এডোয়ার্ড কার্দেলি আমাদের অতিথি হিসেবে এখন সস্ত্রীক নয়া-দিল্লিতে আছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, চীন জঙ্গীবাদের নগ্নতম অধ্যায়ে প্রেসিডেন্ট টিটোর রুশ সফরের মতই ভাইস-প্রেসিডেন্ট কার্দেলির এই ভারত সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ,

কার্দেলিই চীনা জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়ার প্রধান মুখপাত্র, মাও-লি শাউ-চি'র আসল প্রতিপক্ষ।

শুধু হালের চীন-বিরোধী তাত্ত্বিক লড়াইয়ে নয় বাহান্ন বছরের প্রবীণ সংগ্রামী কার্দেলি তাঁর তরুণ বয়স থেকেই যুগোশ্লাভিয়ার অন্যতম নায়ক, মার্শাল টিটোর প্রধান সহচর।

জন্মেছিলেন শ্লোভানিয়ার এক অখ্যাত শহরে, জনৈক রেলকর্মীর ঘরে। লেখাপড়া শিখেছিলেন—ভবিষ্যতে শিক্ষক হবেন এই বাসনায়। '২৮ সনে মাত্র আঠার বছর বয়সে রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে তাঁর যোগ্যতাও অর্জন করেছিলেন কার্দেলি, কিন্তু শিক্ষকতা করতে পারেননি কোনদিন। বেকারের তালিকায় নাম লিখিয়ে দু'বছর বসে থাকার পর কাজ পাওয়ার সময় যখন এল তখন দেখা গেল কার্দেলি তাঁর যোগ্যতা খুইয়ে বসে আছেন, তিনি কম্যুনিস্ট হয়ে গেছেন। সুতরাং নিয়োগ পত্রের বদলে এল পুলিশের লোক। ওরা তাঁকে ধরে নিয়ে গেল।

'৩৪ সনে ছাড়া পাওয়া মাত্র কার্দেলি পালিয়ে গেলেন চেকোশ্লোভাকিয়ায়। তারপর সেখান থেকে গোটা ইউরোপ ঘুরে গলিপথে রাশিয়া,—মস্কো। কার্দেলি সেদিন রাশিয়া এবং ইউরোপে এক দুর্ধর্ষ কর্মী এবং মার্কসবাদের পক্ষে অন্যতম শক্তিমান লেখক। (বইঃ যুদ্ধ ও সমাজতন্ত্র, ডেভালপমেণ্ট অব দি শ্লোভানিয়ান ন্যাশনাল প্রোব্লেম, দি রোড টু নিউ যুগোশ্লাভিয়া, ইত্যাদি।) 'স্পিরেনস' নামের আড়ালে বসে এক চেকোশ্লোভাকিয়াতেই তিনি নাকি ইস্তাহার লিখেছেন প্রায় সাত হাজার!

এ খবরগুলো পিকিং-এর অজানা থাকতে পারে কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এবং তার আগে পরে কার্দেলি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা যে কোন কম্যুনিস্টের গর্ব হওয়ার মত। কার্দেলি আজও খুঁড়িয়ে হাঁটেন। কারণ যুদ্ধপূর্ব পাঁচ বছরের কারাজীবনে রাজকীয় পুলিশ পায়ের গোড়ালি দুটো ভেঙ্গে দিয়েছিল তাঁর। যুদ্ধের সময় সেই ভাঙ্গা পা নিয়েই কার্দেলি তবুও গেরিলা নায়ক-টিটোর প্রধান সহচর। ইউরোপের সাম্যবাদীরা সেদিন টিটোর মত তাঁর প্রশংশায়ও মুখর। মনে রাখতে হবে, কার্দেলি সেই স্বল্প সংখ্যক বিদেশী কমরেডের অন্যতম যিনি মস্কো থেকে সেদিন 'অর্ডার অব লেনিন' পেয়েছিলেন। তাছাড়া পোল্যাণ্ড

এবং আলবেনিয়া থেকে আরও বহুতর খেতাব।

তবুও '৪৮ সনে তাঁকেই দেখা গিয়েছিল রাশিয়া এবং কমিনটার্নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। ঘটনাটা সেদিন অনেকের কাছে বিস্ময়কর ঠেকেছিল, কারণ যাকে বলে 'মস্কোব্রীড' কার্দেলি পুরোপুরি তাই। তাছাড়া, তার মাত্র এক বছর আগে ওয়ারশ'তে তিনিই মার্শাল প্ল্যানের 'চক্রান্তের' বিরুদ্ধে সোবিয়েত প্রস্তুতিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। বেলগ্রেড তখন কমিনটার্নের প্রধান কার্যালয়। এবং কার্দেলি তখন আদি যুগোশ্লাভ সরকারের ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ থেকে লালফৌজ সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত নয়া সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী। তবুও সেদিন তিনি তাঁর দেশকে নিয়ে স্তালিনের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াতে দ্বিধা করেননি, কারণ মাস্কোর মতলব তাঁর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তিনি দেখছিলেন—তথাকথিত সহায্যের বিনিময়ে দেশের আসল প্রভুত্ব চলে যাচ্ছে অন্য হাতে। হক না সে হাত সাম্যবাদী, কার্দেলি নির্দ্বিধায় তা চেপে ধরলেন; আগে তিনি দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী, তারপর কম্যুনিস্ট কিংবা অন্য কিছু। ২০.১২.৬২

কারিয়াপ্পা, কে. এম.

'—প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত নিজেদের বেদখলী জমিটাকে দখল করা!'

একটি মাত্র কথা। কিন্তু মুখ থেকে বের হওয়া মাত্র চতুর্দিকে হট্টগোল। কেননা, সাবধানীরা ভেবে দেখেছেন তার পরেও অনেক কথা আসে!

অবশ্যই সত্য এবং সঙ্গত ভাবনা। কিন্তু ভেবে দেখা হল না এ কথার পরে যেমন অনেক কথা আসে তেমনি আগেও অনেক কথা থেকে যায়। এবং সে গুলো সবই অভিজ্ঞতার কথা। কিছু ব্যক্তিগত, কিছু ইতিহাসের।

মন্টি-আইক-জুকভ, এলেনব্রুক-ইসমে-ওয়াভেল,—এক দুই কথায় ইতিহাস নড়চড় করার নজীর বাদই দিচ্ছি। শুধু মানুষটির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলছি।

নাম—কোডেন্দ্র মাডাপ্পা কারিয়াপ্পা। দেখতে যেমন অনেকটা আইসেনহাওয়ারের মত, কথাবার্তায়ও আইক-এর সঙ্গে অদ্ভুত মিল তাঁর। স্বদেশেও যদি কেউ ভারতের ভূতপূর্ব প্রধান সেনাপতিকে জিজ্ঞেস করেন—'আপনার বাড়ী কোথায়?' মুখে

বালকের মত সেই হাসিটি বজায় রেখেই তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন—'ভারত!' তারচেয়ে ছোট কোন এলাকা কখনই নয়।

জন্ম—১৯০০ সনে। সেনাবাহিনীর সঙ্গে পরিচয়—উনিশ বছর বয়সে। সে পরিচয় '৫৩ সন অবধি একটানা।

অফিসার হিসাবেই যোগ দিয়ে ছিলেন। সুতরাং, তখনই পদোন্নতির প্রশ্ন ওঠে না। তরুণ সৈনিকের মনে প্রশ্ন যেটা ছিল সে—যুদ্ধ কোনদিন দেখতে পাব, অথবা পাব না! প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং সৈন্যদের মনেও আপাতত নতুন লড়াইয়ের কোন ভাবনা নেই।

কিন্তু কারিয়াপ্পাকে তাই ভাবতে হল। পরের বছরই আরব বিদ্রোহ! ইংরেজের হয়ে কারিয়াপ্পাকে ছুটতে হল—ইরাকে।

ইরাকেই হাতেখড়ি। তারপর প্রায় পঁচিশ বছর ছোটখাট অনেক ইরাক নিয়ে দুর্ধর্ষ সৈনিকের সংসার। কারিয়াপ্পা তখন সতত বিদ্রোহী উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সাম্রাজ্যের রক্ষক।

তারপর এল দিক্‌চক্রবাল আচ্ছন্ন করে একদিন মহাযুদ্ধ। সীমান্ত প্রহরীকে ঘাঁটি ছেড়ে বের হতে হল। একবার সেই ইরাক, মেসোপোটামিয়া, সিরিয়া, ওয়াজিরিস্তান, আর একবার ব্রহ্মদেশ,—পূর্বরণাঙ্গন।

পূর্ব পশ্চিম দুই মাঠেই যে বিস্তর লড়েছেন কারিয়াপ্পা নামক সৈনিক সে খবর জানা গেল ইম্পিরিয়াল ডিফেন্স কলেজে বিদেশী নামের তালিকাটি দেখে। '৪৬ সনে ওখানে স্বাগত জানান হল এই ভারতীয় সৈনিককে। পরের বছর ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের কর্তৃত্ব সহ তাঁকে নিযুক্ত করা হল ভারতীয় স্থল বাহিনীর অধ্যক্ষ। তার পরের বছরটাও কাটল ওয়েস্টার্ণ কমাণ্ডের প্রধান হিসেবে। কিন্তু '৪৮ সন সার্ভিস বুক ঘোষণা করল সেই চরমতম সম্মান, সি-ইন-সি। আটচল্লিশ বছরের প্রবীণ যোদ্ধা মনোনীত হলেন ভারতের প্রধান সেনাপতি।

'৫৩ সন অবধি প্রভূত কৃতিত্ব এবং জনপ্রিয়তা সহ এই পদ থেকে যখন অবসর গ্রহন করলেন জেনারেল কারিয়াপ্পা তখন আনিবার্য ভাবেই এই অভিজ্ঞ এবং সমর্থ মানুষটিকে স্থায়ী-ভাবে অবসর প্রদানের কথা ভাবা গেল না। জেনারেল কারিয়াপ্পাকে সে বছরই নিযুক্ত করা হল অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতের রাষ্ট্র প্রতিনিধি। সে পদে তাঁর কৃতিত্ব কতদূর পেঁ ছেছিল তা অনুমান করা যায়

কাসাভুবু, জোসেফ

সেই সংবাদ অথবা গুজবটি থেকেই। শোনা যাচ্ছে: অস্ট্রেলিয়ানদের ইচ্ছে কারিয়াপ্পা তাঁদের গভর্নর জেনারেল হন।

শেষ পর্যন্ত কি হবেন জানিনা, কিন্তু ইতিমধ্যেই ভারতের এই জেনারেলটি যে কর্মে ও কথায় অন্তত কিছু মানুষের হৃদয়ে যে এর চেয়েও সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন তা জানি।

কেননা, চৌরঙ্গীর সেই লোহার রেলিংটিতে নিজের চোখে দেখেছি কারিয়াপ্পার ছবি ঝুলানো একখানা। সেই বিচিত্র দেওয়ালপঞ্জীর ভীড়ে তৎকালে সেটিই একমাত্র ভারতীয় জেনারেলের ছবি। ২৩. ৩. ৬১

কাসাভুবু, জোসেফ

পশ্চিমী ভদ্রতা।

পুরানো পৈতৃক রাজত্বটা প্রজাদের হাতে তুলে দেওয়ার আগে তরুণ বেলজিয়ানরাজ বেড়াতে এসেছেন লিওপোল্ডভিল-এ। রাজা-প্রজার মিলিত দরবারের আয়োজন হল রাজধানীতে। সভা বসল। রাজা এলেন। বেলজিয়ান পারিষদেরা জয়ধ্বনি দিলেন—'ভাইভ লী রয়!' অর্থাৎ—রাজাবাহাদুর দীর্ঘজীবী হউন!'

—'ভাইভ, কাসাভুবু!' সমস্বরে প্রতিধ্বনি পাঠাল প্রজাবর্গ। অপমানিত এবং বিরক্ত বেলজিয়ানরাজ জানতে চাইলেন—কে এই কাসাভুবু? উপদেষ্টারা কানে কানে বললেন—কঙ্গোর ভবিষ্যতের রাজা—ফিউচার পি. এম!

বেলাজিয়ামের আশা ছিল—কাসাভুবুই কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী হবেন। হলে তাঁদের কিঞ্চিৎ বাঁচোয়া। কেননা লোকটা আগুনে বটে, কিন্তু যারপর-নাই লিবারেল। অর্থাৎ তিনি তাঁর অংশটুকু পেলেই খুশী। কাসাভুবু দেড়শ' উপজাতির অন্যতম বাকোঙ্গাদের নায়ক। ওদের বাস প্রধানত কঙ্গোর দক্ষিণ-পশ্চিমে। সুতরাং, কাসাভুবুর যত চিন্তা নিম্ন-কঙ্গো নিয়ে। কাতাঙ্গা নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র ভাবনা নেই। ভাবনা নেই ব্যাঙ্কটা বা খনিটা কে চালাল তা নিয়েও। সুতরাং বেলজিয়াম বলল—কাসাভুবুই কঙ্গোর ভবিষ্যত প্রধনামন্ত্রী!

কিন্তু ৩০শে জুন দেখা গেল নবজাত কঙ্গোর সভাপতির আসনে বসে আছেন কাসাভুবু। প্রধানমন্ত্রীর আসনে—অন্য মানুষ;—লুমুম্বা! মুখ দেখে বোঝা গেল কাসাভুবু মনক্ষুণ্ণ। অন্যমনস্কও যেন। বেল-

জিয়ান পারিষদ বললেন—হাতুড়িটা এনেছেন ত স্যর ?

হ্যাঁ !—গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন কাসাভুবু।

ক'টা মাসও একসঙ্গে কাটান গেলনা। পেছন থেকে কঙ্গোর অস্থির মাথায় হাতুড়ি হেনেছেন জোসেফ কাসাভুবু। তিনি লুমুম্বাকে বাতিল করে দিয়েছেন। লুমুম্বা বলছেন—বাতিল হয়ে গিয়েছেন কাসাভুবু নিজেই।

তর্কটা মুহূর্তে মীমাংসা করার মত নয়। কেননা, জোসেফ কাসাভুবুর তেতাল্লিশ বছরের জীবনটা বরাবরই বাঁধাধরা মীমাংসার বাইরে। বাবা মিশনারীদের স্কুলে পাঠিয়েছিলেন ছেলেকে যাজক বানাতে। পাঁচ বছরে সেখান থেকে পুরো 'সাহেব' বনে বেরিয়ে এলেন কাসাভুবু। একটা কাঠ-গোলায় কেরানীর কাজ নিলেন। কিছুদিন পর পদোন্নতি হল। কাসাভুবু সরকারী কেরানী হলেন। তারপর ক্রমে কলোনিয়াল অফিসে অফিসার।

ইতিমধ্যে লিওপোল্ডভিল-এ বো-কাঙ্গোরা জমাট বেঁধে উঠেছে। আবাকো পার্টি মনের মত নায়ক খুঁজছে। কাসাভুবু ইসারাটা বুঝলেন। চাকরী ইস্তাফা দিয়ে তিনি পলিটিসিয়ান হলেন। তাঁর দাবি স্বাধীন হলে নিম্ন-কঙ্গো আলাদা ঘর করবে। ফরাসী কঙ্গোর সঙ্গে মিলে মিশে থাকবে।

সেটা যখন তিনি ছাড়তে রাজী হলেন তখন তাঁর মুখে নতুন দাবি শোনা গেল। যথা: কঙ্গো একটা দেশ নয়, কয়েকটা 'প্রদেশ' বা 'দেশ' মিলে একটা দেশ! তার একটা সম্পূর্ণত কাসাভুবুর নিজের।

সত্য বটে, লিওপোল্ডভিল-এর বাইরে কাসাভুবুর তেমন জনপ্রিয়তা নেই এবং কঙ্গোর জাতীয় পরিষদের ১৩৭টি আসনের মধ্যে মাত্র ১২টি তাঁর হাতে। কিন্তু বাদবাকী সব কয়টিও লুমুম্বার হাতে নয়। সেখানে ৬৫টি দল। তার চেয়েও বড় কথা, দেশটায় ১৫০টি উপজাতি এবং লুমুম্বাও জানেন, তাদের মধ্যে এই মানুষটির সখা অনেক। সুতরাং কাসাভুবু সিংহাসনটা দখল করতে না পারলেও দেশটাকে যে অনায়াসেই পোড়াতে পারেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ '৫৯ সনের সেই বিখ্যাত দাঙ্গাটা তাঁরই কীর্তি!

৮. ৯. ৬০

কাসেম, আবদুল করিম

ইরাকে সেদিন উৎসব হবে। লোকেরা বিনে-খরচায় সিনেমা দেখবে, হাফ-ভাড়ায় রেলে চড়বে এবং এবম্বিধ।

এই কর্মসূচীটি ইরাকের দ্বিতীয় বিপ্লব-বার্ষিকী দিনের জন্যে নয়, কাসেম যেদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন সেদিনের জন্য। ইরাকে সেদিন অফিসিয়াল উৎসবের দিন।

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ইরাকের প্রধানমন্ত্রী—তাঁর নিজের ভাষায় 'সোল লীডার অব ইরাক'—আবদেল করিম কাসেম হাসপাতালে। ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যর্থ হয়েছে। আততায়ীর গুলী হত্যা করতে পারেনি তাঁকে। 'আল্লা' তাঁকে বাঁচিয়েছেন।

—'আল্লা মহান্!—কাসেম পাগল!'—বাগদাদের পথে আততায়ী নামবার মাত্র ক' সপ্তাহ আগে রাজধানীর পথে চেঁচিয়ে বলেছে ইরাকের নরনারী। ঘৃণায় রেষ্টুরেন্টের চেয়ারে পা তুলে বসেছে ইরাকী জোয়ানেরা। গাড়ী থেকে কাসেম যদি কখনও ওদের পায়ের তলা দেখতে পান তবে অপমান হবে তাঁর। হওয়া উচিত। কাসেমের 'পিপলস কোর্ট' খুনীদের আদালত। কাসেম খুনী। তাঁর হাতে এককালের সহযোগীদের তাজা রক্ত।

গায়ে রক্তমাখা উর্দি। কাসেম যখন হাসপাতালে এলেন তখন ইরাকী জনতার কাছে আবার তিনি সেই পুরানো বীর। আবার তাঁর নামে জয়ধ্বনি উঠল আকাশে। রোগশয্যায় থেকেও কাসেমের কান এড়াল না তাদের সেই 'জিন্দাবাদ'। সুতরাং, তিনি মুখ খুললেন। কাগজে কাগজে ইতিমধ্যে অনেক 'এক্সক্লুসিভ ইণ্টারভিউ' বেরিয়েছে তাঁর। অনেক বীরত্বের কথা বলেছেন রুগ্নকাসেম। যথা: সিরিয়া, জর্ডন এবং ইরাক নিয়ে একটা সাম্রাজ্য গড়ার চিন্তা সেকালে 'সাম্রাজ্যবাদী' ছিল বটে, কিন্তু আজ আর তা নয়। কেননা, আজকের ইরাক সাম্রাজ্যবাদী নয়, বিপ্লবী। তিনি আরও বলেছেন নাসের ভীরু। পোর্ট সৈয়দ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল তাঁর সৈন্যরা, ইসরাইল যদি আমার প্রতিবেশী হতো তবে ক'ঘণ্টার মধ্যেই মুসলমানদের হাতে আমি তুলে দিতাম আমাদের প্যালেষ্টাইন। এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

নাসের বলেন—কাসেম উন্মাদ। সিরিয়াবাসী পলাতক ইরাকী জেনারেলেরা কিছু বলেন না। তাঁরা নাকি

প্ল্যান করছেন। তদুপরি আছেন জর্ডানের তরুণ রাজা হোসেন। আত্মীয়-বিয়োগ ভুলেননি তিনি। এমন কি নিশ্চিন্ত নয় সৌদি আরব পর্যন্ত। কেননা, কাসেম নাসেরকে এড়াতে গিয়ে কমিউনিস্টদের হাতে ধরা দিয়েছেন। অথচ কমিউনিজম ইসলামে হারাম।

এমন অবস্থায় হাসপাতালের বাইরের ইরাকও কি কাসেমের পক্ষে আর একটি রোগশয্যা নয়? ৩.১২.৫৯

[দ্রষ্টব্য : আরিফ]

কাস্ত্রো, ফিডেল

আমেরিকানরা বলে—'ও, হি ইজ দি বেলকনিম্যান!' কেউ কেউ বলেন —'ছেলেটা আসলে একটা শো-বয়।'

কয়েক শ' মাইল দূর থেকে, নিশ্চিন্ত প্রাসাদের সুসজ্জিত বেলকনিতে দাঁড়িয়ে দেখলে অবশ্য তাই মনে হয়। স্পষ্ট স্পেনিস রক্ত। সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা। কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদ নিতান্তই অগোছাল এবং অপরিচ্ছন্ন। পরনে একটা খাকী আর্মি-প্যান্ট, গায়ে একটা আর্মি-জ্যাকেট, মাথায় আর্মিক্যাপ। কিউবার নায়ক ফিডেল কাস্ত্রোকে দেখলে মনে হয়না তিনি মধ্য আমেরিকার একটা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের প্রধান, কিংবা ষাট লক্ষ নর-নারীর তিনি নির্ভর-স্থান। যেন কোন তরুণ স্পেনিয়ার্ড মেটাডোর, এই মাত্র সে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করে ঘরে ফিরেছে!

বয়স মোটে চৌত্রিশ। মাথায় ঢেউ খেলান কালো চুল। গালে চাপ-বাঁধা অবিন্যস্ত দাড়ি। মুখে—হ্যাভানা চুরুট। সেই চুরুটের একখানার বাজার দর—৫০ সেণ্ট! আমাদের পয়সায় আড়াই টাকা! কাস্ত্রো শো-বয় বৈ কি!

বৃদ্ধ কিউবার বাল-নায়ক একটানা পাঁচ ঘণ্টা বক্তৃতা করেন, (তিন ঘণ্টার কমে নাকি তাঁর ফুসফুস রাজীই হয় না), রাইফেল ঘাড়ে ফেলে কুড়িদিন হাঁটতে পারেন, পরশু খেয়েছিলেন কিনা মনে করতে পারেন না, গেল তিন দিনে ক'ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলেন জানেন না এবং প্রতিবেশী দানবের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে ইতঃস্তত করেননা। সুতরাং, কিউবার চাষী বলে, 'ফিডেল আমাদের বাঘ!'

অনেকে কাস্ত্রো সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন। কিন্তু কেউ বলেননি—কাস্ত্রো 'কাগজের বাঘ।' কেননা, ঝানু ডিরেক্টার বাটিস্তার হাত থেকে এই কিউবা নামে দ্বীপটিকে কেড়ে নিতে

কাস্ত্রোর সময় লেগেছে মাত্র পাঁচ বছর, লোক খরচ হয়েছে মাত্র—আড়াই শ! নিউইয়র্কে প্রতি হপ্তায় ছুটির দিনে গাড়ী চাপায়ও এর চেয়ে বেশী লোক প্রাণ দেয়।

লোকে বলে—সেটা বাটিস্তার দুর্ভাগ্য, আর কাস্ত্রোর ভাগ্য। কিন্তু কাস্ত্রো বলেন—সে তাঁর স্বপ্ন। বন্ধুরা বলেন—সে তাঁর সাহস।

ফিডেল কাস্ত্রোর বোধ হয় সব কটাই ছিল এবং বোধ হয় সব কটাই এখনও আছে। বাবা যখন স্পেন থেকে ক্যারেবিয়ান সাগরের এই দ্বীপটিতে পা দেন তখন তখন তাঁর পকেটে একটি পয়সাও ছিল না। কাস্ত্রো যখন জন্মালেন তখন তাঁর প্রচুর পয়সা, বিস্তর আখি-জমি। সুতরাং, বড়-ঘরের ছেলে স্কুলে গেল। সেখান থেকে কলেজে। সৌখিন শিকারী হিসেবে ধনীর দুলাল বন্দুকটা আগেই চিনেছিল, এবার তার পকেটে পিস্তল উঠল। কাস্ত্রো পড়তে পড়তেই রাজনৈতিক হয়ে গেলেন। '৪৭ সনে ক্যারিবিয়ান বিপ্লবীরা যেদিন কিউবার উপকূল থেকে ডোমিনিকান রিপাব-লিকের উদ্দেশ্যে জাহাজ ভাসাল তরুণ কাস্ত্রো সেদিন জাহাজে অন্যতম যাত্রী। পথে কিউবার প্রহরীরা যখন সে জাহাজ আটকাতে চাইলেন তখন অনেকে জীবন হারালেন। কিন্তু ভাসতে ভাসতে নতুন জীবনে এসে ঠেকলেন কাস্ত্রো। তিনি হ্যাভানায় সংসারী সেজেছেন। বিয়ে করেছেন, বাবা হয়েছেন,—আইন পড়ছেন। সে পড়া কতদূর এগিয়েছে তা জানা গেল এক বছর পরে।

১৯৫৩ সনের ২৬শে জুলাই। বাটিস্তা'র ঘুমন্ত সৈন্যবাহিনীর উপর সহসা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তেরখানা গাড়ী বোঝাই এক অজ্ঞাত বাহিনী। সৈন্যরা অবাক হয়ে দেখল সে বাহিনীর পুরো ভাগে কাস্ত্রো। তাঁর বয়স মাত্র ছাব্বিশ।

বাটিস্তা ওকে জেল দিলেন। স্ত্রী মার্থা তাঁকে ডিভোর্স করলেন। কাস্ত্রো হেরে গিয়েছেন। এখন তিনি জেলখানায় বসেবসে ইংরাজী-অভিধান পড়ে সময় কাটান। কিন্তু স্বপ্নের মায় কাটাতে পারেন না। ২৬শে জুলাই তারিখটাকে তিনি বাঁচাতে চান বাটিস্তাই তার ব্যবস্থা করলেন কাস্ত্রোকে তিনি ছেড়ে দিলেন।

২৬শে জুলাইয়ের প্রতিজ্ঞা নি সেই যে কাস্ত্রো বনবাসী হলেন, আ তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেলনা, আ তাঁকে ধরা গেলনা। হ্যাভানা

উৎফুল্লিত জনতা আবার যেদিন দেখল তাদের ফিডেলকে কাস্ত্রো সেদিন বাটিস্তাকে খুঁজছেন। কিউবা সেদিন তাঁর অধীন।

কিউবার তরুণ অধিনায়ক আজ আর এক নবীন স্বপ্নের ঘোরে পড়েছেন। তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত মার্কিন দেশের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। এই যুদ্ধের ফলাফলটা এই মুহূর্তেই বলা যেত। কিন্তু স্থানগত এবং কালগত কারণে তা বলা মুস্কিল। কেননা, মাত্র ছেচল্লিশ হাজার বর্গ-মাইলের দ্বীপ হলেও কিউবা লাতিন আমেরিকাবাসী দেশ। সে যেমন চিনি বেচে খায়, তেমনি তাকে সেধে খাওয়াবার লোকও দুনিয়ায় অনেক। তাছাড়া, মার্কিনীরাই বলেন—ও দেশের কাস্ত্রো নামক ছেলেটা 'সত্যিই লাকি চ্যাপ!' ১৪. ৭. ৬০

কিং (জুনিয়র), মার্টিন লুথার

এ 'গান্ধী' আবির্ভূত হয়েছিলেন একটি ক্লান্ত মায়ের অবশ পা দু' খানার দিকে তাকাতে গিয়ে।

সেদিন ১লা ডিসেম্বর, বৃহস্পতি-বার; ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। সবে সকাল হয়েছে। কোর্ট স্কোয়ার ছেড়ে সিটি লাইন্স-এর একটি বাস গর্জন করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। অদূরেই মণ্টগোমারীর এম্পায়ার থিয়েটার। বাসের ভেতরে ছত্রিশজন যাত্রী। তাদের মধ্যে চব্বিশজন কৃষ্ণকায়, বারোজন শ্বেতাঙ্গ। কৃষ্ণাঙ্গরা সবাই পেছন থেকে সামনের দিকে সার করে বসে,—শ্বেতাঙ্গরা সামনে থেকে পেছনের দিকে। মার্কিন দেশের দক্ষিণাঞ্চলে, বিশেষত আলবামায় তাই নিয়ম।

এম্পায়ার থিয়েটারে এসে গাড়ি থামল। ছ'জন নতুন যাত্রী উঠলেন এই স্টপে। প্রত্যেকেই তাঁরা শ্বেতাঙ্গ। ড্রাইভার যথারীতি কৃষ্ণাঙ্গ যাত্রীদের আদেশ দিলেন আসন ছেড়ে দিতে। কেননা, এই রাজ্যে সরকারী আইন—শ্বেতাঙ্গদের বসবার পর আসন খালি থাকলে তবেই সেটা কৃষ্ণাঙ্গের প্রাপ্য। সুতরাং, বিনাবাক্যব্যয়ে তিনজন নিগ্রো উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু আশ্চর্য, একটি কৃষ্ণাঙ্গ রমণী তখনও বসে। তিনি বললেন—আমি উঠব না। দুঃসাহসী সেই মেয়েটির নাম—মিসেস রোজা পার্কস। তিনি দরজির কাজ করেন।

ওঁরা রোজাকে ধরে থানায় নিয়ে গেলেন। বিচারে দশ ডলার জরিমানা হল তাঁর। কিন্তু পরের সোমবার

কিং, মার্টিন লুথার

যা হল মার্কিন দেশের ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। মণ্টগোমারীর কোন নিগ্রো সেদিন বাসে চড়লেন না। তার পরের দিনও না। দিনের পর দিন, ৩৮১ দিন ওঁরা হাঁটলেন, ঘোড়ায় চাপলেন, গাড়ি ধার করে কর্মীদের কাজে পাঠালেন, কিন্তু তবুও বাসে চড়লেন না। সে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। রোজার খোঁড়া পায়ে ভর করে বিপ্লব এসেছে আলবামার শহর মণ্টগোমারীতে। রোম ছেড়ে স্পার্টাকাস যেন আমেরিকার দক্ষিণে। —তবে সম্পূর্ণ অন্য বেশে। সমগ্র দেশ স্তম্ভিত, বিশ্ব চমকিত। এমন আশ্চর্য লড়াই কি করে আমেরিকার হিংস্র দক্ষিণে সম্ভব? সেদিনই পৃথিবীর কানে প্রথম গুঞ্জরিত হয়েছিল সেই যাদুকরের নাম,—মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়ার),—রোজার অবশ পায়ের সমর্থনে দণ্ডায়মান লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গের পেছনে তিনিই—'গান্ধী'।

জর্জিয়ার এক যাজকের ঘরের সন্তান। জন্মের পর বাবা নিজের নামে নাম রেখেছিলেন—মাইকেল কিং। ছেলে যখন ছ'বছরে পড়েছে দৃষ্টিবান পিতা বললেন—এবার আমরা নাম পাল্টাতে চাই,—আজ থেকে আমি এবং তুমি দু'জনেই—মার্টিন লুথার কিং। রিফর্মেশনের সেই ঐতিহাসিক প্রটেষ্ট্যাণ্ট নায়ককে পুত্রের জীবনে নতুন করে প্রত্যক্ষ করতে চাইলেন তিনি। কিশোর কিং তখনও অস্থিরমতি বালক মাত্র। অ্যাটলাণ্টার মোর হাউস কলেজে সমাজবিদ্যা পড়তে পড়তে তখনও তিনি ভাবছেন—দমকলে কাজ নেবেন, আগুন নিভাবেন; কখনও বা ভাবছেন ডাক্তার হবেন, কখনও বা উকিল। কেননা,—প্রতিবেশী নিগ্রোদের জীবনে অনেক ব্যাধি, অনেক বে-আইনী আদেশ নির্দেশ। এখনও মনে পড়ে—দোকানে একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বলে তিনিও একদিন চড় খেয়েছিলেন। তবুও ধ্রুবতারা খুঁজে পাওয়া গেল আরও কিছুদিন পরে, ক্রোজার-এর ধর্মীয় বিদ্যালয়ে এসে। গান্ধীর দেশ ভারতে এসেছেন অনেক পরে, কিং সেখানেই খুঁজে পেয়েছিলেন ভারতের গান্ধীকে।

তারপর হার্ভার্ড এবং অবশেষে মণ্টগোমারীর এই গীর্জা—গান্ধী সেই থেকে দূর বিদেশের কৃষ্ণাঙ্গ যাজকের জীবনে প্রত্যহের নক্ষত্র। মার্টিন লুথার কিং বলেন—নাজারেথের খ্রীষ্ট আর ভারতের গান্ধী আমার সর্বস্ব।—

খ্রীষ্ট পথ দেখিয়েছেন, গান্ধী প্রমাণ করেছেন সে পথ এখনও বাস্তব।—দি স্পিরিট অব প্যাসিভ রেসিস্ট্যান্স কেম টু মি ফ্রম দি বাইবেল, দি টেকনিক অ্যাণ্ড এক্সিকিউশান কেম ফ্রম গান্ধী!

জীবনাচারেও কিং দ্বিতীয় গান্ধী। বয়স মাত্র চৌত্রিশ (জন্ম ১৯২৮)। '৫৩ সনে করেত্তা স্কট নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করছেন। য়ুলান্দা নামে ছোট্ট একটি মেয়েও আছে ওঁদের। কিন্তু গৃহী হয়েও বাপটিস্ট কিং এক বিরাগী যাজক। পোষাকে তাঁর মন নেই। বলেন—আমি আণ্ডার-টেকার সেজে থাকতে চাই না বটে, পোষাক নিয়ে মাতামাতিও ভালবাসি না। যে কোন পুরানো ধাঁচের স্যুট আমার পক্ষে যথেষ্ট। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি উঁচু চমৎকার শরীর, ওজন প্রায় ১৭০ পাউণ্ড। কিন্তু কিং খেলাধুলায় বরাবর গরহাজির। বেসবল, সাঁতার এবং টেনিস দেখতে ভালবাসেন তিনি, কিন্তু খেলতে নয়। তবে গান্ধীজীর সঙ্গে আসল মিল তাঁর যেখানে সে ভয়লেশহীন চিত্তের বলে। অনেকবার বোমা ফেটেছে তাঁর ঘরে, কানের কাছে; কিন্তু বন্ধুদের পরামর্শ মেনে কিং তবুও কোনদিন আত্মরক্ষার্থে হাতে কোন অস্ত্র তুলে নেননি। আমেরিকার গান্ধী উত্তেজনার চরম মুহূর্তগুলোতেও স্থির কণ্ঠে বলতে পারেন—ডু নট গো গেট ইওর ওয়েপনস!…দি স্ট্রংম্যান ইজ দি ম্যান হু ক্যান স্ট্যাণ্ড আপ ফর হিজ রাইটস অ্যাণ্ড নট হিট ব্যাক!

একটি জনপ্রিয় মার্কিন সাপ্তাহিক তাঁদের এই "গান্ধী"কে গত বছরের সেরা ব্যক্তিত্ব বলে চিহ্নিত করেছেন। দুই লক্ষ দশ হাজার কৃষ্ণাঙ্গের ওয়াশিংটন অভিযান এবং তার পরেই ডালাসের সেই কৃষ্ণবর্ণ শুক্রবার যদি যুক্তরাষ্ট্রের জীবনে বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয় তবে এ সম্মান অবশ্যই কিং-এর প্রাপ্য। কেননা, মার্টিন লুথার কিং-ই সেই মানুষ যাঁর যাদুস্পর্শে কৃষ্ণ আমেরিকা আজ জাগ্রত। মনে পড়ছে লিঙ্কন মেমোরিয়ালের নীচে দাঁড়িয়ে তিনি বলছিলেন—'আমি স্বপ্ন দেখছি…!' ওঁরা লক্ষ কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন—'ড্রিম অন।' কিং-ই তাঁদের এই স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন। মনে পড়ছে তিনি বলেছিলেন—উই উইল টার্ন আমেরিকা আপ সাইড ডাউন ইন অর্ডার দ্যাট ইট টার্ন রাইট সাইড আপ! একথা বোধ হয় একমাত্র

কুজবারী, সাইদর

তিনিই বলতে পারেন যিনি গান্ধী, অথবা গান্ধীর মতন। ২. ১. ৬৪

কুজবারী, সাইদর (কর্নেল)

হুবহু ঠিক 'একদিনকা সুলতান' নয়,—দু' দিনকা। হাঁ, মাত্র আট-চল্লিশ ঘণ্টার জন্যেই '৫৪ সনে একবার তিনি বসেছিলেন বটে সিরিয়ার সিংহাসনে। প্রেসিডেণ্টের আসনে। কিন্তু আজকের মত সৈন্যরা তাঁর 'পেছনে' ছিল না। ছিল—সামনে। ফলে, প্রভু তথা মিত্র শিশাক্লির মতই জনতার পায়ে কুর্নিশ জানিয়ে তখৎ-এ-তাউস থেকে নেমে এসেছিলেন দু'দিনকা সুলতান। তারপর, দীর্ঘ সাত বছর পরে এই প্রত্যাবর্তন। —ডঃ কুজবারী কি সত্যিই সেই 'সহস্র এবং এক রজনী'র দেশের মানুষ নন?

খানদানী ঘরের সন্তান। গোটা মধ্যপ্রাচ্যে এমন কোন বড় ঘর নেই দামাস্কাসের কুজবারীদের যাঁরা চেনেন-না। কর্নেল সাইদর,—এবারকার নাসের তথা ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অন্যতম বিদ্রোহী যিনি তিনিও কুজবারী। কর্নেল সাইদর কুজবারী। সদ্যনিযুক্ত প্রধান—ডঃ কুজবারীর আরও একটা পরিচয় আছে সিরিয়ায়। দামাস্কাসের বিখ্যাত ব্যবসায়ী খোমোসিয়া তাঁর শ্বশুর-মশাই।

পারিবারিক এই পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আইনজীবী হিসেবে ডঃ কুজবারীর প্রতিষ্ঠা। দামাস্কাস ও বেইরুট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখর আইনের ছাত্র ডঃ কুজবারী দামাস্কাসে অন্যতম পসারওয়ালা আইনজীবী। তা ছাড়া ফরাসী এবং আরবী ভাষায় তিনি বিস্তর আইন-পুস্তকের লেখক এবং দামাস্কাস বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান আইনের অধ্যাপক। সুতরাং বয়স যদিও এখন মোটে সাতচল্লিশ—সিরিয়ার লোকেরা নাম জানে তাঁর সাঁইত্রিশ থেকেই।

'৪৮ সনে আইনবিশারদ ডঃ কুজ-বারী ছিলেন সরকারের অন্যতম আইন উপদেষ্টা। '৫৩ সনে জেনারেল শিশাক্লি বললেন—'তোমার পরামর্শ দপ্তরের বাইরেও প্রয়োজন। আমি তোমাকে আমার পার্লামেণ্টের স্পীকার করতে চাই।' কুজবারী বললেন—'যে আজ্ঞে।' ব্যাঘ্রের সেই প্রথম রক্ত আস্বাদন।

স্পীকার থেকে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। তারপর শিশাক্লির পতন দিনে দু'দিনের জন্যে সাক্ষাৎ প্রেসিডেণ্ট।

বাঘ তখন বন্ধু চেনে না, সে রক্ত পাগল।

বন্ধু শিশাকৃলিকে পরামর্শ দিলেন ডঃ কুজবারী—'সে-ই ভাল, তুমি বরং পালিয়ে যাও। দেখি, কি করতে পারি !'

তেমতাবস্থায় রফা ভিন্ন উপায় ছিল না। নয়া জমানার সঙ্গে আপোস করলেন ডঃ কুজবারী। ফলে, পাকা চার বছর মন্ত্রিত্ব করা গেল নির্বিবাদে। '৫৮ সন অবধি ডঃ কুজবারী কখনও সিরিয়ার শিক্ষামন্ত্রী, কখনও আইন-মন্ত্রী, কখনও বা শ্রমমন্ত্রী।

এল—'৫৮ সন, নাসের এবং ইউ-নিয়ন। আরব লিবারেশন পার্টির নায়ক ডঃ কুজবারী মনে মনে এ মিলকে মন্দ বললেন। ওঁরা গন্ধ পেলেন। ফলে,—পদ গেল, পার্টি গেল,—এমনকি এতদিনের পুরানো মানুষটির জন্যে স্থানীয় কাউন্সিলেও একটা চেয়ার বরাদ্দ করা হল না!

বাধ্য হয়েই ডঃ কুজবারী ফিরে এলেন তাঁর সাবেক রাজত্বে। আবার সেই আইনের জগৎ। বিশ্ববিদ্যালয়, আদালত। এবং সেখান থেকেই গত বৃহস্পতিবারের বারবেলায় হঠাৎ—

সন্দেহ নেই, সিরিয়ার সদ্যমনোনীত প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণপন্থী এবং পশ্চিমী ঘেঁষা। কিন্তু আর কেউ না জানে নাসের জানেন—শেষ পর্যন্ত যদি ঐ আসনে এই মানুষটিই থেকে যান তা হলে খুব বড় রকমের কোন বিপদ নেই। কেননা '৫৫ সনে নাসেরের সঙ্গে ওদিক থেকে যাঁরা উৎসাহভরে বান্দুং এসেছিলেন ডঃ কুজবারী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাছাড়া আজও ডঃ কুজবারীর কাছে মেডেল আছে একটা। পদকটার নাম—'অর্ডার অব দি রিপাবলিক'! দিয়ে ছিলেন যিনি তিনি—রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট—নাসের স্বয়ং!

৫. ১০. ৬১

কুঞ্জরু, হৃদয়নাথ

যৌবন থেকেই 'কমিটি-ম্যান'। এবং যখনই কমিটি, প্রায়শই সেখানে তিনি চেয়ারম্যান।

সুরু হয়েছিল দ্বিতীয় কমন-ওয়েলথ সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের চেয়ারম্যানের আসন নিয়ে। তারপর প্রধান হিসেবে যে সব আসনে তিনি বসেছেন তার মধ্যে আছে—রেলওয়ে দুর্নীতি তদন্ত কমিটি, ইউ পি য়ুনিভারসিটি গ্রাণ্টস কমিটি, ইণ্ডিয়ান স্কুল অব ইণ্টার ন্যাশনাল স্টাডিজ, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড

এফেয়ার্স, চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটি এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে সব কমিটিতে তিনি ছিলেন বা আছেন তার মধ্যে আছে—স্টেট রিঅর্গেনাইজেশন কমিশন, য়ুনিভারসিটি গ্রাণ্টস কমিশন, এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

সুতরাং, বলা নিষ্প্রয়োজন একালের ভারতের সঙ্গে মানুষটির অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। অচ্ছেদ্য সম্পর্ক আমাদের নামটির সঙ্গেও। কেননা, পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর নাম শোনেননি এমন ভারত সন্তান ভারতে আজ বোধহয় একজনও নেই।

গোখেল-তিলকের আমলের মানুষ। এবং সেই একই ধাতুতে গড়া। সার্ভেণ্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে নাম লিখিয়েছিলেন সেই ১৯০৯ সনে। সেই থেকে পঁচাত্তর বছর বয়সে আজও মাতৃভূমির সেবকই আছেন।

দেশ—কাশ্মীর, জন্মস্থান—ইউ. পি। লেখাপড়া কিছু এলাহাবাদে, কিছু লণ্ডনে। পণ্ডিত কুঞ্জরু এলাহাবাদের বি. এ, লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এর বি. এস-সি। অবশ্য তার পরেও (আক্ষরিক অর্থেও) তিনি এল. এল. ডি।.

স্বদেশী জীবনে 'সার্ভেণ্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র নায়ক পণ্ডিত কুঞ্জরু একাধিক বিশিষ্ট জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জনক। ইউ. পি আইন-সভা, কেন্দ্রীয় আইনসভা, গণপরিষদ, রাজ্য সভা ইত্যাদির সদস্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ—এককালে বিখ্যাত 'ন্যাশ-নাল লিবারেল ফেডারেশনে'র জনক। এছাড়া পূর্ব-আফ্রিকার জাতীয় কংগ্রেস থেকে শুরু করে জাপানের প্যাসিফিক রিলেশনস কনফারেন্স, বহু প্রতিষ্ঠানের তিনি একদা প্রধান কিংবা পথপ্রদর্শক।

পথপ্রদর্শক রাজ্যসভায়ও। পণ্ডিত কুঞ্জরুই সেখানেই আজও একমাত্র সদস্য, যিনি কথা বললে বিরোধী পক্ষ, সরকারী পক্ষনির্বিশেষে গোটা সভাটা কান পেতে শোনে। কেননা কুঞ্জরু শুধু যে ভাল বলতেই পারেন তা নয়,—এদেশে 'কমিটি' নামক আধুনিক পঞ্চায়েতের জন্মকাল থেকে তার মধ্যে বাস করার ফলে পার্লা-মেণ্টের আদর্শ ভাষাটাও তিনি জানেন।

সংবাদ: স্থির, ধীর এবং বিচক্ষণ এই প্রবীণকে সদ্যগঠিত রেল-দুর্ঘটনা তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যানের আসনে বসান হয়েছে। খবরটা অনিবার্যভাবেই শ্রীজগজীবন রামের পক্ষে দুঃসংবাদ।

কেননা, লোকে বলে—পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু সত্য ছাড়া আর কিছুই চোখে দেখেন না। তবে রেল দপ্তরের পক্ষে আশার কথা এই—চোখের সামনে সত্য-নির্ণয়ে বিঘ্ন দেখলে পণ্ডিত হৃদয়নাথ সেখানে থাকেন না। মনে আছে বোধ হয়—রেলের দুর্নীতি সন্ধান কমিটিতে কুঞ্জরু শেষ পর্যন্ত ছিলেন না।

১১. ১. ৬২

কুয়াড্রাস, জনিও

'সান্তা মেরিয়া'র বেতার ঘর থেকে প্রথম বাণীটি ঘোষিত হয়েছিল ওঁর নামে। যদিও সেই মুহূর্তে মানুষটির হাতে কিছুই ক্ষমতা ছিল না তবুও অকূল সাগরে ভাসতে ভাসতে ওঁর নামটিই স্মরণ করেছিলেন বিদ্রোহী গ্যালভাও। কেননা, নামটি সত্যই নির্ভর-যোগ্য। শুধু রক্তসম্পর্কের বিদ্রোহীদের পক্ষে নয়, ছ' কোটি তিরিশ লক্ষ মানুষের প্রায় প্রত্যেকের পক্ষে।

'প্রায়' বলতে হল এজন্যে, কারণ ওঁর বিপক্ষেও প্রার্থী ছিল, দল ছিল কিছু। স্বভাবতই ছিল কিছু বিরুদ্ধাচারীও। কিন্তু সে নগণ্য। বিশেষ, সেই মানুষের পক্ষে যাঁর নিজের কোন দল নেই। অন্তত রাজনৈতিক দল বলতে ব্রেজিলে যা বোঝায়—তার কোনটিতে তাঁর নাম নেই।

দলের নাম—সোস্যাল খ্রীশ্চিয়ান। সে দল সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিশেষ। নিজের নাম—জনিও কুয়াড্রাস। লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম দেশ ব্রাজিলে স্মরণীয় নাম বিশেষ।

পেশায় কুয়াড্রাস ছিলেন এক-কালে আইনজীবী। এবং কখনও কখনও অর্থ পণ্ডিত। তবুও যেন মনে হয় অন্য কোন পরিচয় আছে লোকটির। কেননা, চেহারাটা আইনজীবীর মত নয়, কথাগুলোও পেশাদার ইকনমিষ্ট-এর কথা নয়।

অবশেষে সে পরিচয়ও পাওয়া গেল একদিন। কুয়াড্রাস সেদিন নিজ রাজ্যের রাজধানী শহর সাও পাউলোর (Sao Paulo) বিখ্যাত মেয়র। এ শহর আজ ইউরোপ আমেরিকায় এক আশ্চর্য সুন্দর এবং সুপরিচালিত শহর। এবং সকলে জানে—তার একমাত্র কৃতিত্ব যাঁর তিনি সাও পাউলোর সেই কর্মঠ মেয়র। কুয়াড্রাস '৪৯ সন থেকে এ শহরের মেয়র এবং যুগপৎ সাও পাউলো রাজ্যের গভর্নর।

জনপ্রিয় মানুষ, জনপ্রিয় নাম। সুতরাং, টিকিট হাতে অনেকে

ঘোরাফেরা করেন। কিন্তু কুয়াড্রাসের এক কথা—নো! প্রেসিডেন্ট হতে চাই না আমি! '৫৬ সনের নির্বাচন চলে গেল। চোখের সামনে এল আরও অব্যবস্থা,—কুশাসন। সুতরাং '৬১ সনে আর অমত করতে পারলেন না দেশপ্রিয় মেয়র তথা প্রাদেশিক গবর্ণর। বিশেষ, ইতিমধ্যে দু'টি দেশ দেখে এসেছেন তিনি। ব্রেজিলের চেয়ে সত্যিই রাশিয়া বা কিউবা স্বতন্ত্র দেশ!

সুতরাং, কুয়াড্রাস প্রার্থী হলেন। হাতে তাঁর সুস্পষ্ট কর্মসূচী। দলসমূহের প্রতি একমাত্র বক্তব্য—যারা এই কর্মসূচী মান, তারা আমাকে সমর্থন কর। কনজারভেটিভরা (আসলে নাকি তার প্রগতিশীল) প্রকাশ্যত সমর্থন জানালেন। এলেন সোস্যালিস্টারাও। যাঁরা এলেন না, তাঁরা লোক দাঁড় করালেন, কিন্তু প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচারণ করতে পারলেন না। কেননা, লোকটি রাজনৈতিক বর্ণবিহীন হলেও জনতার চোখে কর্মসূচীটি যারপর নাই রঙ্গীন।

সুতরাং, যথাসময়ে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হয়ে গেলেন কুয়াড্রাস। ফলে ক্যাপ্টেন গ্যালভাওই যে আশ্রয় পেলেন তাই নয়, লোকে বলে—ব্রেজিল নামক দেশটাও অবশেষে রক্ষা পেল। ৯. ২. ৬১

কেইটা, মোডিবো

দীর্ঘ, সুগঠিত, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল পুরুষ। বয়স—পঞ্চাশ। কিন্তু দেখলে মনে হয় মোডিবো কেইটা (Modibo Keita) যেন এখনও তিরিশের ঘরে।

দেহে যেমন আদিম স্বাস্থ্য, মুখে তেমনি প্রাণখোলা আদিম হাসি। কেইটা আফ্রিকার নবীন সন্তান। জন্ম গরীব বাম্বারাদের ঘরে, ফরাসী সুদানের রাজধানী বামাকো শহরে। মোডিবোর বাড়ীতে যদি কুলপঞ্জী থাকত তাহলে দেখা যেত আজ যিনি নবজাত মালি ফেডারেশানের প্রধানমন্ত্রী, একদিন তাঁর পূর্বপুরুষেরাই ছিলেন প্রাচীন মালি রাজ্যের রাজা এবং মন্ত্রী।

কেইটা কোনদিন সে দাবি তুলেননি। তিনি ফরাসীদের প্রজা হয়ে জন্মেছিলেন, জীবনও শুরু করলেন বাধ্য প্রজা হিসেবেই। প্রাইমারী স্কুলে পড়া শেষ হল। আফ্রিকান মুসলমানের ঘরের ছেলে কেইটা পশ্চিমী কায়দায় সেকেণ্ডারি স্কুলে ভর্তি হলেন। সেখান থেকে সসম্মানে পাশ হয়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে কাজ জুটে

গেল একটা। ভদ্র কাজ। স্কুল মাস্টারি। ১৯৩৫ সনে কেইটা গাঁয়ের মাস্টার হলেন।

দশ বছর এ কাজেই কেটে গেল। '৪৫ সনে সুদানের ছেলেরা ধরে পড়ল। তারা কেইটাকে ফরাসী গণপরিষদে প্রতিনিধি করে পাঠাতে চায়। কেইটা গররাজী হতে পারলেন না। সেই দিন থেকেই তিনি রাজনীতিক।

আফ্রিকার নবীন রাজনীতিক কেইটার জীবনের পরবর্তী বছরগুলো তার দেশের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ান। তাঁকে কমিউনিস্ট আখ্যা দিয়ে একদিকে যেমন জেল খাটান হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি শাসন পরিষদের নানা উচ্চতর পদেও বসান হয়েছে। অবশ্য, দ্বিতীয়টির জন্যে দায়ী তাঁর দেশের লোক। এবার তাঁরা এবং প্রতিবেশী সেনেগল্-এর মানুষেরা মিলে তাঁদের নতুন দেশ মালি ফেডারেশনের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করলেন তাঁকে। কেইটা তাঁর নিজ হাতে গড়া ফেডারেশনের স্বাধীন মন্ত্রিসভার প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

ছুটো দেশ, কিন্তু রাজ্যটা তবু মস্ত হল না। সেনেগল আর সুদানে মিলে জমি ৬ লক্ষ ৬০ হাজার একর, মানুষ —৬০ লক্ষ। আকারে মালি কঙ্গোর চেয়েও ছোট, লোকসংখ্যায় নাইজেরিয়া, ইথিওপিয়া, কিম্বা ঘানাও তার চেয়ে বড়। তদুপরি মালির জমিতে চীনে বাদাম ছাড়া ফসল নেই, জমির নীচে কেনা বেচা করে ছুটো পয়সা পাওয়া যায় এমন কোন খনিজ নেই। কিন্তু তবুও লোকে বলে মালির ভবিষ্যৎ আছে। কেননা, দেশটাতে কেইটার মত স্থির বুদ্ধির স্থির মাথার নেতা আছেন।

৮. ৭. ৬০

কেক্কোনেন, প্রেসিডেন্ট

গ্রোমিকো যখন আঙ্গুল নেড়ে ওঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফিনল্যাণ্ডের বিপদের কথা বোঝাচ্ছিলেন উনি তখন হাওয়াই দ্বীপের সমুদ্রসৈকতে শুয়ে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছিলেন। খবরটা শুনে—গামছা নিয়ে জলে নামলেন।

অগাধ সাগরের মানুষ। নাম—কালেভ য়ুরহো কেক্কোনেন। পরিচয়—সহসা আবার খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় উত্থাপিত ফিনল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট,—যিনি সদ্য নিজের হাতে দেশের পার্লামেণ্টটি ভেঙেছেন এবং অচিরেই রাশিয়া যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য: ফিনল্যাণ্ডের বিপদটা ঠিক কোথায় একটু খোঁজ খবর করবেন।

কেক্কোনেন, প্রেসিডেন্ট

এক কথায়—জটিল রাজনীতিক। অথচ—রাজনীতিতে যে এলেন সে শুধু যোগাযোগের কারণে।

খ্যাতনামা আইনের ছাত্র। আইনের সব কটি পরীক্ষা পাশ করে একটি 'ডক্টরেট' পদবী নিয়ে হেলিসেঙ্কিতে ওকালতি করতেন। দেওয়ানি মামলার উকিল। মক্কেলদের অধিকাংশই চাষী। সেই সূত্রেই আলাপ হল ওঁদের দল এগ্রেরিয়ান পার্টির সঙ্গে। আলাপে আলাপে উকিল ক্রমে পার্টির বৈঠকখানায় ঢোকবার ছাড়পত্র পেলেন,—তারপর সেখান থেকে ক্রমে অন্দর মহলে। এসব ১৯৩৬ সনের কথা। কেক্কো-নেনের বয়স তখন ছত্রিশ বছর।

সে বছরেই প্রথম পার্লামেণ্টে। তারপর একাদিক্রমে আজও সেখানেই আছেন এগ্রেরিয়ান পার্টির নায়ক কেক্কোনেন। ইতিমধ্যে নানা দলের, নানা জনের সরকারে তিনি যেসব পদ অলঙ্কৃত করেছেন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—মন্ত্রিত্ব, স্পীকারসিপ, উদ্বাস্তু বিভাগের প্রধান, ব্যাঙ্ক অব ফিনল্যাণ্ডের অন্যতম পরি-চালক ও প্রধানমন্ত্রিত্ব।

কেক্কোনেন ফিনল্যাণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী নির্বাচিত হন ১৯৫০ সনে। তারপর কখনও দলের সঙ্গে তিনি উঠেছেন, কখনও পড়েছেন, কিন্তু রাজনীতি তাঁর অব্যাহত আছে আজ অবধি। এমনকি প্রেসিডেণ্টের আসনে বসেও।

অদ্ভুত রাজনীতিক কেক্কোনেন। হাওয়া যখন যেদিকে, তিনি সেদিকে। কখনও তিনি কমিউনিস্টদের সঙ্গে, কখনও বিপরীতপন্থীদের সঙ্গে। তবে মন তাঁর প্রধানত বাঁ কূল ঘেঁষেই চলতে স্ফূর্তি পায় বেশী। যথা :

প্রেসিডেণ্ট রিসটো রাইতি যখন জার্মানীর পক্ষে, কেক্কোনেনের গোপন সাধনা তখন রাশিয়ার স্বপক্ষে। যদিচ, তার এক বছর আগে মাত্র (১৯৩৯) রুশ আক্রমণ ঘটেছিল তাঁর মাতৃ-ভূমিতে।

'৪৮ সনে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট-দের বিরুদ্ধে তাঁর প্রধান মিত্র ছিলেন কমিউনিস্টরা। এখনও পশ্চাদ্‌ভূমিতে শক্তি নাকি তারাই।

ঘরোয়া রাজনীতিতে কমিউনিস্ট বান্ধব কেক্কোনেন আন্তর্জাতিক রাজ-নীতিতে 'নিরপেক্ষ' হয়েও সোবিয়েত বান্ধব। '৪৮ সনে মস্কোয় বসে তিনিই মিত্রতার চুক্তি করেছিলেন রাশিয়ার সঙ্গে। '৫০ সনে দ্বিতীয় যাত্রায় স্বয়ং স্ট্যালিন দেখা করেছিলেন তাঁর সঙ্গে।

কেক্কোনেনের হাতেই সেদিন নিষ্পন্ন হয়েছিল রুশ-ফিনল্যাণ্ড বাণিজ্য চুক্তি। 'ফিনল্যাণ্ডের ইতিহাসে ইতিপূর্বে অভূতপূর্ব' নামে কথিত সেই চুক্তিপত্রখানা নিয়ে সগর্বে কেক্কোনেন সেদিন ঘোষণা করেছিলেন—ফিনল্যাণ্ডের জমিতে দাঁড়িয়ে যদি কেউ রাশিয়া আক্রমণ করতে চায় তবে আমি লড়াই করব তাদের সঙ্গে!

আরও উল্লেখযোগ্য, রুশ-মিত্র কেক্কোনেন স্বদেশে 'ফিনল্যাণ্ড-সোবিয়েত ইউনিয়ন' নামক একটি বেসরকারী সংস্থার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক স্টকহলমে অনুষ্ঠিত 'শান্তি সম্মেলনে'র তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠতম সরকারী সমর্থক। শান্তি সম্মেলনের ইস্তাহারে সেদিন স্বাক্ষর ছিল তাঁর।

দু'টি ছেলেমেয়ের পিতা কেক্কোনেন কষট্টিতেও প্রবল বক্তা,—মনোযোগী শ্রোতা; রাষ্ট্রনীতিবিদদের তালিকায় তিনি বিশিষ্ট হাস্যরসিক এবং স্বদেশের লোকেদের কাছে অন্যতম ক্রীড়াবিদ। ফিনল্যাণ্ডে যত ক্রীড়া সংস্থা আছে তার সব ক'টিতেই কোন না কোন পদে তাঁর নাম পাওয়া যায়, যেমন পাওয়া যায়—'৩০-এর পর থেকে ফিনল্যাণ্ডের যাবতীয় রাজনৈতিক ক্রীড়ায়ও।

এমন খেলোয়াড় মানুষটি আসলে কারও ক্রীড়ণক কিনা, সে খবর পেতে হলে দুনিয়াকে অবশ্যই আরও ক'টা দিন ধৈর্য ধরতে হবে!

২৩. ১১. ৬১

[পরের বছর ফেব্রুয়ারীতে]

১৯৩৯ সনের ৩০শে নভেম্বর। ফিনল্যাণ্ডের জলে স্থলে আকাশে সেদিন নির্লজ্জ শত্রুর হানা। বিশ্ব চিন্তিত, স্বাধীনতার স্বপক্ষের মানুষেরা আহত, ক্রুদ্ধ।

স্তালিন ভেবেছিলেন—সে আর কতক্ষণের জন্যে! এতটুকু দেশ, সন্দেহ নেই লালফৌজ মাটিতে পা দেওয়া মাত্র ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার পায়ে এসে লুটিয়ে পড়বে! কিন্তু চমকিত বিশ্ব সেদিন অবাক হয়ে দেখেছিল ফিনল্যাণ্ড তা করে নি। রুশ সৈন্যের কাছে আত্মসমর্পণ করার আগে তারা ষোল সপ্তাহ ধরে বরফের ওপরে রক্তের অক্ষরে স্বাধীনতার সঙ্কল্প জানিয়েছিল।—সে-দেশেরই মানুষ! সুতরাং—

সুতরাং, গেল নভেম্বরে সে খবর যখন এল তখন বিন্দুমাত্র চিন্তার ছাপ দেখা গেল না ওঁর একষট্টি বছরের প্রবীণ মুখে, বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা দেখা গেল না চশমার আড়ালে ওঁর ছোট

কেনডেথ, কে. পি.

ছোট গভীর চোখ দুটিতে। অথচ, পরিস্থিতিটা তখন ভাববার মত।

উনি তখন মার্কিন দেশের অতিথি। হাওয়াইয়ের সমুদ্র সৈকতে রোদ পোহাচ্ছেন। খবর এল কিছুক্ষণ আগে মস্কোয় সোবিয়েত পররাষ্ট্র-সচিব গ্রোমিকো ওঁর দূতের হাতে একটা কাগজ দিয়েছেন। তাতে আড়াই হাজার শব্দ আছে এবং প্রত্যেকটি তার ভাববার মত! কেননা, রাশিয়া বলেছে ফিনল্যাণ্ড নাকি বিপদে পড়েছে, তার উচিত অগৌণে রাশিয়ার সঙ্গে বসে সলা করা এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

খবরটা শুনে উনি ধীরে ধীরে বালির উপর বসেছিলেন। তারপর দাঁড়িয়েছিলেন এবং তারপর চশমাটা চোখে ঠিকমত বসিয়ে একটু হেসে-ছিলেন। কেননা, অন্যরা না জানলেও তিনি জানেন, সতের বছর ধরে ফিন-ল্যাণ্ডকে রাশিয়ার হাতে ছেড়ে না দিয়েও তিনি কি করে 'নিরপেক্ষ' রেখে চলেছেন।

পরের মাসে মোটরে ট্রেনে প্লেনে ২৩৮০ মাইল রাস্তা পার হয়ে সাইবেরিয়ার খামারে গিয়ে ক্রুশ্চফের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন কেকোনেন। বলেছিলেন—বল, কি তোমার দাবি?

ক্রুশ্চফ উত্তরে প্রকারান্তরে যা বলেছিলেন, তার মানে দাঁড়ায়,—কিছু নয়। তিনি শুধু এইটুকু শুনতে চেয়ে-ছিলেন, কেকোনেনকে কথা দিচ্ছেন যে, ভবিষ্যতেও ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার বন্ধু থাকছে! কেননা, সামনে নির্বাচন হেতু নিকিতা কিঞ্চিৎ চিন্তিত আছেন।

এবার সে চিন্তার অবসান হল। সংবাদঃ আগামী ছ'বছরের জন্যে কেকোনেনই ফিনল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট আছেন। তিনি নির্বাচনে জিতেছেন।

উল্লেখ্য, '৫৬ সনে জিতবার আগে '৫০ সনে একবার এই পদে তিনি হেরেছিলেন। কারণ, ইলেকশানের দিনে ফিনল্যাণ্ডে সেবার ভীষণ বরফ পড়েছিল।

এবার জিতলেন। কারণ, লোকে বলে,—রাশিয়ায় এখন বরফ গলছে কিনা তাই! ২২. ২. ৬২

কেনডেথ, কে. পি.

'এই মুহূর্তে আমি, মেজর জেনারেল কে পি কেনডেথ···ভারতস্থ প্রাক্তন পর্তুগীজ উপনিবেশগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।'···

তাম্রপত্রে লিখিত পঞ্চদশ শতকের কোন আলমিডা-আলবুকর্কের ঘোষণা

পত্র নয়, ১৯৬১ সনের ২০শে ডিসেম্বর খাস পাঞ্জিমের মাটিতে দাঁড়িয়ে যিনি এই নাতিদীর্ঘ ঐতিহাসিক ঘোষণাটি পাঠ করছিলেন, পদবীটা তাঁর বাঙালী কানে কিঞ্চিৎ অপরিচিত ঠেকলেও নিশ্চিত জানবেন, তিনি ভারতীয়। ঐ দিনে, ঐ সময়ে, যে কোন ভারতীয়ের চেয়ে অধিকতর ভারতীয়!

সতের নম্বর ডিভিসন নামে যে বাহিনীটিকে নিয়ে তিনি সাড়ে চারশ' বছরের প্রাচীন দস্যুর আড্ডায় হানা দিয়েছিলেন সেটি যেমন আসলে মারাঠা বাহিনী, তেমনি তাঁদের পরিচালক কে. পি কেনডেথ নামক সেনানায়কটিও দুর্ধর্ষ দক্ষিণী,—সেই বিন্ধ্যাচলের ওপারের দেশের মানুষ, স্বাধীনতার নামে লড়াইয়ের অভ্যাস যাদের আর্য থেকে ইংরেজ পর্যন্ত—চিরকালের। ইতিহাসেরও এমনি মতি পর্তুগীজের পীঠে শেষ অর্ধচন্দ্রটিও পড়ল সকলের হয়ে তাদেরই একজনের হাত দিয়ে।

গোঁফ দেখেই চেনা যায় মানুষটি 'শিকারী'। তারপরও পরিচয় বলতে যা বাকী থাকে তা সম্পূর্ণ হয়ে যায় একবার শুধু চোখ আর চোয়াল জোড়াটার দিকে তাকালে। পঁয়তাল্লিশ বছরের জওয়ান কেনডেথ সত্যিই পাকা লড়িয়ে। পাঞ্জিমের পর নয়,—আগে থেকেই।

'কমিশনড' হয়েছেন ১৯৩৭ সনে। সুতরাং, বলা নিষ্প্রয়োজন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধটা যাঁদের হস্তক্ষেপের ফলে মহাযুদ্ধ তিনিও ছিলেন তাঁদেরই একজন। ব্রিগেডিয়ার কেনডেথ তখন একটা আস্ত গোলন্দাজ বাহিনী চালাতেন। তৎসহ একটা পদাতিক বাহিনী। তারপর অনেক কাল কেটেছে তাঁর সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় দপ্তরে। কেনডেথ সেখানে ছিলেন আস্ত একটা বিভাগের কর্তা,—আর্টিলারী বিভাগের ডাইরেক্টার।—আর এখন? পৃথিবীতে আজ, এই তারিখে এমন লোক বোধ হয় খুব কমই আছে যারা জানেনা ভারতীয় সেনাপতি মেজর-জেনারেল কে. পি কেনডেথ আজ ভারতবর্ষে শেষ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যটির প্রথম ভারতীয় সামরিক শাসনকর্তা। যদি জিজ্ঞেস করেন এ পদে বসবার আগে জঙ্গীলাট লড়েছেন কেমন? তবে বৃটিশ জনৈক সাংবাদিককেই সাক্ষী দাঁড় করাব, বলব,—'এমন ক্লীন অপারেশন আর হয় না!'

২২. ১২. ৬১

কেনিয়াট্টা, জোমো

'আমাদের নেতার যারা বিচার করেছে আমরা তাদের হত্যা করব। তাদের নিজেদের হাড় থেকে মাংসপেশী ছিঁড়ে নিয়ে আমরা তাদের বাঁধব। শ্বেতাঙ্গদের যারা সাহায্য করেছে আমরা তাদেরও ছাড়ব না। আমরা তাদের চোখ তুলে নেব। সাতদিন সেভাবে রেখে দিয়ে তারপর আমরা তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করব। দেখব, শ্বেতাঙ্গরা তাদের জীবন ফিরিয়ে দিতে পারে কিনা।'

কেনিয়ার 'জ্বলন্ত-বর্শা' জোমো কেনিয়াট্টার বিচারের দিনে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল দুর্ধর্ষ মাউ মাউরা। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করেছে তারা। একজন দুজন নয়,—ছত্রিশজন রাজসাক্ষী সেদিন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল কাঠগড়ায় দাঁড়াবার আগে।

জোমো কেনিয়াট্টা কেনিয়ার মুকুটহীন রাজা, সন্তোত্থিত আফ্রিকার মনের সম্রাট। '৫৩ সাল থেকে তিনি ইংরেজের কারাগারে। সন্ত্রাসবাদী মাউ মাউদের সাহায্যের অপরাধে সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে তাঁর। তারপর, নিষিদ্ধ দলের সদস্য হিসাবে চলবে আরও তিন বছর। অবশ্য কারাগারে 'সদাচারের' জন্য এক বছর আগেই ছাড়া পাবেন তিনি! সে ভবিষ্যতের কথা। উপস্থিত, কেনিয়ার শার্দুল, তেষট্টি বছরের বীর সংগ্রামী জোমো কেনিয়াট্টা জেলখানার পাচক। অন্যান্য মাউ মাউ বন্দীদের রেঁধে খাওয়ান তাঁর কাজ।

আগাগোড়া রহস্যময় পুরুষ। কি নাম কেউ সঠিক জানে না। কেউ বলেন—'জনস্টন', কেউ বলেন—'জন', কেউ কেউ 'জোমো'। তবে আফ্রিকানরা এক নামেই চেনেন তাঁকে। সেই নাম—জোমো কেনিয়াট্টা। মানে,—'জ্বলন্ত বর্শা'।

'বর্শা নয়, ঘাড়ে এক গাদা বিষমাখা তীর আর হাতে একটা ধনুক নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতাম আমি। ঠাকুর্দার গরু ভেড়া ছিল অনেক। বাঘ সিংহ তাড়িয়ে সেগুলো নিয়ে দিন রাত্তির মাঠে মাঠে ঘুরতাম।'

কোথায় জন্ম, কিংবা কবে তাও সঠিক কেউ জানে না। কেউ বলেন, জন্মেছিলেন উনি নাইরোবির কাছাকাছি কোন কিকুউ গ্রামে। এবং সম্ভবত ১৮৯৩ সনে।

ঠাকুর্দা 'যাদুকর' ছিলেন। কিকুউদের মধ্যে বিস্তর প্রভাব ছিল তাঁর বাবার ছিল প্রতিপত্তি। সুতরাং দশ

বছর বয়সে ছেলেটি সাহেবদের চোখে পড়ে গেল। তাঁরা ওঁকে স্কুলে ডাকলেন।

নাইরোবির একটা স্কটিশ মিশনারী স্কুলে ভর্তি হলেন কেনিয়াট্টা। সেখান থেকে পাশ করে চাকরী নিলেন এক সাহেব কুঠিতে। 'বয়'-এর কাজ। কিন্তু সৌভাগ্যবশত সেই শ্বেতাঙ্গ হৃদয়বান ছিলেন। ছেলেটি তাঁর মন জয় করে নেওয়া মাত্র তিনি তাঁকে স্থানান্তরিত করে দিলেন। এবার কর্মস্থল নাইরোবি মিউনিসিপ্যালিটি। জোমো কেনিয়াট্টা তখন সেখানে কেরানীর কাজ করেন। বাইরের জগৎ তথা অন্যবিধ জীবনের সঙ্গে সেই তাঁর প্রথম পরিচয়।

সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হওয়া মাত্র দেখা গেল কেনিয়াট্টা সদ্যগঠিত কিকুউ সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন-এর অন্যতম নেতা নির্বাচিত হয়ে গেছেন। তারপর থেকে ক্রমেই তিনি কেনিয়ায় অধিকতর জনপ্রিয় নায়ক।

'২৯ সনে সেই অধিকারবলেই লণ্ডনে এলেন তিনি। উদ্দেশ্য— কেনিয়ার বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা। আলোচনা হল। একবার নয়, অনেকবার। কিন্তু আর দেশে ফেরা হল না। লণ্ডন থেকে চলে গেলেন তিনি মস্কো। সেখানে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসেবে দু' বছর কাটিয়ে ফিরে এলেন আবার লণ্ডন। এখানে তাঁর অনেক কাজ।

কিছুদিন তিনি একটি স্থানীয় কোয়েকার স্কুলে পড়েছেন, কিছুদিন লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ। আবার কিছুদিন কেটেছে তাঁর বিখ্যাত নৃ-তাত্ত্বিক ডঃ মিলনোস্কির শিষ্য হিসেবে। সেই কালেই রচিত কেনিয়াট্টার বিখ্যাত বই—'ফেসিং মাউণ্ট কেনিয়া।'

পড়াশুনা ছাড়াও তাঁর দীর্ঘ লণ্ডন জীবনে আরও অনেক কিছু করেছেন কেনিয়াট্টা। তিনি এনক্রুমা প্রভৃতির সহযোগিতায় প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেস সংগঠন করেছেন, আফ্রিকার দাবির সমর্থনে আন্দোলন করছেন এবং দুঃসাহসীর মত সাসেক্স-এর মাঠে শ্রমিকের কাজ করে নিজের প্রবাস জীবন চালিয়েছেন। ওখানেই জনৈকা ইংরেজ স্কুল শিক্ষিকার সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। সুখী দম্পতি কেনিয়াট্টারা একটি পুত্র সন্তানের পিতা এবং মাতা।

দীর্ঘ সতের বছর পরে ১৯৪৬ সনের সেপ্টেম্বরে সপরিবারে মাতৃভূমিতে ফিরে এলেন আফ্রিকার জোমো।

কিন্তু সে যেন মাত্র কয়েকটি বছরের জন্যে।

দেশের মাটিতে পা দেওয়ার পরের বছরই গঠিত হল কেনিয়া আফ্রিকান ইউনিয়ান। তার পরের বছর 'মাউ মাউ' আন্দোলন। সুতরাং, 'জ্বলন্ত বর্শা' কয়েদ হলেন। ওঁরা তাঁর বিচার করলেন। প্রিট-এর ভাষায় 'বিচারের প্রহসন করলেন!' সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন কেনিয়াট্টা। বিচারকাল ধরলে আজ প্রায় দশ বছর হতে চলেছে জোমো আজও কারাগারে। আফ্রিকানরা বলেন—আমাদের আফ্রিকা আজও পিঞ্জরবদ্ধ।'

রাজনৈতিক নেতা হিসাবে আফ্রিকান ইউনিয়নের সভাপতি জোমো কেনিয়াট্টার সেদিন দাবি ছিল সামান্য। (১) আইন পরিষদে কালোদের সঙ্গত প্রতিনিধিত্ব চাই (কেনিয়ার আইনসভায় আফ্রিকান এবং ইউরোপীয়ানদের জন্য চৌদ্দটি করে আসনের ব্যবস্থা আছে। দেশে আফ্রিকানদের সংখ্যা ষাট লক্ষ, শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা ষাট হাজার!) (২) বর্ণবৈষম্য দূর করতে হবে (৩) ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার করতে হবে এবং ইত্যাদি।

ইংরেজেরা এই ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলোর জবাব দিয়েছে তাঁকে কারগারে বন্ধ করে। '৫২ সন থেকেই 'জরুরী অবস্থার' নাম করে ব্যাপক দমননীতি চলেছে তাদের। দশ হাজার মাউ মাউ জীবন দিয়েছে এই ক'বছরে। কিন্তু জোমো, কেনিয়াট্টাকে কি ভুলেছে তারা?

ইংরেজরা জানে, আফ্রিকা কোনদিন ভুলবে না তাঁকে। গেল বছর মার্চ মাসে সাক্ষী হিসাবে আদালতে ডাক পড়েছিল কেনিয়াট্টার। নাইরোবিতে কোর্ট বসাতে সাহস পাননি বিচারকেরা। দু'শ মাইল দূরে কিটেল-এ বিচার সভা বসিয়েছিলেন তারা। কেনিয়া ভেঙ্গে পড়েছিল সেদিন সেই ছোট্ট শহরটিতে। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় চৌত্রিশজন জাতীয়তাবাদী নেতাকে আটক করা হয়েছিল সেদিন, মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল দুইটি প্রভাবশালী দৈনিক কাগজের। একটি তার শ্বেতাঙ্গদের কাগজ!

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কেনিয়াট্টা বললেন—সন্ত্রাসবাদ উচ্ছেদের জন্যে আমার যা করণীয় আমি তা করেছি।

—I told my people to let the Mau Mau disappear

like the roots of a fig tree !

কর্তৃপক্ষ ধাঁধায় পড়লেন। কি বলতে চান কেনিয়াট্টা? অতি সাবধানীরা হুঁসিয়ার করে দিলেন কেনিয়াট্টা বলতে চান—মাউ মাউরা আরও আত্মগোপন করে থাকুক। ডুমুরের শিকড় দেখা যায় না, কারণ তা গভীরে থাকে। কেনিয়াট্টা আরও গভীরে পালিয়ে যেতে বলেছেন তাঁর অনুচরদের।

আজ মনে হয় ভুল বুঝেছেন বৃটিশ কর্তৃপক্ষ। জোমো কেনিয়াট্টাকে কারাগারে রেখে তাদের কেনিয়ায় শান্তি স্থাপনের চেষ্টাটি দেখে মনে হয়, তাঁরাই যেন পালিয়ে যেতে চাইছেন কেনিয়ার সমস্যা থেকে। কেননা, জোমো কেনিয়াট্টা যতক্ষণ কারাগারে কেনিয়ার শান্তি ততক্ষণ আরও দূরে।

শোনা যাচ্ছে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ছাড়া পাবেন জোমো কেনিয়াট্টা। কিন্তু দশ বছর আগে যে মানুষটি বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনিই কি ফিরে আসবেন আবার?

বয়স এতদিনে সত্তরে পৌঁছে গেছে বটে, কিন্তু বন্ধুরা বলেন, ফিরে আসছে যে জোমো সে আরও ধারাল বর্শা !

২৭. ৬. ৬১

[১৯৬১ সনের ১৪ই আগষ্ট জোমো কোনিয়াট্টা মুক্তিলাভ করেন, এবং ১৯৬৩ সনের ১১ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রিতে কেনিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্মলাভ করে। কেনিয়াট্টা তার প্রথম প্রধানমন্ত্রী]।

কেনেডি, জন. এফ

—ওহ্ নো! স্বামীর মাথাটা কোলে টেনে নিতে নিতে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন মিসেস কেনেডি।

তবুও শতাব্দীর মহত্তম, নিষ্ঠুরতম ট্রাজেডিকে ঠেকান গেল না। ২২শে নভেম্বর, ১৯৬৩। সেদিন মানব ইতিহাসে আর এক শুক্রবার। আবার পর পর তিনটি গুলী। ডালাসের রাজপথে আবার সেই ঘৃণ্য, লজ্জাকর, —মানুষের আলোকাভিসারের পথে হীন অন্ধকারের কাহিনী। শিকার এবারঃ একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কিন সন্তান জন কেনেডি, ৩৫তম মার্কিন প্রেসিডেণ্ট।

রুজভেল্টের মত সুরু, লিঙ্কনের মত শেষ। কেনেডির নাতিদীর্ঘ জীবন যেন একালের এক সেরা কাব্য। তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি মহৎ, তেমনি নিষ্ঠুর, তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ।

'—যা না করে আমি পারব না,

তা আমি করবই ; বাধা আসবে, বিপদ আসবে, চাপ আসবে, হয়ত নিজের জীবনেও তার ফলাফল সুখকর হবে না, কিন্তু তাহলেও মানুষের সমগ্র নীতিবোধের ভিত্তি সেখানেই'—লিখেছিলেন কেনেডি। তাঁর সমগ্র কর্মজীবন যেন এই বাক্যটি ঘিরেই। আজ তাঁর নাতিদীর্ঘ জীবনের যে গৌরবময় উপসংহার ঘটল তাও যেন এই বাক্যটিতে ঘোষিত জীবনের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেই। ৩৫তম মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট জন ফিটজারেল্ড কেনেডি আপন আদর্শ নিয়েই ছেচল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন, আপন আদর্শ নিয়েই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। এ মৃত্যু একমাত্র লিঙ্কন বা গান্ধীজীর আত্মত্যাগের সঙ্গেই তুল্য।

ম্যাসাচুসেটস-এর কেনেডি পরিবারের সন্তান জন কেনেডি বিখ্যাত জোসেফ. পি কেনেডির তনয়। কেনেডি পরিবারের আদি নিবাস ছিল আয়র্ল্যাণ্ড। ১৮৪৭ সনের আলু-দুর্ভিক্ষের দিনে তাঁর পূর্বপুরুষ পিতৃভূমি ত্যাগ করে ম্যাসাচুসেটস-এর ব্রুকলিনে নতুন করে বসতি স্থাপন করেন। ঠাকুর্দা এবং দাদামশাই দুজনেই রাজনীতিক ছিলেন। বাবা জোসেফ ব্যবসায়ে বিস্তর অর্থশালী হলেও রাজনীতির নেশা ছাড়তে পারেননি। রুজভেল্ট তাঁকে বৃটেনে মার্কিণ রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়েছিলেন। জন সেই পিতারই নয়টি ছেলেমেয়ের একজন,—দ্বিতীয়। তাঁর জন্ম তারিখ —২৯শে মে, ১৯১৭ সন।

পরিবারের টাকার অভাব ছিল না। বাবা জোসেফ ১৭৫০ লক্ষ ডলার সঞ্চয় করেছিলেন। তাছাড়া ছেলেদের সম্পর্কে তাঁর উচ্চাশা ছিল। সুতরাং জন-এর লেখাপড়ার আয়োজনে কোন ত্রুটি ছিল না। বোস্টনে স্কুলের পড়া শেষ হওয়া মাত্র পুত্রকে তিনি বিখ্যাত লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিস-এ পাঠালেন। কেনেডির জীবনে এই বিদ্যালয়টি, বিশেষ করে সেখানকার বিখ্যাত রাজনৈতিক তাত্ত্বিক অধ্যাপক ল্যাস্কির প্রভাব অসামান্য। বলতে গেলে আধুনিক পৃথিবীর নানা বৈপরীত্য এখানেই প্রথম তাঁর চোখে পড়ে। ক'বছর পরে ১৯৩৫ সনে মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি যখন হার্ভার্ড থেকে স্নাতক হয়ে বের হয়েছেন বলা চলে কেনেডি তখন থেকেই—'নিউফ্রন্টিয়ার্সম্যান।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কৃশকায় তরুণটি খেলার মাঠে এবং সাঁতারের পুকুরেও আপন দলের গর্ব ছিলেন। কর্মজীবনে

সহপাঠীদের এই গর্বকে কেনেডি জাতীয় গৌরবে পরিণত করলেন। ১৯৪১ সনে তিনি স্বেচ্ছায় নৌ-বাহিনীতে যোগ দিলেন। দু'বছর পরে ১৯৪৩ সনে তরুণ লেফটেন্যান্ট যখন একটি পি-টি বোট-এর অধিনায়কত্ব করেছেন তখন সোলমন দ্বীপের কাছে হঠাৎ দু'টি জাপানী ডেষ্ট্রয়ার তাঁকে আক্রমণ করে। কেনেডি পিঠে গুরুতর আঘাত পান। কিন্তু তা' সত্বেও ন'দিন ধরে তিনি দশজন আহত সৈনিকের দায়িত্ব নিয়ে বেপরোয়া লড়াই করে নিরাপদ এলাকায় পৌছেন। নৌ-বিভাগ জানত—তিনি নিহত হয়েছেন। বাবা জোসেফ কেনেডির কাছে সেই মর্মে একটি সরকারী তারও পাঠান হয়েছিল! ফিরে আসার পর অসীম বীরত্বের জন্যে সেদিন তাঁকে নৌ-বহরের সম্মান পদকে সম্মানিত করা হয়।

এরপর যুদ্ধ ক্ষেত্র প্রত্যাগত সৈনিক সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। বিখ্যাত তিনটি বইয়ের ('হোয়াই ইংল্যাণ্ড স্লেপট', 'প্রোফাইলস ইন কারেজ', 'ষ্ট্রেটেজি অব পিস') লেখক কেনেডি ছাত্র জীবন থেকেই কলমের বলে অসাধারণ। প্রথম বইটি তাঁর ছাত্রাবস্থায় লেখা। প্রতিপাদ্য বিষয়: ইংরেজের যুদ্ধ প্রস্তুতিহীনতার কারণ কী? হার্ভার্ডে একটি থিসিস হিসেবে বইটি লিখিত হয়। সাংবাদিক কেনেডির কর্মজীবন সুরু হয় শিকাগোর 'হেরল্ড আমেরিকান' কাগজে রিপোর্টার হিসেবে,—শেষ একটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে। '৪৬ সনে এ জীবনে ছেদ টেনে দিয়ে রাজনীতিতে নামলেন কেনেডি। কেননা পরিবারের গৌরবময় ঐতিহ্য সেদিকেই। বড় ভাই জোসেফ কেনেডিও রাজনীতি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিহত হন। ছোট ভাই তাঁর সংকল্পকে নিজের জীবনে পূর্ণ করতে চাইলেন।

'৪৬ সনেই ম্যাসাচুসেটস-এর হাউস অব রিপ্রেজেনটিভ-এ তরুণ রাজনীতিক আসন নিলেন। তিনি একটানা ছ'বছর সেখানে ছিলেন। তারপর ১৯৫২ সনে সেনেটে পদপ্রার্থী হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে রিপাবলিকান প্রার্থী ছিলেন হেনরী ক্যাবট লজ। তিনিও বিখ্যাত রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান। কিন্তু তবুও তাঁকে পরাজয় মানতে হল। এই নির্বাচন লড়তে গিয়েই জন কেনেডি বিশেষভাবে জাতির নজর আকৃষ্ট করলেন। পরের

বছর ১৯৫৩ সনে তিনি জ্যাকলিন বোঁভার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। মিসেস কেনেডি একটি কন্যা (ক্যারোলিন, ৬) এবং একটি পুত্র (জন, ৩) সন্তানের জননী। ১৯৫৬ সনে তিনি ডেমক্রাটিক প্রার্থী হিসেবে উপ-রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থী হলেন। কিন্তু দলের মনোনয়ন লাভ করতে পারেননি। সিনেটার কেফাভের-এর কাছে অল্পের জন্য তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। ১৯৫৮ সনে আবার তিনি সেনেটে আসেন, এবং দু'বছর পরে লস-এঞ্জেলস কনভেনশান-এ ডেমোক্র্যাটিক দল তাঁকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে গ্রহণ করেন। সম্মেলনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন লিণ্ডেন জনসন। নির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে রিপাবলিকান প্রার্থী ছিলেন তৎকালীন ভাইস-প্রেসিডেন্ট নিক্সন। একে তরুণ বয়স, তদুপরি ধর্মে ক্যাথলিক, অনেকে ভেবেছিলেন কেনেডি হয়ত প্রবল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হতে পারবেন না। কিন্তু জন এবারও অসাধ্য সাধন করলেন। ১৯৬০ সনের ৮ই নভেম্বর মার্কিণ জাতি সগর্বে রায় দিল কেনেডিই আমাদের ৩৫তম প্রেসিডেন্ট। কেনেডির বয়স তখন মাত্র ৪৩ বছর। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের দীর্ঘ তালিতায় তিনি কনিষ্ঠতম। তাছাড়া তিনিই প্রথম রোমান ক্যাথলিক প্রেসিডেন্ট। তিনি সরকারীভাবে হোয়াইট হাউসে কর্মভার গ্রহণ করেন —২০শে জানুয়ারী, ১৯৬১। কেনেডি সেদিন তাঁর স্মরণীয় উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন—আমার সংগ্রাম মানব জাতির সাধারণ শত্রু দারিদ্র্য, উৎপীড়ন এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে।

৩৫তম মার্কিণ প্রেসিডেন্ট তরুণ রাষ্ট্রনায়ক কেনেডি শুধু অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কিণ রাষ্ট্রপতি নন,—একালের পৃথিবীতে তিনি আজ ঐতিহাসিক পুরুষ। টানা আট বছর আইজেনহাওয়ার শাসনের পরে এই সাহসী প্রেসিডেন্ট যে হোয়াইট হাউসেই পরিবর্তনের হাওয়া এনেছিলেন তাই নয়, তাঁর নাতিদীর্ঘ শাসনকাল দুনিয়ার কাছেও পরিবর্তনের যুগ। স্বদেশে তিনি যে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর কর-হ্রাস সংক্রান্ত প্রস্তাব; আমেরিকার অনুন্নত এলাকাগুলোতে, বিশেষত শিল্প ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে যেখানে আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দিয়েছে সেখানে

ঢালাও আর্থিক সাহায্য দান সংক্রান্ত ব্যবস্থা, ব্যাপক হারে গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনা, বার্ধক্যে চিকিৎসাদান ব্যবস্থা এবং দেহ-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মার্কিণ নাগরিকের জন্যে সমানাধিকার আদায়। শেষোক্তটি প্রেসিডেণ্ট কেনেডির রাজনৈতিক কর্মসূচীতে বৃহত্তর,—মহত্তম সংকল্প। তাঁর বিখ্যাত 'সিভিল লিবারটিজ' বিল এখনও কংগ্রেসের সামনে সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও কেনেডি 'নিউ ফ্রণ্টিয়ার্স' ম্যান'। তিনি বার্লিনে উত্তেজনা হ্রাস করার পক্ষপাতী ছিলেন। লাওস-কে তিনি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তিনি দিয়েম-এর অগণতান্ত্রিক এবং বৌদ্ধ নিগ্রহের নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন। লাতিন আমেরিকা সম্বন্ধেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ভিন্ন ধরনের। উরুগুয়ে সম্মেলনে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার সামাজিক এবং আর্থিক পুনর্গঠনে আমেরিকার বিশেষ দায়িত্বের কথা বলেন। এই অঞ্চলে ব্যাপক আর্থিক এবং কারিগরী সাহায্য পরিকল্পনা তাঁরই সৃষ্টি। প্রবল সমালোচনার মুখে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি যেমন কিউবার হামলায় সরকারী দায়িত্ব অস্বীকার করেননি, তেমনি কিউবা যেদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রত্যক্ষ সমস্যায় পরিণত হয়—সাহসী প্রেসিডেণ্ট সেদিনও কর্তব্য পালনে পিছুপা হননি। তাঁর কিউবা অবরোধ এবং তাঁর দাবী অনুযায়ী ক্রুশ্চফ কর্তৃক কিউবা থেকে সোবিয়েত রকেট অপসারণ একালের এক স্মরণীয় ঘটনা। শুধু কিউবা নয়, প্রেসিডেণ্ট কেনেডির শাসনকাল যেমন বার্লিনে দেয়াল উঠতে দেখেছে, তেমনি রাশিয়ায় বরফ গলতেও দেখেছে। কেনেডি-ক্রুশ্চফের মিলিত উদ্যোগে নিষ্পন্ন পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ (জলে, স্থলে এবং আকাশে) নিরস্ত্রীকরণের পথে এক ঐতিহাসিক ধাপ। প্রেসিডেণ্ট রাষ্ট্রনায়কদের ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন। শুধু পশ্চিমী রাষ্ট্রনায়কগণ নয়, তিনি ক্রুশ্চফের সঙ্গেও দেখা করেছেন। হোয়াইট হাউস এবং ক্রেমলিনের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা বিখ্যাত 'হট লাইন' তাঁরই কীর্তি। তাঁর আর দু'টি কীর্তি—স্বদেশে মহাকাশ জয় এবং বিদেশে শান্তিসেনা, 'পীস-কোর' প্রেরণ।

কেনেডি, জন. এফ

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতায় বিশ্বাসী ৩৫তম মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের কাছে এশিয়া আফ্রিকার অগ্রসরমান দেশগুলোর ঋণও কম নয়। বিশেষত ভারত তাঁর আন্তরিকতা এবং উদ্যমের কাছে চিরকাল ঋণী থাকবে। গত বছর অক্টোবরে চীনা আক্রমণের পরক্ষণে বিনাসর্তে যিনি ত্বরিৎগতিতে সামরিক সাহায্য নিয়ে ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি প্রেসিডেণ্ট কেনেডি। তিনিই সেদিন তাঁর বিশেষ দূত হিসেবে হ্যারিম্যানকে এদেশে পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তী মার্কিণ সাহায্যের প্রতিশ্রুতির পেছনেও তিনিই ছিলেন অন্যতম প্রেরণা। তাঁর একাধিক বক্তৃতায় প্রেসিডেণ্ট বার বার প্রমাণ করেছেন তিনি—ভারত-বান্ধব। ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অকাতর আর্থিক সাহায্য-দানের জন্যে তাঁর আকুতি থেকে সুরু করে ভারতে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, সর্বত্র তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যম আজ প্রায় প্রবাদে পরিণত। ১৯৬১ সনের নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে ওয়াশিংটনে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে তিনি বলে-ছিলেন—মার্কিণ দেশ আজ যে আদর্শের প্রতিভূ, আপনি এবং আপনার দেশ ভারত সেই আদর্শের জীবন্ত ইতিহাস; আমি আপনাকে শ্রদ্ধাবণতচিত্তে গ্রহণ করি। পরের বছর ১৯৬২ সনের মার্চ মাসে প্রেসিডেণ্টের শুভেচ্ছার দূত হয়ে ভারতে এসে-ছিলেন—ফার্ষ্ট লেডি মিসেস কেনেডি। তারপর এ বছর জুন মাসে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মার্কিণ দেশ সফর। দুই দেশের বন্ধুত্ব প্রতিদিন বেড়েই চলেছিল। আশা ছিল, প্রেসি-ডেণ্ট কেনেডির ভারত আগমনে সেই বন্ধুত্ব পূর্ণতা লাভ করবে। প্রেসিডেণ্ট গেল জুনে ভারতের আমন্ত্রণ গ্রহণও করেছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, সে আশা পূর্ণ হল না। তার আগেই ভারত-বন্ধু বিদায় নিলেন। মনে পড়ছে ডঃ রাধাকৃষ্ণনকে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে কেনেডি বলেছিলেন—আমরা হয়ত সব সময় ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, কিন্তু নিজেদের আদর্শকে নিশ্চয়ই রক্ষা করতে পারি।

৩৫তম মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট জন ফিটজেরল্ড কেনেডির ছেচল্লিশ বছরের জীবন তারই মহৎ কাহিনী।

২৪. ১১. ৬৩

কেনেডি, জ্যাকলিন

'This year, for the first time since our predecessor selected Brenda Frazier as the Queen of Glamour, we are ready to name the No. 1 Deb of the year···Queen Deb of the year is Jacqueline Bouvier···'

যে মেয়েটিকে নিয়ে আমেরিকার ফ্যাসান-সমালোচকেরা সেদিন এমন সরগরম নিউ-পোর্টের কামরেক ক্লাবে, সেই নবাগতা অষ্টাদশী আজ দু'টি সন্তানের জননী। তাঁর বয়স এখন বত্রিশ এবং তিনি মার্কিণ প্রেসিডেন্টের গৃহিণী। 'ফার্স্ট লেডি' জ্যাকলিন তবুও যেন চলনে বলনে, ভাবে ভঙ্গীতে ফ্যাসানের রানী।

দু'বছর আগে জেনারেল দ্য গল এসেছিলেন একবার হোয়াইট হাউসে। যাওয়ার সময় জাঁদরেল জেনারেলের মুখে শোনা গিয়েছিল ফরাসীসুলভ রসিকতা: আমেরিকা থেকে কোন বস্তু আজ আমি নিজের দেশে নিয়ে যেতে পারলে যদি সত্যিই সুখী হতাম সে একমাত্র—জ্যাকলিন।

পরের বছর জুলাইয়ে 'জ্যাকি' প্যারিসে আসছেন শুনে ফরাসী দেশ যা করেছিল স্বয়ং জেসোফিনও নিশ্চয় কোনদিন তা আশা করেননি। বাধ্য হয়েই মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সেদিন নিজের পরিচয় দিতে হয়েছিল—'আই এম দি ম্যান হু একম্পেনিড জ্যাকলিন কেনেডি টু প্যারিস!' অর্থাৎ, 'জ্যাকলিন কেনেডির সঙ্গে যে ভদ্র-লোকটি প্যারিসে এসেছেন আমিই তিনি!' ফ্যাসানের রানী বহুকালের রানী-হীন দেশে সেদিন যেন মহারাণী, সম্রাজ্ঞী।

সম্রাজ্ঞী ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরক্ষণ থেকেই। কেননা, লং-আয়ল্যাণ্ডের যে সমাজে যে ঘরে ওঁর জন্ম সেখানে মানবশিশু অন্যথা জন্মগ্রহণ করে না। প্রচুর অর্থ। অভিজাত 'ফরাসী' বংশ।

কমসে কম 'জ্যাকি'র চব্বিশ জন পূর্বপুরুষ আটলান্টিক পার হয়ে এপারে এসে লড়াই করে গিয়েছেন আমেরিকার স্বাধীনতার জন্যে। একে একে সবাই তাঁরা ফিরেও গিয়েছেন নিজেদের দেশে। কিন্তু একজন ফেরেন নি। সেই ঘর ছাড়া জনৈক মাইকেল ব্যুভেয়ারের বংশের মেয়ে। ঠাকুর্দা ছিলেন মস্ত রিপাবলিকান। বাবা—ততোধিক মস্ত স্টক ব্রোকার।

সুতরাং, ছ'বছর বয়সেও নিজস্ব ঘোড়া পেয়েছিলেন জ্যাকি, বারো বছর বয়সে—নিজস্ব আস্তাবল। হ্যাঁ, জ্যান্ত ঘোড়ার আস্তাবল! তা ছাড়া, জলে প্রমোদতরী, ডাঙ্গায় টেনিস।

বয়স যখন তাঁর আঠার মিস পোর্টারের স্কুলের ছাত্রী, 'লেডিজ ভিলেজ ইমপ্রুভমেণ্ট সোসাইটির' বাৎসরিক ফ্যাসান শো'র অন্যতম ধাত্রী এবং ভাসার কলেজের বড় পড়ুয়া জ্যাকি তখন ক্লাবে ক্লাবে সুপরিচিত 'চিনেমাটির রূপসী।' সমালোচকেরা বলেন—'মেয়েটি ক্ল্যাসিকেল গড়নসম্পন্না।'

কিন্তু এত স্তুতির পরেও 'ফ্যাসানরানী'র মুখে হাসি নেই। প্রথম কারণ, নিঃসন্দেহে পারিবারিক তথা বাবা মা'র বিচ্ছেদ। কিন্তু দ্বিতীয় কারণ? ক্লাবের কেউ এই আপাত শান্তশিষ্ট মেয়েটির ভেতরের খবর নিতে পারলে নিশ্চয় একটি খবরই পেতেন সেদিন। জানতে পারতেন—এ মেয়েটি ক্লাবে আসে যায় বটে, কিন্তু ক্লাবের জীবনকে ঘরে তুলতে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই!

তা ছিল না বলেই, প্রথম পরিচয়েই প্রস্তাব উঠল। সে ১৯৫১ সনের কথা। সর্বন-ফেরত 'জ্যাকি' তখন জর্জ ওয়াশিংটন কলেজের একজন গ্রাজুয়েট। তিনি 'ওয়াশিংটন টাইমস, এবং 'হেরল্ডে'র হয়ে ছবি তোলেন, রিপোর্ট লেখেন। তিনি—রিপোর্টার! আর কেনেডি? ম্যাসাচুসেটস থেকে তিনি সেনেটে বিখ্যাত ডেমোক্র্যাট প্রার্থী। সেই উপলক্ষেই পলিটিসিয়ান আর তরুণী রিপোর্টারের প্রথম সাক্ষাৎকার! তারপর অনেক রেস্তোরাঁ, অনেক উপহার (বই), অনেক সিনেমা, এবং একটিমাত্র পোস্টকার্ড শেষে অবশেষে '৫৩ সনের সেপ্টেম্বরে চার্চ! চার্চেই সেই বিখ্যাত দুই ছত্রের পোস্টকার্ডখানা দেখিয়েছিলেন—জ্যাকি। বলেছিলেন—দু'বছরে জ্যাকের একমাত্র চিঠি!

তারপর আরও কয়েকটা বছর কেটে গেছে। হোয়াইট হাউসের গৃহিণী এখন দেশে দেশান্তরে রূপকথার রানী। যেখানে তিনি সেখানেই হাসি। আশা ছিল এবার আমরাও সে হাসিতে যোগ দিতে পারব কেননা, উপর্যুপরি খবর ছিল শ্রীমতী কেনেডি ভারতে আসছেন এবং এ মাসেই। কিন্তু 'পুনশ্চ' হিসেবে এবার শোনা গেল তিনি অচিরে আসছেন না। মার্চ তক যাত্রা স্থগিত।—কেন? কারণ স্বরূপ বলা হয়েছে

শ্বশুরের অসুখ। লোকেরা বলছে—হ্যাঁ, সে জ্বরকেই বলে 'পলিটিক্যাল ফিভার'। আসল কারণ নির্ঘাৎ—গোয়া!

তর্ক অনাবশ্যক। অবান্তরও। তবুও নেহাৎ হাসিটা মার গেল বলেই সেই বাক্যটি শোনাচ্ছি 'জ্যাক' প্রেসিডেন্ট হওয়ার দিনে হাসতে হাসতে, কাঁদতে কাঁদতে জ্যাকি জগতকে যা শুনিয়েছিলেন। মার্কিণ প্রেসিডেন্টের পত্নী সেদিন বলেছিলেন '—আই ফিল এজ দো আই হ্যাড জাস্ট টার্নড ইনটু এ পিস অব পাবলিক প্রপার্টি!'

'জ্যাকি'র প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি।

৪. ১. ৬২

কৈরালা, বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ

বিচিত্র দেশ নেপাল। শাসনতান্ত্রিকপ্রধান সেখানে রাজা। কিন্তু এই সেদিন ('৫১) অবধিও হিমালয়ের কোলে ঐ ছোট্ট দেশটিকে (৫৪ হাজার বর্গমাইল) যিনি শাসন করতেন তিনি রাজা নন,—রাণা;—রাজ্যের বংশানুক্রমিক প্রধান মন্ত্রী। রাজা ত্রিভুবন নিজে বিদ্রোহ করে প্রথমবারের মত নেপালকে আধুনিক যুগের আহ্বান শুনিয়েছিলেন। সে নাটকীয় কাহিনী আজ ইতিহাস।

নেপাল আজ আধুনিক দেশ। ত্রিভুবন সেদিন স্বদেশ ছেড়েছিলেন ভারতীয় বিমানে। নেপালের প্রধানমন্ত্রী কৈরালা ভারতে এলেন তাঁর নিজের দেশের বিমানে। ভারতের সঙ্গে যোগাযোগকারী আশী মাইল দীর্ঘ পথটি আজ সম্পূর্ণ। নদী উপত্যকা পরিকল্পনার কাজ সুরু হচ্ছে, গ্রামে গ্রামে স্কুল বসছে। নেপাল এখন আধুনিকতার পথে। ক'বছর আগেও ইনকামট্যাক্স সম্পর্কে কোন কথা জানতেন না ওখানকার অর্থবান ভূস্বামীরা। নির্বাচন, আইন, আইনের শাসন—ইত্যাদিও ছিল তাদের কাছে অজ্ঞাত জিনিস। আজ নেপালে তার সবই আছে। নিজেদের ব্যাঙ্ক, নিজেদের মুদ্রা, করনীতি···। এবং সবচেয়ে বড় জিনিস গণতান্ত্রিক শাসন।

নেপালের লোকসংখ্যা মোটে এক কোটি। কিন্তু উনত্রিশটি রাজনৈতিক দল সেখানে। দল আর দলাদলিতে ক'বছর অনিবার্যভাবেই অস্থির শাসন চলল সেখানে। অবশেষে এল '৫৯ সনের ফেব্রুয়ারীতে বহু অভিপ্রেত নির্বাচন। এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক স্থিতিও।

নেপালের এই রাজনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তনে ভারতের প্রভাব কতখানি সে হয়ত গবেষণার বিষয়, কিন্তু তরুণ নেপাল যে ভারতের হাতে গড়া তার উদাহরণ আজকের নেপালের প্রধান-মন্ত্রী স্বয়ং। কে. আই সিংয়ের যেমন অনেক আত্মীয়বন্ধু এখনও পাটনায় রয়েছেন, কৈরালা ভ্রাতৃদ্বয়ের বন্ধুরাও তেমনি ছড়িয়ে আছেন গোটা উত্তর এবং পূর্ব ভারতে। বিশেষ করে, প্রধানমন্ত্রী বিশ্বেশ্বর প্রসাদের সঙ্গে একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করেছেন, কলেজ স্ট্রীটে চা খেয়েছেন এমন মানুষ কলকাতায় অনেক।

ছাত্রজীবনে কৈরালা ছিলেন ভারতের তৎকালীন তরুণদের মতই জাতীয়তাবাদী। তবে তাঁর মনের মিল বেশী পেতেন তিনি সোশ্যালিস্ট-দের আড্ডায়। '৪২ সালে কংগ্রেস এবং সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে একযোগে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন করেছেন মাতৃকাপ্রসাদ এবং তাঁর ছোটভাই বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ। দুই ভাই এক সঙ্গে স্বপ্ন দেখেছেন কবে ভারত স্বাধীন হবে; কবে নেপাল মুক্ত হবে।

ত্রিভুবন ভারতে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলেন সেই মুক্তির দূত হয়ে। স্বদেশ থেকে নির্বাসিত মাতৃকাপ্রসাদ কৈরালা অতঃপর নিযুক্ত হয়েছিলেন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। এবার ছোটভাই বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ হলেন নেপালের প্রথম নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী।

তরুণ বিশ্বেশ্বরপ্রসাদের সঙ্গে প্রতিবেশী ভারতের যেমন অনেকদিনের আত্মীয়তা—প্রবীণ হিমালয় দুহিতা নেপালের সঙ্গেও তেমনি। নতুন যুগের পটভূমিকায় কৈরালা যদি এই বন্ধনকে আরও দৃঢ়তর করে তুলতে পারেন তবে সে-ই হবে ইতিহাসের নিয়ম পালন। [দ্রষ্টব্য: মহেন্দ্র, রাজা] ২৩. ১. ৬০

কোজলফ, ফ্রল রোমানিভিচ

বছর কয় আগে হ্যারিম্যানকে নাকি ক্রুশ্চফ নিজেই বলেছিলেন কথাটা। আলাপ করিয়ে দিয়ে কানে কানে বলেছিলেন—আমার উত্তরাধি-কারী। ক'মাস পরে, ১৯৫৯ সনের জুনে নিউইয়র্কে চেপে ধরেছিলেন সাংবাদিকেরা,—ভবিষ্যতে আপনিই নাকি ক্রুশ্চফের আসনে বসছেন?

—সে কি কথা! চমকে উঠে-ছিলেন ক্রেমলিনের দ্বিতীয় পুরুষ। —কমরেড ক্রুশ্চফকে আমি ভাল করেই জানি। তাঁর চমৎকার শরীর,— তিনি অনেক, অনেক দিন বাঁচবেন।

বাঁচবেন হয়ত। বুলগানিন-ভরো-

শিলফ, জুকফ-ম্যালেনকফ অনেকেরই তবিয়ত অন্তত এখনও বহাল। কেননা, সাম্যবাদ সাবালক হয়েছে, ওদেশে গোরে পাঠাবার রীতিও ক্রমশ বদলাচ্ছে। কিন্তু যাকে বলে রাজনৈতিক মরণ? শোনা যাচ্ছে সেই অবসান আজ ক্রুশ্চফকে ধীরে ধীরে ঘিরে ফেলছে, ক্রেমলিনে আবার কানাকানি সুরু হয়েছে। পূর্বাভাস—নায়কের আয়ু আর বেশী অবশিষ্ট নেই। এবং এবার তাঁকে যিনি গদীচ্যুত করতে চলেছেন তিনি 'কবর' থেকে উঠে আসা জঙ্গী জুকফ নন,—কট্টর সংহিতাকার সুসলফও নন,—তিনি সেই প্রিয় সখা একদা ক্রুশ্চফ নিজেই যাঁকে গোকুল থেকে মথুরায় ডেকে এনেছিলেন।

নাম—কোজলফ। পুরো নাম—ফ্রল রোমানিভিচ কোজলফ। বয়স—পঞ্চান্ন। উচ্চতা—পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। ওজন—১৭৬ পাউণ্ড। ক্রেমলিনে সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ। পোশাকে-আশাকেও সবচেয়ে ফিট-ফাট, চালচলনে সবচেয়ে কেতাদুরস্ত। ভাল জামাকাপড় ভালবাসেন। সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধিয়েছেন। 'টাই'-এ জড়োয়া পিন পরেন। শক্ত কথাও হাসি মাখিয়ে বলতে পারেন। দেখে একজন মার্কিন সেনেটর বলেছিলেন—এ কাইণ্ড অব বুর্জোয়া বলশেভিক! সানফ্রান্সিসকোর এক কারবারী বলেছিলেন—চমৎকার সেলসম্যান।—আহা, ভদ্রলোক যদি আমার ফার্মে কাজ করতেন!

কথাটা অসত্য নয়। কোজলফ কাজের মানুষ। কিন্তু এ খবরটা আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র সেদিন,—১৯৫৭ সনের জুন মাসে। তার আগে কোজলফ রাশিয়ার বাইরে ত বটেই স্বদেশেও খুব সুপরিচিত মানুষ নন। জন্ম—মস্কো থেকে দেড়শ' মাইল দূরে এক গাঁয়ে। বাবা চাষী ছিলেন। ন'টি ভাই বোনের মধ্যে পাঁচটি মারা গেছে অকালে—না খেতে পেয়ে। দুটি যুদ্ধে। সবেধন নীলমণি এই ছেলেটি বেঁচে ছিল (আর বেঁচে আছেন এক বোন)—কারণ পনের বছর বয়সে সে কারখানায় ঢুকেছিল। সেইখানেই পার্টিতন্ত্রে দীক্ষা এবং লেখাপড়া,—শিক্ষা। পার্টি থেকেই ওঁরা ওঁকে লেনিনগ্রাদ পাঠিয়েছিলেন ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। পড়েছেনও। কোজলফ যন্ত্রবিজ্ঞানের একজন সম্পূর্ণ ইঞ্জি-নীয়ার। যুদ্ধের সময় ইস্পাত কার-খানায় কাজ করতেন। পার্টিতে তখন খ্যাতি তাঁর প্রধানত লেনিনগ্রাদের কর্মী হিসেবেই। সেখানে নেতা

হয়েছেন তিনি কুখ্যাত 'লেনিনগ্রাদ-কেস'-এর ('৪৮-'৪৯) পরে,—ঝানফ-এর বিচার শেষে। '৫৩ সনের মার্চে স্তালিন মারা গেলেন। সেপ্টেম্বরে ক্রুশ্চফ পার্টিতে গদীয়ান হলেন, নভেম্বরে কোজলফ মনোনীত হলেন—লেনিনগ্রাদ-প্রধান। কোজলফ সেই থেকেই ক্রুশ্চফের অন্তরঙ্গ সহচর। এ বন্ধুত্ব আরও ঘন হল—'৫৭ সনের 'অ্যান্টি পার্টি ষড়যন্ত্র' দিনে। ক্রুশ্চফের সমর্থনে কোজলফই ছিলেন সেদিন অন্যতম বল। বিরোধীদের নাম দিয়েছিলেন তিনি—'টালমুডিস্ট'—গোঁড়ার দল। লোকে বলে এ সমর্থনের পেছনে হু'টি কারণ ছিল। প্রথম কারণ,—স্তালিনের আমলে নিজেও কিছুদিন বন্দীশিবিরে কাটিয়েছিলেন তরুণ বলশেভিক কোজলফ। দ্বিতীয় কারণ—কারখানা থেকে ইঞ্জিনীয়ারকে অনেকদিন খামারে দ্বীপান্তরী করে রেখেছিলেন ম্যালেনকফ। ক্রুশ্চফ তাঁকে উদ্ধার করেছেন। তিনি তাঁকে শুধু খামার থেকে প্রেসিডিয়ামেই তুলে আনেননি, দেশের ফার্স্ট ডেপুটি প্রিমিয়ারের ক্ষমতা দিয়েছেন। এ পদে হু'জন আছেন। একজন মিকোয়ান, আর একজন কোজলফ। কিন্তু সরকারী কাগজপত্রে দ্বিতীয়জনই প্রথম। ক্ষমতায়ও। হালে যত কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ-বদলী অদল-বদল—সবই করছেন নাকি কোজলফ।

চিরকালের দরবারী নিয়ম। অবশেষে প্রভুর পালা। ক্রেমলিনের নিয়োগ-বদলীর কর্তা নাকি এবার নিজেই প্রভু হতে চলেছেন। খবরটা হয়ত সত্য, হয়ত অসত্য। কিন্তু অভাবিত নয়। কেননা, সেদিন অবধি অজ্ঞাত থাকলেও কোজলফ আজ আর স্বদেশে অখ্যাত মানুষ নন। রাজ্যে রাজ্যে পার্টিতে পার্টিতে তাঁর আজ বহু অনুচর। তাঁরা ক্রুশ্চফের সব কিছুর বিরুদ্ধে নন। বিশেষ করে চীন প্রসঙ্গে নাকি তাঁরা সবাই দলপতির সঙ্গে একমত। কিন্তু দেশের ভেতরে বরফ গালাবার কাজে নয়। কোজলফ সেক্ষেত্রে গোঁড়াদের মুখপাত্র। ক্রুশ্চফের চেয়ে তিনি দজ্জাল সংস্কৃতি-মন্ত্রী মাদাম ফুর্ৎসেবার অধিকতর ভক্ত।

বিতর্কটা প্রকাশ্য হয়েছিল মাস কয় আগে। হাতে একটা পাণ্ডুলিপি নিয়ে ক্রুশ্চফ ঘোষণা করলেন—কমরেডস, এটি আলেকজান্দার সোলজেনিৎসিন-এর লেখা সেই বইটি। আমি এটি ছাপতে দিতে চাই।

বইটির কথা সবাই শুনেছেন। নাম—'ওয়ান ডে ইন দি লাইফ অব

আইভান দেনিসোভিচ'। বিষয়ঃ স্তালিন আমলের বন্দীজীবন। প্রেসিডিয়ামের সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি সুরু করলেন। কোজলফ উঠে দাঁড়ালেন—এতটা কি ঠিক হবে? রেগে আগুন হয়ে উঠলেন ক্রুশ্চফ,—বন্ধুগণ, স্তালিনের কথা উঠলেই আমরা এমন মিইয়ে যাই, কারণ, আমাদের সকলের মধ্যেই এখনও কিছু না কিছু স্তালিনের ভগ্নাংশ রয়ে গেছে।—কমরেডস, আমার কাছে এই পাণ্ডুলিপিটির কুড়িটি কপি আছে, আপনারা পড়ে দেখুন।

ওঁরা পড়েছিলেন। এবং পড়া শেষে ক্রুশ্চফকে সমর্থনও করেছিলেন। কিন্তু কোজলফ খুশী হতে পারেন নি। বিশেষ করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 'কিউবা' এল, এবং সেই দুশ্চিন্তাক্ষণেই এই বইটি উপলক্ষ্য করে রাশিয়ার শিল্পী-সাহিত্যিক মহলে দেখা দিল—'নবজীবনের জোয়ার।' সুতরাং, প্রভুকে শিক্ষা দিতে মনস্থ করলেন তাঁর প্রিয় অনুচর। তিনি একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। এবং ক্রুশ্চফকে আমন্ত্রণ করলেন সেখানে পদধূলি দিতে। ফলাফল আজ সর্বজনবিদিত। ক্রুশ্চফ একটি ছবির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন—যেন গাধার লেজে আঁকা! পাশে দাঁড়িয়ে তখন মনে মনে হাসছিলেন কোজলফ।

আপাততঃ এভাবেই লড়াই চলছে। বলা যায়না অদূর ভবিষ্যতে এ লড়াই কি চেহারা নেবে। কেননা, পর্যবেক্ষকেরা বলেন শুধু ক্রুশ্চফের মত উদর নয়, ওঁর পেটে উচ্চাকাঙ্খাও আছে। অবশ্য, শরীরটা যদি শেষ পর্যন্ত ভাল থাকে। উল্লেখযোগ্য '৬১ সনে একবার 'স্ট্রোক' হয়ে গেছে ওঁর। ২৫. ৫. ৬৩

কোঠারি, ডঃ দৌলত সিং

পড়েছেন অনেক জায়গায়।

জন্মস্থান উদয়পুরে, ইন্দোরে, এলাহাবাদে। এমন কি কেম্ব্রিজে পর্যন্ত। কিন্তু তবুও নিজে বললেন—'আমি ডঃ মেঘনাদ সাহার ছাত্র।'

কেননা, দৌলত সিং কোঠারির খ্যাতি যা সে পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবেই। এবং বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখায় তাঁর আকর্ষণের কারণ যিনি তিনি এলাহাবাদের তৎকালীন ফিজিক্স টীচার,—ডঃ মেঘনাদ সাহা।

মাত্র বাইশ বছর বয়স তখন। এলাহাবাদের কৃতী ছাত্র দৌলত সিং পাশ করে বের হতে না হতেই বিশ্ববিদ্যালয় কাজ দিয়ে দিল তাঁকে।

কেননা, এই ছেলেটিকে হাতছাড়া করা ঠিক নয়!

'৩৪ সনে এলাহাবাদ থেকে দিল্লি চলে এলেন কোঠারি। তারপর '৪৮ সনে এলেন দেশরক্ষা দপ্তরে। অবশ্য পূর্বপদ না ছেড়েই। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ কোঠারি তখন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। পদার্থবিজ্ঞানে তিনি কেম্ব্রিজ থেকে 'ডক্টরেট' পেয়েছেন এবং নানা দেশে তাঁর স্থির প্রতিষ্ঠা। কারণ, কোঠারিই প্রথম বৈজ্ঞানিক যিনি প্রমাণ করেছেন—'অণু'কে কেবলমাত্র চাপ সাহায্যেও ভাঙা সম্ভব! এ তত্ত্ব ছাড়াও সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে তাঁর অনেক উল্লেখযোগ্য দান। সুতরাং, দেশ স্বাধীন হওয়ামাত্র কোঠারি নিযুক্ত হলেন ভারত সরকারের অন্যতম বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ভারত সরকার প্রকাশিত 'নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোসান' নামক বিশ্বখ্যাত বইটির তিনিই লেখক।

এবার ভারতের সেই বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত হলেন 'ইউনিভারসিটি গ্রাণ্ট কমিশনের' সভাপতি। এ সংবাদ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই আনন্দের। বিশেষত ডঃ কোঠারিই এই আসনটিতে প্রথম ব্যক্তি যিনি সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক। দ্বিতীয়ত, আরও উল্লেখযোগ্য, এবারও নূতন দায়িত্ব গ্রহণ করছেন তিনি পুরানোটি বহাল রেখেই। সুতরাং আপাতত অন্তত আমাদের সেই নিরলস গবেষকটিকে হারাবার সম্ভাবনা নেই। ৯. ৩. ৬১

[১৯৬৪ সনের ১৬ই জুলাই তারিখে ভারত সরকার একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ডঃ কোঠারি সেই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন। কমিশনে মোট সদস্য আছেন ১৫ জন। সরকার সমীপে তাঁদের বক্তব্য পেশ করার শেষ তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছে ১৯৬৬ সনের ৩১ শে মার্চ।]

কোসিগিন, আলেক্সি

হেডলাইনটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। ছাপা হয়েছিল রাশিয়ার উদ্যোগে প্রকাশিত একটি বাংলা সাময়িকীতে। সম্ভবত বুলগানিন-ক্রুশ্চভের ভারত সফরের সময়ে। ওঁরা সেদিন লিখেছিলেন—এই দুই মহান দেশের 'বন্ধুত্ব গড়িয়া ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে...!'

যদিচ পোষাক পরিবর্তনের ফলে

কিঞ্চিৎ কিম্ভূত, তবুও এই 'ক্রমে ক্রমে' কথাটা সেদিন বড্ড ভাল লেগেছিল। বন্ধুত্বেও 'ক্রমশ' আছে বৈ কি!

এবার তা নিশ্চয় সম্পূর্ণ হল। অন্তত পক্ষে, নিশ্চয় আরও বাড়ল। কেননা, এবার আরও একটা গাঁট পড়ল। যিনি পরালেন তাঁর নাম—আলেক্সি নিকোলায়েভিচ কোসিগিন। সংক্ষেপে—কমরেড কোসিগিন।

বলা যেতে পারে জাত কমিউনিষ্ট। কারণ, তাঁর জন্মের বছরই রাশিয়ায় প্রথম বিপ্লব। অবশ্য মহাবিপ্লবেরও সেটা শৈশব মাত্র। অবশেষে '১৭ সনের নভেম্বরে যখন শুরু হল সেই তুমুল ঝড়—কোসিগিন তখনও কিশোর। তাঁর বয়স তখন মাত্র বার।

বার যখন বাইশে পৌঁছাল তখন কোসিগিন পাকাপোক্ত পার্টিম্যান। তবে সরকারী খাতায় এখনও নাম ওঠেনি তাঁর। সে যখন উঠল তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।

১৯৪৩ সন। রাশিয়ান সোবিয়েত ফেডারেল রিপাবলিক তথা পনেরটি রিপাবলিকের বৃহত্তমটির অন্যতম বিশিষ্ট ডেপুটি কমিশনার কোসিগিন নির্বাচিত হলেন তাঁর নিজ রাজ্যের ভাইস-চেয়ারম্যান।

তারপর থেকে কেন্দ্রে এবং ক্রমাগত উপরের দিকে। সোবিয়েত দেশের বর্তমান উপ-প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে পহেলা নম্বর, কমরেড কোসিগিন ইতিমধ্যে যে সব পদ অলঙ্কৃত করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : বস্ত্র-শিল্পের কমিশার, সোবিয়েত অর্থনৈতিক পরিষদের ভোগ্যপণ্য বিভাগের চেয়ারম্যান, এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-পরিষদে ডেপুটি মন্ত্রিত্ব। কোসিগিন ১৯৪৬ সন থেকে মন্ত্রিপরিষদের একজন চেয়ারম্যান বা ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী। '৫৩ সনের ডিসেম্বর অবধি তাঁর দপ্তর ছিল—খাদ্য এবং লঘুশিল্প। তারপর থেকে তিনি আরও গুরুতর মানুষ। কোসিগিন এখন সোবিয়েত দেশের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী। তদুপরি, তিনি পলিটব্যুরোর একজন বিশিষ্ট সদস্য।

রুশ নায়ক সস্ত্রীক কলকাতা ঘুরে গেলেন। এবার ওঁরা সঙ্গে এনেছিলেন নতুন ছয় দফা চুক্তি, আরও ষাট কোটি টাকা! আর এনেছিলেন—অপরিমিত হাসি, ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে—'হিন্দী-রুশী ভাই ভাই!' সে ভাষা শুনলে মনে হয়, এ বন্ধুত্ব সত্যিই বোধ হয় কোনদিন ভাঙবার নয়। ২. ৩. ৬১

কৃপালনী, আচার্য জে. বি.

'আই চার্জ হিম উইদ্ ওয়েষ্টিং দি মানি অব এ পুওর স্টার্ভিং নেশন, আই চার্জ হিম উইদ্ দি নেগলেক্ট অব দি ডিফেন্স অব দি কানট্রি···, আই চার্জ হিম উইদ্ হ্যাভিং লেণ্ট হিজ সাপোর্ট টু টোটালিটেরিয়ান রেজিম্স্ এগেনস্ট দি উইল অব দি পিপল, আই চার্জ হিম··· !'

লক্ষ মানুষের মুখের সামনে তর্জনী তুলে যে দীর্ঘকায় মানুষটি কথাগুলো বলেছিলেন তিনি কোন 'বার্ক' নন। কিন্তু বার্ক-শেরিডনের অশরীরী আত্মা যেন সেদিন তাঁর কণ্ঠে, কৃশ দেহে, কালো কালো গভীর দুটি চোখে। কিন্তু তবুও তদানীন্তন হেষ্টিংসকে রোখা যায়নি। কেননা, চৌপট্টির অদূরেই ছিল গোয়া। এবার বোধ হয় প্রমাণ হয়ে গেল একটি রোহিলা যুদ্ধই সব নয়। বিশেষ, অভিযোগগুলো যদি সত্য হয়, এবং অভিযোগকারী যদি বার্ক হন;—কিংবা আচার্য কৃপালনী।

ভাল বক্তা। বার্ক না হলেও পার্লামেণ্টে স্বীকৃত ব্যাঘ্র, ধারে এবং ভারে দোসর পাওয়া ভার। ভাল কলম। একগাদা সারবান বইয়ের লেখক,—তার প্রত্যেকটি যে কোন গান্ধীবাদী বা গণতন্ত্রীর অবশ্য পাঠ্য। তার চেয়েও বড় কথা—ব্যক্তিত্ব। পঁচাত্তর গ্রীষ্মের দহন পোহান এই জ্ঞানবান মানুষটি নিষ্ঠায় এবং স্পষ্টতায় অদ্বিতীয়। আপস কাকে বলে আচার্য কৃপালনী অন্তত তা জানেন না।

বাঘের পিঠে চড়েছেন বলতে গেলে রুশ বিপ্লবের আগে। রাশিয়ায় যখন বিপ্লব হচ্ছে কৃপালনী তখন চম্পারণে সত্যাগ্রহ করছেন। ওঁদের লড়াই যখন অর্দ্ধশতক পূর্ণ করতে চলেছে কৃপালনী তখনও লড়িয়ে,—তাঁর এখনও বিরাম নেই।

প্রখ্যাত ছাত্র। দুটো বিষয়ে—এম. এ। ইতিহাস এবং ইকনমিকস-এ। কাজ করতেন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। অর্থাৎ বিহারের কোন কলেজে। পাঁচটা বছরও সুস্থিরভাবে কাটান গেল না। সতের সাল এসে কলেজের দরজায় হানা দিল। চম্পারণ, মহাত্মা গান্ধী। কৃপালনী গান্ধীজীর সঙ্গ নিলেন। বিহার থেকে সোজা গুজরাট। ঘুরে ফিরে—বেনারস।

তরুণ কৃপালনী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের একান্ত-সচিব ('১৮)। পরের বছর মালব্য বললেন—তোমাকে আমার এখানে পড়াতে হবে! কৃপালনী

বললেন—আচ্ছা, তাই হবে। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি পলিটিকস পড়ানোর কাজে লেগে গেলেন।

কিন্তু রাজনীতিতে যিনি একবার চিন্তার স্বাদ পেয়েছেন বইয়ের পাতায় তাঁর আর মন বসবার কথা নয়। কৃপালনীও যথারীতি উড়ো-উড়ো হয়ে উঠলেন। ছেলে পড়ানো ছেড়ে তিনি সুতো কাটা ধরলেন। বোঝা গেল, চম্পারণের সেই ফকির তাঁর মন কেড়ে নিয়ে গেছেন।

কিন্তু গান্ধীজী বললেন—শুধু গ্রামোদ্যোগ নয়, তোমাকে পড়াতেও হবে জগৎরাম। কৃপালনী আবার অধ্যাপনায় লাগলেন। এবার তিনি আচার্য। গুজরাট বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ।

পাঁচ বছর ছিলেন একাজে ('২২-'২৭)। তারপর অসহযোগ আন্দোলন, কংগ্রেস, কারাবাস। নবম-বারের মত '৪২ সনে জেলে চললেন কৃপালনী। নিখিল ভারত কংগ্রেসের তখন তিনি সম্পাদক ('৩৪-'৪৬)।

'৪৫ সনে ছাড়া পাওয়া গেল। পরের বছর মীরাটে কংগ্রেস। আচার্য জগৎরাম ভগৎকিশোর কৃপালনী নির্বাচিত হলেন সভাপতি।

বিরোধের ইঙ্গিত সভাপতির ভাষণেই ছিল। ক' মাসের মধ্যেই তর্কটা প্রবল হল। অক্টোবরে আসনে বসেছিলেন। পরের বছর নভেম্বরেই পদত্যাগ করলেন কৃপালনী। তাঁর মতে —কংগ্রেস পার্টি এবং কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট সেই পার্টি নিয়ন্ত্রিত একটি যন্ত্র,—ইনষ্ট্রুমেণ্ট মাত্র! কংগ্রেস সরকার তত্বটা মানলেন, কিন্তু মন্ত্রীরা গদীহীন নেতাদের যখন তখন মানতে রাজী হলেন না।

সুতরাং, আচার্য কৃপালনী প্রথমে সেই দাবীতে 'দলের ভেতরে দল গড়লেন। '৫১ সনে গঠিত হল তাঁর ডেমক্রিটিক ফ্রণ্ট। আগের বছর বেরিয়ে গেছে ফ্রণ্টের বাহন।—'ভিজিল।'

কিন্তু সংস্কার যেন তবুও অসম্ভব। কৃপালনী দলত্যাগ করলেন। নতুন দল গড়ে উঠল দেশে। নাম—কৃষাণ মজদুর প্রজা পার্টি। উদ্দেশ্য—সমাজতন্ত্র, শ্রেণীহীন সমাজ। সমাজতন্ত্রীরা বললেন আমরাও দলে আছি। দল নাম পাণ্টাল। এবার থেকে তারা প্রজা সোসালিষ্ট পার্টি। '৫৪ অবধি আচার্য কৃপালনী ছিলেন পার্টির চেয়ারম্যান।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বন্ধনও কাটাতে হল। কেননা—আদর্শ প্রশ্ন। এবং সে প্রশ্নে আচার্য চিরকালের মত এখনও আপসহীন। তিনি দল ছাড়তে রাজী, কিন্তু মত ছাড়তে কভি নেহী।

কৃপালনী, সুচেতা

বোধ হয় আমরোহার মাঠে আবার প্রমাণ হল দলহীন হয়েও আচার্য নিঃসঙ্গ পথিক নন। ক'মাস বাইরে থেকে আবার তিনি পার্লামেন্টে ফিরে এলেন। এ প্রত্যাবর্তন ঐতিহাসিক। শুধু দেশের পক্ষে নয়, আমাদের পার্লামেন্টের জীবনেও। কেননা, গণপরিষদের আমল থেকে তিনি শুধু সেখানে মূল্যবান ব্যক্তিত্ব নন, আচার্য কৃপালনীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি প্রয়োজন হলে বলতে পারেন—ক্ষেত্রবিশেষে স্ত্রী স্বাধীনতা বিপজ্জনক। প্রমাণ—আমার স্ত্রী !

২২.৯.৬৩

কৃপালনী, সুচেতা

"Courageous as a lioness, she made herself feared and respected······even by the toughs of the locality."

শ্রীপ্যারেলাল-এর কথা। কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

স্ত্রী নোয়াখালি যাত্রার আগে স্বামীর কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন একটি বিষের কৌটো। আচার্য বলে দিয়েছিলেন—দরকার হলে ব্যবহার করো। তার দরকার হয়নি। কিন্তু হতে পারতো—

খবরটা জানালেন আচার্য কৃপালনী। সাংবাদিকদের কাছে তিনি জানালেন নোয়াখালি থেকে তিনি সুচেতার লেখা একটা চিঠি পেয়েছেন। তাতে তিনি জানিয়েছেন দত্তপাড়ার কাছাকাছি কোন গ্রামে থাকাকালে গুণ্ডারা তাঁকে অপহরণ করার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। কেননা, সুচেতা জানিয়েছেন, তার আগেই একজন দল-ভঙ্গ দিয়েছে। সে সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে।

দাঙ্গায় নোয়াখালিতে গান্ধীজির পরেই দ্বিতীয় খবর—শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী। গান্ধীজি তখনও নোয়াখালি যাননি। সুচেতা তখন একাকী নোয়াখালি এবং ত্রিপুরায়। তাঁর মুখের কথা তখন নোয়াখালির একমাত্র নির্ভরযোগ্য সংবাদ। কেননা অন্যদের কাছে যা অনুমান, তাঁর কাছে তা অনুভব। কংগ্রেস সভাপতি ব্যাপক ধর্মান্তকরণের এবং নারী নিগ্রহের সংবাদ সমর্থন করেন। কারণ, কৃপালনী বলেন—সে খবর সুচেতার দেওয়া। মেয়েরা নিজের মুখে মিসেস কৃপালনীকে তা বলেছে।

সুচেতা 'কৃপালনী' হয়েছে ১৯৩৭ সনে। তার আগে ছিলেন তিনি—

সুচেতা মজুমদার। বাবা ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন বহির্বঙ্গে খ্যাতনামা বাঙ্গালী চিকিৎসক। তাঁদের আদি ভদ্রাসন ছিল নদীয়ায়। সুচেতার এক ভাই শ্রী এস. এন. মজুমদার বিখ্যাত আই.সি.এস.। আর এক ভাই প্রখ্যাত গান্ধী-শিষ্য শ্রীধীরেন মজুমদার এখন সর্বোদয় নায়ক। বাবা প্রবাসী, সুতরাং, মেয়েকে ভর্তি করতে হল প্রথমে লাহোরে, তারপর দিল্লিতে। সুচেতা বি. এ. পরীক্ষায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়েছিলেন, এম-এতেও (ইতিহাসে) প্রথম হলেন —দিল্লিতে। সুতরাং, বেনারস হিন্দু বিদ্যালয় সাগ্রহে ডেকে নিল তাঁকে। '৩১ সনে মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে (জন্ম ১৯০৮) সুচেতা লেকচারার নিযুক্ত হলেন বেনারসে। বিখ্যাত গান্ধীপন্থী সিন্ধি অধ্যাপক কৃপালনীও তখন সেখানে। দু'জনের বয়সের ব্যবধান প্রায় কুড়ি বছর। তবুও দৃষ্টিভঙ্গীর মিল দু'টি মানুষকে অচিরেই কাছাকাছি করল। কৃপালনী স্বেচ্ছায় বিয়েটা দেড বছর পিছিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ তাঁর 'বন্ধু' জওহরলাল তখন কারাগারে। (আচার্য তাঁকে চিঠিতে লিখছেন— 'যেক্ষেত্রে এই অনুষ্ঠানে আর কেউই উপস্থিত থাক বলে আমি চাইনি, সেক্ষেত্রে আমি চেয়ে ছিলাম তুমি উপস্থিত থাকবে। আমার বয়সের কথা ভেবে স্বভাবতই সুচেতা যদিও আর অপেক্ষা করতে চাইছিল না, তবুও সে আমার মনোভাব বুঝেছিল ও মেনে নিয়েছিল।')

'৩৯ সনে অধ্যাপনায় ইতি পড়ল। সুচেতা রাজনীতিতে এলেন। অন্যতম প্রেরণা পরিবার এবং জে. বি. সন্দেহ নেই—কিন্তু তার চেয়েও বড় প্রেরণা- দেশ।

সুচেতা কৃপালনীর দেশপ্রেম আজ বহু পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত। '৩৯ সনেই তিনি কংগ্রেসের বৈদেশিক দপ্তরের সম্পাদিকা নিযুক্ত হলেন। পরের বছর কারাগমন। তিন বছর ছেদ দিয়ে আবার। অন্তর্বর্তী সময়টুকু তিনি ছিলেন কংগ্রেসের মহিলা দপ্তরের সম্পাদিকা।

'৪৫ সনে ছাড়া পেলেন সুচেতা। '৪৭ সনে অন্যরা সকলে। '৪৮ থেকে '৫১ সন অবধি একটানা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পদে। '৫২ সনে এলেন লোকসভায়। ফাঁকে ফাঁকে কখনও 'য়ুনো', কখনও গণপরিষদ, কখনও কস্তুরবা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। তবে সব সময় কংগ্রেসী হিসেবে নন।

কৃষ্ণমাচারী, টি. টি.

আচার্য কৃপালনী তখন কংগ্রেস ত্যাগ করেছেন। সঙ্গে সুচেতাও। তখন তিনি কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি, এবং পরে প্রজা সোসালিস্ট পার্টির নেত্রী। কৃপালনী আর ফিরলেন না। কিন্তু '৫৭ সনে কংগ্রেস আবার ফিরে পেল সুচেতাকে। তিনি কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেত্রী। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যা এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদিকা। লোকসভায়ও তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধি।

তবে রাজধানীর বাইরে পরিচয় তাঁর তার চেয়েও বড়। বাংলার মেয়ে সুচেতা ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে—ন্যায়বতী নেত্রী। সাহস এবং সততায় তিনি সিংহী।

১৯৬০ সনে দিল্লি ছেড়ে লক্ষ্ণৌ ঠিকানা করেছিলেন শ্রীমতী কৃপালনী। তখন তিনি উত্তর প্রদেশ মন্ত্রিসভায় অন্যতম বিশিষ্ট মন্ত্রী,—শ্রমদপ্তর তাঁর হাতে। এখন তিনি ভারতের এই বৃহত্তম রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী।

২৬. ৯. ৬৩

কৃষ্ণমাচারী, টি. টি.

'টি. টি. কে. নামে এক ছেলে,
চড়তো ঘোড়া, চলতো অবহেলে।
ঘোড়া বলে আর পারিনে
একটুকরো খড় ফেল
টি. টি. কে বলে চল বেটাছেলে!'

পদ্য হিসেবে উদ্ভট হলেও লক্ষ্যটি সুস্পষ্ট,—সুনির্দিষ্ট। এটি শোনা গিয়েছিল কোন নির্বাচনী সভায় নয়, ভারতীয় লোকসভায়। এবং শোনা গিয়েছিল ঠিক এমনি সময়ে, দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের আগে আগে। পাঠক ছিলেন—শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। লেখক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁরা দু'জনেই সেদিন আশঙ্কা করেছিলেন—ভারতীয় অর্থ-মন্ত্রীর ঘোড়াটি এবার নিশ্চয়ই চলতে নারাজ হবে; সে নির্ঘাৎ পিঠঝাড়া দেবে!

কিন্তু দেয়নি। শত্রুপক্ষের সব আশাকে চূর্ণ করে, দুই দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে নিজের বাক্সে দশ হাজার ভোট বেশী নিয়ে আবার লোকসভায় ফিরে এসেছিলেন কৃষ্ণমাচারী। এবার বিনে মহড়ায় অর্থমন্ত্রীর আসনে।

তবুও পরের বছর নিঃশব্দে যেদিন দিল্লি থেকে মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে প্লেনে চড়েন তিনি সেদিন কেউ ছিল না বিমানঘাটিতে তাঁকে রুমাল উড়িয়ে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্যে।

প্রধানমন্ত্রীর হৃদয়ে এবং মুখে অবশ্য যথেষ্ট সমবেদনা ছিল, ফিরোজ গান্ধীরও বন থেকে গাছটাকে আলাদা করার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু হায়, তবুও কৃষ্ণমাচারীর নিজের মানুষ কাউকে পাওয়া যায়নি সেদিন। কেননা, বিচারপতি চাগলার মন্তব্যে করুণার লেশমাত্র ছিল না। কেউ সখেদে, কেউ সানন্দে,—স্বভাবতই সকলে আশা করেছিলেন অবশেষে কৃষ্ণমাচারী বোধ হয় অগস্ত্যযাত্রাই করলেন।

বলতে বাধা নেই, বন্ধুরা সেদিন রীতিমত ভাবিত তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে। কি করবেন এই সঙ্গীহীন বিপত্নীক? সংসার নিয়ে সময় কাটানোর প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, চার ছেলের প্রত্যেকেই সাংসারিক গৃহস্থ।—বাগান করবেন? তা হয়ত। বাগানের সখ ওঁর বরাবরই। কিন্তু তাই বলে কি ফুলের বাগিচায় বানপ্রস্থ?—সে কক্ষনো হয় না!

অনেকে ভেবেছিলেন দক্ষিণী নৃত্য-কলার অন্যতম সমঝদার শ্রীকৃষ্ণমাচারী হয়ত এবার রাজনৈতিকের বদলে সাংস্কৃতিক জীবন যাপন করবেন। হয়ত তিনি পড়বেন, লিখবেন, আনন্দ করবেন,—বিত্তবানের অবসর যাপন করবেন। তা ছাড়া বন্ধু মহলে শ্রীকৃষ্ণমাচারীর সেদিকে ঝোঁকের কথাও সুবিদিত। মাদ্রাজে তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী গোটা ভারতে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিগত সংগ্রহ। আরও বিশিষ্ট একারণে যে, সেসব বইয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই আবার মার্কসবাদী সাহিত্য। শ্রীকৃষ্ণমাচারী এক সময় বলতেন তিনি 'মৌলিক মার্কসবাদী'। মার্কসবাদীরা সে কথা স্বভাবতই বিশ্বাস করতে নারাজ, কারণ লোকসভায় তাঁদের সম্পর্কে এমন কথাও নাকি তিনি কখনও কখনও বলেছেন যা সরকারের পক্ষে ছাপা সম্ভব হয়নি!

সুতরাং, এহেন টি. টি. কে'র পুনরভ্যুদয়ে কেউ কেউ যে চিন্তিত হবেন তা বিচিত্র নয়। বিস্ময়কর বরং বোম্বাই-শেয়ার মার্কেটের মতিগতি। কেননা, শত্রুপক্ষ এতকাল টি. টি. কে'কে তাঁদের মিত্র বলেই পরিচিত করে আসছেন। কিন্তু সে পরিচয় কি সত্য? শেয়ার মার্কেট পরিত্রাহি স্বরে বলবে না,—তা নয়, তা নয়। ওঁদের ভাষায় টি. টি. কে মানে থিরুভল্লের থাট্টায়িল কৃষ্ণমাচারী নয়,—'ট্যাক্সেশন অ্যাণ্ড ট্যাক্সেশন'!

সুতরাং, যদি বলেন তবুও উনি কি করে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লোকসভায়

চলে এলেন তবে উত্তর দেব সে শুধু ফেব্রুয়ারীর মাহাত্ম্যে। আজ্ঞে হ্যাঁ,—ফেব্রুয়ারীর।

কার ভাগ্যে অষ্টগ্রহের কি যোগজ ফল লেখে জানিনা, কিন্তু টি. টি. কৃষ্ণমাচীর জীবনে ফেব্রুয়ারী যে চিরকালই কিছু না কিছু অভাবিত বলে এ বিষয়ে তিনি নিজেও নিঃসন্দেহ।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্র্যাজুয়েট টি. টি. রঙ্গাচারীর পুত্র (জন্ম—১৮৯৯) মাদ্রাজের উদীয়মান ব্যবসায়ী টি. টি কৃষ্ণমাচারী ১৯৪১ সনের ফেব্রুয়ারীতে লোভনীয় প্রতিষ্ঠা অবহেলায় ছেড়ে ছিলেন রাজনীতি করবেন বলে। তার আগে '৩৭ সনে বণিক প্রতিনিধি হিসেবে যেবার তিনি প্রথম মাদ্রাজ আইনসভায় নির্বাচিত হন সেও ফেব্রুয়ারীতে। তার পর '৪২ সনে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে '৪৬ সনে গণপরিষদে এবং '৫২ সনে মন্ত্রিসভায়। যতবার শ্রীকৃষ্ণমাচারীর জীবনে যা হয়েছে সব ফেব্রুয়ারীতে। এমন কি '৫৮ সনে যখন তিনি 'চির-কালের মত' দিল্লি ছেড়ে যান সেও ফেব্রুয়ারীতে। ফেব্রুয়ারী মাসের ১৩ তারিখে। এবার শেষ প্রতিদ্বন্দ্বীটি নাম প্রত্যাহার করলেন অবশ্য জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে। কিন্তু ফল পাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণমাচারী সেই ফেব্রুয়ারীতেই।

সুতরাং, মিছেই রাজাজী রাগ করেন! ১.২.৬২

[কামরাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬৩ সনের শেষভাগে নেহেরুজী যখন তাঁর মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করেন তখন শ্রীকৃষ্ণমাচারী নিযুক্ত হন ভারতের অর্থমন্ত্রী। জুনে (১৯৬৪) পুনর্গঠিত শাস্ত্রী-মন্ত্রিসভায় তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে—তৃতীয়।]

ক্রুপ, আলফ্রেড

সেকালে ওঁদের নাম ছিল 'কামানের রাজা'। প্রথম মহাযুদ্ধেরও অনেক আগে, ১৮৮৭ সনে একুশটি দেশে প্রায় পঁচিশ হাজার কামান বিক্রি করেছিলেন জার্মানীর বিখ্যাত ক্রুপ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডারিক ক্রুপের পুত্র আলফ্রেড ক্রুপ। তাঁর তৈরী কামানেই প্রুশিয়া সেদিন পরাজিত করেছিল অষ্ট্রিয়া এবং ফ্রান্সকে। লোকে তাই আলফ্রেডের নাম দিয়েছিল—'আলফ্রেড দি গ্রেট।'

দুই পুরুষ পরে,—আজ যিনি জার্মানীর শিল্প-সম্রাট তাঁর নামও আলফ্রেড। আলফ্রেড ক্রুপ। প্রথম মহাযুদ্ধে যে বিরাট কামানটি জার্মানীকে

পথ করে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সের দিকে—তার নাম ছিল—'বিগ বার্থা'। বার্থা আলফ্রেডের মায়ের নাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বাবা গুস্তাভ ছিলেন হিটলারের অন্যতম বন্ধু এবং সহায়। রুর-এর এক ধারে তাঁর দেড়লক্ষ শ্রমিকের বিরাট কারখানাটি ছিল হিটলারের সবচেয়ে বড় বল। এ কারখানার বিখ্যাত 'বিগ গুস্তাভ' কামানেই সেদিন তিনি গুলী চালিয়ে ছিলেন সেভাস্তপোল এবং ভার্সাইল-এ।

১৯৪৫ সনে বিজয়ী মিত্রশক্তি যখন বিধ্বস্ত এসেন-এ গুস্তাভের বিরাট প্রাসাদটির সামনে এসে দাঁড়াল—তখন সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন—আলফ্রেড, তাঁর পুত্র। গুস্তাভ অবসর নিয়েছেন। এখন তিনিই ক্রুপ-ঐশ্বর্যের মালিক। আলফ্রেড বললেন—আমি যোদ্ধা নই, ব্যবসায়ী।

তবুও গুস্তাভ এবং ক্রুপ-এর আরও এগারজন ডাইরেক্টারের সঙ্গে যুদ্ধ অপরাধী হিসাবে বিচার হল—আলফ্রেড ক্রুপ-এর। বিচারে তাঁর বার বছর জেল হল। জার্মানীর সব-চেয়ে ধনী লোকটি এবার এলেন—ল্যাণ্ডসবার্গ-এর কারাগারে। নিজের হাতে কাপড় কাচেন, থালা মাজেন। সুযোগ পেলে জেলের কামারখানায় কাজ করেন। দশ বছর বয়স থেকেই ক্রুপ কারখানাব মানুষ।

অবশেষে ছ'বছর কারাবাসের পরই ছেড়ে দেওয়া হল তাঁকে। সেটা ১৯৫১ সালের কথা। আগের বছর গুস্তাভ মারা গেছেন। ক্রুপ কারখানা যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। দেশে দেশে চালান হয়ে গেছে ক'পুরুষের যত্নে গড়ে তোলা কারখানার যন্ত্রপাতি। তবুও বংশানু-ক্রমিক ব্যবসা থেকে পশ্চাদপসরণ করলেন না আলফ্রেড। সবাই এক-বাক্যে স্বীকার করছে তিনি বিজয়ী।

এসেন-এর শিল্পপতি তিপ্পান্ন বছর বয়স্ক আলফ্রেড ক্রুপ এখন অনেকের মতে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনবান লোক। পশ্চিম জার্মানীর আর্থিক স্বাস্থ্য অনেকাংশে তাঁরই কীর্তি। আজ তাঁর হাতে খনি নেই। কিন্তু রুর-এর তীরে ক্রুপ নগরীতে উনসত্তরটি কারখানার মালিক তিনি। সেখানে রেল ইঞ্জিন, এরোপ্লেন, জাহাজ থেকে সুরু করে নকল দাঁত—সব তৈরী হয়। পঁয়তাল্লিশটি কোম্পানী তাঁর সেলস ডিপার্টমেণ্ট।

ক্রুপ ভারতে এসেছেন। বাইরের আর্থিক দুনিয়ায় তিনিই এখন জার্মানী। রৌরকেলার ইস্পাত কারখানাটি

ক্রুশ্চফ, নিকিতা

জার্মানীর নামে তাঁর সহযোগিতায়ই তৈরী। শুধু ভারতে নয়, এশিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ইউরোপে এমনি অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ক্রুপ জার্মানীর হয়ে। এমনকি রাশিয়ায়ও। কর্মক্ষেত্রের পরিধিতে তিনি এখন যোগ্যার্থেই শিল্প জগতের 'আলফ্রেড দি গ্রেট।' ৯.১.৬০

ক্রুশ্চফ, নিকিতা

'একটা গল্প বলি শুনুন। কোন এক সময়ে কোন এক কয়েদখানায় তিনজন বন্দী ছিল। তাদের একজন এনার্কিষ্ট, একজন সোস্যাল ডেমক্র্যাট, —আর তৃতীয়জন এক গোবেচারা ইহুদি। নাম তার পিনিয়া। পিনিয়া যেমন দেখতে ছোটখাট, তেমনি লেখাপড়ায়ও খাট। যা হক, আদেশ হল—খাওয়াদাওয়া বিলিবন্দোবস্তের জন্যে কয়েদীদের একজন নেতা নির্বাচন করতে হবে। খবর শুনে এনার্কিষ্ট মহোদয় চটে আগুন। তিনি বিপ্লবী,—এসব নিয়মতান্ত্রিক ব্যাপারে তিনি নেই।—তা, একান্তই যদি কাউকে নেতা বানাতেই হয়, তবে দাও ঐ পিনিয়া ব্যাটাকে লীডার করে। তাই হল। দেখা গেল, পিনিয়া কাজকর্ম ভালই চালাচ্ছে।······দিন যায়। অবশেষে এনার্কিষ্ট আর সোস্যালিষ্ট বুদ্ধি করলেন—যে করে হক, জেল থেকে পালাতে হবে। সোস্যাল ডেমক্র্যাট খুব পণ্ডিত লোক। তিনি পরিকল্পনা রচনা করলেন। এনার্কিষ্ট স্বভাবতই যথেষ্ট সাহসী। তিনি সুড়ঙ্গ কাটলেন। পালাবার সময় এল।—কিন্তু সুড়ঙ্গে আগে মাথা গলাবে কে? আগে যে যাবে প্রহরীদের সঙ্গে তার প্রথম মোলাকাত হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং সোস্যাল ডেমক্র্যাট চুপ করে রইলেন। ভয়ে কাঁপতে লাগলেন—এনার্কিষ্ট। ওদের কাণ্ড দেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ছোট্ট পিনিয়া। সে বলল,—বন্ধুরা, তোমরা আমার পেছনে পেছনে এস।—আমি আগে নামছি সুড়ঙ্গে।'

গল্প শেষ হল। ঘর ভর্তি সাংবাদিকদের দিকে সহাস্যবদনে তাকালেন ক্রুশ্চফ। '—ভদ্রমহোদয়গণ, এই বেচারা পিনিয়াটি কে জানেন?' ক্রুশ্চফ আবার হাসলেন। —'তার নাম নিকিতা ক্রুশ্চফ।'—

পৃথিবীতে বহু পিনিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, অনেক পিনিয়া ছোট থেকে বড়, মস্ত বড়ও হয়েছে। কিন্তু দেশ ও কালের বিচারে চৌষট্টি বছরের

নিকিতা ক্রুশ্চফ যেন তাদের সকলের পুরোভাগে। স্তালিন তাকে একদিন 'গোপাক' নাচ দেখাতে আদেশ করেছিলেন! ব্যঙ্গ করে বেরিয়া একদিন এই গোলগাল মানুষটিকে বলেছিলেন —'আওয়ার পটেটো পলিটিসিয়ান।' কখনও বা বলতেন—'আওয়ার বিলাভেড্ চিকেন পলিটিসিয়ান!'

আজ বেরিয়া নেই। সে আজ এমন মৃত যে রুশিয়া তার নাম মনে করতেও ঘৃণা বোধ করে। যাঁকে নিয়ে তারা গর্ব করতে পারত 'পটেটো পলিটিসিয়ান' ক্রুশ্চফ সেই 'মহান স্তালিনকে'-ও টেনে এনে এমন এক জায়গায় নামিয়েছেন—যেখানে তিনি 'খুনী' বা 'উন্মাদ' না হলেও, কমপক্ষে একজন সাধারণ কমরেড মাত্র। '৫৬ সনের ফেব্রুয়ারীতে সেই বিখ্যাত ২০তম কংগ্রেসে সেদিন যা সম্ভব করেছেন ক্রুশ্চফ, তার তুলনায় মেলেনকভ-কাগানেভিচ-মলোটভ পর্ব বোধহয় তাঁর পক্ষে অনেক সহজ কাজ। বুলগানিন বা জুকভ অধ্যায়টি এর চেয়ে একটু কঠিন ছিল বটে,—কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করাই যে ছোট্ট পিনিয়ার ধর্ম। সুতরাং, স্তালিনোত্তর রাশিয়ায় দেখতে দেখতে অধীশ্বর হয়ে বসলেন পিনিয়া ক্রুশ্চফ। স্তালিন রচিত উত্তরাধিকারীদের ফর্দে তাঁর নাম ছিল না। স্তালিন-মুক্ত বহির্বিশ্বে নাম ছিল তাঁর মাঝারিদের তালিকায়। কিন্তু আজ? রাশিয়ার নতুন-করে-লেখা ইতিহাসে লেনিনের পরেই আজ কমরেড ক্রুশ্চফের মূর্তি। বাইরের দুনিয়ায়ও আজ আর কেউ 'মিডিওকার' বলেন না তাঁকে। বললেও অন্যরা মানে না। কেননা, ক্রুশ্চফ নতুন চাঁদ ছেড়েছেন। তাঁর রাজত্ব পুরানো চাঁদে—মানুষের পতাকা পৌঁছে দিয়েছে। নিকিতা ক্রুশ্চফ এ যুগের আলেকজাণ্ডার।

কিন্তু আলেকজাণ্ডারের মত ক্রুশ্চফ রাজকুমার নন। বাবা ছিলেন —ইউক্রেন সীমান্তে পল্লীবাসী এক দরিদ্র খনিশ্রমিক। ছোটবেলায় মাঠে মাঠে মেষ চরিয়ে বেড়াতেন নিকিতা। কৈশোরে প্রমোশন হল। মেষপালক থেকে খনিশ্রমিক। ক্রমে কারখানা-শ্রমিক। সুরু হল উত্থান। যৌবনে অক্ষরজ্ঞানহীন নিকিতা ভর্তি হলেন সৈন্যবাহিনীতে। গৃহযুদ্ধে দিক বদল করে চলে এলেন বিদ্রোহীদের দলে। কেননা—ক্রুশ্চফ গরীবের যন্ত্রণা জানেন। ছোটবেলায় তাঁকে চাবুক খেতে হয়েছিল একবার। জমিদারদের জলে না বলে মাছ ধরার শাস্তি

হিসাবে। সে জালা তখনও ক্রুশ্চফের মনে।

যা হক, যুদ্ধের পরে লালফৌজ তাদের লড়িয়েটিকে পাঠাল শ্রমিকদের স্কুলে। ক্রুশ্চফ তখনও খনিতে কাজ করেন। অবসরে স্কুল করেন। জীবনে সেই তাঁর প্রথম স্কুলে যাওয়া। পরবর্তীকালে আরও বছর দুই তিনি পড়ে ছলেন বটে মস্কোর ইণ্ডাসট্রিয়াল একাডেমিতে, কিন্তু থিওরিটিক্যাল মার্কসবাদী বলতে যা তা কোনদিনই হতে পারেননি। এখনও ক্রুশ্চফের মুখে মার্কস-লেলিনের মুখস্ত করা ছত্র শুনেনা কেউ। ইউক্রেনের মাটি-মাখা গেঁয়ো প্রবাদ তার মার্কস ভাষ্যের নিজস্ব টীকা। ক্রুশ্চফ এখনও নাকি সময় সময় এমন ভাষায় কথা বলেন—যা কোন মতে কানে আঙ্গুল দিয়ে শোনা গেলেও কিছুতেই কাগজে ছাপা যায় না। বিন্দুমাত্র লজ্জিত নন ক্রুশ্চফ তার জন্য। তিনি বলেন—'একটু আধটু মসলা দিলে মার্কসবাদ আরও ভালই হবে। —নয় কি ?'

কমিউনিজমের গুরুপাক ব্যবস্থায় এই মসলা ছিটান ক্রুশ্চফের অন্যতম কৃতিত্ব। তার বিশ্বাসে রাশিয়ান মানুষ আজ অনেক মুক্ত। পাস্তারনাক বা ম্যালেনকভ এখনও জীবিত। রাশিয়ানরা এখন 'প্রাভ্দা'তে পিকটরিয়াল ছবি দেখতে পায়, ছেলেমেয়েরা নতুন গড়া 'বিয়ে-বাড়ীতে' গিয়ে দুটো কমেডি শুনতে পায়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও বরফ-ভাঙ্গার দায়িত্ব নিয়েছেন ক্রুশ্চফ। 'কোল্ড-ওয়ার' স্বুরুর সময় তার শেষ আছে বলে জানত না কেউ। আজ যেন দেখা যাচ্ছে তারও অন্ত আছে। ক্রুশ্চফের বেপরোয়া আচার-আচরণ নিঃসন্দেহে তার একটি কারণ।

নিকিতা ক্রুশ্চফ চারদিন পরেই ভারতে আসছেন। এই তাঁর দ্বিতীয়বার ভারতদর্শন। ইতিমধ্যে ভারতের যেমন আর একটু বয়স হয়েছে, এশিয়া সম্পর্কে ক্রুশ্চফের অভিজ্ঞতারও তাই। নতুন পারিপার্শ্বিকে তার এই শুভাগমন সেদিক থেকে গেলবারের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চীনের পর ভারতের পক্ষে ত বটেই, আইজেনহাওয়ার-এর পর বোধহয় রাশিয়ার পক্ষেও। কেননা, ক্রুশ্চফ বলেন—'ইফ ইউ ক্যানট ক্যাচ দি বার্ড অব প্যারাডাইস, বেটার টেক এ ডয়েট হেন !'

৬.২.৬০

ক্লার্ক, স্যার আর্থার, সি.

Telstar, as it orbits by
Up above the earth so high,
Twinkles almost puckishly ;
"Oh what fools these mortals
be."

কবিতাটা ছাপা হয়েছিল একটা ইংরেজী কাগজে, গেল ১১ই বুধবার। এবং ছাপা হয়েছিল এজন্যে নয় যে, তার আগের দিন কেপ কার্নিভেলে মার্কিনীরা সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বিশ্বে নতুন যুগের সংবাদ আকাশে ছেড়েছে, তাদের বিস্ময়কর টেলিফোন আর টেলিভিসন কেন্দ্র 'টেল স্টার' পৃথিবীর ওপর দিয়া ঘণ্টায় ষোল হাজার মাইল বেগে ছবি আর খবর ছিটাতে ছিটাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে,— আসল কারণ ইংল্যাণ্ড সেদিন সত্যিই বোকা বনে গিয়েছে! টেলিভিসন সে 'টেল স্টার'-এর সঙ্গে চেনা-পরিচয় করতে গিয়ে বি. বি. সি-র দর্শকেরা অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন সেখানে একটি চেনা-চেনা মুখ! চোখ বুজতেই মনে পড়ল মুখটি ফরাসী ডাক বিভাগের মন্ত্রীমহোদয়ের। তিনি বলছেন: 'আপনারা এখন প্যারিসে আছেন, সুতরাং, আসুন, আমার সঙ্গে কয়েকটা মিনিট আনন্দের মধ্যে কাটিয়ে যান!...'

আনন্দই বটে। পর্দায় আবির্ভূত হল সুদর্শনা একটি তরুণী। মুখে তার আনন্দের গান! সঙ্গে সঙ্গে বোতাম টিপল গোটা ইংল্যাণ্ড।—কি? ব্যাপার কি?—এমন ত কথা ছিল না!

সত্যিই কথা ছিল না। 'টেল স্টার' বিষয়ে যারা চুক্তিবদ্ধ ফরাসীরাও তার একজন বটে, কিন্তু কথা ছিল— আর সকলের মত ২৩শে জুলাইয়ের আগে তারাও সেখানে 'টেস্ট কার্ড' ছাড়া—নাচ গান বা 'প্রাণবান' কিছু পাঠাবে না। সুতরাং, ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে পরদিন ভোরে কাগজে কাগজে ছাপা হল সখেদ গর্জন: 'পাইরেটস ইন স্পেস!... ফ্রান্স স্টিলস টি. ভি স্পেস শো...,—ও হোয়াট ফুলস দিজ মর্টেলস বি।'

কিন্তু তখনকার মত 'বোকা' বনে গেলেও ইংরেজেরা যে সত্যিই নির্বোধ নয়, সে খবরটাও অবশেষে জানা গেল 'টেল স্টার'-এর নেপথ্য কাহিনী প্রকাশিত হওয়ার পর।

আমেরিকা সানন্দে জানিয়েছে, 'টেল স্টার' তাদের কীর্তি হলেও তার

আসল জনক যিনি তিনি একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী।

নাম—আর্থার সি. ক্লার্ক। বয়স চুয়াল্লিশ। পরিচয়—লেখক।

হ্যা, লেখক চৌরঙ্গীর পেপার ব্যাক-এর দোকানগুলোতে জিগ্যেস করবেন, দেখবেন প্রত্যেকে চেনে ওঁকে। ক্লার্ক কমসে কম আটাশখানা বই লিখেছেন। এবং অধিকাংশই তার কল্পনা আর বিজ্ঞানের যোগে যাকে বলে সায়েন্স-ফিকশান তাই। ফলে ক্লার্ক শুধু লেখক নন, জনপ্রিয় লেখকও বটে। ইতিমধ্যেই পনেরটি ভাষায় কমপক্ষে কুড়ি লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে গেছে তাঁর বই। (তার কয়েকটি: দি এক্সপ্লোরেশন অব স্পেস, ভয়েস অ্যাক্রস দি সী, আপার সাইড অব দি স্কাই, এ ফল অব মুন ডাস্ট ইত্যাদি) তার কয়েক হাজার অন্তত এই কলকাতাতেই।

সতের বছর আগে এমনি লেখার ছলেই লিখেছিলেন—প্রবন্ধটা। প্রবন্ধ নয়,—তার সঙ্গে তেল জল মিশিয়ে আজকের সংবাদ সাহিত্যে যাকে বলে 'ফিচার' তাই। ক্লার্ক তখন রয়াল এয়ার ফোর্সে একজন ফ্লাইট লেফটেনেণ্ট। উড়তে উড়তেই প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি—'...ক্যান রকেট স্টেশন গিভ ওয়ার্ল্ড-ওয়াইড রেডিও কভারেজ?' লেখাটা ছাপা হয়েছিল ১৯৪৫ সনের অক্টোবরে একটা বেতার বিষয়ক কাগজে। কেপ ক্যানাভেরাল সেখান থেকেই নাকি ইশারা পেয়েছিলেন!

ক্লার্ক এখনও লেখেন। কখনও মহাকাশ নিয়ে, কখনও মহাসমুদ্র নিয়ে। আকাশের মত সমুদ্রেও তার প্রগাঢ় অনুরাগ,—নেশা। অস্ট্রেলিয়া এবং সিংহলের সমুদ্রতলে ক্যামেরা নিয়ে বিস্তর সময় কাটিয়েছেন তিনি। তবে ক্লার্ক আর এখন লেখক নন,—বৈজ্ঞানিক। একদা বৃটিশ ইণ্টার-প্ল্যানেটারি সোসাইটির সভাপতি ক্লার্ক এখন সিংহলে থাকেন এবং সিংহল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সভাপতি হিসেবে নিয়মিত বিজ্ঞানচর্চা করেন। এবার 'টেল স্টারে'র সাফল্যের পর বিজ্ঞানী স্বভূমিতেই বোধ হয় প্রতিষ্ঠিত হলেন।

গবের খবর এই 'টেল স্টার' যদিও মার্কিনী কীর্তি এবং যদিও তার জন্মদাতা ক্লার্ক ইংরেজ বিজ্ঞানী তবুও এ উপলক্ষে আমাদেরও কিছু পাওনা আছে। কেননা, ভারত শুধু ক্লার্ক-এর গল্পের বইগুলোর পাঠক নয়—তাঁর বিখ্যাত কলিঙ্গ পুরস্কারটাও এ

দিয়েছে ক্লার্ক সাহেবেরই হাতে।—কোথায় তখন 'টেল স্টার', কোথায় খবরের কাগজে ক্লার্ক!

১৯. ৭. ৬২

কিসিঙ্গার, ডঃ হেনরী আলফ্রেড

প্রধান সেনানায়ক আইসেনহাওয়ার স্বয়ং তখন মার্কিন দেশের কর্ণধার। কৌটিল্যপ্রতিম কূটনীতিক ডালেস তাঁর সহযোগী। তদুপরি একমাত্রী উপদেষ্টা। হোয়াইট হাউস তখন পণ্ডিতে-প্রধানে গিসগিস। কিন্তু চার কানমন্ত্রটা দিলেন যিনি তিনি হার্ভার্ড-এর এক তরুণ। বয়স তাঁর তখন মোটে একত্রিশ।

ধূসর চোখ, বাদামী চুল। দোহারা চেহারা, লম্বায় পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি, ওজনে একশ' পঁচাত্তর পাউণ্ড। হার্ভার্ড থেকে সদ্য 'ডক্টরেট'-এ ভূষিত তরুণটি সেদিন ডালেস তথা গোটা হোয়াইট হাউসকে চমকে দিয়ে বলেছিলেন—হাতিয়ার আর কূটনীতি যদি এক তালে না চলে তবে আমেরিকার অবস্থা হবে ডায়নোসারের মত। সব থাকা সত্ত্বেও পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সে।

—তবে উপায়?

উত্তর হয়েছিল—উপায় যুদ্ধ। আঞ্চলিক তথা আংশিক যুদ্ধ। দরকার হয়—আণবিক খণ্ডযুদ্ধ।

শুনে ডালেস পুলকিত বোধ করেছিলেন। কিন্তু 'দি নেসেসিটি ফর চয়েস: প্রসপেক্টস অব আমেরিকান পলিসি' নামক উল্লিখিত বক্তব্যের মুদ্রিত ভাষ্যটা পড়ে তরুণ সেনেটার জন কেনেডি নাকি মন্তব্য করেছিলেন 'ইলিউশান।'

এসব ১৯৫৪ সনের কথা। '৬১ সনের খবর—হার্ভার্ড-এর সেই তরুণ রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপকটিই এখন কেনেডির অন্যতম বান্ধব। তিনি পররাষ্ট্র বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের একজন পরামর্শদাতা।

নাম—ডক্টর হেনরী আলফ্রেড কিসিঙ্গার। বয়স আটত্রিশ। পরিচয় লেখক, অধ্যাপক, রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, গবেষক এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মার্কিন সরকারের বিশিষ্ট বান্ধব। যথা: '৫০ সনে তিনি ছিলেন অপারেশন রিসার্চ অফিসের কনসালটেন্ট, '৫২ সনে—কনসালটেন্ট টু দি ডাইরেক্টর অব সাইকোলজিক্যাল স্ট্রাটেজি বোর্ড, '৫৬ সনে কনসালটেন্ট টু দি ওয়েপন সিস্টেম ইভোলিউশান বোর্ড এবং ইত্যাদি

ইত্যাদি। এখন—কনসালটেণ্ট টু দি প্রেসিডেণ্ট, ইউ. এস. এ।

দু'জনে চেনা হয়েছিল অবশ্য পরস্পর বিরোধিতার মধ্যে। কিন্তু কিসিঙ্গার আর কেনেডির মধ্যে আজ রীতিমত সৌহার্দ্য। এজন্যে নয় যে দুজনে প্রায় সমবয়সী, কিংবা দু'জনেই লেখক। আসল কারণ, কিসিঙ্গারের কলম।

'৫৭ সনে হার্ভাড থেকে তিনি নিক্ষেপ করলেন তাঁর দ্বিতীয় রকেট—'নিউক্লিয়ার ওয়েপনস অ্যাণ্ড ফরেন-পলিসি।' সঙ্গে সঙ্গে উড্রো উইলসন প্রাইজ এবং বকমারী পুরস্কার। মায়া কেটে গেল। কেনেডি সহ আমেরিকা একবাক্যে স্বীকার করল 'সমরবিদ্যায় এতদিনে আমাদের হাতে একটি ক্লাসিক সাহিত্য এল।' কেননা, বইটিতে রকেটের আসল ভিতের কথা ছিল। রাজনৈতিক ভিত্তির কথা।

তার পরও বিস্তর লিখেছেন ডঃ কিসিঙ্গার। তা ছাড়া 'কনফ্লুয়েন্স' নামে তিনি একখানা কাগজও চালান। তাঁর লেখার বিষয় সব সময়—রাজনৈতিক।

রাজনীতি বিষয়েই বক্তৃতা দিতে ভারতে এসেছেন হার্ভার্ড-এর বিশ্বখ্যাত রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক। সঙ্গে এসেছেন, স্ত্রী—আন ফ্লিসথার (Ann Fleischer) ওঁরা এখন কলকাতায় আছেন ইতিমধ্যেই তাঁর খোলাখুলি কথা শুনে দিকে দিকে বক্তৃতা, বিবৃতি শুরু হয়ে গেছে। সম্ভবত আরও হবে। কেননা, শুধু পরিচ্ছন্ন মাথা নয়, ডক্টরের খ্যাতির আর একটি কারণ তাঁর স্পষ্ট ভাষাও।

কিন্তু সমরবিদ্যায় এই স্পষ্ট ভাষা কোথায় পেলেন তিনি? সে কি শুধু বই থেকে? ডক্টর হেসে বলবেন অবশ্যই। কিন্তু যাঁরা ওঁকে পুরো চেনেন তাঁরা বলেন—কিছু পেয়েছেন উনি মাঠ থেকেও।

অনেকেই জানেন না ডক্টর কিসিঙ্গার ১৯২১ সন অবধিও জাতিতে ছিলেন জার্মান। এবং অনেকেই জানেন না—১৯৪৩ সন থেকে '৪৬ সন কেটেছে তাঁর হার্ভার্ডে নয়,—মার্কিন সমর-বাহিনীতে। ১৮. ১. ৬২

খ

খান, আব্দুল গফুর

ওয়ার্ডাররা এল পায়ে বেড়ি পরাতে। রাজনৈতিক কর্মী বটে, কিন্তু জেলার-এর কড়া নির্দেশ—সাবধানে রাখা চাই। কেননা, স্থানটি পেশোয়ার এবং সময়টা ১৯১৯ সন। বাপ বেটা দু'জনেই মেলে ধরলেন নিজ নিজ পা। কিন্তু বেড়ি তাতে কিছুতেই ঠিক হয়ে লাগে না। জেলে যত বেড়ি ছিল, একে একে সব ক'টি চেষ্টা করা হল। কিন্তু বৃথা। এ পাঠানের পা কোন বেড়িতেই বেড় পায় না। পাবে কি করে? জেলার রিপোর্ট লিখলেন, ছোকরাটার বয়স তিরিশও হয়ত হবে না, কিন্তু দেহের ওজন ২২০ পাউণ্ড।

দু'শ কুড়ি পাউণ্ড ওজন, সাড়ে ছ' ফুটের ওপর লম্বা, খড়্গের মত নাক, গোলাপের রং। এণ্ড্রুজ সাহেব আব্দুল গফুরকে দেখে লিখেছিলেন—'এ কিং এমাং মেন বাই স্টেচার অ্যাণ্ড ডিগনিটি অব বিয়ারিং।' সীমান্তের লক্ষ লক্ষ দুর্ধর্ষ মানুষও তাই বলে। গফুর খান তাদের কাছে—বাদশা খান। তিনি তাদের বাদশা।

খাস বাদশার ঘরে জন্ম না হলেও 'ফকির' হওয়ার কথা ছিল না আব্দুল গফুরের। বাবা বেহরাম খাঁ উৎমানজাই গাঁয়ের জনপ্রিয় সর্দার। পেশোয়ারের চারসাদ্দা তহশীলে তাঁর মত অভিজাত ও সম্পন্ন দু'জন আছেন কিনা সন্দেহ। সুতরাং দাদা গেলেন বিলাতে। ডাক্তারি পড়তে। আর গফুর চললেন মিশনারী স্কুলে ম্যাট্রিকুলেট হতে। পরীক্ষাটা পাশ করা গেল না যখন, গফুর তখন ঠিক করলেন—মিলিটারী হবেন। কিন্তু এক দোস্ত বলল, সেখানে বহুৎ বে-ইজ্জতি। সাহেবরা যাচ্ছেতাই ব্যবহার করে। সুতরাং মিলিটারী সাজা আর হল না, গফুর এবার চললেন আলিগড়ে। মুসলমানি লেখাপড়াই ভাল। এক বছর কাটতে না কাটতে বাবা ডেকে পাঠালেন। তোমাকেও বিলেত যেতে হবে। তুমি ইঞ্জিনীয়ারিং পড় তাই আমার ইচ্ছে। ব্যস। দিন ক্ষণ স্থির হয়ে গেল। এমন কি জাহাজের টিকিট কেনা পর্যন্ত। কিন্তু গোল বাঁধল যাওয়ার দিনে। মা কেঁদে কেটে পড়লেন : বড়টিও বাহার মুল্লুক,

এটিও যদি যায় তবে আমার কোল খালি। আব্দুল গফুরের চওড়া বুকটার নীচে মনটা ছিল মায়ের চেয়েও নরম। তিনি সাজগোজ ফেলে মায়ের কোলে বসে পড়লেন। সেই থেকেই তিনি সীমান্ত প্রদেশের কোলে।

'সীমান্ত গান্ধী' বাদশা খান গান্ধী হয়েছিলেন গান্ধীজীকে দেখবার বহু আগে। দুই গান্ধীতে প্রথম দেখা ১৯৩১ সনে। অথচ আব্দুল গফুরের পরিবার ১৯১৯ সন থেকে গান্ধীবাদী। আজ গান্ধীজী নেই। কিন্তু সীমান্তের গান্ধী আজও আছেন। তাঁর চোখের সামনে অনেক ভূমিকম্প ঘটে গেছে, মনের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে অনেক ঝড়, কিন্তু খোদাই খিদমদগার আব্দুল গফুর একটুও টলেননি তাতে। পাকিস্তানের আদালত একবার দু' টাকা জরিমানা করেছিল তাঁকে। বিচারক হুকুম দিলেন অনাদায়ে এক-দিন কারাদণ্ড। গফুর খাঁ বললেন, দ্বিতীয়টিই আমার পছন্দ। জিন্না একবার ডেকে পাঠিয়েছিলেন ওঁকে। আব্দুল গফুর বেরিয়ে এসে বলেছিলেন—'জিন্না সাহেবকে লাট করেছে সাহেবরা। যিনি অন্যের হুকুমে লাট, তাঁর হুকুমে চলবে কে?' এবার আয়ুব খাঁর হুকুম জারী হয়েছে সত্তর বছরের বৃদ্ধ গফুর খাঁর ওপর। তাঁকে ছ' বছরের জন্যে রাজনীতিতে ইস্তফা দিতে হবে। নয়ত—। আদালতকে ভয় পাওয়ার মত মানুষ আব্দুল গফুর কেন, পাঠানমুল্লুকেও কম। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়। আয়ুব খাঁ একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পেতেন, এই পাঠানশ্রেষ্ঠ রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে আছেন আজ এক যুগ। '৪৭ সনে বিহারেই গান্ধীজীর পাশে দাঁড়িয়ে তিনি বলে গেছেন সে কথা। দ্বিতীয়ত, চলতি অর্থে যাকে রাজনীতি বলে—গফুর খাঁ যদি কোন দিন তা করতেনই, তবে সীমান্ত প্রদেশের ইতিহাসটা অন্তত একটু অন্যরকম হত। জীবনে কোনদিন ইলেকশনে দাঁড়াননি সীমান্তের গান্ধী। তাঁর রাজ-নৈতিক জীবন খোদার খিদমদ মাত্র। সেটাকে বে-আইনি ঘোষণা করার শক্তি বোধ হয় কারও নেই। কারণ আব্দুল গফুরের বাবা স্বীকার করেছেন তাঁরও নেই। বুড়ো বেহরাম ছেলেকে ডেকে বললেন—'আব্দুল তোমার স্বদেশী বন্ধ কর।' আব্দুল বললেন—'বাপজান আমি কি নমাজ পড়া বন্ধ করতে পারি?' বাবা বললেন —'সাচ বাৎ।' বাপ-বেটা দু'জনে একসঙ্গে চললেন জেলে। ৭. ৫. ৬০

খান, আয়ুব

"These illiterate peasants certainly know less about running a country than I do!"

—গণতন্ত্রকে হত্যা করার স্বপক্ষে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মীর্জা। কয়দিন পরে প্রায় একই কৈফিয়তে তাঁর হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন তাঁর নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী। প্রেসিডেণ্ট মীর্জাকে জোর করে দেশত্যাগী করার সময়ে জেনারেল আয়ুব খান কৈফিয়ত দিয়েছিলেন—সৈন্যবাহিনী এমন লোককে রাজতক্তে দেখতে চায়, যাঁর ওপরে তাদের আস্থা আছে।

সেনাদলের আস্থাভাজন জেনারেল আয়ুব খান নিজেই বসলেন পাকিস্তানের সিংহাসনে। ছ' ফুট দু' ইঞ্চি উঁচু, দুই শ' দশ পাউণ্ড ওজন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের দুর্ধর্ষ পাঠানদের ঘরের সন্তান, ইংলণ্ডে স্যাণ্ডহার্স্ট কলেজের ছাত্র, বৃটিশ বাহিনীর পুরানো সেবক একান্ন বছরের তরুণ আয়ুবকে দেখে মিত্ররা হৃষ্ট হলেন, প্রতিবেশীরা শঙ্কিত।

গেল এক বছরে আয়ুব খাঁর বেপরোয়া শাসন এবং চালচলনে প্রতিবেশীদের শঙ্কা কমলেও, এই জেনারেলটি সম্পর্কে তাদের সন্দেহ বোধহয় কমেনি। বিশেষ করে ভারতের। ভারত-সম্পর্কে এক বছরে আয়ুব যা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য (১) পূর্বসীমান্তের হাঙ্গামা বন্ধ, (২) খালের জলের পুরানো বিরোধের অপেক্ষাকৃত দ্রুত সমাধানের চেষ্টা, (৩) নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং (৪) পাকিস্তানী কাগজে 'ভারতের' বদলে 'ইণ্ডিয়া'র প্রবর্তন। অদূর-ভবিষ্যতে এই প্রতিবেশীটি সম্পর্কে আয়ুব যা করতে চান বলে প্রকাশ তার মধ্যে আছে (১) পশ্চিম-সীমান্তের পাকা মীমাংসা, (২) দুই দেশের যুগ্ম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং (৩) কাশ্মীর উদ্ধার!

সম্প্রতি এই শেষোক্ত কর্তব্যটি নিয়েই পাকিস্তানে আবার পুরানো জিগির তুলেছেন আয়ুব। কখনও বলছেন—কাশ্মীর পাকিস্তানের প্রাণ, তাকে আমাদের চাই। কখনও বলছেন—কাশ্মীরের মুক্তি কাশ্মীরের জনগণের স্বাধীনতার নামেই প্রয়োজন।

বলা বাহুল্য, আয়ুব খাঁ এবং জন-

গণের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ দুই জিনিস। গেল এক বছরে আয়ুব নিজে দেশ-সেবার পুরস্কার হিসাবে জেনারেল থেকে মেজর জেনারেল হয়েছেন। কিন্তু এখনও শত শত দেশপ্রেমিক তাঁর কারাগারে। পাকিস্তানের অন্যতম দৈনিক কাগজ 'পাকিস্তান টাইমস্' তাঁর আদেশে কণ্ঠরুদ্ধ। আধুনিক পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ কবি ফৈজ আমেদ কারারুদ্ধ। আর জনগণ? আয়ুব বলেন—

"Lots of people are bloody fools!" ১. ১. ৬০

খান, ওস্তাদ আলাউদ্দীন

"রোজ একবেলা গঙ্গাজল খাই,—সাধু বলে দিয়েছেন। আর একবেলা লঙ্গরখানায়,—আর ঐ কেদার ডাক্তারের বারান্দায় শুই। একদিন জিজ্ঞেস করলেন কেদার ডাক্তার—'এই ছোকরা কে রে তুই?'

'—আমি বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি। ত্রিপুরায় বাড়ী। গান বাজনা শিখতে চাই।'···

'—কী, গান বাজনা!···চুরিটুরি করবে না ত?'

'—আজ্ঞে,—কোন ওস্তাদ জানা থাকলে—'

'ওস্তাদ?—জুতো মারব?—বেরো ও—!'···"

তবুও ওস্তাদ পাওয়া গেল। কেননা, ওঁর মত বয়স, আটটা মাত্র টাকা সম্বল করে সুদূর ত্রিপুরার গাঁ থেকে যাঁরা কলকাতা অবধি আসেন—চিরকাল তাঁরা ওস্তাদ পান।

প্রথমে লুলু গোপাল। যতীন্দ্র মোহনের কোর্টের গাইয়ে! তারপর স্বামী বিবেকানন্দের ভাই হারু দত্ত। ঐ সূত্রেই মিনাভায় চাকরী। মাসে মাইনে এক টাকা। "গিরিশ ঘোষ বললেন—'নেড়েটা ত বেশ বাজায়।' —এই নেড়ে তুই কি আমাদের কাছেও নেড়েই থাকবি?"···পিঠে থাবড়া দিয়ে বললেন—'এই তোর নাম হল প্রসন্ন বিশ্বাস!'

অবিশ্বাস্য কাহিনী। কিন্তু প্রতিটি ঘটনা সত্য। ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর জীবনকথা সেদিক থেকে আলাদীনের রূপকথার চেয়েও রোমাঞ্চকর।

মিনার্ভায় থাকতে থাকতেই গোয়ানীজ লোবো সাহেবের ভায়োলিন শেখা হয়ে গেল। তাঁর এক শিষ্যের কাছে শিখলেন—কর্নেট। তারপর মেছো-বাজারের হাজারী ওস্তাদের কাছে—শানাই, নাকাড়া, টিকারা।

সাত সাতটা বছর কেটে গেল।

কিন্তু বিদ্যা যে এখনও অ-আ-ক-খ ধাপে সেটা জানা গেল মুক্তাগাছা গিয়ে। আচার্য জগৎ-কিশোরকে দেখে আবার উন্মাদ হলেন আলাউদ্দীন। অবোধ এবং উন্মাদ।

তবে সান্ত্বনা এই সদগুরু পাওয়া গেল। রামপুরের ওস্তাদ আহামদ আলী তখন মুক্তাগাছায়। ষোল সতের বছরের ছেলের কান্না দেখে তিনি সাকরেদ করে নিলেন তাকে।

আলাউদ্দীন এখন আহমদ আলীর সাকরেদ। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরেন। খানা পাকান। রান্না ঘরে বসে গোপনে গুরুর বিদ্যা চুরি করেন। কখনও কখনও গুরুর বাড়ীতে মজুরের কাজও করেন। কিন্তু মনে এক বিন্দু দুঃখ নেই।

দুঃখ হল সেদিন গুরুমাতা যেদিন বললেন, আলাউদ্দীন এবার তুমি অন্য ডাক্তার দেখ। মনের দুঃখে আলাউদ্দীন তাঁর সর্বস্ব দিয়ে দু তোলা আফিং কিনলেন। কিন্তু মরলেন না। কারণ, যাঁরা এমন কারণে মরতে চান তাঁরা বোধ হয় এভাবে মরতে পারেন না। কালিদাসও পারেননি।

সুতরাং, মসজিদে মরতে গিয়ে পরিবর্তে অন্য আশ্রয় পেলেন। এবার গুরু রামপুরের নবাব দরবারের বিখ্যাত ওস্তাদ স্বয়ং উজীর খাঁ। নবাব বললেন, জাতে বাঙ্গালী, বোমা মারবে না ত!

'—আজ্ঞে না, তবে যদি শেখান, তবে সুরের বোমা মারতে পারি!' উজীর খাঁ এই শিষ্যকে হাতছাড়া করতে রাজী হলেন না।

"...রয়ে গেলাম গুরুর সঙ্গে। সারাদিন গুরুর জুতো, হুঁকো, পান দান, মেডেল পরিষ্কার করি।...সকালে নামাজ করে এসে মাটির হাঁড়িতে গোবর মাখিয়ে একটু চা খাওয়া হয়, বাসি রুটি লবণ দিয়ে খাই।..."

বছরের পর বছর চলে গেল এই ভাবে। তারপর হঠাৎ একদিন চারদিকে জানাজানি হয়ে গেল— ত্রিপুরার সেই সিরাজু ডাকাতের নাতিটি সত্যি সত্যিই ডাকাত হয়েছে। সুরের ডাকাত। নাম তাঁর—ওস্তাদ আলাউদ্দীন।

...মাইহার রাজ বললেন—'কাল দরবার হবে। আপনার আসন সর্দার আর মন্ত্রীর পর, তৃতীয় স্থান। আসার সময় জড়োয়া পাগড়ী দিলেন।'

অনেক শিরোপা। মাইহার,— ভারতবর্ষ, ইউরোপ, শান্তিনিকেতন। 'আবিসিনিয়ায় তখন যুদ্ধ ছিল ইউরোপ যাব, তার আগেই এখানে

(শান্তিনিকেতনে) ছিলাম। যখন যাব তখন গুরুজী বলেন—'নন্দলাল আলাউদ্দীনের মাথাটা রেখে দাও! নন্দবাবুর এক ছাত্র আমার মাথাটা রেখে দিল মূর্তিতে! বহুকাল পরে গুরুদেবহীন বিশ্বভারতী আবার সম্মান জানাল তাঁকে। ওস্তাদ আলাউদ্দীনকে এবার "দেশিকোত্তম" উপাধিতে ভূষিত করলেন তাঁরা।

উপাধি দিয়ে যেমন সঠিক পরিমাপ করা যায় না, কথা দিয়েও তেমনি মানুষটিকে বোঝান যায় না। আশী পেরিয়ে গেছেন। বয়সের কোন হিসেব নেই। যেন যুগযুগান্ত ধরে সাধনা করে চলেছেন। এমনকি আজও।

তার চেয়েও আশ্চর্য সেই সাধকের ভঙ্গীটি। খ্যাতি, মান ঐশ্বর্য সব পেয়েছেন এই মানুষটি। কিন্তু কথায়-বার্তায় পোশাকে যেন চিরকালের বাউল।

সাদাসিধে পোশাক। সেই 'কথা-মৃতে'র বাতভঙ্গী। 'রুটি পাওয়া যাবে ত? আমি দিনে বাঙালী, রাতে পশ্চিমা!' আর জীবনে?—জীবনে তিনি মূর্তিমান সঙ্গীত, সুর! অনেকেই বোধহয় জানেন না ওস্তাদ আলা-উদ্দীনের ঘরে তাঁকে বাদ দিলে আর মূর্তি আছে দুটো। একটি সরস্বতীর, অন্যটি বিটোফেনের! ৬. ৪. ৬১

খান, বেগম লিয়াকত আলি

কলকাতারই একটা কলেজে ট্রেনিং পড়তেন। সুতরাং, বয়স, ঐশ্বর্য, খ্যাতি ইত্যাদির রকমারি প্রলেপের পরেও হয়ত মুখটা অনেকের চেনা চেনা।

পাশ করার পর প্রথম ছ'মাস কলকাতারই একটা মেয়ে স্কুলে মাস্টারী করছিলেন, সুতরাং সহপাঠী সহপাঠিনী ছাড়া ছাত্রীদেরও কারও কারও হয়ত মনে আছে অজানা বস্তুতে রঞ্জিত (সেকালে এ সব বস্তু প্রায় অজ্ঞাতই ছিল) পাতলা ঠোঁট দুটির কথা, যত্ন করে ছাটা একমাথা কোঁকড়ান চুলের কথা।—কিন্তু নামটি?

মনে থাকলেও সে নাম আজ আর চেনা যাবে না। আলমোড়ার সেই মেয়েটিকে। কেননা, সেদিন যিনি কুমারী রাণা, আজ তিনি বেগম লিয়াকত আলি খান।

মা বাবার পছন্দ নয়।'—আই হার্ড মিঃ আলি খান উইল গিভ এ স্পীচ ইন দি এসেম্বলি,—এণ্ড ছাট গট মি' সগর্বে আজও বেগম সাহেবা

গড় গড় ইংরেজীতে বলতে পারেন সে কথা।

সে '২৬ সনের কথা। আলমোড়ার মেয়ে তখন নৈনিতালের ওয়েলেসলি কলেজের পাঠ সাঙ্গ করে লক্ষ্ণৌর ইসাবেলা কলেজ ধরেছে। সম্ভ পাশ করা অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট লিয়াকত আলি সবে এসেছেন ইউ পি'র ব্যবস্থাপক সভায়।

বিয়ে হয়েছে অবশ্য তার অনেক পরে, ১৯৩৩ সনে। এম-এ ক্লাসে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রী রূপসী রাণা তখন ইকনমিকস-এর ফার্স্ট ক্লাস এম-এ, এবং কলকাতার জি-টি। তিনি দিল্লির একটা কলেজে অধ্যাপনা করেন, ইকনমিকস পড়ান।

বিয়ের পর থেকে বেগম লিয়াকত আলি—মুসলিম নাহানে তারকা বিশেষ। তিনি পর্দা মানেন না, অধিকন্তু টাইপ জানেন। তদুপরি তিনি রাজনীতিও বোঝেন।

সুতরাং, সগবে পাকিস্তানীরা বললেন—বেগম আমাদের বিজয়লক্ষ্মী। মার্কিন দেশে মুসলিম মহিলাকে রাষ্ট্রদূতের বেশে দেখে জানালেন—'বেগম পূর্ব দেশের এলিনর রুজভেল্ট।'

'—বাট আই এম এফরেড আই এম নট হাফ ব্রিলিয়ান্ট এজ সি ইজ!'—বুদ্ধিমতীর মত উত্তর দিলেন মিসেস লিয়াকত আলি। সঙ্গে সঙ্গে রটে গেল—'শুধু সুন্দরী নয়, বেগম কথা বলতেও জানেন,—তিনি উইটিও।'

আকবর আর আসরফ— দুই ছেলের জননী বেগম লিয়াকত আলি আরও বিবিধ গুণ ধরেন। এই বাধক্যেও তিনি গান গাইতে পারেন, পিয়ানো বাজাতে পারেন। সুতরাং, সন্দেহ কি মানব জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টির জন্যে 'গোম্বেল ইন্টার ন্যাশনাল' নামক ইতালীয়ান পুরস্কারটি তিনিই পাবেন।

উল্লেখযোগ্য, বেগম সাহেবা ইতালীতেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত।

১৬. ১১. ৬১

খান, সর্দার মহম্মদ দাউদ

যাকে বলে 'বড় খবর'— খবরটা ঠিক তা ছিল না। গেল ১০ই মার্চ তারিখে কাবুল থেকে প্রচারিত ছোট্ট সেই সংবাদটিতে শুধু এটুকুই বলা হয়েছিল— আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সর্দার মহম্মদ দাউদ খান পদত্যাগ করেছেন। রাজা জাহির শাহ তাঁর

পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন। অবশ্য সখেদে।

খবরটা আরও একটু 'বড়' হতে পারত। আফগানিস্তান ছাড়াও অন্তত আরও ক'টি দেশে। বিশেষ ভারতে। কেননা, ডুরাণ্ড লাইন অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা। পাকিস্তান আরও পরে। আহমদ শাহ দুররানীর রাজত্ব, আফগানিস্তানের সঙ্গে আমাদের অনেক কালের সম্পর্ক। প্রধানমন্ত্রী দাউদ খাঁ'র পদত্যাগদিনেই আরও খবর ছিল দুটো। প্রথম খবর: ভারত পরিদর্শনে এসেছেন আফগান-রাজের খুল্লতাত মার্শাল শাহ্ ওয়ালী। সঙ্গে এসেছেন তাঁর পুত্রবধু এবং রাজকন্যা বিলকিস। ওঁরা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় উনিশ দিন ভারত সফর করবেন। দ্বিতীয়: আগামী ১১ই মে তারিখে সরকারীভাবে আফগানিস্তান পরিদর্শনে যাচ্ছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। তিনি সেখানে পাঁচদিন কাটাবেন। বন্ধুত্বের গভীরতা, অতএব, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকুই উল্লেখ করা প্রয়োজন হিন্দুকুশ আর পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতাকে তুচ্ছ করে এই দু'টি দেশের মানুষকে সম্প্রতিকালে যাঁরা আরও কাছাকাছি করেছেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন—সর্দার দাউদ। ভারত আর আফগানিস্তান যে আজ রাজনৈতিক ধর্মে এক—তার পেছনে অনেকখানি কৃতিত্বই তাঁর।

গরীবের ঘরের ছেলে নন। প্রধানমন্ত্রী দাউদ ছিলেন আফগান-রাজের নিকট-আত্মীয়। তাঁর পত্নী বেগম জারমিনা রাজার নিকটসম্পর্কের বোন। রাজার নিজের বোন বেগম জোরাকে বিয়ে করেছেন ছোট ভাই সর্দার মহম্মদ নাইম খান। তিনি আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

শুধু বৈবাহিক সম্পর্কে নয়, সর্দার দাউদ নিজেও রাজপরিবারের সন্তান। তাঁর বাবা মহম্মদ আজিজ খান ছিলেন বিখ্যাত মহম্মদ ইউসুফ খাঁর দ্বিতীয় পুত্র। আমীর আব্দের রহমান ভারতে নির্বাসিত করেছিলেন তাঁকে। ইউসুফ খাঁ' সেদিন আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারতে। ১৯০১ সন অবধি আফগানিস্তানের বিখ্যাত মুসাহিবান পরিবার এ দেশেই ছিলেন।

এই শতকের দ্বিতীয় দশকে হঠাৎ আবার আফগানিস্তানে পটপরিবর্তন হল। ১৯১৯ সনে ইংরেজদের পছন্দের রাজা আমীর হবিবুল্লা নিহত হলেন। কথা ছিল তাঁর ভাই নসরুল্লা এবার তক্তে বসবেন। কিন্তু বাদ সাধলেন

হবিবুল্লাপুত্র বিখ্যাত আমানুল্লা। আফগানিস্তানের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় নাম। কিন্তু আতাতুর্কের মত দেশে পশ্চিমী হাওয়া চালু করতে গিয়ে তিনি গদী হারালেন ('২৯)। রাজা হলেন মোল্লাদের প্রতিভূ—কুখ্যাত "বাচা-ই-সকাও।" কিন্তু সে মাত্র ক'দিনের জন্যে। অচিরেই আসরে আবির্ভূত হলেন জনৈক নাদির খান। "বাচা"কে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে সিংহাসনে বসলেন তিনি। সেই থেকে সুরু হল আফগানিস্তানে নব-বংশ। দেশবাসী জেনে নিশ্চিন্ত হল—নাদির ভারতে নির্বাসিত সেই ইউসুফ খাঁর প্রথম তনয়। ইউসুফ খাঁর আরও চারটি ছেলে ছিল। সবাই ভারতে ভূমিষ্ঠ। তাদেরই একজন মহম্মদ আজিজ খাঁন—পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রীর পিতা। সুতরাং বলা চলে একই বংশ। বিশেষত মনে রাখতে হবে আফগানিস্তানের বর্তমান রাজা জাহিরশাহ নাদির শাহেরই পুত্র।

বড় ঘরের ছেলে। সুতরাং লেখাপড়াও সেরা স্কুল কলেজে। প্রথমে স্বদেশের বিখ্যাত ইস্তিকুয়াল কলেজে; তারপর প্যারিসে। সর্দার দাউদের মাতৃভূমির ভাষা পার্শি, তুর্কী এবং পুস্তু ছাড়াও গড়গড় ফরাসী বলতে পারেন। ছাত্রজীবনেও তিনি প্রখর তরুণ ছিলেন। সুতরাং, পড়া সাঙ্গ হওয়া মাত্র ডাক পড়ল তাঁর জ্যাঠামশাইয়ের দরবারে। নাদির ভ্রাতুষ্পুত্রকে কান্দাহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। ১৯৩৩ সনে ফুটবল খেলায় পুরস্কার বিতরণ করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে আততায়ীর হাতে নিহত হলেন নাদির। সিংহাসনে বসলেন পুত্র মহম্মদ জাহির শাহ। সর্দার দাউদও তখন পিতৃহারা। তাঁর বাবা নিহত হয়েছেন বার্লিনে, আফগান দূতাবাসে। ফলে তরুণ নরপতি এবং তরুণ প্রাদেশিক শাসক আরও ঘনিষ্ঠ হলেন। দেখতে দেখতে রাজার অন্তরঙ্গ, সুহৃদ দুঃসাহসী সর্দার দাউদের পদোন্নতি সুরু হল। প্রথমে দেশের প্রধান সেনাপতি, তারপর সেখান থেকে দেশরক্ষা মন্ত্রী এবং অবশেষে ১৯৫৩ সনের সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী।

সর্দার দাউদ একালের আফগানিস্তানে অন্যতম স্মরণীয় প্রধানমন্ত্রী। সাকুল্যে সাড়ে ন'বছর ছিলেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর আসনে। আফগানিস্তানের জীবনে তার প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য বর্ষ। সর্দার দাউদ এ-সময়ের মধ্যে আফগানিস্তানের জন্যে

যা যা করেছেন তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অন্তত তিনটি বিষয়। প্রথম—জোট-নিরপেক্ষতা। এশিয়ার সামরিক এবং রাজনৈতিক মানচিত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকারী আফগানিস্তান আজ আমাদের মতই গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশ। এ নিরপেক্ষতা অবশ্য আফগানদের জীবনে নতুন নয়। কিন্তু দাউদের নেতৃত্বে আজ তা আরও স্পষ্ট। ১৯৫৫ সনের ডিসেম্বরে ক্রুশ্চফের আগমন উপলক্ষে আবার নতুন করে এর কার্যকারিতা প্রমাণ করেছেন তিনি। আফগানিস্তাকে রাশিয়ানরা ১০ কোটি ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিল সেদিন। দ্বিতীয়--দেশের আর্থিক উন্নয়ন। মার্কিন এবং রুশ সাহায্যে গেল ক'বছরে আফ-গানিস্তানের বিস্তর চেহারা বদল ঘটিয়েছেন দাউদ। রাজধানী কাবুলে আজ শুধু চকচকে ঝকঝকে নতুন নতুন পথই দেখা যাবে না, পথে পথে রাশি রাশি বাস, ট্যাক্সি,—জনতার মুখে যুগ পরিবর্তনের হাসি। তৃতীয়ঃ পাকতুনিস্তান। ১৯৫৫ সনে পাক হামলার দিনে প্রধানমন্ত্রী দাউদ স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন ২৫ লক্ষ পাঠানের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর সরকারের শুধু যে সহানুভূতি আছে তাই নয়,—তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের যে কোন উপায়ে সাহায্যেও প্রস্তুত!

এই দুঃসাহসী প্রধানমন্ত্রীর বিদায় গ্রহণে, অতএব বলা নিষ্প্রয়োজন, হয়ত কেউ কেউ খুশী হবেন। কিন্তু তাঁরা নিরাশ হবেন চুয়ান্ন বছরের এই প্রবীণ রাজনীতিকেব আসনে যিনি এলেন তাঁর পরিচয় শুনলে। সত্য বটে, আফগানিস্তানের সদ্য-নিযুক্ত প্রধান-মন্ত্রী ডঃ মহম্মদ ইউসুফ নীল রক্তহীন মানুষ,—তিনি একান্তভাবেই গরীবের ঘরের ছেলে। কিন্তু তাই বলে তাঁকে দ্বিতীয় 'বাচা-ই-সকাও' বা কুখ্যাত সেই 'ভিস্তিওয়ালার পুত্র' ভাবলে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের ঠকতেই হবে। কেন না, প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ ক'দিন আগেও ছিলেন দাউদের অন্যতম বান্ধব,—সহকর্মী। তাঁর মন্ত্রিসভাতেই খনি এবং শিল্পমন্ত্রী ছিলেন তিনি।

২১. ৩. ৬৩

খান, স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা

অবশেষে যুদ্ধবিরতি।

স্থির হল দু'পক্ষের সেনানায়কেরা এক জায়গায় মিলবেন। সঙ্গে থাকবেন 'য়ুনো'র মধ্যস্থরা।

যথা সময়ে ভারতীয় জেনরেলরা

এগিয়ে গেলেন। ওদিক থেকে এগিয়ে আসছেন পাকিস্তানী জেনারেলরাও। দু'দলেরই আজ খালি হাতে মিলবার কথা।—কিন্তু এ কি ? —ওঁদের হাতে এমনি একখানা ঝুড়ি কেন ? বোমা টোমা নয় ত ?

'—না ভাই সে সব কিছু নয়' —হেসে ফেললেন জনৈক পাকিস্তানী জেনারেল,—'সে কথা পরে হবে। আগে বল দিকি শ্রীনগর রেডিও থেকে যে মেয়েটি প্রতিদিন এমন মিষ্টি গলায় আমাদের গালাগালি করে,—সে কি দেখতেও তেমনি মিষ্টি ?—যদি তাই হয়, তবে এই আপেলের ঝুড়িটা তাকে দিও। বলো,—আমাদের উপহার।'

গালমন্দ শুনেও সেদিন উপহার নিয়ে এসেছিল শত্রুপক্ষের সৈন্যরা। কারণ, মেয়েটির গলাটা ভাল ছিল। আর এক দফা তর্জন গর্জন, রণহুঙ্কার ইত্যাদি শুনতে হবে জেনেও আজ এ মানুষটিকে নিয়ে লিখতে হচ্ছে, কারণ,—লোকটি সত্যিই বক্তা ভাল।

বিশেষণাদি সহ পুরো নাম চৌধুরী স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খান। জন্ম ১৮৯৩ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে, পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে। বাবা নসরুল্লা ছিলেন শিয়ালকোটের প্রতিষ্ঠিত এটর্নি এবং মস্ত জমিদার।

ফলে মাদ্রাসার বদলে ছেলে গেল স্থানীয় আমেরিকান স্কুলে এবং সেখান থেকে লাহোরের সরকারী কলেজে।

কলেজ থেকে ইকনমিক্স এবং হিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে জাফরুল্লা বি. এ. পাশ করলেন। তারপর চললেন বিলেতে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস কলেজের ছাত্র জাফরুল্লা সেখানকার এল এল বি, লিঙ্কনস ইন-এর ব্যারিস্টার এবং কেম্ব্রিজের—ডক্টরেট।

১৯১৪ সন। দেশে ফিরে বাবার আসনে বসে সুরু হল প্রাকটিস। দু'বছর ছিলেন সেখানে। তারপর চলে গেলেন লাহোরে, য়ুনিভারসিটিতে আইন অধ্যাপনার কাজ নিয়ে। কেম্ব্রিজের পদবীটা ঐ কালেই (১৯১১-২৪) অর্জিত।

এক সময় পড়াবার কাজও ছেড়ে দিলেন। দিয়ে লাহোর হাইকোর্টে ঢুকলেন। জাফরুল্লার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা সেইখানেই, হাইকোর্টের ফাঁকে ফাঁকে অবসর বিনোদনে। '২৬ সনে পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য মনোনীত হলেন জাফরুল্লা।

'৩২ সনে হাইকোর্ট ছাড়লেন বটে, কিন্তু ঐ আসনটি নয়। কেননা ইতিমধ্যে রাজনীতি স্বভাবে দাঁড়িয়ে

গেছে। জাফরুল্লা খান নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি ('৩১-'৩২) নির্বাচিত হয়েছেন, ওদিকে দিল্লিতেও তাঁকে নিয়ে টানাটানি স্থরু হয়ে গেছে।

'৩১ সনের মার্চ। রাজধানীতে বিখ্যাত 'দিল্লি ষড়যন্ত্রের' মামলা। ক্রাউনের পক্ষে গাউন গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়েছেন জাফরুল্লা। দেশময় স্বদেশীওয়ালারা ছি ছি করছেন, সাবাস দিচ্ছেন ভারত সরকার।

শুধু মৌখিক বাহবা নয়, পুরস্কারও মিলল। মুসলিম লীগের সভাপতি জাফরুল্লা খান নিযুক্ত হলেন গভর্নর জেনারেলের শিক্ষামন্ত্রী। খ্যাতি তথা উন্নতির সেই স্থরু।

তারপর তদানীন্তন ভারত সরকারের হয়ে জাফরুল্লা দেশে এবং বিদেশে অনেক কাজ করেছেন, অনেক পদে বসেছেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : '৩৫ থেকে '৪১ পর্যন্ত তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সভার বাণিজ্য, আইন এবং যুদ্ধ সরবরাহ মন্ত্রী। '৪২ সনে তিনি ছিলেন চীন দেশে ভারত সরকারের প্রধান প্রতিনিধি। এবং '৪১ থেকে '৪৭ সন পযন্ত ভারতীয় ফেডারেল কোর্টের অন্যতম বিচারপতি। এছাড়া জাফরুল্লা লীগ অব নেশনস ('৩৯)-এ ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং পর পর তিনটে গোল টেবিলে যোগ দিয়েছেন।

স্থতরাং, '৪৭ সনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে জাফরুল্লা খান যখন জাতিপুঞ্জে এসে দাঁড়িয়েছেন তখন তিনি রীতিমত ঝানু রাজনীতিক। অন্তত মুখে যে তাঁর তুল্য পাকিস্থানী দ্বিতীয় কেউ নেই তাও বোঝা গেল সেদিন জাফরুল্লা যেদিন প্রথম বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ালেন। বিষয়টা ছিল —প্যালেস্টাইন। কিন্তু বক্তৃতা শুনে মনে হয়েছিল দেশটা পাকিস্তান। উল্লেখযোগ্য, তাঁর সেই বক্তৃতাটাই ম্যারথন-এর গৌরব পেয়েছিল অনেক কাল।—তবে হ্যাঁ, মেডেল পেয়েছিল পরেরটা, যেটা কাশ্মীর উপলক্ষে উদ্গারিত! জাফরুল্লার নামে সেদিন পাকিস্তানময় 'মার হাবা!—মার হাবা!'

'৪৭ থেকে '৫৪,—একটানা জয়ধ্বনি সহসা একদিন আন্তর্জাতিক আদালতে বিচারপতি পদে তলিয়ে গিয়েছিলেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব চৌধুরী জাফরুল্লা। দেশের বিশ্ব আলোড়নকারী সংবাদগুলোর মধ্যে একমাত্র শোনা গিয়েছিল সেই বর্ষীয়ান রাজনীতিজ্ঞটির নাম, কিন্তু সেই

নিতান্তই একটি ঘরোয়া সংবাদে। কাশ্মীর নয়, আয়ুবের রাজত্ব সম্পর্কে কোন সুচিন্তিত মন্তব্যও নয়, খবর ..ল চৌধুরী জাফরুল্লা খান দ্বিতীয়বার ..র পরিগ্রহ করেছেন। এবং বর ..ও বার্ধক্যে, কনে বস্থরা রব্বামি ..তিমত তরুণী। তাছাড়া মেয়েটি ..নদানী। তার বাবা ছিলেন বিখ্যাত ..লিম রব্বানি।

জাফরুল্লার প্রথমা স্ত্রীও খানদানী ..রের মেয়ে। নাম তার সাক্রন্নিসা ..গম। বাবার নাম এস. এ. খান। .. খান সাহেব ছিলেন এককালে ..ঞ্চলে খ্যাতনামা আই সি এস। উল্লেখযোগ্য, আমামুল হাই নামে ..দের ছেলেও আছে একটি।

বর্তমান খবর তবুও চৌধুরী ..রুল্লার ওজন কমেনি এবং লোক ..চোখে তিনি বিন্দুমাত্র খাটো হননি ..উচ্চতা—৫ ফুট ১০ ইঞ্চি, ওজন— ..সেকালে ১৫৫ পাউণ্ড) যদি হতেন, ..বে কাশ্মীর উপলক্ষে নিশ্চয়ই আবার ..াকে স্মরণ করা হত না।

১৭. ৮. ৬১

খোসলা, ডঃ অযোধ্যানাথ

এক কথায় দ্বিতীয় ভাকরা নাঙাল ..ন।

এজন্যে নয় যে নবীন ভারতের অধিকাংশ ড্যাম-ব্যারেজের মত নিজের মাতৃভূমির সেই বিখ্যাত বাঁধটিতেও তার মস্তিষ্কের স্বাক্ষর ছিল বা আছে। বক্তব্য : তেমনি মজবুত ভিতে গড়া মানুষ, তেমনি বিশাল বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব।

নাম—ডঃ অযোধ্যানাথ খোসলা। দেশ—পঞ্চনদীর দেশ। বয়স—সত্তর। পরিচয়—বিশ্বখ্যাত নদী-শাসক, একালের ভারতের অন্যতম কৃতী ইঞ্জিনীয়ার।

লাহোর থেকে বি এ পাশ করার ক' বছর পরে রুড়কি'র পাশ করা ছেলে অযোধ্যানাথ যখন কাঁটা-কম্পাস আর ম্যাপ-স্কেল নিয়ে কাজে নেমে-ছিলেন—ভারতে তখন অন্য যুগ। কেননা, সে ১৯১৬ সনের কথা। তারপর এল প্রথম মহাযুদ্ধ। পাঞ্জাবে পি ডব্লিউ ডি'র কর্মী খোসলার ডাক পড়ল দিল্লিতে, কেন্দ্রীয় ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিসে। তারপর থেকে নানা পদে সেখানেই ছিলেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার দিনে সব সিঁড়ির শেষে যে আসনটিতে তাঁকে পাওয়া গিয়েছিল তার নাম—'কনসাল্টিং ইঞ্জিনীয়ার এণ্ড চেয়ারম্যান, সেণ্ট্রাল ওয়াটার এণ্ড পাওয়ার কমিশন।' মিনিষ্ট্রি

গজেন্দ্র গদকার, পি. কি.

অব ইরিগেশন এণ্ড পাওয়ার অতঃপর সানন্দে ওঁকে নিজেদের দপ্তরে স্পেশ্যাল সেক্রেটারী করে নিলেন। ১৯৫৩ সন অবধি খোসলা সে পদেই ছিলেন। এ সময়ে তিনি যা যা করেছেন বা হয়েছেন তার মধ্যে আছে: ভারতের প্রধান প্রধান সমুদয় নদী পরিকল্পনা এবং সে সব পরিকল্পনা রূপায়িত করার পথে প্রথম পদক্ষেপ, ভাকরা সংক্রান্ত পরামর্শদাতাদের কমিটির সভাপতিত্ব, নদী সম্পর্কিত তিন চারটে গুরুতর মৌলিক গবেষণা, কয়েকবার বিদেশ পরিদর্শন, ইণ্টার ন্যাশনাল কমিশন অন ইরিগেশন এণ্ড ড্রেনেজ নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

'৫৪ সনে খোসলা সরকারী কাজ থেকে অব্যাহতি পেলেন। পরবর্তী পাঁচ বছর কেটেছে তাঁর পুরানো বিদ্যালয়ের রুড়কি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদে। কিন্তু '৫৯ সনে আবার দিল্লির দপ্তরে ফিরে আসতে হল তাঁকে। কেননা, ভারত সরকার বিবেচনা করে দেখেছেন—মানুষটি আরও কিছুদিনের জন্যে অন্তত পরিকল্পনাকারীদের কাছে অপরিহার্য। ওঁরা তাঁকে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য করে নিলেন। ইতিমধ্যে উপাচার্য খোসলা আমেরিকা থেকে ডক্টরেট উপাধি পেয়েছেন এবং স্বদেশ থেকে 'পদ্মভূষণ'।

'পদ্মভূষণ' ইঞ্জিনীয়ার একদা আরও একটি নতুন সম্মানে সম্মানিত হলেন। সংবাদ: তিনি উড়িষ্যার নতুন রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন। বলতে দ্বিধা নেই, উড়িষ্যা ভাগ্যবান। কেননা, রাজ্য প্রধানের আসনে তাঁরা এমন একজনকে পেলেন যিনি রাজনীতিক নন, ভারতের অন্যতম গঠনকর্মী এবং ব্যক্তিত্বে কৃতিত্বে যিনি সত্যিই দ্বিতীয় ভাকরা-নাঙাল।

১২. ৭. ৬২

গ

গজেন্দ্র গদকার, পি. কি

মাত্র দিনকয় আগের কথা। খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ একটি নাতিদীর্ঘ শিরোনামা চোখে ঠেকেছিল। তাতে লেখা: সোস্যাল ওয়েলফেয়ার

এই দি কস্ট অব ওয়ানস লিবার্টি। অতঃপর ভেতরে প্রবেশ না করে উপায় ছিল না। কেননা, সামাজিক ন্যায়ের নামে মানুষ যখন সামান্য বাধা পাওয়া-মাত্র প্রচলিত আইনের প্রাচীর ভাঙতে উদ্যত, সামাজিক স্বাধীনতার ব্যাপক সংজ্ঞার সামনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যখন কুণ্ঠিত, তখন কে এই মানুষ, আইনের শাসনের নামে যিনি প্রকাশ্যে এমন বিনীত স্বরে কথা বলছেন! ক'ছত্র পড়েই জেনেছিলাম মানুষটি সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা রাখতে চান এমন কোন সমাজতত্ত্ববিদ কিংবা রাজনীতিক নন,—তিনি সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম সুখ্যাত বিচারপতি শ্রীগজেন্দ্রগদকার। আরও জেনে-ছিলাম শিরোনামটা শির মাত্র, তার-পর হৃদয়, মন ইত্যাদি আছে। বক্তা আসলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সামাজিক কল্যাণের মধ্যে যুক্তিপূর্ণ সামঞ্জস্য চান। আরও নিকষ করে বলেন—তিনি ভারতে সর্বাবস্থায় আইনের শাসন চান। বক্তৃতার উপলক্ষ্য—পশ্চিম ভারতের অ্যাড-ভোকেট অ্যাসোসিয়েশনের শতবার্ষিকী উৎসব। স্থান—বোম্বাই। তারিখ [illegible]ই অক্টোবর, ১৯৬৩ সন।

দশ দিনও ঘুরে আসেনি। তারই মধ্যে নতুন খবর: আগামী ফেব্রুয়ারী থেকে শ্রীগজেন্দ্রগদকার ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। খবরটা উৎসাহ-জনক। কেননা, শুধু এই একটি ভাষণ সার নয়, শ্রীগজেন্দ্রগদকারের গোটা জীবনের সার কথা এই—আইনের শাসন। ওয়াকিবহালরা জানেন, ভারতের শাসনতন্ত্রে ৩৬৮ নম্বর একটি ধারা আছে। তদনুযায়ী আমাদের শাসনতন্ত্র প্রথম দশ বছরে এগারবার সংশোধিত হয়েছে। এবং সে সংশোধনের পেছনে সুপ্রিম কোর্টের তীক্ষ্ণ চোখগুলোর ভূমিকা কি। ইদানীং আরও গুরুত্বপূর্ণ যেন তৃতীয় খণ্ডের ৩১ নম্বর ধারাটি। সেটি কেন্দ্র করে ব্যক্তি-স্বাধীনতার তর্কও আজ যেন প্রায় প্রাত্যহিক। সুতরাং এমন দিনে আইনের শাসন সম্পর্কে যাঁরা সত্যিই আগ্রহশীল, শ্রীগজেন্দ্রগদ-কারের নিয়োগ তাদের কাছে, অবশ্যই সুসংবাদ।

পুরো নাম—প্রহ্লাদ বালাচার্য গজেন্দ্রগদকার। বর্তমানে বয়স—বাষট্টি। (সুতরাং, নতুন আসনে থাকছেন মাত্র তিন বছর)। দেশ—মহারাষ্ট্র। লেখাপড়া—প্রথমে সাতারা হাইস্কুল, তারপর কর্নাটক কলেজ, ডেকান

কলেজ, এবং পুনা ল' কলেজ। সর্বত্র বিস্ময়কর প্রতিভার ছাত্র ছিলেন শ্রীগজেন্দ্রগদকার। কোথাও ফেলোশিপ, কোথাও দুর্লভ পুরস্কার, কোথাও বা নতুন কোন সম্মান—শ্রীগজেন্দ্রগদকার ছাত্র-জীবনে সমগ্র পশ্চিম ভারতে সংবাদ।

পুনা ল' কলেজ থেকে পড়া শেষে শ্রীগজেন্দ্রগদকার যখন অ্যাডভোকেটের পোশাকে বোম্বাই হাইকোর্টে যোগ দিয়েছেন (১৯২৬), তখন তাঁর বয়স মাত্র পঁচিশ বছর। সেই থেকে ১৯৫৭ সন অবধি আপন রাজ্য বোম্বাই ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। ১৯৪৫ সন অবধি কেটেছে স্বাধীন আইন ব্যবসায়। তার পরেরগুলো বিচারপতির আসনে। শ্রীগজেন্দ্রগদকার তৎকালে বোম্বাইতে বিখ্যাত বিচারপতি। সুপ্রিম কোর্টে এসেছেন তিনি ১৯৫৭ সনের জানুয়ারীতে। মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর একটি স্মরণীয় কীর্তি ব্যাঙ্ক অ্যায়োয়ার্ড। ১৯৫৫ সনের বিখ্যাত ব্যাঙ্ক অ্যায়োয়ার্ড কমিশনের তিনিই ছিলেন চেয়ারম্যান।

হিন্দু-আইনে ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট আইনবিশারদ শ্রীগজেন্দ্রগদকার আইনের প্রাঙ্গণ ছেড়ে কখনও কখনও বাইরেও পা দিয়েছেন সত্য, কিন্তু সে-ও আইনসূত্রেই। কিছুকাল তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-আইন পড়িয়েছেন। এক সময় তিনি 'হিন্দু ল' কোয়ার্টারলি'র সম্পাদক ছিলেন। তাছাড়া কর্নাটক এবং অন্যত্র আইন বিষয়ে তিনি ধারাবাহিক বক্তৃতা করেছেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত একটি আইনের পুঁথি—'নন্দ পণ্ডিতের দত্তক মীমাংসা'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সুপ্রিম কোর্টের নবনিযুক্ত বিচারপতি সংস্কৃতেও একজন প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত। সেই ছাত্রজীবনে ঝালার বিখ্যাত বেদান্ত পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন তিনি। দ্বিতীয় খবর, 'আইন ! আইন' করে বিরামহীন ধর্মযুদ্ধ চলিয়ে গেলেও মাননীয় বিচারপতি শ্রীগজেন্দ্রগদকার সমাজ-নিরপেক্ষ আইনের প্রবক্তা নন, তিনি মহারাষ্ট্র সমাজ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছেন একাধিকবার সে সমাজ সকলের স্বাধীনতার জন্যই ভাবিত। ২৩. ১০. ৬৩

গলব্রেথ, জন কেনেথ

সম্ভবত বাংলাতেই পড়েছিলাম। পড়ে চমকিত হয়েছিলাম। কেননা, বইটি ছিল প্রকাশ্যত ধনতন্ত্রের স্বপক্ষে।

তারপর হাতে এল একদিন—'এফ্লুয়েন্ট সোসাইটি' এবারও বিষয়-

বস্তু—ধনতন্ত্র। মার্কিন প্রাচুর্যতন্ত্র। অর্থনীতির বই, কিন্তু পড়তে পড়তে সাহিত্য পাঠের আনন্দ। যেমন সুখ-পাঠ্য, তেমনি যুক্তিসম্মত। কে লিখেছেন?—স্টাইল পাল্টে পার্কিন-সনই কি? — কিংবা রসট?—অথবা—। না, ওঁরা কেউ নন। লেখকের নাম—জন কেনেথ গলব্রেথ। মনে পড়ল সেই বাংলা বইটির কথা। তার লেখকের নামটাও যেন তাই ছিল।—গলব্রেথ! পরিচয়লিপি থেকে জানা গলব্রেথ হার্ভার্ড-এ পড়ান। এটি ছাড়া তাঁর অন্যতম বইটির নাম—'আমেরিকান ক্যাপি-টালিজম'।

ক্যাপিটালিজমের পক্ষে সওয়াল করেন বটে, কিন্তু গলব্রেথ ধনীর সন্তান নন। বিত্তবান ব্যবসায়ীও নন। তিনি আগাগোড়াই পড়ুয়া মানুষ।

জন্ম—১৯০৮ সনে এবং মার্কিন দেশে নয়, কানাডায়,—আইওনা স্টেশনের একটি গোলাবাড়ীতে। লেখাপড়া টোরোনটো এবং ক্যালি-ফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। '৩৩ সনে পড়া শেষ। '৩৪ সনে—পি. এইচ. ডি। সঙ্গে সঙ্গে কাজ জুটে গেল। হার্ভার্ড-এ টিউটর নিযুক্ত হলেন গলব্রেথ। কাজে থাকতে থাকতেই বিয়ে এবং কেম্ব্রিজে ফেলোসিপ। গলব্রেথ তিন পুত্রের পিতা।

'৩৯ সনে দেশে ফিরে প্রিন্সটন-এ যোগ দিলেন গলব্রেথ। সেখানে তিনি অর্থনীতির সহকারী অধ্যাপক। মাঝখানে কিছুদিন সরকারী চাকরী। তারপর ১৯৪৯ সনে আবার পুরানো হার্ভার্ড এ প্রত্যাবর্তন। গলব্রেথ সেই থেকে সেখানে অর্থনীতির অধ্যাপক। এবং মৌলিক অর্থনৈতিক চিন্তায় অধ্যাপক গলব্রেথ আজ বিশ্বের অন্যতম খ্যাতনামা পণ্ডিত। তাঁর 'এফ্লুয়েন্ট সোসাইটি' '৫৮ সনে মার্কিন দেশে 'বেষ্ট সেলার',—অন্য দেশে গালে হাত দিয়ে ভাববার মত বই।

সরকারী কাজেও গলব্রেথ মার্কিন দেশে খ্যাতিমান লোক। যুদ্ধের সময় তিনি কাজ করতেন 'প্রাইস এ্যাড-মিনিস্ট্রেশন' দপ্তরে এবং যুদ্ধের পরে স্টেট ডিপার্টমেন্টের 'ইকনমিক সিকিউরিটি পলিসি'র ঘরে। বোমার ফলে জার্মানী আর জাপানের আর্থিক ক্ষতি কত তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব সেদিন যাঁর ঘাড়ে পড়েছিল, তিনি গলব্রেথ।

এই বিখ্যাত গলব্রেথ এবার ভারতে আসছেন মার্কিন দেশের রাষ্ট্রদূত হয়ে। ক'মাস আগেও যে

দেশ ছিল তাঁর কাছে 'পোষ্টবক্স সোশ্যালিজমের দেশ' সেই দেশেই দায়িত্ব পড়েছে তাঁর। ষ্টীভেনসন-এর নির্বাচনী বন্ধু, কেনেডির নির্বাচনী উপদেষ্টা গলব্রেথ সম্ভবত এ কাজে পিছু-পা হবেন না। কেননা, ভারত যেমন সমস্যার দেশ, গলব্রেথও তেমনি সমস্যা-পাগল অর্থনীতিবিদ। ওঁরা বলেন—আমাদের আর্থিক বিস্তার ক্ষেত্রে কেনেথ এক দৈত্য।

দেখতেও। উস্কোখুস্কো চুল, ভাঙা চোয়াল, উদাসীন চোখ। কিন্তু উঠে দাঁড়ালে অন্য মানুষ। গলব্রেথ লম্বায় ছ' ফুট আট ইঞ্চি। আমেরিকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যিই ঐ মাপের কোন মানুষ নেই! ১২. ১. ৬১

গাগারিন, মেজর য়ুরি আলেক্সিভিচ

মস্কো শহরে অনেক গাগারিন। সংখ্যায় তাঁরা প্রায় বারশ'। কিন্তু কেউ তাঁরা এই গাগারিন-এর খবর রাখতেন না। এমন কি, দু' বছরের মেয়ে ইয়েলেনা পর্যন্ত না। সে জানত —বাবা কোথাও বাইরে গেছেন।

স্ত্রী ভ্যালেন্তিনাও প্রথম প্রথম কিছুই জানতেন না। য়ুরি ইচ্ছে করেই জানান নি। কেননা, ভ্যালেন্তিনার পেটে তখন গ্যালিয়া। এই মেয়েটি ভূমিষ্ঠ হয়েছে মাত্র এক মাস আগে। তারপর থেকে অবশ্য ভ্যালেন্তিনা সব খবরই রাখেন। এমন কি, 'বাইরে' মানে কোথায়, সে খবরও। কিন্তু তবুও গলা ফাটিয়ে কাঁদা গেল না। কেননা, খবরটা গোপন, এবং কান্নাটা লজ্জার। সুতরাং এক্ষেত্রে যা করা উচিত ভ্যালেন্তিনা তাই করলেন। দেশ এবং বিজ্ঞানে আস্থা রেখে তিনি স্বামীকে বিদায় অভিনন্দন জানালেন। য়ুরিকে এগিয়ে দিয়ে এসে চোখ মুছে নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকলেন। এবার প্রতীক্ষা, শুধু নীরবে নিঃশব্দে অপেক্ষা। কে জানে, হয়ত এ খবর কোনদিন কাউকে বলা যাবে না।—হয়ত, কোনদিন কেউ জানতেও পারবে না সে আজ কি করল।

'···মাত্র একশ' আট মিনিট। তারপর নিরাপদে অবতরণ, এবং সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশন। প্রতিবেশীদের চিৎকারে ভ্যালেন্তিনার ঘোর কেটে গেল। ছুটে গিয়ে তিনি টেলিভিশনের বোতাম টিপলেন। মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আপেল খাচ্ছিল ইয়েলেনা। আধ-খাওয়া আপেল তার হাতেই রইল। অবাক হয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল— 'ডাডি!—ডাডি!' উত্তেজনায় আনন্দে ভ্যালেন্তিনার দু'গাল বেয়ে জল এল।

—ইয়েলেনার 'ভাডি', তাঁর স্বামী য়ুরি এতক্ষণে নিশ্চয় বিশ্বখ্যাত লোক !

—বিশ্বখ্যাত ? না, তার চেয়েও বেশী কিছু। ওঁরা ওঁর নাম দিয়েছেন 'কলম্বাস অব স্পেস', কিন্তু য়ুরি বোধ হয় তাও নন। তিনি এমন কিছু যা কোনদিন কোথাও ছিল না। এমন কি, 'সায়েন্স ফিকসান'-গুলো বাদ দিলে আমাদের স্বপ্নেও না। য়ুরির জাহাজ আর একটি পৃথিবী আবিষ্কার করে ঘরে ফেরেনি, তিনি নিজের খবর নিয়েই মাটিতে নেমেছেন। মানুষ কি, তারই খবর। যাঁরা তা আনলেন তাঁদের কাছে যেমন চিরকালের মানুষের কৃতজ্ঞতা, যিনি আনলেন তিনিও তেমনি চির-কালের মানুষের গর্ব। কেননা, য়ুরি আমাদেরই মত এই পৃথিবীর মানুষ।

পুরো নাম—মেজর য়ুরি আলেক্সি-ভিচ গাগারিন। গাগারিন মানে —'বুনো হাঁস।

'বুনো হাঁস', কিন্তু জন্ম গৃহস্থের ঘরে। রাশিয়ার স্মলেনস্ক অঞ্চলে ঘাৎস্ক জেলায় একটি যৌথ খামারে। জন্ম তারিখ—১৯৩৪ সনের ৯ই মার্চ।

সাত বছর বয়সে কৃষকের ছেলে স্কুলে ভর্তি হলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে গেল রুশ ভূমিতেও মহাযুদ্ধ। বাধ্য হয়ে পড়া বন্ধ করে দিয়ে ছেলেকে নিয়ে বাবা চলে এলেন জেলা শহরে।—ঘাৎস্ক-এ। সেখান থেকে ছেলে গেল মস্কোর কাছাকাছি আর এক শহরে, লুবার্ৎসিতে। সেখানে সে টেকনিক্যাল স্কুলে পড়বে। '৫১ সনে সে পড়া শেষ হল। গাগারিন ঢালাই শিল্পী হলেন। এবার পড়তে হলে অন্যত্র।

'৫৫ সনে সারাতফে নামক আর একটি শিল্প-বিদ্যালয় থেকে স্নাতক হলেন তিনি। তারপর ভর্তি হলেন আরেনবুর্গে একটি বিমান শিক্ষালয়ে।

বিমান গাগারিনের চিরকালের নেশা। বাল্য থেকেই তাঁর স্বপ্ন তিনি বিমানচালক হবেন। নিত্যনতুন অভিযানে বের হবেন। যেমন হয় জুলে ভার্নের রোমাঞ্চ কাহিনীর নায়কেরা। এই নেশার বশেই সারাতফে-র স্কুলে পড়তে পড়তে স্থানীয় 'এরো-ক্লাব'-এ নাম লিখিয়েছিলেন তরুণ গাগারিন। শিখেছেনও অনেক কিছু। কিন্তু খ্যাতিমান বৈমানিক হতে হলে সেটুকু যথেষ্ট নয়। সুতরাং, চল আরেনবুর্গ।

'৫৭ সন। গাগারিন তখন আরেন-বুর্গ-এ। এমন সময় সহসা সেই যুগান্ত-কারী খবর—'স্পুটনিক'! প্লেনে চড়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন তরুণ বৈমানিক। আনন্দে তিনি গেয়ে উঠলেন—'হাইয়ার, হাইয়ার এণ্ড

হাইয়ার উই স্পীড আওয়ার বার্ডস !' —আহা আমি যদি এমন পাখী হতে পারতাম।

সহজ নয় ত বটেই, বোধ হয় আর সম্ভবও নয়। সে বছর শুধু বৈমানিক হয়েই বের হননি গাগারিন, সোবিয়েত বিমান বহরের মেজর আরেনবুর্গ থেকে গৃহস্থ হয়েও ফিরেছেন। আরেনবুর্গেই ডাক্তারি, পড়তেন ভ্যালেন্তিনা। তাঁকে নিয়ে তিনি ঘর বেঁধেছেন। সে ঘরে আরও বন্ধন আগতপ্রায়।

তবুও তরুণ কমিউনিস্ট প্রতিষ্ঠানের সদস্য, প্রাণবান ক্রীড়াবিদ গাগারিন চেষ্টা করে চললেন। ১৯৬০ সনের জুন মাসে পার্টির সদস্যপদ মিলল। এবং তারপর এল ১৯৬১ সনের ১২ই এপ্রিল পার্টি, দেশ এবং বিশ্বমানুষের হয়ে সেই বিজয়গৌরব।

'হীরো অব দি সোভিয়েট ইউ-নিয়ান', 'অর্ডার অব লেনিন' এবং ইত্যাদি পুরস্কারে সম্মানিত গাগারিন-এর সবচেয়ে বড় গৌরব বোধ হয় এটাই যে, তিনি এখনও এই মাটির পৃথিবীরই মানুষ ! ২০. ৪. ৬১

গান্ধী, ইন্দিরা

পঁয়তাল্লিশ কোটি মানুষের উচ্চকিত হাহাকারের মধ্যে তবুও সবচেয়ে তীব্র যেন সেই মূক প্রতিমাটি। তিন-মূর্তির দোর গোড়ায় দণ্ডায়মান সাদা থানে মোড়া সে মানব-দুহিতা যেন ক্ল্যাসিক্যাল কোন শিল্পীর ছেনিতে কাটা কোন শ্বেতপাথরের মূর্তি।—অথবা যেন মহত্তম ট্যাজেডির সফলতম কোন রূপ। তিন-মূর্তির সেই প্রস্তরী-ভূত শোক যখন নিঃশব্দে শ্বাস ফেলে কোটি মানুষের কান্না তখন স্তব্ধ,—সেই বায়ুবিন্দুই দিকে দিকে হাহাকার হয়ে ফেরে ; শান্তিঘাটে সে প্রতিমা যখন ঠোট নাড়ে, যখন অস্ফুট দুটি শব্দে বলে—'পাপু, বিদায় !' তখন ক্ষুধিত অগ্নিও যেন ধর্ম ভুলে বিষন্ন হয়ে যায়,—একটি কন্যার নিঃসঙ্গতা মুহূর্তে সমগ্র বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। প্রিয়দর্শিনী থৈ থৈ সে কৃষ্ণসাগরেও যেন স্থির একটি শ্বেতপদ্ম। ম্রিয়মান, তবুও ভাসমান। শোকের এই গম্ভীর, পবিত্র, সংহত প্রতিকৃতি বোধহয় একমাত্র জওহরলাল-দুহিতার পক্ষেই সম্ভব। সম্ভবত একালের পৃথিবীতে তাঁর সঙ্গে একমাত্র তুল্য ডালাস, এবং তারপর আর্লিংটনের সমাধিক্ষেত্রের 'জ্যাকি',—মিসেস কেনেডি দু'জনেই এক নারী, দু'জনেই সমান অনির্বচনীয়।

তবুও চলতে হবে। চলতে হয়। কেনেডির পরে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে

অধস্তন পুরুষ রেণ্ডলফ-তনয় উইনস্টন সে প্রত্যাশাকে পূর্ণ করেছিলেন। যদিও কন্যাসন্তান,—তবুও কে জানে, এই ইন্দিরাতেই হয়ত জওহরলাল একদিন সম্পূর্ণ হবেন!

সেই অবিস্মরণীয় গৃহ—'আনন্দ-ভবন'। অতএব, বলা নিষ্প্রয়োজন ইন্দিরা ভারতীয় রাজনীতির কোলের সন্তান। তিনি সঙ্গত কারণেই বলতে পারেন—কংগ্রেস মঞ্চে আমার প্রথম আবির্ভাব তিন বছর বয়সে! কেননা, সুইমিং পুলের খেলা শেষে ফুটফুটে মেয়েটি ছুটে এসে যখন দাদুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত, প্রবীণ মতিলাল নেহরুর বেতের চেয়ারটি ঘিরে তখন হয়ত সমগ্র ভারতের সেরা জাতীয়তা-বাদীরা সমবেত। তারই মধ্যে কোন এক প্রত্যুষে মেয়েটি যখন শুনত পুলিশ বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে, তখন তার পুতুল খেলায় পুলিশের আবির্ভাবও স্বভাবতই অনিবার্য হয়ে উঠত। একদল পুতুল পুলিশ হত, আর একদল স্বদেশীওয়ালা। তার এই শৈশব খেলায় মদত জোগাতেন বাবার এক সহযোদ্ধা, বন্ধু। বয়সের ব্যবধান ভুলে তিনি তখন নিঃসঙ্গ শিশুর খেলার আসরে নিত্যসঙ্গী। ধারাবাহিকতা এখানেও। সেই ক্রীড়াসঙ্গীরা আজও সঙ্গী। ফিরেছিলেন মিসেস কেনেডি। জওহর-লালের পরে, পিতার শেষ মর-অবশেষ ভস্মটুকু প্রয়াগের জলে ভাসিয়ে দিয়ে ইন্দিরা ফিরে এলেন আরও রুক্ষ পৃথি-বীতে,—নেহরুহীন ভারতের রাজ-নৈতিক মঞ্চে। দিল্লির ঘোষণাঃ তিনি জাতির নব-কর্ণধার শাস্ত্রীজীর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। মতিলাল নেহরুর পৌত্রী, কমলা নেহরুর কন্যা, জওহরলালের প্রাণপ্রতিম 'ইন্দু' রাজ-নীতিকেই স্থায়ী ঘর হিসেবে গ্রহণ করেছেন, শাস্ত্রীজীর মন্ত্রিসভায় তিনি তথ্য ও বেতারমন্ত্রীর দায়িত্ব নিচ্ছেন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য। কেননা অন্যান্য দিক ছাড়াও সরকারীভাবে ইন্দিরার এই আবির্ভাব ধারাবাহিকতার দিক থেকেও স্মরণীয় ঘটনা। তাঁর পদসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে নেহরু-পরিবারের যোগ তৃতীয় পুরুষে পৌঁছাল। সমসাময়িক পৃথিবীতে সফল ধারাবাহিকতার একমাত্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সম্ভবত বৃটেনের চার্চিল পরি-বার। প্ল্যাটো বলেছিলেন—প্রগতির একমাত্র প্রতিশ্রুতি সেখানেই নিশ্চিত যেখানে 'ইম্‌মরটাল সান্‌স ডিফায়িং দেয়ার ভাদারস!' মার্লবরোর ডিউকের

ইন্দিরার সেই সহচরের নামই লালবাহাদুর শাস্ত্রী।

মাতৃগত-প্রাণ মেয়ে। এখনও সগর্বে বলেন—আমি মায়ের মেয়ে। কথাটা সত্য। কিশোরী ইন্দিরার কাছে মা ছাড়া দ্বিতীয় নারী জোন অব আর্ক। তাঁকে ভালবেসেই নাকি ইন্দিরা আবাল্য বিদ্রোহী। বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে শুনে সে বাড়ির সমুদয় পুতুল ডেকে সভা জমায়,—টেবিল থাবড়ে তাদের বিদ্রোহী বানাতে চায়। আবার মায়ের রুগ্ন মুখখানার কথা ভাবলেই তার কান্না পায়। তবুও শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা—নেহরু কন্যা। বিদেশীরা, দেশ বিদেশের পুরানো নেহরু-বন্ধুরা দু' দণ্ড কথা বলেই নির্দ্বিধায় বলে দেন: সী ইজ এ নেহরু। কেউ বলেন—এ পলিটিক্যাল প্রজেক্শন অব হার ফাদার! কেউ বলেন—এগেন সেম কেস্ অব অ্যারেসটেড ইডিওলজিক্যাল ডেভলাপমেণ্ট!'

ইন্দিরা দ্বিতীয় নেহরু, নেহরুর আপন হাতে গড়া তাঁর দ্বিতীয় স্বরূপ। সেও যেন এক অনন্য পিতৃহৃদয়। উদ্বেগমথিত পিতা দশ বছরের মেয়েকে চিঠিতে পৃথিবীর রূপান্তর শেখাচ্ছেন (লেটারস ফ্রম এ ফাদার……), নৈনী সেণ্ট্রাল জেল থেকে তেরো বছরে মেয়ে তিন বছর ধরে চিঠিতে চিঠিতে পড়ে গেল—বিশ্ব ইতিহাসের কাহিনী (গ্লিম্পসেস…')। সে চিঠির ফাঁকে ফাঁকে পিতার প্রাণের কথা—'ইন্দিরা মনে রেখো পৃথিবী বদলায়।'—'ইন্দিরা আশা করি বড় হয়ে তুমিও একজন মুক্তিযোদ্ধা হবে।' আবার কখনও বা প্রত্যাশা পুরণের সম্ভাবনায় উৎফুল্লিত পিতার গর্ব: বুদ্ধিতে এবং মাথায় তুমি এমন চটপট বড়ো হয়ে উঠছ।… আর কিছুদিন পরে হয়ত তুমিই শিক্ষক হয়ে অনেক নতুন নতুন শেখাবে আমাকে।……

ইন্দিরার শিক্ষা নিয়ে সেদিন সত্যই ভাবনার অন্ত ছিল না জওহর-লালজীর। সুইজারল্যাণ্ড, পুণা, বিশ্ব-ভারতী, অক্সফোর্ডের সমরভিল কলেজ অনেক জায়গায় পড়েছেন প্রিয়দর্শিনী। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তার মধ্যে একটু বিশেষ ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছে যা সে ঐ অক্সফোর্ডের দিনগুলো। প্লুরিসির জন্য শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারেননি ইন্দিরা। কিন্তু সেদিনের লণ্ডন জীবনে যা পেয়েছিলেন তাঁর কাছে আজও তা অমূল্য। বেভিন, উইলকিনসন, ল্যাস্কি, মেনন—সবাইকে তাঁর সেখানেই পাওয়া। ইন্দিরা সেদিন কেম্ব্রিজের

নেহরুর চেয়েও জীবন্ত ছাত্রী। তিনি বৃটিশ লেবার পার্টিতে নাম লিখিয়েছিলেন। লেবার রেলিতে কৃশতনু এই ভারতীয় তরুণীটি সেদিন একটি নবীন শিখার মত। সন্ধ্যার অবসরটুকু কাটত ইণ্ডিয়া লীগে। বাকীটুকু স্কুল অব ইকনমিকস-এর সহযোগী অপ্রতিরোধ্য ফিরোজের সান্নিধ্যে। বাবার পরে, এঁরা প্রত্যেকেই তাঁর জীবনে ঘটনা।

ফিরোজ গান্ধীর সঙ্গে ইন্দিরার বিয়ে হয়—১৯৪২ সনের ২৬শে মার্চ। ইন্দিরা তারপর থেকে এক পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক অস্তিত্ব। অবশ্য বাবা যেটুকু সময় কেড়ে নিচ্ছেন, সেটুকু বাদ দিয়ে। মায়ের মৃত্যু— ৯৩৬ সনে। নিঃসঙ্গ নেহরুর জীবনে ইন্দিরা সেই থেকেই একমাত্র সান্ত্বনা। দুরন্ত নেহরু একমাত্র তাঁরই বশ। দুর্দ্ধর্ষ নেহরু একমাত্র তাঁর কাছেই শান্ত। স্বভাবতই ইন্দিরার সবটুকু জীবন সম্পূর্ণত তাঁর নিজস্ব নয়। তবুও যখনই সময় আসছে, তখনই তিনি 'ধাত্রী' পরিচয় সরিয়ে রাজনৈতিক। একদা কিশোরী নেহরু-দুহিতা ষাট হাজার বালক-বালিকার 'মাংকি-ব্রিগেড' তথা বানর-সেনা সাজিয়ে এলাহাবাদ সহ সারা ভারতকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন, এবার ফিরোজ আর ইন্দিরা গড়লেন আরও বিশাল বাহিনী—ছাত্র ফেডারেশন। তারপর তেরোমাসব্যাপী সেই জেল-জীবন, কংগ্রেস, স্বাধীনতা, দিল্লীর আধা-সরকারী জীবন এবং পরবর্তীকালের ভুবন বিখ্যাত ইন্দিরা। তিনি কখনও চীনে, কখনও রাশিয়ায়, কখনও আমেরিকার বিশ্বমেলায়, কখনও আফ্রিকায়। সবত্র তিনি দ্বিতীয় নেহরু। চীনে কম্যুনিস্ট মেয়েদের ভিড়ে তাঁকে দেখে বিদেশী সাংবাদিকের কলমে একটি তুলনা আসে—এ লোটাস ফ্লাওয়ার ইন এ বেড অব ব্রোকোলি।

ভারতীয় রাজনীতিতেও ইন্দিরা দ্বিতীয় নেহরু হয়েও একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। ১৯৩৮ সন থেকে তিনি কংগ্রেসে আছেন, ওয়াকিং কমিটিতে ১৯৫৫ সন থেকে। তদুপরি অসংখ্য সমাজহিতমূলক প্রতিষ্ঠানের তিনি নেত্রী অথবা ধাত্রী। কিন্তু আজ অবধি কংগ্রেসের ঘরের অন্যতম এই ভোট বিজয়িনীকে নিজে নির্বাচনে প্রার্থী হতে দেখেননি কেউ। পন্থজী একবার নাকি বিশেষ করে চেষ্টা করেছিলেন। ইন্দিরা রাজীব এবং সঞ্জয়ের অজুহাত তুলে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। ছেলেরা যখন বড় হয়েছে

গায়ত্রী দেবী, মহারাণী

(জন্ম—যথাক্রমে ১৯৪৪ এবং '৪৬) তখনও তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। অনেক অনেক চেষ্টা করে ১৯৫৯ সনে কংগ্রেসের 'জিঙ্গায় গ্রুপ'-এর নায়িকাকে কংগ্রেস সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ইন্দিরা সেখানে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছিলেন—ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বাবার নাম কেটে দিয়ে। ভাষাভিত্তিক মহারাষ্ট্র, কেরলে কম্যুনিষ্ট শাসন, দালাইলামা-প্রসঙ্গ ইত্যাদি বহু বিষয়েই পিতার সঙ্গে সেদিন তাঁর মতান্তর। কিন্তু তবুও বছর যখন ঘুরে এল—কন্যা আবার সেই তিনমূর্তির ভবনেই পিতার সহচর। এমন কি ফিরোজ গান্ধীর নামেও চিঠি আসে তখন—'কেঃ অঃ রাজীব ও সঞ্জয়, প্রাইম-মিনিস্টারস হাউস, নিউ দিল্লি।'

এবার সেখান থেকেই কর্কশ রাজনীতিতে নেমে আসছেন নেহরু-দুহিতা। তাঁর এই পদসঞ্চার সাগ্রহে লক্ষ্য করার মত। নতুন কিছু দিতে পারলে তবেই তিনি প্লেটোর পছন্দের উত্তরপুরুষ। আর যদি তা নাও পারেন, তা হলেও ক্ষতি নেই। জওহরলালের যুগের পূর্ণতার পক্ষে একটা কারণ হয়ে বেঁচে থাকাটাও এদিনে কম কথা নয়। 'ইন্দু' সেটুকু পারবেন অবশ্য। ১১.৬.৬৪

গায়ত্রী দেবী, মহারাণী

কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে ক্যামেরার চোখে দেখলে বিশ্বের প্রথম দশজন সুন্দরীর একজন। হ্যাঁ, এই একচল্লিশ বছর বয়সেও।

শুধু রূপে নয় গুণেও। মোটর ত বাঁ হাতে,—তিনি ঘোড়ায় চড়তে পারেন, পোলো খেলতে পারেন—আর শিকার? এমন যে দুর্ধর্ষ রাণী এলিজাবেথ তিনিও শুনে তাজ্জব বনে গেলেন ;'—বল কি সাতাশটা বাঘ মেরেছ নিজের হাতে ?

'—এখন আর মারি না। মারতে ভাল লাগে না,—কেমন জানি মায়া লাগে।' হেসে উত্তর দিয়েছিলেন পুরাদস্তুর শিকারীর বেশে পাশে দণ্ডায়মান রাইফেল ধারিণী। ও বেশে ওঁকে নাকি মনে হয় ঝাঁসীর রাণী!

রাজাজী বলেন—তিনি শুধু ঝাঁসীর রাণী নন,—একাধারে তিনি লক্ষ্মী এবং লক্ষ্মীবাঈ, তদুপরি তিনি সীতাও।

বাংলা দেশের মেয়ে। নাম—মহারাণী গায়ত্রী দেবী। কোচবিহারের রাজকন্যা, বরোদার ভাগ্নী—গায়ত্রী দেবী এখন রাজস্থান মহারাজ মান-বাসিনী। তিনি সিংহের গৃহিনী,

(তৃতীয় স্ত্রী। পূর্ববর্তী দু'জন বেঁচে নেই)—রাজস্থানের অন্যতম ঐতিহ্যবান রাজ্য জয়পুরের মহারাণী। আশ-পাশের সমুদয় রাজ্যের প্রজারা বলে —তিনি আমাদের মা-রাণী।

তবে প্রজা-বাৎসল্যের কারণ নয়, জয়পুরের মহারাণী আজ সংবাদ অন্য কারণে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জয়পুর থেকে তিনিই এবার লোকসভায় প্রার্থী সেজেছেন। তার চেয়েও বড় খবর গোটা রাজস্থানে তিনিই এবার স্বতন্ত্র পার্টির মা-জননীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

চোখে সানগ্লাস, পরিধানে সিফনের শাড়ী—স্বতন্ত্র পার্টির নেত্রী রাজস্থানের ইতিহাসে নাকি এক স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছেন। নিজের হাতে ক্যাডিলাককে ধুলো উড়িয়ে গাঁয়ের পর গাঁ তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন —বক্তৃতা দিচ্ছেন।

কথায় কথায় হাততালি পড়ছে সত্য, কিন্তু গায়ত্রী দেবী তবুও নাকি বক্তা হিসেবে তেমন সুবিধের নন। কেননা, তিনি লেখা কাগজ দেখে দেখে কথা বলেন, এবং উচ্চারণ কখনও কখনও সত্যই নাকি বোঝার পক্ষে কষ্টকর।

অভিযোগটা সম্ভবত সত্য। কেননা, হরফগুলো ইংরেজী হলেও কাগজগুলো লেখা আসল হিন্দিতে। বাংলার মেয়ে গায়ত্রী শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী। তিনি বাংলা জানেন, সুইজারল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ডে পড়া জয়পুরের মহারাণী ইংরেজীও চমৎকার জানেন। কিন্তু হিন্দী এখনও নাকি তাঁর ততখানি রপ্ত হয়নি। উল্লেখ-যোগ্য, যদিও চারচারজন সেক্রেটারীর হাতের লেখার সাক্ষ্য পাওয়া যায় কাগজগুলোতেই তবুও বক্তৃতাগুলো নিজেরই লেখা। ওয়াকিবহালরা বলেন—প্রাসাদে থাকলে প্রতিদিন ভোর সাতটায় মহারাণী এখন ইংরেজীতে ডিক্টেশন দিতে বসেন, সেক্রেটারীরা তা হিন্দী করে তাকে ফেরৎ দেন।

ক'মাস আগেও এ মহিলাটি ভোরের এই সময়টায় কি করতেন জানেন? একটা সাদা ঘোড়ায় চড়ে আঠারোটা ঘোড়ার তদারকি করতেন। সে হলো তাঁর পোলো খেলার ঘোড়া।

৩০. ১১. ৬১

গিজেঙ্গা, এন্টনি

অবশ্য পশ্চিমীদের সাক্ষ্য।

ওঁরা বলেন—তিনি রাজনীতি জানেন না, তিনি কূটনীতি জানেন না,

গিজেঙ্গা, এণ্টনি

তিনি ভাল বক্তৃতা পর্যন্ত করতে পারেন না। এমন কি, এণ্টনি গিজেঙ্গা নিজের মাতৃভাষা সোয়াহিলিতে জনতার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে পারেন না!

আশ্চর্য, তা হলেও লুমুম্বার মৃত্যুর পরে কঙ্গোর জনতা বিনা বাক্য ব্যয়ে শিরোপাটি কিন্তু তুলে দিয়েছিল ওঁরই মাথায়। লিওপোল্ডভিল থেকে ওঁরই চোখের ইঙ্গিতে কঙ্গোর রাজধানী সেদিন স্থানান্তরিত হয়েছিল স্টানলভিল-এ, ওঁর নিজের ঘরে। ওঁরা কৈফিয়ত দিয়েছিলেন—গিজেঙ্গা এমন জনপ্রিয়, কারণ লুমুম্বার ভাই লুই ওঁর বন্ধু—পার্শ্বচর। কিন্তু তাই কি?

আসল কারণ সম্ভবত এই যে, লুমুম্বা নিজেই ওঁর মধ্যে বেঁচে ছিলেন।

লুমুম্বার মতই দীর্ঘকায়। লুমুম্বার মতই তীব্র জাতীয়তাবাদী। বয়সেও দু'জনেই প্রায় সমবয়সী। এণ্টনি এবার চল্লিশে পড়লেন। কিন্তু কুড়ি বছর বয়স থেকেই তিনি—লুমুম্বাপন্থী, অর্থাৎ বেলজিয়ানবিরোধী।

এই সাম্রাজ্যবাদ বিরুদ্ধতাই একদিন ওরিয়েণ্টাল প্রদেশের জনৈক স্কুল-শিক্ষক গিজেঙ্গাকে টেনে এনেছিল বেলজিয়ান সাম্রাজ্যের রাজধানীতে। তরুণ জাতীয়তাবাদী লুমুম্বার পাশাপাশি সেদিন নিজস্ব একটি দল গড়েছিলেন। স্বতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দল। কিভু এবং ওরিয়েণ্টাল প্রদেশ সানন্দে এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর পতাকা তলে!

কিন্তু দল হাতে পেয়েও খুশী নন গিজেঙ্গা। কেননা, দীক্ষা তাঁর তখনও অসম্পূর্ণ। অথচ, বিদেশী বেলজিয়ানদের তাড়ান মাত্র যে সমস্যা দেখা দেবে, কঙ্গোর মত দেশে সেটা সামলানো কাঁচা রাজনীতিকের কর্ম নয়। লিওপোল্ডভিল থেকে সাধক তাই সেদিন পাড়ি জমিয়েছিলেন প্রাগ-এ। দু'-বছর শিক্ষানবীশ ছিলেন সেখানকার ইনষ্টিটিউট ফর আফ্রিকান স্টাডিজ-এ। তারপর ফিরে আসামাত্র স্বাধীনতা এবং পরবর্তী কান্নাময় কঙ্গো-সংবাদ।

গোড়ার দিকে সে খবরে অনেকের চেয়েই অগ্রবর্তী ছিলেন এণ্টনি গিজেঙ্গা। '৬০ সনের নির্বাচনে পার্লামেণ্টের ১৩৭টি আসনের মধ্যে ১৩টিই তখন তাঁর দখলে। লুমুম্বা পেয়েছিলেন ৩৬টি। সুতরাং, তাঁর সমর্থন-বলেই লুমুম্বা সেদিন প্রধানমন্ত্রী। গিজেঙ্গাকে সহকারী প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে লুমুম্বা স্বীকার করেছিলেন এই সমর্থনের মূল্য।

কিন্তু আজ অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। কেননা, লুমুম্বা আজ নেই। এবং ইতিমধ্যে বহু জল (তৎসহ রক্ত) বয়ে গেছে কঙ্গো নদীতে। ফলে, ক' মাস আগেও স্টার্নলিভিল-এর যে গিজেঙ্গাকে বাদ দিয়ে কঙ্গো ছিল অভাবিত আজ সেই মুক্তিযোদ্ধাই নিন্দিত, অপমানিত। শোনা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় সরকারকে অমান্য করার অপরাধে তাঁর বিচার হবে!

কিন্তু সে বিচার করবে কে? কঙ্গোয় কি এখনও কোন পরিচ্ছন্ন হাত আছে? ১৮. ১. ৬২.

গুপ্ত, চন্দ্রভানু

চন্দ্র এবং ভানু দুই-ই। এবং বোধ হয় কোনটাই গুপ্ত নয়। চাঁদ ভাবে চন্দ্রভানু গুপ্তের পরিচয়গুলো অবশ্য কিঞ্চিৎ পুরানো। তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণচন্দ্র (এম. এ., এল. এল. বি), এলাহাবাদ হাইকোর্টের চাঁদের-সভায় স্মরণীয় চাঁদ। কাকোরি ট্রেন ডাকাতি মামলায় রামপ্রসাদ 'বিসমিল' এবং আসফাকউল্লার পক্ষের অ্যাডভোকেট তরুণ চন্দ্রভানু গুপ্ত সেদিন দেশময় সংবাদ। লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যালিটি, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট··· উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস বা মন্ত্রিসভায় অন্যতম নিষ্ঠাবান 'ভারত সেবা সন্তান' (চন্দ্রভানু নিজেই এই প্রতিষ্ঠানটির জনক) চন্দ্রভানু অবশ্য সেদিন সব সময় সমান মাপের জ্যোতিষ্ক ছিলেন না, কিন্তু সর্বদাই তিনি স্নিগ্ধ কোমল, এবং তদীয় মূল গ্রহের অনুগত। সেদিনের চাঁদে জ্যোতির অভাব হয়ত ছিল, কিন্তু কোন কলঙ্ক ছিল না।

প্রখর ছাত্র ছিলেন। লক্ষ্ণৌর এম. এ এবং এল. এল. বি। সে '২৫ সনের কথা। চন্দ্রভানু আদালতে যোগ দিলেন। পাঁচ বছর পরে, অর্থাৎ, '৩০ সনেই দেখা গেল তার পক্ষে দাঁড়িয়ে অন্য আইনজীবীদের সওয়াল করতে হচ্ছে। চন্দ্রভানু এখন রাজনৈতিক মানুষ।

'২৬ সন থেকেই তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেসের সদস্য। '২৭এ এলেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলীতে, '২৮ সনে মিউনিসিপ্যালিটিতে এবং তার পরের বছর জেলা কংগ্রেসে। চন্দ্রভানুর উদয় যেন সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।

ক'টা বছর মেঘে কাটল। '৩০, '৩১, '৩২, '৩৩ জেলখানায় চলে গেল। '৩৭ সনে চন্দ্রভানু এলেন উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায়। '৪৬ সনে আবার। এবার চন্দ্রভানু তাঁর জীবনের মধ্যাহ্নে।

প্রথম বছরটা কাটল মুখ্যমন্ত্রীর পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারী হিসেবে। পরের বছর মন্ত্রী হলেন তিনি। '৪৭ থেকে '৫৭—একটানা দশ বছর মন্ত্রিত্ব। চন্দ্রভানু তখন ইউ. পি'র অন্যতম বিশিষ্ট মন্ত্রী। প্রথমে হাতে ছিল খাদ্য এবং সরবরাহ দপ্তর। ক্রমে এল—শিল্প, পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য এবং ইত্যাদি। ফলে '৫৭ সনের নির্বাচনে প্রজাসমাজতন্ত্রী ত্রিলোকী সিং যখন তাঁকে ভূপাতিত করলেন—লোকে বলল লোকটা দিনে দুপুরে সূর্যগ্রাস করল। চন্দ্রভানু গুপ্তের পরাজয় উত্তর ভারতে সেদিন একটা ঘটনা।

চন্দ্রভানু আবার উঠতে চাইলেন। এবার উপনির্বাচন, এবং মফস্বলে। সুতরাং, আশা ছিল। কিন্তু এবারও প্রজাসমাজতন্ত্রী প্রার্থী শ্রীমতী রাজেন্দ্র কিশোরের কাছে পরাজয় বরণ করতে হল তাঁকে। বোঝা গেল—ইউ. পি তাঁকে খারিজ করে দিয়েছে। তাদের মনে চন্দ্রভানু গুপ্ত নামক সূর্যটির অস্ত ঘটে গেছে।

আবার উদিত হয়েছেন চাঁদ। সুকৌশলে মেঘ ফুঁড়ে আবার আবির্ভূত হয়েছেন তিনি ইউপি'র অনুজ্জ্বল আকাশে। কিন্তু ১৯৬০ সালের অক্টোবর থেকে চন্দ্রভানু বোধ হয় আর সেই ছোট-খাটো নিটোল চন্দ্রটি নন। ইদানীং তাঁর দ্বিতীয়ার্ধ-টিই বোধ হয় অধিকতর প্রবল। একষট্টিতে চন্দ্রভানু এখন রীতিমত প্রখর, প্রবল এবং উত্তপ্ত। যদিও 'চিরকুমার' তবুও সংসার ভাঙ্গা-গড়ার এক অদ্ভুত নেশা তাঁর। দুই তিন বছর আগে নির্বাচনে হেরেও বাইরে থেকে সম্পূর্ণ নিজের প্রখরতায় সুসংগ-ঠিত মন্ত্রিসভাকে তছনছ করে গদিনসীন হয়েছেন তিনি। সে উদ্দণ্ড মার্তণ্ডের সামনে পড়ে, নক্ষত্র পূজারী জ্যোতিষীশ্রেষ্ঠ-আয়ুবান ডঃ সম্পূর্ণানন্দ আজ রাজ্যত্যাগী, তিনি নিছক রাজ্যপাল। চন্দ্রভানু সেদিক থেকে এক বিস্ময়কর প্রতিভা। উপগ্রহ থেকে নিজেকে তিনি যেভাবে পরিপূর্ণ গ্রহে রূপান্তরিত করেছেন তা বাস্তবিকই চমৎকার।

বলা অনাবশ্যক, এই সূর্যোদয়ের পথে কিঞ্চিৎ গোলমাল ছিল। ভারতের বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশের আকাশে চন্দ্রভানু যে পথে রাত ভোরে সূর্য হয়ে উঁকি দিয়েছিলেন অনিবার্য-ভাবেই তা ছিল গলি পথ। দলাদলির সেই রন্ধ্রগুলোই আজ অতিকায় গহ্বর হয়ে তাঁর পায়ের সামনে,—মার্তণ্ডকে ঘিরে খণ্ড খণ্ড মেঘ। বিব্রত চন্দ্রভানু

জানেন তাঁর পক্ষে সেখান থেকে রাহুমুক্তি সহজ নয়। কেননা, হালের যাবতীয় হট্টগোলের কেন্দ্রে যিনি, নাম তার—আলগুরাই শাস্ত্রী। কাশী বিদ্যাপীঠের ছাত্র বটে, কিন্তু উত্তর প্রদেশের বনমন্ত্রী বৈদিক যুগের সন্ন্যাসী নন,—রাজ্যের লোকেরা জানেন কথায় কথায় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ান অবশ্য, কিন্তু সেগুলো অধিকাংশই একজনের। শ্রীআলগুরাই কার্যত মর্ডান চাণক্য। ইতিমধ্যেই দেখা গেছে মন্ত্রিসভায় অনেকেই মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে নেই। রাজ্য কংগ্রেস, যেখানে এককালে চন্দ্রভানু ছিলেন বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট তাও বহুলাংশে হাতছাড়া। তবে কি এরই মধ্যে সূর্যের আলো হারাবার সময় হয়ে গেল? অসম্ভব নয়। কেননা, মাত্র তিনদিন আগেও দেখা গেছে কৃষ্ণবর্ণ সূর্যও সম্ভব। ২৫ ৭. ৬৩

গুরসেল, জেনারেল

'দেশে আজ রাজনৈতিক ঝড় বইছে, যে করে হক এই দুষ্ট আবহাওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করো। যে করে হক রাজনীতি থেকে দূরে থাকো' —সংক্ষিপ্ত বিদায়বাণী। তুরস্কের স্থল-বাহিনীকে বিদায় অভিনন্দন জানাচ্ছেন তাঁদের প্রিয় অধিনায়ক জেনারেল কেমল গুরসেল। অসময়ে অপ্রত্যাশিত সংবাদ। জুলাইয়ে গুরসেল-এর অবসর গ্রহণের কথা। কিন্তু মে'র প্রথম সপ্তাহেই শোনা গেল, তিনি দু' মাসের ছুটি নিয়েছেন। বোঝা গেল, মেণ্ডেরেস-সরকার তাঁকে চিরকালের মত বিদায় দিয়েছেন। গুরসেল গোটা তুর্কী-বাহিনীর 'জেমাল', প্রিয়-পুরুষ। সৈন্যরা তাই তার বিদায়বাণীটি মনোযোগ দিয়ে শুনল, ভাবল, কিন্তু মানল না।

তিন সপ্তাহও কাটল না। ইস্তাম্বুল, আঙ্কারার পথে পথে ট্যাঙ্ক নামল, পলায়মান মেণ্ডেরেস বন্দী হলেন এবং তুরস্কে ফৌজী-শাসন কায়েম হল। দেখতে দেখতে অস্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠিত হল। সামরিক অসামরিক মিলিয়ে আঠারজনের ন্যাশনাল ইউনিটি কমিটি। লক্ষ মানুষের আনন্দ ধ্বনির মধ্যে আঙ্কারার নৌজোয়ানেরা শুনল সেই কমিটির শীর্ষে যিনি বসেছেন তিনি আর কেউ নন, জেনারেল গুরসেল।

ইয়া উঁচু ভারিক্কি চেহারা। মাথায় শনের মত পাকা চুল। বয়স ষাটের ঊর্ধ্বে। জেনারেল গুরসেল এই নয়া জামানার মানুষ নন। চেহারায় কিছুটা মিশরের নাগিব-এর সঙ্গে

মিল থাকলেও তিনি নাগিব নন, —নাসেরও নন। তিনি সৈনিক। ক্লান্ত সেনাপতি। কামাল পাশার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একদিন তিনি লড়াই করেছেন, এখন আর না। এবার তিনি বিশ্রাম চান।

তবুও সৈন্যরা যখন ডাকল গুরসেল সাড়া না দিয়ে পারলেন না। এ যে কামালেরই ডাক। এ লড়াইয়ের যিনি আসল নায়ক, গুরসেল বিশ্বাস করেন,—তিনি কামাল আতাতুর্ক। কবর থেকে তিনিই তুর্কী জোয়ানদের ডেকেছেন উঠে দাঁড়াতে।

কামালপাশা আজও তুরস্কের অনেক কিছু। তিনি তুর্কীদের মাথা থেকে 'ফেজ' তুলে নিয়ে 'হ্যাট' বসিয়ে দিয়েছিলেন। মোল্লাদের ফতোয়ার বদলে সুইজারল্যাণ্ডের আইন চিনিয়েছিলেন। আরবীর বদলে লাতিন হরফ, শত সতীনের ঘরে বোরখার জীবনের বদলে স্বাধীন নারী জীবন, সরকারী খেতাবের বদলে বাপ ঠাকুর্দার পদবী—তুর্কী নরনারীকে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন তিনি। তুরস্কে তিনিই প্রথম লোক গুনেছিলেন, কল বসিয়েছিলেন এবং সর্বোপরি তিনিই প্রথম ছ'শ বছরের পুরানো সুলতানী হুকুমৎ মাটি চাপা দিয়ে তুর্কীদের গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিলেন।

মেণ্ডেরেস সে অধিকারটুকুও যেন কেড়ে নিতে চললেন। তাঁর তুরস্ক বেহিসেবী সংসারীর অগোছাল সংসার। এমন যদৃচ্ছ, যেন ব্যক্তিগত। মেণ্ডেরেসের দেশে কল যেমন অনেক, মাথায় ঋণের বোঝাও তেমনি অপরিমিত। তুর্কীদের হাতে হাতে 'ইনফ্লেশন'-এর ফাঁপা বেলুন। অথচ কোন কাগজে যদি শুধু মাত্র 'মুদ্রাস্ফীতি' কথাটা ছাপা হয় তবে সাংবাদিকদের গর্দান।

সুতরাং, কামাল পাশার সহযোদ্ধাকে অতঃপর আর পাশ কাটিয়ে গেলে চলে না। গুরসেল ফিরে এসেছেন। কামাল-পাশা অনেক কিছু করে গিয়েছেন। গুরসেল-এর সেই সামর্থ্য নেই। তিনি শুধু একটা কাজ করে যেতে চান। তিনি তুরস্কে আবার গণতন্ত্রের হাওয়াটা ফিরিয়ে আনতে চান।

৪. ৬. ৬০

গেইটস্কেল, হিউ টড্ নেলোর

দলের তরুণেরা বলেন—গেইটস্কেল একটি খটখটে ক্যালকুলেটিং মেশিন!' গেইটস্কেল আপত্তি করেন

না। কেননা, পলিটিসিয়ানের পক্ষে ক্যালকুলেটিং মেশিন হওয়াটা তাঁর মতে অবান্তর ত নয়ই, বরং অপরিহার্য।

মেসিনটি নিভুর্ল কিনা সে কথা পরে। তার আগে ইংলণ্ডের এই বিখ্যাত শ্রমিক নেতাটির গড়নটা শোনা দরকার। গেইটস্কেল অক্সফোর্ডের খ্যাতনামা ছাত্র। বাইশ বছর বয়সের এই প্রতিভাবান ছেলেটিকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ডেকে এনে 'রীডার' করেছিল। '৩৯ সন অবধি সেখানেই অধ্যাপনা করে কাটিয়েছেন গেইটস্কেল। ইতিমধ্যে শুধু পুঁথিতে নয়, প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁর সমাজতন্ত্রের দীক্ষা হয়ে গেছে। '৩৫ সনে শ্রমিক দলের প্রার্থী হিসেবে তিনি নির্বাচন লড়েছেন। সে লড়াইয়ে তিনি জিততে পারেননি সত্য, কিন্তু দল জেনেছেন। যুদ্ধ যখন স্নরু হল হিউ গেইটস্কেল তখন শ্রমিক দলের বিশিষ্ট সদস্য।

য়ুনিভারসিটি ছেড়ে শ্রমিক নায়ক সরকারী দপ্তরে ঢুকলেন। দেশ-প্রেমিককে দেশের দুঃসময়ে তাই করতে হয়। প্রথমে অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন ইকনমিক ওয়ারফেয়ার-মন্ত্রীর প্রধান পরামর্শ-দাতা (১৯৪০-৪২)। পরবর্তী তিনটে বছর কাটল বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে। সে বছরই দক্ষিণ লীডস পার্লামেন্টে প্রতিনিধি করে পাঠাল তাঁকে। সেই থেকে গেইটস্কেল আজও পার্লামেন্টে লীডস-এর প্রতিনিধি।

গেইটস্কেল যে বছর পার্লামেন্টে এলেন, সে বছর তাঁর সঙ্গে বিজয়ী হয়ে এসেছে তাঁর দলও। মানুষটা কি তবে কল ?

লেবার গবর্ণমেণ্টে গেইট্স্কেল প্রথমে একটা দপ্তরে পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারীর আসন পেলেন, তারপর সেই দপ্তরের মন্ত্রী হলেন এবং অবশেষে ক্রমে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের আসনে উত্তীর্ণ হলেন। তিনি চ্যান্সেলার অব এক্সচেকার মনোনীত হলেন (১৯৫০)।

'৫১ সনের নির্বাচনে দল গেল, কিন্তু তহবিলদারিটা রইল। হিসেবের মেশিন হিউ গেইটস্কেল লেবার পার্টির খাজঞ্চি হলেন। '৫৫ সনে অবসর গ্রহণ করলেন দলের নেতা এটলি। তাঁর শূন্য আসন ঘিরে প্রার্থী দাঁড়ালেন তিনজন। একজন হিউ গেইটস্কেল, অন্য দুজন এনিউরিন বিভান আর হার্বার্ট মরিসন। মরিসন ভোট পেলেন—৪০, বিভান—৭০, আর গেইটস্কেল—১৪০। গেইটস্কেল

হাসলেন। কলের হিসেব ভুল হয় না।

গেল নির্বাচনে ম্যাকমিলন বলেছিলেন—'হয়। এবার হবে। '—আই থিঙ্ক হিজ রেপুটেশান এজ এ ক্যালকুলেটার ইজ গন উইথ দি উইণ্ড!'—গর্ব করে ঘোষণা করেছিলেন ম্যাক।

সে ঘটনা মিথ্যে হয়নি। নির্বাচনে গেইটস্কেলের হিসেব মোটেই নির্ভুল হয়নি। তবে এজাতীয় হিসেবে অন্যেরাও যে কখনও কখনও ভুল করেন তাও জানা গেল এবার। লোকে ভেবেছিল, কেউ কেউ বলেও ছিলেন—যুদ্ধক্ষেত্রে হেরে যাওয়া নায়ক এবার প্রাসাদেও সিংহাসনটি হারাবেন। গেইটস্কেল শ্রমিক দলের নেতার আসন ছাড়তে বাধ্য হবেন।

কিন্তু খবর এসেছে পার্লামেণ্টে ২৫৭ জনের দলের মাত্র ৭ জন ভেবেছেন সেকথা। বাদবাকীদের (চৌদ্দ জন ছাড়া) কাছে চুয়ান্ন বছরের হিউ টড নেলোর গেইটস্কেল এখনও দলের রাজা। গেইটস্কেল কি নিজেও জানতেন সে-কথা? তবে কি সত্যিই তিনি এখনও সেই নির্ভুল ক্যালকুলেটিং মেশিন? ২. ৭. ৬০

[গেইটস্কেল ১৯৬২ সনের নভেম্বরে অকালে দেহত্যাগ করেন।]

শুধু কাজ আর কাজ। এমন কাজের মানুষ সহসা আর হয় না।

গর্ডন ইয়ং ('স্টালিনস এয়ারস') লিখছেন—'...হি ডিড নট ড্রিংক, ডিড নট স্মোক, সেলডম ওয়েণ্ট আউট উইথ গার্লস, বাট ওয়ার্কড অলমোস্ট আনসিজিংলি!'

নেশা বলতে—দাবা খেলা, মাছ ধরা, ডাক-টিকিট সংগ্রহ করা আর বই পড়া।

বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগে পশ্চিমী সাহিত্য। বালজ্যাক, বায়রন, হুগো, গ্যাটে আর সেক্সপীয়ার।...কিন্তু একেবারে অপছন্দ একালের পশ্চিমীদের যুক্তিধারা। নিজেই বলেন—আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আমার কাছে সেই যুক্তিই সঠিক যা সোবিয়েত দেশের স্বপক্ষে।

বক্তৃতায় কখনও কখনও মার্ক-টোয়েন-এর উদ্ধৃতি শোনা যায় বটে, কিন্তু মুখে হাসি দেখা যায় কদাচিৎ যেন পাথরে খোদাই মন, পাথরে খোদাই মুখ। দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে মার্কিনীরা নাম দিয়েছিল—'দি গুম্‌ফেস্ট ইয়ং ম্যান ইন ওয়াশিংটন!' কেউ কেউ বলেন—'দি মিস্টিরিয়াস রাশিয়ান',

কেউ কেউ—'দি নিউ সোভিয়েট ম্যান!'

নাম—আন্দ্রে আন্দ্রিভিচ গ্রোমিকো। জন্ম—১৯০৯ সন। জন্মভূমি—খাস রুশিয়া।

বিশ্বখ্যাত কূটনীতিক, সোবিয়েত দেশের পররাষ্ট্র সচিব—গ্রোমিকো সত্যি সত্যিই গরীবের ঘরের ছেলে। বাবা ছিলেন তাঁর মিনস্ক-এর কাছাকাছি কোন এক গাঁয়ের জনৈক অখ্যাত কৃষক। অশিক্ষিতও।

কিন্তু নতুন কালের রীতি অনুযায়ী ছেলে স্কুলে গেল। স্কুল থেকে কলেজে। '২৮ সনে কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে বের হলেন তরুণ গ্রোমিকো। তিন বছর পর—আরও একটা পাশ। '৩১ সনে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ থেকেও ডিগ্রি পেলেন তিনি। এবং সে বছরই গ্রোমিকো কমিউনিস্ট হলেন।

রীতি অনুযায়ী এবার তাঁর পার্টির কাজ করার কথা। কিংবা—শিক্ষকতা। কিন্তু পরিবর্তে গ্রোমিকো আবার ছাত্র হলেন। এবার মস্কোতে। প্রথম রাজধানীর এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট, তারপর—ইনস্টিটিউট অব ইকনমিকস।

পাঁচ-বছর পর তিনি যখন সেখান থেকে বের হলেন গ্রোমিকোর হাতে তখন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান নয়, তিনি মস্কোর একজন উদীয়মান বিজ্ঞানীও। একাডেমি অব সায়েন্স ইতিমধ্যেই সিনিয়ার রিসার্চ সায়েন্টিস্ট হিসেবে চাকরী দিয়ে বসে আছে তাঁকে।

এবার কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়ে ঘুরে বেড়ান। চমৎকার কাজ। হয়ত সারা জীবন ধরেই চলত। কিন্তু তিন বছরের মাথায় হঠাৎ ঝদানফ-এর (Zhdanov) নজরে পড়ে গেল ছেলেটি। সংগে সংগে ('৩৯) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পররাষ্ট্র দপ্তরে স্থানান্তরিত হয়ে গেলেন গ্রোমিকো। সেখানে তিনি—আমেরিকান বিভাগের কর্তা। মস্ত চাকরী। মতান্তরে শোনা যায় যাঁর জোরে গোড়াতেই তিনি এমন দামী চেয়ারে বসতে পেরেছিলেন তিনি—মোলটফ।

যা হক। পররাষ্ট্র দপ্তর। সুতরাং ফাইলের আমেরিকা থেকে আসল আমেরিকায় আসতে বেশী দিন লাগল না। সে বছরই দূতাবাসে পরামর্শদাতা হিসেবে যোগ দিলেন গ্রোমিকো। তখন তিনি এক বর্ণও ইংরেজী জানেন না।

ক' বছর পরে ('৪৩ সনে) তিনি যখন মার্কিন দেশে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রদূত

নিযুক্ত হয়েছেন তখন ইংরেজী যেন গ্রোমিকোর মাতৃভাষা।

মার্কিন দেশে সোবিয়েত রাজদূত, য়ুনোয় রাশিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি, বৃটেনে ('৫২-'৫৩) রুশ দূত এবং সোবিয়েত রাশিয়ার ডেপুটি পররাষ্ট্র সচিব গ্রোমিকো অতঃপর বিশ্বে সুবিদিত কূটনীতিক। বিশেষ নিরাপত্তা পরিষদে দু' বছরে ('৪৬-'৪৮) পঁচিশটি 'ভেটো' এবং অগণিত 'ওয়াক-আউট' -এর কৃতিত্বে গ্রোমিকো আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক অবিস্মরণীয় নাম।

তেহরান, পটাসডাম, ইয়াল্টা—বহু বিশ্বখ্যাত বৈঠকের অন্যতম সাক্ষী, অপরাজেয় কূটনীতিক গ্রোমিকো '৫৭ সনের ফেব্রুয়ারী থেকে সোবিয়েত দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এবার শোনা যাচ্ছে: তাঁর আরও পদোন্নতি প্রায় অবধারিত। কেননা, একদল বলেন—'যে কোন পদে যোগ্যতায় গ্রোমিকো অতুলনীয়।' 'কারণ', অন্য দল বলেন '—গ্রোমিকোইজ এ টিপিক্যাল ইয়েস-ম্যান!' তাঁদের মতে গ্রোমিকো সেই ধরনের কূটনীতিবিদ যিনি যে কোন হুকুম তামিল করতে জানেন, কিন্তু নিজে একটি 'কমা'ও যোগ করতে পারেন না বা চান না।

চাইলে গ্রোমিকো সব করতে পারেন। ভালবেসে বিয়ে করতে ত বটেই, এমন কি হাসাতে পর্যন্ত।

গ্রোমিকো বিয়ে করেছেন সম্প্রতি। '৪৭ সনে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, যে মেয়েটিকে তিনি বিয়ে করেছেন সেই লিডিয়া তার কলেজের সহপাঠিনী।

আর হাসি? সেবার নিউ ইয়র্কে এক ভোজসভা বসেছে। বাইরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। রাস্তা ভেসে যাওয়ার উপক্রম। জানালা দিয়ে এক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছেন তদানীন্তন সোবিয়েত রাষ্ট্রদূত গ্রোমিকো। গম্ভীরভাবে হঠাৎ তিনি সভার দিকে ঘুরে বললেন—'এণ্ড টু-মরো দি নিউ ইয়র্ক টাইমস উইল ব্লেম ইট অন গ্রোমিকো।' ৩০.৩.৬১

ঘ

ঘোষ, অতুল্য

এই ছেলেটিও গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়। তবে হারমোনিয়াম নয়, গলায় থাকে তার একটা খোল। সে কীর্তনীয়া। কীর্তনের দলের লোক।

একবার শরৎচন্দ্র এসেছিলেন ওঁদের বাড়ি বেড়াতে। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। দত্তবাবুর ছেলেটি তখনও কীর্তনের দলে ভেড়েনি। সে স্কুলে পড়ে। ক্লাস এইট-এ। শরৎচন্দ্র বললেন—দেখি মার্কসীট।...হ্যাঁ,—এ ছেলে এখনই এত নম্বর পাচ্ছে,—তবে বড় হয়ে করবে কি।'

সেটা ১৯২০ সনের কথা। সে বছরই প্রথম নন-কো-অপারেশন। বাচ্চা ছেলে স্কুল ছেড়ে দিয়ে জানাল, —'আর যাই করি, ইংরেজের গোলাম হচ্ছি না!'

তা বটে। হুগলীর জেজুর গ্রামের বিখ্যাত দত্তবাড়ির ছেলে (বাবার নাম—কার্তিকচন্দ্র ঘোষ) ষোল বছর বয়সে (জন্ম—১৯০৪ সন) স্কুল ছেড়ে কীর্তনের দল ধরলেন। খোলে তাঁর চমৎকার হাত।

১৯২৪ সন। দেশবন্ধুর মৃত্যুদিন। শ্মশান থেকে ঘরে ফিরতে ফিরতে কীর্তনীয়া এতদিনে যেন জানতে পেরেছেন কীর্তনের অর্থ। পরদিনই গৃহত্যাগী হলেন শ্রী ঘোষ। আর কীর্তন নয়,—এবার দেশের কাজ।

সুরু হল ইংরেজী প্রবাদের নিয়মে। নিজের গাঁ নিয়েই। জেজুর নাইট স্কুল। তারপর আরও গাঁ। আরামবাগ, শ্রীরামপুর। গাঁ থেকে গাঁয়ে। কোনদিন কুড়ি মাইল, কোনদিন তিরিশ মাইল। কোন দিন খাওয়া জোটে, কোনদিন জোটে না। তাহলেও কাজ বন্ধ হয় না।

স্বভাবতই একদিন শহরেও পৌছান গেল। '২৮ সনে জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারী।...দাসপুর মার্ডার কেস। ...আবার অসহযোগ। '৪২-এর আন্দোলন। অতুল্যবাবু জেলা শহর থেকে রাজধানীর দিকে ধাওয়া করলেন। '৪৭ সনে যখন বঙ্গভঙ্গের চেষ্টা হচ্ছে তখন তিনি কলকাতায় জাতীয় বঙ্গ সম্মেলনের সম্পাদক। ১৯৫০ সন থেকে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি অবশ্য এখন সহ-সভাপতি।

ঘোষ, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র

হুগলী জেলা বোর্ডের ভূতপূর্ব সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের বর্তমান সহ-সভাপতি, ওয়ার্কিং কমিটির প্রাক্তন সভ্য, লোকসভার সদস্য এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদ্য নির্বাচিত সভ্য শ্রীঅতুল্য ঘোষ একজন বিচক্ষণ লেখকও। দলের কাগজ 'দৈনিক জন-সেবক' ছাড়াও নানা সময়ে তিনটি সাপ্তাহিকের ('পত্র', 'নির্মোক' এবং 'নির্ণয়') সম্পাদনা করেছেন তিনি। তদুপরি তিনি রাজনীতি বিষয়ক দুখানা উৎকৃষ্ট বইয়ের লেখক। (উল্লেখযোগ্য : 'নোয়াখালিতে গান্ধী', 'অহিংসা ও গান্ধী' 'নৈবাজবাদীর দৃষ্টিতে গান্ধীবাদ' ইত্যাদি।)

—আর সংগঠক? শ্রীঅতুল্য ঘোষের নেতৃত্বে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস যেন এক বিচক্ষণ গৃহস্থের সংসার। যেমন কারবালা ট্যাঙ্ক লেন-এর বাড়ীতে তেমনি 'কংগ্রেস ভবনে'। ঘরে যেমন এত কাজের মধ্যেও অতুল্যবাবু কখনও ভোলেন না কবে কার জন্মদিন, কে কি খেতে ভালবাসে,—বাইরেও তেমনি তিনি জানেন কার নজর কোন দিকে,—কংগ্রেস কোথায়, কিংবা দেশ কি পেতে চায়।

১২.১.৬১

ঘোষ, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র

দু'ভাবে চেনা যেতে পারে।

হয় দেখে, কিংবা কথা শুনে।

সভাটা যাদেরই হক, আর যত বড়ই হক, কোনমতে গলাটা একবার কানে এলেই হল। লোকেরা তৎক্ষণাৎ জেনে গেল—কে এবার বলছেন। জনসভায় ওঁর মত মাতৃভাষায় কথা বলা বড় একটা শোনা যায় না। স্পষ্টত বোঝা যায় 'দেশ' —ঢাকা জেলা।

যেমন কথা বলার ভঙ্গীতে তেমনি চাল চলনে, পোষাকে। ইংরেজী পোষাকও পারেন বটে। ('ওয়েষ্ট টুডে'তে ছবি আছে) তবে '২১ সনের পর জীবনে একবার। নয়ত প্রতিক্ষণে সেই সনাতন বাঙ্গালী। মোটা খাদির ধুতি, খাদির পাঞ্জাবী, খাদির চাদর। পায়ে—প্রায়শ চপ্পল, কদাচিৎ জুতো।

কিবা ট্রামে বাসে সভাকক্ষে, কিংবা মিছিলের আগে আগে—একমাথা সাদা চুল, সাদা খাদি মণ্ডিত সেই নাতিদীর্ঘ মানুষটিকে দেখা মাত্র মনে হয়—এ নগরে তিনি যেন কোন আগন্তুক। তাঁর আসল ঘর কোন গাঁয়ে, কিংবা কোন আশ্রমে।

বাস—কয়েক যুগ ধরে স্থায়িভাবে কলকাতায়, (ইদানীং—গড়িয়াহাটা

রোডে।) আশ্রমের লোকেরা এখনও বলেন—আশ্রমিক। রাজনীতিক হওয়া সত্ত্বেও ওঁর নামে শ্রদ্ধাশীল সত্যিই বাংলাদেশে অনেক। কি পদ্মার এপারে, কি ওপারে।

ডাক নাম—ডঃ ঘোষ। পুরো নাম—ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। জন্ম—১৮৯১ সন। জন্মস্থান—ঢাকা। ঢাকা জেলার মালিকান্দা গ্রাম। লেখা পড়াও প্রধানত ঢাকায়, ঢাকা কলেজে। তারপর কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে।

কেমিস্ট্রি নিয়ে পাশ করলেন। সংগে সংগে প্রেসিডেন্সী কলেজে চাকরি এবং রসায়ণ শাস্ত্রে তৎকালীন দুর্লভ পি. এইচ. ডি (১৯২০)। সুতরাং উচ্চতর পদের আহ্বান এল। ডঃ ঘোষ কলেজ ছেড়ে আরও পাকা সরকারী কাজে যোগ দিলেন। এবার সাক্ষাৎ টাকশালে। কলকাতার ঐতিহাসিক টাকশালায় ডেপুটি এ্যাসেমাষ্টার নিযুক্ত হলেন ডঃ ঘোষ। ও বাড়ীতে ও কাজে ভারতীয় তিনিই প্রথম। সে '২০ সনের কথা।

পরের বছর দেশে এলেন গান্ধী, চারদিকে অসহযোগ আন্দোলন। সুতরাং দু'বার মাত্র ভাবলেন তরুণ বাঙ্গালী কেমিষ্ট। তারপর ধীর পায়ে বেরিয়ে পড়লেন ঘর ছেড়ে। টাকা বানাবার কাজ ছেড়ে সোজা ফকিরের পথে।

অতঃপর ডঃ ঘোষের কাহিনী ভারতের একটি অন্যতম নিষ্ঠাবান গান্ধীভক্তের জীবনী। জেল, জেল, জেল। আশ্রম, আশ্রম, আশ্রম। মালিকান্দা, অভয় আশ্রম (কুমিল্লা)—গঠন কর্ম, বাপুর সান্নিধ্য। '২০, '৩০, '৩১, '৩৩, '৩৪, '৪২—বছরের পর বছর কারাবাস। ডঃ ঘোষ আমাদের জাতীয় আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্মী।

ক্রমে গ্রাম-কর্মী থেকে জাতীয় নায়ক। ১৯৩৯ থেকে ১৯৫০—একটানা দশ বছর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন বাংলার এই কর্মীটি, তার মধ্যে যুগপৎ কিছুকাল বাংলা কংগ্রেসের সম্পাদক এবং একবার 'হরিজন সেবক সঙ্ঘের' সভাপতি।

সুতরাং, '৪৭-এর আগষ্টে অনিবার্য ভাবেই তার নামটি মনে পড়ে গেল। প্রথমত কেন্দ্রে, তারপর খণ্ডিত প্রদেশে।

গান্ধীজি আশীর্বাদ করেছিলেন, কৃপালনী সমর্থন জানিয়েছিলেন—তবুও, মাত্র কয়েকটি মাস। '৪৮-এর জানুয়ারীতেই পদত্যাগ করলেন ডঃ ঘোষ।—কেন? তাই নিয়ে আজও

বিবিধ বিতর্ক। তবে একথা সবাই মানেন—একটা নতুন ধরনের আবহাওয়া এনেছিলেন সেদিন ঐ ছোট্ট মানুষটি। সাবধানীর মতে—তাতে ঝড়ের আশঙ্কা ছিল! সাধারণের মনের কথা—পাবলিক সেদিন তাই চেয়েছিল।

যাক, প্রথমে ছাড়লেন মুখ্যমন্ত্রীর আসন। তারপর দুটো বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ছাড়লেন—কংগ্রেসের ঘর। এবার নতুন পার্টি, নতুন দল। নাম—'কৃষক প্রজা মজদুর পার্টি' (১৯৫০)। তারপর রাজনৈতিক ভাঙ্গাগড়ার নিয়মেই এল নতুনতম দল, প্রজা সোশ্যালিষ্ট পার্টি। ডঃ ঘোষ অতঃপর তাদের অন্যতম সর্বভারতীয় নায়ক। দলের পক্ষে ভারতের এই খণ্ডে সম্ভবত তারও বেশী কিছু। এখানে তিনি আরও মূল্যবান। কারণ—শুধু মহিষাদল নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বও। এই ব্যক্তিত্ব যেমন সকলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ঘরে বসিয়ে রাখতে পারে, আমরা দেখে আনন্দিত, সেই ব্যক্তিত্বই তাঁকে যথাসময়ে যথাযোগ্য সিদ্ধান্তে অনুপ্রাণিত করতে পারে। ডঃ ঘোষ মতবিরোধ গোপন না করেই জানিয়েছেন—পার্টি ত্যাগ প্রসঙ্গ অন্তত তাঁর কাছে এখনও গুজব মাত্র।

সুলেখক, ('ওয়েস্ট টুডে' এবং 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস') সরল বক্তা এবং চিরকালের রাজনৈতিক আশ্রমিক ডঃ ঘোষ একজন স্নেহময় 'পিতা'ও। অনেকেই শুনে অবাক হয়ে যান সাধনা নামে যে মেয়েটি তাঁর সর্ব-সহচরী (এবং কখনও কখনও সহ-লেখিকাও) তিনি তাঁর নিজের কন্যা নন। অথচ, যাঁরা ওঁকে জানেন সকলে বলেন—নিজের বাবাও এমন হয় না! ৯. ২. ৬১

ঘোষ, শচীন্দ্রমোহন

ঊনপঞ্চাশ বছরের সমর্থ দেহ। শান্ত সমাহিত মুখ। ঝকঝকে দাঁতগুলোতে পান-সুপুরির কোন চিহ্ন নেই। ঠোঁট দেখে বোঝা যায়—সিগারেট অপরিচিত। যেন—সদাচারী সদালাপী কোন ভদ্র বাঙালী গৃহস্থই।

সাদা পোষাকে দেখলে মনেই হয় না এই মানুষটি ঘণ্টায় ষাট মাইলবেগে মোটর সাইকেল চালাতে পারেন, কোমরে পিস্তল গুঁজে শহরময় নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারেন চোর, গুণ্ডা এবং সমাজবিরোধীদের নিয়ে। ভাবা যায় না, এই মানুষটিই আর

ক' দিন পরে লালবাজারে বসবেন, এই বিরাট শহরের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন!

: এ লাইনে কেন এলেন ?

: কেন, তা কি আমিই জানি ? শুধু জানতাম—এই নিরিবিলি পড়ুয়ার জীবন চিরকাল ভাল লাগবে না। তাই এমন একটা কিছু খুঁজছিলাম—যাতে, প্রতিযোগিতা আছে, তীব্রতা আছে, জীবন আছে।

সে বেশ কিছুদিন আগের কথা। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে বি. এ পাশ করেছেন। এম. এ পড়ছেন। তখনই কানে এসেছিল সেই প্রতিযোগিতার খবরটি। পুলিস সার্ভিসের পরীক্ষা হচ্ছে এবং এম. এ পরীক্ষার আগেই তার দিন।

পড়ুয়া বই সরিয়ে রেখে পরীক্ষা দিতে বসে গেলেন। ফল বের হলে দেখা গেল তিরিশজনের মধ্যে তিনিই প্রথম হয়েছেন।—সুতরাং, আর পালিয়ে আসার অর্থ হয় কি ? উনি পুলিসেই যোগ দিলেন। ওঁর বয়স তখন মাত্র একুশ!

নাম—শচীন্দ্রমোহন ঘোষ। বাবার নাম—বীরেন্দ্রমোহন ঘোষ। দেশ—ঢাকা।

বাবা সরকারী চাকরী করতেন। বদলীর চাকুরী। বড় ছেলে শচীন্দ্রমোহন বাবার সঙ্গেই থাকতেন। ফলে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন তিনি—ঢাকা নয়, যশোহরে, আই. এ, বি. এ কলকাতা শহরে। এবং উল্লেখযোগ্য, '৩৪ সনে এ শহরেই প্রথম পুলিসের খাতায় নাম উঠেছিল তাঁর। ঘুরে ফিরে, আবার সেই কলকাতায়। তবে এবার নতুন পরিচয়ে, শচীন্দ্রমোহনই কলকাতার নতুন পুলিস কমিশনার।

সম্মান এবং দায়িত্ব যেমন বিরাট নতুন পুলিস কমিশনারের অভিজ্ঞতাও তেমনি বিস্তীর্ণ। '৩৫ সন থেকে বাংলার নানা জেলায় গুরুত্বপূর্ণ পদে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। এবং দেশবিভাগের পরে পশ্চিম-বাংলায়ও সার্ভিসবুক তাঁর উজ্জ্বল। '৪৬-এর দাঙ্গার সময়ে তিনি ছিলেন কুমিল্লার অ্যাডিশন্যাল পুলিস সুপার, '৪৭ সনে ২৪ পরগণার সুপার। তাছাড়া, পশ্চিম বাংলা সহকারী ইন্সপেক্টর জেনারেলের পদে বসেছেন শ্রী ঘোষ, বসেছেন ডি. আই. জি'র আসনেও। সুতরাং, বলা নিষ্প্রয়োজন কলকাতার কমিশনারের পদ তাঁর নিজের কাছে কোন খবর হওয়ার কথা

নয়। কিন্তু তবুও মানুষটিকে নিয়ে আলোচনার লোভ দমন করা যায় না। কেননা, এমন হাসিমুখে এমন শান্তভাবে এত বড় শহরটার দায়িত্ব নিতে পারেন কেউ সে কথা ওঁকে না দেখলে সত্যিই বিশ্বাস করা যায় না!

২৩.৩.৬২

ঘোষ, সুরেন্দ্রমোহন

দেওয়ালে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্রাবলী। অনাচ্ছাদিত টেবিলটার এককোণে শ্রীঅরবিন্দ। দেখে মনে হয়না কোন রাজনীতিকের ঘরে বসেছি। যেন কোন ভক্তের কুটির।

উনি কথা বলছিলেন। মাথায় পাকা চুলগুলো বিরল হয়ে এসেছে। মুখের ভাঁজে ভাঁজে বয়সের কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু কালো ফ্রেমের চশমাটির নীচে চোখ দুটো স্পষ্টতই বয়সোচিত নয়, একটু অন্যরকম, অত্যন্ত প্রখর। উনি কথা বলছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে। বাংলাদেশের নয়, গোটা ভারতের। কিন্তু সে কাহিনী যেন প্রত্যেকটি তাঁর নিজের চোখে দেখা।—কোথায় নানাসাহেব, কোথায় আজিমুল্লা, কোথায় গদরপার্টি, কোথায় ময়মনসিংহের হেমেন্দ্র আচার্য,—কিন্তু এমনভাবে কথাগুলো বলে গেলেন তিনি সন তারিখ সহ যেন ইতিহাসের কোন প্রতিভাবান ছাত্র!

কিন্তু পরে জেনেছিলাম—ছাত্র নন, প্রত্যক্ষ দর্শক। বিগত একশ বছরের সবটুক না হলেও শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ নামে ঊনসত্তর বয়সের, এই প্রবীণ বঙ্গ সন্তানটি প্রায় আধা-শতক ধরে নিজের চোখে এমন এমন বহু ঘটনা দেখেছেন, নিজের হাতে এমন এমন অনেক কাজ করেছেন—যা সহসা ভেবে ওঠা যায় না!

সেকালে তাঁর নাম ছিল—মধু ঘোষ। এবং বাংলাদেশে সেদিন এমন কোন তরুণ ছিলেন না যিনি সুদূর ময়মনসিংহের এই ছেলেটির নাম না জানতেন। কেননা, কলেজে পড়তে পড়তেই সেই বালক বোমা পিস্তল ধরেছেন এবং বয়স যখন তাঁর মাত্র আঠার বছর তখনই তিনি তৎকালীন বাংলার প্রথম সারির দুর্ধর্ষদের তালিকায় উঠে গেছেন। 'অস্ত্র আইনে' মধু ঘোষ প্রথম কারারুদ্ধ হন ১৯১১ সনে। আর তাঁর জন্ম—১৮৯৩ সনে!

তারপর 'যুগান্তর' পার্টির অন্যতম নায়ক শ্রী ঘোষ জীবনে অনেকবার জেলে গেছেন। সব মিলিয়ে দেওয়ালের

ওপারে জীবন কেটেছে তাঁর প্রায় তেইশ বছর। সুতরাং, সে জীবনের ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। অনাবশ্যক বাংলাদেশে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পরিচয়ও। সদলবলে সুরেন্দ্রমোহন কংগ্রেসে এসেছেন ১৯২০ সনে। তারপর থেকে ১৯৫০ সন অবধি বাংলার কংগ্রেস আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা সকলের জানা। ১৯২৯ সন থেকে এ. আই. সি. সি সদস্য সুরেন্দ্র-মোহন ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৮ সন অবধি একটানা প্রায় দশ বছর ছিলেন বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি। তাঁর আমলেই বাংলার প্রথম নির্বাচন, তাঁর আমলেই বাংলার দুর্ভিক্ষ, দেশ বিভাগ, এবং আমাদের এই স্বাধীনতা।

দেশ বিভাগের পরে ১৯৪৯ সনে আবার পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস প্রধানের পদে বৃত হয়েছিলেন বটে শ্রী ঘোষ, কিন্তু তারপর থেকেই বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে তিনি যেন দূরের মানুষ। অতঃপর তাঁর কর্মক্ষেত্র কখন-ওবা আরও দূরে,—মনে মনে সতত তিনি পণ্ডিচেরীতে। কর্মস্থান ইদানীং প্রধানত রাজধানী দিল্লি। '৫২ সনের নির্বাচনে শ্রী ঘোষ লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারপর '৫৭ সনের এবং এবারকার নির্বাচনের পর থেকে একটানা রাজ্যসভায় আছেন। এবং সসম্মানে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা বিষয়ক কমিটির তিনি সম্পাদক ছিলেন এবং আরও বহু উপলক্ষ্যে তিনি কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের হয়ে নানা রাজ্যে দায়িত্ব পালন করেছেন। সংবাদ : রাজ্য-সভার অন্যতম সদস্য, বাংলার প্রবীণ কংগ্রেস নায়ক এবার সেখানকার কংগ্রেস দলের সহ-নেতা নির্বাচিত হয়েছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, বাঙ্গালী মাত্রই প্রবীণ কংগ্রেস নেতার এই সম্মানে আনন্দিত হবেন।

২১. ৬. ৬২

চ

চক্রবর্তী, অমিয়

'তুমি থাকলে মনের মধ্যে স্রোতের ধারা বয়—তার প্রয়োজন যে কত তা আশপাশের লোক বুঝতে পারে না'—লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবির চার পাশ ঘিরে সেদিন দেশ

দেশান্তরের অনেক জ্ঞানীগুণীর ভিড়। তবুও তিনি একান্তে কাছে ডেকেছিলেন ক্ষীণতনু তীক্ষ্ননাসা সেই ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকটিকে, যিনি বাংলায় আধুনিক কবিতা লেখেন। এমন কবিতা যা 'আধুনিকের স্বরূপ', এবং গুরুদেব বলেন,—বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে সে কবিতার কবি—'প্রকৃতই সর্বদেশীয়।'

নাম—অমিয় চক্রবর্তী। পরিচয় কবি, প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক, সমাজকর্মী। কিন্তু সেগুলো নেহাৎই পেশাগত সম্ভবত—বিশ্ব-পথিক মানবসন্ধানী। নিজে বলেন,—এখনও আমি পথিক।

জন্ম—১৯০১ সনের ১০ই এপ্রিল। জন্মস্থান—শ্রীরামপুর। লেখাপড়া শিখেছিলেন বাংলার বাইরে, পাটনায়। তারপর আরও দূরে অক্সফোর্ডে। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ শ্রীচক্রবর্তী অক্সফোর্ডের ডি. ফিল। অক্সফোর্ডের সিনিয়ার রিসার্চ ফেলো ডঃ চক্রবর্তী যখন ১৯৩৭ সনে লাহোরে গবেষণা করছেন তখন তিনি বাংলাদেশে সুপরিচিত ব্যক্তি; কলকতার তরুণ সাহিত্যানুরাগী মহলে তাঁর নাম জানে না এমন মানুষ অল্প। কেননা ১৯২৬ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ হওয়ার দিন থেকে অমিয়চন্দ্র শান্তিনিকেতনে এক বিস্ময়কর আগন্তুক। প্রথম পরিচয়ের পরেই কবি তাঁকে আপন সাহিত্য বিষয় সম্পর্কিত একান্ত-সচিবের আসনে বসিয়েছেন,—তাঁর চেয়েও বড় কথা অমিয়চন্দ্র কবির হৃদয়ে আপন ঠাঁই খুঁজে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর এই একান্ত-সচিবের সম্পর্ক রবীন্দ্র সাহিত্যে ততদিনে প্রবাদে পরিণত।

কবির সঙ্গে বার্মিংহাম, রাশিয়া, পারস্য, ইরাক, যারবেদা জেলে গান্ধীজীর শয্যাপার্শ্বে, বারোদায় বক্তৃতার আসরে—শান্তিনিকেতনের ইংরেজীর অধ্যাপক (১৯২৬-৩৩) এবং গুরুদেবের একান্ত-সচিব শ্রী চক্রবর্তী সেদিন সর্বত্র। অক্সফোর্ডের কাজ শেষ হওয়ার পরে ১৯৪০ সন থেকে অবশ্য তিনি শান্তিনিকেতনের বাইরে বাইরে। কিন্তু চিরদিন জীবন তাঁর শান্তিনিকেতনের সেই সূর্যকে ঘিরেই। কবি তাঁকে 'সাহিত্যের পথে' উৎসর্গ করছেন, আদর করে বিদেশিনী স্ত্রীর নাম রাখছেন—'হৈমন্তী', অনুরোধে পড়ে কবিতা লিখেছেন 'আফ্রিকা' নামে,—অমিয়কুমার রবীন্দ্রনাথের কাছে শুধু পশ্চিমের জানালা নন,—ততোধিক।

'৪০ থেকে '৪৮ সন অবধি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়ে শ্রী চক্রবর্তী আজ বহুকাল পরদেশী। গিয়েছিলেন হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে, দু'বছরের জন্যে। তারপর আর দেশে ফেরা হয়নি। প্রিন্সটন, ইয়েল, কানসাস ইত্যাদি নানা মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর '৫৩ সনে তিনি স্থায়িভাবে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন, —তুলনামূলক প্রাচ্য ধর্ম ও সাহিত্য পড়ান। ছুটি নিয়ে ক'মাসের জন্যে স্বদেশে এসেছেন, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাকুর অধ্যাপকের কাজ করছেন। জানুয়ারীতে আবার বোস্টনে নিজের আসনে ফিরে যেতে হবে। বিশ্ব-ভারতী কর্তৃপক্ষ তার আগে প্রবাসী এই ভারত সন্তানটিকে বিশেষভাবে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামী ২৪শে ডিসেম্বর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে তাঁরা শান্তিনিকেতনের বিশ্বখ্যাত মুখপাত্রটিকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করছেন।

অসংখ্য উক্তিতে, অগণিত চিঠিতে কবি নিজে যাঁকে সম্মান জানিয়ে গিয়েছেন তাঁর কাছে এই সম্মান অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, বরং বলা চলে বিশ্বভারতীই অবশেষে আপন কর্তব্য পালন করতে পারলেন। 'খসড়া', 'এক মুঠো', 'পারাপার', 'ঘরে ফেরার দিন' ইত্যাদি বহু পরিচিত কবিতা সংকলন এবং 'সাম্প্রতিক' নামে প্রবন্ধ সংগ্রহ ছাড়াও 'চলো যাই'-এর (শিশুগ্রন্থ হিসেবে সরকারী পুরস্কারে বিখ্যাত লেখক সম্মানিত) অমিয়চন্দ্র দেশে-বিদেশে ভারত-তত্ত্বের সুপরিচিত আধুনিক ভাষ্যকার। ১৯৪৭ সনে নোয়াখালিতে গান্ধীজীর সহযাত্রী শ্রী-চক্রবর্তী তাঁর 'দি সেইণ্ট অ্যাট ওয়ার্ক' বইয়ে গান্ধীজীকে পশ্চিমের কাছে নতুনভাবে পরিচিত করেছেন, 'টেগোর রীডার' সম্পাদনা করে (১৯৬১) নতুনভাবে রবীন্দ্রনাথকেও। তার চেয়েও বড় পরিচয় তাঁর এখনও তিনি প্রাচীনভূমি ভারত থেকে পশ্চিমের পথে পথে এক বিস্ময়কর চলমান পথিক। '৫৫ সনে আফ্রিকা ছুটে-ছিলেন তিনি ডঃ অ্যালবার্ট সোয়াইৎ-জারের সঙ্গে দেখা করতে, '৫৯ সনে মস্কোয় পাস্তেরনাকের সঙ্গে কথা বলতে। এমন বিশ্বপথিক কোন দেশেই অনেক নেই। ১৯. ১২. ৬৩

চক্রবর্ত্তী, বি. এন.

১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট যদি কেউ কলকাতার রাজভবনে গিয়ে থাকেন তবে নিশ্চয় ওঁকেও দেখেছেন।

চন্দ, অশোক কুমার

কাঁচায় পাকায় মেশান একটু সেকেলে ধরনে গোছান এক মাথা চুল, সুন্দর করে ছাঁটা সেকেলে ধরনের গোঁফ, সেকেলে ধরনের প্রসন্ন মুখ। থেকে থেকেই তাকাতে ইচ্ছে করে, এবং তাকালে কেন জানি মনে মনে বিশ্রাম পাওয়া যায়!

নাম—বীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী। বয়স—আটান্ন। শ্রী চক্রবর্তী তখন 'সেক্রেটারী টু গভর্নর'। তখনই শুনেছিলাম রাজভবনে সদ্যাগত হলেও এই মুখটি বাংলার নানা জেলায় সুপরিচিত। এমনকি রাইটার্স বিল্ডিংসেও। কেননা, স্বাধীনতার আগে সেখানে তিনি একসময় ফিনান্স সেক্রেটারী ছিলেন! সেই চক্রবর্তীই এবার য়ুনোয় আমাদের স্থায়ী প্রতিনিধি হলেন।

খবরটা অতঃপর মোটেই বিস্ময়কর নয়। কারণ, '২৯ সনের পুরাণো আই. সি. এস শ্রী চক্রবর্তী ইতিমধ্যে স্বনামধন্য কূটনীতিক। ১৯৪৮ সন থেকে নানকিং, টোকিও, নয়াদিল্লির পররাষ্ট্র দপ্তর, নেদারল্যাণ্ডস, কোরিয়া, লণ্ডন, কলম্বো, পূর্ব-পশ্চিমের বহু দেশে নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কখনও সেক্রেটারী, কখন মিনিষ্টার, কখনও হাইকমিশনার। ১৯৬০ সনের সেপ্টেম্বর থেকে শেষোক্ত পদেই তিনি কানাডায় ছিলেন। এবার ডাক পড়ল জাতিপুঞ্জের দরবারে।

প্রত্যাশা সেখানেও এই বাঙ্গালী কূটনীতিক তাঁর পূর্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখবেন। এ প্রত্যাশা আরও এ কারণে—বীরেন্দ্রনারায়ণ সত্যিই অভাবিত গুণসমুদয়ের সমন্বয়। রাজভবনেই শুনেছিলাম—তিনি চমৎকার ফটো তোলেন! হয়ত অচিরেই শুনতে পাব তিনি চমৎকার বক্তৃতাও করতে পারেন। ১৭.৫.৬২

চন্দ, অশোককুমার

কিছুকাল আগে হঠাৎ একখানা বই হাতে পেয়েছিলাম। বিলিতি বই। নাম 'ইণ্ডিয়ান এডমিনিস্ট্রেশান।' লেখকের নাম—এ কে চন্দ। ভূমিকা লিখেছেন ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। উৎসর্গ পত্রে লেখা ছিল—'টু, জওহরলাল নেহরু; উইথ অ্যাফেকশান এণ্ড অ্যাডমিরেশন'। বইটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তাতে ভারত শাসনের ইতিহাস থেকে সুরু করে অডিটর জেনারেলের পদ সৃষ্টি পযন্ত অনেক কথা ছিল। অনেক সমস্যার আলোচনা ছিল। কিন্তু ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির হিসেবের খাতায় লাল পেন্সিল চালালে কি সমস্যার

উদ্ভব হতে পারে তা ছিল না। অবসর-প্রাপ্তির মুখে এসে ভারতের কম্প-ট্রোলার জেনারেল শ্রীঅশোক চন্দ আজ তাও জেনে গেলেন।

শ্রীহট্টের বিখ্যাত চন্দ পরিবারের বিখ্যাত চার ভাইয়ের অন্যতম শ্রীঅশোক চন্দ বয়সে যেমন প্রবীণ (৫৮) শাসন অভিজ্ঞতায়ও তেমনি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে তিনি যখন ইণ্ডিয়ান অডিট এণ্ড একাউন্টস সার্ভিসে যোগ দেন, তখন তাঁর বয়স মোটে চব্বিশ। ক' বছরের মধ্যেই মাদ্রাজ সরকারের অধীনে উচ্চপদে আহ্বান পেলেন তিনি। '৪৬ সনে সে পদ প্রত্যাশাকে ছাড়িয়েও যেন উচ্চতর হল। শ্রী চন্দ ভারত সরকারের জয়েণ্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন। পরের বছরই—এডিশনাল সেক্রেটারী। '৫৪ সনের আগস্ট মাসে ভারতের অডিটর এবং কম্পট্রোলার জেনারেল নিযুক্ত হওয়ার আগে—তাঁর কর্মজীবনে আর দুটি উল্লেখযোগ্য পদ—মাস কয়েকের জন্য ইংলণ্ডে ভারতের ডেপুটি হাই কমি-শনারের কাজ এবং কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারিত্ব।

স্বভাবতই, যোগ্যতা এবং অভি-জ্ঞতায় শ্রী চন্দ নয়াদিল্লির শাসক মহলে মূল্যবান কর্মী। দপ্তরের বাইরেও তাই তাঁকে নিয়ে টানাটানি। '৪৭ সনে দেশবিভাগের সময় তাঁকে পাঞ্জাব পার্টিশন কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্ব করতে হয়েছে। তার আগের বছর লাণ্ড লীজ ডেলিগেশন-এর সদস্য হিসেবে তিনি আমেরিকা ঘুরে এসেছেন। '৪৭ সন আর '৪৮ সন—বলতে গেলে কাটাতে হল বিলেতেই। তখন স্টার্লিং ব্যালেন্স নিয়ে ঘোরতর সমস্যা। '৫০ আর '৫২ সনে আবার ইউরোপ যাত্রা। এবারকার কাজ রেল সম্পর্কে। ভারতীয় রেলওয়ে ডেলিগেশন। তাঁরই নেতৃত্বে সেবার ইউরোপ ঘুরে এল।

শুধু প্রতিরক্ষা দপ্তরের হিসেবের খাতা নয়, শ্রী চন্দ ভারতীয় প্রতিরক্ষা সম্পর্কেও যে যৎকিঞ্চিৎ ওয়াকিবহাল তা অনেকে না জানলেও ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিশ্চয় জানেন। কেননা, '৪৭ সনে ভারতীয় ডিফেন্স ডেলিগেশন নিয়ে তিনিই গিয়েছিলেন লণ্ডনে। শেষ পর্যন্ত ভারতের অডিটর এণ্ড কম্পট্রোলার জেনারেল-এর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদটি চারপাশের আক্রমণের মুখে কতখানি অবশিষ্ট থাকবে বলা যায় না, তবে শ্রীঅশোক চন্দ যে কম্পট্রোলার জেনারেল হিসেবে

তাঁর পরবর্তীদের কাছে অনেককাল বেঁচে থাকবেন তা নিশ্চিত। ২৪.৪.৬০

চন্দ্রশেখর, ডঃ এস্

প্রতিটি কথাই শোনবার মত। প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি বাক্য, প্রতিটি সিদ্ধান্ত। ফলে সেই ঘোরেই শুনেছিলাম, শুনে হাততালিও দিয়েছিলাম। কিন্তু বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়েই আজ স্বীকার করছি কলকাতা ইনফরমেশন সেণ্টারে শোনা সেই অপূর্ব বক্তৃতাটির একটি বাক্য কিছুতেই আমার পরিপাক হয়নি।—ডঃ চন্দ্রশেখর মাপ করবেন, সে বিষয়ে আমি, আমরা আপনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি। কারণ—নিম্নোক্ত।

মাত্র চুয়াল্লিশ বছরের জীবনে এই দেশেরই একটি সাধারণ ঘরের ছেলের কাহিনীতে পাচ্ছি, তিনি—ভেলোর থেকে স্কুল সাঙ্গ করে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছেন, মাদ্রাজের পড়া শেষ করে তিনি কলম্বিয়ায় গেছেন, কলম্বিয়া থেকে প্রিন্সটনে। মাদ্রাজের এম এ., এম. এল। কলম্বিয়ার এম. এস-সি, নিউইয়র্কের পি. এইচ. ডি সেই তরুণ ইতিমধ্যেই লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ 'ফেলো', খেটেছেন বরোদায়—কলম্বিয়ায় খ্যাতির সঙ্গে পড়িয়েছেন, স্টকহলম-টোকিও, ফরমোজা-ওসলো, অষ্ট্রিয়া-আমেরিকায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে বক্তৃতা করে এসেছেন, 'হাংগ্রি পিপল এম্পটি হ্যাণ্ড ডেমগ্রাফিক ডিসআরমামেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া',—'ইণ্ডিয়াস পপুলেশন : ফ্যাক্টস এণ্ড পলিসি' ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বিশ্বখ্যাত সাহিত্যগুণসম্পন্ন সংখ্যাতত্ত্ব, তথা বিজ্ঞানের বই লিখেছেন এবং দু'বছর আগে চীন ঘুরে এসে জগতের জ্ঞান বৃদ্ধি করেছেন (যথা : সেখানে তিনি জন্মনিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম তৈরীর কারখানা দেখে এসেছেন।) তদুপরি এই বয়সে তিনি জাতিপুঞ্জের জন্ম-সংখ্যা বিষয়ক বিভাগ চালিয়েছেন এবং আজ জন্মসংখ্যা বিষয়ে ভারতের একমাত্র গবেষণাগার মাদ্রাজের গান্ধীনগরস্থ 'ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর পপুলেশন স্টাডিস' নামক বলতে গেলে প্রায় নিজের হাতে গড়া একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছেন!

অথচ আশ্চর্য, অবলীলাক্রমে কলকাতায় সেই মানুষটিই কিনা আমাদের শুনিয়ে গেলেন,—৪৫০ মিলিয়ন মানুষ থাকলে এদেশে নোবেল

পুরস্কার পেয়েছেন মাত্র দু'জন. এফ বি
এসে আছেন একজন।

তৎসত্ত্বেও ভারত-সন্তানদের গুণগত
উৎকর্ষতা সম্পর্কে যে নিরাশ হওয়ার
কিছু নেই ডঃ শ্রীপতি চন্দ্রশেখর তাঁর
নিজের জীবনটিকে গুণলেই তা বুঝতে
পারতেন।—এই বয়সে এমন পণ্ডিত
কোন্ দেশে হাজারে হাজারে হয়?

৭.৬.৬২

চালিহা, বিমলাপ্রসাদ

দু'হাতে তুলে নাচা যায়, বুক
ফুলিয়ে বলে বেড়ান যায় এমন খবর
সব সময় পাওয়া যায় না। চাওয়াও
যায় না। সেদিক থেকে আমরা
সনাতন মধ্যবিত্ত গেরস্থ। মোটামুটি
'ভাল আছি' কিংবা 'চলে যাচ্ছে'
শুনতে পেলেই আমাদের যথেষ্ট। কিন্তু
দুর্ভাগ্য এই, ভারতের অন্যতম প্রত্যন্ত
প্রহরী আসাম আজ তাও শোনাতে
পারেছে না তার প্রতিবেশীদের।

আসাম সংবাদ—একের পর এক
দুঃসংবাদ। ভূমিকম্প, বন্যা, নাগা
বিদ্রোহ, মিকির পাহাড়ের উদ্বাস্তু এবং
বিশেষ বাঙ্গালী-নিগ্রহ,—আমাদের
[illegible] বছরের শাসনচিন্তায় বেপরোয়া
আসামের নিজস্ব সংশোধনী অনেক।
[illegible] কিছু কিছু অবশ্য প্রাকৃতিক,
কিছু কিছু ঐতিহাসিক। কিন্তু
বাদবাকীটার ষোল আনার স্রষ্টাই
বোধ হয়—উক্ত এলাকার কিছু কিছু
ভারতীয় নাগরিক। সুস্থ অসমীয়ারা
ত মানেন, এবং লোকশ্রুতি এই, এক-
জন আসাম সন্তান এই উন্মত্ততার
ফলাফলটা জানেন। তিনি রাজ্যের
মুখ্যমন্ত্রী,—শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চালিহার
বয়স পঞ্চাশের নীচে। সুতরাং,
আসাম ও বাংলার মিলিত ইতিহাসের
অনেকখানিই হয়ত তিনি দেখেননি।
কিন্তু নিজের জীবনে যতটুকু জেনেছেন
সেটুকুও কম নয়। শ্রী চালিহার জন্ম
শিবসাগরে। কিন্তু শিক্ষা কলকাতায়।
কলকাতার সিটি কলেজে তখন তিনি
মাধ্যমিক বিজ্ঞানের ছাত্র, এমন
সময় এল অসহযোগ আন্দোলন।
কলকাতার সঙ্গে পা মিলিয়ে তরুণ
চালিহা ভেসে গেলেন তাতে।

সেই যে রাজনীতির দীক্ষা হল,
আর ছাড়া গেল না। কারামুক্তির
পরে চালিহা গান্ধীজীর কাছে এসে
হাজির হলেন। তাঁর হাতে একটি
নতুন ধরনের চরকা। তিনি নিজে
আবিষ্কার করেছেন। গান্ধীজী সেই
নবাবিষ্কৃত যন্ত্রটি সহ তাঁকে পাঠিয়ে
দিলেন বিহারে। চালিহা সেখানে

সর্বভারতীয় হলেন। সকলের সঙ্গে বসে সুতাকাটা শিখলেন। '৪২ সনে আবার জেলখানার ডাক এল। '৪৪-এ বের হয়ে শ্রী চালিহা আবার চরকা নিয়ে বসলেন। আসামে তিনি তখন অন্যতম গঠন-কর্মী। সুতরাং '৪৬ সনে শিবসাগরের লোক সানন্দে তাঁকে ভোট দিল। পরের বছর বিধানসভায় কংগ্রেস দল তাঁকে পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারী মনোনীত করল। তিন বছর পরে রাজ্য কংগ্রেসও সেক্রেটারী নির্বাচিত করল তাঁকে, এবং পরের বছরই সভাপতি। '৫৩ সনে কংগ্রেসের হয়ে একটা উপনির্বাচনে দাঁড়ালেন তিনি, ফলে লোকসভায় যেতে হল। '৫৬-এর নির্বাচন আবার তাঁকে মাতৃভূমিতে বন্দী করল। '৫৭-এর ডিসেম্বরে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসতে হল।

আজীবন গঠনকর্মী শ্রীচালিহা জানেন আজকের আসাম যে পথে চলেছে তা সঠিক গঠনের পথ নয়। তাকে এমন একটা পথ বেছে নিতে হবে যেখানে সৎ প্রতিবেশী হিসেবে পরিচয়টাও বিবেচ্য।

৮. ৭. ৬০

চাগলা, মহম্মদ আলি করিমভাই

কি লণ্ডনে, কি ওয়াশিংটনে, কি বোম্বাইয়ে নিজের বাড়িতে। হঠাৎ ঘরে ঢুকলে মনে হবে বাড়ির মালিক বোধ হয় কোন আর্ট কালেক্টর। ঘরে ঘরে দেশী-বিদেশী চিত্রকরদের আঁকা ছবি। বৈঠকখানার দেওয়ালে গান্ধীজীর একটি প্রকাণ্ড প্রতিকৃতি। দূর থেকে দেখলে মনে হবে—পেন্সিল স্কেচ। কাছে গেলে জানা যায় আসলে সেটি চুল কেটে কেটে তৈরী। গৃহস্বামীর নিশ্চয় হাতের কাজেও নেশা আছে।... বইয়ের আলমারিগুলোর দিকে তাকালে মনে হবে—নেশা আইনে। কিন্তু সোফায় ভর করে গুছিয়ে বসতে না বসতে যখন মাথায় একরাশ সাদাকালো ঢেউ খেলান চুল, মুখে উদ্দাম হাসি আর চোখে কালো ফ্রেমের ভারী চশমা নিয়ে সামনে এসে হাত বাড়িয়ে দাঁড়াবেন এ বাড়ির মালিক তৎক্ষণাৎ সব অনুমান ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। জানা যাবে শুধু চিত্রকলায় নয়, শুধু আইনেও নয়,—এ মানুষের আসল আকর্ষণ মানুষেই।

নাম—মহম্মদ আলি করিম চাগলা। বয়স—তেষট্টি। বার

চাগলা, মহম্মদ আলি করিমভাই

আইনবিদ্ চাগলা আজ ভারতের তহবিলে অন্যতম খ্যাতনামা কূটনীতিবিদ। তাঁর কূটনৈতিক জীবনের সূচনা হ'ল,—১৯৫৮ সনের সেপ্টেম্বরে। সে বছরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় দূত নিযুক্ত হন তিনি। জনশ্রুতি জি এল মেটার শূন্য আসনে আইনবিদ্ চাগলাকে যিনি মনোনীত করেছিলেন তিনি শ্রী নেহরু স্বয়ং।

এই নির্বাচন যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তার প্রমাণ মার্কিন দেশে চাগলার কর্মজীবন। আজ সেখানে তিনি 'নিউ ডিপ্লোমেসি'র অন্যতম সফল প্রবক্তা হিসেবে স্বীকৃত। নিজের পরিচয়পত্র পেশের দুদিন পরেই পাকিস্থানের হাতে সমর সম্ভার তুলে দেওয়ার অপরাধে মার্কিন দেশকে সে-দেশেরই জনসাধারণের আদালতে অভিযুক্ত করেছিলেন তিনি। এই নব দূতকে দেখে যুক্তরাষ্ট্র সেদিন চমকিত। এই চমক শেষ অবধি বজায় ছিল। কেননা, চাগলার কার্যকলাপ হোয়াইট হাউস ঘিরেই শেষ হত না। তিনি তাঁর লক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করেছিলেন—মার্কিন জনসাধারণকে। দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ধারাবাহিক বক্তৃতা করেছেন। তাছাড়া রেডিও

জনাব করিম চাগলা বোম্বাইয়ে বিখ্যাত ব্যবসায়ী। আমদানী-রপ্তানির বিরাট কারবার ছিল তাঁর। ছেলে বোম্বাইয়ের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়া শেষ করে বিলেতে গিয়েছিলেন আরও পড়তে। অক্সফোর্ডে মডান হিস্ট্রি এবং ইনার টেম্পল থেকে ব্যারিস্টারী পড়ে চাগলা যখন দেশে ফিরেছেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ বছর।

সেই তরুণ বয়সেই ব্যবসায়ী-তনয় নতুন ব্যবসায় নামলেন। বোম্বাই হাইকোর্টে তিনি আইন ব্যবসা শুরু করলেন। ১৯৪১ সন পর্যন্ত সেই নেশায়ই ছিলেন। '৪১ সনে হাইকোর্টে বিচারপতি নিযুক্ত হলেন, চার বছর পরে প্রধান বিচারপতি। চাগলা বোম্বাই হাইকোর্টের বিখ্যাত বিচারপতিদের একজন। তাছাড়া ল' কমিশন, ল' এডুকেশন কমিশন ইত্যাদিতেও তিনি একজন বিশিষ্ট সদস্য। বোম্বাইয়ের সরকারী ল' কলেজে কিছুকাল তিনি অধ্যাপনাও করেছেন। 'দি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউসন' (১৯২৭) এবং 'ল, লিবার্টি এণ্ড লাইফ'-এর (১৯৫০) লেখক শ্রী চাগলা শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট। কিছুকাল বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন তিনি।

চার্চিল, স্যার উইনস্টন

টেলিভিসান, খবরের কাগজ—যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই আইনজীবী তৎক্ষণাৎ স্বদেশের পক্ষে তর্কে নেমেছেন।

যদিও লণ্ডন তাঁর বহুদিনের পরিচিত জায়গা তবুও অক্সফোর্ডের এসিয়াটিক সোসাইটি এবং ইণ্ডিয়ান মজলিসের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রী চাগলা সেখানে যেন তত প্রখর নয়। হয়ত দুই দেশের চেনা-জানার গভীরতা-বশত তা অনাবশ্যকও।

শোনা যাচ্ছে, তাঁর লণ্ডনের মেয়াদ শেষ হবার আগেই শ্রী চাগলা দেশে ফিরে আসছেন। এবং তিনি ভারতের আইনমন্ত্রী নিযুক্ত হবেন। যদি তাই হয়—তবে কেমন আইনমন্ত্রী পাচ্ছে ভারত ভবিষ্যতে?

যাঁরা তাঁকে চেনেন, তাঁরা বলেন: মানুষ হিসাবে চাগলা চমৎকার। তিনি বড়লোকের ছেলে। বিয়েও করেছেন বড়ঘরের। স্ত্রী মেহেরুন্নিসা ধারসি জীবরাজের কন্যা। তিনি সুশিক্ষিতা। ওঁদের তিনটি ছেলে-মেয়ে। মেয়ে হাসনুরাই বড়। তাঁর স্বামী পাইলট। ছেলে জাহাঙ্গীর ইঞ্জিনীয়ার। ছোট ছেলে ইকবাল অক্সফোর্ডের ছাত্র। চিত্রকলা এবং থিয়েটার ছাড়াও গল্‌ফ, ব্রিজ, বেসবল-এর ভক্ত। রাজনৈতিক মতামতে তিনি—'ডেমক্রাট, প্রগ্রেসিভ লিবারেল।' একদা জিন্নার সহকারী হিসেবে আইন-ব্যবসায়ে নেমেছিলেন শ্রী চাগলা—কিন্তু আজ তিনি সেখান থেকে অনেক অনেক দূর। লোক-সমালোচনা তুচ্ছ করে বছর কয় আগে তিনি সগর্বে পল রবসন জন্মোৎসব কমিটির সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। এখনও একদিকে যেমন তিনি চীনদের সহিত আপন হাতে লড়াইয়ে রাজী, অন্যদিকে তেমনি কমিউনিস্টদের যদৃচ্ছ কথা বলতে দেওয়ার পক্ষপাতী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, চাগলা তার আইনজীবী জীবনে যে বিখ্যাত মামলাগুলোতে খবরের কাগজে সংবাদ হয়েছিলেন, তার মধ্যে আছে পর্তুগাল-বনাম-ভারত, বোম্বাই সেলসট্যাক্স অ্যাক্ট, হরিজনের মন্দির প্রবেশ, বোম্বাই প্রহিবিশন আক্ট এবং বিখ্যাত সেই ডালমিয়াঘটিত ব্যাপার! ২৩. ৮. ৬৩

[১৯৬৩ সনের ১৯শে নভেম্বর তারিখে শ্রী চাগলা ভারতের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন।]

চার্চিল, স্যার উইনস্টন

লণ্ডন। ১৯৪০ সনের ২১শে অক্টোবর।

ফরাসী জাতির উদ্দেশ্যে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর আজ বিশেষ বেতার বক্তৃতা। দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীট। নিজের হাতে তার খসড়া তৈরী করছেন চার্চিল। সামনে বসে আছেন বি-বি-সির কর্মী, জনৈক ফরাসী বেতার সাংবাদিক। সহসা সাইরেন। বাহিরে বোমা বৃষ্টি! টেবিলটা পর্যন্ত কাঁপছে। কিন্তু চার্চিল কাজ করে চলেছেন। কখনও আপন মনে হাসছেন। কখনও কথা বলছেন।

সন্ধ্যায় আক্রমণের তীব্রতা আরও বেড়ে গেল। ওঁরা নিচে গিয়ে বসলেন। অজস্র বোমা ঝরছে আজ। থেকে থেকে গর্জন করছে এন্টি-এয়ারক্রাফট-গান। তারই মধ্যে বক্তৃতার রিহার্সেল দিচ্ছেন চার্চিল।—কিন্তু কি লাভ? মনে মনে বেতার কর্মী উদ্বিগ্ন। বাইরে তখনও বোমা বৃষ্টি হচ্ছে। অথচ এদিকে সময় হয়ে এল। হাতে মাত্র কয়েক মিনিট। সহসা ঘড়ির দিকে তাকালেন চার্চিল।—দাঁড়াও, আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি। মুহূর্ত পরেই ফিরে এলেন তিনি। গায়ে একটা গ্রে-ব্লু ওভার কোট, মাথায় একটা আর-এ-এফ-এর টুপি।—রেডি?

—রেডি স্যার!

—ফলো মি!

সেই মস্ত শরীরটা নিয়ে এক দৌড়ে ডাউনিং স্ট্রীট পার হলেন চার্চিল। কাছাকাছি কোথায় যেন বোমা ফাটল একটা। তারই আলোকে এক ঝলক দেখা গেল তাঁকে। তার-পর দৌড়তে দৌড়তে এগলি সে গলি এ-সিঁড়ি সে সিঁড়ি, এবং অবশেষে বি-বি-সির গোপন আস্তানা।

স্টুডিওতে একখানা মাত্র চেয়ার। সেখানে চার্চিল বসে। ঘোষক বললেন —আমি? নিজের কোলটা দেখিয়ে দিলেন চার্চিল। সেখানে বসেই ঘোষণা করা হল। সুরু হ'ল চার্চিলের বক্তৃতা…। ফ্রেঞ্চ ম্যান!… দে ডেয়ার টু কমপেয়ার দ্যাট ম্যাড-ম্যান হিটলার উইথ ইওর নেপোলিয়ান, নেপোলিয়ান হু ওয়াজ…।' বোঝা যাচ্ছে চার্চিলের এই বক্তৃতার সঙ্গে হাতের কাগজ খানার মিল আজ অতি সামান্য। বক্তৃতা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন চার্চিল। স্টুডিওর একমাত্র সাক্ষী অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর গাল বেয়ে জল পড়ছে। ধরা গলায় তিনি বললেন—উই হ্যাভ মেড হিস্ট্রি টু নাইট!

এই হচ্ছেন ইংলণ্ডের চার্চিল।

চার্চিল, স্যার উইনস্টন

শত্রু মিত্র ভেদে জগতের—স্যার উইনস্টন, আজীবন নিজের হাতে ইতিহাস তৈরী যাঁর জীবন।

বিখ্যাত ডিউক অব মার্লবরোর বংশের উত্তর পুরুষ। সুখ্যাত লর্ড র‍্যানডলফ চার্চিলের পুত্র স্যার উইনস্টন এক বিস্ময়কর মানুষ। তিনি নিজের হাতে বিদেশ বিভূঁয়ে লড়াই করেছেন,—একবার মন্ত্রীত্ব ছেড়ে পর্যন্ত; শত্রুর হাতে বন্দী জীবন যাপন করেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সাংবাদিকের কাজ করেছেন (মর্নিং পোস্ট), সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এবং বাগ্মিতায় ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা। তিনি ঘোড়ায় চড়েন, বই লেখেন, ছবি আঁকেন, এই বয়সেও নাচেন—এবং কি নয়? সেই বাচ্চাদের পুতুলের মত মস্ত মুখ, নেভি ব্লু সাইরেন স্যুট, মুখে চুরুট—চার্চিল যেন ইংলণ্ডের সেই আদর্শ 'জন বুল।' তার দুই আঙ্গুল গড়া "ভি" দুনিয়ার বিজয় চিহ্ন, কোথাও না কোথাও তিনি আছেন এই সংবাদ আজও মানুষের কাছে এক সুখকর স্মারক চিহ্ন। সে স্মারক অফুরন্ত প্রাণের, বিরামহীন কর্মের।

খবর এসেছে স্যার উইনস্টন সহসা পিঠে আঘাত পেয়েছেন। পরবর্তী খবরটা অবশ্য কিঞ্চিৎ আশ্বাসজনক। আঘাত তত গুরুতর নয়। আগামী ৩০শে নভেম্বর ছিয়াশীতে পড়ছেন চার্চিল। তার ক'দিন আগে এ সংবাদ স্বভাবতই উদ্বেগজনক। তবে চিরকাল উদ্বেগজনক পরিস্থিতি থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসাই চার্চিলের জীবন। আমরা আশা করব এবারও তিনি তাই করবেন। দুই আঙ্গুলে 'ভি' বানিয়ে হাসতে হাসতে তিনি বিছানা ছেড়ে নেমে আসবেন।

২৪, ১১, ৬০

[সত্যি সত্যিই নেমে এসেছিলেন চার্চিল। তারপর যথারীতি আবার তিনি নতুন সংবাদ। এবার উপলক্ষ্য অন্য।]

"—ইজ দি রাইট অনারএবল জেণ্টলম্যান এওয়ার দ্যাট দিস হাউস ইজ এ ডাল-আর প্লেস উইদাউট হিম?"

চার্চিল হাতের চশমাটা দূরবীনের ভঙ্গীতে চোখের সামনে তুলে ধরে সামনের দিকে তাকিয়েছিলেন। ১৯৫৩ সনের কথা। উদ্বেগজনক রোগশয্যা ছেড়ে সেদিন তিনি সবে আবার কমন্সসভায় ফিরেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সেই মৃদু

তিরস্কার : ইজ দি রাইট অনারএবল জেণ্টলম্যান……।

শুধু চার্চিল নন, সদস্যরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছিলেন—কথাগুলো যিনি বলছেন তিনি টোরি কুলপতি স্যার উইনস্টন-এর পুরানো শত্রু শ্রমিক সদস্য উড্রো ইয়াট। স্মিত হাস্যে চার্চিল তাঁর এই আন্তরিক শুভেচ্ছাকে গ্রহণ করেছিলেন। আবার তিনি কমন্স সভায় নিজের আসনটিতে গিয়ে বসেছিলেন।

১৯০০ সন থেকে তার যাতায়াত সেখানে। চার্চিল যখন পার্লামেণ্টে এসেছেন, ম্যাকমিলান তখন ছ'বছরের বালক। দীর্ঘ বাষট্টি বছর তাঁর পার্লামেণ্টারী জীবন। ভিক্টোরিয়া থেকে এলিজাবেথ—অনেক রাজারানী তাঁর চোখের সামনে সিংহাসনে এসেছেন, চলে গেছেন। কিন্তু চার্চিল ঘুরে ফিরে আবার সেই পুরানো ঘরটিতে ফিরে গিয়েছেন। প্রথম জীবনে তাঁর সবচেয়ে বড় আঘাত সম্ভবত ১৯২২ সনের পরাজয়। সেদিন তিনি সখেদে বলেছিলেন—'আই এম উইদাউট এন অফিস, উইদাউট এ সীট, উইদাউট এ পার্টি, এণ্ড উইদাউট এন এপেনডিক্স!' পরবর্তী জীবনে দ্বিতীয় আঘাত ১৯৪৫ সনের নির্বাচন। ক'বছর পরে গিল্ডহলে আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় চার্চিল বলেছিলেন—প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এই বোধহয় প্রথম আমি এখানে এলাম। অবশ্য তার একটা কারণও আছে। যখন আমার আসবার কথা গিল্ডহল তখন নাৎসী বোমার ঘায়ে মাটিতে লুটিয়ে আছে। সে যখন উঠে দাঁড়াল তখন তার ঘায়ে আমি ধরাশায়ী।

সাময়িক এই বিরতিগুলো বাদ দিলে একালের কমন্সসভা আর চার্চিল এক অচ্ছেদ্য অস্তিত্ব। তিনি সেখানে গ্ল্যাডস্টোনকে বক্তৃতা করতে শুনেছেন। অ্যাসকুইথ এবং মর্লির সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন; ধার-করা বক্তৃতা নিয়ে জীবন আরম্ভ করে (পার্লামেণ্টে চার্চিলের প্রথম বক্তৃতার ধারালো কথাগুলো সবই পাশে বসা আর এক সদস্য টমাস গিবসন বোলস-এর বলে দেওয়া) নিজেকে তিনি পার্লামেণ্টে প্রবাদ পুরুষে পরিণত হতে দেখেছেন। বৃটিশ পার্লামেণ্ট ডিজরেলীর মত মানুষও পেয়েছে, কিন্তু চার্চিল সেখানে তুলনাহীন। চেম্বারলেন তাঁর কাছে—এক অসহায় অস্তিত্ব ('দে আর ডিসাইডেড অনলি টু বি আনডি-সাইডেড') রামসে ম্যাকডোনাল্ড—'দি

বোনলেস ওয়াণ্ডার' (চার্চিল বলেছিলেন —ছোট বেলায় বাবা আমাকে সার্কাসে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় ছিল নাকি 'বোনলেস ওয়াণ্ডার', হাড্ডিহীন মানুষ। আমি ভয় পাব বলে ওঁরা তা আমায় দেখতে দেননি। অবশেষে পঞ্চাশ বছর অপেক্ষার পরে আজ তা দেখতে পেলাম!) এটলী তাঁর কাছে আরও করুণার পাত্র,—তিনি নাকি 'এ শিপ ইন শিপস ক্লোথস!'

তবুও হাউস অব কমন্স-এর প্রাণের মানুষ ছিলেন চার্চিল। স্যার উইনস্টন নিজেও সেটা জানতেন। ১৯৫৫ সনে হাউস অব লর্ডস'-এ আসনের বদলে স্বেচ্ছায় 'নাইট অব দি গার্টার' হয়েছিলেন তিনি। কেন না, হাউস অব কমন্স তাঁর ভালবাসার আবাস। জীবনে অনেক দেশ দেখেছেন তিনি। বাঙ্গালোর থেকে বুওর-যুদ্ধ, দুটো মহাযুদ্ধ—নানা রঙের পৃথিবী। কিন্তু ডিউক অব মালবরোদের ঘরের এই বিশ্বজয়ী সন্তানটির কাছে সকলের সেরা জগৎ—কমন্স সভা। কিছুদিন আগে একজন অবসরগ্রহণের ইঙ্গিত করেছিলেন তাঁকে। চার্চিল তাঁর সেক্রেটারী তথা জামাতাকে বলেছিলেন তাঁর কানে-শোনার যন্ত্রটা নিয়ে আসতে।—আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট টু মিস দি ওয়ার্ড। সেটি আসা মাত্র কানে লাগিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন স্যার উইনস্টন,—'উড ইউ মাইণ্ড টু রিপিট হোয়াট ইউ জাস্ট সে'ড!' গোটা হল হাসিতে ভেঙ্গে পড়েছিল।

বাইরে এসে এক পুরানো সাংবাদিক বন্ধুর কাছে মন খুলেছিলেন চার্চিল—ইউ নো,—দিস ইজ এ প্রেটি গুড পাব!...এণ্ড এজ আই লুক এট দি ফেসেস আই ওয়াণ্ডার, হোয়াই আই স্যুড লিভ দিস পাব আনটিল সাম ওয়ান সেইশ—'টাইম জেণ্টলম্যান!'

উননব্বুই বছরের বার্ধক্য আজ সেই হৃদয়বিদারক বাক্যটি ঘোষণা করেছে। শুধু সক্রিয় রাজনীতি থেকে নয়—চার্চিল, এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক চার্চিল হাউস অব কমন্স থেকেও বিদায় নিতে চলেছেন। তিনি আর নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন না। স্যার উইনস্টন তাঁর নির্বাচকদের কাছে ছুটি চেয়েছেন।—কিন্তু ইতিহাসের কাছ থেকে?

ক'দিন আগে উত্তরটা শুনিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কেনেডি। চার্চিলকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম অনারারি নাগরিকের সম্মানে ভূষিত করতে গিয়ে তিনি বলেছেন স্বাধীনতার

ইতিহাসে চিরকালের নাম তিনি। সেখানে আর কিছু যদি থাকে তবে সেই মানুষটির কাহিনীও থাকবে যিনি ইংল্যাণ্ডের সেই ভয়াবহ অন্ধকার দিনগুলোতে একাকী নির্ভয়ে আলো হাতে পথে বের হয়েছিলেন, ইংরেজী-ভাষাকে নতুনভাবে রণসজ্জায় সাজিয়ে রণাঙ্গনে পাঠিয়েছিলেন!

১০. ৫. ৬৩

চিয়াং কাই শেক

'Hold your tongue, you rebels! If you want kill me, kill me now!' গর্জন করে উঠলেন বন্দী জেনারেল। সামনে তাঁর বিজয়ী বিদ্রোহী। ইয়ং মার্শালের অনুচর ক্যাপ্টেন সান। তিনি মাটিতে হাঁটু গেড়ে অনুনয় করে চলেছেন—'আমার কথা শুনুন জেনারেল আমার কথা—' আবার উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন আহত জেনারেল। কোটে তাঁর বোতাম নেই, মুখে দাঁত নেই,—তাড়া-তাড়ি পালাতে গিয়ে নকল পাটিটা মুখে পুরার সময় পান নি। তা হক। তবুও কিছুতেই বশ মানতে রাজী নন তিনি। '—না, না,—কোন কথা শুনতে চাইনে আমি। শুধু জানতে চাই —তোমরা আমার অধস্তন সৈনিক, অথবা শত্রু। যদি শত্রু হও, তবে এখনি হত্যা কর আমাকে, এক্ষুনি!—'

এই সেই চিয়াং। জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক, বাবা যাঁর নাম রেখেছিলেন 'জুই তাই', সাবালক হয়ে নিজে যিনি নাম নিয়েছিলেন 'কাইশেক (সীমা-স্তম্ভ), দেশের লোক যাঁকে ভালবেসে বলত—'জিয়াং গাই-শেক' এবং শেষ পর্যন্ত নিজে যিনি সরকারী-ভাবে নাম নিয়েছিলেন—'চিয়াং চুঙ চেঙ' বা বিশ্ববাসীর—বিস্ময় চিয়াং। যে জেনারেলিসিমোর কথা বলা হল তাঁকে দেখা গিয়েছিল ১৯৩৬ সনের ১২ই ডিসেম্বর বেলা সাড়ে পাঁচটায়—বিদ্রোহী সান-এ, শহরতলীর একটা বাড়ীর প্রাঙ্গণে। বলা নিষ্প্রয়োজন, ফরমোজার সেই সুরক্ষিত কক্ষটিতে উঁকি দিলে সম্ভবত একই মানুষটিকে দেখা যাবে আজ। হয়ত চীনাদের মধ্যে দুর্লভ, পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি উঁচু সেই প্রখর কাঠামোটা নেই আজ, হয়ত নেই কুচকুচে কালো চোখ দুটিতে সেই ঔজ্জ্বল্যও, কিন্তু এখনও এই পচাত্তর বছর বয়সেও আজও আছেন সেই চিরকালের চিয়াং-কাইশেক। এখনও তিনি চা খান না, ধূমপান করেন না; এখনও তিনি

চেন, ই

হাঁটতে হাঁটতে কবিতা আওড়ান, স্টুবার্ট-এর রেকর্ড বাজাতে বাজাতে ঘুমোতে যান ; 'কবিতা, পাহাড় আর পত্নী'—এখনও তাঁর ভালবাসা এবং তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য—দেশ তাকে বহুকাল ('৪৮) খারিজ করলেও এক-কালের রাজার আজ বনবাসে দিন কাটলেও জেনারেলিসিমোর সেই খাকি কোর্তাটাই এখনও তাঁর পোশাক। স্বভাবতই, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে যেতেও জেনারেলিসিমো মাঝে মাঝে এখনও তাই খবরে পরিণত হন। যেমন হয়েছেন এবার। খবর : পিকিং এবং মস্কোতে চিয়াং আবার আলোচ্য হয়েছেন। কেননা, তিনি নাকি মূল ভূখণ্ড নিবাসী 'বিদ্রোহীদে'র নতুন করে আবার সাজা দেওয়ার কথা ভাবছেন!

শুনতে উদ্বেগজনক অথবা হাস্যকর হলেও চিয়াং কাইশেক নাম যার—বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁর পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক খবর। বিশেষ করে যাঁরা জনৈক আটপৌরে লবণ ব্যবসায়ীর এই পুত্রটির বিচিত্র জীবন-কাহিনী জানেন তাঁরাই জানেন,—সঙ্কল্পে এ-মানুষ সত্যিই পর্বত, সাহসিকতায় 'বুলডগ'। হাওয়ার গতি দেখে কোন দিন তিনি মন পাল্টাতে জানেন না। শুধু একটা কাহিনী শোনাচ্ছি।

তরুণ জেনারেল তখন সুংদের তিন কন্যার কনিষ্ঠ মি-লিং সুংয়ের নামে উন্মাদপ্রায়। ক'বছর আগে তিনি তাঁর বাল্যে বিবাহিত পত্নীকে ত্যাগ করেছেন। সান ইয়াত সেন-এর শিষ্য এখন তস্য শালিকাকে বিয়ে করতে চান। প্রথমে স্বয়ং পাত্রীর আপত্তি। পরম নিষ্ঠাবলে সে আপত্তি জয় হল। কিন্তু এবার বাদ সাধলেন পাত্রীর মা। তিনি বললেন—খৃষ্টানের মেয়েকে বিয়ে করতে হলে খৃষ্টান হওয়া চাই। সকলে ভেবেছিল চিয়াং রাজী হয়ে যাবেন। কিন্তু আশ্চর্য, জেনারেল সাফ জবাব দিলেন—'না'। খৃষ্টান যদি হই কখনও সে বই পড়ে, খৃষ্টান ধর্ম যাচাই করে,—বিয়ে করে নয়! উল্লেখযোগ্য চিয়াং তাই করেছিলেন। বিয়ে তিনি অ-খৃষ্টান হিসেবেই করেছিলেন।

৫. ৭. ৬২

চেন, ই

এডগার স্নো ওঁর কথা লেখেননি। অ্যানা লুই ষ্টং-এর সঙ্গেও ওঁর কথোপ-কথন হয়েছিল বলে মনে পড়ছে না। স্বল্পবাক মানুষ। কিন্তু লড়িয়ে লোক। 'মার্শাল' খেতাব পেয়েছেন মাত্র

সেদিন। ১৯৫৫ সনের সেপ্টেম্বরে। কিন্তু লড়াই করছেন বহুদিন। নতুন চীনের জন্মের বহু আগে থেকে।

চু এন-লাই-এর সঙ্গে যাঁরা এসেছেন কমপক্ষে সাঁইত্রিশ জন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অতিথি। তবে উল্লেখযোগ্যতম—এই একজন। চেন ই' উনষাট বছরের এই লোকটি যেমন চু এন-লাইয়ের চেয়ে বছর তিনেকের ছোট, পদমর্যাদায় কিছুটা তাই। তিনি নতুন চীনের সহকারী প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী।

চেন ই'র জীবন কর্মবহুল। ৯ সন থেকে '৫৮ সন পর্যন্ত সাংহাই-য়ের মেয়রের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সহকারী প্রধানমন্ত্রিত্ব ত করেছেনই, তাছাড়া যুগপৎ চীনের দেশরক্ষা কাউন্সিলের সহসভাপতিত্ব এবং পূর্ব চীনের সামরিক অধিনায়কত্বও করেছেন। এছাড়াও এই সঙ্গে আরও নানা জাতীয় কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। যথা: কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ইত্যাদি। একমাত্র পররাষ্ট্র সচিব হিসাবে তাঁর নির্বাচনটি সাম্প্রতিক ঘটনা। ১৯৫৯ সনের এপ্রিল থেকে তিনি চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী। অবশ্য, পররাষ্ট্র ব্যাপারে চেন ই একেবারে নবাগত নন, সেকথাও সহজেই অনুমেয়। চু এন-লাই আর একবার যখন ভারতে আসেন তখন চেন ই তাঁর সঙ্গে ছিলেন না সত্য, কিন্তু বান্দুং-এ তিনি সহযাত্রী ছিলেন। সুতরাং এবার তাঁর ভারত আগমন সেদিক থেকে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশেষ করে, অনেকের অনুমান—চীনের দিক থেকেও এ ঘটনাটা একেবারে অনুল্লেখযোগ্য নয়। কেননা, তাঁরা বলেন সরকারের ভেতরে যাঁরা চু-এর শক্তি এই লোকটি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। চু-এর মত তাঁর ধার নেই বটে, কিন্তু ভার আছে। এবং অনেকে বলেন—তা চু-এর চেয়ে কম নয়।

২৪.৪.৬০

চ্যাপলিন, চার্লস্

'ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর। চার্লি চ্যাপলিন ওয়েন্ট টু ওয়ার। হি টট দি নার্সেস হাউ টু ড্যান্স। অ্যাণ্ড দিস···হোয়াট হি টট দেম···! গেল যুদ্ধ নয়, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার কথা। তামাম ইউরোপে, আমেরিকায়,—চার্লি চ্যাপলিন তখন থেকেই নায়ক। পর্দায় নয়, মাটিতে। সৈন্যরা ছাউনিতে তাঁর ভঙ্গীতে নাচে,

স্কুলে-কলেজে ছেলেমেয়েরা তাঁর নামে সুর করে ছড়া কাটে। লক্ষ লক্ষ লোক তখন তাঁর মত গোঁফ রাখে, হাজার হাজার মানুষ তখন হাতে তাঁর মত ছড়ি রাখে,—তামাম দুনিয়ায় তখন শুধু চার্লি আর চার্লি। হাঁটার ভঙ্গি চার্লির মত, মদের বোতলের গড়ন চার্লির মত,—গ্লাসের ডিজাইন চার্লির মত। জনৈক বিখ্যাত সমালোচকের কথায়—চার্লি তখন সত্যিই 'দি বিগেস্ট সিঙ্গল ফ্যাক্ট ইন দি মোশান পিকচার ইনডাষ্ট্রি।' এবং নিঃসন্দেহে—এখনও।

হোমারের জন্মস্থানের সঠিক খবর যেমন কেউ রাখে না, তেমনি—চার্লিরও। কেউ বলে জন্ম তাঁর—কেনিংটন, কেউ—ক্ল্যাসহাম, কেউ—বলহাম। কিন্তু, বিস্ময়কর সেই শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন কিন্তু বার্মনসিতে। তা হোক। বিশ্ব শুধু এটুকু জানলেই নির্ভুল ভাবে নিজেকে, যখন জানা যায়, বার্মনসি জায়গাটা ইংল্যাণ্ডে।

—চার্লি কি ইংরেজ? দেশ—ইংল্যাণ্ড, কর্মভূমি—আমেরিকা, বর্তমান নিবাস—সুইজারল্যাণ্ড, মঞ্চ—এখনও গোটা বিশ্ব। সুতরাং, এক কথায় বিশ্বনাগরিক বলাই বোধ হয় ঠিক। তাছাড়া চার্লি হলেন—ফরাসী, ইহুদী, ইংরেজ; রক্তে আমার ত্রিবেণী।

গরীব পেশাদার গায়ক-গায়িকার ঘরের ছেলে চার্লি রোজগারে নেমেছিলেন চার বছর বয়সে। শহরের ভাঁটিখানার সামনে দাঁড়িয়ে দাদা সিডনীর সঙ্গে গান গাইতেন তিনি। বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়কর জীবনের সূচনা সেই পথের ধারেই।

তারপর বার্নোর অভিনয়ের দল এবং ক্রমে ১৯১০ সনে ম্যাকসনেটের সঙ্গে একদিন হলিউডে। চার্লির বয়স তখন মাত্র—একুশ।

চল্লিশ বছর পরে, ১৯৫১ সনে পাকাপাকিভাবে যখন তিনি ফিরে এলেন ইউরোপে, চার্লি তখন শুধু বিখ্যাত নন,—বিস্ময়কর মানুষ। নির্বাক এবং সবাক—চলচ্চিত্রের দুই যুগেই তিনি বিস্ময়কর অভিনেতা, বিস্ময়কর পরিচালক, বিস্ময়কর চিত্রনির্মাতা। শুরু করেছিলেন 'কক্ ইন এ কাবারে' দিয়ে। তারপর 'লাফিং গ্যাস', 'দি ভ্যাগাবণ্ড', 'দি লিটল মাউস', 'গোল্ড রাস', 'সিটি লাইটস', 'মডার্ন টাইমস', 'মঁসিয়ে ভার্দু', 'গ্রেট ডিক্টেটার' 'লাইম লাইট'—অজস্র চিত্রের প্রতি ইঙ্গিতে চার্লি আজও বিস্ময়কর।

তবে তার চেয়েও চার্লি চ্যাপলিন বিস্ময়কর মানুষ হিসেবে। তাঁর ছবির মতই বিচিত্র সেই জীবন। ছবির মতই হাসির অন্তরালে একটি সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ বেদনার ধারা। হলিউডে লক্ষ লক্ষ ডলারের মালিক চার্লি থাকতেন লস-এঞ্জেলস-এর গরীব পাড়ার একটি সস্তা হোটেলে। দারিদ্র্যকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারেননি—জীবনেও অভিনয়কে। প্রথম স্ত্রী মিলড্রেড পরে জেনেছিল এমন হাসিখুশি মানুষটি কেন ঘর ভেঙে পালিয়ে গেল। অভিনয় অসহ্য—অভিনেতাদের রাজার কাছে।

বিয়ের পর দু' বছর ছিলেন মিলড্রেড-এর সঙ্গে। তিন বছর লিটা গ্রে'র সঙ্গে। স্বেচ্ছায় দশ লক্ষ টাকা খেসারত দিয়েছিলেন চার্লি।

তৃতীয়া পলেট গর্ডাডকে কবে বিয়ে করেছিলেন তিনি, কেউ জানে না। শুধু 'গ্রেট ডিক্টেটার'-এর ভূমিকা বদল দেখে জানা গিয়েছিল—চার্লি এখনও হাসতে পারছেন না।

সেই হাসি দেখা গিয়েছিল চার্লি চ্যাপলিনের মুখে ১৯৪৩ সনের জুন মাসে। বিখ্যাত নাট্যকার ইউজেন ও'নীলের কন্যা উনা সেদিন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন জীবনসঙ্গিনী হিসেবে। উনার বয়স তখন আঠার, চার্লির চুয়ান্ন।

এখনও আছেন উনা। সুইজারল্যাণ্ডে জেনেভা হ্রদের ধারে সাঁইত্রিশ একর জমি জুড়ে চার্লি আর তাঁর বিরাট বাড়ি, মস্ত সংসার। আগের আগের পক্ষের ছেলেমেয়েরা রয়েছেন। উনা নিজেও ঘরভরা সন্তানের জননী। কেননা চার বছর বয়সে রাস্তায় রাস্তায় হাত পেতে গান গাইত যে শিশুটি, তার স্বভাব গ্রেট ডিক্টেটার এর নায়কের ঠিক উল্টো। শিশু দেখলে আঁৎকে উঠত হিটলার। কিন্তু চার্লি—ছোটদেব দেখলেই হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিতে চান।—এ চিরশিশুর জন্ম হিটলারের চারদিন আগে কিনা! অন্তত চার্লির তাই মত।'—হিটলার, ২০শে এপ্রিল, আমার—১৬ই, ১৮৯৮ সন!'

সংবাদ: বিশ্বের অন্যতম বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড এবার চার্লিকে 'ডক্টরেট' উপাধিতে সম্মানিত করেছেন। চার্লি চ্যাপলিন জীবনে প্রভূত সম্মান পেয়েছেন। তবুও এ-সম্মানটা উল্লেখযোগ্য; কেননা, অক্সফোর্ড যাকে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছেন, তাঁর সম্পর্কে হ্যানওয়েলের একটি বোর্ডিং স্কুলের খাতায় লেখা আছে:

জগন, ডাঃ ছেদি

চ্যাপলিন, চার্লস। বয়স—সাত বছর। প্রোটেস্ট্যাণ্ট। স্কুলে ভর্তি হওয়ার তারিখ—১৮ই জুন, ১৮৯৬। ছাড়বার তারিখ—১৮ই জানুয়ারী, ১৮৯৮।

৫.৪.৬২

জ

জগন, ডাঃ ছেদি

জর্জ-টাউনে সব চেয়ে বড় দাঁতের ডাক্তার কে?

কি ইংরেজ, কি নিগ্রো, কি চীনা, কি ভারতীয়,—শহরের যে কোন লোককে জিজ্ঞাসা করা মাত্র উত্তর পাওয়া যেত—'কেন, ডাঃ জগন!'

দাঁতের ডাক্তার থেকে প্রধান মন্ত্রী। বৃটিশ গায়নার সদ্য-নিবাচিত প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ছেদি জগন সেদিক থেকে সত্যিই কৌতূহলোদ্দীপক ব্যক্তিত্ব। বোধ হয় সমান কৌতূহলোদ্দীপক তার পূর্বপুরুষদের কাহিনীটি।

পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূল। শ্বেতাঙ্গরা সেদিন জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে আসত ওদের। তারপর পায়ে শিকল বেঁধে নামিয়ে দিত মাঠে মাঠে, বাগিচা আর কলের কাজে।

ডাঃ জগনের পূর্বপুরুষরাও এ কাজে একদিন এসে নেমেছিলেন এখানেই। আদি দেশ তাঁদের বিহার, ভারত। তারপর অনেকদিন পার হয়ে গেছে। শিকল বদলী হয়েছে। ডাচদের জায়গায় এসেছে ইংরেজরা (১৭৯৬)।

বাবা কাজ করতেন একটা চিনি কলে। তিনি ফোরম্যান ছিলেন। সুতরাং চার পাশের অন্যান্য মানুষের চেয়ে কিঞ্চিৎ সচ্ছলও।

দেশের নানা জাতের পঞ্চাশ লাখ মানুষের মধ্যে—শতকরা সত্তর জনই লেখাপড়া জানে না। ফোরম্যান পিতা তাই ছেলেকে পাঠালেন বিদ্যার্জনে। আদেশ: স্বখরচায় পড়তে হবে।

স্বদেশে তা সম্ভব নয়। সহজ নয়। জগন চলে গেলেন বিদে[illegible] আমেরিকায়। সেখানে দিনে [illegible] নানাবিধ কাজ করেন, রাতে [illegible] বামা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন।

সেখানকার পড়া শেষ করে ভর্তি হলেন নর্থ-ওয়েস্টার্ন-এর [illegible] স্কুলে। সেখানেই জানেথ-এর [illegible]

্র প্রথম দেখা। জানেথ রোজেন
্গের সঙ্গে।

রোজেনবার্গ পড়তেন—ধাত্রীবিদ্যা, ্গন-চিকিৎসাবিদ্যা। তবে দু'জনের ্ধ্যে অন্তরঙ্গতা হল যা উপলক্ষ্যে সে ্পূর্ণ অন্যবিধ বিদ্যা। নাম তার ্জনীতি।

শিকাগোর মেয়ে রোজেনবার্গ ছিলেন কমিউনিষ্ট, দরিদ্র গায়নার ্স্তান জগন আদর্শে পুরো মার্কসিস্ট। ্তরাং দু'জনে অন্তরঙ্গতা ক্রমে ্লবাসায় পরিণত হল এবং অবশেষে ৯৯৩ সনে ওঁদের বিয়ে হয়ে গেল।

দু' বছর পরে স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে ্লেন জগন। স্বদেশে ওরা সুখী ্তি। স্বামী ডাক্তারী করেন, স্ত্রী ্জনীতি।

'৪৩ সনে স্বামীও চেয়ার ছেড়ে ্লন জনতার মধ্যে। জনপ্রিয় ্ৎসককে ঘিরে রাতারাতি গড়ে নতুন দল। নাম—পিপলস্ ্রোগ্রেসিভ পার্টি। সে বছরই নতুন ্গনতন্ত্র এবং নির্বাচন। নির্বাচনে ্শটি আসনের মধ্যে ষোলটি চলে ্রি নতুন দলের হাতে। ফলে ্তের ডাক্তার অত:পর হোয়াইট-্র দন্তশূলের কারণ হয়ে উঠলেন। '৫৭ সনে বৃটিশ সরকার জগন এবং

জনসন, প্রেসিডেণ্ট লিনডেন বি.

তাঁর বন্ধুদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রী সভাটি বাতিল করে দিলেন। অজুহাত দেওয়া হল—ওরা কমিউনিষ্ট ছিল। প্রতি-শ্রুতি প্রচারিত হল—আবার নির্বাচন হবে।

সম্প্রতি সে নির্বাচন হয়ে গেল। সগৌরবে আবার ফিরে এলেন তেতাল্লিশ বছরের তরুণ রাজনীতিক ডাঃ জগন। তাঁর দল এবার আরও বেশী আসনের অধিকারী! ফলে, বলা বাহুল্য, বৃটিশ গায়না এবার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হতে চলল। উল্লেখযোগ্য, ইংরেজ রাজত্বে যাদের জন্যে সত্যিই সূর্য ডুবত না এই উপনিবেশটি ছিল (ভৌগোলিক কারণবশত) তাই। ইতিহাস বলবে যিনি শেষ পর্যন্ত তা ডুবিয়ে ছিলেন তিনি একদিন দাঁতের ডাক্তার ছিলেন। ৩১.৮.৬১

জনসন, প্রেসিডেণ্ট লিনডেন বি.

'আমি আমার যথাসাধ্য করব। একমাত্র তাই-ই আমি করতে পারি। আমি আপনাদের সাহায্য চাই,—আর চাই ঈশ্বরের সহানুভূতি'—জাতির প্রতি বেতারে এই নাতিদীর্ঘ বাণী দিয়ে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির প্রাণহীন হাত থেকে বিশ্বের অন্যতম সবল গণতন্ত্রের জটিল এবং দুরূহ দায়িত্বভার আপন

জনসন, প্রেসিডেন্ট লিন্‌ডেন বি.

হাতে তুলে নিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি জনসন। মার্কিন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তিনিই এখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। ডালাস থেকে যে বিশেষ বিমানে স্বর্গত প্রেসিডেন্টের শবাধার রাজধানী ওয়াশিংটনে আনা হয় তারই একটি কক্ষে ভাইস প্রেসিডেন্ট লিন্‌ডেন জনসন রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন একজন জেলা জজ। পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক এই বিখ্যাত ডেমক্র্যাট নায়ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৬তম প্রেসিডেন্ট।

হঠাৎ আপিসের সকলকে ডেকে লাইন করে দাঁড করালেন। তারপর বললেন "দেখি তোমাদের নেকটাই।"

দেখা গেল, আছে বটে সকলেরই গলায় কিন্তু কারও যথাযথ নয়।

নিজে হাতে প্রত্যেকটি ঠিক করে দিলেন। বলেন—শিখিয়ে দেব? কি করে ঠিক রাখতে হয়? নিজের টাইটা তিনি আলতোভাবে ঢিলে করলেন। তারপর সম্পূর্ণ না খুলে মাথা দিয়ে গলিয়ে বের করে আনলেন। বললেন—এই আমার কৌশল। এমন ভাবে বাঁধিয়ে একদিন বাঁধলেই চলে, প্রতিদিন নট, খুলতে হয় না।

এক কথায়—টিপটপ। চুল ধূসর হয়ে এসেছে, কিন্তু মাথাটি আদ্যোপান্ত সুবিন্যস্ত। সাম্প্রতিক পদোন্নতির আগে মার্কিন সিনেটে তিনি খ্যাত-নামা 'বাবু'। দামী স্যুট, নিজের নাম মনোগ্রাম করা সিল্কের সার্ট, সোনার পিন, সোনার কলম, সোনার ঘড়ি যেন কোন সদ্য রাজত্ব-পাওয়া ব্যাভেরিয়ান সম্রাট।

আপিসে আরও। আসবাব পত্র সব তাঁর নিজের পছন্দ মত। মাথার ওপর এমন ভাবে দুটি আলো বসিয়েছেন যে, নিজের চেয়ারটিতে বসলে মাথায় ধূসর চুলে একটা সোনালী রেখা জাগে।

অথচ, বাহান্ন বছর আগে এ মানুষটিরই জীবন সুরু হয়েছিল শাইন বয় হিসেবে। টেক্সাসের সেই ছোট্ট শহরটায় বসে বসে জুতো পালিশ করত ছেলেটি। সঙ্গে সঙ্গে স্কুলে পড়ত ও।

স্কুলের পড়া শেষ হওয়া মাত্র সুরু হয়ে গেল রোজগারের জীবন। কখনও কখনও গাড়ী ধোলাই করা, কখনও রাস্তা তৈরী করা। সেখান থেকে উঠতে উঠতে এখানে। এখন সেই সব রাস্তাগুলোর ধারেই টেক্সাস রাজ্যটিতে তাঁর নামে বিস্তীর্ণ একটা এলাকা।

নাম—জনসন। লিনডেন বাইনেস জনসন। পরিচয়—মার্কিন দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট (প্রেসিডেন্ট যে হলেন না সে শুধু অল্পের জন্যে!)

তবে এটুকু যে হয়েছেন সে অনেক কিছুর জন্যে। সে এক কাহিনী বিশেষ।

গরীবের ছেলে। তবুও কাজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন একদিন। ভাড়া নেই। সুতরাং, হিচ হাইক করেই এসে হাজির হলেন সান-মার্কস-এ। এবার ভর্তি হলেন সাউথ ওয়েস্ট টীচারস কলেজে। কলেজের খরচ আসত কাছাকাছি একটা স্কুল থেকে। সেখানে দারোয়ানের কাজ করতেন তিনি!

তিন বছর পরে কলেজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে বের হলেন জনসন। সঙ্গে সঙ্গে কাজও মিলে গেল একটা। হাডসনে একটা স্কুলের কাজ। সেখানে তাঁকে ছেলেদের বক্তৃতা দিতে শিখাতে হবে।

সেই উপলক্ষেই পরিচয় বিখ্যাত কংগ্রেস সদস্য ক্লিবার্গ-এর সঙ্গে এবং কিছুদিন পরে (১৯৩৪) 'লেডি বার্ড' নামে পরিচিতা বিখ্যাতা টেক্সাস-সুন্দরী ক্লডিয়া টেলার-এর সঙ্গে। ক্লিবার্গ জনসনকে নিজের সেক্রেটারী যুক্ত করলেন এবং ঘটনা সূত্রে ধনিকদুহিতা সেই প্রখর ছেলেটিকে দেখামাত্র ভালবেসে ফেললেন।

দশ সপ্তাহ ব্যাপী প্রেম, তারপর বিবাহ। বিয়ের পর ক্লিবার্গ-এর সঙ্গে জনসনেরা চলে এলেন ওয়াশিংটনে। জনসন সেখানে দিনে সেক্রেটারীর কাজ করেন, রাতে জজ টাউনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আইন পড়েন। এখন তাঁর পরিচিতের পরিধি অনেক বিস্তৃত।

সুতরাং, একদিন শোনা গেল ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট তাঁকে ন্যাশনাল ইয়ুথ এসোসিয়েশনের দায়িত্ব দিয়ে টেক্সাসে পাঠাচ্ছেন। দু-বছর পরে '৩৭ সনে নয়জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে আবার রাজধানীতে ফিরে এলেন জনসন। এবার সোজা কংগ্রেসে। ঘটনা দেখে এফ. আর. ডি মুগ্ধ, বিস্মিত। তিনি জনসনকে তাঁর প্রমোদ তরীর সহযাত্রী করলেন। প্রেসিডেন্টের গাড়ীতে বসে জনসন তাঁর সঙ্গে গোটা টেক্সাস ঘুরলেন। ডেমোক্র্যাটদের কাছে দক্ষিণী জনসন রীতিমত মূল্যবান।

এগার বছর একটানা কংগ্রেসে। তারপর '৪৮ সনে সিনেট-এ। '৫৪ সনে আবার। '৫৩ সনে ডেমোক্র্যাটরা তাঁকে সিনেটে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নেতা নির্বাচিত করলেন। '৫৪ সনে

তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। স্ট্যালিনগ্রাডে লড়াই করে '৪৩ সনে তিনি পোলিস বাহিনীর সহকারী প্রধান সেনাপতির পদ পেলেন। ক্রমে একদিন ঘোষিত হলেন 'সি এন সি'। পোলি 'মুক্তি' ফৌজের—প্রধান সেনাপতি।

যুদ্ধ শেষ হল। দেশপ্রেমিকেরা দেশে ফিরলেন। নতুন করে ঢেলে সাজান পোল্যাণ্ডে শুরু হল নয়া-জমানা। 'প্রধান সেনাপতি' আলেকজাণ্ডার জাওয়াজকি এখন সেখানে একজন আঞ্চলিক শাসক ও ডেপুটি। কিন্তু জাওয়াজকি বরাবরই হাতে-কলমে রাজনৈতিক। ফলে '৪৯ সনেই শোনা গেল—তিনি পোলিশ ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন। অর্থাৎ শ্রমিকেরা জানিয়েছেন—তারা ওকে ভালবাসেন! ফলে '৫১ সনেই নতুন সংবাদ জানা গেল।—জাওয়াজকি এখন থেকে পোল্যাণ্ডের সহকারী প্রধানমন্ত্রী। পরের বছর আরও গরম খবর—জাওয়াজকি প্রেসিডেন্ট। সেই থেকে তিনি এ পদেই নিযুক্ত আছেন।

উল্লেখযোগ্য এই, ইতিমধ্যে পোল্যাণ্ডে নানা ধরনের ভূমিকম্প হয়ে গেছে। কিন্তু প্রেসিডেন্টের আসনটি যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। কেননা সেখানে যে মানুষটি বসে আছেন পা দু'খানি তাঁর গোড়া থেকেই মাটিতে! ১৯. ১০. ৬১

জিলাস, মিলোভান

"I have travelled the entire road open to a communist: from the lowest to the highest rung of the hierarchical ladder……"

মিশমিশে কালো একমাথা চুল, খড়্গের মত নাক, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দুটি চোখ। চেহারা দেখলে মনে হয় না বয়স একান্নয় পৌঁছেচে। জবানী শুনলে ভাবাও যায় না সেগুলো লেখা হয়েছে জেলে বসে।

বছর দেড়েক বাইরে 'ছুটি' কাটিয়ে জিলাস আবার জেলে ফিরে গেলেন। সেই সেলটিতে যেখানে ১৯৫৪ সনে বন্ধু টিটো তাঁর পুরানো সহকর্মীকে রেখেছিলেন এবং যেখানে ওঁরা কারাগারের অধিকার পাওয়ার আগে সুদূর ১৯৩০ সনে তৎকালের দেশের রাজা মলিভান জিলাস নামক একটি বিদ্রোহী তরুণকে বন্দী করে রেখেছিলেন। শোনা যায়, রাজধানী থেকে চল্লিশ মাইল দূরে মিট্রোভিকার কারাগারের সেই পুরানো সেলটিই জিলাসের

আজকের ঠিকানা। ঈশ্বর অন্যরকম কিছু না ঘটালে যুগোস্লাভিয়ার ভূতপূর্ব ভাইস প্রেসিডেণ্ট আগামী দশটি বছর সেখানেই কাটাবেন।

জেল দেখে ভয় পাবার মত মানুষ যদি হতেন, তবে হয়ত চিরকাল সিংহাসনেই কাটাতে পারতেন। অন্তত শুধু মুখ না খুলতে পারলেই স্বাধীন জীবন ছিল নিশ্চিত। টিটো সে মর্মেই কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও পারা গেল না। কেননা, জিলাস বলেন, 'আমি যেন চোখে রক্ত নিয়েই জন্মেছি। আমার চোখে জীবনের প্রথম দৃশ্যটাই ছিল রক্তাক্ত।'

কথাগুলো বলেছিলেন অবশ্য বিচার-হীন পিতৃভূমির ('ল্যাণ্ড উইদাউট জাস্টিস') সেই অংশটুকুর প্রকৃতি বর্ণনা করতে যেখানে নিকোলা জিলাস নামক জনৈক যোদ্ধা তথা কৃষকের ঘরে সাতটি সন্তানের একটি হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তিনি। পূব ইউরোপের ঐ কোণটিতে রক্ত সেদিন প্রাত্যহিক ছিল।

দশ বছর বয়সে মায়ের কোল থেকে নেমে স্কুলে গিয়েছিলেন চাষীর ছেলে। আঠার বছর বয়সে এসে নাম লিখিয়েছিলেন বেলগ্রেড য়ুনিভার্সিটির দর্শন এবং আইনের ক্লাসে। সেখানেই মার্কস-তন্ত্রে প্রথম দীক্ষা। ফলে '৩৩ সনে ডিগ্রী নিয়ে সোজা কর্মক্ষেত্রে ফেরা গেল না, পরিবর্তে যেতে হল জেলে। অবশ্য মেয়াদ ছিল মাত্র তিন বছর।

জেল থেকে বের হওয়ার পরই টিটোর সঙ্গে দেখা। টিটো তখন পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল, জিলাস প্রখর পার্টিম্যান। টিটো ওকে স্প্যানিস সিবিল ওয়ারে লড়াই করার জন্যে লোক সংগ্রহ করতে বললেন। জিলাস আশাতীত যোগ্যতার পরিচয় দিলেন। ফলে অচিরেই দু'জনের বন্ধুত্ব হয়ে গেল, এবং '৪০ সনেই দেখা গেল জিলাস পার্টির পলিট ব্যুরোতে উঠে এসেছেন।

যুদ্ধের সময় আরও এগিয়ে গেলেন জিলাস। মহাযুদ্ধে তিনি বাবা, দুই ভাই, দু'টি বোন সব হারালেন, তবুও পিতৃভূমির মুক্তি যুদ্ধে একবারও পেছন তাকালেন না। তিনি তখন লিবারেশন আর্মির সুপ্রিম স্টাফের একজন, অন্যতম। '৪৪ সনে মিলিটারী মিশন নিয়ে তিনিই গিয়েছিলেন মস্কোয় এবং স্তালিনের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসে তিনিই প্রথম প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলেন—যুগোস্লাভিয়াস্থ লাল-ফৌজের নৈতিক অধঃপতনের!

১৯৪৫ থেকে '৫৩ সন পর্যন্ত জিলাস তখন যুগোস্লাভিয়ায় উদীয়মান নক্ষত্র। কখনও তিনি মন্ত্রী, কখনও পার্টির পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, কখনও বাইরে রুশ-যুগোস্লাভ বিরোধে দ্বিতীয় পক্ষের প্রধান মুখপত্র। জনপ্রিয়তায় এবং গুরুত্বে জিলাস তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি।

'৫৩ সনে সে ব্যক্তিত্ব সরকারী স্বীকৃতি পেল। নিজের এলাকায় শতকরা ৯৯·৮ ভোট পেয়ে জিলাস কেন্দ্রীয় পরিষদে এলেন এবং অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। ক্রমে পরিষদ পরিচালনার ভারও তাঁর উপর অর্পিত হল।

কিন্তু সে আসনে বসবার আগেই এল টিটোর সমন। অপরাধ—জিলাস বেপথে চলেছেন। ক্রমেই তিনি আদর্শচ্যুত হচ্ছেন। প্রমাণ তাঁর প্রবন্ধাবলী। কাগজে কাগজে জিলাস তখন আজকের ক্রুশ্চভ প্রায়। তিনি পার্টির সমালোচনায় মুখর। এমন কি পার্টির কর্তাদের গৃহিণীদের আচার আচরণও বাদ দিতে রাজী নন তিনি। তদুপরি তিনি সাধারণের জন্যে আরও স্বাধীনতা চান, আইনের শাসনকে আরও প্রসারিত করতে চান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সহকর্মীকে আঠার মাস নজরবন্দী রাখার আদেশ দিলেন টিটো। ক'মাস পরেই মার্কিন দেশে প্রকাশিত হল তাঁর ততোধিক সমালোচনামূলক আর একটি প্রবন্ধ। ফলে নজর বন্ধনের বদলে কারাবাস নির্দিষ্ট হল তিন বছর। জেলে থাকা কালে বের হল—বন্দীর লিখিত বক্তব্য, 'নিউ ক্লাস'। জিলাস লিখেছেন—যুগোস্লাভিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হল মানেই কমিউনিজমের সমাপ্তির সূচনা হল। দেখতে দেখতে চোদ্দটি ভাষায় অনূদিত হয়ে গেল সেই বই। ফলে, তিনের সঙ্গে আরও সাত বছর যুক্ত হল!

অবশেষে গেল বছর জানুয়ারীতে টিটোর মন ফিরল। জিলাসকে তিনি মুক্তি দিলেন। সর্ত তিনি আর মুখ খুলতে পারবেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে কলম খুলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন জিলাস। তিনি পাঁচটি ভাষা জানেন। গোর্কির রচনাবলী অনুবাদ করেছেন। জেলে বসেই বিখ্যাত কয়টি বই লিখেছেন। সে সব বই পড়ে একজন সমালোচক বলেছেন—'সাহিত্য তার একটি হারানো ছেলেকে ফিরে পেল।'

কিন্তু রাজনীতি আবার কেড়ে নিয়ে গেল তাঁকে। এবারের অপরাধও

কলমের। তবে সে কলম যে কাহিনী বলেছিল তা রাজনীতির। স্তালিনের সঙ্গে টিটোর বিরোধের কাহিনীই ছিল —জিলাসের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং, টিটো আবার দৃঢ় হলেন। এবং বেলগ্রেডের এক বদ্ধদুয়ার আদালতে কাঠগড়ার উপর থেকে স্ত্রী স্তেফানিকে অভিনন্দন জানিয়ে লড়িয়ে জিলাস আবার তার সেই পুরানো সেলটিতে ফিরে গেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, স্তেফানি ওঁর দ্বিতীয় স্ত্রী। আগের স্ত্রীর নাম ছিল মিত্রা মিত্রোভিক। ১৭. ৫. ৬২

জুলিয়ানা, রানী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুখে মুখে ইউরোপে একজন রাজকুমারী খবরের কাগজে সংবাদ হয়েছিলেন। নাম তাঁর—জুলিয়ানা। সংবাদের হেতু : সাতাশ বছরের এই ডাচ রাজকুমারী জার্মানীতে অলিম্পিক খেলা দেখতে গিয়ে খেলার মাঠে পঁচিশ বছরের এক জার্মান রাজকুমারকে হৃদয় দিয়ে ফেলেছেন। ছেলেটির নাম —বার্ণাড। তিনি শুধু সদ্বংশজ তাই নয়, সুশিক্ষিত এবং সম্পন্নও বটে। রাজকুমার একটি বিখ্যাত জার্মান প্রতিষ্ঠানে বিরাট কাজ করেন। তৎসত্ত্বেও ব্যাপারটা হল্যাণ্ডের পক্ষে উদ্বেগজনক। কেননা, হল্যাণ্ড তৎকালে (১৯৩৬) নিরপেক্ষ দেশ এবং জর্মানীতে অনভিপ্রেত নাৎসীদের প্রভুত্ব। সুতরাং বিয়েতে মত দেওয়ার আগে নেদারল্যাণ্ড-এর প্রজারা রাজকুমারের রাজনৈতিক আদর্শ সন্ধানে ব্রতী হল, বিয়ে মাস কয়েকের জন্যে পিছিয়ে গেল এবং জুলিয়ানা অনিবার্য ভাবেই খবরে পরিণত হলেন। সেও আর এক মার্গারেট উপাখ্যান প্রায়।

সেই জুলিয়ানা, চুয়ান্ন বছরের প্রবীণা রাণী আর তাঁর স্বামী বার্ণাড সকন্যা কলকাতা ঘুরে গেলেন। এবারও তিনি সংবাদ। কেননা, যদিও প্রায় তিনশ বছর ধরে এশিয়ায় ওঁদের আনাগোনা, রাজত্ব—তাহলেও গত চারশ' বছরের মধ্যে জুলিয়ানাই ডাচ রাজবাড়ীর প্রথম মানুষ যিনি স্বচক্ষে এশিয়া দেখলেন। তাঁর এই ভ্রমণ বাদ দিলে কি শ্রীরামপুর কি জাভা বর্ণিও—হল্যাণ্ডের রাজপ্রাসাদে সাম্রাজ্য চিরকাল মানচিত্রে অন্যতম রং মাত্র। সেখানে অনেক কিছু পাওয়া যায় বটে কিন্তু দেখবার কিছুই নেই।

জুলিয়ানা এবার রীতি ভঙ্গ করে

খবর হলেন। কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়কর সংবাদ ডাচদের এই রানী নিজে। আজন্ম ইউরোপে তিনি খবর। ১৯০৯ সনে এই নীলনয়না সুদর্শনা রাজকুমারীটির জন্মক্ষণে হেগএর প্রাসাদ থেকে একান্নবার তোপধ্বনি হয়েছিল, কারণ হল্যাণ্ডের সুখ্যাত রানী উইলহেলমিনা (Wilhelmina) বিয়ের দীর্ঘ আট বছর পরে এই একমাত্র সন্তানকে কোলে পেয়েছিলেন। মা নিজে রানী ছিলেন। তাঁর মা এমাও। সুতরাং জুলিয়ানা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মুহূর্তেই প্রজারা জেনেছিল—এবারও তারা সিংহাসনে রানীই পেল।

একটানা পঞ্চাশ বছর সগৌরবে রাজত্ব করে মা মেয়ের হাতে রাজ্য তুলে দিয়েছিলেন যখন (১৯৪৮) জুলিয়ানার বয়স তখন উনচল্লিশ। কিন্তু সিংহাসনের কাছাকাছি আছেন তিনি সেই আঠার বছর বয়স থেকেই। সুশিক্ষিতা রাজকুমারী (তিনি প্রাইভেট টিউটর ছাড়াও লিডেন-এর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন) সেই থেকেই তাঁর দেশের প্রজাবর্গের নয়নের মণি। রাজরানীর ব্যাপারে হল্যাণ্ডও অনেকটা ইংলণ্ডের মত। সেখানেও নিয়ম-তান্ত্রিক রাজতন্ত্র। বরং, নিয়মের দিক থেকে রাজারানীরা আরও রিক্ত। ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথ মুকুট পরতে পারেন, কিন্তু জুলিয়ানার সুন্দর বাদামী চুলগুলো টুপি ছাড়া কোনদিন মুকুটের স্পর্শ পায়নি। কেন না, সেটা রিপাবলিকের সম্পত্তি। তবুও ওরা রানীকে ভালবাসে কারণ জুলিয়ানা রানী হয়েও মানবী।

তিনি পিয়ানো বাজাতে পারেন, ঘোড়ায় এবং সাইকেলে চড়তে জানেন, স্কেটিং করতে পারেন এবং ডাচ ছাড়াও ফরাসী, ইংরেজী এবং জার্মান তিনটি ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারেন। জুলিয়ানা সম্ভবত একমাত্র রানী যিনি নিজের বক্তৃতা নিজে লিখে থাকেন।

এ ছাড়াও রানী জুলিয়ানার জনপ্রিয়তার আরও কারণ আছে। নাৎসী আক্রমণের পরেই স্বামীকে রণক্ষেত্রে পাঠিয়ে রানী দেশান্তরী হয়েছিলেন। প্রথমে ইংল্যাণ্ডে এবং পরে কানাডায় থেকেই উদ্বাস্তু রানী স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছেন। যুদ্ধের পর তাঁর হাত দিয়ে একদিকে যেমন ইন্দোনেশিয়ার মত সাম্রাজ্য হাতছাড়া হয়েছে, অন্যদিকে তাঁর রাজত্বেই হল্যাণ্ড উত্তমর্ণ

থেকে অধমর্ণে পরিণত হয়েছে। সুতরাং, প্রজারা সুখী। তা ছাড়া ব্যক্তিগত জীবনে জুলিয়ানা এক অবিশ্বাস্য প্রকৃতির রানী। তিনি প্রাসাদ থেকে প্রথাগত সৌজন্য প্রদর্শনের যাবতীয় প্রথা দূর করেছেন। স্বামী এবং সন্তানেরা কি খাবে—রানী নিজেই তা ঠিক করে দেন! তাছাড়া জুলিয়ানা আরও একটি নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। ওঁদের পরিবারে নিয়ম ছিল কোন রাজকুমার বা রাজকুমারীর নাম রাখার সময় পূর্বপুরুষদের স্মরণে রাখতে হবে। জুলিয়ানার পুরো নাম সে কারণেই জুলিয়ানা লুসি এমা মেরী…ইত্যাদি ইত্যাদি সাত সাতটি নামের এক দীর্ঘমালা। ওঁরা কেউ রানীর ঠাকুমা, কেউ দিদিমা। রানী তাতে রাজী নন। তাঁর চারটি মেয়ে প্রত্যেকের নাম যে কোন ডাচ মেয়ের মত; সবচেয়ে বড় যে মেয়েটি, মায়ের পর যিনি আবার ডাচদের রানী হবেন তাঁর নাম—প্রিন্সেস বিয়াত্রিক্স,—শুধু বিয়াত্রিক্স। ১৭. ১০. ৬৩

ঝ

ঝা, বিনোদানন্দ

গায়ে ঢিলে হাতা কর্কশ খাদির পাঞ্জাবী, হাঁটুর অব্যবহিত পরেই ধুতির প্রান্ত, পায়ে চম্পারণী চপ্পল, মাথায় সাদা খাদির টুপি, মুখে গ্রাম্য প্রশান্তি। নাম—বিনোদানন্দ ঝা। পণ্ডিত ঝা বিহার নামক রাজ্যটির নব নির্বাচিত মুখ্য মন্ত্রী।

জন্ম—দেওঘরে, মৈথিলি ব্রাহ্মণের ঘরে। লেখা পড়া আংশিক সেখানে বাকীটুকু এখানে, অর্থাৎ বাংলা দেশে। কিশোর বিনোদানন্দ (জন্ম—১৯০০ সন) বরাহনগরের ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্র।

স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে পণ্ডিত বংশের তরুণ ভর্তি হলেন—কলকাতার সিটি কলেজে, সে ১৯১৮-১৯ সনের কথা।

তার আগের বছর কংগ্রেস দেখতে গিয়েছিলেন বিনোদানন্দ। সেকালের কংগ্রেস; উত্তেজনাকর দৃশ্য। পড়তে পড়তে চোখে ভাসে, মন বই ছেড়ে পালিয়ে যেতে চায়।

পালিয়ে যাওয়ার সুযোগও এল। এল অসহযোগ আন্দোলন। বই ছুঁড়ে

ফেলে বিনোদানন্দ যোগ দিয়ে বসলেন তাতে। এবং যোগ দিলেন সানন্দে।

তারপর থেকে জেলে জেলেই দিন কেটেছে পণ্ডিতজীর। বাইরে যখন তখন তিনি গ্রাম কর্মী, নয়ত শ্রমিক সেবায়েত। '৩৭ সনে ওঁরা নির্বাচনে দাঁড করালেন ওঁকে। বিনোদানন্দ বিধান সভায় এলেন। সেই থেকে তিনি আজও সেখানে আছেন। তবে একই আসনে নয়।

প্রথমে ছিলেন পালামেণ্টারি সেক্রেটারী। ১৯৪৬ সনে হলেন মন্ত্রী। দপ্তর—স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন। পরে বিগত মন্ত্রী সভায় শ্রম এবং রাজস্ব সচিব। সে সময়েই পণ্ডিতজীর প্রথম বিদেশ ভ্রমণ। জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে সে বছর তাঁরই নেতৃত্বে পাঠান হয়েছিল ভারতীয় প্রতিনিধি দল।

স্থির, ধীর স্বল্পবাক এই আদর্শ মানুষটি যে শুধু বিহারের পক্ষেই নিজেকে নিভরযোগ্য প্রমাণিত করেছেন তাই নয়। অন্যদের পক্ষেও তিনি সম্ভবত অভিনন্দনযোগ্য মানুষ।

১৬. ২. ৬১

টয়েনবি, আর্নল্ড

যেখানে জমি উর্বর, আবহাওয়া অনুকূল এবং জীবনের যাত্রাপথ সহজ সেখানেই সভ্যতার আদিভূমি। অন্তত সাধারণ ইতিহাস পাঠকের তাই ধারণা। কিন্তু টয়েনবি বলেন—ভুল ধারণা। তাঁর মতে নীল নদের উপত্যকা সভ্যতার দোলনায় পরিণত হওয়ার আগে ছিল শ্বাপদের বিচরণভূমি। শুধু বন আর বন,—এই ছিল তার তখনকার পরিবেশ। মেসোপোটামিয়া এবং চীন সভ্যতার ভিটের খবরও তাই। সুতরাং, একালে মানবসভ্যতার অন্যতম পাঠক আর্নল্ড জোসেফ টয়েনবির সিদ্ধান্ত : সভ্যতার জন্ম পরিবেশে নয়, (পরিবেশের) চ্যালেঞ্জে।

এক যুগ ধরে লেখা দশ ভল্যুম-এর প্রকাণ্ড বই, এ যুগের শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিক কীর্তি—'এ স্টাডি অব হিস্টরি'তে এমনি অনেক অভিনব তথ্য ও তত্ত্ব উদ্ঘাটন করেছেন টয়েনবি। তিনি বলেন—'এটিক

অরণ্যাঞ্চল শূন্য হয়ে গেল। সুতরাং বাধ্য হয়েই স্থাপত্যের জন্যে এথেন্সকে হাত দিতে হল পাথরে। পার্থেনন এই অভাবেরই ফসল।' সমালোচকেরা বিনীতভাবে বললেন—তার প্রমাণ? প্রমাণ টয়েনবির না আছে তা নয়। কিন্তু তার উল্টোপ্রমাণও যথেষ্ট। সুতরাং তাঁর পাণ্ডিত্যে পূর্ণ আস্থা রেখেই ইউরোপ বলে—টয়েনবি ঐতিহাসিক হয়েও মিস্টিক। বিজ্ঞান তাঁর মাথায় আছে বটে, কিন্তু হাতে নেই। লেখায় টয়েনবি—'স্যুডো-সায়েন্টটিস্ট'। কেউ কেউ বলেন, তিনি—কবি।

এক কথায় তিনি কি বলতে বললে—এই জ্ঞানবৃদ্ধ হয়ত বলতেন---তিনি খৃস্টান। বিশ শতকের ইউরোপবাসী জনৈক খৃস্টান। তিনি ঐতিহাসিক হয়েছেন—কারণ তাঁর মা তাই ছিলেন। তরুণ টয়েনবির আগ্রহ ছিল ক্ল্যাসিক্যাল ভাষায় এবং বিদ্যায়। কাব্য আর উপকথায় আচ্ছন্ন সেই মোহময় জগতের আকর্ষণ তাঁকে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় শুধু উচ্চতম স্থানটিতেই টেনে নিয়ে গেল না, পুরানো পৃথিবীর সেই এলোমেলো জট ভাঙাবার নেশাটাও ধরিয়ে দিয়ে গেল। প্রথমে উইনচেস্টার-এ একটা স্কলারসিপ, তারপর বালিওলে আর একটা, ক্রমে এখানেই ফেলোশিপ এবং বিবাহ। টয়েনবি বিখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক গিলবার্ট মারী'র ছাত্র এবং জামাতা।

কর্মজীবনে টয়েনবির পরিচয় দীর্ঘ ও কৃতিত্বপূর্ণ। অনুমানের উপকরণ হিসাবে এখানে এটুকুই উল্লেখ্য: প্রায় চল্লিশ বছর ধরে আর্নল্ড টয়েনবি বৃটেনের 'রয়াল ইনস্টিটিউট অব ইণ্টার-ন্যাশনাল এফেয়ার্স"-এর ডাইরেক্টর। এখন তাঁর বয়স—একাত্তর।

আধুনিক বৃটেনের অন্যতম গৌরব, এ যুগের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক টয়েনবি ভারতে এসেছেন। এবার তিনি আজাদ-স্মৃতি বক্তৃতামালার জন্যে আমন্ত্রিত অতিথি। টয়েনবির এই দ্বিতীয়বার ভারত দর্শন। প্রথমবার ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর লিখিত বাসনা প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল, দক্ষিণ ভারতের কোন গাঁ থেকে একটি গরুর গাড়ি করে তিনি ভারত দর্শনে বের হন। হাতে যুগের পর যুগ, শতকের পর শতক সময়! ভারতের অন্তর্রহস্যকে এমন অল্প কথায় প্রকাশ করা বোধ হয় টয়েনবির পক্ষেই সম্ভব। কেন না, টয়েনবি সত্যদর্শী ঐতিহাসিক হয়েও ধর্মীয়

মস্তিক। আর ভারতবর্ষ সেই ঐতিহাসিকের অতিসাবধানে গোনা একুশ সভ্যতার অন্যতম। তাছাড়া টয়েনবির মতে পৃথিবীর সাতটি শ্রেষ্ঠ ধর্মের শ্রেষ্ঠতমটি (অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম) ভারতেই জাত। ২৭. ২. ৬০

টাটা, জে. আর. ডি.

বছর কয় আগে আমেরিকানরা হিসেব করেছিলেন একবার। তেল-সাবান থেকে মোটর-রেল—সব মিলিয়ে ওর সাম্রাজ্যের মূল্য হবে ৪০ কোটি ডলার, কর্মীসংখ্যা—এক লক্ষ সাড়ে ষোল হাজার। এখন অবশ্যই আরও অনেক, অনেক বেশী। কিন্তু কানে হেডফোন লাগিয়ে ককপিটে বসা হাওয়াইন শার্ট পরা মানুষটির দিকে তাকালে কী কেউ ভাবতে পারে সে কথা ?

পারেন, যাঁরা ওকে জানেন। তাদের কয়েক হাজারের কাছে পরিচয় তাঁর শুধু—'জে', কয়েক লক্ষের কাছে শুধু 'চেয়ারম্যান', কয়েক কোটির কাছে—'জে আর ডি', বিশ্বে আরও অল্প কথায়,—শুধু 'টাটা'। জাহাঙ্গীর রতনজী দাদাভাই টাটা নয়, শুধু 'টাটা'।

ছোটবেলা থেকেই জামসেদজীর এই পৌত্রটি একটু অন্য ধাতের ছেলে। বাবা জামসেদজীতনয় বিখ্যাত—আর ডি টাটা। মা—পলিন সুজান জেনেভিভ টাটা (Pauline Suzanne Genevieve Briere). জন্ম—১৯০৪। জন্মস্থান—প্যারী। জে আর ডি'র চোখের তারায় বাল্য থেকেই তাই পূব আর পশ্চিম ভেদহীন। লেখাপড়াও তাঁর কিছুদিন ভারতে, কিছুদিন মাতুলালয় প্যারীতে, কিছুদিন জাপানে। জামসেদজীর আদুরে নাতির জন্যে পৃথিবীতে শিখবার জিনিস ছিল অনেক। কাপড়ের কল খোলার আগে জামসেদজী নিজে টেক্সটাইল এঞ্জিনীয়ারিং শিখেছিলেন বিলেতে। কিন্তু জাহাঙ্গীর শিখলেন—বিমান চালনা। কেননা, এই শতকের দ্বিতীয় দশকে সেটাই সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল, সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ বিদ্যা।

টাটা ভারতে প্রথম লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভারতীয় বৈমানিক (১৯২৯), টাটা ভারতে অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক—এ খবরগুলো গেল ক'দিনে নতুন করে আবার সবাই জেনেছেন। কিন্তু যে তথ্যটা অনেকেই এখনও জানেন না—সে ১৯৫৩ সনের ১লা আগস্ট তারিখে জাহাঙ্গীর টাটার

ভাষা। বিমান চলাচল ব্যবস্থা জাতীয়করণের সংবাদ ঘোষিত হয়েছে। দেশে বিদেশে অনেকে আশা করে আছেন; টাটাকে এবার রূঢ়তম সরকারী সমালোচকের ভূমিকায় দেখা যাবে। কিন্তু এ কী? স্মিত হাস্যে আসন পরিগ্রহ করলেন জাহাঙ্গীর; তারপর কর্মীদের বললেন—নতুন উদ্দীপনায় দায়িত্বভার গ্রহণ করতে। তিনি চান বিমান চালনায় ভারত আরও গৌরব-শালী হক। মনে পড়ে, বিদেশী একটা কাগজে মন্তব্য পড়েছিলামঃ হ্যাঁ, বলতে হবে, জে আর ডি সত্যিই হাসতে জানেন।

শুধু হাসি নয়, জামসেদজী টাটার উত্তরাধিকারী যিনি তিনি আরও কিছু জানেন। মনে রাখতে হবে '৪৩ সনে তিনি ছিলেন গান্ধীজীর মুক্তি-আন্দোলনে অন্যতম অগ্রণী, '৪৪ সনে বোম্বাই পরিকল্পনার অন্যতম রূপকার। ফরাসীরা তাকে 'লিজিয়ন অব অনার' দিয়েছে—আমেরিকা তাঁকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 'ম্যানেজমেণ্ট ম্যান' ('৫৩) হিসেবে সম্মান জানিয়েছে, ভারত তাঁকে 'ডক্টরেট', 'পদ্মবিভূষণ', ইত্যাদিতে সম্মান জানিয়েছেন। তা-ছাড়া ভারতীয় বিমান বাহিনীর তিনি একজন অনারারী—'গ্রুপ ক্যাপ্টেন'। কেননা, টাটা শুধু ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি নন, এক বিচিত্র ব্যক্তিত্বও। তাঁর সমুদয় লাভের পাঁচ ভাগের চার ভাগ ব্যয় হয়—জনকল্যাণে। নিজে তিনি পুরানো গাড়ি চড়েন, আর কোন নেশা নেই। অবসরে তিনি খেলনা ইঞ্জিন গড়েন। ১৯. ১০. ৬০

টেরেসা, মাদার

ঢুকেই মনে হল, কোথায় যেন দেখেছি। হয়ত ট্রাম, হয়ত পথ, হয়ত কোথাও নয়—মা মেরীর কোন সচিত্র জীবনীর পাতায়। সেই মুখের আদল, সেই চোখ, চলার ভঙ্গিতে সেই অচঞ্চল মাতৃমূর্তি। পার্থক্য শুধু এই, নিপুণ শিল্পীদের আঁকা সেই চির-চেনা নিটোল মুখটিতে বিশ্বশিল্পীর হাতে নতুন ক'টি রেখা যুক্ত হয়েছে, ৫৪এ লোয়ার সার্কুলার রোডে আলোর আড়ালে বাসিনী এ মায়ের বয়স হয়েছে।

হেসে বললেন, এত ভাবছ কি? দেখেছ নিশ্চয়, দেখবে বৈকি।—এই ত তোমার দুই ট্রাম আগে কালীঘাট থেকে ফিরছি, আজ তেত্রিশ বছর তোমাদের সঙ্গেই ত পথে ঘুরছি।

—তেত্রিশ বছর?

—হঁ্যা, আবার হাসলেন তিনি, কবে জন্ম তোমার ? তা হলেই ভেবে দেখ, আই এম মোর ইণ্ডিয়ান দ্যান ইউ !

বলার দরকার ছিল না। দরকার ছিলনা মা মেরী আর মহামান্য পোপের ছবি দুটোর পাশে দেওয়ালে রাষ্ট্রপতির নিজের হাতে স্বাক্ষরিত ঐ সম্মানপত্রটি টানিয়ে রাখবার—'আমি আপনাকে পদ্মশ্রী উপাধিতে··· ', কিংবা ম্যানিলা থেকে এইমাত্র আগামী ৩০শে নিজে হাজির হয়ে পুরস্কার গ্রহণের জন্যে ম্যাগসেসে কমিটির যে অনুরোধপত্রটি এসেছে, সেটি পড়বার। কেননা, মাদার টেরেসার কোন পরিচয়পত্রই, অন্তত কলকাতার কাছে নতুন কিছু নয়,—অভাবিত ত নয়ই নয়। আজ এই মুহূর্তে পরিচ্ছন্ন শয্যায়, পেটভরা খাবারের থালা সামনে নিয়ে কালীঘাটের 'নির্মল হৃদয়'এ যে একশ' সাতটি মানুষ জগৎ সম্পর্কে অবশেষে নিঃসংশয়, তারা প্রত্যেকে জানেন বুকে ক্রুশ, হাতে জপের মালা নীল-পাড় সাদা শাড়ি জড়ানো এই অচেনা মা যদি চলতে চলতে হঠাৎ তাঁদের সামনে এসে থমকে না দাঁড়াতেন, তাহলে মানুষের ওপর এই প্রবল আস্থা নিয়ে তাঁরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারতেন না। লোয়ার সার্কুলার রোডের 'নির্মলা শিশু ভবন'-এর প্রতিটি শিশুও যেন জানে, এ মা ছিলেন বলেই ওরা এখনও আছে,—থাকবে।

শুধু 'নির্মল হৃদয়', আর কুড়িয়ে-পাওয়া শিশুর মায়ের কোল 'নির্মলা শিশু ভবন' নয়, মাদার টেরেসা আজ চৌদ্দটি স্কুল চালান কলকাতার আলোবঞ্চিত শিশুদের জন্যে, আটটি কুষ্ঠশুশ্রূষা কেন্দ্র গড়েছেন তিনি এ শহরের পরিত্যক্ত কুষ্ঠরোগীর জন্যে, তাছাড়া একটি যক্ষ্মা ক্লিনিক, ছ'টি দাতব্য চিকিৎসালয়, কমার্শিয়াল স্কুল, কারিগরী বিদ্যালয় এবং কি নয়! এক মা আর একশ' উনসত্তর 'ভগ্নী' মিলে সে এক অভাবিত করুণার জগৎ, সাগর। কলকাতার এক গৃহকোণ থেকে ভারতের দিকে দিকে আজ তার ঢেউ। রাঁচি, দিল্লি, ঝাঁসি, আগ্রা, আম্বালা, আসানসোল, অমরাবতী, ভাগলপুর, বোম্বাই, রায়গড়—গোটা ভারতে আজ এক নব মানবধর্ম, নিঃশব্দ সেবার প্রতীক।

—উঠি ভোরে সাড়ে চারটায় ; সাতটা থেকে শুরু হয় কাজ। যতক্ষণ পারি ঘুরি, রাত ন'টার মধ্যে ঘরে ফিরি।

টেলার, ম্যাক্সওয়েল ডাভেনপোর্ট

এই বয়সে ট্রামে-বাসে, পায়ে, হেঁটে ভোর সাতটা থেকে রাত ন'টা! মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে গেল—একটা গাড়ী হলে ভাল ছিল বোধ হয়!

—নো, নো! মাথা নাড়লেন মাদার। কক্ষনো গাড়ী নয়।—জান, গাড়ীতে চললে ফুটপাথটা সব সময় ঠিক ঠিক নজরে পড়ে না, আমার যে সেখানেই কাজ! দেখছ না, এই কুকুরটা পর্যন্ত সেখান থেকেই পাওয়া। পায়ের কাছে বসে ছিল একটা কালো দিশি কুকুর, মাথায় মায়ের হাতের ছোঁয়া পেয়ে সে আরামে এবার চোখ বুজল।

অদ্ভুত মানুষ। কখনও ইংরেজী বলছেন, কখনও গড়গড় হিন্দি, কখনও স্পষ্ট বাংলা। অথচ, কথা প্রসঙ্গে বলেন, দেশ ছিল সুদূর আলবেনিয়ায়। ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন যুগোস্লাভিয়ায়। জিজ্ঞেস করলাম—এখানে আসার পর ('২৯) দেশে গিয়েছিলেন কখনও?

ধমকে উঠলেন মাদার, হেসে বললেন, কিছু মনে থাকে না তোমার! দু' বছর আগে আমেরিকা গিয়েছিলাম, বলতে পার ইউরোপেও। কিন্তু দেশে যাব কি,—এইত আমার দেশ! শেষের ক'থা দুটি স্পষ্ট নির্ভুল বাংলা।

লজ্জা চাপা দেওয়ার জন্যেই বলতে হল—এত ভাল বাংলা জানেন আপনি?

—হ্যাঁ। আবার হাসলেন মাদার। কারণ, একাজ সুরু হয়েছে আমার মোটে '৪৮ সনে। তার আগে কুড়ি বছর ছিলাম লরেটোতে। সেখানেই শিখেছিলাম। এণ্টালীর সেণ্ট মেরী স্কুলে অনেককাল বাংলা পড়িয়েছি আমি।—কি, কি হল, তুমিই বল 'নির্মল হৃদয়' শব্দটা কি খারাপ বাংলা? 'ইম্যাকুলেট সোল'-এর এই অনুবাদটা আমারই করা। মাদার মেরীর বাংলা নামকরণ করেছি আমি—'নির্মলা'!

উঠতে উঠতে মনে হল ম্যাগসেসে পুরস্কার কমিটি এবার যাঁকে সম্মানিত করলেন, ওঁরা জানেন না, তিনি ভারতীয় খৃস্টান সন্ন্যাসিনী হলেও আমার কাছে কাল মনে হয়েছিল যেন সত্যিই কোন বাঙালী জননী।

৯. ৮. ৬২.

টেলার, জেনারেল ম্যাক্সওয়েল ডাভেনপোর্ট

বন্ধুত্ব তো পরে, বলতে গেলে মৌখিক পরিচয়টুকুও ছিল না। চেনা-জানা বলতে যা সে পাঁচজনের মুখে

শুনে শুনে। কেউ বলেন গ্রীক লাতিন তো মাখন-রুটি, টেলার জাপানী জার্মান, স্প্যানিস, ফরাসী চার চারটি বিদেশী ভাষায় অনর্গল। কেউ কেউ বলেন—লোকটিকে জেনারেল না বলে দার্শনিক বলাই সংগত। কেননা, মধ্যপ্রাচ্যে কোন সামরিক সমস্যার কথা উঠলেই তিনি জানতে চাইবেন —আচ্ছা, জারেকজেস যেন কীভাবে ব্যাপারটার মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন? প্রেসিডেণ্ট নিজেও যে মানুষটির মনের কথা কিছু না জানেন এমন নয়। বিশেষত, তিনি ওঁর বিখ্যাত এবং বহু বিতর্কিত বই 'দি আনসার্টেন ট্রাম্পেট' পড়েছেন। তিনি জানেন—সামরিক ব্যাপারে টেলারও তাঁরই মত এক ধরনের—'নিউ ফ্রন্টিয়ার্সম্যান'। যেমন, টেলার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধের বিশ্বাস করেন। তিনি বার বার বলেছেন (এবং লিখেছেনও) রাশিয়ার ক্রেমলিনের গুলীর জবাবে আমরা যদি পারমাণবিক হাতিয়ার হাতে তুলি তবে সেটা হবে আত্মহত্যার নামান্তর। আধুনিক পরিস্থিতিতে সামগ্রিক পারমাণবিক যুদ্ধ কার্যত সম্ভব নয়, ফলে আমেরিকার এমন প্রস্তুতি দরকার যে প্রয়োজনে 'ফ্লেক্সিবল রেসপন্‌স' বা যখন যেমন প্রতিউত্তর সম্ভব। অর্থাৎ ওঁরা যদি পুরানো সামরিক অস্ত্র নিয়ে কোথাও আমাদের আক্রমণ করেন তবে আমাদেরও তাই করতে হবে। সুতরাং কেবল পারমাণবিক অস্ত্র নয়, —আমেরিকাকে স্থলবাহিনী, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি মামুলী আয়োজনের দিকেও নজর দিতে হবে। কথাগুলো তৎকালেই মনে ধরেছিল। সুতরাং ১৯৬১ সনের এপ্রিলে বে অব পিগ্‌স-এ ভরাডুবির পরে ক্রুদ্ধ, মর্মাহত, ক্ষুব্ধ কেনেডি টেলিফোনটি তুলে নিয়ে অবশেষে ওঁকেই কাছে ডেকেছিলেন। রিটায়ার্ড (১৯৫৯) চীফ অব স্টাফ প্রেসিডেণ্টের দ্বিতীয় বিশ্বস্ত অনুচর রবার্টকে সঙ্গে নিয়ে সি-আই-এ'র ফাইল ঘাটতে বসেছিলেন। কেননা, কিউবায় ব্যর্থতাটা বড় কথা নয়, তার চেয়েও জরুরী তার কারণগুলো।

সেই থেকেই শুরু। '৬১ সনের জুলাইতে কেনেডি ঘোষণা করলেন আইসেনহাওয়ারের আমলে মার্কিন চীফ অব স্টাফ জেনারেল ম্যাক্সওয়েল ডাভেনপোর্ট টেলারকে তিনি তাঁর সামরিক উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত করেছেন। নানা মহলে তখনই নানা রকমের আপত্তি উঠেছিল, কিন্তু কেনেডি তবুও টেলারকে ছাড়তে রাজী হননি। বরং অচিরেই প্রেসিডেণ্ট

টেলার, ম্যাক্সওয়েল ডাভেনপোর্ট

তাঁকে আরও গুরুত্বপূর্ণ আসনে বসালেন। কেনেডির নির্দেশে টেলারের পরিচয় হল—চেয়ারম্যান, জয়েণ্ট চীফস অব স্টাফ। কেননা, প্রেসিডেণ্ট মনে করেন তাঁর এজাতীয় কোন অন্য ধরনের জেনারেলকেই দরকার।

সত্যিই অন্য ধরনের মানুষ। চেহারায় যোদ্ধার কোন লক্ষণ নেই,—শান্ত মুখ, শান্ত দুটি চোখ। কেস্টেভিল-এর জনৈক সাধারণ আইনজীবির ঘরের ছেলে। সমর বাহিনীতে এসেছেন সুদূর ১৯১৭ সনে। টেলার হেসে বলেন—ডাঙায় যে আছি সে দৈবাৎ। মালাক্কা প্রণালীটি যদি ইউরোপে হত তবে এতদিনে আমি নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল হতাম। নেহাৎ ছোটবেলায় ভূগোল একদম মনে থাকত না তাই! প্যারাস্যুট বাহিনীতে সৈনিক ছিলেন অনেক-কাল। কিন্তু বলতেন—আমি লাফাতে ভালবাসি না, যারা লাফায় তাদের সঙ্গে থাকতে ভালবাসি।

সে বাসনাও পূর্ণ হয়েছিল। টেলার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনে বিখ্যাত মার্কিন অধিনায়ক। ইতালীতে গোপন অভিযাত্রা থেকে শুরু করে ১০১ নম্বর বাহিনী নিয়ে নর্মাণ্ডিতে অবতরণ—তাঁর সামরিক জীবন নানা দুঃসাহসিক ঘটনায় পূর্ণ। তবে কী লড়াইয়ের মাঠে, কী অন্যত্র, চিরকালই তিনি একটু স্বতন্ত্র। '৪৫ সনে ওয়েস্ট পয়েণ্টে বিখ্যাত সামরিক অ্যাকাডেমির কর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। সেই সম্মানের পদটিকে চিহ্নিত করে এসেছেন তিনি সৈনিকদের পাঠ্যসূচীতে টি. এস. এলিয়ট অন্তর্ভুক্ত করে। তারপর '৪৯ সনে বার্লিন এবং '৫৩ সনে কোরিয়ায় বিখ্যাত ৮ম বহরের অধিনায়কত্ব। কোরিয়ায় ভারতীয় সেনাপতিদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব পেণ্টাগন-এ আজও এক সংবাদ। টেলারের মুখের কোরিয়ান ভাষা শুনে সিংম্যান রী পর্যন্ত সেদিন হতবাক।

'৫৫ থেকে '৫৯ সন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চীফ অব স্টাফ, এবং উপস্থিত মার্কিন সমর বিভাগের সর্বেসর্বা জেনারেল টেলার আগামী ১৬ই ভারত পরিদর্শনে আসছেন। এ কর্মসূচী কেনেডি বেঁচে থাকা কালের—বাতিল-করা পুরানো প্রোগ্রাম পূরণ। তা হলেও পাকিস্তান পরিদর্শনের আগে তাঁর ভারত আগমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইদানীং এই বিখ্যাত মার্কিন জেনারেল অসামরিক কাজেই তাঁর অবসর জীবন কাটাচ্ছিলেন। কেনেডি

ডেকে এনে তাঁকে আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ আসনে বসিয়েছেন, ফলে কী মার্কিন সমর বিভাগ, কী অন্যত্র—টেলারের সমালোচক অনেক। এবং শোনা যায়,—পাকিস্তান তাদের অন্যতম। কেননা, কোরিয়া এবং কেনেডি দুই সূত্রেই এই মার্কিন সমরবিদ আমাদের বান্ধব। সেটা সত্য হক বা না হক, টেলার যে স্বচ্ছ দৃষ্টি সম্পন্ন অন্য ধরনের জেনারেল সে বিষয়ে বিশ্ব একমত। রবার্ট কেনেডির ভাষায়—হি ক্যান গিভ থিংস এ কোল্ড এণ্ড ফিসি আই! ৯. ১. ৬৪

[১৯৬৪ সনের জুন-জুলাইয়ে ভিয়েৎনামে সংকট ঘনীভূত হওয়ার পর জেনারেল টেলার দঃ ভিয়েৎনামে মার্কিন দূত নিযুক্ত হন। তাঁর আগে এই পদে ছিলেন হেনরী ক্যাবট লজ।]

টিটো, মার্শাল জোসেফ ব্রোজ

চুলের মত চিড়টা দেখতে দেখতে কৃষ্ণ সাগর হয়ে উঠল। ক্রমে পরিণত হল দুরতিক্রম্য হিমসাগরে।

ওঁরা বললেন—তোমরা ঠিক মার্কস নির্দিষ্ট পথে চলছ না।

এঁরা উত্তর দিলেন—আমাদের দেশে আমাদের নাগরিকদের আমাদেরই বিরুদ্ধে গুপ্তচর নিযুক্ত করে রাশিয়াও বোধ হয় খুব সংগত কাজ করছে না।

ওঁরা বললেন—যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্টরা কমিউনিস্ট নয়।

টিটো উত্তর দিলেন—রাশিয়ায় যা বলছে তা আদৌ কমিউনিজম নয়। মহান লেনিন বেঁচে থাকলে আজ—

ওঁরা বললেন—টিটো? টিটো জুডাস।

টিটো বললেন, কে স্ট্যালিন?—হি ইজ দি ব্ল্যাক বিস্ট!

'৪৪ থেকে '৪৮, চতুর্বর্ষব্যাপী সেই কলহ আজ ইতিহাসে পরিণত। সেই সঙ্গে পুনরায় ঐতিহাসিক পুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত মার্শাল টিটোও। পুনরায় বলছি এজন্যে যে, সত্যিই টিটোর উত্থান এমন এক অবিশ্বাস্য ধরণের যেখানে পদক্ষেপ মাত্রই মনে হয় প্রতিষ্ঠা।

কোরাসিয়ার সেই চাষীর কুটিরে পনেরটি ভাইবোন, পিতা মদ্যপ। পায়ের নীচে মাটি ছিল না। সুতরাং শুরু হল অকূল সাগরে ভাসা।

লেখা পড়া বলতে যা তা সব বারো বছর বয়সের মধ্যে (জন্ম—১৮৯২)। তের থেকেই নিমজ্জমান মানুষের নিয়মে সামনে খড়কুটো যা পাওয়া

টিটো, মার্শাল

যায় তা-ই। কিশোর টিটো কখনও জমিতে মজতুরের কাজ করেন, কখনও লোকেদের বাড়ীতে বাসনকোসন মাজেন, কখনও বা তাঁর কাজ তালা-চাবি সারাই!

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই সৈন্য-বাহিনীতে নাম লেখাতে হল। টিটো মিলিটারীতে চলে গেলেন। তিনি রাজকীয় অষ্ট্রিয়ান বাহিনীতে সৈনিক হলেন। সাধারণ পদাতিক।

ভাসমান মানুষ যেন এতদিনে মাটির স্পর্শ পেলেন। তিনি সমস্ত শক্তি একীভূত করে লড়াইয়ে মাতলেন। ওঁরা তাঁকে সার্জেণ্ট মেজর করে রাশিয়ান রণাঙ্গনে পাঠালেন। ১৯১৫ সন। দুর্ধর্ষ স্লাভ লড়িয়ে টিটো সহসা একদিন আহত হয়ে সেখানে বন্দী হলেন। রাশিয়ার সঙ্গে সেই তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার। এবং যদিচ বন্দীভাবে, তবুও সেই প্রথম দর্শনেই ভালবাসার সূচনা।

প্রথম ভালবাসা ফেলাঘিয়া নামে চঞ্চলা মেয়েটির সঙ্গে। বিদেশী বন্দীকে ভালবাসা জানালেন রুশ তরুণী। প্রতিদানে টিটো ভালবাসলেন ওঁকে সহ গোটা রুশ দেশকে। বিশেষ, কমিউনিস্ট নামে খ্যাত দুর্ধর্ষ মানুষ-গুলোকে। টিটো রুষ ভাষা শিখলেন, ফেলাঘিয়াকে বিয়ে করলেন, এবং রেড-গার্ডদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জার-এর সঙ্গে লড়াই করলেন। তিনি এখন শুধু সৈনিক নন, পাকা কমিউনিস্ট।

সুতরাং '২০ সনে দেশে ফেরামাত্র তাঁর জন্য স্থান নির্দিষ্ট হল—রাজা আলেকজাণ্ডারের কারাগার। ছাড়া পাওয়া মাত্র কিছুদিন শ্রমিক সভা ইত্যাদি। তারপর আবার কারাকক্ষ। মেয়াদ—এবার ছ'বছর।

ছ' বছর পরে, '৩৪ সনে আবার যখন ছাড়া পেলেন টিটো তখন তিনি যুগোশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নায়ক। পার্টির বন্ধুরা তাঁকে মস্কো পাঠালেন। উদ্দেশ্য: তান্ত্রিক সাধনা সম্পূর্ণ করে দেশে ফিরিয়ে আনা।

ফেরার পথে নানা নামে, নানা পোষাকে দেশ থেকে দেশান্তরে। টিটো কোথাও স্ট্রাইক করাচ্ছেন, কোথাও গেরিলা সংগ্রহ করছেন। কেননা স্পেনে তখন গৃহযুদ্ধ। এবং সুশিক্ষিত কমিউনিস্ট হিসেবে তিনি জানেন—সেখানে তাঁর কি কর্তব্য।

একই কর্তব্যবোধের অতুলনীয় পরিচয় পাওয়া গেল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। যুগশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল টিটো তখন প্রায় দেড়লক্ষ

গেরিলার দুর্ধর্ষ নায়ক। সুতরাং মিত্রশক্তিকে শুধু যে যুদ্ধকালেই তাঁকে স্বীকার করে নিতে হল, তাই নয়, যুদ্ধ শেষেও তেমনি স্বীকৃতি দিতে হল টিটোর লালরাজ্যকে। চাষীর ছেলে টিটো সেই থেকে সর্বস্বীকৃত দুর্ধর্ষ। আরও দুর্ধর্ষ '৪৮ থেকে। কেননা, কমিনফর্ম থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েও টিটো সেদিন সোজা হয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন!

উনসত্তর বছরের প্রবীণ লড়িয়ে তেমনি অনড় দাঁড়িয়ে আছেন আজও। ইউরোপে তিনি এক তৃতীয় শিবির। যথা, এশিয়ায় ভারতবর্ষ। পেটেণ্ট করা লালও নয়, নীলও নয়; তার সঙ্গে দুনিয়ার পক্ষহীনের পরামর্শ!

যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট যুগশ্লাভ কমিউনিস্ট পার্টি এবং সৈন্য বাহিনীর সর্বময় কর্তা মার্শাল জোসেপ ব্রোজ টিটো কি এখনও কমিউনিস্ট?

পুঁথি মিলিয়ে যাঁরা দেখেন, তাঁরা বলেন—না, বোধ হয় না। কেননা আদর্শগত জীবনে টিটো এক রাজসিক মানুষ। তিনি তিনটে বিয়ে করেছেন, তিনি রাজপ্রাসাদে থাকেন, প্রমোদ তরীতে হাওয়া খান।—শিকার করেন, দাবা খেলেন, মদ খান, এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

আশ্চর্য, যুগোশ্লাভ জনতা তবুও বলে—টিটো জিন্দাবাদ!

৫. ৭. ৬১

ড

ডন, জুয়ান (স্পেন)

শুধু ডন জুয়ান নন, পর্তুগালের বালিচরে রঙ্গীন ছাতা খাটিয়ে যাঁরা নিয়মিত দিবাস্বপ্ন দেখে আসছেন, সেই ঘরহারা রাজন্যকুল একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলেন। তাহলে এও হয়? স্বপ্নও তাহলে সত্যি হয়? তাঁদেরই প্রতিবেশী বনবাসী 'স্পেনরাজ' ডন জুয়ানকে স্মরণ করেছেন 'স্পেন সম্রাট' ফ্রাঙ্কো। আবার নাকি ডনকে রাজা করবেন তিনি।

সম্ভাবনাটা নতুন নয়, নতুন সংবাদটা। রাজধানী থেকে সদলবলে একশ' মাইল এগিয়ে এসে জেনারেল-সিমো ফ্রাঙ্কো দেখা করেছেন ডন-এর সঙ্গে। '৫৪ সনের পর এই তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎকার। আরও উল্লেখ-যোগ্য, তাঁরা আলোচনা শেষে একটি যুক্ত বিবৃতিও প্রচার করেছেন। তার মর্ম: আমরা যুবরাজ কার্লস-এর পড়াশুনা নিয়ে আলোচনা করেছি। আমাদের ইচ্ছে সে তাঁর নিজের

ডিফেনবেকার, জন জর্জ

দেশেই পড়ুক। তবে হ্যাঁ, এর সঙ্গে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকার বা ইত্যাদি বিষয়ের কোন যোগ আছে বলে যদি কেউ ভাবেন, তবে তা ভুল হবে। ইত্যাদি।

সম্প্রতি জানা গেল, মোটেই তা ভুল হয়নি। ফ্রাঙ্কো '৩৭ সন থেকে স্পেনের 'এল ক্যাডিলো'। অর্থাৎ একেশ্বর নায়ক। '৪৭ সনে তিনি স্থির করেছেন, তাঁর জীবৎকালে তিনি তাই থাকবেন। তারপর তাঁর উত্তরাধিকারী কে হবেন, সেটা স্থির করার আইনসম্মত অধিকারও তাঁর। এককালের দুর্ধর্ষ জীবন আজ আটষট্টিতে পৌঁছেচে। সন্ধ্যা না হলেও অপরাহ্ণ ত নিশ্চয়ই। ফ্রাঙ্কো তাই ভবিষ্যৎ ভাবছেন। তেইশ বছরের জুয়ান কার্লসকে যে তিনি সেই বাসনায় ঘরে এনেছিলেন অতঃপর সেটা আর গোপন করে লাভ কি! সুতরাং আবার তাঁর বাবার ডাক পড়ল। এবার ফ্রাঙ্কো স্পষ্ট। তিনি বললেন, তোমার ছেলে কার্লস স্পেনের ভবিষ্যৎ রাজা। ডন জুয়ান বললেন, স্পেনের বোরবনদের বংশে তা কখনও হয় না। পিতার বর্তমানে পুত্র কখনও সিংহাসনে বসে না। ফ্রাঙ্কো বললেন, বসবে। তোমার ছেলে বসবে।

কিন্তু কার্লস একবাক্যে বলছে—না, তা হয় না। বাবার জীবৎকালে আমি কিছুতেই রাজা হব না। কিছুতেই না।

ছেচল্লিশ বছরের প্রবীন ডন জুয়ান উপস্থিত এ নাটকের নীরব দর্শক। ফ্রাঙ্কোর হাতের পুতুল হয়ে রাজা হতে বিন্দুমাত্র বাসনা নেই তাঁর। তাছাড়া তিনি আজ আর তেমন রাজাও হতে চান না। বড়জোর এবার হলে ইংলণ্ডের রাজা। 'পপুলার এণ্ড কনষ্টি-টিউশন্যাল মনার্কি' এখন তাঁর আদর্শ।

ডন জুয়ান বলেন, স্পেনে এখন যা চলছে, সেটা নিকৃষ্ট রাজতন্ত্রও নয়। আমার দেশ এখন যেন পর্তুগালের মত। পর্তুগাল 'রিপাবলিক'। কিন্তু 'রিপাবলিক' কথাটি মুখে আসা মাত্র এখানে অবধারিত কারাবাস। স্পেনে আসলে রাজতন্ত্রই বহাল আছে। কিন্তু 'রাজতন্ত্র' কথাটি তোমার মুখে এসেছে কি তুমি গিয়েছ।

৭. ৫. ৬০

ডিফেনবেকার, জন জর্জ

কানাডায় ডিফেনবেকার মন্ত্রি-সভার পতন ঘটেছে।

খবরটা সম্পূর্ণ অভাবিত না হলেও বাইরের দুনিয়ার কাছে চাঞ্চল্যকর।

বিশেষ আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড এবং ভারত—পৃথিবীর তিন খণ্ডে ছড়ানো তিনটি দেশের কাছে। কেননা, আজকের ইংল্যাণ্ডের কাছে হ্য গল যা, ইদানীংকার ডিফেনবেকার ছিলেন আমেরিকার কাছে অনেকটা তাই। ইংল্যাণ্ডের কাছে পরিচয় ছিল তাঁর 'হার ম্যাজিস্টিজ-·অনুগত অনুচর,'—ভারতের কাছে—কমনওয়েলথ-এর মূর্তিমান আদর্শ, অন্যতম নির্ভরযোগ্য বান্ধব। মনে রাখতে হবে, চীনা হামলায় ডিফেনবেকার শুধু যে হোয়াইট-হাউস হোয়াইট হল-এর প্রায় সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে এসেছেন তাই নয়, গেল কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে কমন মার্কেট প্রসঙ্গে তিনিই ছিলেন ভারতের দোসর। জাতীয়তা, ইংল্যাণ্ডপ্রীতি এবং কমনওয়েলথ আসক্তি—এই তিন নিয়েই ছিল ডিফেনবেকারের রাজনীতি। প্রশ্ন: তবুও মানুষটিকে নামতে হল কেন? সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে ডিফেনবেকারের উত্থান কাহিনীটাও শোনবার মত।

পনের বছর পরে পাঁচ পাচটি নির্বাচনে পরাজয় মেনে ১৯৪০ সনে অবশেষে সত্যিই যখন ওয়াক'র জনৈক আইনজীবী ডিফেনবেকার অটোয়ার হাউস অব কমনস্-এ একখানা আসন টেনে বসে পড়লেন, কানাডায় সেদিন অনেকেই নাকি তাঁর নিষ্ঠা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ডিফেনবেকার শুধু মৃদু হেসেছিলেন। কেননা, তিনি জানতেন তাঁর স্বপ্ন সফল হওয়ার পথে এটা প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

সাচকাচিওয়েন-এর এক খামার বাড়ীতে প্রদীপের আলোয় কানাডার এক ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রীর জীবনী পড়তে পড়তে জনৈক জার্মান স্কুলশিক্ষকের তনয় জন জর্জ ডিফেনবেকার নাকি চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—'আমিও কানাডার প্রধানমন্ত্রী হব।' ছেলের কথা শুনে মা হেসেছিলেন। কিন্তু আদর্শবাদী লিবারেল বাবা গম্ভীর হয়ে উঠেছিলেন। মাঠের বদলে ছেলেকে তিনি কলেজে পাঠিয়েছিলেন। কলেজে পাঠ্যবই ছাড়াও তরুণ ডিফেনবেকার-এর আকর্ষণ ছিল প্রধানমন্ত্রীদের জীবনী, পার্লামেণ্টারী তর্কাতর্কির বিবরণী এবং রাজনীতির রীতিনীতি। তিনি ফাঁকা ঘরে বক্তৃতা দেন, রাজনৈতিক ভাষা রপ্তের চেষ্টায় পাতার পর পাতা মিছিমিছি লেখেন। লক্ষণ দেখে কলেজ ম্যাগাজিন সগর্বে সম্পাদকীয় লিখে জানাল: আমরা

বিশ্বাস করি, অটোয়ার পার্লামেণ্টে জর্জ একদিন বিরোধীদলের নেতৃত্ব করবে।

বিরোধীদল দিয়েই আরম্ভ করেছিলেন। পরিবারের লিবারেল ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী (কুড়িটি বিখ্যাত খুনের মামলায় আসামী পক্ষে ছিলেন তিনি। মৃত্যুদণ্ড হয়েছে মাত্র দুজনের!) রাজনৈতিক জীবন সুরু করেছিলেন কনসারভেটিভ হিসেবে। বরাবর তাই আছেন। '৪০ সনে পার্লামেণ্টে আসার ষোল বছর পরে, জর্জ ড্রু'র মৃত্যুর পর থেকে প্রোগ্রেসিভ কনসারভেটিভদের নায়কত্ব করছেন। প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন '৫৭ সনের জুন মাসে। ১৯৩৫ সনের পর কানাডায় সেই প্রথম কনসারভেটিভ শাসন। মনে হয়েছিল, এ শাসন আরও ক' দফা চলবে। বিশেষ, গেল বছরের নির্বাচনের পর দল ক্ষীণ হয়ে গেলেও প্রধানমন্ত্রী ডিফেনবেকার এই সেদিন অবধিও ছিলেন জনপ্রিয়। গত মাসেও গ্যালপ-পোল নিয়ে দেখা গেছে তাঁর সমূহ কোন আশঙ্কা নেই!

মানুষটির দিকে তাকালেও তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। পাঁচ ফুট সাড়ে এগার ইঞ্চি উঁচু,—গভীর দুটি কালো চোখ। সে চোখ স্বদেশের নামে মুহূর্তে যেমন দাউ করে জ্বলে উঠতে পারে, তেমনি মুহূর্তে আবেগে ঝাপসা হয়ে ওঠে। নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক। নিষ্ঠাবান সংসারী। রাজনৈতিক জীবনে একমাত্র সাধনা ছিল তাঁর কানাডাকে একটি জাতিতে পরিণত করা। সংসারে একমাত্র আপনজন তাঁর স্ত্রী। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর আড়াই বছর পরে ১৯৫৩ সনে নতুন করে আবার সংসারী হয়েছেন ডিফেনবেকার। সাতষট্টি বছরের প্রবীণ রাষ্ট্রনায়কের জীবনে গৃহিণীই একমাত্র সঙ্গী। চার্চিল অবাক হয়ে গিয়েছিলেন—'থ্যাঙ্ক য়ু' বলে নিষ্ঠাবান কনসারভেটিভ ডিফেনবেকার যখন নেপলিয়ান ব্রাণ্ডির গ্লাসটা ধীরে ধীরে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যাপ্টিস্ট ডিফেনবেকার সিগারেট পর্যন্ত স্পর্শ করেন না। দেশ ছাড়া তাঁর আর কোন নেশা ছিল না।

তবুও নেমে আসতে হল। কারণ 'দেশরক্ষায় ব্যর্থতা।'—কিসের বিরুদ্ধে?—কার আক্রমণ থেকে? আমেরিকার অভিযোগ ছিল—ডিফেনবেকার কানাডার রকেটাদি মার্কিন সহযোগিতায় আধুনিক করছেন না—তিনি উত্তর আমেরিকার

নিরাপত্তাকে দুর্বল করছেন। তদুপরি কিউবার সংকট মুহূর্তে তিনি কানাডার উপর দিয়ে মার্কিন বোমারু চলতে দেননি, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিরোধীদলও প্রকারান্তরে একই অভিযোগ এনেছেন আজ—কিন্তু ডিফেনবেকার? বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁরও বক্তব্য ছিল। সে বক্তব্যের সার কথা—কানাডা!—কানাডা! কানাডা আর আমেরিকার কোন ব্যবধান থাকবে না ডিফেনবেকার তা ভাবতেও পারতেন না। তাঁর অভিযোগ ছিল কানাডার অর্থনীতিতে মার্কিন প্রভাব বাড়ছে, কানাডায় মার্কিন আগন্তুক বাড়ছে, কানাডার কাগজে কাগজে মার্কিনী বেসবল খেলার খবর বাড়ছে (অথচ মার্কিন কাগজে ক্রিকেটের খবর নয়), 'কানাডার ছেলেমেয়েরা স্বদেশের টেলিভিসন বন্ধ করে মার্কিনী ছবি দেখছে, কানাডার লেখক পাবলিশার-এর সন্ধানে ন্যুইয়র্ক ছুটছে! ডিফেন-বেকার এই দৃশ্যের অবসান চান। তিনি বলতেন—'আই এম নো অ্যান্টি আমেরিকান!···আই এম অনলি—স্ট্রংলী প্রো ক্যানাডিয়ান।

কিন্তু সম্ভবত আবার বোধ হয় প্রমাণিত হল, দেশপ্রেমও মাত্রাহীন আদর্শ নয়। ৭. ২. ৬৩

ডেনিং লর্ড আলফ্রেড টমসন

তারিখ—২৫ সেপ্টেম্বর, সন—১৯৬৩। হার ম্যাজেস্টিস স্টেশনারী অফিস সেদিন নিয়ম ভঙ্গ করে মাঝ-রাত্তিরে ঝাঁপ তুলেছিল। লণ্ডনের আর পাঁচটা সাধারণ দোকানের মত মাথায় নিওনের হাতছানি ঝুলিয়ে ছিল—'রিড ইন ফুল!···' নারী-পুরুষ, তরুণ-বৃদ্ধ নির্বিশেষে প্রজাবর্গ অপেক্ষায়ই ছিলেন। দুয়ার খুলতে না খুলতে দু'হাজার মানুষ অ-ইংরেজের মত এক সঙ্গে কাউণ্টারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন; তাঁদের মধ্যে অক্সফোর্ডের ছেলেরা, বৃদ্ধা ল্যাণ্ডলেডি, তরুণী ভাড়াটিয়া এবং প্রবীণ রাজনীতিক—সবাই ছিলেন। হার ম্যাজেস্টির দোকানীরা ক্যাশমেমো গুনে দেখেছিলেন—প্রথম চার ঘণ্টার বিক্রির পরিমাণ পাঁচ হাজার। পরদিন শূন্য আলমারীগুলো ঘোষণা করেছিল চব্বিশ ঘণ্টায় যা উবে গেল সংখ্যায় তা এক লক্ষ। এবং কোন সরকারী প্রকাশের পক্ষে এহেন বিক্রি এই প্রথম। 'কমাণ্ড পেপার নাম্বার—২১৫২' (বইটির সরকারী নাম) সেদিক থেকে দ্বিতীয় 'লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার!'

ডেনিং, লর্ড আলফ্রেড টমসন

ক্রেতাদের প্রত্যাশা ছিল তার চেয়েও বেশী। ওঁরা ভেবেছিলেন— শুধু লেডি চ্যাটার্লি নন, তার পাতায় পাতায় থাকবে—অসংখ্য 'রোমান রমণী' আরব্য উপন্যাস তুল্য কাহিনী; নিদেন পক্ষে একটি দ্বিতীয় 'কিনসে রিপোর্ট' ত বটেই। সাতাশটি অধ্যায়ের প্রতিটির শিরোনামায় তার ইঙ্গিতও ছিল। ভিক্টোরিয়ান উপন্যাসের মত সেখানে আকর্ষণীয় পূর্বাভাষ; 'দি ডার্লিং লেটার'…'দি স্ল্যাশিং',… 'দে লিভ ফর স্পেন',…'দি স্প্যানিয়ার্ডস ফটোগ্রাফ'…ইত্যাদি ইত্যাদি। ভাষা এবং পরিবেশন ভঙ্গীতেও অভিনবত্ব ছিল, সাহিত্য ছিল, কিন্তু একশ' চৌদ্দ পৃষ্ঠার বইটি শেষ করে অধিকাংশ ইংরেজ নরনারী জেনেছিলেন— পুস্তকটি উত্তম এবং পয়সা কোনটিরই যোগ্য বদলী নয়। ৭ শিলিং ৬ পেনির বদলে (চৌরঙ্গীপল্লীর হিসেবে ৫ টাঃ ১০ আনা) তাঁরা যে পুঁথিটি রাত জেগে সংগ্রহ করেছেন সেটি আগাগোড়া 'নীল'-বই-ই; তার ষাট হাজার শব্দে কোথাও হলুদের ছোঁয়া নেই। ওয়ার্ড, ক্রিস্টিন, মাণ্ডি, প্রফুমো, অ্যাস্টার সাহেবের বাগান বাড়ী, মাঝরাত্তিরের আসরে মুখোসধারী সবাই আছে—কিন্তু কেউ নতুন করে কোন বিস্ময়কর অ্যাঙ্গলো স্যাক্সন প্রজাতি নয়। ওয়ার্ড সুবিধেজনক লোক ছিল না। অন্য বদ নেশা ছাড়াও তার কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতি ছিল। ক্রুশ্চফের ছবি আঁকার জন্যে তার আগ্রহের অন্ত ছিল না। ক্রিস্টিন ষোল বছর বয়স থেকেই 'উইকেড', প্রফুমো স্খলিত পুরুষ ইত্যাদি ইত্যাদি। বিশেষ করে এ বইয়ে এমন কিছু নেই যাতে ম্যাকমিলানকে এক্ষুনি, এই মুহূর্তে, ভোটদ্বন্দ্বে আহ্বান করা যায়, কিংবা গোয়েন্দা দপ্তরের বড়বাবুদের চাকরী খাওয়া যায়, অথবা আরও দু'চারজন মন্ত্রীকে নির্বাসনে পাঠান যায়। এ পুস্তিকা অনুযায়ী মোটামুটি সবাই বেকসুর খালাস, শেষ করার পরে পাঠক সব কাহিনী ভুলে যায়; শুধু তাঁর চোখে ভাসে মলাটের মাথায় ছাপা সু-অলংকৃত লাতিন বাক্যটি যার মানে—ইভিল টু হিম হু ইভিল থিঙ্কস্! লেবার পার্টি কিংকর্তব্যবিমূঢ়, খবরের কাগজ হঠাৎ আবার সিরিয়াস এবং নম্র, ইংল্যাণ্ড এ-জাতীয় বইয়ের বৈধতা ইত্যাদি আইনের খুঁটিনাটি ভাবনা নিয়ে মগ্ন; তার একমাত্র আলোচ্য এখন এ পুস্তকের গ্রন্থকার।

নীল বই যেমন, তেমনি নীল রক্তধারী লেখক। নাম—লর্ড আলফ্রেড টমসন ডেনিং। বয়স—চৌষট্টি। পরিচয়—মাস্টার অব দি রোলস; পদাধিকারে লর্ড চীফ জাস্টিস-এর পরেই বিচারপতিদের মধ্যে দ্বিতীয়।

ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত বিচারপতিদের একজন হুইটচার্চের লর্ড ডেনিং ছাত্র-জীবন থেকে স্থুরু করে এই পরিণত বার্ধক্য অবধি নানা সম্মান লাভ করেছেন। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং নানা বিদ্বৎসভার সম্মানে ভূষিত মাননীয় বিচারপতির দীর্ঘ কর্মজীবনে অভিজ্ঞতাও অনেক। কিন্তু 'লর্ড ডেনিংস রিপোর্ট' নামে ছোট্ট এই বইটি লিখতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছেন তা বোধ হয় তুলনা-রহিত। সাত সপ্তাহে ১৮০ জন মানুষ তাঁর জেরার উত্তর দিয়েছেন। মন্ত্রী, পার্লামেণ্ট সদস্য, সাংবাদিক থেকে স্থুরু করে তাঁদের মধ্যে গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা, নাইট ক্লাব মালিক, নিশাচর নিশাচরীরা সব স্তরের মানুষ ছিলেন। সুদূর ১৯৪০ সনে কোন ভি.আই.-পি. কোন রহস্য-ময়ীর মায়াজালে আটক পড়েছিলেন—ডেনিং তাঁকে খুঁজে বের করেছেন। রাত্রির বিচিত্র আসরে মুখোসপরা লোকটি কে ছিল তাঁকেও তাঁর জানতে হবে। সব জিজ্ঞাসা শেষ হলে দেখা গিয়েছিল সাকুল্যে তহবিলে শব্দ জড় হয়েছে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার! প্রবীণ আইনজ্ঞ তাকেই ছেঁকে, ছেঁটে নামিয়ে এনেছেন ষাট হাজারে। টোরিদের প্রাণবায়ু স্বরূপ ষাট হাজার শব্দের একটি জীবনদায়ী বাক্যে—'আই ওয়াজ স্যাটিসফাইড দ্যাট, মাচ অব হোয়াট আই ওয়াজ টোল্ড ওয়াজ আনট্রু!' অর্থাৎ হে বিশ্বজন, তোমরা যা শুনেছ সব সাচ্চা নয়!

* * *

ডেনিং কি আপন রক্তবর্ণে রিপোর্টটা রঞ্জিত করেছেন? অ্যাস্টা-ব্লিসমেণ্ট-এর অন্যতম কড়িকাঠ কি নিজের মাথায় পতনোন্মুখ ছাদের দায়িত্ব নিয়েছেন? সে তর্কে আমরা অবান্তর। একান্তভাবেই সেটা ওদের ঘরোয়া বিষয়। এতদ্দেশীয় পাঠকদের শুধু দুটো খবর জেনে রাখা আবশ্যক। প্রথম খবর গুরুগম্ভীর বিচারপতি হয়েও ডেনিং এমন সু-সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন বলে দিকে দিকে যে বিস্ময় সেটা খুব যুক্তিপূর্ণ নয়। ইংরেজদের অন্তত ভুলে যাওয়ার কথা নয় লর্ড ডেনিং আর একটি বেস্ট-সেলার 'লিডিং কেসেস'-এর (১৯২৯)

যুগ্ম সম্পাদক। দ্বিতীয় তথ্য স্বজাতির ঘরে মাননীয় বিচারপতির এই প্রথম উঁকি নয়,'ন্যাশনাল ম্যারেজ গাইডেন্স'-এর প্রেসিডেণ্ট এবং 'ম্যাট্রিমনিয়েল কজেস' সম্পর্কিত কমিটির চেয়ারম্যান লর্ড ডেনিং নিজেও দু'বার বিয়ে করেছেন। এবং দ্বিতীয়বার (১৯৪২) বিপত্নীক বিচারপতির ঘরে যিনি এসেছেন তিনি জনৈকা স্বামীহীনা।

১০. ১০. ৬৩

ত

তাসেন্দেল, যুবঝাগিন (মঙ্গোলিয়া)

চীন আর রুশ দ্বন্দ্বে এবার আরও একজন সাম্যবাদী প্রকাশ্যে মস্কোর প্রতি আনুগত্য জানালেন। তিনি মঙ্গোলিয়ার কমিউনিস্ট নায়ক যুবঝাগিন তাসেন্দেল। পিকিং-এ এক নাটকে যোগ দিতে এসে যুগপৎ তিনি আর এক নাটকের সূচনা করেছেন। চীনের সঙ্গে মঙ্গোলিয়ার নাটকীয় সীমান্ত-চুক্তিতে সই দেওয়ার পূর্ব-মুহূর্তে চু-এর মুখের ওপর তিনি ঘোষণা করেছেন: আমরা রাশিয়ার শান্তি-পূর্ণ সহাবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী। ঘোষণাটি আদৌ জটিল না হলেও তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা মঙ্গোলিয়া শুধু এশিয়ার প্রবীণতম কমিউনিস্ট রাষ্ট্র নয়,—তার তিন দিক ঘিরে আছে মাও-এর চীন সাম্রাজ্য।

তিন দিকে চীন, আর একদিকে রাশিয়া। তবুও যে তাসেন্দেলকে মাও পকেটস্থ করতে পারলেন না তার কারণ তাসেন্দেল নিজে যতখানি, তার চেয়ে অনেক বেশী—মঙ্গোলিয়ার ইতিহাস। ভারত আর চীনের মাঝামাঝি তিব্বতের মত চীন এবং রাশিয়ার মাঝামাঝি এই সাড়ে সতের লক্ষ বর্গমাইলের দেশটি ১৯১৫ সন অবধি ছিল চীন সাম্রাজ্যের অংশ। কিন্তু চেঙ্গিসখাঁর জন্মভূমি, একদা গোটা চীনের অধীশ্বর মঙ্গোলরা তা মানতে রাজী হল না। তারা বিদ্রোহী হল। এবং ১৯২১ সনে সত্যি সত্যিই চীনাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে তারা স্বাধীন মঙ্গোলিয়াব জন্ম দিল। এই চীন-বিরোধী সংগ্রামে সেদিন মঙ্গোলিয়ার একমাত্র সহায় ছিল—মস্কোর লালফৌজ। সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের পেছনেও ছিল তারা অন্যতম বল। তাদের সাহায্যেই

মঙ্গোলিয়া অন্তর্বিদ্রোহ দমন করেছে, '৩০ সনে একাধিক জাপ আক্রমণ প্রতিহত করেছে। ফলে, মঙ্গোলিয়া জন্ম থেকেই অনুগত রুশ সহচর। এখনও তার নিজের সৈন্যবল মাত্র চল্লিশ হাজার।

এই সাহচর্য দিনে দিনে ক্রমেই আরও নির্ভরতার চেহারা নিয়েছে—চীনাদের মনোভাবের জন্যে। তদানীন্তন চীন মঙ্গোলিয়ার স্বাধীনতাকে মেনে নেয়নি। '২৪ সনে রাশিয়ার সঙ্গে এক চুক্তিবলে তারা মঙ্গোলিয়ার ওপর কিছু কিছু কর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছিল বটে, কিন্তু চীন তাতে সন্তুষ্ট ছিল না। কেননা, মঙ্গোলিয়া কার্যত তাদের কোন অধিকারই স্বীকার করত না। শেষ পর্যন্ত সেই অধিকারটুকুও চলে গেল। '৪৫ সনে ইয়াল্টায় রুশ চীন চুক্তি হল। স্থির হল—গণভোটে মঙ্গোলিয়ার ভবিষ্যৎ স্থির হবে। ভোট নিয়ে জানা হবে তারা চীনের সঙ্গে থাকবে, অথবা যেমন আছে তেমনি,—স্বতন্ত্র। মঙ্গোলিয়া একবাক্যে জানাল—স্বতন্ত্র।

স্বভাবতই মাও এ সিদ্ধান্তে তুষ্ট নন। কেননা সাড়ে সতের লক্ষ বর্গ মাইল জমির প্রায় সোয়া ছ'লক্ষ বর্গমাইলই মরুভূমি হলেও মঙ্গোলিয়া একটি অর্থপূর্ণ দেশ। সত্য বটে, সে দেশে বাড়ীর চেয়ে তাঁবু বেশী, মানুষের চেয়ে (লোকসংখ্যা মাত্র দশ লক্ষ)—ঘোড়া এবং গরু (গবাদি পশুর সংখ্যা—২১ মিলিয়ন)। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সোবিয়েত সহযোগিতার ফলে মঙ্গোলিয়া আজ এক লোভনীয় দেশ। সেখানে তেল আছে, তৈলশোধনাগার আছে, কাপড়ের কল আছে, কাগজের কল আছে। তা ছাড়া সোবিয়েত অনুসন্ধানকারীরা জানিয়েছেন—তার মাটির তলায় কয়লা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, টিন, আরও অনেক ধন আছে।

সুতরাং '৫৩ সন থেকেই পিকিং-এর একমাত্র চিন্তা মঙ্গোলিয়ার প্রভুত্ব। তাসেন্দেল সেদিন থেকেই তাঁদের লক্ষ্য। দু'বছর আগে '৬০ সনের মে মাসে চু এন্-লাই মঙ্গোলিয়ায় গিয়েছিলেন ওঁকে সৌহার্দ্য জানাতে। ফেরার সময় ৫০ মিলিয়ন ডলার সাহায্যও গুঁজে দিয়ে এসেছিলেন মঙ্গোল প্রধানমন্ত্রীর হাতে। দু'মাস পরে রাশিয়া সবিস্ময়ে দেখেছিল তাসেন্দেল বুখারেস্ট সম্মেলন সম্পর্কে যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছেন তা চীন বা রাশিয়া কারও পক্ষে নয়—নিরপেক্ষ। রাশিয়া তৎক্ষণাৎ তলব

করেছিল ওঁকে। তাসেন্দেল সেখান থেকে ফিরেছিলেন—১৫৪ মিলিয়ন ডলারের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। ছ'মাস পরে এল আরও ১৩৫ মিলিয়নের প্রতিশ্রুতি। তাসেন্দেল সেই থেকে পুরোপুরি মস্কোপন্থী। কেননা, এই দুই দফায় মঙ্গোলিয়া রাশিয়া থেকে যা পেয়েছে তা পূর্ববর্তী তের বছরে সমুদয় রুশ সাহায্যের চেয়েও বেশী। হিসেব করে দেখা গেছে এই রুশ সাহায্যের ফলে মাথাপিছু বাইরের সাহায্যের পরিমাণ আজ মঙ্গোলিয়াতেই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী। তারপরও চীনারা অবশ্য চেষ্টা করেছিল। তারা টাকার বদলে মঙ্গোলিয়ায় ২২ হাজার চীনা শ্রমিক উপহার পাঠিয়েছিল। কিন্তু তাসেন্দেল তবুও আর চীনের সঙ্গে অধিকতর ভ্রাতৃত্বে রাজী হননি। শোনা যায় অধিকাংশ চীনা শ্রমিকই দেশে ফিরে গেছে। যারা আছে তারাও কাঁটা তারে ঘেরা নিজেদের ব্যারাকে থাকে। কেননা, মঙ্গোলরা নাকি বলে—'লেনিন আমাদের আত্মীয়। মায়ের দিক থেকে তিনিও মঙ্গোল!'

তাসেন্দেলও তাই। রক্তে রুশ না হলেও অনেক দিক থেকেই তিনি রুশী হাওয়ার মানুষ। তিনি রাশিয়ায় লেখাপড়া করেছেন, রুশ মেয়েকে বিয়ে করেছেন, তা ছাড়া ইদানীং তিনি স্বদেশে ক্রুশ্চফ হওয়ার চেষ্টায় আছেন। ক্রুশ্চফের স্তালিন বিরোধী অভিযানের মতই এ বছর তিনি স্বদেশে চৈবালসান বিরোধী অভিযান শুরু করেছেন। অথচ চৈবালসান ছিলেন মঙ্গোলিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত নায়ক এবং তাঁর নিজের রাজনৈতিক আচার্য। '৪০ সনে চৈবালসান প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন বলেই পার্টির প্রধানের আসনে বসতে পেরেছিলেন তাসেন্দেল। '৫২ সনে তাঁর মৃত্যুর পরে তদীয় শিষ্য হিসেবেই সকলে তাঁকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর আসনে। তাসেন্দেল সেই থেকে দু'টি সিংহাসনই নিজের অধিকারে রেখেছেন। যাঁরাই তাঁর বিরুদ্ধাচার করেছেন তাঁদেরই তিনি একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিযোগে সরিয়েছেন: ওঁরা চৈবালসান-এর আদর্শ মানেন না!

তাসেন্দেল সেই চৈবালসানকেই এখন কবর থেকে তুলে এনে বিচার করছেন। তিনি 'ডগমাটিজম' সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখছেন, সোবিয়েত নীতির জয়গান করে বিবৃতি দিচ্ছেন, মাওকে চমকে দিয়ে আলবেনিয়াকে 'নিও-

রিভিশানিস্ট' আখ্যা দিচ্ছেন,—সোবিয়েত পন্থার বিরুদ্ধাচারীদের বিশ্বাসঘাতক বলছেন। এমন কি, তাঁর একমাত্র সাহিত্যকীর্তি 'দি লাইফ এণ্ড ডীডস অব মার্শাল চৈবালসান' বইটি পর্যন্ত তিনি বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন।

সুতরাং পিকিং-এ তাঁর সর্বশেষ ঘোষণাটি বিস্ময়কর কিছু নয়,—বিস্ময়কর বরং তারপরও সীমানা চুক্তিটিকে চীনারা কিভাবে 'বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ায়' ঘটছে বলে চালাচ্ছেন তাই।

২৭. ১২. ৬২

তায়াবজী, বদরুদ্দিন ফৈজ হাসান

ভালোয় ভালোয়ই চলছিল। বার্ষিক 'তামাসা' দেখতে লাটসাহেবরাও আসছিলেন। কিন্তু তৃতীয় অধিবেশন শেষে বিপত্তি বাধালেন স্যার অ্যাকল্যাণ্ড কলভিন,—তৎকালীন ইউ পি'র গভর্নর। তিনি বললেন—কংগ্রেস বিপজ্জনক এবং আমার মতে, হিন্দু ছাড়া অন্য কারও প্রতিনিধিত্ব করার কোন অধিকার নেই তার।

উত্তর দিলেন হিউম—আদি প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম নায়ক।

কংগ্রেস যে হিন্দুর প্রতিষ্ঠান নয়, তার প্রমাণস্বরূপ সেদিন সগর্বে তিনটি নাম উচ্চারণ করেছিলেন তিনি। তার একটি: মিঃ জাস্টিস বদরুদ্দিন তায়াবজী, কংগ্রেসের তৃতীয় তথা ১৮৮৭ সনে মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি। হিউম বলেছিলেন—তায়াবজী আছেন, তাঁকে হিন্দু বলা—'মনট্রাস!'

তাঁরই পৌত্র।

ঠাকুর্দার মত বাবা ফৈজ তায়াবজীও ছিলেন আইন জগতের মানুষ—বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি। কিন্তু পুত্র বদরুদ্দিন ফৈজ হাসান বদরুদ্দিন অক্সফোর্ড সাঙ্গ করে ঘরে ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন সে যুগের অন্যতম কামনার ধন—আই. সি. এস পদবী। সুতরাং পারিবারিক ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে পরিচয় তাঁর একটু অন্য রকমের। কখনও তিনি দিল্লিতে আণ্ডার সেক্রেটারী, কখনও পাঞ্জাবে ডেপুটি কমিশনার, কখনও রাষ্ট্রদূত।

শেষ পর্যন্ত পাকাপাকিভাবে পররাষ্ট্র দপ্তরে স্পেশাল সেক্রেটারীর পদে সম্মানিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি যেসব দেশে রাষ্ট্রদূতের কাজ করেছেন, তার মধ্যে আছে—বেল-

জিয়াম, ইন্দোনেশিয়া, ইরান এবং পশ্চিম জার্মানী। সব দেখাশুনার দেশে, সব পরীক্ষার অন্তে পররাষ্ট্র দপ্তরের গর্ব পঞ্চান্ন বছরের প্রবীণ তায়াবজীকে এবার পাঠান হচ্ছে আলিগড়ে। আগামী ৭ই থেকে সেখানে তিনি উপাচার্যের আসনে বসছেন।

কলভিনদের সাধনার ধন আলিগড়ে এখনও থেকে থেকে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে উনবিংশ শতকী স্বপ্ন; বদরুদ্দিন তায়াবজীর পৌত্র কি সফল হবেন সেখানে ?

সকলের প্রত্যাশা—হঁ্যা। কারণ ঠাকুর্দার মতই এই বদরুদ্দিনও নিজের কালের মানুষ। এই বয়সেও তিনি শিকার করেন, মাছ ধরেন, ঘোড়ায় চড়েন, তেমন গানের আসর পেলে রাত জাগেন। তার চেয়েও বড় কথা —চারপাশে যতই ভেজাল থাক, কোন্‌টা খোসা আর কোন্‌টা শাঁস, তিনি তা চেনেন। তাঁর সদ্যপ্রকাশিত বইটির নাম কি জানেন ?—'চাফ এণ্ড গ্রেন !' ২১. ৯. ৬২

তুর, প্রেসিডেন্ট সেকু

পঁচিশ লক্ষ মানুষের দেশে গ্রাজুয়েট মোটে দু'শ। সাক্ষরের হার—শতকরা পাঁচ, মাথাপিছু বার্ষিক আয় মেরে কেটে দু'শ টাকার কাছাকাছি।

মাঝামাঝি আরও দুটো পথ ছিল। দ্যগল বললেন—আমি আশা রাখি গিনি তারই একটা বেছে নেবে।

পাশেই বসেছিলেন তুর। তিনি জবাব দিলেন—আমি আশা করি গিনি ফরাসী প্রেসিডেন্টকে নিরাশ করবে। কোনাক্রিতে সে রাত্তিরে তুর-এর সঙ্গে দ্য-গল-এর ভোজ খাওয়ার কথা। রাগে তিনি ভোজ-সভা বাতিল করে দিলেন।

ক' সপ্তাহ পরেই ভোটাভুটির ফল জানা গেল। তুর-এর গিনি সত্যিই কথা রেখেছে। দ্যগলকে সে নিরাশ করেছে। আফ্রিকার একমাত্র ফরাসী উপনিবেশ জানিয়েছে সে দলে নেই। দ্য গল-শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে তার ভোট—পাঁচ কম সেন্ট পারমেণ্ট! রেগে নব-নেপোলিয়ান বললেন—দু' মাসের মধ্যে আমরা চলে আসছি! তুর উত্তর দিলেন—আট দিনের মধ্যে নয় কেন ?

গেল বছরের গোড়ার দিককার কথা। কোনাক্রি-র রাজভবনে সেদিন সে এক দৃশ্য। ফরাসীরা চলে যাচ্ছে। চেয়ার টেবিল, খাতা

ঙ্গিল—মায় দেওয়ালের ইলেকট্রিক ব—কিছুই বাদ দিচ্ছে না তারা। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট তুর আর দাম তুর যখন তাঁদের নতুন ভবনে সেছেন তখন—টেলিফোনটা পর্যন্ত ই সেখানে।

রাজভবনে টেলিফোন নেই, দেশে ডিও লোকাভাবে স্তব্ধ, মন্ত্রীরা রানীর কাজ করছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সভায় আসতে পারছেন না। তে তাঁর দুই দুইটা জরুরী পারেশন!

লোকে বলল—দেশটা বেঘোরে রা গেল। প্রতিবেশী বন্ধুরা মনে নে বললেন—আত্মহত্যা করল। স্তু আশ্চর্য এই—তুর হেসে বললেন -দেশটা বাঁচবার পথ ধরল!—উই ভ আওয়ার উইল, আওয়ার র্মস এণ্ড লেগস, এণ্ড উই নো হাউ ওয়ার্ক!

অদ্ভুত বক্তা। সেবার তিনি রাসী চেম্বার-এ ডেপুটি নির্বাচিত য়েছেন। প্যারিস-এ প্রথম বক্তৃতা। নি উঠে দাঁড়াতেই সভাকক্ষ ফাঁকা য় গেল। দু'চারজন সদস্য শুধু বরের কাগজে মাথা গুঁজে পড়ে ইলেন। বক্তৃতা সুরু হল। ওঁরা তের কাগজ বন্ধ করে কান পাতলেন। ক্রমে দু'চারজন আবার ধীরে ধীরে ফিরে এলেন। তুর যখন শেষ করেছেন সভা তখন লোকে ঠাসাঠাসি।

আর একবার গিনিতেই বক্তৃতায় কাকে আক্রমণ করলেন তিনি। সাতটা দিনও কাটল না। বেচারা মারা গেল। কথায় যাদু আছে। ওঁর জিভে মানুষ মারার ক্ষমতা!

শুধু কথায় নয়,—কাজেও। সেকু তুর (অনেকের মতে) আফ্রিকায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ। যেমনি বিচক্ষণ, তেমনি বেপরোয়া।

তুর বলেন—তাঁর চরিত্রে ঐ দ্বিতীয় বস্তুটির কারণ তাঁর ঠাকুর্দা। যেকালে কেউ 'স্বাধীনতা' শব্দটা পর্যন্ত শোনেনি সেইকালে তিনি স্বাধীনতার জন্যে লড়েছিলেন! এবং লড়েছিলেন—তাঁর মত নয়,—একা।

একপুরুষ ওঁদের ঘুমে কেটেছে। বাবা ছিলেন গরীব মুসলমান চাষী। সাত ভাইবোনের এক—তুর মাদ্রাসায় ভর্তি হলেন। সেখান থেকে ফরাসী টেকনিক্যাল স্কুলে। সেখানেও বেশীদিন থাকা গেল না। জীবিকার সন্ধানে বের হতে হল। অর্থদপ্তরে একটা কাজ জুটল। কেরানীর কাজ। কিন্তু ওপর-

ওয়ালারা দেখলেন কাজের চেয়ে ছেলেটার বেশী ঝোঁক অকাজের দিকে। সুযোগ পেলেই সে ইউনিয়ন করে বেড়ায়। ওঁরা ওঁকে একটা বেজায়গায় বদলী করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাজে ইস্তফা দিয়ে তুর ষোল আনা পলিটিসিয়ান বনে গেলেন। তিনি ফ্রান্সের প্রভাবশালী শ্রমিক ইউনিয়ন কনফেডারেশন জেনারেল 'দ্যু ট্রাভিল'-এর গিনি শাখার সভাপতি হলেন।

সেই থেকে সুরু হল। এই ফরাসী প্রতিষ্ঠানটি ছিল কমিউনিষ্টদের হাতে। তাঁরা তুর-কে হাতছাড়া করতে রাজী হলেন না। স্বভাবতই তুর ইউরোপ দেখার আমন্ত্রণ পেলেন। প্যারিসের উত্তপ্ত কফিখানা—প্রাগ, —ওয়ারশ,—মার্কসবাদ। তুর যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর মুখে আরও ধার, মাথায় আরও বিচক্ষণতা।

'৫৩ সনে তাঁর নেতৃত্বে আফ্রিকার প্রথম সফল ধর্মঘট হল। তুর-কে বাদ দিয়ে এখন আর গিনির কথা ভাবা যায় না। তিনি স্থানীয় এসেম্বলীতে স্থান পেলেন। ক্রমে রাজধানী কোনাক্রি-র মেয়র নির্বাচিত হলেন। এবং অবশেষে '৫৭ সনে গিনির দ্বিতীয় শাসক। মানে—ফরাসী প্রেসিডেন্টের অধীনে ভাইস প্রেসিডেন্ট।

তুর এখন প্রজাতন্ত্রী গিনি প্রেসিডেন্ট।

গিনির প্রেসিডেন্ট সেকু তু ভারতে এসেছেন। ভারতকে দে তিনি যেমন শিখতে পারেন অনেক তাঁর ঐ ছোট্ট দেশটির কাছে ভারতের শিক্ষণীয় কম ন বিশেষজ্ঞদের মতে—গিনি এক অদ্ভু সফল প্রজাতন্ত্র। আফ্রিকা বটে, কি সেখানে উপজাতি সর্দার নেই প্রজারাই সব। চার হাজার গ্র পঞ্চায়েত। পিঁপড়ের মত প্রজ কাজ করছে। এগুলো কি 'লে ক্যাম্প'? তুর বলেন—না। এগুল কি চীনের 'কমিউন?' তুর বলে —না, এটা গিনির বাঁচবার পথ মানুষ যার একমাত্র মূলধন, সে আফ্রিকার বাঁচবার পথ।

আশ্চর্য, আত্মবিশ্বাস। 'গিনি' মানে—একরকম ঘাস, একজাত মুরগী কিংবা একরকম সোনা। স চেয়ে খাঁটী সোনা।—আর মানে? আফ্রিকানরা বলে—তু মানে হাতি!

২৯. ৯.

ভরেস্কোভা, ভ্যালেন্তিনা

'যে যাই বলুক, ব্যাপারটা আমার ল্পনার বাইরে। এক বিশ্ব এবং র সম্ভাবনা সম্পর্কে এতদিনে আমার ধারণাগুলো গড়ে উঠেছিল আজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল',—লেছিলেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক লোকফ। বিলেতে তখন পুরাদমে ক্শিন-মরসুম চলেছে। 'ডেলি ক্সপ্রেস' হঠাৎ পক্ষ থেকে আকাশে র্জনী তুলে বলেছিল—'মিস উনিভার্স—দি ওম্যান টু লুক্ আপ।' সুদূরের কলকাতা আট কলমে ফটে পড়েছিল; ফরাসী কাগজ 'লা দ' লিখেছিল—'উইকার-সেক্স শব্দটা তদিনে সরকারীভাবে আমাদের ষা থেকে বিদায় নিল!'

সে-ই প্রথম কাহিনী নয়। াধবীলতা' এর আগেও কখনও খনও দুনিয়ার চোখের সামনে তমাল-তরুর' প্রাণৈশ্বর্য প্রমাণ রেছে। ম্যাথুওয়েব-এর একান্ন ছর পরে (১৯২৫) গার্ট্রুড এডার্লে লিশ চ্যানেল পার হয়েছিলেন। ন্ডবার্গের মাত্র পাঁচ বছর পরে মেলিয়া এরহার্ড ব্যোমযানে অ্যাট-ন্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন। এমনকি মনুর দেশেও আরতি সাহা, গীতা চন্দরা মুখ দেখিয়েছেন। কিন্তু ১৯৬৩ সনের ১৬ই জুন রোববার বিশ্বের কানে যে কাহিনী পৌছাল সে শুধু অশ্রুতপূর্ব নয়—এই বিশ শতকের শেষেও যেন অভাবিত। মনু থেকে মাদাম সিমঁ দ্য বোভা ('সেকেণ্ড-সেক্স'), পরাশর থেকে ফ্রয়েড সব তছনছ হয়ে গেল, 'টাস' সগর্বে ঘোষণা করল—'মহাকাশে নতুন একটি উজ্জ্বল তারকা উদিত হল,—ইট আউট সাইনস অল দি ফিল্ম স্টারস ইন দি ওয়ার্ল্ড…।' ইসভে-স্তিয়া কাঠের হরফ ঠুকে বলল—'লিসেন ওয়ার্ল্ড! লিসেন!'

কলকাতার মধ্যবিত্তের ঘরের বৌ সেদিন রান্না ভুলে সে কাহিনী শুনেছিল,—দিদিমা-ঠাকুমা অবাক বিস্ময়ে টোপর-মোড়া মেয়েটির মিষ্টি মুখটির দিকে তাকিয়েছিলেন। 'ভোস্টক-সিক্স'-এর খোপে বসা মেয়েটির নাম ছিল—'সি-গাল',—শঙ্খচিল। তার মাত্র তিন মাইল দূরে 'ভোস্টক-ফাইভ'-এ বসে একটি তরুণ। তাঁর নাম—'হাউক',—বাজপাখী। পৃথিবী থেকে একশ উনচল্লিশ মাইল ওপরে ঘণ্টায় আঠার হাজার মাইল বেগে মহাশূন্যে ওঁরা পাক খাচ্ছেন।

সেখানে বসেই খাওয়া দাওয়া করছেন, গান গাইছেন, এই আমেরিকাকে, এই এশিয়াকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, বেতারে ক্রেমলিনে বসা ক্রুশ্চফের সঙ্গে কথা বলছেন। মেয়েটি বলেছে—'মাকে বলবেন চিন্তার কোন কারণ নেই!'

তিন দিন পরে যখন মাটিতে নেমে এল 'শঙ্খ-চিল', গাঁয়ের মেয়ে ভলিয়া তখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নায়িকা। ভাল নাম—ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভা। বাবা ছিলেন ট্রাক্টর ড্রাইভার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাঁকে কেড়ে নিয়ে গেছে। তেরেস্কোভার সবে তখন স্কুলে যাবার বয়স। এখন অবশ্য অনেক বেশী,—ছাব্বিশ। তা হক, বাপ-মরা মেয়ে, ছোটবেলা থেকে মায়ের কোলে পিঠে মানুষ। মা কাজ করতেন সুতো কলে। স্কুলের প্রথম দফার পাঠ শেষ করে মেয়েও ভর্তি হল একটা টায়ার ফ্যাক্টরীতে। দিনে কাজ করে, রাতে হাইস্কুলে পড়ে। ক'মাস পরে সেখান থেকে চলে এল মায়ের কাছে,—সুতো-কলে। ভেলেন্তিনা বহুকাল সেখানেই কাজ করতেন,—তাঁত চালাতেন। তারপর যে সময়টুকু থাকত সেটুকু কাটাতেন হয় পার্টি করে, না হয় প্যারাসুট খেলে। ভোস্তক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগে একশ' ছাব্বিশবার আকাশ থেকে লাফিয়ে মাটিতে নেমেছে এই দুরন্ত মেয়েটি। দস্যিপনায় সে বরাবরই দড়। কিন্তু তাই বলে পৃথিবীর মাথার ওপর দিয়ে তিন দিনে আটচল্লিশ পাক? সত্য বটে, সঙ্গী 'বাজপাখি' তথা বায়কোভস্কি আরও অবিশ্বাস্য পাঁচ দিনে তিনি ঘুরে এলেন প্রায় কুড়ি লক্ষ ষাট হাজার মাইল,—একশ উনিশ ঘণ্টায় একাশী পাক! কিন্তু তবুও তিন দিন পরে মস্কোসহরের নায়িকা সেদিন তেরেস্কোভা। ক্রুশ্চফ ওঁর গালে চুমু খেলেন, এগিয়ে এসে চুমু খেল 'ভোস্টক-ত্রি'র (আগস্ট, ১৯৫২) বিজয়ী বন্ধু নিকোলায়েফ। একটি তরুণ গেয়ে উঠল—'ভলিয়া মাই লাভ, ইউ আর হাইয়ার দ্যান ইভেন দি ক্রেমলিন!' আনন্দে তেরেস্কোভা কেঁদে ফেললেন। দস্যি মেয়ের চোখে নাকি লোকেরা সেই প্রথম জল দেখল।

বিজয়-তূর্যের মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছিল মেয়েদের এভাবে লোহার পুতুল করে লাভ কি? বিখ্যাত পশ্চিমী সমাজতত্ত্ববিদ মার্গারেট মেড বলেছিলেন—'দি রাশিয়ানস ট্রিট মেন এণ্ড উইমেন

ইণ্টারচেঞ্জ এবলি, উই ষ্ট্রিট মেন এণ্ড উইমেন ডিফারেণ্টলি !' হয়ত বা কোন নারী অভ্যাসবশত মনে মনে কেঁপেও উঠেছিলেন। কিন্তু ভারত আগমনের আগের মুহূর্তে 'শঙ্খচিল' তেরেস্কোফা চেলি পরে মালাবদল করে যে নতুন পরিচয় নিলেন তারপর সাবধানীদের সে আতঙ্কের শেষ বিন্দুটাও মিলিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। এতকাল বন্ধু এবং সহকর্মীরা বলতেন—আপাত 'টম বয়' বলে মনে হলেও স্বভাবে মেয়েটা বরাবরই মেয়েলি। হাই-হিল পেলে খুশী হয়, ভাল ছাটের জামা পেলে লাফালাফি করে, যখন তখন 'বড় মস্কো' (আতর) মাখে, মাইনে পেয়েই মায়ের কাছে মনিঅর্ডার করতে ছোটে, —এবং কি নয়। 'ভোস্টক'-এ ওঠার আগে নিজের স্টাইলে চুল বেঁধেছে পর্যন্ত মেয়েটা! এবার বিশ্বকেও সায় দিতে হবে তাঁদের কথায়। কেন না, ভারত যে তেরোস্কোফাকে অভিনন্দন জানাতে চলেছে তিনি আর কেবলি 'শঙ্খচিল' নন, ভলিয়া এখন ঘরের বৌ। তাঁর সঙ্গে যে দু'জন মহাকাশ বিজয়ী আসছেন তাঁদের একজন তাঁর সহচর সেই 'বাজপাখী'টি বটেন, অন্যজন স্বামী।

[১৯৬৪ সনের জুন মাসে তেরে-স্কোফা মা হয়েছেন। তাঁর একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে।]

১০. ১১. ৬৪

তোরে

প্রেসিডেণ্ট প্রাদো বন্দী। পেরু সরকার সৈন্যবাহিনীর সামনে নত-জানু। রাজধানী লিমার পথে পথে আগুন। আগুন নিয়ে খেলা চলেছে সেখানে।

উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদ সন্দেহ নেই। উদ্বেগজনকও বটে। কেননা, এখান থেকে বহু দূরে হলেও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে দক্ষিণ আমেরি-কার পেরু মস্ত দেশ (আয়তন—৫ লক্ষ বর্গমাইলের ওপর, লোকসংখ্যা—প্রায় দেড় কোটি)। তদুপরি দেশটি ভূপৃষ্ঠের সেই 'সন্দেহ-জনক' খণ্ডে অবস্থিত নাম যার—লাতিন আমেরিকা! সুতরাং, স্বভাবতই উদ্বেগ কারও কারও পক্ষে স্বস্তির কারণও হয়েছে হয়ত। কিন্তু বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষের স্বস্তি তাঁদের মত আগুনের খবরে নয়,—অন্যত্র। তাঁরা আনন্দিত তিনি এখনও ধরা পড়েননি। আগুন যিনি ইচ্ছে করলেই জ্বালাতে বা

নিভাতে পারেন। সৈন্যবাহিনী এখনও তাঁর ধরা ছোঁয়া পায়নি!

অবিশ্বাস্য প্রকৃতির মানুষ, অবিশ্বাস্য জীবন। ১৯৩০ সনের পর থেকে দ্বিতীয় রাতে একই বিছানায় কেউ শুতে দেখেনি তাঁকে। জন্ম—১৮৯৫ সনে পেরুর এক অভিজাত স্প্যানিস পরিবারে। বাবা 'লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়া' নামে একটা কাগজ চালাতেন, কাকা যাজকের বেশে ধর্ম-প্রচার করে বেড়াতেন। তরুণ বালক—পিয়ানো বাজাতেন, পাহাড়ে চড়তেন, ফাঁকে ফাঁকে নিৎসে পড়তেন, জার্মান এবং ফরাসী ভাষা শিখতেন। এজিলো এবং সানমার্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর তুল্য ছাত্র ছিল না সেকালে (১৯১৯)।

লক্ষণ দেখে মনে হয়েছিল তিনিও ছাত্রই গড়বেন। কেননা, পড়া শেষে লিমা এবং হাভানার বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলাই ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। কিন্তু '২৩ সনে হঠাৎ আগ্নেয়-:গিরি বিস্ফোরণ হল। প্রেসিডেণ্ট লেগুইয়ার বিরুদ্ধে দেশের তরুণ সমাজ বিদ্রোহ ঘোষণা করল। অনিবার্য-ভাবেই তার দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁর ওপর। শাস্তি হিসেবে তোরে নির্বাসিত হলেন মেক্সিকোতে। কেননা, আমেরিকান পপুলার রেভলিউশনারী এলায়েন্স তথা 'আপরা' নামে পেরুর যে সব চেয়ে বড় এবং সব চেয়ে প্রগতিশীল দলটি সেটি তাঁরই কর্মফল।

মেক্সিকো থেকে তিনি পাড়ি জমালেন অক্সফোর্ডে। সেখান থেকে পড়া শেষে সুইজারল্যাণ্ডে। তারপর—জার্মানী, রাশিয়া এবং ইউরোপের নানা দেশ হয়ে '২৭ সনে স্বদেশ অভিমুখে। পথে আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে অবশেষে যখন তিনি গুয়াটে-মালায় এসে নেমেছেন—পুলিস তখন তাঁকে ধরে ভাসিয়ে দিল সাগরে। ঘুরতে ঘুরতে এক বস্ত্রে তোরে এসে নামলেন জার্মানীতে।

তিন বছর পরে '৩০ সনে ডিক্টেটরী শাসনের অবসান হওয়ার পর দেশে ফিরলেন তোরে। কিন্তু তাঁর জন-প্রিয়তার ব্যাপ্তি দেখে চিন্তিত হয়ে উঠলেন নতুন প্রেসিডেণ্ট কর্নেল কেরো। তিনি তাঁকে জেলে পাঠালেন। সে কারাকক্ষে কারও যাওয়ার অনু-মতি নেই, সেখানে লেখাপড়া করবার মত আলো নেই। দেশে গুজব: তোরেকে হত্যা করা হয়েছে। বিশ্বময় আন্দোলন তোরেকে আমরা জীবিত দেখতে চাই। সে দাবিপত্রে সেদিন যাঁরা স্বাক্ষর করেছিলেন তাঁদের মধ্যে

ছিলেন—ভারতের রবীন্দ্রনাথ,—গান্ধী !

'৩৩ সনে আততায়ীর হাতে নিহত হলেন কেরো। তোরে আবার জনতার কোলে ফিরলেন। কিন্তু সে অল্প দিনের জন্যে। তারপর আবার আন্দোলন,—আবার আত্মগোপন। '৫০ সনে অড্রিয়ার হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে তিনি নাটকীয়ভাবে আশ্রয় নিলেন—কলম্বিয়া দূতাবাসে। চার বছর সেই বাড়ীতে কাটিয়ে তবে তিনি অনুমতি পেয়েছিলেন ঘরে ফিরবার নয়—দেশ ছাড়বার। অবশেষে '৫৬ সনে গদীয়ান হলেন প্রাদো। তোরেকে তিনি দেশে ফিরবার অনুমতি দিলেন। সে মাত্র গেল বছর মার্চ মাসের কথা।

কিন্তু একটি বছর ভাল করে কাটতে না কাটতে আবার আত্ম-গোপনে বাধ্য হলেন পেরুর জাতীয়তার জনক। কেন না, এবার তাঁর রাজ্যলাভ ছিল প্রায় অবধারিত!—তিরিশ বছর বিরামহীন লড়াইয়ের পর সেটা কি খুব অসঙ্গত ছিল?—হায়, মানুষগুলোর কি নেশা, তবুও তারা আগুন নিয়েই খেলবে !

২৬.৭.৬২

থ

থর্নিক্রফট, জর্জ এডওয়ার্ড পিটার

এসেছিলেন বটে কমন মার্কেট-এর প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু ছ'ফুট এক ইঞ্চি উঁচু মানুষটি কমন য়ুরোপীয়ান নন।

ধূসর চুল, ধূসর চোখ। জর্জ এডোয়ার্ড পিটার থর্নিক্রফট আসলে নীল রক্তের মানুষ। অন্তত—আদর্শে।

জন্ম—১৯০৯ সনে। ডানস্টন-এ এবং ভাল পরিবারে। থর্নিক্রফট যমজ সন্তান। বোন এলিজাবেথ আর তিনি একদিনে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন।

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে ভাই-বোন দু'জনে দু'দিকে পা বাড়ালেন। বোন এলিজাবেথ ব্যারিস্টার হলেন। ইটন পেরিয়ে থর্নিক্রফট যোগ দিলেন রয়াল মিলিটারী একাডেমিতে।

'৩০ সনে যথারীতি তিনি গোলন্দাজ বাহিনীতে পদস্থ অফিসারে পরিণত হলেন। কিন্তু কেন জানি কাজটা ঠিক মনোমত লাগল না। তিন বছর পরেই তিনি সে-কাজ ছেড়ে দিলেন।

থিমায়া, কে. এস.

এবার বোনের পদাঙ্ক ধরে ধরে। (যমজ বলেই কি ?) '৩৫ সনে 'ইনার টেম্পল'-এ যোগ দিলেন ভূতপূর্ব সৈনিক থর্নিক্রফট। বার্মিংহাম-এ তিনি কিছুদিন স্বাধীন ব্যবসাও করলেন। তারপর খ্যাতি কোর্টের এলাকা ছাড়িয়ে বাহিরে পৌছান মাত্র একদিন (১৯৩৮) পার্লামেন্টে এসে আসন পরিগ্রহ করলেন। বলা বাহুল্য, সে আসন 'টোরি'দের সারিতে।

'৩৯ সনে যুদ্ধ। পার্লামেণ্ট ছেড়ে সৈনিক রণাঙ্গনে চললেন। বৃটেন থেকে সোজা আফ্রিকায়। উল্লেখ-যোগ্য : মিত্রপক্ষের উত্তর আফ্রিকায় অবতরণের পরিকল্পনাটি যাঁরা রচনা করেছিলেন ক্যাপ্টেন থর্নিক্রফট তাঁদের অন্যতম।

যুদ্ধের পর আবার যখন স্বদেশে ফিরলেন থর্নিক্রফট, তিনি তখন 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' ('৪৫) এক-জন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী।

সে বছর ক্ষণিকের জন্যে আসনচ্যুত হলেন উদীয়মান টোরি থর্নিক্রফট। কিন্তু সে মাত্র কয়েক মাসের জন্যে। হাতের কাছে উপনির্বাচনের সুযোগ পাওয়া মাত্র আবার স্বস্থানে ফিরে এলেন তিনি। সেই থেকে একটানা এখনও পার্লামেণ্ট-এ আছেন। এবং সগৌরবে।

মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে চার্চিল মন্ত্রী সভার ('৫১) সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন থর্নিক্রফট, দীর্ঘকাল তিনি স্বদেশের 'চ্যান্সেলার অব এক্সচেকার'-এর কাজ করেছেন এবং এখন যদিচ তিনি দেশের বিমান দপ্তরের মন্ত্রী, তবুও তাঁরই উপর দায়িত্ব পড়ে দেশে দেশে বৃটেনের অর্থচিন্তা ব্যাখ্যা করবার। কেননা, থর্নিক্রফট একদিকে যেমন বিখ্যাত টোরি অর্থনীতিবিদ্ অন্যদিকে তিনি বিদ্রোহী টোরি-ও বটে। সুতরাং, মধ্যস্থতার ক্ষেত্রে তিনিই দলের মুখপাত্র।

ব্যক্তিগত জীবনে রক্ষণশীল থর্নি-ক্রফট প্রগতিশীল গৃহস্থ। তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহিত। এবং উল্লেখযোগ্য খবর তাকে যাঁরা চেনেন না তাঁরাও জানেন তাঁর স্ত্রী কার্লাকে। কেন না, এই মহিলাটি ছিলেন বৃটেনের একটি খ্যাতিমান 'ফ্যাসান জার্নাল'-এর জনপ্রিয় সম্পাদিকা। ২০. ৭. ৬১

থিমায়া, কে. এস

এই শতকের দ্বিতীয় দশকের কথা। সেদিন রাত্তিরে এলাহাবাদের একটা হলে বসে থিয়েটার দেখছিলেন

তিনজন ভারতীয় সৈনিক। তাঁদের গায়ে সাবঅলটার্ন-এর বেশ। পাশে সিবিলিয়ানের পোশাকে মাঝবয়সী কে একজন বসে।

অভিনয় হচ্ছে। অঙ্ক-পরিবর্তন উপলক্ষে মাঝে মাঝে আলো জলছে। সেই আলোতেই হঠাৎ একবার ওঁদের দিকে আড়চোখে তাকালেন লোকটি। তারপর স্পষ্ট ইংরেজীতে বললেন—'টেল মি হাউ ডাজ এন ইণ্ডিয়ান ফিল, ওয়েরিং দি ইউনিফর্ম অব আওয়ার বৃটিশ রুলারস ?'

'হট্ !'—চটে গিয়ে ধাঁ করে উত্তর দিয়ে উঠলেন ওঁদের মধ্যে তরুণতমটি।

আশ্চর্য, বৃদ্ধ কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি বললেন,—'আই এম সিরিয়াস !'—আচ্ছা বিদেশী পোষাক পরলেই কি নিজেদের বিদেশী মনে হয় তোমাদের ?

'—তা কেন ? তা ই বলে নিজেদের ইণ্ডিয়ান বলেও ভাবি না আমরা !' উত্তর দিল আর একটি তরুণ।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে শুধরে দিল সেই তরুণ সহ-কর্মীটি,—'আমরা নিজেদের ভারতীয় বলে ভাবলেও ত আর ভারতীয়রা তা ভাবছে না আমাদের ?'

'—কেন ভাববে না ?' বৃদ্ধ এবার হাসলেন। তারপর বললেন—'দেখ, সে অনেক কথা। এখানে এভাবে সব বলা যায় না। তার চেয়ে বরং তোমরা কাল সন্ধ্যায়—আমার ওখানে এসো। নেমন্তন্ন রইল।' বলেই পকেট থেকে ছোট্ট একখানা কার্ড বের করে তিনি তা গুঁজে দিলেন তরুণটির হাতে।...ড্রপসীন উঠল। আলো নিভে গেল।

আবার যখন আলো জলল তখন অভিনয় শেষ হয়ে গেছে। থিয়েটার ভেঙ্গে গেছে। হল থেকে বেরিয়ে পকেট থেকে কার্ডখানা বের করল সৈনিকটি। মুহূর্তে তাঁর সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কেননা, কার্ডটির গায়ে লেখা—'মতিলাল নেহরু'। এলাহাবাদে নতুন এলেও উদীয়মান ভারতীয় সৈনিক থিমায়া জানেন এই মানুষটি কে !

সেই থেকে আলাপ। এবং সেই আলাপের ফলেই ক্রমে বিবিধ পরিবর্তন ! এলাহাবাদের পথে মতিলাল নেহরুর কন্যার অনুরোধে মাথা থেকে সৈনিকের টুপি খুলে ফেলে দিয়েছিলেন থিমায়া, সহকর্মী এবং শ্বেতাঙ্গ পুলিস কর্মচারীদের উপেক্ষা করে অন্ধকারে দাঁড়িয়েদাঁড়িয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলেন মহাত্মার বক্তৃতা। এমন কি একদিন স্বয়ং

মতিলালকে চমকে দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন তিনি—'বলুন কি করতে হবে আমাকে বলুন! আপনি যা আদেশ করবেন আমি তাতেই রাজী!'

উত্তরে মতিলাল বলেছিলেন—'আমার ইচ্ছে, তোমরা যা করছ তা-ই কর। কেননা, আজ হক, কাল হক, ভারত একদিন স্বাধীন হবেই। মনে রাখতে হবে, সেদিন আমাদের নিজেদেরই দেশ রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে!'

পুরো একটা রাত্রি না ঘুমিয়ে ভেবেছিলেন থিমায়া। তারপর নিঃশব্দে ফিরে গিয়ে ছিলেন নিজের ডিউটিতে। কিন্তু সে কর্তব্যে যে স্বদেশ চিন্তাও উপস্থিত ছিল নিয়ত তার প্রমাণ—'৪২ সনের আগ্রা। আগ্রার দেওয়ালে দেওয়ালে তখন বিদ্রোহীদের প্রাচীর পত্র—'ডোণ্ট বি এফ্রেড অব দি হায়দ্রাবাদস।—দে নেভার স্যুট!' থিমায়া তখন হায়দ্রাবাদ ব্যাটেলিয়ানের অধীশ্বর। বরাবরই তিনি একটু ভিন্ন ধরনের সৈনিক।

নাম—কোদেন্দ্র সুব্বায়া থিমায়া। বয়স—পঞ্চান্ন। (জন্ম—মার্চ, ১৯০৬) উচ্চতা—ছ' ফুট তিন ইঞ্চি, ওজন দু'শ পাউণ্ড।

সৈনিকের পরিবার নয়। বাবা ছিলেন মার্কারার (কুর্গ) একজন বাগিচা মালিক। কফি বাগান ছিল তাঁর। তবুও যে বাঙ্গালোরের এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান স্কুল জোসেফ-কটন থেকে বের হওয়ার পর ছয় ভাই-বোনের মধ্যে দ্বিতীয়টি অক্সফোর্ডের বদলে দেরাদুনে প্রেরিত হল তার কারণ—মা। তিনি য়ুরোপ দেখেছেন এবং সৈনিকদের মর্যাদা জানেন।

'২২ সনে দেরাদুন। সেখান থেকে যথা সময়ে স্যাণ্ডহার্স্ট-এ যাওয়ার একটা যোগ্যতা ছিল না। তিনি উর্দু জানতেন না। তবুও যে তাঁকে আটকান গেল না সে অন্যবিধ যোগ্যতার কারণে। আর বিষয়ে তিনি প্রয়োজনের চেয়ে বেশী নম্বর ত পেতেনই, তাছাড়া ক্রিকেটেও স্বয়ং প্রধান সেনাপতির সামনে সেঞ্চুরি করে বসতেন। অন্যান্য খেলাধুলায়ও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

স্যাণ্ডহার্স্ট-এও তা প্রমাণিত হল। অস্ত্র এবং (যুদ্ধ) শাস্ত্র উভয়তই থিমায়া যোগ্যতার পরিচয় দিলেন। কিন্তু তবুও গোল বাধল। কেননা, উর্ধ্বতন ইংরেজ অফিসাররা আবিষ্কার করে ফেলেছেন যে এই ভারতীয় তরুণটির কাছে একটি শ্বেতাঙ্গ মেয়ে নিয়মিত

ভাবে রঙ্গীন খামে চিঠি লিখছে! কিন্তু তা হলেও থিমায়াকে বাতিল করা গেল না। কেননা, স্যাণ্ডহার্স্ট-এর পরীক্ষার ফল ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়ে গেছে।

'২৬ সনে দেশে ফিরে এলেন থিমায়া। তিনি তখন মাত্র কজন গুণা-গুণতি ভারতীয় অফিসারের একজন। প্রথমে বাঙ্গালোর। পরে সেখান থেকে রেজিমেণ্টের সঙ্গে বাগদাদে। সেখান থেকে এলাহাবাদ। এলাহাবাদ থেকে কোয়েটা মাদ্রাজ হয়ে গেল যুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশে। কোয়েটাতে থাকা কালেই বিয়ে (১৯৩৫)। স্ত্রী সিনা কারিয়াপ্পা পরিবারের মেয়ে। আগে থাকতেই দুই পরিবারের পারিবারিক আত্মীয়তা ছিল। বলা বাহুল্য, অতঃপর সে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ।

গেল যুদ্ধে থিমায়া পূর্ব রণাঙ্গণে একমাত্র ভারতীয় জেনারেল যিনি স্বয়ং আস্ত একটি রেজিমেণ্ট পরিচালনার অধিকার পেয়েছেন। কামগাঁও-এর যুদ্ধে তাঁর সেই কৃতিত্বের পুরস্কার 'ডি এস ও' এবং জাপানের আত্ম-সমর্পনের অনুষ্ঠানে মাউণ্টব্যাটেন এর সঙ্গে উপস্থিত থাকার সম্মান।

এর পর স্বাধীনতা। পাক-ভারত সীমান্ত, কাশ্মীর এবং কোরিয়া। ওয়েস্টার্ণ কম্যাণ্ডের তৎকালীন 'জি ও সি' জেনারেল থিমায়ার পরবর্তী কাহিনী কমবেশী সবাই জানেন। কাশ্মীর প্রসঙ্গে যা অনেকে জানেন না তা হচ্ছে এই জেনারেল থিমায়া সেখানে নিজের হাতে ট্যাঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে লড়েছেন। এবং বিশ্বের ইতিহাসে তের হাজার ফুট উঁচুতে সেই প্রথম ট্যাঙ্ক লড়াই।

দীর্ঘ সৈনিক জীবনের পরে ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল থিমায়া অবশেষে অবসরগ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনিই বোধ হয় একমাত্র ভারতীয় সৈনিক যিনি তার আগে ইতিহাসে নিশ্চিত স্থানে করে নিলেন।

১৯৬২ সনের অক্টোবরে চীনা হামলার পর জেনারেল থিমায়াকে জাতীয় প্রতিরক্ষা পর্ষৎ-এঅন্যতম উপদেষ্টা হিসেবে মনোনীত করা হয়। ১৯৬৪ সনের জুলাইয়ে তিনি সাই প্রাসে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। এই পদে তাঁর পূর্ববর্তী যিনি ছিলেন তিনিও ভারতীয়। নাম তার বিগ্রেডিয়ার গিয়ানী।]

১১. ৫. ৬১

দ

দত্ত, সুবিমল

নিকিতিন, লেবেদফ বা ভেরিশ্চে-গিন দিয়ে যেমন শুরু করা যায় তেমনি রবীন্দ্রনাথ বা জওহরলালকে দিয়েও অনায়াসে।

আজকের রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের দৌত্য চলছে সেদিন থেকেই। অবশ্য বেসরকারীভাবে। সরকারী ভাবে সূচনা করেছিলেন বিজয়লক্ষ্মী। সাফল্য সমাধা করেছিলেন রাধাকৃষ্ণন। ধারা অব্যাহত রেখে চলেছেন—আর. কে. নেহরু। ভবিষ্যতেও যে তা যথারীতি চলবে তার ইঙ্গিত এবারকার ব্যক্তি নির্বাচন।

এবার রাশিয়ায় আমাদের দূত হয়ে চলেছেন যিনি—নাম তাঁর শ্রীসুবিমল দত্ত। বয়স—পঞ্চান্ন। পেশা আজীবন রাজকার্য।

চট্টগ্রামের বিখ্যাত দত্ত পরিবারের ছেলে। ভারতময় মায়ের খ্যাতি ছিল 'রত্নগর্ভা'। অনেক ভাই। প্রত্যেকেই উল্লেখযোগ্য কেউ কিংবা কিছু।

সুবিমল পড়তেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। কেমেস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স। সেখান থেকে লণ্ডন। য়ুনিভার্সিটি কলেজ। '২৮ সনে তেইশ বছর বয়সে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস।

দেশে ফিরেই নিয়ম অনুযায়ী সরকারী চাকুরী। প্রথমে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টার, তারপর এডিশন্যাল জেলা জজ এবং অবশেষে '৩৮ সনে ভারত সরকারের দপ্তরে আণ্ডার সেক্রেটারি। ক্রমে ('৪১) জয়েণ্ট সেক্রেটারি।

'৪১ সনে আবার প্রাদেশিক দপ্তরে ফিরতে হল। ডেপুটি সেক্রেটারি হিসাবে বাংলা দেশে ফিরে এলেন শ্রী দত্ত। চাকুরী স্থায়ী হল জেলা শাসকের পদে।

সে বছর স্বাধীনতা। দপ্তরেও নাড়া-চাড়া পড়ল। পররাষ্ট্র দপ্তর যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান করতে করতে শ্রী দত্তের খোঁজ পেলেন। অচিরাৎ তিনি কমনওয়েলথ মিনিস্ট্রির সেক্রেটারি নিযুক্ত হলেন। তারপর থেকেই শ্রী এস. দত্ত—পররাষ্ট্র দপ্তরে।

অবশ্য পররাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা তাঁর তখন বিলেতের ছাত্র জীবনেই শেষ

ছিল না, আগের অভিজ্ঞতা বলতে—বিলেতে ছাত্রজীবন আর '৪১ সন। সে বছর ভারত সরকারের এজেন্ট হিসেবে মালয়ে কাজ করেছিলেন তিনি। তবে ইতিমধ্যেকার অভিজ্ঞতা অনেক, অফুরন্ত।

'৫০ থেকে '৫২ সন,-দু'বছর পর-রাষ্ট্র দপ্তরের সচিব, '৫২—'৫৪ দু'বছর জার্মানীতে রাষ্ট্রদূত, সে বছরই কিছু-দিন কমনওয়েলথ সেক্রেটারি এবং '৫৫ সনের অক্টোবর থেকে ভারতের ফরেন সেক্রেটারি!

ভারতের ফরেন সেক্রেটারি শ্রী এস. দত্ত ভারতের বাইরে আজ সুপরিচিত ব্যক্তি। ইতিমধ্যে তিনি অনেক দেশ দেখেছেন, অনেক রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে কথা বলেছেন, অনেক সভায় বসেছেন, সুতরাং অনেকের কাছেই তিনি চেনামুখ। এমন কি নিশ্চয় ক্রেমলিনেও। কিন্তু নামটা মুখস্থ হয়ে গেলেও, ভারতে অনেকের কাছেই মুখটা তাঁর অচেনা। অন্তত, উড্ডীয়নের পথে বিমানঘাটিতে নেহরুজীর ডাইনে বাঁয়ে সার-বাঁধা মানুষগুলোর ফটো থেকে এই সেদিন পর্যন্তও সেই মুখটা খুঁজে বের করতে পারিনি আমি। এখন অবশ্য পারি। কারণ কাজটা খুব সহজ। কেননা, যিনি চিনিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর হাতে ছবি ছিল না বটে, কিন্তু বলে দিয়েছিলেন,—এসব সময়ে নেহরুজীর পাশেই যে লোকটি থাকেন সেই লোকটি!

দয়াল, রাজেশ্বর

নয়া জমানা। নতুন নায়ক, নতুন শাসন। সুতরাং পুরানো সম্পর্ক নিয়ে দিল্লি উদ্বিগ্ন। পররাষ্ট্র দপ্তর অনেক ভাবলেন। সহসা নামটা মাথায় ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি গেল করাচীতে।—নতুন হাইকমিশনার যাচ্ছেন সেখানে।

—ইউ?—তুমি?

—ইউ?—তুমি?

ভারতীয় হাই কমিশনারকে জড়িয়ে ধরলেন পাকিস্তানী নায়ক। আয়ুব বললে—'তাহলে তুমিই এলে?'

রাজেশ্বর উত্তর দিলেন—তাহলে তুমিই বসলে?

কথোপকথনটা শোনা কথা। কিন্তু ঘটনাটা করাচীর কূটনীতি-বিদদের জানা হয়ে গেল। সবাই জানলেন—আয়ুব আর দয়াল বন্ধু। ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

শ্রীরাজেশ্বর দয়াল তখন উত্তর-প্রদেশের কোন জেলায় জেলা ম্যাজি-

ষ্টেট। আয়ুব স্থানীয় গ্যারিসন-এর কর্তা। কর্মসূত্রে পরিচয়। তারপর ক্রমে বন্ধুত্ব। রাজনৈতিক ঘটনাচক্র দুই বন্ধুকে দেওয়ালের দুই দিকে ঠেলে দিল। তারপর—এই দেখা হল! অদ্ভুত ঘটনা। তার চেয়েও অদ্ভুত জীবন। কোথায় সেদিনের আয়ুব খাঁ, কোথায় রাজেশ্বর দয়াল।

জন্ম উত্তরপ্রদেশের একটি সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ঘরে। শিক্ষা—এলাহাবাদ এবং অক্সফোর্ডে।

শ্রী দয়াল ইতিহাসের ছাত্র। ইতিহাসেই তিনি অক্সফোর্ড থেকে এম-এ হলেন। সামনে তখন আই-সি-এস পরীক্ষা। বাইরের ছাত্র (open compitition) হিসেবে তাতে বসে গেলেন। ফল বের হলে দেখা গেল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও শ্রীদয়ালের নামটি রয়ে গেছে।

আই-সি-এস,—সুতরাং চাকরী হল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট-এর কাজ। ক্রমে সেক্রেটারী ('৪৬-'৪৮) এবং অবশেষে পররাষ্ট্র দপ্তরে। কেন্দ্রের সঙ্গে শ্রীদয়ালের পরিচয় ছিল না এমন নয়। এর আগে নানা বিষয়ে দিল্লীতে তিনি উত্তরপ্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তবে—এ নতুন ধরনের কাজ। প্রথমেই—মস্কো। শ্রীদয়াল মস্কোর ভারতীয় দূতাবাসে কাউন্সিলার নিযুক্ত হলেন। কিছুকাল (১৯৪৮-'৪৯) চার্জ দ্য এফেয়ার্স-এর কাজও চালাতে হল তাঁকে। '৫০ সনে দেশে ডাক পড়ল। আসামে সেবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়। শ্রীদয়ালের উপর ভার পড়ল সেখানে ত্রাণকার্য পরিচালনার। সাময়িক কাজ। সুতরাং, ক'মাসের মধ্যেই আবার বিদেশে যাওয়ার কথা উঠল। এবার য়ুনো।

'৫০ সনে শ্রীরাজেশ্বর দয়াল ভারতের বিকল্প প্রতিনিধি হিসাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে আসন গ্রহণ করলেন। জাতিপুঞ্জের সভায় তখন—সুয়েজ সমস্যা, কাশ্মীর সমস্যা। শ্রীদয়াল অনায়াসে এই দুই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। বোঝা গেল, শুধু কূটনৈতিক কাজ নয়, প্রকাশ্য-কূটনীতিকের জীবনও তাঁর কাছে স্বচ্ছন্দ জীবন।

সুতরাং বারটি দেশ মিলে যখন তাঁকে নিরস্ত্রকরণ কমিটির শীর্ষে বসাতে চাইল, ভারত তখন বিন্দুমাত্র দ্বিধা দেখাল না, বরং '৫২ সনের জানুয়ারিতে পররাষ্ট্র দপ্তর শ্রীরাজেশ্বর দয়ালকেই জাতিপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা করলেন!

জাতিপুঞ্জে শ্রী দয়াল অনেক কাল ছিলেন না। কিন্তু সেখানে তাঁর স্বল্প-

কালের জীবন অনেক কৃতিত্বে উজ্জ্বল। তিনি ভারতের পক্ষ থেকে ডাঃ গ্রাহামের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়েছেন এবং তাৎপর্যপূর্ণ আফ্রো-এশিয়া গোষ্ঠীর তিনিই অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

'৫৪ সনে তাঁকে পাঠান হল যুনোর চেয়েও গুরুতর দেশে। যুগোশ্লাভিয়া ইউরোপে ভারতের বিশিষ্ট বন্ধু দেশ। শ্রীদয়াল রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হলেন সেখানে। পরের বছর একই সঙ্গে রুমানিয়া এবং বুলগেরিয়ায়ও বিশেষ দূতের দায়িত্ব দেওয়া হল তাঁকে। '৫৮ সন অবধি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে একাজেই বহাল ছিলেন তিনি। জানুয়ারিতে গ্রীস-এ দূত করা হল তাঁকে। এবং নভেম্বরে পাকিস্তানে হাই কমিশনার।

খবর এসেছে—শ্রীদয়াল এবার চলেছেন আফ্রিকায়। অশান্ত বেলজিয়ান কঙ্গোতে তিনি সেক্রেটারি জেনারেলের হয়ে জাতিপুঞ্জের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

এই কাজেও শ্রীদয়াল নতুন নন। '৫৮ সনে লেবাননে জাতিপুঞ্জ যে পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ করেন, শ্রীরাজেশ্বর দয়াল ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। সুতরাং লোকটা জাতিপুঞ্জের চেনা মানুষ। তদুপরি এ্যামেচার শিকারী, ফটোগ্রাফার এবং চিত্রকর শ্রীদয়াল হ্যামারশীল্ডের ব্যক্তিগত বন্ধু। স্বভাবতই প্রত্যাশা, এবার সেক্রেটারি জেনারেল কাজটা নির্বিঘ্নে চলবে এবং কঙ্গোর মনোবাসনারও একটা নিষ্পত্তি হবে। কেননা, শ্রীদয়াল যুনোর প্রতিনিধি হলেও ভারতের লোক এবং আফ্রোএশিয়া গোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা! ৮. ৯. ৬০

দাদু, ডঃ এম. ইউসুফ

ভারতীয় নাম। তবুও সেই অর্থে আজ আর ভারতীয় নন। কেননা, বোম্বাই বন্দর থেকে সেই অজ্ঞাত দেশের দিকে জাহাজ যাত্রা করেছিল যেদিন সে অনেকদিন। আজ তার স্মৃতি যদি কোথাও থাকে সে যেন শুধু মুখের আদলে।

গায়ে ইউরোপীয় পোষাক, মুখে আফ্রিকার ভাষা। অথচ নাম—ডাঃ এম ইউসুফ দাদু। ট্রান্সভাল এর ভারতীয়রা বলেন 'আওয়ার বিলাভেড লীডার।' আফ্রিকানরা বলে—আমাদেরও।

ওদের মত অন্যরা জানেনা বটে, তবুও এশিয়া আফ্রিকার কানে অত্যন্ত পরিচিত নাম। কেননা, সর্বজন শ্রদ্ধেয় নানার মৃত্যুর পর থেকে

দিয়েম, নো, দিন

ট্রান্সভালে তিনিই এক মাত্র কর্মী, নায়ক। ডারবানের যে পথে সত্যাগ্রহী সেজেছিলেন '১৩ সনে একদিন ভারতের গান্ধী সেই পথেই, মাত্র এই সেদিন সাহেবী পোষাক ছেড়ে গান্ধী টুপি মাথায় দিয়ে মালানের আইন অমান্য করতে নেমেছিলেন তিনি।

দুর্ধর্ষ কর্মী, প্রবল বক্তা। সাহেবরা বলেন—'আফ্রিকার চার্চিল।' কংগ্রেস সেবার য়ুনোয় পাঠিয়েছিল ওঁকে। ট্রান্সভাল-এর চার্চিলকে। পথে সরকার কেড়ে নিয়ে গেল পাসপোর্ট। এরোড্রোম থেকে সোজা কোর্টে। মামলায় দাদু জিতলেন। এবং অতঃপর ইচ্ছে করেই বিনে পাশপোর্টে গিয়ে হাজির হলেন পারী। আইন যখন সরকারই মানে না, তখন আইন ভঙ্গের অধিকার তাঁর আছে বৈকি! ট্রান্সভাল-এর চার্চিল শুধু বক্তা নন, দুর্ধর্ষ বিদ্রোহীও।

দু'জন বন্ধুকে নিয়ে দাদু ভারতে এসেছেন। উদ্দেশ্য : বন্ধু দেশ হিসেবে ভারত পরিদর্শন। আফ্রিকার স্বপক্ষে জনমত সংগঠন। উল্লেখযোগ্য : দাদু ভারতীয়দের নায়ক বটে, কিন্তু তাঁর লড়াই সমুদয় অশ্বেতকায়দের নামে!

আমরা আফ্রিকার নামেই অভিনন্দন জানাচ্ছি তাঁকে। ৯.২.৬১

দিয়েম, নো, দিন

ধর্মযোদ্ধার সব লক্ষণই ছিল। সাহসিকতা, একাগ্রতা, দৃঢ়তা, সংসারের প্রতি আকর্ষণহীনতা, এমনকি, কমিউনিজমের ওপর ব্যক্তিগত আক্রোশ পর্যন্ত। যদিচ ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসীটি নন, তবুও দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামের প্রেসিডেন্ট নো দিন দিয়েম সদাচারী মানুষ। বাষট্টি বছর বয়সে এখনও তিনি 'কুমার'। তাছাড়া যদিও তিনি ক্ষমতায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ঐ গুরুত্বপূর্ণ দেশটিরও সম্রাট তুল্য, তবুও দিয়েম ভোজনে যে-কোন গরীব চাষীর মত। পার্থক্য শুধু এই, তিনি সিগারেট খেতে ভালবাসেন। তবে 'চেন-স্মোকার' প্রেসিডেন্ট কাজেও তেমনি, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে টানা আঠার ঘণ্টা খেটে থাকেন।

গুণাবলী সেখানেই শেষ নয়। হো চি মিনের উত্তর ভিয়েৎনাম এবং লাওসের লালদের কাছে দিয়েম এক বিস্ময়কর যোদ্ধা। '৫৪ সনে খণ্ডিত ভিয়েৎনামের উত্তরাংশটুকুর নায়ক হিসেবে তিনি যখন প্যারিস থেকে সায়গনে এসে নামেন, তখন তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে হাজির ছিলেন

মাত্র পঞ্চাশজন মানুষ। দিয়েম সেদিন বলতে গেলে নিজের দেশে প্রায় অপরিচিত। কেননা, সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারীর ঘরের সন্তান হিসেবে তাঁর জীবনও শুরু হয়েছিল রাজকর্মচারী হিসেবেই। ফরাসী বিদ্যালয়ের স্নাতক দিয়েম একুশ বছর বয়সে জীবন আরম্ভ করেছিলেন জেলা-শাসক হিসেবে। সেখানেই তাঁর কমিউনিস্টদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। তাদের বিরুদ্ধে সফল লড়িয়ে দিয়েম ক্রমে ফরাসীদের নকল শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিপদও লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু বেশীদিন সে পদে থাকতে পারেননি। কেননা, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদও তাঁর কাছে মনে হয়েছিল কমিউনিস্টদের মতই তুল্য ঘৃণ্য। সুদূর '৩৩ সন থেকেই দিয়েম তাই দেশের রাজনীতিতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

তবুও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে হো চি মিনের অনুচরেরা একদিন গোপনে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল ওঁকে তাদের অরণ্যবাসে। বিস্মিত দিয়েম দেখলেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং হো চি মিন। হো বললেন—তুমি আমাদের সঙ্গে এস। দিয়েম বললেন তার আগে কৈফিয়ত দাও, কেন তোমরা আমার ভাইকে হত্যা করেছ? হো জবাব দিলেন—তার জন্যে আমি দুঃখিত।—খুনীদের সঙ্গে হাত মিলাতে পারছি না বলে দুঃখিত আমিও—উত্তর দিলেন দিয়েম। হো বন্দীকে মুক্তির নির্দেশ দিলেন। দিয়েম দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিলেন। সেখান থেকে '৫৪ সনে সায়গনে। পর্যবেক্ষকেরা বলেছিলেন—দু' মাস টিকতে পারলে যথেষ্ট! দিয়েম যে শুধু টিকেছেন তাই নয়, গেল ক'বছরের ইতিহাস বলবে—হয়ত তিনি এশিয়ায় দ্বিতীয় গ্রীসের নজীরও রেখে যেতে পারতেন।

কিন্তু বোধ হয় আর বেশী দিন নয়। কেননা, দিয়েম আজ একচক্ষু যোদ্ধা। স্বেচ্ছায় যে লড়াই তিনি আজ দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ডেকে এনেছেন, তা সীমান্তের গেরিলা যুদ্ধের চেয়েও মারাত্মক। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম বৌদ্ধের দেশ। এ দেশের দেড় কোটি মানুষের মধ্যে এক কোটিই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ক্যাথলিক দিয়েম তাঁদের আস্থা হারিয়েছেন। তাঁরা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ডেমোক্র্যাসির নাম দিয়েছে আজ 'দিয়েমোক্র্যাসি'। নির্বাচনে জিতলেও বিরোধী সদস্য আজ সেখানে আইনসভায় বসবার অধিকার পান না। তাছাড়া রাজত্বের শাঁসটুকু আজ সম্পূর্ণত দিয়েমেরই

যেন পারিবারিক ধন। তাঁর ভাই, ভ্রাতৃবধূ—তাঁরাই রাজত্বের সব। বাকী যা থাকে, সেটুকু ভোগ করেন পনের লক্ষ ক্যাথলিক। ক্যাথলিক না হলে কোন সৈনিক নাকি সেখানে ক্যাপ্টেন পদের সীমা ছাড়াতে পারেন না। স্বভাবতই বৌদ্ধদের এখন মঠ গুম্ফা ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময়। আসছেনও তাঁরা। এপ্রিলে দিয়েম হুকুম দিয়েছিলেন—বুদ্ধের জন্মদিনে কোন গুম্ফায় ধর্মীয় পতাকা উড়ান চলবে না। সে আদেশ অমান্য করে তথাগতের ২০০৮তম জন্মদিনে বুদ্ধ শিষ্যরা প্রাণ দিয়েছেন হুই শহরে। ১১ই জুন সায়গনে নিজহাতে আগুন জ্বালিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছেন ৭৩ বছরের বৃদ্ধ বৌদ্ধ শিষ্য। হাজার হাজার সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী উপবাস করছেন, লক্ষ লক্ষ তরুণ শোভাযাত্রা করছে। তাদের ঘাড়ে ঘাড়ে প্ল্যাকার্ড। তাতে লেখা—'প্লিজ কিল আস্!'

ক্ষমতামত্ত দিয়েম হয়ত আজ ভুলে গেছেন, কিন্তু ইতিহাস জানে, দেশের শতকরা ৮০ জন মানুষ যখন এই আবেদন পেশ করে, তখন কান না পাতলে রাজত্ব থাকে না।

[১৯৬৩ সনে ভিয়েৎনামে সৈন্য-বাহিনীর বিদ্রোহ ঘটে। প্রেসিডেন্ট দিয়েম তাতে নিহত হন।]

১৮. ৮. ৬৩

দেশমুখ, সি. ডি.

সচরাচর সরকারী কর্মচারীরা এ সব বিষয়ে তর্ক তোলেন না। কেননা, সেটা তাঁদের ইথিকস-এ নেই। কিন্তু তিনি তুলেছিলেন। বলেছিলেন—দ্বিভাষিক বোম্বাই অসঙ্গত। ওরা মানতে রাজী হননি। সুতরাং, তিনি ইস্তফা দিয়েছিলেন।

সাধারণ সরকারী কর্মচারীরা এ সব বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন না। কেননা, তাতে নিজেদেরও বিপাকে পড়ার সম্ভাবনা। কিন্তু তিনি তুলেছিলেন। বলেছিলেন—'দুর্নীতির অনেক ঘটনা আমার মুখস্থ। যদি তদন্ত হয় তবে প্রধানমন্ত্রীর হাতে আমি তা তুলে দিতে পারি। ওঁরা সেদিন এস. আর. দাতকে তদন্তে নামাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

তিনি এ সব পেরেছিলেন, কারণ কোনকালেই তিনি সাধারণ সরকারী কর্মচারী ছিলেন না।

বরাবরই অসাধারণ প্রকৃতির মানুষ। নাম—চিন্তামন দ্বারকানাথ দেশমুখ। মারাঠা তনয় দেশমুখ

বোম্বাই এবং কেম্ব্রিজের বিখ্যাত ছাত্র। প্রতি পরীক্ষায় ফলাফল তাঁর অসাধারণ। ফলে, তৎকালের নিয়মে তিনি আই. সি. এস হয়েছিলেন। সে ১৯১৯ সনের কথা। দেশমুখের পরবর্তী জীবনও সত্যিই এক অসাধারণ রাজকর্মচারীর জীবন।

প্রথম দিকে কাজ করতেন মধ্য-প্রদেশ এবং বেরারের অর্থ দপ্তরে। তারপর—কেন্দ্রে। যুদ্ধের সময়ে তিনি ছিলেন ভারতে 'শত্রু সম্পত্তির' তত্ত্বাবধায়ক। তারপর '৪৩ সন থেকে '৪৯ সন পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নানা পদে। তার মধ্যে একটা পদের নাম—'গভর্নর'।

৪৯-'৫০ সনে কিছুকাল দেশের বাইরে ছিলেন তিনি। তখন তাঁর পদ ছিল ভারত সরকারের অর্থসংক্রান্ত প্রতিনিধি। তার আগে '৪৬ সনে ইন্টার-ন্যাশনাল মনিটরী ফাণ্ডে এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কে ভারতের তরফের চেয়ারম্যান করা হয়েছিল তাঁকে। এদিকে সেবারই স্বদেশে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটেরও প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছেন তিনি।

কিন্তু সহসা পরিবর্তন হল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান (১৯৫০), আজীবন সরকারী কর্মচারী সি. ডি. দেশমুখ সহসা সব ছেড়ে জন-জীবনে অবতীর্ণ হলেন। এদিকে ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর পরিবর্তিত জীবন লক্ষণ। পরিণত বয়স্ক (জন্ম—১৮৯৬) দেশমুখ বিখ্যাত সমাজসেবী দুর্গাবাঈয়ের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। '৫০ সনে তিনি নির্বাচিত সদস্য হিসেবে লোকসভায় যোগ দিলেন। সে বছরই জুন মাসে অর্থমন্ত্রীর পদে গ্রহণ করা হল তাঁকে।

'৫৬ সনের জুলাই অবধি সে পদেই ছিলেন। তারপর বোম্বাই প্রশ্নে সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলন এবং পদত্যাগ। ইচ্ছে করলে দেশমুখ সেদিন রাতারাতি 'হিরো'য় পরিণত হতে পারতেন। কিন্তু অসাধারণ মানুষ বলেই সম্ভবত, পরিবর্তে তিনি দায়িত্বশীল কর্মীর ভূমিকাটাই গ্রহণ করেছিলেন। পদ-ত্যাগের পরের মাস থেকেই ইউনিভারসিটি গ্রাণ্টস কমিশনের চেয়ারম্যানের আসনে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। সেই সঙ্গে কিছুকাল ছিলেন—ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের চেয়ারম্যানের পদেও। এবার এলেন—দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের আসনে।

বলতে দ্বিধা নেই, দিল্লীর এখন সত্যিই ভাল সময়,—অসাধারণ।

১.৩.৬২

দেশাই, মোরারজী

বোম্বাইয়ের একটা কাগজ মোরারজীর নাম দিয়েছিল 'মর‍্যালজী!' কাগজটার প্রবণতা হরিদ্রাবর্ণের দিকে। নয়ত আর যাই হক, এভাবে প্রহিবিশনের প্রতিশোধ নিতেন না ওঁরা। কেননা, তাতে সত্যের অপলাপ। নৈতিকতার দিক থেকে শ্রীমোরারজী দেশাই নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী। তিনি পার্টিতে নারকেলের দুধ খান। বাড়িতে—জল। সপ্তাহে ছত্রিশ ঘণ্টা তাঁর উপোস। অবশিষ্ট সময়ে খাদ্য হিসাবে যা গ্রহণ করেন তার ষোলআনা নিরামিষ। মোরারজী গেল বছর অবধিও ইচ্ছে করে বিদেশ ভ্রমণ এড়িয়েছেন—কারণ তা হলে তাঁকে ইন্‌জেক্‌শান নিতে হয়। মোরারজীর জাতীয়তাবাদ রক্তে বিদেশী উপাদান মেশাতেও নারাজ!

তাই বলে কি ব্যতিক্রম নেই?—আছে। আছে বলেই যাঁরা জানেন, তাঁরা বলেন, মোরারজী পদ্ম হলেও তাঁর বোঁটাটি ইস্পাতের। সেদিক থেকে গান্ধীশিষ্য দেশাই বরং প্যাটেলের কাছাকাছি। গুজরাট এবং বোম্বাই দাঙ্গা পাঞ্জাবে হতে পারেনি শুধু তাঁর পুলিশ ব্যবস্থার জন্য। মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিজে বলেছেন, ট্রম্বেতে মার্কিন রিফাইনারি বসল কারণ জায়গাটা নিরাপদ। কেননা, তা মোরারজী-শাসিত বোম্বাইয়ের অন্তর্ভুক্ত। দেশ এবং বিদেশের আস্থাভাজন পঁয়ষট্টি বছরের মোরারজী এখন ভারতের অর্থমন্ত্রী। একই প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রীসভায় তিনি পঞ্চম অর্থমন্ত্রী। পর পর চারজন মন্ত্রীর প্রতিষ্ঠা আত্মসাৎ করার গৌরবে স্বভাবতই এই দপ্তরটি উত্তরসূরীদের পক্ষে শঙ্কাজনক। এবারের বাজেটের পর নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যায়, মোরারজী তাতে নির্ভয়ে চলাফেরা করতে সমর্থ। কারণ, তাঁর আত্মবিশ্বাস বিগত চারজনের চেয়েই প্রবলতর। তদুপরি অভিজ্ঞতা।

শাসন এবং দেশপ্রেম দু' ব্যাপারেই মোরারজী ভারতের অন্যতম অভিজ্ঞ মন্ত্রী। দরিদ্র স্কুল-মাষ্টারের ছেলে হিসাবে গ্র্যাজুয়েট মোরারজী প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন জীবিকার কারণে। লেগে থাকলে উন্নতিও ছিল অবধারিত। কিন্তু গান্ধীজীর জন্যে তা হল না। মোরারজী চাকরী ছেড়ে গান্ধীশিষ্য

হলেন। ফল—সাকুল্যে ছ' বছর কারাবাস এবং সরকারী দপ্তরে সেক্রেটারীসিপ-এর বদলে মন্ত্রিত্ব। মোরারজী '৪৭ সন থেকেই মন্ত্রী। '৫২ সন থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। '৫৬ সন থেকে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। '৫৮ সন থেকে অর্থমন্ত্রী।

অর্থমন্ত্রী হিসাবে মোরারজী কেমন হলেন বাজেটই তা বলবে। আমি শুধু মুখ্যমন্ত্রী মোরারজীরই গল্প বলছি একটা। মোরারজী বোম্বাইয়ে নিয়ম করলেন—স্কুলে কেউ ফাউণ্টেন পেন-এ লিখতে পারবে না। সবাইকে কাঠের হ্যাণ্ডেল-এ লিখতে হবে। কারণ, নয়ত স্কুলের ছেলেদের মধ্যেও ধনী-দরিদ্র ভেদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। অনেক গার্জেন মনে মনে হাসলেন। কিন্তু মোরারজী কানুন ছাড়লেন না। তাঁর যা কথা তাই কাজ। আর কাজ মাত্রই কর্তব্য।

৫. ৩. ৬০

দেশাই, এম. জে.

বলতে পারেন—রাজধানীতে আজ সবচেয়ে ব্যস্ত মানুষ কে? কেউ হয়ত ভাবছেন—প্রধানমন্ত্রী তথা দেশরক্ষা-মন্ত্রী, কেউ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী; কারও হয়ত মনে পড়ছে—কমিউনিস্ট পার্টির নায়কদের কথা; কারও দূতাবাসের চীনাদের কথা, নয়ত দেশরক্ষা বিভাগের সেই জনৈক মুখপাত্র'টির কথা—ইদানীং প্রতিদিনই যাঁকে দিনান্তে কিছু না কিছু মুখে নিয়ে দেশের সামনে এসে একবার হাজিরা দিতে হয়।

হয়ত তাই। রাজধানীতে সবাই আজ কম-বেশী ব্যস্ত, সক্রিয়। কিন্তু তাহলেও কেন জানি বিশেষ করে বার বার মনে পড়ে ত্রস্ত-ব্যতিব্যস্ত সেই মানুষটির কথা, খবরের কাগজের পাতায় পরিচয় যাঁর পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিব।

পাঁচ মিনিট আগে চেকোস্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রদূত ঘর ছেড়েছেন। তারপরেই এলেন সুপরিচিত মানুষ দীর্ঘকায় গলব্রেথ। তারপর ইউ. এ. আর,—তারপর অষ্ট্রেলিয়া। ইতিমধ্যে হয়ত তিনবার প্রধানমন্ত্রী ফোনে কথা বলেছেন, অধস্তন কোন সচিব দুটো জরুরী তারের খসড়া পড়িয়ে নিয়েছেন,—এবার হয়ত সাংবাদিকেরা আসছেন। মণিলাল জগদীশ দেশাই তবুও প্রসন্নমুখে কাজ করে চলেছেন। তাঁর ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই,—বিরক্তির প্রশ্ন ওঠে না। কেননা,—তিনি ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান

সচিব এবং নয়াদিল্লির পররাষ্ট্র দপ্তর সম্ভবত আজ বিশ্বের সবচেয়ে জরুরী সরকারী অফিস!

কিন্তু মুখ দেখলে মনে হবে দেশাই সবচেয়ে সুখী কর্মী। চলনে-বলনে কোথাও তাঁর বিন্দুমাত্র উদ্বেগের লক্ষণ নেই। এমন দিনেও মানুষটি যে এমন অনায়াসগতি, বলা নিষ্প্রয়োজন, তার একমাত্র কারণ দেশাইয়ের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা।

আমেদাবাদের সন্তান। লেখাপড়া করেছেন—আমেদাবাদ, বোম্বাই এবং লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ। তিন কেন্দ্রেই কৃতী ছাত্র ছিলেন। সুতরাং ১৯২৮ সনে এই কড়াকড়ির দিনেও অনায়াসেই আই-সি-এস হয়ে ঘরে ফিরেছিলেন মণিলাল দেশাই। মণিলালের বয়স তখন চব্বিশ। এখন আটান্ন।

দেশে আরও খ্যাতি অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্যে। '৪৬ সন পর্যন্ত দেশাই ছিলেন বোম্বাই সরকারের অন্যতম সেরা সিবিলিয়ান। বিশেষত, রাজস্ব ব্যাপারে কম জুড়ি ছিল তাঁর। সুতরাং '৪৭ সনে ডাক পড়ল দিল্লিতে। দেশাই নিযুক্ত হলেন সদ্য-প্রতিষ্ঠিত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল। তারপর 'য়ুনো', লণ্ডন হাইকমিশন এবং ফিনল্যাণ্ড, সুইডেন, ডেনমার্কে নানা দায়িত্ব নিয়ে রকমারী দৌত্যের পর '৫৩ সনে শ্রীদেশাইয়ের আবার ডাক পড়ল। তিনি পররাষ্ট্র দপ্তরে কমনওয়েলথ সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন। '৫৪ সনে ক'মাস লণ্ডনে হাইকমিশনারের কাজও করতে হল তাঁকে। তারপর ভিয়েৎনাম কমিশন ইত্যাদি হয়ে অবশেষে শ্রীসুবিমল দত্তের জায়গায় স্থায়িভাবে পররাষ্ট্র দপ্তরে।

এতকাল দপ্তরে শ্রীদেশাইয়ের খ্যাতি ছিল 'পাকিস্তান বিশেষজ্ঞ' হিসেবে,—সন্দেহ নেই এত দিনে এবার তিনি কমিউনিস্ট কূটনীতি সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞে পরিণত হয়েছেন। নয়াচীনের ঠিকানায় পাঠানো নতুন চিঠিগুলো বোধ হয় তাই বলে!

১৫. ১২. ৬২

অ গল, চার্লস

চীন সম্পর্কেই অনেকে অনেক কথা বলেছেন। লেখক, সাংবাদিক, রাষ্ট্রনীতিবিদ—সবাই। কিন্তু অল্প কথায় এশিয়ার এই দেশটি সম্পর্কে চরম সত্য যাঁদের মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁরা দু-একজনই জেনারেল। এবং আশ্চর্য কো-ইনসিডেন্স এই,—

দু'জনই তাঁরা জাতিতে ফরাসী। একজন তাঁদের জেনারেল বোনাপার্টি, অন্যজন—জেনারেল চার্লস দ্য গল। প্রায় দেড়শ বছর আগে নেপোলিয়ান পশ্চিমকে হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন—চীনকে ঘুমাতে দাও। সে যখন জাগবে দুনিয়ার তখন দুঃখ।' গেল সপ্তাহে দ্য গল পূর্বকে (এবং রাশিয়াকেও) হুঁশিয়ার করে বলেছেন, চীন হচ্ছে—

"innumerable············and wretched, indestructible and ambitious, building up by a great effort a power which we cannot measure, and looking around for spaces into which one day···will have to spread itself."

নেপোলিয়ান ইতিমধ্যেই সত্য প্রমাণিত হয়েছেন। উপস্থিত লক্ষণ যা তাতে দ্য গলকেও মেনে না নিয়ে বোধ হয় উপায় নেই আমাদের। কারণ জেনারেল দ্য গল পঞ্চম রিপাবলিকের দ্বিতীয় নেপোলিয়ান। ফরাসী দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে অন্তত তাই। সেই ছোট থেকে বড় হওয়া—সেই সামান্য থেকে অসামান্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়—অবশিষ্ট ইউরোপে দ্য গল ছিলেন ভাগ্যান্বেষী সৈনিকমাত্র। রুজভেল্ট ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন 'নকল জোন অব আর্ক।' বিরক্ত চার্চিল স্বভাবজ কৌতুকে সঙ্গে সঙ্গে নাকি উত্তর দিয়েছিলেন—

"Yes, but my bloody bishops won't let me burn him."

আজ সেই দ্য গল ইউরোপের পঞ্চ প্রধানের একজন। তিনি ইচ্ছে করলে গিরিশৃঙ্গ কাছে আনতে পারেন, ইচ্ছে করলে পারেন কিছুদিন অন্তত দূরে ঠেলে দিতেও। সুতরাং দ্য গল-এর কথা নিশ্চয় একেবারে আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না আজ।

তাছাড়া, দ্য গল—মেজাজে নেপলিয়নের যত কাছাকাছি, মগজে সেই দুর্ধর্ষ এবং স্বপ্নচালিত মানুষটির থেকে ঠিক তত দূরে। নেহরুর চেয়ে বয়সে এক বছরের ছোট হলেও এই ছ'ফুট চার ইঞ্চি দৈত্য-মানবটি মাথায়ও একটি দৈত্য। ইতিহাস, ভূগোল, আধুনিক রাষ্ট্রনীতি ও ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্যে তাঁর মত দখল সমসাময়িক রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে নাকি দুর্লভ। নেহরুজীর মতই সময় পেলে কলম নিয়ে বসা তাঁর নেশা। এবং ইউরোপীয় রসিকদের মধ্যে তাঁর প্রথম জীবনের বই দু'খানা (The Sword's Edge

ধর, ডঃ নীলরতন

এবং The Army of the future) না হলেও দ্য গল-এর স্মৃতিকথাটি নিঃসন্দেহে ফরাসী সাহিত্যে একটি কীর্তি! সুতরাং, এডগার স্নো বা সিম ঁ দ্য বোভ'র কথা যখন আমরা 'কোট্' করি, তখন গায়ে ইউনিফর্ম দেখেই দ্য গলকে বাতিল করে দেব কেন?

তাছাড়া অনেকেই জানেন না,—জেনারেল দ্য গল ফরাসী দেশে না হলেও অন্তত কিছু সংখ্যক ছেলে-মেয়ের কাছে 'চাচা চার্লস!' তাঁদের প্রথম মেয়েটি মারা যাওয়ার পর দ্য গল দম্পতি একটি শিশুসদন খুলেছিলেন। ছুটির দিনগুলো এখনও সেখানেই কাটাতে ভালবাসেন দ্য গল। সঙ্গে থাকে তাঁর তিনটি নাতি-নাতনি, সতেরটি ভাই ঝি, ভাগনের মধ্যে জনাকয় এবং মামি দ্য গল। আর চারপাশ ঘিরে থাকে এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে—যাদের কেউ নেই। এবং যাদের কাছে 'ডিফিকাল্ট জেনারেল' দ্য'গল—'আঙ্কল চার্লস্।'

২১. ১১. ৫৯

ধর, ডঃ নীলরতন

ঘরোয়া আড্ডা।

চার পাশে সব চেনা-জানা বন্ধুরা, মাঝখানে একজন। উস্ক-খুস্ক চুল ও পুরু লেন্সের চশমা ও প্রশান্ত গম্ভীর মুখ। বোঝা যায়,—তাঁকে নিয়েই আলোচনা।

একজন বললেন—'আচ্ছা, সারা জীবন করলেন ত মাস্টারী,—তবে দান করার এত টাকা পেলেন কোথায়?

'—তাইত!' চশমার আড়ালে চোখ দুটি বুঝি হেসে উঠল। গম্ভীর ভাবে তিনি বললেন,—'সে অনেক ব্যাপার।'

—'কেমন?'

—'বলুন না একটু ভেঙ্গেই!' অন্য একজনের আব্দার।

—'তবে বলি,'—তিনি সুরু করলেন—'কত রোজগার করেন আপনি? দেড়শ? মাসে দশ টাকা করে রেখে যান।—বছরে কত হয়? —দশ বছরে?—কুড়ি বছরে?— —সে অঙ্কটাই করে দেখুন না।'

সকলে নির্বাক। লোকটি লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেছে বলে নয়, প্রক্রিয়াটা শুনে।

তবুও দাতা হিসাবে তাঁর পরিচয় নয়,—প্রথম পরিচয় বিজ্ঞানী হিসাবেই।

নাম—ডঃ নীলরতন ধর। জন্মভূমি—যশোর, কর্মভূমি—এলাহাবাদ।

যশোরের সেই ধর পরিবার বাংলা দেশে বিখ্যাত। ভারতের ডাঃ নীলরতনের নাম বিদেশের গুণী মহলে সুখ্যাত। নীলরতন এ কালের ভারতের অন্যতম কৃতী বিজ্ঞানী। জমি, সার, আলো বিষয়ে তাঁর একাধিক গবেষণা আজ জগতের ধন।

জন্ম—১৮৯২ সন। লেখাপড়া—কলকাতা, লণ্ডন এবং পারী। রসায়ন শাস্ত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যশস্বী ছাত্র নীলরতন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস. সি এবং পারীর ডি. ফিল Docteures Sciences। ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার দিন থেকে (১৯১৯) তিনি লণ্ডনের রয়াল ইনষ্টিটিউট অব কেমিষ্ট্রীর ফেলো এবং ভারতীয় এডুকেশন সার্ভিসের সদস্য।

কর্মজীবন সুরু হয়েছিল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেমিষ্ট্রির তরুণ অধ্যাপক নীলরতন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল লেবরেটারীর ডিরেক্টার। এখন তিনি ডিরেক্টার এলাহাবাদের বিখ্যাত 'শীলা ধর ইনস্টিটিউট অব সয়েল সায়েন্স'-এর।

অনেকে জানেন না ভারতের এই একমাত্র মৃত্তিকা গবেষণাগারটি ডঃ ধরেরই একক কীর্তি। এবং যাবতীয় তাঁরই নিজের অর্থে গড়া। শীলা ছিলেন ডঃ ধরের স্ত্রী।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, (প্রস্তাবিত) কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজীবন অকাতরে দান করে আসছেন ডঃ ধর। গবেষনাগারের পরেই দান তাঁর একমাত্র নেশা।

আর এক নেশা বলা যায়,—দেশভ্রমণ। '৫২ সনে দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করেছেন ডঃ ধর। কিন্তু তবুও সে যেন বিরাগীর সংসার। নিঃসন্তান ধর দম্পতি সুযোগ পেলেই বাইরে চলে যান। লণ্ডন, কেম্ব্রিজ, এডিনবরা, পারী, উপসলা! বিভিন্ন বিজ্ঞান কেন্দ্রে বক্তৃতা, নানা লোকের সঙ্গে মেলা মেশা। ডঃ ধর এলাহাবাদে আদর্শ সজ্জন বাঙালী, বিদেশে জনপ্রিয় ভারতীয়।

নন্দ, গুলজারিলাল

এলাহাবাদে মৃত্তিকা গবেষনাগারের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান ডঃ নীলরতন ধর এবার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করছেন। ইতিপূর্বে '২২ সনে একবার তিনি কংগ্রেসের রসায়ন শাখার সভাপতিত্ব করেছেন। এবার বসলেন—মূল সভাপতির আসনে।

এই সম্মান তাঁর বহুদিনের প্রাপ্য। তবুও বাংলা দেশের কানে সংবাদটা সুখকর। কেননা, আজীবন প্রবাসী হয়েও ডঃ ধর আজও যশোরের বাঙালী। বাংলা দেশ এখনও তাঁর ধ্যান। মনে রাখতে হবে বহুভাষাবিদ ডঃ ধরের অন্যতম বই দুটি বাংলা দেশের জন্যেই বিশেষ করে লেখা। একটি তার—'আমাদের খাদ্য', অন্যটি—'জমির উর্বরতা বৃদ্ধি।' বলা বাহুল্য দুটিই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্যে। শুধু ভাষা নয়, দামটাও। মূল্য—প্রতিটি আট আনা।

৫. ১. ৬১

নন্দ, গুলজারীলাল

মাথায় গান্ধী টুপি, মুখে পশ্চিম ভারতের গাঁয়ের মানুষের মত ঠোঁটের প্রান্ত ছাড়িয়ে আধ-পাকা আধা-ছাঁটা মোটা গোঁফ। ভাল ক্যামেরাম্যান-এর দামী ক্লোজ-আপ লেন্স খুঁজে হয়রান হয়ে গেলেও অসমান মুখটির কোথায়ও আভিজাত্যের কোন আভাস পাবে না,—হয়ত চশমার তলায় প্রতিভার সেই তথাকথিত দ্যুতিও ধরা পড়বে না। চেহারা এবং চালচলনে ভারতের নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ এই বছর বয়সেও একান্তভাবেই শ্রমিকের প্রতিনিধি, যেন তাঁদেরই কেউ। স্থায়ী ঠিকানা তাঁর এখনও—মণিনগর, আমেদাবাদ।

আমেদাবাদের সুখ্যাত শ্রমিক নেতা শ্রীগুলজারীলাল নন্দ যেমন কেবলই শ্রমিক নেতা নন, তেমনি তিনি বোম্বাই তথা মহারাষ্ট্রেরও সন্তান নন। বাবা বুলাকিরাম নন্দের ভদ্রাসন ছিল শিয়ালকোট, পাঞ্জাব। গুলজারী-লালের জন্ম সেখানেই। লেখাপড়া প্রথমে লাহোরের বিখ্যাত ফোরম্যান

ক্রিশ্চিয়ান কলেজে, তারপর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এলাহাবাদের এম, এ এবং এল. এল. বি. শ্রীনন্দ ১৯২১ সন থেকে সক্রিয় কংগ্রেসসেবী। বোম্বাই এসেছিলেন তিনি ন্যাশনাল কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে। নন্দ সেখানে ইকনমিকস পড়াতেন। রাজনীতি করতেন আমেদাবাদে কাপড়কলের শ্রমিকদের মধ্যে। ১৯২২ সন থেকে তিনি সেখানে নায়ক।

১৯৫১ সনে দিল্লির দরবারে যোগ দেওয়ার আগে ১৯৩৭ সন থেকে শ্রীনন্দ বোম্বাই মন্ত্রিসভায় পুরানো মুখ। পার্লামেণ্টরী সেক্রেটারীর পদ ছাড়াও সেখানে তিনি বেশ কিছুদিন মন্ত্রিত্ব করেছেন। তাছাড়াও হাউসিং বোর্ড, আমেদাবাদ শহর মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি। বোম্বাই মন্ত্রিসভায়ও তাঁর দপ্তর ছিল হাউসিং এবং লেবার। ১৯৪৭ সনের মে মাসে যাঁরা জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের জন্ম দিয়েছিলেন, বোম্বাইয়ের তৎকালীন শ্রমমন্ত্রী শ্রীনন্দ তাঁদের অন্যতম।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শ্রীনন্দ সূচনা থেকেই পরিকল্পনা মন্ত্রী। অর্থনীতির ছাত্র নন্দ পরিকল্পিত অর্থনীতি বিষয়ে চিরকাল উৎসাহী। সুভাষচন্দ্রের অধিনায়কত্বে কংগ্রেস যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেছিল শ্রীনন্দ ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। তাছাড়া খাদি, গ্রামীণ অর্থনীতি এবং পরিকল্পনা বিষয়ক গুটিকয় বইয়ের লেখক শ্রীনন্দ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ইকনমিক প্রোগ্রাম কমিটিরও সদস্য! স্বভাবতই পরিকল্পনা কমিশনেও শ্রীনন্দই ক্রমে অধিকতর দায়িত্বশীল ব্যক্তি। শ্রম কর্মসংস্থান এবং পরিকল্পনা দপ্তর ছাড়াও ১৯৬০ সনের জুলাই থেকে তিনি পরিকল্পনা কমিশনের সহ-সভাপতি।

এবার আরও ওপরে। শ্রীনন্দ, তদুপরি, ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কার্যত, সব দিক থেকেই আজ তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় দ্বিতীয় ব্যক্তি। শ্রীনন্দ ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সাময়িকভাবে অন্যান্য দপ্তরও (যথা: সেচ বিদ্যুৎ) পরিচালনা করেছেন বটে, কিন্তু ঠিক এ ধরনের কাজে সম্ভবত এই তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতা। আশা করা যায়, এক্ষেত্রেও তিনি বিফল হবেন না। কেননা, ধীরমতি, স্বল্পবাক সাদাসিধে ধরনের মানুষ শ্রীনন্দ শুধু আদর্শনিষ্ঠ নন, তিনি কাজের মানুষও।

উপসংহারে শ্রীনন্দের আদর্শনিষ্ঠা সম্পর্কে দু'-একটি খবর। লবণ সত্যা-

নাইডু, পদ্মজা

গৃহী, এককালে খাদি অর্থনীতিতে বিশ্বাসী ভারত মজদুর সেবক সংঘের নেতা শ্রীনন্দ কংগ্রেসের খিচুড়ীর হাঁড়িতে নাকি 'আদা', কেননা তিনি 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ফোরাম'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু শ্রীনন্দ কি সোস্যালিস্ট ? সম্ভবত সোস্যালিস্টরা মাথা নাড়বেন। কেননা, শ্রীনন্দ কোন-দিন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না, এবং কমিউনিস্টরা বলবেন, বিস্তর দেশ ঘুরলেও যুগোশ্লাভিয়া ছাড়া বোধহয় কোন 'সোস্যালিস্ট' অর্থনীতির প্রয়োগ ফল তিনি চোখে দেখেন নি। তাছাড়া, অনেকে বলেন, শ্রীনন্দ সনাতনপন্থীও বটেন। শুধু ভারত সেবক সমাজ নয়, ভারত সাধু সমাজেরও নেতা এবং যোগাভ্যাস তাঁর অন্যতম নেশা।

তবে বলে রাখা ভাল, সন্ন্যাসীদের নেতা হলেও ভারতের নতুন হোম-মিনিস্টার গৃহী, তিনি দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যার পিতা। তাঁর পত্নীর নাম—শ্রীমতী লক্ষ্মী। ৫. ৯. ৬৩

নাইডু, পদ্মজা

"Lotus-maiden,
you who claim
All the sweetness
of your name,
Lakshmi, fortune's queen,
defend you,
Lotus-born like you, and
send you
Balmy moons of love to
bless you······
Lotus-maiden, may you be
Fragrant of all ecstasy."

মেয়ের উদ্দেশে কবিতা লিখে-ছিলেন মা :—'ভারতের বুলবুল' সরোজিনী নাইডু। মায়ের কোলে প্রথম কন্যাসন্তান। সরোজিনী আদর করে নাম দিয়েছিলেন তার 'বিবি'। কিন্তু এ নাম তো আর বাইরে চলে না। অনেক ভেবে কবি মেয়ের দ্বিতীয় নাম রাখলেন—পদ্মজা। তারপরই এই কবিতা,—লোটাস-মেডেন,—মে ইউ বি··· !"

মায়ের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করেছেন 'বিবি'। চলনে-বলনে, রুচিতে আদর্শে—তিনি আজ অনেকের কাছেই দ্বিতীয় সরোজিনী নাইডু। মায়ের মত যদিবা না হন, 'মায়ের-মেয়ে' অবশ্য। সেটুকুও কম কথা নয়। বিশেষত যে পরিবারে তাঁর জন্ম সেখানে মাকে বাদ দিলেও বিখ্যাত নাম অনেক। তার মধ্যে নিজের নামটিকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা সহজ কাজ নয়। পদ্মজার পক্ষে নানা কারণে সে দিন সেটা আরও কঠিনতর।

জন্ম—১৯০০ সনের ১৭ই নভেম্বর। **জন্মস্থান**—সে-ই হায়দরাবাদ। লেখাপড়াও অতএব, শুরু হয়েছিল সেখানেই। মেয়েকে হায়দরাবাদে মাবুবিয়া গার্লস হাই-স্কুলে পাঠিয়েছিলেন সরোজিনী। কিন্তু পদ্মজা সেখানকার পড়াও শেষ করতে পারেননি। কারণ—স্বাস্থ্য হীনতা। ছোটবেলা থেকেই পদ্মজা রোগা মেয়ে। স্কুল-আমলে তিনি আরও ভেঙ্গে পড়লেন। ফলে স্কুলের বদলে পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে হল বাড়িতে। প্রচুর বই ছাড়াও সেখানে অনেক শিক্ষণীয়। বিশেষত নাইডুদের বাড়িতে তখন বিরাট এবং বিখ্যাতদের আনাগোনা লেগেই আছে। কিশোরী মেয়ে পদ্মজা তাঁদের সঙ্গকেও পাঠ্য বলে বুঝতে শিখলেন। গান্ধীজী তাকে আদর করে আপন করে নিলেন, নেহরুর সঙ্গেও তার দিব্যি চেনাজানা। তদুপরি মায়ের সঙ্গে দেশভ্রমণ। অতএব স্কুল ছাড়লেও বিকল্প হিসেবে যা পাওয়া গেল সে অনেক।

এই বিশেষ শিক্ষার ফল পেতেও দেরী হল না। অচিরেই দেখা হল সরোজিনী নাইডুর এই কন্যাটি হায়দরাবাদে সমাজসেবিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ডঃ বি, রামকৃষ্ণ রাও, নবাব আলি ইয়ার জং প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে তিনি একটি সংস্থা গড়েছেন। নাম তার—'সোসাইটি অব ইউনিয়ন অ্যাণ্ড প্রোগ্রেস।' উদ্দেশ্য: হিন্দু মুসলিম সাংস্কৃতিক মিলন। পদ্মজাই সেদিন উদ্যোগী হয়ে প্রিন্স অব বেরারের স্ত্রী প্রিন্সেস দুরি শাহওয়ার আর নিজাম-বাহাদুরের আর এক পুত্রবধু নিলফারকে পর্দা সরিয়ে জনতার সেবায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

হায়দরাবাদের হিন্দু-মুসলমান গরীব মেয়েদের মধ্যে পদ্মজা নাইডু একটি সুপরিচিত নাম। শহরে সমাজ উন্নয়নমূলক নানা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ছাড়াও তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সেদিন গ্রামাঞ্চলে কুটিরশিল্প সম্পর্কে নানা পরিকল্পনা চালু করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেই কৃতিত্বের স্মারক হিসেবে হায়দরাবাদ হ্যাণ্ডিক্র্যাফট অ্যাডভাইসারী বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছিল তাঁকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য দক্ষিণে রাষ্ট্র-পতির ভবন 'রাষ্ট্রপতি নিলয়ম'-এর সমুদয় সজ্জাপরিকল্পনা পদ্মজার নিজের। ঘরের রং পর্দা আসবাব থেকে ছাইদানটি পর্যন্ত তিনি নিজে

সব সাজিয়েছেন। তবে কলানুরাগী পদ্মজার খ্যাতি তার চেয়েও বেশী হায়দরাবাদে জনসেবী হিসেবেই।

হায়দরাবাদে পুলিশ অভিযানের ক'বছর আগেও দেখা গেছে অসুস্থ পদ্মজা গরুর গাড়ি চড়ে সুদূর মাচিরে-ডিপল্লীর দিকে চলেছেন। গাঁয়ের-মানুষের-আপনজন সরোজিনী নাইডুর কন্যা খবর পেয়েছেন সেখানে গ্রাম-বাসীদের ওপর হামলা হচ্ছে, মেয়েরা অত্যাচারিত হচ্ছেন। পদ্মজা সেক্ষেত্রে নীরব থাকার মত মেয়ে নন। ১৯২১ সনে হায়দরাবাদে যাঁরা জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত করেছিল তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম; ১৯৩০ সনে বিদেশী পণ্য বর্জনের আন্দোলনের জন্য যখন স্বদেশী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও তার অন্যতম উদ্যোক্তা। '৪২ সনে কিছুদিন অন্তরীণ পর্যন্ত রাখা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু পদ্মজা তবুও চিরকাল কানে কান্না পৌছান মাত্র চঞ্চল।

পুলিশ অভিযানের পরেও একই সেবিকার ভূমিকায় দেখা গেছে তাঁকে। হায়দরাবাদবাসী কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি হিসেবে সম্মান জানিয়েছিল তাঁকে প্রথমে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য মনোনীত করে, তারপর ১৯৫০ সনে হায়দরাবাদের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে লোক সভায় পাঠিয়ে। লোকসভায় পদ্মজার বাগ্মিতা সেদিন অনেককেই সরোজিনী নাইডুর কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিল। পদ্মজার বক্তৃতা-ভাষণ এখনও বহু কানেই সরোজিনী নাইডুর দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর যেন।

'৫০ সনে মায়ের সঙ্গে লখনউ চলে গিয়েছিলেন তাঁর আদরের 'বিবি'। বাসনা ছিল—মা যতদিন বেঁচে থাকেন তাঁর কাছে থেকে দেখাশুনা করবেন। হঠাৎ একদিন আকস্মিকভাবে সরোজিনী শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। পদ্মজা সেদিন এলাহাবাদে। মা-ই পাঠিয়েছিলেন ওঁকে, এগিয়ে গিয়ে রাজাজীকে নিয়ে আসতে। পদ্মজার জীবনে সেদিনটি ভুলবার নয়।···মায়ের পর বাবা। সেই শোক সামলাতে না সামলাতে এল সেই অপ্রত্যাশিত আহ্বান—বাংলায় যেতে হবে। সে ১৯৫৬ সনের কথা।

শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু সেই থেকে বাংলায়ই আছেন। সুসংবাদ আগামী পাঁচ বছরও তিনি আমাদের মধ্যেই কাটাচ্ছেন। সরোজিনী নাইডু নিজেকে 'বাংলার মেয়ে' বলতেন। পদ্মজাও আজ সম্পূর্ণত

তাই। তিনি শুধু এই রাজ্যের জনপ্রিয় রাজ্যপাল নন ততোধিক—নিজেদের ঘরের মেয়ের মত। বলা নিষ্প্রয়োজন পদ্মজা এ পরিচয়টিও অর্জন করেছেন তাঁর অসাধারণ প্রতিভা আর হৃদয়ের বলে। তিনি বাঙালী উদ্বাস্তুদের মধ্যে ঘুরে বেড়ান, তিনি কলকাতার আবর্জনা সাফাইয়ের তদারকি করেন, তাঁর বাড়িতে বসে শহরের মেয়েরা জওয়ানদের জন্যে উল্ বোনেন···অসুস্থ ডাঃ রায়কে তিনি শয্যাপার্শ্বে থেকে ঔষধ খাওয়ান। রোগী কথা না শুনতে চাইলে তিনি কপট হুকুম শোনান—আমি গভর্নর বলছি—। পশ্চিম-বাংলার রাজ্যপাল আজ বাংলাদেশে রীতিমত প্রবাদ।

বাঙালী সরোজিনী নাইডুর কন্যাকে হৃদয়ে আসন দিয়েছে সন্দেহ নেই। পদ্মজাও তেমনি ভালবেসে ফেলেছেন বাংলাকে। তার প্রমাণ তাঁর এই তৃতীয় বারের মত রাজ্য-পালের দায়িত্ব গ্রহণ। কলকাতা যাত্রার আগে পদ্মজা বলেছিলেন—যদি ভাল না লাগে তবে কিছুতেই এক বছরের বেশী থাকছি না!

১০. ১২. ৬৪

নারলিকার, ডঃ জয়ন্ত বিষ্ণু

'ইট ইজ এ ফিয়ার্স থিয়োরি—ফিয়ার্সার ধ্যান আইনস্টাইন!'—বলেছেন হয়েল। রয়াল সোসাইটির অনেক বিজ্ঞ এবং মান্য শ্রোতারও তাই অভিমত। স্পষ্টতই তারা কেউ কেউ স্তম্ভিত, কেউ কেউ বিমূঢ়। সুতরাং সে প্রসঙ্গ থাক। আইনস্টাইন নিউটনের সঙ্গে ওঁদের সঠিক পার্থক্য কোথায় বা কতখানি—সে মামলার ফয়সলা যাঁরা করবার তাঁরাই করবেন। আমাদের কাছে তার চেয়েও উত্তেজনাকর খবর গত ১১ই জুন রাত্রে বৃটেনের রয়াল সোসাইটিতে যে দু'জন বিজ্ঞানী বিশ্বের জ্ঞানীজন-দের যুগপৎ আলোড়িত এবং বিচলিত করেছেন তাঁদের একজন আমাদেরই ঘরের ছেলে।—আপেল কেন মাটিতে পড়ে? সেই পুরানো প্রশ্নের নতুন,—শুধু নতুন নয়, অভিনব এই উত্তরটির পেছনে যতখানি কৃতিত্ব বিখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্রেড হয়েল-এর ঠিক ততখানিই ডঃ জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকারের। তিন ছত্রের যে অঙ্কটি আগামী ক'মাস হয়ত ক'বছর পৃথিবীর নানা প্রান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে, গবেষণা-গারে অগণিত প্রবীণ নবীনের কপালে

চিন্তার রেখা ফোটাবে—রয়াল সোসাইটির বোর্ডে খড়ির লিখনে তিনিই সেগুলো সাজিয়েছিলেন ! সে যেন বিশ্ব-বিস্তীর্ণ ব্ল্যাকবোর্ডে স্বদেশেরই নাম লিখে দেওয়া। রমন-রামানুজ, জগদীশচন্দ্র সত্যেন্দ্রনাথের পরে তিনিই আমাদের আবার বিজ্ঞানের দুনিয়ায় তুলে ধরলেন !

*　　*　　*

নাম জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার। বয়স মাত্র ছাব্বিশ (জন্ম ১৯শে জুলাই, ১৯৩৮)। জন্মস্থান—কোলাপুর। লেখাপড়া—বেনারস। কেননা, সেখানেই ছিল বাবার কর্মস্থল। বাবা ভি. ভি. নারলিকার কেম্ব্রিজের এম, এ (১৯৩০) এবং রেংলার। তিনি ভারতের প্রথম শ্রেণীর গাণিতিকদের একজন। দীর্ঘকাল বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন তিনি। কিছুকালের জন্য প্রোঃ চ্যান্সেলারও করা হয়েছিল তাঁকে। ১৯৬০ সনে অবসর গ্রহণের পর ঠিকানা বদল করে তিনি রাজস্থানবাসী হয়েছেন। আটান্ন বছরের প্রবীণ বিজ্ঞানী এখন সেখানে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান।

পুত্র জয়ন্তের গণিত-দীক্ষা হয়েছিল বাবার কাছেই। এখনও বাবাই তাঁর প্রথম গুরু। রয়াল সোসাইটিতে পড়ার পরক্ষণেই ওঁদের তত্ত্বের একটা কপি তিনি বাবার কাছে পাঠিয়েছেন। কেননা, জয়ন্ত বলেন—পৃথিবীতে যে ক'জন আমার এই গণিত সহজে ধরতে পারবেন আমার বাবা তাঁদের একজন। জয়ন্তর দ্বিতীয় প্রেরণা বলা চলে তাঁর মাকে। মাও সুশিক্ষিতা। তিনি বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্রী। সংস্কৃতে স্নাতক হলেও সমান অধিকার তাঁর ক্লাসিক্যাল ইংরাজী সাহিত্যে। তাঁর প্রেরণায় এই বয়সেই পুরো 'গীতা' জয়ন্তর কণ্ঠস্থ। গণিতের থিয়োরি ব্যাখ্যা করতে সুযোগমত হামেশাই তিনি নাকি গীতার শ্লোক আওড়ান !

স্কুলে আগাগোড়া তুখর ছাত্র ছিলেন। কলেজেও। বিশেষত, গণিতে। মা বলেন—ওর বরাবরের অভ্যেস কাগজ পেন্সিল এড়িয়ে চলা। চোখ বুঁজে মনে মনে অঙ্ক ভাবতেই বেশী মজা পেত জয়ন্ত। কিন্তু তা হলেও নম্বরে ঘাটতি পড়েনি কোনদিন। ১৯৫৭ সনে বি. এস. সি'তে ডিস্টিংশন সহ প্রথম স্থানই রেখে-ছিলেন জয়ন্ত। তারপর থেকেই তরুণ নারলিকার বাবার সেই প্রিয় বিদ্যালয়

কেম্ব্রিজে প্রবাসী। প্রথম ভর্তি হয়েছিলেন কেম্ব্রিজের ফিজউইলিয়ম হাউস-এ। সেখানে গণিত, ফিজিক্স এবং স্ট্যাটিসটিকস্ পড়তেন। তারপর সেখান থেকে গণিতে 'ট্রাইপস' নিয়ে গত বছর এসেছেন কিংস কলেজে। জয়ন্ত এখন সেখানে 'ফেলো'। একাজের বর্তমান মেয়াদ ১৯৬৭ অবধি। কিংস কলেজে যোগ দেওয়ার আগে গত বছর কিছুদিন তিনি ফিজ উইলিয়াম হাউসে গণিত শিক্ষার ডাইরেক্টরের আসনে ছিলেন। সেই সময়টুকুতে আর একটি উপরি রোজগার করে ফেলেছেন এই মেধাবী তরুণ, কেম্ব্রিজ থেকেই দর্শনে তিনি 'ডক্টরেট' আদায় করে নিয়েছেন। এবার আদায় করলেন সেই সুদুর্লভ বস্তু,—বিজ্ঞান জগতে প্রকৃত বিতর্ক হিসেবে বিশ্বের স্বীকৃতি!

হয়েল আর নারলিকার; নারলিকার আর হয়েল! বিশ্বময় বিজ্ঞানী মহলে আজ ওঁরাই আলোচ্য। বিশেষত, নারলিকারকে নিয়ে আজ আর বিস্ময়ের সীমা নেই। হয়েল সুপরিচিত। বিজ্ঞানী হিসেবে যেমন, মানুষ হিসেবেও তেমনি। বয়স মোটে আটচল্লিশ বটে, কিন্তু ইতিমধ্যেই ইউরোপে পরিচয় তাঁর 'আধুনিক রেঁনেশা-ম্যান।' তিনি দুরূহতম তত্ত্বাবলী ঘাটতে ঘাটতেই ফুটবল খেলা দেখেন, পাহাড়ে চড়েন, একের পর এক বেস্ট-সেলার (সায়েন্স ফিকশান) বাজারে ছাড়েন, জে বি প্রিস্টলের মত লোকের সঙ্গে বসে নাটক লেখেন, অপেরার জন্যে গীতি-নাট্য,—এবং কি নয়! কেম্ব্রিজের অ্যাস্ট্রোনমির এই অধ্যাপক তাই জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি। কিন্তু নারলিকার তা নন। ক'দিন আগেও অজ্ঞাত-পরিচয় এই ভারতীয় অখ্যাত একজন গবেষক মাত্র। তাছাড়া বয়সেও তিনি বলতে গেলে প্রায় 'বালক'। আইনস্টাইন তাঁর থিওরি যখন প্রতিষ্ঠিত করছেন (১৯১৬) তখন তাঁর বয়স সাঁইত্রিশ, আমাদের সত্যেন্দ্রনাথ যখন বাইরের পৃথিবীতে যথার্থভাবে পরিচিত হয়েছেন তখন তিনিও বোধ হয় তিরিশ, অথবা প্রায়-তিরিশ। আর নারলিকার? আলোড়নকারী একটি তত্ত্বের অন্যতম জনক হয়ে তিনি যখন বিশ্বের সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন বয়স তাঁর মোটে ছাব্বিশ! সম্ভবত, বিজ্ঞানের এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে তাঁর চেয়ে তরুণ বয়সে মাত্র আর একজন মানুষই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সক্ষম হয়ে-

ছিলেন। তিনিও কেম্ব্রিজেরই ছাত্র এবং এই রয়াল সোসাইটি ছিল তাঁর মঞ্চ। প্রাতঃস্মরণীয় সেই অতুলনীয় প্রতিভাধরের নাম—নিউটন!

* * *

শুধু গবেষণার বিষয়বস্তুতে ঐক্য নয়,—সত্যাবিষ্কৃত এই ভারতীয় বিজ্ঞানী নাকি চালচলনেও চিরকালীন সেই ব্যক্তিত্বগুলোর লক্ষণাক্রান্ত। এক জোড়া মোটা ভুরু, কালো বড় বড় দুটো চোখ,—একমাথা কালো চুল;—এছাড়া জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকারের দেখবার যা আছে সে নাকি তাঁর পরিচ্ছন্ন হাসি আর অপরিচ্ছন্ন বেঢপ প্যাণ্টকোট! শুধু পোষাকে নয়, ওঁর নাকি গণিত আর গবেষণা ছাড়া অন্য কিছুতেই মন নেই। না খেলাধূলায়, না তরুণসুলভ আমোদ আহ্লাদে। জয়ন্ত মদ খান না, সিগারেট খান না, কেম্ব্রিজের বিখ্যাত বাইচখেলায় যান না। অবসরে তিনি কখনও কখনও সি পি স্নো'র নভেল পড়েন, কখনও ওডহাউস, শার্লক হোম কিংবা ডব্লিউ ডব্লিউ জ্যাকব। কিন্তু এতদিন বৃটেনে থাকলে কি হবে, তিনি আইয়ান ফ্লেমিং-এর নাম পর্যন্ত জানেন না। তার চেয়েও শুনবার মত খবর—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত দিস্তা দিস্তা কাগজ নষ্ট করেন যে বিজ্ঞানী কোনদিন ভুলেও নাকি তাঁর ইচ্ছা হয়নি একবার 'ইউরেকা' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন!

প্রশ্নঃ জয়ন্ত কবে ফিরছেন? বছর তিনেক আগে একবার মা বাবাকে দেখে গিয়েছেন দু'ভাই (ওঁর একমাত্র ভাই অনন্তও কেম্ব্রিজে আছেন। সুতরাং এই মুহূর্তে আবার ছুটে আসার প্রশ্ন ওঠে না। তিনি জানিয়েছেন—ফিরছি '৬৭ সনের পরে, অর্থাৎ কেম্ব্রিজের মেয়াদ শেষ করে। —কিন্তু এই কেম্ব্রিজ, এই সহকর্মিদল গবেষণাগার,—শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরতে পারবেন কি? বাবা বলেন—অবশ্য জয়ন্ত অনেক আগেই এদেশের ছেলে হয়ে আছে। '৬১ সনে ইতালীতে এক বিজ্ঞান সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল সে কেম্ব্রিজের হয়ে, কিন্তু গত বছর কুসংস্কার এবং জাতিবৈষম্য উচ্ছেদকল্পে 'ইউনেস্কো' যে সম্মেলন ডেকেছিল জয়ন্ত ছিল তাতে ইণ্ডিয়ান ডেলিগেট। মা বলেন শুধু কি তা?—এই দেখ ছবি। পাশেই থাকেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ই. এম. ফ্রস্টার। জয়ন্ত তাঁর সঙ্গে ফটো তুলে পাঠিয়েছে,—মাথায় পাগড়ি, গায়ে তার আমাদেরই পোষাক।

২৫. ৬. ৬৪

[১৯৬৫ সনে প্রজাতন্ত্র দিবসে ডঃ নারলিকার রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন।

নারায়ণ, জয়প্রকাশ

মনে হয় কোন নব্য মুশকিল-আসান, কাঁধে (অদৃশ্য) মস্ত শ্বেত-পতাকা, হাতে শান্তি চিরাগ। নিশানে নিশানার অভাব নেই—হাঙ্গেরী, তিব্বত, গোয়া, কাশ্মীর, জামসেদপুর, নাগাল্যাণ্ড,—আকসাই-চীন সর্বঘটে তিনি বিরাজমান। আবার আজ উত্তর রোডেশিয়ায় পিস্-মার্চ, কাল ইন্দোনেশিয়ার বন্দিমুক্তি পরশু নেপালের পঞ্চায়েত, তার পরদিনই হয়ত বা অন্য কোন মহৎ উপলক্ষ্যের লক্ষ্যে আরও দূরবর্তী কোন স্থানে। অত্যন্ত সহানুভূতিশীল দর্শকও স্বীকার যাবেন,—এমন যোদ্ধা কল্পকাহিনীতেও কদাচিৎ মেলে!

নেহরুজী নিজেই নাকি বলে-ছিলেন একবার (১৯৪৮)—'জয়প্রকাশ ইজ দি ফিউচার প্রাইম মিনিস্টার অব ইণ্ডিয়া।' গান্ধীজী নাকি বলেছিলেন —'গ্রেটেস্ট মার্ক্সিস্ট অব ইণ্ডিয়া।' মার্কসবাদীরা তৎকালে (অর্থাৎ ১৯৪০ সনের আগে) ব ল তে ন—"ইণ্ডিয়ান লেনিন।" সোস্যালিস্টরা বলতেন (১৯৪৮ সনের আগে)—'এশিয়ার পহেলা নম্বর সোস্যালিস্ট।' এবং কোন কোন গান্ধীপন্থী নাকি বলেন (১৯৫১ সনের পর থেকে)—"জে পি ভারতের শ্রেষ্ঠ গান্ধীবাদী।" অথচ জয়প্রকাশ নিজে বলেন—"আমি রাজনীতিক নই। নাউ আই অন্‌লি ট্রাই টু ডু হোয়াট ইজ রাইট। দি রেস্ট মাস্ট টেক কেয়ার অব ইট-সেলফ!"

তবুও যে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ থেকে থেকেই গুরুতর রাজনীতিকের ভঙ্গিতে এখানে-ওখানে উঁকি মারেন তার কারণ সেটাই বরাবরের স্বভাব। তাঁর মত আর কোন ভারতীয় রাজ-নীতিক বোধ হয় মনে মনে এত প্রাসাদ গড়েননি, এবং ভাঙেননি। জয়প্রকাশ নারায়ণ সেদিক থেকে ক্ষণে ক্ষণে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আদর্শ-বাদী হয়েও শেষ পর্যন্ত এক আশ্চর্য অ্যামেচার। রাজনীতিতে নেমে এক জীবনে তিনি যত কৌতুক করেছেন তেমন বোধ হয় আর কেউ নয়। সেদিক থেকে সমস্ত জয়প্রকাশের জীবন রীতিমত বর্ণাঢ্য।

জন্মেছিলেন বিহারের সীতাবদি-য়াড়া নামে ছোট্ট এক গাঁয়ে (১১ই অক্টোবর, ১৯০২ সন) এক কায়স্থ

ঘরে। বাবা সেচ বিভাগে সামান্য কাজ করতেন। ছেলে স্কুলে পড়ত। জয়প্রকাশের বয়স তখন মাত্র আঠার এমন সময় হঠাৎ জেলায় এসে উপস্থিত হলেন গান্ধী স্বয়ং। তরুণদের তিনি ইংরেজের গোলামখানা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে আহ্বান জানালেন। জয়প্রকাশ স্কুল থেকে বাড়ি চলে এলেন। তারপর ১৯২২ সনের আগস্টের এক দিনে কলকাতা থেকে পাড়ি জমালেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। উদ্দেশ্য: সেখানে নিজে রোজগার করে পড়বেন। দুটোই করেছিলেন সেদিন জয়প্রকাশ। তিনি মার্কিন দেশের নানা স্থানে দীর্ঘ সাত বছর ধরে কলকারখানায় ক্ষেতেখামারে নানা কাজ করেছেন এবং কলম্বাস থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন,—এম-এ পড়েছেন। কিন্তু সম্ভবত তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই জয়প্রকাশ সেখানেই কম্যুনিস্টতন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। পথ খরচা জোগাড় করতে পারলে এবং সময়মত শ্বশুরমহাশয়ের ঘনিষ্ঠ বান্ধব জনৈক রাজেন্দ্র প্রসাদের সাবধান বাণীটি এসে হাতে না পড়লে ("ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ হবে ভারতে, —রাশিয়ায় নয়।") তিনি সেদিন রাশিয়ায়ই চলে যেতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জয়প্রকাশ বিয়ে করেছেন বিদেশযাত্রার আগে,—বয়স যখন কুড়ির নীচে।

সাত বছর বিদেশে কাটিয়ে ১৯২৯ সনের সেপ্টেম্বরে জয়প্রকাশ দেশে ফিরলেন। পরের বছর জানুয়ারীতেই কংগ্রেসে যোগ দিলেন কট্টর কম্যুনিস্ট। বন্ধু নেহরু তরুণ সোস্যালিস্টকে শ্রমিক দপ্তরের দায়িত্ব অর্পণ করলেন। ১৯৩৪ সনের ১৭ই মে ভূমিষ্ঠ হল কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি। তৎ-কালের বিখ্যাত "আগুন খেকো" জয়প্রকাশ নারায়ণের পরবর্তী কাহিনী সকলের জানা। প্রথমে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে দোস্তি, পরক্ষণেই সব খুইয়ে ছাড়াছাড়ি। '৪০ সনের এপ্রিলে সোস্যালিস্ট পার্টি থেকে কম্যুনিস্টরা বিদায় হল। বিদ্রোহী জয়প্রকাশ প্রবল গৌরবে বিয়াল্লিশের বিদ্রোহ চালালেন। তিনি কখনও ২২ ফুট দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে জেল থেকে (হাজারিবাগ জেল, ৮ই নভেম্বর ১৯৪২), কখনও নেপাল সীমান্তে পুলিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ সমর চালাচ্ছেন। তৎকালে জীবিত বা মৃত অবস্থায় দশ হাজার টাকা তাঁর মাথার মূল্য।

'৪৮ সনে কংগ্রেস ত্যাগ করার পর থেকে সে মাথার দাম লোকচক্ষে ক্রমেই যেন কমতির দিকে। জয়-প্রকাশ তখন "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়" শ্লোগানে আস্থাবান। তখনও তিনি তাঁর দশ হাজারী "ফ্রিডাম ব্রিগেড" মাধ্যমে জনতার রাজ কায়েমের স্বপ্ন দেখেন। দু'বছর পরেই শোনা গেল জয়প্রকাশ মত বদল করছেন। তিনি এমনকি সমাজতন্ত্রে পর্যন্ত যথেষ্ট নির্ভরতা খুঁজে পাচ্ছেন না। কিছুদিন কাটল যুগোশ্লাভিয়ার "নব্য-তন্ত্রে"র মায়ায়, তারপর '৫২ সনে সর্বোদয়ের স্নিগ্ধ ছায়া। '৫৪ সনে জয়প্রকাশ সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন—আর দল নয়, রাজনীতি নয়,—এবার থেকে ভূদান আমার একমাত্র ধ্যান।

ইদানীং সে ধ্যানেও শান্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেননা, পৃথিবীতে অনেক ত্রুটি, সেখানে পলায়ন সম্ভব হলে, মোক্ষ কেউ আটকাতে পারে না। জয়প্রকাশ তাই অবশেষে নবরূপ ধারণ করেছেন। কখনও তিনি আন্তর্জাতিক শান্তি ব্রিগেড গড়ছেন, কখনও আয়ুবের ছক ধার করে ভারতের জন্যে বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নক্সা কাটছেন, কখনও ভারতের তথাকথিত লুপ্ত আত্মার সন্ধানে দাঙ্গার ছাই ঘাটছেন, কখনও তিনি নাগাল্যাণ্ডে,—কখনও কাশ্মীরে।

নাগাল্যাণ্ডের তথাকথিত শান্তি-যজ্ঞ জমতে না জমতে নতুন সুসমাচার আওড়াতে শুরু করেছেন জে. পি। তিনি আকসাই চীনকে ভূদানের তালিকায় তুলেছেন। এবং তার পর-ক্ষণেই কাশ্মীর উপত্যকা মাথায় নিয়ে পিণ্ডিযাত্রার উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছেন। জয়প্রকাশ নিঃসন্দেহে—অনির্বচনীয়।

২০. ৮. ৬৪

নাসের, গামাল আবদেল

কায়রোর আকাশে যখন রয়্যাল এয়ার ফোর্সের প্লেনগুলো গর্জন করতে করতে উড়ে বেড়াত, মিশরের প্রাচীন মাটিতে দাঁড়িয়ে আট বছরের একটি শিশু তখন হাত পা ছুঁড়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাত—'ইয়ে আজিজ!' 'ইয়ে আজিজ!' দহিয়া তাঘুদ আলইংলিজ! —ইয়ে আজিজ!—হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, ইংরেজেরা এক্ষুনি যেন কোন বিপদে পড়ে, হে ঈশ্বর, এক্ষুনি যেন—!

ছেলেটি নীল উপত্যকার এক দরিদ্র চাষীর ঘরের ছেলে। বাবা তার চাষী নন—জনৈক সহকারী

পোস্ট মাস্টার। তাঁর এই দুরন্ত ছেলেটির নাম—গামাল আবদুল নাসের! আজও তেমনি 'দুরন্ত', তেতাল্লিশ বছরের দুর্ধর্ষ রাষ্ট্রনায়ক নাসেরের পরবর্তী জীবন বয়সানুক্রমে নীচের মত :

বয়স যখন ষোল : নাসের তখন কায়রোর আল্‌-নাহ্‌দা স্কুলে পড়েন। তিনি স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখেন। এবং পুলিশ একদল মানুষকে পিটাচ্ছে দেখে বই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ লড়াইয়ে মেতে যান! নাসেরের চওড়া কপালের এক কোণে আজও দাগ আছে একটা। সেটা সে-ই দিনের, পুলিশের লাঠির দাগ। সেই উপলক্ষেই 'ইয়ং ইজিপ্টিয়ান'দের সঙ্গে পরিচয়, কারাবাস এবং প্রথম রাজনৈতিক দীক্ষা। কায়রোর নাসের তখন বিখ্যাত ছাত্রনেতা। ইচ্ছে করলে তিনি যে কোনদিন ছাত্রদের ধর্মঘট করাতে পারেন। করিয়েও ছিলেন।

বয়স যখন কুড়ি : তরুণ নাসের তখন কায়রোর রয়াল মিলিটারী একাডেমির শিক্ষানবীশ। তাঁর প্রথম পরিচয় তিনি—সৈনিক হয়েও ইংরেজ বিরোধী। তা হলেও সেকেণ্ড লেফটেনেণ্ট হিসেবে একটা বাহিনী দিয়ে তাঁকে পাঠান হল—নীল নদের তীরে একটি ঘাঁটিতে। কেননা, সে বছরই মিউনিক এবং আরব-প্যালেস্টাইন যুদ্ধ। নাসের সে যুদ্ধে তখন প্রধানত দর্শক।

বয়স যখন ছাব্বিশ : মিলিটারী একাডেমির ইনস্ট্রাক্টার নাসের এখন বিবাহিত। তিনি কায়রোর এক সম্পন্ন কার্পেট ব্যবসায়ীর কন্যাকে বিয়ে করেছেন। তেতাল্লিশেও নাসের এখনও সেই মেয়েটির স্বামী। ওঁরা পাঁচটি সন্তানের জনক-জননী।

বয়স যখন তিরিশ : কলেজ থেকে বের হয়ে তিনি এবার চললেন রণাঙ্গনে। কেননা, সেটা ১৯৪৮ সন এবং প্যালেস্টাইনে তখন তুমুল যুদ্ধ। ফিরে আসার দিন ঘাড়ে আঘাতের সঙ্গে মনে একটি সংকল্পও ছিল তাঁর সেদিন। সেটি,—যে করে হক, ইংরেজকে তাড়াতে হবে। 'কারণ' তরুণ সেনানীর নির্ভুল হিসেব 'আসল শত্রু ওরাই!' ফলে সেদিনই ফাজুলার এক গোপন সভায় গঠিত হল—ফ্রি অফির্সাস পার্টি। এ দলের সভ্যরা সবাই সৈনিক।

বয়স যখন চৌত্রিশ : 'সাতশ' 'ফ্রি অফিসার'-এর সহযোগে নাসের

সৈন্য বিদ্রোহ ঘটালেন ফারাউদের ঐতিহাসিক দেশে। ফারুক বিদায় নিলেন। নাসের তাঁর জায়গায় সামনে এগিয়ে দিলেন জেনারেল নাগিবকে।

বয়স যখন ছত্রিশ : বিদায় নিলেন নাগিব। কারণ ক্ষমতা হাতে পেয়ে তিনিও নাকি ফারুক হতে চলে ছিলেন। স্বভাবতই এবার সামনে এগিয়ে এলেন নাসের স্বয়ং। তাঁর গায়ে তখনও একটা কর্নেলের জামা! বন্ধুরা টানাটানি করলেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কিছুতেই সেমিরামিস হোটেলের ভেতরে ঢুকবেন না! শুধু চা আর সিগারেট ভক্ত এই মানুষটি তাই বান্দুংয়ে সেদিন এত সহজে সকলকে জয় করে ফেলেছিলেন।

বয়স যখন আটত্রিশ : সেবার সুয়েজ জাতীয়করণ এবং সুয়েজ যুদ্ধ। বিলিতি কাগজেই কার্টুন বেরিয়েছিল—খাল সাঁতরে বৃটিশ সিংহ পালাচ্ছে, লেজটি তার মিশরের স্ফীংক্স-এর হাতে! হাজার হাজার বছরের পাথরের মূর্তিগুলো যেন সেদিন সহসা জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, এই দু'শ পাউণ্ডের আরব জোয়ানটির কথার যাদুতে।

বয়স যখন তেতাল্লিশ : সে বছর সৈনিক বিপুল ভোটে নির্বাচিত হলেন সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সভাপতি (১৯৫৮)। ক্রমে সিরিয়ায় দেখাদেখি সঙ্গে এল ইয়েমেনও। 'ইউ এ আর' তখন মধ্যপ্রাচ্যে এক থরহরি সংবাদ।

বয়স যখন আটচল্লিশ : এবারও পরপর অনেক চমকপ্রদ সংবাদ 'ইউ-এ-আর' ও তার সভাপতিকে ঘিরে। প্রথম, সিরিয়া বেরিয়ে গেল। দ্বিতীয় গেল—ইয়েমেন। কিন্তু আশ্চর্য, নাসের যে তবুও হাসছেন তাই নয়, তিনি সেই নাসেরই আছেন। ক'দিন আগে তিনি মিশরের মাটিতে শেষ বিদেশীদের চরমপত্র দিয়েছেন। আর তার ক'দিন আগে? শোনা যায় গোয়ায় পা পড়ার আগে কারও মুখের দিকে না তাকিয়ে সুয়েজের মুখে পর্তুগালের জাহাজটি যিনি আটকে দিয়েছিলেন তিনি নাকি এই নাসের!

—আগে থেকেই কি পরিকল্পনা ছিল কোন?

নাসের এবারও নিশ্চয় হেসে জবাব দেবেন—'নো, আই রিয়ালি হ্যাভ নো প্ল্যানস, আই জাস্ট রি-অ্যাক্ট।'

৮. ১২. ৬১

নায়ার, সুশীলা,

যেতে যেতে প্যারেলাল বলেছিলেন—'তোকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছি জানিস ?—স্বর্গে।' অবাক হয়ে লাজুক মেয়েটি দাদার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। '—হঁ্যা, প্যারেলাল বলেছিলেন—'পৃথিবীতে স্বর্গ যদি কোথাও থাকে দেখবি আমাদের আশ্রম তাই।' ট্রেণের কামরায় ওঁকে প্রার্থনা শিখিয়েছিলেন প্যারেলাল। কিভাবে বসতে হয়, কিভাবে চোখ বুঁজতে হয়, কিভাবে রামধুন গাইতে হয় ইত্যাদি।

সুশীলার সেই প্রথম গান্ধীজীকে দেখা। তিনি তখন কলেজের ছাত্রী। বয়স—মাত্র ১৫। ভাইয়ের সঙ্গে দু' সপ্তাহ ছুটি কাটাতে এসেছিলেন ওয়ার্ধায়। ভেবেছিলেন ছুটির পর আবার ঘরে ফিরে যাবেন, দিদির মত পড়ায় মন দেবেন। তাছাড়া মা সাবধানও করে দিয়েছিলেন—'দেখিস, দাদার পাল্লায় পড়ে কোন মন্ত্র টন্ত্র আবার নিসনি যেন।'

তা নেননি। কিন্তু ঘরে ফেরা মাত্র মা জেনেছিলেন মেয়ে তাঁর ঘরে ফেরেনি। দিদি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। নিরস গলায় বলেছিলেন—'হঁ্যা, পরবি বৈকি! তবে এ কাপড় থাকতে নয়। আগে এ কাপড় ছিঁড়ুক তবে খাদি পাবি।—হু, মেয়েও আমার গান্ধী হবেন।'

'—হুঁ, তুমি কি ভেবেছ তুমিও গান্ধী হবে?' বহুদিন পরে প্রায় ভৎর্সনার সুরেই কথাটা বলেছিলেন 'বা',—কস্তুরবা। '৪২ সনের কথা। ওঁদের সঙ্গে সুশীলাও তখন আগা খাঁ প্রাসাদে। খবর এসেছে বাড়ীতে মা শয্যাশায়ী। তার পরেই খবর, সংসারে তাঁর নিকটতম বন্ধু বৌদি (আর এক ভাইয়ের স্ত্রী) তাঁর প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করেছেন। মরার সময় তিনি বলে গিয়েছেন—সুশীলা যেন ওঁকে দেখে! তবুও কাগজ কলম নিয়ে বসতে রাজী হলনা মেয়েটা। সরোজনী নাইডু বললেন, কস্তুরবা বললেন, জেলের অন্য বন্দীরা বললেন, কিন্তু সুশীলা কিছুতেই লিখবেন না। কেননা, চিঠি লেখার অধিকার নিয়ে বাপুর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য চলছে! গান্ধীজী জেল থেকে বাইরে চিঠি লিখবেন না বলে সঙ্কল্প করেছেন। কস্তুরবার ধৈর্যভঙ্গ হল। তিনি রেগে গেলেন—'দেখ, গান্ধীজী মহাত্মা!—তুমি কি মনে কর তুমিও গান্ধী হবে?'

ডঃ সুশীলা নায়ার গান্ধী হননি। 'বা' জানলে আনন্দিত হতেন তাঁর এই আদুরে মেয়েটি, প্যারেলালের সেই ফুটফুটে বোনটি আজ এমন মেয়ে হয়েছেন বাপু যা তাঁকে হতে বলতেন, —'মেয়ের মত মেয়ে!'

দুই ভাই এক বোনের পর গুজরাটের বিখ্যাত নায়ারদের এই মেয়েটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন গুজরাট জেলার কুনজা বলে একটা গ্রামে। গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথম দেখার দিনে পড়তেন তিনি লাহোর কলেজে। তারপর দিল্লির লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ, তারপর কলকাতা এবং অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দিল্লির এম. বি. বি. এস., পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ডি., জন-হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. পি. এইচ. এবং ডক্টর পি. এইচ. ডাঃ সুশীলা নায়ার আজ শিশু এবং সামাজিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসক হিসেবেও স্বনামধন্য। ফরিদাবাদের মেডিকেল অফিসারের কাজ ছাড়াও কস্তুরবা ট্রাস্ট মেডিকেল বোর্ড, 'উনো'র সোস্যাল কমিশন ইত্যাদি নানা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে তিনি অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। এক সময় দিল্লি রাজ্যের স্পীকার এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রীও ছিলেন।

কিন্তু ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুশীলা নায়ারের তার চেয়েও বড় পরিচয় বোধ হয় এই যে, তিনি পনের বছর বয়স থেকেই 'স্বাস্থ্যমন্ত্রী'র কাজ করে আসছেন। তাঁর দীর্ঘ ছাত্রজীবনে ('৫০ সন অবধি) যখনই সুযোগ এসেছে তখনই তিনি আশ্রমে। সেখানে তিনি ছাত্রজীবন থেকেই 'ডাক্তার।' সেবার হঠাৎ বাপুর টেলিগ্রাম এল—'বা' ইজ ইল!' সুশীলা তখন কলকাতায়। স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এ পড়ছেন। তখন-কার মত পড়া মুলতুবী। এক মাস ছুটি নিয়ে তিনি ছুটলেন ওয়ার্ধা। তেমনি নোয়াখালি শুনে—নোয়াখালি, —পাঞ্জাবের খবর আসা মাত্র—পাঞ্জাব।

এখন 'বা' নেই,—বাপু নেই। সুশীলা তাই অবসরও চান না। দিনরাত্তির তিনি বাপুর কাজে, দেশের কাজে ডুবে থাকতে ভালবাসেন। কালেভদ্রে যখন ফাঁকা পান, একা আপন মনে বসে রং তুলি নিয়ে বসেন, ছবি আঁকাই তাঁর একমাত্র নেশা।

২. ৮. ৬২

নায়ারেরে, জুলিয়াস

পঁয়ত্রিশে প্রধানমন্ত্রী !

খবরটা আফ্রিকার বলেই 'যাদু' নয়।

আসল কথা, হতে জানা চাই। উনি যে হলেন সে শুধু 'উহরু' 'উহরু' ধ্বনি আর বর্শানৃত্য দেখিয়ে নয়,—অন্য একটি মন্ত্র বলে। ওঁর শ্লোগান ছিল—'উহরু না কাজি !'—'স্বাধীনতা এবং কাজ।' শুধু স্বাধীনতা নয়, তার সঙ্গে চাই কাজ! কাজ চাই স্বাধীনতার জন্যেও !

সত্যিই কাজের মানুষ ছিলেন—সদ্য স্বাধীন ট্যাঙ্গানাইকার প্রধানমন্ত্রী নায়ারেরে। বাবা জানকি উপজাতির জনৈক দলপতি। বাড়িখানা ছিল বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া লেকের ধারে। কিন্তু স্কুল ছিল সেখান থেকে চল্লিশ মাইল দূরে। ছোট বেলায় ছেলেটি সেখানেই পড়ত।

তারপর মুসোমার সেই স্কুল থেকে ক্রমে ক্রমে আরও দূরে। প্রথমে তাবোরার ক্যাথলিক মিশন স্কুলে, তারপর উগাণ্ডার একটা টিচার্স ট্রেনিং কলেজেই। সেখানেই বিখ্যাত কেনিয়ান ডাঃ কিয়ানোর সঙ্গে দেখা এবং সেখানেই খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষা। জুলিয়াসের বয়স তখন মাত্র কুড়ি বছর।

পাশ করার পর তিন বছর শিক্ষকতা করেছিলেন তাবোরার একটা স্কুলে। তারপর একদিন ছাত্র হয়ে নিজেই পাড়ি জমালেন বিলেতে। উল্লেখযোগ্য, ট্যাঙ্গানাইকা নামক দেশটি থেকে ইংলণ্ডে তিনিই প্রথম বিদেশী ছাত্র।

'৪৯ সনেও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি আর ইতিহাস পড়তেন জুলিয়াস নায়েরেরে। পড়ার ফলে রাজনীতি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্টতর হল। মনে মনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, অভিযোগ আর আবেদন নয়, মুক্তির একমাত্র পথ—কর্ম,—বিরামহীন কাজ।

দেশে ফিরে আবার স্কুলের কাজেই ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। তিনবছর মনে তাঁর দেশের ছেলেদের লেখাপড়া শেখান ছাড়া আর অন্য কোন চিন্তা ছিল না। কিন্তু '৫৩ সনে ওরা এসে এমনভাবে ধরে পড়ল যে, এড়ান গেল না। জুলিয়াস সহযোগী সরকারী কর্মচারীদের একটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে গেলেন।

তবে তিনি যে তখনও কর্মী আছেন সেটা বোঝা গেল পরের

বছর। বৎসরান্তে দেখা গেল—যা ছিল সরকারী কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠান তা-ই এখন ট্যাঙ্গানাইকান আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন। দশটি সন্তানের পিতা জুলিয়াস তার প্রধান।

তৎসত্ত্বেও ১৯৫৪ সন অবধি শিক্ষকের আসন ছাড়েননি—ট্যাঙ্গানাইকার প্রায় নিশ্চিত প্রধানমন্ত্রী। নিশ্চিত বলছি এজন্যে যে, কাউন্সিলে আসন যখন নয়টি তখনও তাঁর দল পাচ্ছে আটটি। আজ যখন আসন সংখ্যা একাত্তর, তখন তাঁর হাতে আসন আছে সত্তর।

কোন আস্ফালন নেই, একফোঁটা রক্তপাত নেই,—এ মানুষ কেন বলতে পারবেন না যে,—কাজে, শুধু মাত্র নীরব কর্মেও স্বাধীনতা আসে।

১৪. ১২. ৬১.

নিজাম, স্যার ওসমান আলিখান

ভক্ত প্রজারা বলত—'জিলেল্লাহি' অর্থাৎ মর্ত্তে ঈশ্বরের ছায়া। আর্জির আরম্ভে আর যেসব পারসিক বিশেষণ চোখে পড়ত ইংরেজীতে তর্জমা করলে তার মধ্যে একটির মানে—'দি গ্রেট এণ্ড হোলি প্রটেক্টার অব দি ওয়ার্ল্ড।' অন্য একটির অর্থ—'মাইটি হোল্ডার অব ডেষ্টিনিস।' নিজাম সেদিন সত্যিই ভাগ্যবিধাতা। অন্তত ভারতের বিরাশী হাজার তিনশ' তের বর্গমাইল জমিতে,—এক কোটি নব্বুই লক্ষ মানুষের জীবনে। তাঁর ফরমান তাদের জীবনে আইন। ওরা তাঁর নিজস্ব রেলপথে যাতায়াত করে, তাঁর তসবীর আঁকা খামে পোস্টকার্ডে চিঠি লেখে, তার টাঁকশালে তৈরী 'হালি সিক্কা' টাকায় হাটবাজার করে। তাছাড়া তাঁর হাতিশালে হাতি, ঘোড়শালে ৯৭৪ ঘোড়সওয়ার, ব্যারাকে ব্যারাকে ৪২৭৮ জন গোলন্দাজ, ১৩১১৭ জন পুলিস, এবং ১১২০০ ফৌজ। তৎকালেও (দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে) ফেলাছড়া করে তাঁর রাজকোষে রাজস্ব আসতো বছরে প্রায় আট কোটি টাকা—শুধু কি তাই? ইংরেজদের চোখের সামনেই তিনি জাফরান রংয়ের আসরফী নিশান ওড়ান। বৃটিশ রেসিডেণ্টও দরবারে চিঠি পাঠাতে হলে আগে মনোযোগ দিয়ে তাঁর সম্বোধনটি সাজান। তাঁদের ঠিকানার খাতা অনুযায়ী নিজামের সম্পূর্ণ নাম: লেফট্যানেণ্ট জেনারেল হিজ একজলটেড হাইনেস রুস্তমই দৌরাণ, আরস্তু-ই জামান, সিপাহ-সালার, মুজঃফর-উল-মুলুক-ওয়াল-মামলিক, আসফ জা, নিজামউদ্দৌলা,

নিজাম, স্যার ওসমান আলিখান

মীর স্যার ওসমান আলি খান বাহাদুর ফতে জং, ফেথফুল অ্যালাই অব দি বৃটিশ গভর্ণমেন্ট, জি.সি.এস.ই, জি.বি.ই,—নিজাম অব হায়দ্রাবাদ এণ্ড বেরার! নিজাম তাতে খুশী হতেন না। তিনি একবার হিজ একজলটেড হাইনেস-এর বদলে হিজ ম্যাজেস্টির জন্য দাবী তুলেছিলেন। প্রজারা শুনেছিল—ইংরেজরা সে দাবী মেনে নেয়নি। তাতে বলা নিষ্প্রয়োজন তাদের ভাগ্যবিধাতার মহিমা বিন্দুমাত্র খর্ব হয় না। নিজাম তখন 'ঈশ্বরের ছায়া' কেন, বলতে গেলে স্বয়ং দ্বিতীয় ঈশ্বর। তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলা পুত্রেরও বারণ! বাবার সঙ্গে কথা বলতে হলে তাঁদেরও নাকি মাঝে কাউকে প্রতীক হিসেবে দাঁড় করিয়ে তাঁকেই সব বলতে হয়!

এসব তৎকালের কাহিনী। অর্থাৎ ১৯৪৮ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বরের আগেকার। হায়দ্রাবাদ এবং তার বিশ্বখ্যাত নিজামের পরবর্তী কাহিনী আজ সকলের জানা। কাসেম রেজভির স্বপ্নের রাজ্য 'ওসমানিস্তান' হয়নি। ফকিরের কথা ফলেছে। প্রথম নিজাম তাঁর হাতে সাতটি 'কুলচা' (পিঠা) দিয়ে বর চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—সাতপুরুষ তোমার বংশ নিশ্চিন্ত। সেই স্মৃতিতেই 'কুলচা' আসরফী নিশানে রাজ্যের প্রতীক ছিল। কিন্তু হায়, কোথায় আজ সে পতাকা। একদা ভারতের বৃহত্তম রাজ্য হায়দ্রাবাদ আজ রাজ্য হিসেবে অবলুপ্ত। নিজাম,—তিনিও যেন মধ্যযুগের কোন প্রবাদের অবশেষ মত। জীর্ণ দেহ, ভগ্ন মন—সাতাত্তর বছরের প্রবীণ হায়দ্রাবাদ-অধিপতি আজ নিশ্চিতভাবেই অতীতের ভগ্নস্তূপ। 'কিসমৎ' ছাড়া তাঁর মুখে আজ আর কোন ফরমান নেই। অথচ ক'বছর আগেও তিনি ছিলেন এক স্বতন্ত্র পুরুষ।

দিল্লীর মোগলদের থেকে স্বতন্ত্র বংশ। বংশের প্রতিষ্ঠাতা নিজাম-উল-মুলুক আসফ জা (১৭২৪) মোগল দরবারেরই কর্মচারী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বলতেন তাঁর পূর্বপুরুষ স্বয়ং পয়গম্বরের শ্বশুর আবু বকর। ওসমান আলি সেই বংশেরই সপ্তম পুরুষ। জন্ম তাঁর—১৮৮৬ সনে। এবং বলতে গেলে জন্মদিন থেকেই তিনি নিজাম। কেননা, দীর্ঘদিন নিঃসন্তান পূর্ববর্তী নিজামের প্রাসাদে তিনিই প্রথম সন্তান। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাই ভবিষ্যতের নিজাম হিসেবে তাঁর নামটি ঘোষণা করা হয়েছিল।

ওসমান আলি হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে বসেছেন ১৯১১ সনে, পঁচিশ বছর বয়সে। বিয়ে করেছেন তিনি তারও আগে, ১৯০৫ সনে। নিজাম তখন যথার্থই নিজাম বাহাদুর। মন্ত্রী সালার জংয়ের মিউজিয়ম দেখতে গিয়ে ভবিষ্যতের নিজাম একটি শ্বেত পাথরের নারীমূর্তি তারিফ করেছিলেন। প্রথা অনুযায়ী সেটি তৎক্ষণাৎ প্রাসাদে নজরানা হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা। কলানুরাগী মন্ত্রী সে সৌজন্য দেখাতে রাজী হননি। শোনা যায় সিংহাসনে বসে নিজাম তার জবাব দিয়েছিলেন আর একটি প্রথা ভঙ্গ করে। তিনি নিজেই নিজের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন! ওসমান আলির দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের রাজত্বে এমনি সব খেয়াল খুশী পছন্দ অপছন্দেরই কাহিনী।

*　　*　　*

ইদানীং শোনা যাচ্ছে, নিজাম তাঁর প্রথমপুত্র আজম জা তথা স্বনামধন্য প্রিন্স অব বেরারকে খারিজ করে তস্য পুত্র প্রিন্স মুক্কারাম জাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে চান। শোনা যায় তার কারণ প্রিন্স অব বেরার নাকি অত্যন্ত বিলাসী, তাঁর আমোদ আহ্লাদ, জাঁক-জমকের শেষ নেই। নিজাম নিজে আমোদ জানতেন না এমন নয়, তিনি শুধু কবি স্বভাবের মানুষ নন, তাঁর হারেমের কাহিনী এখনও নাকি সমগ্র দক্ষিণে এক রহস্য, কিন্তু প্রতিষ্ঠা তাঁর প্রধানত 'কিপ্টে' হিসেবেই। শোনা যায় সামনে একটি পয়সা পড়ে থাকতে দেখলেও নিজাম হাত বাড়িয়ে সেটি তুলে নিতে ইতঃস্তত করেন না। ইদানীং তাঁর সে স্বভাব নাকি আরও পরিণত। প্রতিরক্ষা তহবিলে তাঁর দানের কাহিনী সুবিদিত। নিজাম জানিয়েছিলেন—টানাটানিতে আছি, বেশী অসাধ্য। আর একবার জনৈক বিদেশীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—রেডিও যে কিনব তার পয়সা কোথায়?

হয়ত প্রশ্ন উঠবে: তার পরেও উত্তরাধিকারীর প্রশ্নে এত চিন্তার কারণ কি? উত্তর: সেখানেই নিজাম বাহাদুরের আসল মাহাত্ম্য। তাঁর কিছু নেই বটে, কিন্তু বছরে এখনও পঞ্চাশ লাখ টাকা সরকারী ভাতা আছে, তাছাড়া আছে পাঁচ কোটি ডলার পরিমাণ মোহরদানা, পনের কোটি ডলারের জেওরপাতি এবং বিস্তর সারফ-ই-খাস বা খাস জমিপত্তর। নিজাম এখনও পৃথিবীর সবচেয়ে ধনীদের মধ্যে একজন।

নে উইন, জেনারেল

ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে ছিল দু'খানা তোরঙ্গ। সেগুলো পেয়েছিলেন উপস্থিত খবরের কাগজের রিপোর্টাররা। বাকী ছিল তিনখানা কামিজ আর খানকয় লুঙ্গি। ত্রস্ত-হাতে একটা স্যুটকেসে সেগুলো গুছিয়ে নিয়ে উ নু প্রধানমন্ত্রীর বাস-ভবন থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। বলেছিলেন—উপায় নেই, নয়ত দেশ উৎসন্নে যায়।

সে ১৯৫৮ সনের অক্টোবরের কথা। স্বেচ্ছানির্বাসিত প্রধানমন্ত্রীর শূন্য আসনে সঙ্গে সঙ্গে অধিষ্ঠিত হলেন এক অদ্ভুত দর্শন আগন্তুক। গায়ে তাঁর সামরিক উর্দী, কোমরে পিস্তল। আশ্বাস দিলেন—ব্রহ্মের জনপ্রিয় প্রধান সেনাপতি—ভয় নেই, আমি কেয়ার-টেকার মাত্র। আমার এই ফৌজী-জমানার মেয়াদ মাত্র ছ'মাস। তারপর যাকে খুশী বসাও, আমরা আবার ব্যারাকেই ফিরে যাচ্ছি।

ফিরেও ছিলেন। সমগ্র বিশ্বকে বিস্মিত করে সত্যি সত্যিই আঠার মাস রাজত্ব করার পর আপন আসনে ফিরে গিয়েছিলেন নে উইন। '৬০ সনের ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আবার প্রধানমন্ত্রী ভবনে ফিরে এসেছিলেন প্রবীণ নায়ক উ নু। কিন্তু তখনও তিনি জানেন না বাঘ রক্তের স্বাদ নিয়ে গুহায় ফিরেছে।

সেটা বোঝা গেল ৬২ সনের মার্চে। এবার আর 'ক্যু' শব্দটা এড়ান গেলনা। আচমকা উ নু বন্দী হলেন, পার্লামেণ্ট বাতিল। রেঙ্গুণের উপকণ্ঠে ছোট্ট একটি কুটির নির্দিষ্ট হল দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর জন্যে। নে উইন বললেন—খাওয়া-পরা ছাড়াও যে কোন পানীয়, পৃথিবীর যে কোন খবরের কাগজ এখন থেকে সবই পাবেন উ নু। একমাত্র যা পাবেননা সে এই দেশ। এবার থেকে তার পরিচালনার ভার সম্পূর্ণ আমার।

অসহায় ব্রহ্ম সেদিন আপত্তি জানাতে পারেনি। তাছাড়া নে উইনও তাদের মোটামুটি চেনা মানুষ। তারা জানে সৈনিক হলেও নে উইন রাজনৈতিক মানুষ। আগাগোড়া তিনি আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক।

মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। কিন্তু তবুও ব্যবসার বদলে গেরস্থের ছেলে নে উইনকে পাঠান হয়েছিল প্রোমে, হাইস্কুলে। তারপর রেঙ্গুন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে বের হয়ে

সরকারী কাজ নিয়েছিলেন তরুণ ব্রহ্ম-সন্তান। ডাক বিভাগের কাজ। নে উইন তখন রেঙ্গুন পোস্ট অফিসে একজন কেরানীর নাম। অবশ্য নে উইন নয়, তাঁর সঠিক নাম তখন মাউং স্থ মাউং।

কেরানী স্থ মাউং সৈনিক হয়েছিলেন তিরিশের যুগে। ব্রহ্মে তখন ব্যাপক বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন। বিখ্যাত থাকিন গোষ্ঠী কেরানীর রক্তে আগুন ধরাল। তিনি কলম রেখে গোপনে রাইফেলে হাত রাখলেন। কিছুদিন পরে দলের নির্দেশে গোপনেই পালিয়ে গেলেন বিদেশে, জাপানে। যে তিরিশজন ব্রহ্ম সন্তান সেদিন দেশের মুক্তির জন্যে জাপানে যুদ্ধবিদ্যা রপ্ত করেছিলেন স্থ মাউং তাঁদেরই একজন।

জাপান থেকে ওঁরা ফিরে এসেছিলেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুনের মধ্যে, বিজয়ী জাপানী বাহিনীরই সঙ্গে। এসেই নামলেন জাপ বিরোধী সংগ্রামে। তারই স্বীকৃতি স্বরূপ পরবর্তীকালে জেনারেল আউং সাঙ বন্ধুকে ডেকে ছিলেন স্বাধীন ব্রহ্মের সেনাবাহিনীতে। এক বছর পরে প্রবল লড়িয়ে স্থ মাউং নাম পেলেন—নে উইন 'উজ্জ্বল সূর্য।' তিনি ব্রহ্মের প্রধান সেনাপতি। সাধারণ সৈনিকেরা বলে তিনি শুধু সূর্য নন, 'আহা-বা'—আমাদের পিতাও।

সেনাদলের নেতৃত্ব থেকে দুই কোটি চল্লিশলক্ষ মানুষের অভিভাবকত্ব;—জেনারেল নে উইন কি দেশবাসীর আশঙ্কাকে দূর করতে পেরেছেন? চব্বিশমাস টানা রাজত্বের পরে পুরানো এই সৈনিকটি কি বরাবরের মতই 'নিরাপদ দেশপ্রেমিক' মাত্র? বাইরে থেকে প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া সহজ নয়। ভেতর থেকেও সেটা কঠিন কাজ। কেননা, নে উইনের দেশে আজ যেমন চাওয়া মাত্রই ভিসা মেলেনা, তেমনি রেঙ্গুণে আজ পাশপোর্টও দুর্লভ। ইনিয়া লেকের ধারে তিনশ' ঘরের বিরাট হোটেলটি ফাঁকা। সেখানে টুরিস্ট নেই। কারণ নে-উইন এখন বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ পছন্দ করেন না। আপাতত একাগ্রচিত্তে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া ব্রহ্মের নাকি অন্য কোন কাজ নেই।

চীন, রাশিয়া, আমেরিকা—অর্থ সাহায্য সকলের থেকেই নেওয়া হয় বটে, কিন্তু দেশে যাবতীয় বিদেশী প্রচার বন্ধ। দিশি খবরের কাগজও

নিয়ন্ত্রিত। নে উইন এবং তাঁর বিপ্লবী পরিষদ সমাজতন্ত্রের সাধনায় মেতেছেন। দেশে সমবায় কৃষি চালু হয়েছে। একদিন ভোরে উঠে ব্রহ্মবাসী দেখল দেশের চব্বিশটি ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটির দুয়ারে ফৌজ মোতায়েন। রেডিওতে ঘোষণা করা হল—ব্যাঙ্ক নেওয়া হয়েছে। তারপর এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ফার্ম। তারপর তেল, কাঠ, খনি, পরিবহণ এবং অন্যান্য যাবতীয় ব্যবসা। মায় বয়-স্কাউট, রেডক্রস, অটোমোবাইল এসোসিয়েশন পর্যন্ত। সর্বশেষ, ব্রহ্মের সর্বেশ্বর জানাচ্ছেন এবার থেকে এতদ্দেশে তিনি ছাড়া অন্য রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ।

রেঙ্গুণের গভর্ণমেণ্ট হাউসের একটি ঘরে বসে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আলো জ্বালিয়ে একের পর এক জাতীয়-করণের ফর্দ প্রকাশ করে চলেছেন বাহান্ন বছরের প্রবীণ সেনাপতি। শরীর ক্লান্ত। দেহে ব্যাধির আক্রমণ স্পষ্ট, একটি হাত অংশত অবশ হয়ে গেছে। কিন্তু তবুও তাঁর 'বিপ্লবে' বিরাম নেই। ছাদে অ্যান্টিএয়ার-ক্রাফট-গান অষ্টপ্রহর পাহারা দিচ্ছে। দরজায় দরজায় সিপাহী-শান্ত্রী, রাজ-নৈতিক দিক থেকে দেশ 'বন্দী শিবির', চারদিকে 'রেডফ্ল্যাগ' 'হোয়াইট ফ্ল্যাগ' নানা রংয়ের কম্যুনিস্ট; তারপর কারেন, কাচিন —রকমারী অসন্তোষ। তারই মধ্যে প্রবল বেগে ধেয়ে চলেছেন ব্রহ্মনায়ক। —কোথায়?—কোনদিকে?—সমাজ-তন্ত্রের এই তথাকথিত 'ব্রহ্মদেশীয় পথটি' কি এখনও বর্মীসড়ক?

২. ৪. ৬৪.

নিক্সন, রিচার্ড এম.

—'Fine, I am in agreement. I know that I am dealing with a very good lawyer!"

ক্রুশ্চভ নিক্সন-এর কাঁধে হাত রাখলেন।

—'তুমিও তাহলে পারতে?' উত্তর দিলেন নিক্সন।—'আফটার অল ইউ ডোণ্ট নো এভরিথিং!'

আমেরিকানরা বলেন—রিচার্ড এম. নিক্সন সব কিছু জানেন। ক্রুশ্চভের সংগে কথা বলার কৌশল থেকে শুরু করে হোয়াইট হাউস-এর নাড়ি নক্ষত্র, ডিফেন্স প্রোগাম-এর খুঁটিনাটি সব। মার্কিন দেশে একশ' সত্তর বছরে তেত্রিশজন প্রেসিডেণ্ট। কিন্তু মার্কিনীরা বলেন—ভাইস-প্রেসিডেণ্ট এই একজনই। নিক্সন যে শুধু প্রেসিডেণ্টের হয়ে কাজ

চালাতে পারেন তাই নয়, অনায়াসে তিনি প্রেসিডেন্টের আসনে বসতে পারেন। সংবাদ, দুই দুই দফা ভাইস-প্রেসিডেন্ট থাকার পর অতঃপর রিচার্ড নিক্সন সেই আসনটিই নিতে মনস্থ করেছেন। আসছে নির্বাচনে তিনি রিপাবলিকান প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন।

যাদু শুধু ম্যাক্সিকোতে নয়, কখনও কখনও যে খাস নিউ ইংল্যাণ্ডেও চলে তার প্রমাণ মিক্সন।

১৯৪৬ সনের কথা। ক্যালিফোর্ণিয়ার কোয়েকারদের ছেলে তরুণ নিক্সন তখন আইন ব্যবসা ছেড়ে নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। এমন সময় লস-এঞ্জেলস-এর কাগজে হঠাৎ একদিন অদ্ভুত বিজ্ঞাপন বের হল একখানা। স্থানীয় রিপাবলিকান পার্টি তাতে জানাচ্ছেন—তারা একজন উচ্চাভিলাষী তরুণ চান। রিপাবলিকানদের হয়ে তাঁকে ইলেকশান লড়তে হবে! বন্ধুরা নিক্সনকে বিজ্ঞাপনটা দেখালেন। একজন পরামর্শ দিলেন দরখাস্ত করতে। ছাত্র হিসাবে ছেলেটার নাম ছিল। এটর্নি হিসেবেও মন্দ নয়। দরখাস্ত গৃহীত হয়ে গেল। নিক্সন রাজনীতিক হয়ে গেলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেত্রিশ। এখন সাতচল্লিশ। মাঝের বছরগুলো ক্রমাগত উপরে উঠার খবরে বোঝাই।

'৫০ সনে তিনি সিনেটার হলেন। '৫২ সনে সহ-রাষ্ট্রপতি। '৫৬ সনে আবার থেকে গেলেন 'আইক', সংগে সংগে নিক্সনও। আইসেনহাওয়ার বলেন,—'নিক্সন ইজ মাই বয়!' নিক্সন বলেন—'মাই প্রেসিডেন্ট!' শত্রুরা বলেন যতটুকু সম্ভাবনা সে সেখানেই।

নিক্সন বিস্তর খাটতে পারেন, প্রচুর হাসতে পারেন, ভাল বক্তৃতা করতে পারেন। বলাবাহুল্য, মার্কিন ভোটারের কাছে এগুলোর দাম অনেক। তদুপরি ও দেশের পক্ষে আরও কয়টি দুর্মূল্য গুণও আছে তাঁর। যথা: তিনি তাস খেলেন না, ধূমপান করেন না, কালেভদ্রে মদ খান এবং মাঝে মধ্যে সিনেমায় যান। এছাড়াও—নিক্সন সুখী গৃহস্থ। পেট্রিসিয়া আর জুলি তাঁর দুই মেয়ে। দু'জনেই পিতৃভক্ত। ওদের মা পেট্রিসিয়া রায়ান ওরফে প্যাট নিক্সন মার্কিন দেশে একজন মস্ত নিক্সন ভক্ত। ৪. ৮. ৬০

নিজলিঙ্গাপ্পা, এস.

কলমের ঘোরে বলা হয় বটে—নতুন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু মহীশূরের

নিজলিঙ্গাপ্পা, এস

রাজনীতিতে সিদ্ধভ্ভানাহল্লি নিজলিঙ্গাপ্পা প্রবীণ ব্যক্তি। বয়সে না হলেও, বিশেষত্বে।

বয়স—বাষট্টি। রাজনৈতিক জীবনের দৈর্ঘ্য প্রায় তিরিশ। লেখাপড়া শিখেছিলেন—জন্মভূমি মহীশূরে, শেষ দিকে ঘর থেকে দূরে, পুনা শহরে। সেখান থেকে আইনে উপাধি নিয়ে নিজলিঙ্গাপ্পা যখন মহীশূর হাইকোর্টে যোগ দেন তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। সে ১৯২৬ সনের কথা। দেশে তখন প্রথম অসহযোগ আন্দোলন হয়ে গেছে।

সেকালের নিয়মে অনেকের মতই রাজনীতিতে দীক্ষা নিয়েছিলেন বার-এ বসে। সেখানে থেকেই শরিক হয়েছিলেন দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলনে। কিন্তু বেশী দিন সুযোগ পাওয়া গেল না তার। আইন অমান্যের অপরাধে প্রতিষ্ঠিত আইনজীবীর নাম কাটা গেল হাইকোর্টের খাতা থেকে। পরের বছর আরও কড়াকড়ি। হাত-কড়া পড়ল নিজ লিঙ্গাপ্পার হাতে। তিনি কয়েদ হলেন।

'৪৭ সন অবধি (কেননা মহীশূরে ইংরেজ ছাড়া দ্বিতীয় শাসক ছিলেন) নানা দফায় কারাজীবন চুকিয়ে নিজলিঙ্গাপ্পা যখন বাইরে এসেছেন তখন তিনি মহীশূরের বিখ্যাত নায়ক। '৪৫ সনে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। পরের বছর নবগঠিত কর্ণাটক কংগ্রেসেরও হাল ধরার দায়িত্ব পড়ল তাঁরই উপর তার পর থেকেই গণপরিষদ, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, পার্লামেণ্টারী বোর্ড —এস নিজলিঙ্গাপ্পা সর্বত্র। '৪৬ থেকে একটানা আট বছর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন তিনি। ওয়ার্কিং কমিটিতে ছিলেন পাঁচ বছর। তদুপরি —'৫২ সন থেকে পাঁচ বছর লোকসভায়।

'৫৬ সনের অক্টোবরে 'বিশাল মহীশূর' রাজ্য বিধানসভায়' নিজলিঙ্গাপ্পা কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হলেন। সুতরাং লোকসভার পালা চুকিয়ে এবার ঘরে ফিরতে হল তাঁকে। '৫৮ সনের মে অবধি সে পদে ছিলেন তিনি। তারপর আবার মহীশূর-দিল্লি এবং আভ্যন্তরীণ দলাদলি।

দীর্ঘ চার বছর পরে নিজলিঙ্গাপ্পা আবার তাঁর পূর্বতন আসনে ফিরে এসে প্রমাণ করলেন, শুধু অভিজ্ঞতায় নয়, বিচক্ষণতায়ও তিনি মহীশূরে প্রবীণের দাবি রাখেন।

২৮. ৬. ৬২

নেহরু, জওহরলাল

চার্চিল বলেন—নেহরু ভয়লেশহীন পুরুষ, দুঃসাহসী সমালোচক বলেন—তিনি লোটাস-ইটার। বিশ্ব বলে—এ চরিত্র দুর্লভ, নেহরু ইতিহাসের গৌরব; অনেকের আন্তরিক ভাষ্য—নেহরু পরম ট্রাজেডি, তিনি হ্যামলেট।

হয়ত সব সত্য, হয়ত সব মিথ্যা। হয়ত দুই-ই সমান সত্য—নেহরু ভারতের জনগণমনঅধিনায়ক, নেহরু সত্যই এক বিস্ময়কর বৈপরীত্য। কিন্তু তবুও চুয়াত্তরতম জন্মদিনে আজ যে নেহরুকে দেখতে পাচ্ছি আমরা, তাঁর মুখের দিকে তাকালে পুরানো সব বিশেষণগুলো যেন মুহূর্তে বাতিল হয়ে যায়, তর্ক মুলতবী থাকে।

চুয়াত্তরে যে মানুষ নতুন করে জন্মাতে পারেন,—চুয়াত্তরে যে মানুষ নিজে স্বপ্ন জগতের সব মায়া কাটিয়ে নতুন জগতের সন্ধানে দুর্জয় সংকল্পে রূঢ় বাস্তবে পা বাড়াতে পারেন—সম্ভবত তিনি ঋতুরাজ। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাতচল্লিশে বসন্ত বলে চিনেছিলেন—সম্ভবত তিয়াত্তরেও নেহরু তাই।

ভুল বলা হল। সম্ভবত নেহরু চিরকাল তা-ই ছিলেন। বৈপরীত্য যেমন নেহরুর স্বভাবে আবাল্য, তেমনি এই নতুন করে জন্মাবার বাসনাও তাঁর আজীবন। ফলে, এই তিয়াত্তর বছরে আমরা যে নেহরুকে পেয়েছি তিনি কখনই এক ব্যক্তি নন। নানা সময়ে নানা অধ্যায়ে নানা ভূমিকায় দেখা সেই মানুষগুলোর অন্তরালে একটি চিরকালীন ব্যক্তিত্বের পরিচয় হয়ত ছিল, হয়ত আছে,—কিন্তু সে জীবনীকারের অনুসন্ধান ফল; জনতার নেহরু অনিবার্যভাবেই চিরনতুন—নানাবিধ।

বার্নার্ড শ' বলেছিলেন—এশিয়ার লেনিন। ভারতের কমিউনিস্টরা এক সময় আখ্যা দিয়েছিলেন—কেরেনস্কি। ইথেল মানিন নাম দিয়েছিলেন—দুনিয়ার সেরা ডেমক্র্যাট; চীনারা বলে—রানিং ডগ অব ইম্পিরিয়ালিজম। ল্যাস্কি বলেছিলেন—সমসাময়িক কালের সবচেয়ে চলমান জননেতা, তথাকথিত প্রগতিশীলেরা বলেন—বাঁধনপ্রিয় গোঁড়া। লুই ফিসার লিখেছিলেন—চার্চিল পারমাণবিক বোমা তৈরীর পেছনে অন্যতম প্রেরণা ছিলেন, কিন্তু তার তাৎপর্য ধরতে পারেন নি; নেহরু বোমার বিরুদ্ধে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তিনি আণবিক যুগের ভাষায় কথা বলেন।…

'…হ্যালো প্রাগ?—হ্যালো পারী? —হ্যালো লণ্ডন? ইজ ইট পীস অব

ওয়ার?—ইজ ইট পীস অব ওয়ার?··· '৩৮ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বক্ষণে সেদিন যে নেহরুকে দেখেছিল পশ্চিম তিনি যেন এক উন্মাদ। আজ লণ্ডন, কাল স্পেন, পরশু চেকোস্লোভাকিয়া —কখনও তিনি ইডেনের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত, কখনও তিনি ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের শিবিরে জেনারেলদের সঙ্গে আগামী ভারতের 'স্বাস্থ্যপান' করছেন, মনে মনে স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনী সংস্কার করছেন, কখনও চেকোস্লোভাকিয়ার ভাগ্য নিয়ে ভাবছেন, ব্যঙ্গ করে লিখছেন—'হ্যালো লণ্ডন?···হ্যালো প্রাগ?—হ্যালো লণ্ডন?···চেম্বারলেন টু গো টু হিটলার এগেন ডে আফটার টুমরো! হি ইজ বিকামিং কোয়াইট গুড এট ক্যারিয়িং মেসেজেস্ বাই এয়ার।

ব্যক্তিগতভাবে নেহরুজীর সঙ্গে পরিচিত জনৈক জীবনীকারের লেখায় পড়েছিলাম—ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর বোম্বাইয়ে কংগ্রেস কর্মীদের একটি সভায় নেহরু ভাষণ দিতে গিয়েছিলেন। সভার কাজ চলেছে, এমন সময় হঠাৎ নেহরুজী এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন, যিনি বক্তৃতা করছিলেন তাঁকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে বললেন—চীনে যুদ্ধ লেগেছে, এমন সময়ে আমাদের এসব সাংসারিক আলোচনা শোভা পায় না।—'উই মাস্ট কাম আইট!—উই মাস্ট জয়েন চায়না।

অনেকে জানেন জওহরলাল সেদিন উদ্যোগী হয় চীনে মেডিকেল মিশন পাঠিয়েছিলেন। য়ুনানের পর্বতকন্দর থেকে মাও সে তুং, চু তে সেদিন আনন্দভবনের ঠিকানায় কৃতজ্ঞতার চিঠি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু অনেকে জানেন না জওহরলাল সেদিন নিজেও চীনে ছুটে গিয়েছিলেন। চুংকিং-এ তের দিনে পাঁচবার নিজের চোখে জাপানীদের বোমা ফেলতে দেখেছিলেন। চীনের মাটিতে চীনা সৈন্যদের ট্রেঞ্চে বিদেশী 'জওয়ান' জওহরলালের মুখের দিকে তাকিয়ে দুনিয়া সেদিন শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল। ফেরার আগে তিনি চিয়াং দম্পাতিকে দু'পাশে দাঁড় করিয়ে ফটো তুলে দেশে ফিরেছিলেন।

কিন্তু সে ছবিটি কী এলবামে অনেকদিন রেখেছিলেন নেহরু? এডগার স্নো—চীনা কমিউনিস্টদের অন্যতম আদি বান্ধব এডগার স্নো পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ক' বছর পরে নেহরুর ঘরে ঢুকে। টেবিলে কমলা নেহরুর ছবির পাশে মাদাম সান ইয়েৎ

সেন। স্নোকে দেখেই হাত বাড়িয়ে ছুটে এলেন নেহরু—'আও চীনা-বিশারদ'—আগে বল ওদের হারতে আর কদিন লাগবে ?'

'—কাদের ?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন স্নো। কেননা, তাঁর জানা ছিল নেহরু কমিউনিস্ট নন, তিনি চিয়াং-এর বান্ধব।

'—কাদের আবার ?—চিয়াং-এর ! কাগজে যতই তার জিতের খবর পাচ্ছি, ততই আমি মুষড়ে পড়ছি !

সে যেন সম্পূর্ণ অন্য নেহরু। তিনি স্নো-কে বলছেন—চিয়াং প্রবাবলি উড নট হ্যাভ লাস্টেড দিস লং উইদাউট আমেরিকান হেল্প'···

এসব ১৯৪৮ সনের কাহিনী। নেহরু আর তখন রোমান্টিক ইণ্টার-ন্যাশনালিস্ট নন, তিনি ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

তার পরের যে নেহরু তার কথা সর্বজনবিদিত। চীন জানেনা গত ২০শে অক্টোবরের পূর্ব মুহূর্তেও তিনি ছিলেন বিশ্বে চীনা কমিউনিস্টদের অকমিউনিস্ট শ্রেষ্ঠতম বান্ধব। পানিকর স্পষ্ট লিখেছেন—ব্রহ্ম সরকার বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছিলেন বলেই আমরা আজ লালচীন স্বীকৃতিকারীদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী নয়ত নেহরুই ছিলেন মুক্তদুনিয়ার প্রথম রাষ্ট্রনায়ক যিনি কমিউনিস্ট চীনকে প্রায় জন্মমুহূর্তেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। মনে পড়ছে বান্দুং-এ চীনের মতলব সম্পর্কে কিঞ্চিৎ স্পষ্ট ভাষায় কথা বলেছিলেন বলে জওহর-লাল রাগে কাঁপতে কাঁপতে সিংহল প্রধানমন্ত্রীর ঘরে চড়াও হয়েছিলেন।

সেই নেহরুকেই সেই চীনের বিরুদ্ধে অবশেষে আজ নিজেই হাতিয়ার হাতে তুলে নিতে হল !—এ কী নিয়তি ? আমার মনে হয় এখানেই নেহরু চরিত্রের চিরকালের ট্রাজেডি, তাঁকে বার বার জন্মাতে হয়।

আরও অনেকবার এমনি ভাবে নতুন করে জন্মেছেন তিনি। আঠার বছর বয়সে কেম্ব্রিজ থেকে তিলক-ভক্ত নেহরু চিঠিতে নির্দ্বিধায় তর্ক করতেন তাঁর মডারেট পিতার সঙ্গে। বলতেন—'দি লিবারেলস আর সিম্পলি হেসনিং দি ডুম অব দেয়ার পার্টি !' কিন্তু পরবর্তীকালে যখন নিজের মতের সপক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন এল তাঁর নিজের জীবনে নেহরু কী সেদিন বহুলাংশে তেমনই আপোষপন্থী নন ? তিনি সুভাষচন্দ্র জয়প্রকাশ-কৃপালনীর মত নেমে আসতে পারেন নি, তিনি মাউণ্ট-

ব্যাটেনের কালে—তাঁর সেই প্রবল ব্যক্তিত্ব নিয়ে সেই মারাত্মক ছোরাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন নি।

অথচ তার মাত্র ক'মাস আগে '৪৬ সনের মার্চ মাসেও কানপুরের কুইন্স পার্কে ভারত শুনেছিল তার নায়ক জওহরলাল জাতিকে কথা দিচ্ছেন—পাকিস্তান দূর অস্ত! আমি কথা দিচ্ছি হাজার বছরেও সে বস্তু হবে না। (···I say with confidence that···Pakistan···can never be achieved···even in one thousand years.)

অথচ যেদিন সে দুর্ঘটনা সম্ভব হল নেহরু সেদিন নিঃসন্দেহে তেমনি আন্তরিক ব্যথিত। যা ছিল সংকল্প তা-ই বৎসরান্তে হৃদয়বিদারক বিষাদ। সেদিনের রাষ্ট্রনায়ক নেহরুকে দেখে জনতারও সহানুভূতি হয়!

এমনি নজীর আরও অনেক—অফুরন্ত। মনে পড়ছে আজাদ হিন্দ ফৌজের দিনগুলোর কথা। ক'মাস আগে এই কলকাতাতেই নেহরু বলেছিলেন—সুভাষ যদি জাপফৌজ নিয়ে দেশে আসে তবে তাঁকে পয়লা রুখব আমি। ক' মাস পরে সেই নেহরুই সকলের আগে ছুটে এসেছিলেন—আজাদ হিন্দ-এর জওয়ানদের সাহায্যার্থে। তিনি তহবিল খুললেন, গাউন চাপিয়ে লাল কিল্লায় ছুটলেন, যুদ্ধ অপরাধে ইংরেজের বিচার করার অধিকার চাইলেন এবং দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—'হ্যাড আই বিন ইন প্লেস অব সুভাষ বোস আই উড হ্যাভ ডান একজাক্টলি হোয়াট হি হ্যাজ ডান!'

স্বাধীনতার পরে ভারতের কর্ণধারের আসনে বসেও সে জওহরলাল অপরিবর্তিত। তাঁর আচারে আচরণে চিরকালের সেই শিশু,—এখনও এই চুয়াত্তরে পা দিয়েও তিনি বেপরোয়া রোমান্টিক।

তিনি উপযুক্ত অর্থের কথা না ভেবে দুঃসাহসিক পরিকল্পনায় হাত দেন, কার্যত কী হবে না হবে না ভেবে রাজ্য ভাঙ্গা-গড়ায় আস্কারা দেন,—এক হাতে শত দায়িত্ব নিয়ে ব্যুরোক্র্যাসির পত্তন করেই ব্যুরোক্র্যাটদের সম্পর্কে রূঢ়তম বাক্য ব্যবহারে ইতঃস্তত করেন না, তিনি কখনও বস্তী পোড়াচ্ছেন, কখনও চোরাকারবারীকে লাইটপোস্টে ফাঁসী দিচ্ছেন, কখনও বা স্কুলের ছেলেমেয়েরা কেমন ব্যাগে বই নিয়ে চললে ভাল হয় তাই ভাবছেন। সন্দেহ নেই,—তাঁর সব

ভাবনার আদি ভারতের প্রতি তাঁর ভালবাসা, কিন্তু তাঁকে স্বীকার করেছে বলেই ভারত তাঁর এই স্বপ্ন-বিলাসে কতখানি রাজী—তা দেখাও বোধহয় ছিল নায়ক জওহরলালের দায়িত্ব। বিশেষ, নেহরু নিজেই বলেন—নায়ক জনতা ব্যতিরেকে নয়!

মনে পড়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যখন উপজাতীয় হাঙ্গামা জওহরলাল তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নন, অন্তর-বর্তিকালীন সরকারে মন্ত্রী-প্রধান মাত্র। কিন্তু দুঃসাহসীর মত তবুও তিনি ছুটেছিলেন সেখানে। ওরা তাঁর পথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে গুলী ছুঁড়ছিল কিন্তু জওহরলালকে তবুও লাণ্ডিকোটাল থেকে ফেরান যায় নি,—বিহারে তিনি বোমা ফেলার সংকল্প ঘোষণা করে-ছিলেন—কিন্তু সমালোচকেরা বলবেন —তিব্বত উপলক্ষ্যে তাঁর সে কণ্ঠস্বর শোনা যায় নি—শোনা যায়নি লাদাকে চীনা হানাদার নামবার পরেও। জওহরলাল যখন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন তখন হাতে আর বিকল্প নেই।

তবুও যে 'নেহরুজী কী জয়' ধ্বনি নিয়ে ভারত আজ তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার একমাত্র কারণ—আমাদের জানা আছে এটাই তাঁর স্বভাব। তিনি স্বপ্নবিলাসী। তিনি কখনও স্বপ্নলোকে, কখনও অসহায়ের মত কঠিন বাস্তবে—তখন সত্যিই তিনি ভিন্ন পুরুষ। তাঁর ক্রোধ তখন 'পুণ্য ক্রোধ' হলেও সত্যিই ক্রোধ,—চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জই।

[নেহরুজীর চুয়াত্তরতম জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত।] ১৪. ১১. ৬৩

[১৯৬৪ সনের ২৭শে মে বুধবার বেলা ২টার সময় জননায়ক জওহরলাল শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। তিরো-ভাব দিনে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর ৫ মাস ১৩ দিন। নীচের রচনাটি ২৮শে মে তারিখে প্রকাশিত।]

অনুগত এবং অন্তরঙ্গ সহচরদের একজন বলেছিলেন,—তিনি আমাদের অশ্বত্থ। আজ অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবে, সেই বিশাল প্রাচীন বটবৃক্ষ যখন সহসা তার পরম নির্ভর ছায়া-দানে বিরত; সেই প্রচণ্ড, প্রকাণ্ড শূন্যতার মুহূর্তে বার বার জিজ্ঞাসাচিহ্ন হয়ে পঁয়তাল্লিশ কোটি মানুষের সামনে উঁকি দিয়ে ফিরছে সেই ঐতিহাসিক প্রশ্ন—নেহরু কী আমাদের জীবনে কেবলই অশ্বত্থ ছিলেন? তুলনাহীন সর্বগ্রাসী ব্যক্তিত্ব অপরিমেয় প্রাণৈশ্বর্য,

অনন্ত সহনশীলতা আর নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার আশ্বাস—প্রায় অর্ধশতকের বিরামহীন রাজনৈতিক জীবনে এই কি তাঁর প্রথম এবং শেষ পরিচয়? চোখের সামনে হাজার হাজার বর্গ-মাইলব্যাপী যে বিশাল ভারত, দৃষ্টির আড়ালে আধুনিক ভারতের যে জটিল মানসলোক সেদিকে তাকালেই জানা যাবে নেহরু, একালের ভারতের দ্বিতীয় আকবর, দ্বিতীয় অশোক নেহরু—সেখানে আরও বিরাট, আরও স্বরাট, আরও অমোঘ। তিনি কখনও দ্বিতীয় চার্চিল, কখনও দ্বিতীয় লেনিন, কখনও দ্বিতীয় রুজভেল্ট। পৃথিবী যদি সীমারেখা হয় তবে ভারতের নেহরু কখনও কখনও তদতিরিক্ত; বিশ শতকের ইতিহাসে তিনি নেতৃত্বের নূতন দিগন্ত।

গেল পঞ্চাশ বছরের ভারতের রাজনৈতিক জীবনে নেহরুজীর যে ভূমিকাটি আজ বিশেষ করে মনে পড়ছে, ভারত চিরকাল মনে করে রাখবে সে সংগ্রামী নেহরু। কি জনপ্রিয়তায়, কি প্রভাবে—গান্ধীজীর পরে নেহরু ভারতের হৃদয়ের রাজা।

দেশের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা চেতনাকে তিনি যেভাবে আলোড়িত, উদ্ভাসিত করেছেন তেমন আর কেউ নন। ১৯৪৭ সনের পরেও স্বাধীন ভারতে নেহরু সেই বিস্ময়কর সেনা-নায়ক। নেহরু জীবনের এই অখণ্ডতা, বলা বাহুল্য, আমাদের জাতীয় সাধনার ধারাবাহিকতার পেছনে অন্যতম প্রেরণা,—জাতীয় প্রাণ-ভাণ্ডারে অন্যতম বল। এ সৌভাগ্য শুধু আজ নয়, আগামী দিনের ভারতকেও স্বীকার করতে হবে। ভারত ইতিহাসে ক্লান্তিহীন যোদ্ধা নেহরুর আসন সেখানে নির্দিষ্ট।

যুদ্ধে নেহরু বিপ্লবী ছিলেন। শুধু এজন্যে নয়, লাহোর কংগ্রেসের বহু আগেই তিনি সমাজতন্ত্রবাদে দীক্ষা নিয়েছিলেন বা পশ্চিমী বিপ্লববাদ সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ এবং বোধ গভীর ছিল,—ভারতের ক্ষেত্রেও সংঘাতকে তিনি অনিবার্য বলেই মেনে নিয়েছিলেন। ফলে প্রাক্-স্বাধীনতা কংগ্রেসের প্রতিটি প্রগতিশীল প্রস্তাবের পেছনে যেমন অন্য ধরনের গান্ধী-শিষ্য নেহরু উপস্থিত, তেমনি স্বাধীনতা-পর ভারতে নব-জাতি গঠনের যে ব্যাপক বিপ্লবের প্রস্তুতি এবং কর্মকাণ্ড সেখানেও গেল সতের বছর ধরেই নেহরুজীই ভারতের

দার্শনিক-তাত্ত্বিক ; তিনি আমাদের নায়ক,—আমাদের কণ্ঠস্বর। হয়ত-বা তার চেয়েও বেশী,—নেহরুই এই নব-ভারতের আত্মাস্বরূপ। ভারত ইতিহাসের এক অন্যতম যুগসন্ধিক্ষণের অধিনায়ক নেহরু তাই যুগপুরুষ।

দেশ-বিভাগ, মহাত্মার আকস্মিক তিরোভাব, কাশ্মীর যুদ্ধ, হায়দ্রাবাদ, তদুপরি আরও নানা সমস্যায় বিব্রত এবং নানা ক্ষতে পীড়িত ভারত-স্বাধীনতার সেই আলো-আঁধারি প্রহরগুলোও যে নিঃশঙ্ক এবং নিশ্চিত জীবনকে রক্ষায় সমর্থ হয়েছিল তার একটি কারণ নেহরুর অতন্দ্র প্রহরীর দৃষ্টি এবং ব্যক্তিত্ব। সর্দার প্যাটেলের ঋজুতা এবং নেহরুর অপ্রতিরোধ্য হৃদয়ের আবেগ সেদিন ভারতের শ্রেষ্ঠ দুই মূলধন। নেহরুর সেই যুদ্ধ পরবর্তীকালে ক্রমে আরও দুঃসাহসী কেন না, ক্রমেই তিনি সমাজদেহের অন্তর্মুখী। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতিভেদ-প্রথা এই তিন শত্রুর বিরুদ্ধে নেহরুর আপোসহীন যুদ্ধ আধুনিক ভারতের জীবনে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁর জীবৎকালেই ভারতে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে আইন পাশ হয়েছে, তাঁর উদ্যোগেই প্রবল প্রতিরোধের মধ্যেই ভারত হিন্দু-কোড বিলের মত যুগান্তকারী ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। ভারতের সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভবত ওয়াটারলুর চেয়ে ছোট ঘটনা নয়। গান্ধী শিষ্য নেহরু সেখানে ওয়েলিংটন।

বিপ্লবী নেহরু বিপ্লবী হয়েও বাঁধা সড়কে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি শান্তির পথে, সম্মতির পথে আস্থাবান ছিলেন। সেদিক থেকে নেহরু বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ডেমক্র্যাট। ভারতের গণতান্ত্রিক জীবন-বিশ্বাসে, ভারতের রাজনৈতিক পথ-নির্বাচনে সেদিক থেকেও নেহরু এক ধ্রুবতারা। আমাদের এই শাসনতন্ত্র, এই পার্লামেণ্ট, এই সম্মতিভিত্তিক রাষ্ট্রতন্ত্রে তাঁর স্পর্শ সর্বত্র। এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোতে যখন একে একে গণতন্ত্রের দীপ নিবে যাচ্ছে ভারত তখনও যে জনতার রায়কেই চরম এবং পরম বলে ভাবে—এই দুর্লভ ঐতিহ্য যাঁরা আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেলেন নেহরু তার অগ্রগণ্য। তাঁর গণতন্ত্র-বিশ্বাস শুধু আমাদের রাষ্ট্রীয় সত্তাকে দৃঢ় ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত করেনি, তিন-তিনটি সাধারণ নির্বাচনের সাক্ষী থেকে নেহরু আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন—জনতাই শেষ কথা।

তবে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের জীবনে নেহরুর তার চেয়েও বড় কীর্তি—ভারতের এই বিস্ময়কর কর্মযজ্ঞ। নয়াদিল্লির যোজনা-ভবন যখন স্বপ্নেও অভাবিত নেহরুজী আর সুভাষচন্দ্রই তখন ভারতে শুনিয়েছিলেন পরিকল্পনা ছাড়া মুক্তির পথ নেই। জওহরলাল সেদিন জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান হয়ে যে সঙ্কল্পকে আমাদের গোচরে এনেছিলেন,—সেটি যে কাগজ আর কলমের খেলা নয় সেটিই তিনি জানিয়েছিলেন স্বাধীনতার পরক্ষণে। ভারতের পাঁচশালা যোজনা তার লক্ষ্য, তার পথ, তার প্রাণ সবই যেন অতঃপর নেহরু। তিনিই ভিলাই, ভাখরা, চিত্তরঞ্জন, পরাদীপকে আমাদের কাছে একালের মন্দির-মসজিদ বলে চিনিয়েছেন; তিনিই আমাদের গরুর গাড়ির যুগ থেকে স্পুটনিকের যুগের পথ দেখিয়েছেন, তিনিই আমাদের কাছে স্বাধীনতাকে সত্যমহিমায় উদঘাটিত করেছেন। নেহরু যদি ভারতের 'শেষ মোগল' হন, তবে এই পাঁচশালা যোজনাই তাঁর ফতেপুর সিক্রি, তাজমহল।

ভূমি সংস্কার, সমাজ সংস্কার, রাজনৈতিক মন্ত্রদীক্ষা, শিল্পবিপ্লব—সর্বত্র সেই প্রাণবায়ু—নেহরু। নেহরু যদি তার কোনটিই সম্পূর্ণ করে না গিয়ে থাকেন তা হলেও ক্ষতি নেই। সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানবিক এবং রাজনৈতিক যে চার চাকায় ভর করে ইতিহাস চলে নেহরু সেই চক্রচতুষ্টয়-কেই যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে রেখে গেছেন। ইতিহাসে কদাচিৎ কেউ এক হাতে তা করতে পারেন। পথ চিহ্নিত হয়ে গেছে, রথ চলতে সুরু করছে! অতঃপর ভারতের ইতিহাস অভ্রান্ত পথিক। কারও সাধ্য নেই—ভারত আবার থামে, অথবা পেছনে তাকিয়ে পলায়নের কথা ভাবে। ভারত-ইতিহাসে নেহরুর অমোঘতা সেখানেই।

শুধু ঘরোয়া-কাহিনীতেই নয়, নেহরু আমাদের বিশ্ব-পরিচয়েও এক ঐতিহাসিক কাহিনী। গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত স্পেনের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে, কখনও চেকোশ্লোভাকিয়ায়, কখনও চীনে,—কখনও 'য়ুনো'র মঞ্চে, কখনও হোয়াইট হাউসের সিঁড়িতে, কখনও ক্রেমলিনে—নেহরু একালের পৃথিবীতে আমাদের সবচেয়ে বাঙময়, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দূতই নন, ভারত-পথিক নেহরু বিশ শতকের নাতিদীর্ঘ তালিকার অন্যতম বিশ্ব-নাগরিক। ভারতের স্বতন্ত্র-পথচারী বৈদেশিক

নীতি, ভারতের গর্বের ধন নিরপেক্ষতা-বাদ যেমন তাঁরই তীক্ষ্ণ, দূরপ্রসারী দৃষ্টির কীর্তি, তেমনই আফ্রো-এশিয়া সংহতি, এশিয়া-আফ্রিকার মুক্তিযুদ্ধেও তিনি এক উদার, সাহসী, ক্লান্তিহীন মূর্তি। তাঁর প্রেরণা, তাঁর কণ্ঠস্বর মানব ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অনিবার্য, চিরকালীন সম্পদ। ঊনিশ শতকের দৃষ্টিতে রোমান্টিক কর্মযোগী নেহরু যদি কাভ্যুর আর গেরিবল্ডির সংমিশ্রণ হন, বিশ শতকের পৃথিবী বলবে নেহরু রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী তো বটেই—উইলকি, উইলসন, রাসেল, আইনস্টাইন একালের আদর্শবাদী আন্তর্জাতিকতাবাদীদের একমাত্র সার্থক সমন্বয়। এবং সকলের সঙ্গে মিল থাকা সত্ত্বেও, নেহরু তবু নেহরু-ই—তিনি অদ্বিতীয়, একক। ইতিহাসের পথপ্রান্তে এ মানুষ কি শুধুই আমাদের প্রিয়, পূজ্য, পরিচিত বটবৃক্ষ? গতকাল নিদারুণ মধ্যাহ্নের ভারতের দিকে তাকালে হয়ত তাই মনে হত। মহীরুহের পতন ঘটেছে। পঁয়তাল্লিশ কোটি আশ্রয়হীন পাখী শূন্য আকাশে ডানা ঝাপটাচ্ছে; শোকে, শঙ্কায় আর্তনাদ করছে। এই অসহায় মুহূর্তে হয়ত সেটাও একটা সত্য। কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য জানিয়ে গিয়েছেন নেহরু নিজে, মাত্র ক'দিন আগে তাঁর শেষ সাংবাদিক সম্মেলনে। দ্যুতচ্ছলে সেদিন তিনি বলেছিলেন—'লাইফটাইম ইজ নট এণ্ডিং সো, ভেরি সুন!'—আমার জীবনকালে অচিরেই শেষ হচ্ছে না। সম্ভবত ইতিহাসও তাই বলবে। ১৯৬৪ সনের ২৭শে মে-ই নেহরু-কালের শেষ তারিখ নয়।

[৩১শে মে, ১৯৬৪ সনে 'রবিবাসরীয় আলোচনী' বিভাগে প্রকাশিত।]

'যদি' দিয়ে আজ আর কোন কথা নয়।

সত্য একটিই: নেহরু আর নেই। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না কাল থেকে ভারত আর কখনও সেই আশ্চর্য প্রাণপুরুষকে চোখে দেখতে পারবে না, স্পর্শ করতে পারবে না, তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে জয়হিন্দ' ধ্বনি তুলতে পারবে না। আমরা তবুও সৌভাগ্য-বান। নেহরু যে বায়ু থেকে নিঃশ্বাস নিয়েছেন আমরাও সেই বাতাস বুকে টেনেছি, নেহরু যে ভারতের পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছেন সেই পথেই ধুলি উড়িয়েছি, দু' ধারে মেলা সাজিয়েছি; নেহরুর পিছু পিছু নিত্য

যে কুম্ভমেলা সেখানে আমরাও ছিলাম। দুঃখ আগামী দিনের ভারতের জন্য। তারাও নেহরুকে পাবে, কিন্তু আমাদের নেহরুকে পেল না। কখনও সমুদ্রের মত গভীর, কখনও ঝড়ের মত উদ্দাম, কখনও দার্শনিকের মত নিস্পৃহ, কখনও শিশুর মত চঞ্চল যে বিস্ময়কর নেহরু তাঁর দেখা পেল না। তাঁর ভালবাসার দেশ, তাঁরই হাতে গড়া ভারতের ধ্যানলোক,—সবই থাকবে। কিন্তু নয়াদিল্লির প্রধানমন্ত্রী ভবন থেকে বুধবার বেলা দুটোয় যে মানুষটি ইতিহাসে চলে গেলেন, তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। ভবিষ্যৎ যদি, অতএব, আমাদের কালকে ঈর্ষা করে তবে তাকে দোষ দেব না। ওরা শতাব্দীর তৃতীয় মহান কান্নার লগ্নটি থেকেও বঞ্চিত হল।

'যদি' দিয়ে আজ আর কোন কথা নয়। হয়ত তিনি নেপোলিয়ান হতে পারতেন, হয়ত লেনিন, হয়ত বিসমার্ক, হয়ত চার্চিল, হয়ত গান্ধী। নেহরু কি হতে পারতেন তা নিয়ে বিস্তর তর্ক হয়েছে, বিস্তর গবেষণা। আজ কাঁদতে কাঁদতে মনে হচ্ছে: তার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমরা কাঁদছি, কারণ তিনি নেহরু ছিলেন। শুধু নেহরু। কারও মতো নয়, কারও অভিমত অনুযায়ী সংশোধিত কোন পুরুষের প্রতিমা নয়, —আমরা এমন করে কাঁদছি তিনি তাঁর মত ছিলেন বলেই। পঁচাত্তরেও 'ঋতুরাজ' সম্ভবত একমাত্র তিনিই থাকতে পারেন। এই পৃথিবীতে সম্ভবত রাষ্ট্রনায়ক হয়েও একমাত্র তিনিই ঘরে এবং মাঠে, স্বদেশের লোকসভায় এবং বিশ্বের কূটসভায় একটিমাত্র মুখচ্ছবি নিয়েই চলাফেরা করতে পারতেন। মুখোসহীন এমন রাজনীতিক নেহরুই হতে পারেন। একমাত্র নেহরুই। কেননা, তিনি জন-নায়ক হয়েও আমাদেরই মত ছিলেন। তিনি 'নেহরু' হয়েও মানুষ ছিলেন।

ব্যক্তি হিসেবে দুর্লভ জাতের রাষ্ট্র-নায়ক। তিনি সমুদ্র ভালবাসেন, পর্বত ভালবাসেন, — প্রবাহমান নদী, তারকাখচিত আকাশ ভালবাসেন। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগের মুহূর্তে তাঁর তিন তিনটি দিন বুঝি তাই কেটেছে রাজধানীর পাষাণ কায়ার বাইরে—দেরাদুনের পাহাড়ে। দিন কয় পরেই আবার পাহাড়-পুরীতে নিমন্ত্রণ অপেক্ষা করছিল তাঁর। কালিম্পং সে অন্তরঙ্গ দর্শকের দৃষ্টিস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হল। নেহরুর মত ধ্যানমগ্ন গম্ভীর দৃষ্টি নিয়ে এরপর কে

আর পাহাড়ের দিকে তাকাবে? হয়ত এরপরও কবিরা বন্দনা করবেন, অভিযাত্রীরা আসবেন—কিন্তু নেহরু এই একজনই ছিলেন। বিশ্বের অন্যতম বিশাল রাষ্ট্রের ব্যস্ততম অধিনায়ক হয়েও তিনি—একমাত্র তিনিই দুষ্ট বালকের মত ক্ষণে ক্ষণে পালাতে পারতেন।

প্রকৃতিতে নিঃসঙ্গ হয়েও নেহরু এক আশ্চর্য জনতার মানুষ। তিনি জনতাকে ভালবাসতেন। ভারতীয় জনতা তাঁর কাছে শুধু স্তূপীকৃত কর্তব্যপুঞ্জ নয়—তাঁর প্রেরণা, তাঁর উত্তেজনা, তাঁর সর্বস্ব। জনতার সঙ্গে কথা বলার জন্যে ১৯৩৫ সনে জওহরলাল পাঁচ মাসে পঞ্চাশ হাজার মাইল ঘুরেছিলেন। ভুবনেশ্বর পর্যন্ত সে পরিক্রমা ছিল একটানা। 'ভারত সন্ধানী' ষোল বছর বয়সে সেই যে পথে নেমেছিলেন তারপর কোনদিন আর দ্বিতীয় ঘরের কথা ভাবেননি। ভারতের এই ধূলি, এই পথ প্রান্তর—সে-ই ছিল তাঁর স্থায়ী ঠিকানা, প্রিয়তম আশ্রয়। গান্ধীজী ছাড়া পৃথিবীর কোন জননেতাই বোধ হয় কোন দিন মাটির এত কাছাকাছি ছিলেন না। হ্যারো-কেম্ব্রিজ, ইনারটেম্পল ফেরত এই 'রাজকুমার' সেদিক থেকেও অনন্য রাষ্ট্রনায়ক। আমরা তাঁকে সব অধিকার দিয়েছিলাম। সুদূর ১৯৩৭ সনে 'চাণক্য' নামে তিনিই প্রশ্ন তুলেছিলেন—'অ্যাণ্ড ইজ ইট নট পসিব্‌ল ছাট জওহরলাল মাইট ফ্যান্সি এ সীজার?' নেহরু তবুও শেষ দিন পর্যন্ত নেহরুই ছিলেন! তিনি জনতাকে সম্রাট বলে মেনে নিয়েছিলেন।

অনন্য দৃষ্টিভঙ্গীতেও। জিন্না একবার বলেছিলেন—'দিস ম্যান ইজ আউট টু ক্রিয়েট কেওস।' নেহরু উত্তর দিয়েছিলেন—'ইয়েস, আই অ্যাম!' তিনি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এক মূর্তিমান বিতর্ক। তাঁর বিরামহীন জিজ্ঞাসায় প্রবীণেরা বিরক্ত সংশয়ীরা পলাতক,—পিতৃপ্রতিম বাপু কখনও আশ্বস্ত, কখনও চিন্তিত। নেহরু কংগ্রেসের প্রাণলক্ষণ,—তাঁর প্রাণবেগে জাতীয় প্রতিষ্ঠান ধাপে ধাপে নবজাতক। বাইরের পৃথিবীতেও তাই। স্পেনের গৃহযুদ্ধ, চেকোশ্লোভাকিয়া, চীন, ইন্দোনেশিয়া নেহরু সর্বত্র ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, আগ্নেয় জিজ্ঞাসাচিহ্ন। পরবর্তী কালে তাঁর একই ভ্রূকুটি দেখা গেছে কোরিয়া, ইন্দোচীন, সুয়েজ, হাঙ্গেরী, কঙ্গো উপলক্ষে। বিশ্বের অভি-

ভাবকেরা তাঁকে নিয়ে বত্রত, অভিভাবকহীনেরা তাঁর নামে মুখর। কেননা, একালের গৃহস্থ রাষ্ট্রনায়কদের পৃথিবীতে নেহরুই একমাত্র লড়িয়ে যিনি সীমানার বিধিনিষেধ মানেন না। ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরে বসার পরও তিনি ছিলেন বিশ্ব যোদ্ধা। টেবিলে কাগজ কাটা ছুরি ছিল তাঁর তলোয়ারের মত। নেহরু কথা বলতে বলতে বালকের মত সেটি নিয়ে খেলা করতেন।

কবি হৃদয়ের মানুষ। মহাদেব দেশাই বলেছিলেন—তার একটা প্রমাণ নেহরুর হাতে কাটা সুতা। সেই কবে থেকে দেখছি, মোটা সুতো কোনদিনই মানুষটির হাত দিয়ে বের হল না! প্রমাণ আরও অনেক আছে। 'আত্মজীবনী' 'ভারত-সন্ধানে' 'কন্যার নিকট পিতার পত্র' 'বিশ্ব ইতিহাসের প্রসঙ্গ'-এর লেখক নেহরু শুধু এক অপ্রতিরোধ্য অনুসন্ধানী রাষ্ট্রনায়ক নন—পাতায় পাতায় তিনি কবি।

ব্যক্তিগত জীবনে টকটকে লাল গোলাপকুঁড়ির মত তাজা, ধবধবে সাদা খাদির মত নির্মল, কীটস-এর কবিতার মত পবিত্র সেই নেহরুই আবার রাজনৈতিক জীবনে সিংহের মত সাহসী তালোয়ারের মত তীক্ষ্ণ। পাঁচ ফুট দু' ইঞ্চি উঁচু, দেড়শ' পাউণ্ড ওজনের সেই রোমান মূর্তিটি যেন দ্বিতীয় হিমালয়। তেমনি উত্তুঙ্গ, তেমনি সর্বংসহ তেমনি অটল। স্বাধীনতা-পূর্ব দিনের কাহিনী আজ অবান্তর, ইরাবতী তীরে সাদা ঘোড়ার পিঠে আরূঢ় লাহোর কংগ্রেসে তরুণ সভাপতিকে দেখে বিশ্ব যে প্রতিজ্ঞাকে প্রত্যক্ষ করেছিল ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্টের মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সেই যোদ্ধা তেমনই আপসহীন, তেমনি বিদ্রোহী। পরবর্তী সতের বছরের কাহিনীও তাই। চার্চিল বলেছিলেন—উই আর টার্নিং ওভার ইণ্ডিয়া টু মেন অব স্ট্র লাইক দি কাস্ট হিন্দু মিঃ নেহরু, অব হুম ইন এ ফিউ ইয়ারস নো ট্রেস উইল রিমেন!'

চার্চিল যে হিসেবে ভুল করেছিলেন তার প্রমাণ আজকের ভারত আজকের জগত। ক' বছর আগে (১৯৬১) হোয়াইট হাউস-এ দার্শনিক এবং প্রবক্তা' নেহরুকে স্বাগত জানাতে গিয়ে তাঁর সুদূরের ভাব শিষ্য কেনেডি বলেছিলেন—নেহরুর নিরপেক্ষতাবাদ হয়ত সঙ্গত কারণেই আমেরিকার বিরক্তের হেতু হতে পারে—'বাট ইট ডাজ মিন ছ্যাট ইণ্ডিয়া ম্যাটারস্!'

অর্ধশতক জুড়ে ভারতের ধ্যানে কর্মে তার অজস্র দানের মধ্যে নেহরুর

অন্যতম কীর্তি এটাই,—ইণ্ডিয়া ম্যাটারস্! শুধু জনবল হেতু নয়, শুধু ভবিষ্যতের সম্ভাবনার জন্যে নয়—ভারতের এই প্রতিষ্ঠার কারণ তার পথের নিজস্বতা, তার দৃষ্টিভঙ্গীর বিশিষ্টতা এবং সেই আদর্শে ভারতের দৃঢ়তা। চীনা আক্রমণের অব্যবহিত পরে নেহরুর আহ্বানে বিশ্ব যেভাবে সাড়া দিয়েছিল গলব্রেথ তা দেখে সবিস্ময়ে বলেছিলেন—সদ্যোজাত একটা জাতির পক্ষে এই সম্মান অভাবিত। নেহরুই তাঁর নিজের জীবন, তাঁর একাগ্র সাধনা দিয়ে আমাদের জন্য সেই দুর্লভ গৌরব অর্জন করেছিলেন। গণতন্ত্র, সমাজ-তন্ত্র, গোষ্ঠীনিরপেক্ষতা এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব এই চারি স্তম্ভেই জগতের বিস্ময় আজকের ভারতসৌধ। এ কীর্তি নিশ্চয় কোন 'মৃণালভুক্' বা 'হ্যামলেট'-এর সাধ্য নয়।

'গুরুদেবের সুরে বাঁধা, মহাত্মার জীবন-কর্মে সাধা' নেহরু হয়ত বা কখনও কখনও রোমান্টিক, কখনও দার্শনিক—কিন্তু সেটা তাঁর শেষ পরিচয় নয়। নেহরু প্রথম এবং শেষ পরিচয়ে নিশ্চিতভাবেই রাষ্ট্রনীতিবিদ। ভারতে তিনি যেমন একটি যুগ, বিশ্বেও তাই। এশিয়া আফ্রিকার দেশে দেশে আজ যে ঘুমভাঙা কলরব, ভারতের নেহরু তার অগ্রদূত। বান্দুং বেলগ্রেড শেষ সংবাদ নয়। গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতার দুঃসাহসী কারিগর নেহরু কি 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান', পারমাণবিক বিষ মুক্ত পৃথিবীরও প্রথম শিল্পী নন? নেহরু বলেছিলেন—লজ্জার কথা! এতদূর এসেও আমরা মাটির নীচে ঘর খুঁজছি, বিষবাষ্প থেকে বাঁচার জন্যে ইঁদুরের মত আশ্রয় গড়ছি। আইনস্টাইন তাই এগিয়ে এসে সেই বসন্তদূতকেই জড়িয়ে ধরেছিলেন, সাদা খদ্দরে মোড়া সেই মানুষটিকে, বুকে যাঁর বার্ধক্যেও লালগোলাপ, হাতে চন্দন কাষ্ঠের ন্যায়দণ্ড। বলেছিলেন—আমাদের একমাত্র ভরসা তুমিই। আরও বলে-ছিলেন—তোমার পদচিহ্নই আগামী পৃথিবীর কক্ষপথ।

আমরা যেন সেই চিহ্নগুলো মুছে না ফেলি।

নেহরু, বি. কে.

'আনন্দ ভবন'-এর ছেলে। মায়ের নাম—রামেশ্বরী নেহরু। বাবার নাম—ব্রিজলাল নেহরু। ছেলের নাম—'বি. কে. ;' অর্থাৎ ব্রিজকুমার নেহরু।

স্বদেশীওয়ালাদের বাড়ী হলেও বাবা ছিলেন সরকারী কর্মচারী।

বার্মায় মস্ত কাজ করতেন তিনি। ব্রিজলাল ছিলেন সেখানকার অ্যাকাউন্ট্যান্ট-জেনারেল। (এখন অবশ্য শান্তিপূর্ণ অবসরের জীবন যাপন করছেন।)

ফলে, বাল্যশিক্ষা সেখানেই, রেঙ্গুনে। কলেজ—এলাহাবাদে। অন্যান্য শিক্ষা 'লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস' এবং কিছুকাল 'ইনার টেম্পল'-এ।

ব্যারিস্টারী পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়ে '৩৪ সনে বি. কে. ইণ্ডিয়ান সিভিলসার্ভিস-এ যোগ দিয়ে বসলেন। এবং বলা বাহুল্য, যথারীতি উত্তীর্ণ হয়েও গেলেন। সে ১৯৩৪ সনের কথা। 'বি কে'র বয়স তখন মাত্র পঁচিশ।

দেশে ফেরার পর প্রথমাবস্থায় কিছুকাল কাটল পাঞ্জাবে। তারপর থেকে ভারতের অন্যতম আই-সি-এস বি. কে কখনও দিল্লীতে, কখনও বিদেশে। ইতিমধ্যে দেশে বিদেশে যে সব পদে কাজ করেছেন তিনি তার মোটামুটি ফর্দটিও অতিশয় দীর্ঘ। শুধু এইটুকুই উল্লেখ করছি যে, ভারতের বর্তমান 'কমিশনার জেনারেল অব ইকনমিক এফেয়ার্স, শ্রী বি কে নেহরু শুধু যে আমাদের অর্থ, শিক্ষা ইত্যাদি দপ্তরে বিবিধ উচ্চপদে কাজ করেছেন তাই নয়, তিনি অস্ট্রেলিয়া এবং সুদানেও আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। তাছাড়া কমনওয়েলথ অর্থনৈতিক সম্মেলন, ইণ্টার ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক, ইউ. এন ইত্যাদি বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। সর্বশেষ যা করেছেন সে, তৃতীয় পরিকল্পনা উপলক্ষে মার্কিন দেশের সঙ্গে সেই বিখ্যাত আর্থিক চুক্তিটি সম্পাদন।

শোনা যাচ্ছে শ্রী বি. কে. নেহরুর এবার মার্কিন দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত হওয়ার সম্ভাবনা। খবরটা সম্ভবত চমকপ্রদ নয়, কেননা, বি. কে. নেহরুর পক্ষে সেটা মোটেই দেশ-বদল নয়। অনেকেই জানেন না, ভারতের আর্থিক বিষয়ক 'কমিশনার জেনারেল' এর আপিস এখনও ওয়াশিংটনে।

তাছাড়া অনেকেই হয়ত এটাও জানেন না যে ইত্যাদি ছাড়াও রাষ্ট্রদূত হওয়ার আরও একটি 'বিশেষ' যোগ্যতা আছে ব্রিজকুমারের। তাঁর স্ত্রী ম্যাগডালেন ফ্রিদ মান। '৩০ সনে লণ্ডনে এই হাঙ্গেরিয়ান তরুণীটির সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওঁর। ওঁরা বিয়ে করেছেন '৩৫ সনে।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য খবর:
লনিন পুরস্কার বিজয়িনী আফ্রো-
শীয় সংহতি আন্দোলনের অন্যতম
নত্রী রামেশ্বরী নেহরু আনন্দভবনের
ই বিজুর মা। ২০. ৭. ৬১.

[শ্রী বি. কে. নেহরু ১৯৬২ সনে
ার্কিন দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত
ন।]

নহরু, রামেশ্বরী

কলকাতায় যেমন জোড়াসাঁকোর
াকুরবাড়ী, এলাহাবাদে তেমনি
আনন্দ ভবন'। দু' বাড়ীতেই তখন
দিগ্বিজয়ের যুগ।

ঠাকুরবাড়ীর একটি মেয়ের বিয়ে
ল পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবের একটি মেয়ে
বৌ হয়ে এল এলাহাবাদে, 'আনন্দ
ভবনে'। প্রায় সমসাময়িক ঘটনা।
যাগাযোগ এমন, খ্যাতিতেও দু'জনে
প্রায় সমান সমান। কৃতিত্ব দু'জনেরই
র্বতপ্রমাণ।

সরলা দেবী কাগজ চালাতেন।
কাগজের নাম—'ভারতী'। রামেশ্বরী
াহসা ততখানি এগিয়ে যেতে পারলেন
া। তিনি বনেদী ঘরের মেয়ে। বাবা
ছিলেন তাঁর পাঞ্জাবের বিখ্যাত নায়ক
রাজা নরেন্দ্রনাথ। স্বামী খ্যাতনামা
াজ-কর্মচারী ব্রিজলাল নেহরু।
সুতরাং বিয়ের পর বছর পাঁচেক
কাটল ঘোমটার আড়ালেই। কিন্তু
আনন্দ ভবনের প্রতিটি জানালায়
দরজায় তখন ঝড়ের বেগে বয়ে
চলেছে মুক্তির হাওয়া। সুতরাং ক'
বছর কাটতে না কাটতেই দেখা গেল
নতুন বৌ ঘোমটা সরিয়ে কলম নিয়ে
বসেছে। সে সরলা দেবী হয়েছে।
সেও কাগজ করবে একখানা।
মাসিক কাগজ। মেয়েদের কাগজ।

কাগজটার নাম ছিল—'স্ত্রী দর্পণ।'
সম্ভবত হিন্দি ভাষায় এ কাগজ-টাই
প্রথম মহিলাদের কাগজ। প্রায়
ষোল বছর (১৯০৯—) একটানা বের
হয়েছিল কাগজটি। জন্ম দিন থেকে
শেষদিন পর্যন্ত সম্পাদিকা ছিলেন
তার রামেশ্বরী নেহরু—নেহরুদের
বাড়ীর বৌ।

শুধু কাগজ নয়, 'বাড়ীর বৌ'
সেদিন আরও কয়েকটি এমন এমন
কাণ্ড করেছিলেন যা সেকালের
নিয়মে রীতিমত লোমহর্ষক। যথা:
সুদূর ১৯০৯ সনে তিনি 'প্রয়াগ মহিলা
সমিতি' নামে একটি মেয়েদের
প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, '২৬ সনে
দিল্লিতে 'উইমেনস লীগ' প্রতিষ্ঠা
করেছিলেন এবং স্ত্রী স্বাধীনতা বিষয়ে
সেকালেও যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি

করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অথচ শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়—রামেশ্বরী কোনদিন স্কুলে পড়েননি। বিয়ের আগে বর্ণ পরিচয় ছাড়া বিশেষ কিছু পড়েছিলেন বলেও তাঁর মনে নেই।

মাত্র ক' বছরের ব্যবধান। দেখতে দেখতে রামেশ্বরী সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। তিনি আর 'ঘরের বৌ' নন দেশের 'মাতাজী'। '২৮ সনে সরকার তাঁকে 'এজ অব কনসেণ্ট কমিটির' সদস্য মনোনীত করলেন, '৩১ সনে তিনি 'লীগ অব নেশনস'এ বেসরকারী প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিলেন। তারপর রাশিয়া সহ গোটা ইউরোপের মেয়েদের অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে '৩৮ সনে আবার ঘরে ফিরলেন। 'মাতাজী' সেই থেকে দেশমাতৃকার সেবিকা, তিনি গান্ধীশিষ্যা।

'হরিজন সেবক সঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠা থেকে রামেশ্বরী নেহরু তার সহ-সভাপতি এবং এপদে থাকা অবস্থায় ভূভারতে এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে তিনি যাননি, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এমন কোন আন্দোলন নেই যাতে তিনি হাত দেননি। সঙ্ঘের অন্যরা বলেন—আমাদের যা কিছু তার বারো আনাই মাতাজী।

এছাড়াও বাংলার দুর্ভিক্ষ, পাঞ্জাবের দাঙ্গা, কস্তুরবা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, উইমেনস কনফারেন্স, মরাল এণ্ড মেণ্টাল হাইজিন, আণবিক বোমা বিরোধী আন্দোলন, আফ্রো-এশিয়া সংহতি, শান্তি আন্দোলন ইত্যাদি বহু জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সঙ্গে আজ জড়িয়ে আছে রামেশ্বরী নেহরুর নাম স্টকহলম থেকে টোকিও—মাতাজী আজ সুপরিচিতা।

সংবাদ: শান্তিযোদ্ধা হিসেবে পঁচাত্তর বছরের ভারতীয় সমাজ সেবী এবার লেনিন পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য—'৫৫ সনে তিনি স্বদেশেও 'পদ্মভূষণ' লাভ করেছিলেন। ৭. ৯. ৬১

নোয়েল-বেকার, ফিলিপ জে.

১৯১২ সন। স্টকহলমে সে বছর বিশ্ব অলিম্পিকের আসর। বৃটেন থেকে দৌড় প্রতিযোগিতায় যাঁরা যোগ দিতে এসেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে আগে নজরে পড়ে একটি দীর্ঘকায় তরুণকে। অনুসন্ধানে জানা গেল, ছেলেটি কেম্ব্রিজের একজন

খ্যাতনামা 'ব্লু', বিখ্যাত একিলিস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইউনিয়ান এণ্ড এথলেটিক ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট। নাম: ফিলিপ জে বেকার।

সাতচল্লিশ বছর আগে কেম্ব্রিজের আন্তর্জাতিক আইন বিভাগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র তরুণ ফিলিপ বেকার স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় ছুটেছিলেন দৌড়ের মেডেল আনতে; এ বছর বৃটিশ পার্লামেণ্টের প্রবীণ শ্রমিক সদস্য নোয়েল-বেকার চলেছেন সেখানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সম্মান নোবেল-প্রাইজ গ্রহণ করতে।

১৯৫৯ সনের শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী নোয়েল-বেকার—জীবনে এই প্রথম পুরস্কার পেলেন এমন নয়। ১৯২০ সনের অলিম্পিকে তিনি পনের শ' মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন। তার আগে বুথহামের স্কুলে, হাভার ফোর্ড কলেজে এবং কেম্বিজে 'ভাল ছাত্র' হিসাবে আরও অনেক অনেক পুরস্কার পেয়েছেন এক-কালের কানাডাবাসী এবং পরবর্তীকালের বৃটিশ পার্লামেণ্টের জনৈক খ্যাতনামা লিবারেল সদস্যের এই ষষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ-তম সন্তানটি।

শান্তি সৈনিক হিসাবে নোয়েল-বেকারের কর্মজীবনের শুরু প্রথম মহাযুদ্ধে। অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীর কর্মী হিসাবে সেদিন তিনি ইতালীতে নানা বীরত্বসূচক পদকের সঙ্গে পেয়েছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ পদবীটিও। 'নোয়েল' ফিলিপ বেকারের স্ত্রীর নাম। নার্স আইরিন নোয়েলের সঙ্গে নিজের ভাগ্য জুড়বার সময় ফিলিপ তাঁর নামটিকেও জুড়ে নিয়েছিলেন নিজের নামের সঙ্গে। আজ ওঁদের যুগ্ম নামেই তিনি পরিচিত।

অক্সফোর্ড এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করা ছাড়াও পার্লামেণ্টে আসবার আগে লীগ অব নেশানস-এ কিছু দিন কাজ করেছিলেন নোয়েল বেকার। পার্লামেণ্টে প্রথম আসেন তিনি—১৯২৯ সনে। '৩৯ সনে, যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন—বৃটিশ পরিবহণমন্ত্রীর পার্লামেণ্টারী একান্ত সচিব। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর এখন তিনি—রিটায়ার্ড রাজ-নীতিবিদ।

শান্তির নামে নোয়েল বেকারের সবচেয়ে বড় কীর্তি বোধ হয় তাঁর একখানা বই। বইটির নাম—'দি আর্মস রেস: এ প্রোগ্রাম ফর ওয়ার্ল্ড ডিসআরমামেণ্ট।' রচনা কাল—গেল বছর। এ ছাড়াও নোয়েল

পণ্ডিত, বিজয়লক্ষ্মী

বেকার—'দি লীগ অব নেশানস এট ওয়ার্ক', 'দি জেনেভা প্রটোকল', 'ডিসআরমামেন্ট' ইত্যাদি কয়টি গুরুতর বইয়ের লেখক। জীবনের মত তাঁর রচনারও একটিই বক্তব্য: শান্তি চাই। যুক্তিপূর্ণ এবং মানবিক পন্থায় বিশ্বশান্তি।

১৯৩৫ সনে শান্তিকামী জার্মান লেখক কার্ল ফন ওসিয়েস্কি (Ossies-ky) যখন শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন—তখন হিটলার রেগে গিয়ে বলেছিলেন—জার্মানদের নোবেল পুরস্কার চাই না। আত্ম-সান্ত্বনার জন্যে তিনি (আর্থিক) সম-মূল্যের তিনটি পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন সেদিন। ফিলিপ নোয়েল বেকার এবার নিশ্চয়ই অনুরূপ হতাশার কারণ হবেন না কোথায়ও। কেননা, দায়িত্বশীল ইংরেজেরা বলেন—একজন মাত্র ইংরেজই এ পুরস্কার দাবি করতে পারেন আজ। এবং নিঃসন্দেহে তিনি মিঃ ফিলিপ জে নোয়েল বেকার।

১৭. ১২. ৫৯

প

পণ্ডিত, বিজয়লক্ষ্মী

বিজয়লক্ষ্মী এবারও বিজয়ী হলেন।

বিজয়মাল্যের সঙ্গে ফুলপুরের দেওয়া আটান্ন হাজার কুড়িটি ফুলের মনোহর এই তোড়াটা তবুও যেন দর্শকের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারল না। এ বিজয় প্রাপ্য, প্রত্যাশিত; হয়ত বা অনিবার্যও। কেননা, তার আগে জনৈক ধনবান বৃদ্ধ, জনৈক সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং জনাকয় সাংবাদিকের কাহিনী আছে।

বাগান আর সুইমিং-পুল খচিত প্রাসাদ 'আনন্দ ভবনে'র এক বছর পরে (১৯০০) ভূমিষ্ঠ হয়েছিল মতিলাল নেহরুর দ্বিতীয় সন্তান—স্বরূপ। বাবা কখনও কখনও আদর করে বলতেন — স্বপনকুমারী। এগার বছরের দাদা ডাকতেন—নান। কৃষ্ণার জন্ম আরও সাত বছর পরে। কক্ষভরা আদর, আস্তাবল ভরা ঘোড়া। পাঁচ বছর বয়সে বাবা-মার সঙ্গে ইউরোপ গিয়েছিল আদুরে মেয়ে। ইউরোপীয়ান গভর্নেস মিস হুপার তার গৃহশিক্ষিকা। স্বরূপ পড়ে, নাচে, ঘোড়ায় চড়ে।

'আনন্দ-ভবনে' আসতে আসতে ঘোড়ায় চড়া মতিলাল দুহিতাকে দেখে চমকে ওঠলেন মতিলালের এক সম্ভ্রান্ত ধনবান মক্কেল। পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র তাঁর প্রশ্ন: মেয়েদের এভাবে স্বাধীনতা দেওয়া কি সঙ্গত ? বিজয়লক্ষ্মী সেকালেরই মেয়ে। ফুলপুরের আগে তাঁকে পেছনে অনেকখানি পথ ঘোড়ায় চড়ে আসতে হয়েছে। মতিলাল নেহরুর কন্যার পক্ষেও সেটা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

'১৫ সনে পনের বছর বয়সে নাচ ছেড়ে বাবার সঙ্গে বোম্বাই কংগ্রেস। পরের বছর দাদার বিয়ে। তারপর জালিয়ানওয়ালাবাগ, আগুন···, অমৃতসর কংগ্রেস। বাড়িতে গান্ধীজী, মহাদেব দেশাই, দাদা এবং আরও কত কে! মহাদেব দেশাই-ই ছুড়ে দিয়েছিলেন হাতের কাগজটা। বলেছিলেন—পড়ে দেখ। লেখক আমার বাল্যবন্ধু। স্বরূপ হাত বাড়িয়ে লুফে নিয়েছিলেন; '২০ সনের কোন এক মাসের 'মডার্ন রিভিউ', রচনাটির নাম—'অ্যাট দি ফিট অব দি গুরু', লেখকের নাম—রঞ্জিত এস. পণ্ডিত। পড়ে স্বরূপ মন্ত্রমুগ্ধ।

ক্রমে আরও জানা গেল। রঞ্জিতরা মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি উপকূলে বামবুলির সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ। রঞ্জিতের শৈশব কেটেছে অবশ্য কাথিয়াড়বাবের রাজকোট স্টেটে। ওঁর বাবা সেখানেই থাকতেন। অক্সফোর্ডের খ্রাইস্ট চার্চ এবং মিডল টেম্পলে তুখড় ছাত্র ছিলেন রঞ্জিত। তাছাড়া সরবোন এবং হাইডেলবার্গের ডিগ্রি রয়েছে তাঁর। উপস্থিত এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী করছেন। মহাদেব দেশাই জানালেন—এ সবের চেয়েও বড় পরিচয় রঞ্জিত সত্যিই পণ্ডিত, এবং অদ্ভুত প্রাণচঞ্চল।

সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ রইল না। প্রথম দর্শনের পরেই স্বরূপের জয়মাল্য পড়ল রঞ্জিতের গলায়। রঞ্জিত নাম দিলেন তাঁকে—বিজয়লক্ষ্মী। সে ১৯২১ সনের কথা। তারপর ১৯৪৪ সনে জেলে রঞ্জিতের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে একসঙ্গে সংসার, আইন অমান্য আন্দোলন, ইউরোপ ভ্রমণ, কারাবাস; চন্দ্রলেখা, নয়নতারা, রিতা। অনেক হাসি, অনেক কান্না। তিন বছর বয়সের মেয়েকে রেখে জেলে যাওয়া (১৯৩২), দেওয়ালের ব্যবধানে অন্য কারাগারে স্বামীকে রেখে সাক্ষাতের জন্যে দিন গোনা,—সেসব অনেক যন্ত্রণার কথা। তবুও স্বদেশীর কথা

শুনে সম্ভ্রান্ত মহিলাটি ঠোঁট বাঁকিয়ে মুখের ওপর বলে দিলেন—স্বাধীনতা তোমাদের মত মেয়েদেরই পোষায় বাপু,—ইউ হু হ্যাভ লেফ্‌ট ইওর হোম্‌স!

বিজয়লক্ষ্মী একদিনে জেতেননি।

* * *

প্রথমে এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির শিক্ষা পরিষদে এবং তারপর ১৯৩৭ সনে উত্তর প্রদেশ বিধানসভায়। বিজয়লক্ষ্মী সেবার কানপুরের বিল-হাউর এলাকা থেকে প্রার্থী। প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর—শিক্ষামন্ত্রীর পত্নী শ্রীমতী শ্রীবাস্তব। এলাকায় ভোটার সংখ্যা—৩৮ হাজার। মাত্র হাজার ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হলেন বিজয়লক্ষ্মী। '৪৫ সনে এই কেন্দ্র থেকেই তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। পন্থজী ওঁকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী করে নিলেন। ভারতে তিনিই প্রথম মহিলা মন্ত্রী! তাঁর সম্পর্কে একটি মন্তব্যের উত্তর দিতে উঠে দাঁড়িয়ে আইনসভায় তিনি বলেছিলেন—যে-বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাকে ঘোড়ায় চড়তে দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন, আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে আজ তাঁর পুত্রও হাজির। স্বভাবতই তিনি কংগ্রেসের বিপরীত দিকের আসনে বসেছেন। আশ্চর্য, ওঁরা আজও বদলালেন না!

মহিলা-মন্ত্রী উপলক্ষে তৎকালের কিছু কিছু কাগজেরও অদ্ভুত মতি-গতি। মেয়েদের সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি স্বভাবতই স্ত্রী-স্বাধীনতার, কথা উল্লেখ করেছিলেন। পরদিন কাগজে শিরোনামা ছাপা হল—মিসেস পণ্ডিত বিবাহ-বিচ্ছেদ সমর্থন করেন। এমনি সব নানা গুজব। বাইরের কাগজগুলোও তার ব্যতিক্রম নয়। ইউরোপে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন—আপনি কি মনে করেন মেয়েদের ব্যায়ামচর্চা করা ভাল—কেন নয়? উত্তর দিয়েছিলেন ভারতের প্রথম মহিলা মন্ত্রী। পরের দিন বিস্ময় খবর: ওম্যান মিনিস্টার বিগিনস হার এইটিন-আওয়ার ডে বাই স্ট্যাণ্ডিং অন হেড!

তাই বলছিলাম, ফুলপুরের আগে ঘরে-বাইরে অনেক যুদ্ধ জয় করে তবে এই বিজয়লক্ষ্মী।

* * *

মস্কো (১৯৪৭-৪৯), ওয়াশিংটন ('৪৯—'৫২), লণ্ডন ('৫৫—'৬১), কিংবা রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের সভানেত্রীর আসন ('৫৩—'৫৪)—

এসব একালের কাহিনী। বিজয়লক্ষ্মী তার বহু আগেই বাইরের পৃথিবীতে সুখ্যাত ভারতীয় নারী। মাদাম চিয়াং তাঁরই আমন্ত্রণে ভারতে এসেছিলেন, নেহরুর মিউনিক ভ্রমণের (১৯৩৮) সমর্থনে তিনিই সেদিন বিশ্বের কাছে এগিয়ে গিয়ে কৈফিয়ত দিয়েছিলেন! তার চেয়েও বড় ঘটনা মাদাম পণ্ডিতের ঐতিহাসিক আমেরিকা বিজয়। ভারত সরকার তখন আমেরিকায় বছরে প্রায় কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ করেন ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে, ইংরেজ সরকার খরচ করেন আরও ১০০ থেকে ১২০ লক্ষ ডলার; প্রায় দশ হাজার লোক তখন ভারত বিরোধী প্রচারের কাজে নিযুক্ত। তারই মধ্যে ১৯৪৪ সনে একদিন এসে মার্কিন দেশে অবতরণ করলেন নেহরু-ভগ্নী বিজয়লক্ষ্মী। দু' বছর পরে হট্ স্প্রীং, সান-ফ্রান্সিসকো সেরে তিনি যখন দেশে ফিরে এসেছেন তখন আমেরিকায় আমাদের অন্য পরিচয়।

সুতরাং, মস্কোয় দূত নিয়োগ প্রসঙ্গে নেহরুর মুখে 'নান্'-এর নাম শুনে লিয়াকৎ আলি আপত্তি তুলেছিলেন বটে, কিন্তু মাউন্টব্যাটেনকে মৌন থাকতে হল। বিজয়লক্ষ্মী মস্কোয় প্রেরিত হলেন। তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন অবান্তর।

* * *

অবান্তর হয়ত ফুলপুরের সামান্য ঘটনা উপলক্ষে এই স্মৃতিচারণও। কেননা, ঘরে-পড়া মেয়ে বিজয়লক্ষ্মীর হাতে আজ বিশ্বের সেরা দশ-এগারোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানপত্র, দেশবিদেশের অসংখ্য পদক। তাঁর চৌষট্টি বছরের জীবন একের পর এক জয়েরই কাহিনী। তবুও পুরানো গল্পগুলো বলতে হল কারণ, মহারাষ্ট্রের রাজভবন ছেড়ে বিজয়লক্ষ্মী আজ সেই পুরানো জগতেই ফিরলেন। ফুলপুর তাঁর প্রিয় 'ভাই'-এর এলাকা।

'আমার যা কিছু সব আমার প্রিয় ভাইয়েরই দেওয়া।...অ্যাণ্ড দিস ইজ মাই ওয়ে অব সেয়িং 'থ্যাঙ্ক ইউ' টু হিম।' ২৬. ১১. ৬৪.

পট্টনায়েক, বিজু

শাসক আর শাসিতের শেষ মোলাকাত। ইন্দোনেশিয়ায় সেবার সত্যিই ঝড়। মুখোস ছুঁড়ে ফেলে আসরে নামছে ডাচরা। মরিয়া হয়ে লড়াইয়ে ক্ষেপেছে জনতা। বহির্বিশ্বে তারা বান্ধবহীন।

কিন্তু তাই কি? ডাচ এন্টিএয়ার-

ক্র্যাফট কামানের ব্যূহ ভেদ করে পশ্চিম থেকে আসা যাওয়া করে একটি নিঃসঙ্গ বিমান। কেন আসে, কোথায় যায়—সকলে তা জানে না। জানবার সুযোগ পায় না। এ বিমান শত্রু পক্ষের না হলেও ইন্দোনেশিয়ার কাছে রহস্যময়।

এ রহস্য উদ্ঘাটিত হল সেদিন, দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে যেদিন সেই ছোট্ট বিমান খানি থেকে হাসতে হাসতে নেমে এলেন ইন্দোনেশিয়ার দুই জনপ্রিয় নায়ক। ডাঃ হাতা আর ডাঃ সারিয়ার। নেমেই ককপিটের দিকে এগিয়ে গেলেন হাতা। প্রথম অভিনন্দন জানাতে চান তিনি এই দুঃসাহসিক বৈমানিককে।

চালকের আসন থেকে নেমে এলেন দুর্ধর্ষ ভারতীয় তরুণ। লম্বায় ছ'ফুটের ওপরে। বিরাট দেহ। দেখলেই বোঝা যায় দুঃসাহস এ মানুষটির নিত্য সহচর।

নাম—বিজয়ানন্দ পট্টনায়ক। দেশ—উড়িষ্যা। জন্ম—১৯১৬ সনের মার্চে, কটকে।

বাবা ছিলেন ধর্মপ্রাণ সাধক। উড়িষ্যার বিখ্যাত ব্রাহ্ম নায়ক। তিন ভাইয়ের অন্যতম বিজয় স্কুলের পড়া শেষ করে ভর্তি হলেন কটকের রেভনশ কলেজে।

কিন্তু কলেজী পড়ায় মন মানে না। বিজয় এমন কিছু করতে চান যাতে উত্তেজনা আছে, উদ্দামতা আছে, প্রাণ আছে। তিনি ঠিক করলেন পাইলট হবেন, প্লেন চালাবেন।

মনস্থির হওয়া মাত্র যার কাজ শেষ হওয়া চাই—ছোটবেলা থেকেই এ ছেলে সেই ধাতের মানুষ। তিনি পাইলট হলেন। ভারতের অন্যতম সফল কর্মাশিয়াল বৈমানিক।

বৈমানিক হিসাবে তাঁর এক কৃতিত্ব ইন্দোনেশিয়া। অকথিত কাহিনী অনেক। তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য ভারতের লাট বাহাদুরের প্রিয় বৈমানিক ছিলেন ন্যাশন্যাল এয়ার ওয়েজ-এর পট্টনায়ক। বহুবার বহু মূল্যবান মানুষকে নিয়ে তিনি এশিয়ার দেশে দেশে ঘুরেছেন। বিশেষ করে বিপজ্জনক এলাকায় এবং বিপজ্জনক মুহূর্তে। পট্টনায়ক সেখানেই সব চেয়ে কর্মঠ।

তবুও উড়োজাহাজ নিয়ে ঘুরে বেড়ান হল না। উড়তে উড়তেই '৪২ সনে ডাঙ্গায় নামলেন বিজয়ানন্দ। মাটিতে তখন প্রভূত উত্তেজনা, অনেক কর্তব্য। '৪২-এর 'ভারত ছাড়'

আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। অপরাধের গুরুত্ব জেনেই নিজের ঘরে আশ্রয় দিলেন একজন বিখ্যাত দেশ-নেত্রীকে। শুধু তাই নয়, যথা সময়ে সরকারী বিমানেই তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এলেন লাট বাহাদুরের প্রিয় বিমান-চালক। ফল—কিছুদিন কারাবাস।

জেল থেকে বের হয়ে ঠিক করলেন আর একখানা উড়োজাহাজ নিয়ে চলবে না। এবার বিমান বহর করতে হবে। গঠিত হল কলিঙ্গ এয়ারলাইন্‌স।

তারপর থেকে আরও আরও কলিঙ্গ। পট্টনায়ক উড়োজাহাজ চালান, পাইপ তৈরী করেন, কাপড়ের কল চালান। তিনি বছরে হাজার পাউণ্ড 'কলিঙ্গ পুরস্কার' দেন। তাঁর হাতে লোহার খনি, ম্যাঙ্গানিজের খনি এবং কি নয়! বিজয়ানন্দ পট্টনায়ক ভারতের শিল্পক্ষেত্রে দেখতে দেখতে একটি মস্ত নাম।

মস্ত জোয়ান মানুষ, মস্ত নাম—কিন্তু কথা বললে মনে হয় তার চেয়েও মস্ত তাঁর হৃদয়টি। সদালাপী, সহাস্য মুখ বিজয়ানন্দ—আসলে যেন ব্যবসায়ী নন, শিল্পপতিও নন, অন্য কিছু।

সাদাসিধে পোষাক, সাদাসিধে চাল-চলন, বছরে কমপক্ষে তিনবার ইউরোপ আমেরিকা করছেন। কিন্তু বাড়ীতে দুই প্রস্থ সাহেবী পোষাক খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। দেশজোড়া এত সম্পত্তি, কিন্তু নিজের বলতে শুধু পৈত্রিক বাড়ীটি মাত্র। কাশ্মিরী পত্নী, তিনটি ছেলেমেয়ে—জমজমাটি সংসার। কিন্তু আজীবন আকাশচারীর মুখে তবুও প্রতি মুহূর্তে অন্যদের কথা, মাটির চিন্তা। ক'মিনিট শুনলেই মনে হয়, লোকটি সংসারী নয়,—পলিটিক্যাল।

তিনি নিজেও তাই বলেন। উড়িষ্যার মুখেও একই কথা। '৫২ সন থেকে বিজয়ানন্দ পট্টনায়ক উড়িষ্যায় বিধান সভার অন্যতম সদস্য। তার চেয়েও বড় সংবাদ উড়িষ্যা কংগ্রেসের তিনি অন্যতম সমর্থ নায়ক। বিশেষ গণতন্ত্র পরিষদের সুরক্ষিত দুর্গটিকে যে ভাবে ধূলিসাৎ করেছেন বিজয়ানন্দ, সে বোধ হয় শুধু তাঁর মত বেপরোয়ার পক্ষেই সম্ভব।

বিজয়ানন্দের বলে বলীয়ান কংগ্রেস অতঃপর তাঁকে নির্বাচিত করল তাঁদের প্রধান। বলা বাহুল্য, এ বিজয় শুধু তাঁর ব্যক্তিগত নয়, বোধ হয় কংগ্রেসেরও। কেননা, পঁয়তাল্লিশ বছরের এই মানুষটিকে একবার পুরো ভাগে পেলে আর যাইহোক কখনও পশ্চাদপসরণের আশঙ্কা নেই। ১৬.২.৬১

পহলেভী, রেজা মহম্মদ

সবই ছিল। আলাদীনের চেরাগ (মানে, প্রতিদিন দশ লক্ষ ব্যারেল করে তেল) যাদু-কার্পেট (আজও যার শিল্পীরা দৈনিক এক টাকার বেশী মজুরি পায় না), সিরাজের সিরাপ (আফিং অবয়বে যার 'হাতে মৃত্যু খতিয়ান বার্ষিক দেড় লক্ষের ওপর), বসরার গোলাপ (বছরে তিনশ' টন শুকনো পাপড়ি তার বাইরে যায়) এবং স্বর্গের হুরী (তেহরানের নাইট ক্লাব গুলো সুবিখ্যাত)—সব। সবই ছিল কিন্তু নবীন বাদশার মুখে তবু হাসি ছিল না। কেননা, বাদশার ছেলে ছিল না।

ফাউজিয়া বড় ঘরের মেয়ে ছিল। মিশররাজ ফারুখের বোন। মেয়েটা সুন্দরীও ছিল। কিন্তু দশ বছরে একটি-মাত্র মেয়ে দিয়েছিল সে বাদশাকে। মনের দুঃখে বাদশা তাকে বনে পাঠালেন।

ঘরে এল সুরাইয়া। অপরূপা, আধুনিকা। কিন্তু দশটা বিফল বছরের গ্লানি নিয়ে প্রাসাদ ছাড়তে হল তাঁকেও।

এল ফারা ডিবা। চল্লিশ বছরের বাদশার পাশে একুশ বছরের তরুণী। মুখে তার হাসি। বলল—দুখী রাজার মুখে হাসি ফোটাব আমি!

কথা রেখেছে মেয়েটা। সংবাদ: অবশেষে সত্যিই পারশ্যরাজের মুখে হাসি ফুটেছে। ফারা ডিবা তাঁর মান রেখেছে। বছর ঘুরে না আসতেই বাদশাকে সে একটি সন্তান উপহার দিয়েছে।—পুত্র সন্তান! পারশ্যরাজ শাহানশা রেজা মোহম্মদ পহ্‌লেভী আজ সত্যিই পুলকিত, ইরান উৎফুল্ল, এবং তস্য বন্ধু-বান্ধবেরা নিশ্চিন্ত। কেননা, দেশটা সত্যিই ইমপরটেণ্ট। এবং স্বভাবতই সিংহাসনটা ততোধিক।

বাদশাজাদার নাম রাখা হয়েছে—সাইরাস। নামটা আড়াই হাজার বছরের পুরানো। সিংহাসনটাও কম নয়। বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন। হিন্দুস্তানের মজলিশী বাদশা শাজাহান বসতেন সেটায়। কিন্তু সে তুলনায় সদ্যজাত সাইরাসের বংশটি নবীন। প্রবীণ রাজবংশগুলো হয়ত বলবে—অর্বাচীন।

ইরানে আগাগোড়াই কোন না কোন বাদশা ছিলেন—কিন্তু সে তালিকার কেউ শাহ'র পিতামহ ছিলেন না। বাবা ছিলেন—একজন সাধারণ স্লাভ সৈনিক। কিন্তু উচ্চা-ভিলাষ ছিল তাঁর। ফলে, একদিন

দেখা গেল—১৩০ বছরের পুরানো কোয়াজার বংশ উঠে গেছে এবং তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পহলেভী বংশ (১৯২৬)। শাহ্'র বাবা রেজা শা সেই বংশের প্রথম সুলতান।

বাবার সুলতানী মেজাজ ছিল এবং (একটা চোখে হলেও) আধুনিক দৃষ্টি ছিল। সুতরাং, ছেলে গেল সুইজার-ল্যাণ্ডে আজকালকার দিনের স্কুলে। সেখানে সে বন্ধুদের কাছে সগর্বে গল্প করে—'দেশে থাকতে, জানিস, আমি ঘরে ঢুকলে বুড়োরা পর্যন্ত উঠে দাঁড়ায়।'

লেখাপড়া কিছু সুইজারল্যাণ্ডে, কিছু তেহরানের সামরিক বিদ্যালয়ে। '৩৯ সনে বাবার হুকুম মত বিয়ে। '৪১ সনে বাবার বদলীতে (মিত্রশক্তি তাঁকে নির্বাসিত করেছিলেন) সিংহাসনে।

তারপর থেকে আজ পর্যন্ত শাহ অনেক কিছু করেছেন এবং অনেক কিছু দেখেছেন। '৪৮-এ প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদ। '৪৯ সনে তেহরাণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আততায়ীর পিস্তল, '৫১য় আবার বিয়ে এবং যুগপৎ মোসাদেকের বিদ্রোহ, শাহ্‌র দেশত্যাগ, আবার বিদ্রোহ, প্রত্যাবর্তন এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। মধ্যপ্রাচ্যের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে এখনও থেকে থেকে কেঁপে ওঠে ইরানের জমি। (সে জমির পঁচিশ লক্ষ একরের মালিক শাহ স্বয়ং, আর বাকীটা—অন্যান্য ছোটখাট শাহদের। তাঁদের সংখ্যা—মোট এক হাজার, আর ইরানের প্রজাসংখ্যা প্রায় দুই কোটি!) সৈনিকেরা ষড়যন্ত্র করে, মোসাদেকের ছায়া সহস্রায়তন হয়ে রাজপথে ঘুরে বেড়ায়, রাজনৈতিক দলগুলো উষ্ণতা ছড়ায়,—কিন্তু শাহ নিরুদ্বেগ। তারই ফাঁকে ফাঁকে উন্মত্ত বিশ্বাসীর মত তিনি খুঁজে চলেছেন তাঁর ময়ূর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

ফারুখ বলেছিলেন—আগামী দিন দুনিয়ায় রাজা থাকবে দু'জন। একজন ইংলণ্ডের, অন্যজন তাসের।

সান্ত্বনা, এ তালিকা যখন তৈরী হয় ইরানে তখন সাইরাস নামে কোন সুলতান ছিলেন না।

—ঈশ্বর ফারা ডিবার ছেলেটিকে বাঁচিয়ে রাখুন। ৩. ১১. ৬০

পাতিল, এস. কে.

এ যুদ্ধ ক্ষেত্রটা ছিল ভারতেই! দক্ষিণের অন্ধ্র রাজ্যে। জ্যোতিষীরা বলেছিলেন—ফল নিশ্চিত পরাজয়। হাসতে হাসতে শ্রীপাতিল বলেছিলেন—ফল নিশ্চিত বিজয়। তাই হল। '৫৫

সনের নির্বাচনে কমিউনিষ্টরা আশাতীতভাবে পরাজিত হলেন। লোকে বলল—পাতিল যাদু জানেন।

শ্রী এস. কে. পাতিলের কর্মজীবন বলে—তিনি কাজ জানেন। বিরামহীন, আলস্যহীন যোদ্ধার কাজ। ছাত্রজীবনটুকু বাদ দিলে ১৯২০ সন থেকে পাতিল তা-ই দেখাচ্ছেন।

জন্ম তাঁর ১৯০০ সনে। বোম্বাই-এর রত্নগিরি জেলায়। লেখাপড়া শুরু হয়েছিল বোম্বাইয়ের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে, শেষ হল লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস এবং লণ্ডন য়ুনিভারসিটি কলেজে। পাতিল তখন সেখানে সাংবাদিকতা পড়তেন। '২০ সন এল। সাংবাদিকতা আর হল না। স্বাদেশিকতায় পেয়ে বসল তাঁকে। স্বদেশী স্কুলের কাজে চলল—চার বছর। পরের বছরগুলো কোথা দিয়ে যে চলে গেল কে তার হিসেব রাখে। সংক্ষেপে শ্রীপাতিলের অভিজ্ঞতার হিসেব: কারাবাস আটবার, এ. আই. সি. সি—আটাশ বছর, ওয়ার্কিং কমিটি —পাঁচ বছর ও আরও, বোম্বাই মিউনিসিপালিটি—সতের বছর, রাজ্য বিধানসভা—দশ বছর, প্রাদেশিক কংগ্রেসের সেক্রেটারির কাজ সতের বছর, সভাপতিত্ব—দুইবার এবং এবম্বিধ। শ্রী এস.কে. পাতিল একমাত্র ব্যক্তি যিনি পর পর তিনবার বোম্বাইয়ের মেয়র হয়েছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শ্রীপাতিল নবাগত। '৫৭ সনে সেচ দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে তিনি দিল্লি এসেছিলেন। তারপর থেকে দিল্লি যেন ক্রমেই তাঁকে জড়িয়ে নিচ্ছে। '৫৮ সনে শ্রীপাতিলকে যোগাযোগ এবং পরিবহণ দপ্তরে হাত দিতে হল। এবং অবশেষে ঘাড়ে নিতে হল শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের ব্যর্থতার ঐতিহ্যসহ খাদ্য দপ্তর।

ভারতের খাদ্যমন্ত্রী এখন মার্কিন দেশ সফরে আছেন। আমেরিকায় তিনি এই প্রথম নন। শ্রীপাতিল ভারতের কেন্দ্রীয় মধ্যে দেশ ভ্রমণেও অন্যতম অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্য সহ বহুবার বহু দেশ তিনি ঘুরেছেন। সুতরাং, সংবাদ তা নয়। সংবাদ: শ্রীপাতিল আজ বাইরের দুনিয়ায় সুপরিচিত। ওয়াশিংটনে লোকে জানে পাতিল যা বলেন ভারতে অনেকেই তা বলছে।

৩০. ৪. ৬০

['কামরাজ পরিকল্পনা' অনুযায়ী শ্রী এস. কে. পাতিল ১৯৬৩ সনের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ত্যাগ করেন। নেহরুজীর তিরোভাবের

পর আবার তিনি শাস্ত্রী মন্ত্রিসভায় ফিরে এসেছেন। তিনি রেলদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।]

পাঞ্চেন লামা

চেহারায় দুইজনের অদ্ভুত মিল। বয়সেও। একজন চব্বিশ, অন্যজন বাইশ। দেখলে মনে হয় দুই ভাই। সত্য বটে, দুজনেই গরীব মা-বাবার সন্তান। কিন্তু দালাইলামা আর পাঞ্চেন লামা দুই সহোদর নন, দুই 'ঈশ্বর'। দু'জনেই তাঁরা 'জীবন্ত বুদ্ধ'। একজন অলৌকিক, অন্যজন কিয়ৎপরিমাণে লৌকিক এই যা।

গুরু-দক্ষিণার অনেক চমকপ্রদ কাহিনীই শোনা যায়। কিন্তু এমনটি বোধ হয় আর হয় না। কয়েকশ' বছর আগেকার কথা। তিব্বতের পঞ্চম দালাই লামার গৃহশিক্ষক ছিলেন একজন। দালাই লামা খুবই শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে। অবশেষে প্রণামী স্বরূপ তিনি মাষ্টার মশাইকে জানালেন,—আমি যদি জীবন্ত তথাগত হই, তবে আপনিও তা। আজ থেকে আমার পরেই তিব্বতে আপনার আসন। পাঞ্চেন (শিক্ষক) লামা সেই থেকে তিব্বতের দ্বিতীয় অধিরাজ।

আজকের দালাই লামার ক্রমিক সংখ্যা চৌদ্দ, পাঞ্চেন লামার-দশ। সেদিক থেকে দু'জনেই ঐতিহাসিক পুরুষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই ইতিহাস মুখ্যত এই দুই পুরুষের ক্ষমতা দ্বন্দ্বের ইতিহাস।

ছত্রপতি শিবাজী তাঁর প্রতি দুর্গে দু'জন করে সৈন্যাধ্যক্ষ রাখতেন। উদ্দেশ্য: ক্ষমতা দ্বন্দ্ব বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে রোধ করা। দালাই লামা আর পাঞ্চেন লামাও যুগের পর যুগ বিজয়ী বহিরাগতদের এই পথে সেবা করে এসেছেন। আজও করছেন।

দালাই লামা যখন ভারতে উদ্বাস্তু, পাঞ্চেন তখন পিকিং-এ সম্মানিত অতিথি। দালাই লামা যখন চীনাদের সমালোচনায় ব্যস্ত, পাঞ্চেন তখন তাদের প্রশংসায় মুখর। এই নিন্দা স্তুতি যে অংশত হলেও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তা কারও অবিদিত থাকবার কথা নয়। অন্তত পিকিং-এর ত নয়ই। সুতরাং, তারা 'লামাশাহী' উচ্ছেদ করতে নেমেও পাঞ্চেন লামাকে বাদ দিলেন না। দালাই লামার শূন্য আসনে তোড়জোড় করে তাঁকে বসালেন। কারণ দেশটা তিব্বত এবং তার দশ লক্ষ মানুষের মধ্যে কয়েক লক্ষই—'জীবন্ত বুদ্ধ'।

পার্থসারথি, জি

এবার শোনা যাচ্ছে—পাঞ্চেন লামার ভাগ্যও নাকি পাল্‌টে গেছে। যদি তা সত্য হয় তবে ইতিহাসের অনুমান আরও দুটি সত্য সেখানে ঘটতে চলেছে। (১) পিকিং-এর তিব্বতবিজয় সমাধার পথে এবং (২) তা হতে চলেছে এমন একটা পথে যা রেডইণ্ডিয়ান বিজয়ের চেয়েও কঠিনতর পথ। কেননা এ পথে পাঞ্চেন লামাও বিদ্রোহী হয়।

১১. ৬: ৬০

পার্থসারথি, জি.

লিখিতভাবে বলে পাঠান হল আমি মাও-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই। বিষয়: জরুরী।

উত্তর এল,—পাবে। কবে কখন কোথায় তার কোন উল্লেখ নাই। অথচ সেটা নিয়ম নয়। কেননা, অনুরোধ পত্রটি যিনি পাঠিয়েছিলেন তিনি রাষ্ট্রদূত।

ক'দিন পরে হঠাৎ ভোর রাত্রে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। একগাদা হোমরাচোমরা লোক এসে হাজির।—মাও-এর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলে না?—নাও, চটপট তৈরী হয়ে নাও। তিনি তোমার জন্যে বসে আছেন!

বিচিত্র এই অভিজ্ঞতাটা অবশ্য ঘটেছিল পূর্বসূরী আর একজনের জীবনে। কিন্তু পাকিস্তানে সদ্য নিযুক্ত হাই কমিশনার পার্থসারথিও সেই একই দেশফেরত কূটনীতিক। বরং তাঁর আমলটি (১৯৫৮-৬২) ছিল আরও বিপদসংকুল।

পুরো নাম—গোপালস্বামী পার্থসারথি। জন্ম—১৯১২। কিন্তু বন্ধুমহল ওঁকে চেনে জি. পি নামে এবং চেনে পিকিং-এ যাওয়ার পরে নয়, তার বহু আগে থেকে। কেননা, পার্থসারথি তাঁর তরুণ বয়স থেকেই ভারতে একজন বিখ্যাত সাংবাদিক। মাদ্রাজের পর অক্স-ফোর্ডের ডিগ্রি নিয়ে তিনি ব্যারিস্টারী পড়েছিলেন বটে, কিন্তু '৩৬ সনে কর্মজীবন শুরু হয়েছিল তাঁর মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক হিসেবে। তারপর দীর্ঘকাল ছিলেন প্রেসট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার লণ্ডন প্রতিনিধি। '৫২ সনে সেখান থেকে ফেরার পর শ্রীপার্থসারথির পদ ছিল—চীফ এডিটার, পি. টি. আই।

কিন্তু সাংবাদিকতায় আর থাকা গেলনা। পরের বছরই সরকার কাজে লাগাতে চাইলেন এই মগজে-কলমে চলনে-বলনে সমান প্রখর ভারতীয়টিকে। তিনি আন্তর্জাতিক

কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রেরিত হলেন—কম্বোডিয়া তারপর একই তদারকি কাজে ভিয়েৎনাম। '৫৭ সনে কর্তব্য আরও স্পষ্টতর হল। পার্থসারথি নিযুক্ত হলেন ইন্দো-নেশিয়ায় রাষ্ট্রদূত। পরের বছর চীনে, এবং সেখান থেকে কূটনীতির নতুন রূপ দর্শনান্তে এবার পকিস্তানে।

ক্রিকেট, হকি, টেনিস সব খেলায় সমান পটু মানুষটিকে কীভাবে গ্রহণ করবে পাকিস্তান সে-ই জানে। আমাদের জেনে রাখা ভাল—পার্থসারথি পাকিস্তানেও সুখ্যাত বিখ্যাত গোপালস্বামী আয়েঙ্গারের একমাত্র তনয়। ওঁর নিজেরও একটিই ছেলে! নাম—অশোক।—স্ত্রী ওঁর রাজ্যসভার একজন সদস্যা।

২৬. ১৫. ৬২

পাল, ডঃ রাধাবিনোদ

সনটা ঠিক মনে নেই। তবে নামটা মনে আছে। আর মনে আছে ঘটনাটা। আমরা তখন দূর মফঃস্বলে একটা কলেজে পড়ি। হঠাৎ একদিন কলেজ ছুটি হয়ে গেল। কি ব্যাপার? না, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার নিযুক্ত হয়েছেন (১৯৪৪-৪৬)। সেই স্বনামধন্য ডঃ রাধাবিনোদ পাল এই কলেজে এককালে অধ্যাপক ছিলেন। এবং শুনে অবাক হয়ে গেলাম, গণিতের অধ্যাপক।

তারপর আরও অনেক কথা শুনেছি এবং অবাক হয়েছি। তাঁর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যা, তা শ্রীপালের ছাত্রজীবন। জন্ম নদীয়া জেলার সলিমপুর গাঁয়ে। (১৮৯৬ সনে) বাবার অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। কিশোর রাধাবিনোদ তাই একটা দোকানে কাজ করতেন। তাতেই পড়াশুনার খরচ চলত। তবুও ছেলেটা অনেক ছেলেকে হারিয়ে এম. এ পাশ করল। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপনার কাজ জুটে গেল। তবে সুদূর মফঃস্বলে, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে (১৯১৯)।

এক বছর কাজ করেই আবার কলকাতা ফিরে এলেন। পরের বছর 'এম. এল' হলেন, এবং কলকাতা হাইকোর্টের এটর্নি। চার বছরের পরে ডি. এল (১৯২৪)! আন্তর্জাতিক আইনে তাঁর মত ছাত্র পাওয়া ভার। শিক্ষকও। সুতরাং কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁকে 'টেগোর ল প্রফেসার' নিযুক্ত করলেন। ক'বছর পরে (১৯৪২-৪৩) কলকাতা হাইকোর্ট

নিযুক্ত করল তাঁকে অন্যতম বিচার-পতি। এবার রাধাবিনোদ চললেন—আন্তর্জাতিক আদালতে।

বলা বাহুল্য, এবার আর অবাক হওয়ার মত কথা নয়। কেননা, আন্তর্জাতিক আইনের বিশেষজ্ঞ হিসেবে ভারতের ডঃ রাধাবিনোদ আজ সর্বদেশে সুপরিচিত। এবং উল্লেখযোগ্য সে পরিচয়ও শুরু হয়েছে তাঁর স্বদেশে খ্যাতির তালে তালেই। '২৭ সনেও আন্তর্জাতিক আইন কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। '৩৪ সনে হেগে যেবার কংগ্রেস বসল সেবার তিনি যুগ্মসভাপতি। আর টোকিয়োর সামরিক আদালতে (১৯৪৬-৪৮) বিচারক হিসেবে তাঁর রায়—সে আজও নাকি জাপানীদের মুখে মুখে। মানুষের বিচারে বসে আইনের মর্যাদা রেখেই ব্যক্তিগত মানবতাবোধকে রক্ষা করা যায় কি-ভাবে, ডঃ রাধাবিনোদ সেদিন তাই দেখিয়েছিলেন বিজয়ী পশ্চিমকে।

তাঁর গাঁয়ের লোকেরা বলেন—সেই মমতাময় মানুষটিকেই প্রতিদিন দেখে আসছেন তাঁরা। একজন রাধাবিনোদ এককালে অন্যের সাহায্যে লেখাপড়া শিখেছিলেন। আজ তাঁর সাহায্যে লেখাপড়া করছে এমন ছেলে নাকি অসংখ্য। ৮. ৯. ৬০

পিকাসো, পাবলো

জীবনে প্রথম ভালবাসা। তবুও কোকলোভা যখন চলে গেল তিনি বাধা দিলেন না। বললেন,—উপায় নেই, মেয়েটি বড় বেশী চায়, বেশী চেয়েছিল।

মেরি থেরেস যখন চলে যান তখনও উনি কিছু বলেননি। কিন্তু মেরি বলেছিলেন। খবরের কাগজে তিনি বিবৃতি দিয়েছিলেন। তার মর্ম : অনন্তকাল আমি একটি 'ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভকে' আঁকড়ে থাকতে পারি না'।

ভুল বুঝেছিলেন মেরি থেরেস। গুরুতর ভ্রম। কেননা, এই বিস্ময়কর স্তম্ভটি ইতিমধ্যে ইতিহাসে পরিণত হলেও সেটি যে প্রতি কণায় এখনও জীবিত তার প্রমাণ আজকের পিকাসো।

যাত্রা শুরু করেছিলেন সেই কবে, শতাব্দীর অন্ত্যপ্রান্তে। তারপর সেদিনের স্পেনের জনৈক শিল্প-শিক্ষকের পুত্র কোনদিন কোথাও থেমেছিলেন বলে কারও জানা নেই।

স্পেন থেকে প্যারিস, সেজান রেনো, লুত্রেক, গগাঁ, ভানগগ, ব্রাক,

—রিভিয়ারা, রাশিয়ান সার্কাস, বোহেমিয়ান জীবনাচার ; প্রেম প্রণয়, দ্বন্দ্ব সংঘাত, ডুয়েল—এমন কোন প্রমাণ নেই পিকাসো যেদিন 'মৃত' ছিলেন।

শুধু রং আর তুলিতে নয়,—পিকাসো বেঁচেছিলেন, বৃহত্তর ক্যানভাসেও।

প্রথম মহাযুদ্ধ, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—'শান্তি পায়রা', 'গুয়েরনিকা', 'কোরিয়ার যুদ্ধ'—যে পিকাসো তাঁর ছবিতে সেই পিকাসোই সেদিন কাফেতে, আড্ডায়, পথে।…

হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেছে। প্যারিসের পথে মাতিস-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বন্ধুর। পিকাসোর হাতে একখানা খবরের কাগজ।

: কোথায় চলেছ তুমি ?

: দরজীর বাড়ি। উত্তর দিলেন মাতিস।

: কিন্তু খবর দেখেছ ?—যুদ্ধ যে আরও ছড়াবে না তার প্রমাণ কি ?—উদ্বিগ্ন পিকাসো যেন যুদ্ধের সম্ভাবনায় তখন উন্মাদপ্রায়।

মহাযুদ্ধের পরে ওঁরা কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য করেছিলেন ওঁকে। পিকাসো আপত্তি করেননি। কিন্তু হাঙ্গেরীর ঘটনার পরে নীরব রাখা যায়নি তাঁকে। তাই বলছিলাম মেরি থেরেস ভুল করেছিল। এমন জীবন্ত মানুষ একালের শিল্পের জগতে বোধহয় সত্যিই দ্বিতীয় নেই।

ঝাঁক ঝাঁক পায়রা, রাশি রাশি ছাগল, পাখী, কুকুর—দু'টি গাড়ি, অগণিত বন্ধু, গুণগ্রাহী ছেলেমেয়ে, এবং সর্বোপরি জীবনে ষষ্ঠ উল্লেখযোগ্য সহচরী—জ্যাকুলিন। 'লা ক্যালিফোর্নিয়ার' আশী বছরের প্রবীণ গৃহকর্তা মাত্র কিছুদিন আগে জ্যাকলিনকে বিয়ে করেছেন, উজ্জ্বল রঙের পোষাক পরেন, এখনও প্রতিদিন ছবি আঁকেন, গান করেন,—নাচেন, আড্ডা দেন। পিকাসো সত্যিই 'গ্রেটেস্ট কমেডি ইন মডার্ন আর্ট।' এমন অফুরন্ত অর্থ, এমন বিশ্বব্যাপ্ত সম্মান, এমন অবিশ্বাস্য প্রাণসম্পদ — সত্যিই অভাবনীয়। লা ক্যালিফোর্নিয়ার আশে পাশে একটা খাবারের নাম পিকাসো, প্যারিসের রাস্তায় ট্যাক্সিওয়ালাদের একটা বিশিষ্ট ইডিয়ম পিকাসো,—আর শিল্প জগতে ? জিয়োত্তো, মিকালেঞ্জেলো, বারনিনি—কয়েকটি নাম মনে জাগে বটে, কিন্তু পিকাসোর মত এমন এক হাতে বিশ্বের শিল্প-

ধারায় কেউ বোধ হয় পরিবর্তনের কারণ হননি।

সংবাদ, পিকাসো এবার 'লেনিন পুরস্কারে' পুরস্কৃত হয়েছেন। সন্দেহ নেই, পিকাসোর খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠার তুলনায় পুরস্কারটা অকিঞ্চিৎকর,—কিন্তু তবুও খবরটা উল্লেখযোগ্য। কেননা, 'স্তালিনের প্রতিকৃতিকার' পিকাসো—শি ল্পা দ র্শ হিসেবে বহুকাল রুশ দেশে বাতিল দলে। তবে কি সত্যই 'থ' চলেছে,—বরফ গলছে?

৩. ৫. ৬২

পিল্লাই, পট্টম থান্নু

শঙ্কর জিতেছেন, তাঁর দল জিতেছে। রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেস প্রায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। তা হলেও সকলের প্রত্যাশা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে যিনি অবধারিত তিনি পি.এস.পি নায়ক প্রবীণ থান্নু পিল্লাই।

প্রশস্ত ললাট, কেশবিরল মস্তক, মোটা কালো ফ্রেমের চশমা, গলায় দক্ষিণী কায়দায় জড়ান একটি কালপাড় চাদর। শ্রীপট্টম থান্নু পিল্লাই কেরালার অন্যতম প্রবীণ নায়ক। শঙ্করের মত তিনি আইনসভায় নতুন নন। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর একাদিক্রমে বিধানসভার আসনে বসে আসছেন তিনি। দুই দুইবার বসেছেন মুখ্যমন্ত্রীর আসনেও। একবার কংগ্রেস দলের নেতা হিসাবে। মাত্র ছয় মাসের নাতিদীর্ঘ মন্ত্রিত্ব। দ্বিতীয়বার দশ মাসের জন্যে যখন বসেছিলেন তখন তিনি রাজ্য বিধানসভার আঠারজন প্রজা সমাজতন্ত্রী সদস্যের নেতা। সেবারের মত এবারও তাঁর মন্ত্রিত্বের স্থায়িত্ব নির্ভর করবে কংগ্রেসের উপর। দূরদর্শী আইনবিদ এবং ভূতপূর্ব অভিজ্ঞ কংগ্রেসসেবী শ্রী পিল্লাই জানেন এবার বসলে পরে তাঁর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত। কারণ মাত্র দু' বছর এগার মাস পরেই কেরালায় আবার নির্বাচন এবং তাতে দল হিসাবে পি. এস. পি'র ভূমিকা যে অবহেলার নয় সেকথা বলা বাহুল্য।

৬. ২. ৬০

[দু' বছর পরে, পিল্লাই বিরোধী আন্দোলন উপলক্ষে]

ঘুরেফিরে আবার এল।

তবে উপলক্ষটা বোধ হয় অন্য কিছু হওয়াই সঙ্গত ছিল, শোভন ছিল। কেননা দেশটা গণতান্ত্রিক এই তথ্যটাই বোধহয় সর্বস্ব নয়। তার আগে, বুক লক্ষ্য করে ইটটা ছুঁড়ে মারার আগে মাননীয় বিশপ পরিচালিত বিক্ষোভকারীদের নিম্নোক্ত তথ্যগুলোর ওপর মনে মনে আর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া কর্তব্য

ছিল। 'আর একবার' বলছি এজন্যে, কারণ—পট্টম থাম্নু পিল্লাই সম্পর্কে এ খবরগুলো দক্ষিণে সবাই জানে।

প্রথমত, দেখতে এখনও পুরুষোত্তমম মনে হলেও 'কেরল সিংহে'র বয়স এখন সাতাত্তর।

দ্বিতীয়, শারীরিক কারণে যাঁরা বে-আইনীকে আইন বলে মেনে নিতে পারেন—পট্টম থাম্নু পিল্লাই কোনদিন সে শ্রেণীর মানুষ নন। কেননা, এককালে (এই শতকের প্রথম দশকে) তিনি যেমন ত্রিবান্দ্রমে বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন, তেমনি পরবর্তীকালে ভারতখ্যাত আইন অমান্যকারীও হয়েছিলেন। শেষোক্তটি সাজতে হলে কতখানি নৈতিক বল প্রয়োজন, অনেক বিশপের চেয়েই পিল্লাই তা ভাল জানেন।

তৃতীয়ত, পদত্যাগের জন্যে এমনি ধ্বনি মাঝে মাঝে শোনা গেছে বটে, কিন্তু সেগুলো যে যথেষ্ট জোরদার নয় পট্টম থাম্নু পিল্লাই তারও প্রমাণ দিতে পারেন। চৌত্রিশ বছর ধরে বলতে গেলে একাদিক্রমে তিনি আইনসভায় আছেন।—কিন্তু কৈ, একবার কি তিনি কোথাও ভোটে হেরেছেন?

চতুর্থত, আজকে অবশ্য পরিচয় তাঁর কেরলের মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু দক্ষিণের লোকদের জানবার কথা এ আসন থাম্নু পিল্লাইয়ের জীবনে অন্তত প্রথম নয়। কেরলের জোড়াতালির আসনে বসেছেন মাত্র সেদিন, '৬০ সনের ফেব্রুয়ারীতে, তার আগে '৪৮ সনে কংগ্রেস নায়ক পিল্লাই ছিলেন ত্রিবাঙ্কুরের মুখ্যমন্ত্রী এবং তার পরে '৫৪ সনে—ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের। একই মানুষ একই আসনে তিন নামের তিনটি রাজ্যে,—এ পরিচয়ের দ্বিতীয় নজীর আর আছে কি?

সবশেষে, ইঁট হাতে বিক্ষোভকারীরা মনে রাখতে পারলে উপকৃত হতেন—আজকের এই প্রবীণ প্রজা-সমাজতন্ত্রী নায়কও একদিন তরুণ ছিলেন। দেশপ্রেমিক হিসেবে দেশময় বিক্ষোভ সেদিন তিনিও ছড়াতেন। তবে অন্যভাবে,—কলমে। পট্টম থাম্নু পিল্লাই তখন দক্ষিণের বিখ্যাত কাগজ 'কেরলা জনতা'র প্রধান সম্পাদক!

৮. ৩. ৬২

পিয়ারসন, লিষ্টার বোলস

পরাজিত দলপতি ডিফেনবেকার বিদায় নিতে সম্মত হয়েছেন। টেলিফোনে তিনি বিজয়ী দলকে তাঁর মনোবাসনা জানিয়ে দিয়েছেন! কথাবার্তা শুরু হয়েছে। পাঁজিপুঁথি

ঘাঁটাঘাঁটি চলছে। আশা করা যায়, কানাডার রাজতক্তে অচিরেই আবার ফিরে আসছেন লিবারেল দল। ১৯২১ সন থেকে '৫৭ সন পর্যন্ত বলতে গেলে প্রায় একটানা রাজত্ব করেছেন তাঁরা। মাঝে ছেদ—১৯২৬ 'সনের কয়েকটি সপ্তাহ, আর ১৯৩০ থেকে '৩৫ এই পাঁচটি বছর। সুতরাং, সেদিক থেকে লিবারেলদের প্রত্যাবর্তন কোন বিস্ময়কর ঘটনা নয়। তার চেয়ে স্মরণীয় বোধ হয় কানাডার প্রধানমন্ত্রীর আসনে ছেষট্টি বছরের প্রবীণ রাষ্ট্রনায়ক পিয়ার্সনের আগমন। কেননা, গেল পনের বছর ধরে কেবলি শোনা যাচ্ছিল—পিয়ার্সন আগামী প্রধানমন্ত্রী,—এবার না হলে নিশ্চয় অন্য কোন দিন। সে-'কোনদিন' অবশেষে সত্যিই আজ এল। এখনও তিনি 'আগামী প্রধানমন্ত্রী' বটে,—কিন্তু সে অনাগত দিনের দূরত্ব মাত্র বড়জোর আর দুটি কি একটি দিন।

* * *

১৯৫৪ সনের পরে শান্তির জন্যে সেই প্রথম পুরস্কার। কিন্তু '৫৭ সনে নোবেল কমিটির ঘোষণায় শুধু নামটিই ছিল। বলা হয়েছিল এবার শান্তির জন্যে পুরস্কৃত করা হবে যাঁকে নাম তাঁর লিস্টার বোলস পিয়ার্সন। পরিচয়—কানাডার কূটনীতিক এবং 'য়ুনো'র ভূতপূর্ব সভাপতি। সেই সঙ্গে দেয় অর্থের পরিমাণটাও উল্লেখ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল—তাঁকে যা দেওয়া হবে মার্কিন মুদ্রায় তার পরিমাণ হবে—চল্লিশ হাজার ডলার। কিন্তু বিশেষ করে ওঁকেই কেন দেওয়া হবে কোথাও সে কথাটির উল্লেখ ছিল না।

ছিল না, কারণ সত্যিই কোন একটি বিশেষ বাক্যে লিস্টার পিয়ার্সন এবং বিশ্বশান্তি এই দুটি কাহিনীকে এক সঙ্গে হঠাৎ বিবৃত করা যায় না।

সাধারণ ঘরের ছেলে। বাবা এবং ঠাকুর্দা দু'জনেই ছিলেন যাজক। পড়াশুনাও প্রথম দিকে সাধারণ স্কুলে. মামুলি কলেজে। পড়তে পড়তেই প্রথম মহাযুদ্ধে সৈনিক হয়েছিলেন। একশ' মিনিট ট্রেনিং নিয়ে—ফ্লাইট লেফট্যানেণ্ট পদ পেয়েছিলেন। যুদ্ধ শেষে আবার লেখাপড়া। এবার স্বদেশেই নয়, বৃত্তির বলে—সোজা চলে গেলেন অক্সফোর্ডে, পিয়ার্সন টরোনটোর বি-এ এবং অক্সফোর্ডের বি-এ এবং এম-এ।

ফিরে এসে '২৪ সন থেকে রকমারি কাজ করেছেন। শিকাগোতে মাংসের কোম্পানিতে কাজ

গম্ভীর প্রকৃতির লাবণ্যময়ী' ছাত্রী মেরিয়ন মুভি তরুণ অধ্যাপকের পত্নী হয়ে ঘরে এসেছিলেন। ওঁদের বড় ছেলে আর্থারের বয়স এখন পঁয়ত্রিশ, মেয়ে লিলায়ানের বয়স তেত্রিশ। কিন্তু পিয়ার্সন যেন এখনও খেলোয়াড়। তিনি প্রবল পরিশ্রম করতে পারেন, দিন রাত খাটতে পারেন। ইচ্ছে করলে বিছানায় শুয়ে তিনি মিনিটের মধ্যে ঘুমোতে পারেন। তবে প্লেন আর ট্রেন বাদ দিয়ে। সেখানে নাকি তিনি কিছুতেই স্বাভাবিক বোধ করতে পারেন না।

পিয়ার্সন সবচেয়ে স্বাভাবিক, সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন যেখানে সে—'য়ুনো'। বলতে গেলে 'য়ুনো'র জন্মক্ষণ থেকেই প্রায় তিনি সেখানে আছেন। সানফ্রান্সিকোয় (১৯৪৫) যাঁরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদটি রচনা করে-ছিলেন — কানাডার প্রতিনিধি পিয়ার্সন তাঁদের অন্যতম। তাছাড়া, উদ্বাস্তু বিষয়ক কমিশন, খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন শাখায়ও তাঁর অনেক অবদান। তারই স্বীকৃতি হিসেবে সুখ্যাত কূটনীতিক পিয়ার্সন ১৯৫২ সনের অক্টোবরে নির্বাচিত হয়েছিলেন—সাধারণ পরিষদের সপ্তম অধিবেশনের সভাপতি। সে বছর করেছেন, টরোনটো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়িয়েছেন। '২৮ সন থেকে আছেন দেশের বৈদেশিক দপ্তরে। বছরকয় ছিলেন লণ্ডনে হাইকমিশন অফিসে, এবং অনেকদিন ওয়াশিংটনের দূতাবাসে। সেখানে '৪৫ সনে রাষ্ট্রদূতের পদে উন্নীত হয়েছিলেন তিনি। '৪৬ সন থেকে রাজকর্মচারী পিয়ার্সন লিবারেল নায়ক ম্যাকেঞ্জি কিং-এর শিষ্য, তিনি রাজনীতিক। '৪৮ সনে স্বদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়েছিল তাঁকে। '৫৭ অবধি ছিলেন সে পদে। তারপর '৫৮ থেকে বিরোধী দলের নায়কের পদে। সেখান থেকেই আজ প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন তিনি।

* * *

লম্বা ধাঁচের মুখ, অপেক্ষাকৃত ছোট দুটি চোখ, দীঘল গড়ন,—গলার "বো।" হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন কোন খেলোয়াড়, — অ্যাথলেট। ছিলেনও। ছাত্রজীবনে ভাল খেলতেন। টেনিস, হকি, এবং কিছু না কিছু প্রায় সব রকমের খেলাই। হকি খেলায় অক্সফোর্ডে "ব্লু" হয়েছিলেন। ইতিহাসের অধ্যাপক "মাইক" নিজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের "রাগবি" টিমের কোচ ছিলেন। সেকালেই "লাজুক এবং

লিসবনে অনুষ্ঠিত 'ন্যাটো'র সম্মেলনেও প্রধানের আসনে বসান হয়েছিল তাঁকে। সেদিনের রাষ্ট্রসঙ্ঘ সভাপতি সম্পর্কে রাশিয়ার জেকব মালিক বলেছিলেন—মানুষটি যে দলেরই হোন, আই অলওয়েজ লিসেন হোয়েন হি স্পীকস!

মালিক-এর মত সেই বাক্যগুলো যাঁরা মন দিয়ে শুনেছিলেন তাঁরাই জানতেন নোবেল কমিটি কেন বেছে বেছে ওঁকেই মালাটি দিয়েছিলেন। পিয়ার্সন শুধু "ডেমক্রাসি ইন ওয়ার্ল্ড পলিটিকস" আর "ডিপ্লোম্যাসি ইন নিউক্লিয়ার এজ" নামক দুটি চিন্তাগর্ভ পুঁথির রচনাকার নন,—কোরিয়ার আশু শান্তির পেছনে তিনিই ছিলেন অন্যতম কারণ, তাছাড়া সুয়েজের হামলার পর থেকে গাজা এবং অন্যত্র আজও যে প্রহরারত 'য়ুনো'র সৈন্যদল এ শান্তি বাহিনীর অন্যতম জনক তিনিই।

* * *

পিয়ার্সন শুধু শান্তিতে বিশ্বাস করেন না, শান্তিরক্ষায় শক্তির প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন। বিশেষ করে, আপন বাহুবলের। সন্দেহ নেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার বহু বিতর্কিত সম্পর্ক তাঁর আজকের বিজয়ের পেছনে অন্যতম কারণ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পিয়ার্সন আমেরিকার বন্ধু হলেও তিনি স্বাধীনচারী বান্ধব। একদা কোরিয়া উপলক্ষে নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছিলেন তিনি—আমেরিকা যেন কখনই এমন ভাবে না যে, সে "রেডি!—রে—রেড়ি" বললেই আমরা সাড়া দেব—ইয়েস স্যার, আমরা হাজির!

১৮. ৪. ৬৩

পোপ ষষ্ঠ পল

নব্বুই বছর আগে একটি বিখ্যাত মার্কিন কাগজ ঘোষণা করেছিল: পোপের সিংহাসন তাঁর আয়ুকে অতিক্রম করেছে। কোন জাতি, কোন সরকার বা কোন বিশেষ রাষ্ট্রব্যবস্থা যা সচরাচর হাতে পায় না পোপের আসন তাই পেয়েছে, সে হাজার বছরের পরিপূর্ণ জীবন উপভোগ করেছে। এবার তার মৃত্যুই বিধেয়!

ভ্যাটিকান-এর উন্নত শির লক্ষ্য করে সে-ই প্রথম মৃত্যুকামনা নয়। যুগে যুগে এর চেয়েও নির্দয়, নিষ্ঠুর রায় শোনা গেছে। কিন্তু রোমের পোপের মৃত্যু হয়নি। যুদ্ধ, জাতীয়তা, নিগ্রহ, অবিশ্বাস—ভ্যাটিকান-এর

মর্ত্যের মানুষের দরকার। রেনেসাঁ দিনে এই গীর্জা পোপ করেছিল বিখ্যাত কার্ডিন্যাল পিক্কোলো-মিনিকে যাজক হয়েও যাঁর জীবন ছিল ভোগীর মত, নানা বিলাসে ভূষিত। সাম্প্রতিককালে আবার এক দুর্যোগের ক্ষণে এসেছিলেন—'রাখাল জন',—রোমের সাম্রাজ্য যাঁর করস্পর্শে আজ আরও গণতান্ত্রিক, আরও অর্থপূর্ণ !

স্নুতরাং, তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে কার্ডিন্যাল জিওভ্যানি বাতিস্তা মন্তিনি, সগুনির্বাচিত ষষ্ঠ পল মোটেই বিস্ময়কর নাম নয়। তাঁর মত কোন 'শ্রমিকের আর্চবিশপ'ই বোধ হয় যুগের প্রয়োজন ছিল।

* * *

'শ্রমিকের আর্চ বিশপ', কিন্তু শ্রমিকের ঘরের সন্তান নয়। বাবা ছিলেন ইতালির পো এলাকার বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি,—সাংবাদিক, আইনজীবী এবং রাজনীতিক। ক্যাথলিক পপুলার পার্টির নায়ক হিসেবে বহুকাল পার্লামেণ্টে ছিলেন তিনি। এক ভাই লোদোভিকো এখনও সেখানে আছেন। তিনি ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্য

মন্তিনি ছোটবেলা থেকেই অন্য

আকাশ ঘিরে অনেক দুর্দৈব দেখা গেছে, কিন্তু তারই মধ্যে ধীর পায়ে সেণ্ট পিটার গীর্জার অলিন্দে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রিন্স অব অ্যাপসলক,—সেণ্ট পিটার-এর উত্তরসাধক ; ঠোঁটের কোণের স্মিত হাসিতে চারদিক রাঙ্গিয়ে বিশুদ্ধ লাতিনে ঘোষণা করেছেন : ওরবি এট ওরবি,—এই শহর এবং এই বিশ্বকে আশীর্বাদ !

এবার যিনি এলেন এই মর্ত্য-ভূমিতে মানবপুত্র যিশুর তিনি ২৬২তম 'ভাইকার'—শিষ্যপ্রধান। অন্ধকারের প্রবক্তাদের সাদা ধোঁয়ায় উড়িয়ে দিয়ে সংখ্যাটা অবশেষে সত্যিই যে ইউ-রোপের প্রাচীনতম রাজবংশটিকেও অসংখ্য পুরুষ পেছনে ফেলে এতদূর এগিয়ে আসতে পারল তার একটি কারণ অবশ্যই স্বয়ং মানবপুত্র। কিন্তু দ্বিতীয় কারণ সিস্টাইন গীর্জার সেই কক্ষটি। ইতালিয়ানরা বলেন—এ-ঘরে যাঁরা পোপ হয়ে ঢোকেন, তাঁরা বেরিয়ে আসেন কার্ডিন্যাল হয়ে! কথাটার অর্থ সোজা : সিস্টাইন গীর্জা তাঁকেই পোপ করে যাঁকে করা দরকার। সেখানে আগে থেকে কিছু বলা শক্ত। ইতিহাসে অন্তত তাই দেখা গেছে। অধৈর্য দুনিয়ার সামনে তিনিই এসে দাঁড়াচ্ছেন—যাঁকে

পথের পথিক। মিলান সেমিনারী এবং গ্রেগরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন এবং দর্শনের ছাত্র মন্তিনি তেইশ বছর বয়স থেকেই যাজক। তাঁর পরবর্তী উচ্চ-শিক্ষাও ধর্মীয় বিদ্যালয়ে। পোপের বিখ্যাত পণ্টিফিক্যাল একাডেমীতে তিনি কূটনীতি পড়েছেন। ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম এবং দর্শন ছাড়াও সমাজ-বিদ্যা, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইত্যাদি সেখানে অবশ্যপাঠ্য। তাছাড়া, ফরাসী, স্প্যানিশ এবং ইংরাজী অথবা জার্মান—তিনটে ভাষাও শিখতে হয়। টমাস মান-এর অনুরাগী পাঠক মন্তিনি ইংরেজীর বিকল্প হিসেবে জার্মানই শিখেছিলেন। ১৯২৩ সনে পড়া শেষ হওয়ামাত্র তাঁকে পাঠান হয়েছিল পোল্যাণ্ডে। মন্তিনি সেই থেকে পোপের সদর দপ্তরের কর্মী। ১৯৩৭ থেকে '৫৪ অবধি একটানা স্বরাষ্ট্রদপ্তরে ছিলেন তিনি। পদ ছিল স্বরাষ্ট্রসচিবের সহকারী, কিন্তু আসলে মন্তিনি তখন পোপ দ্বাদশ পিয়াসএর অন্তরঙ্গ সহচর। লোকে বলে ভ্যাটিকান যে সেদিন অবশিষ্ট ইতালির কাছাকাছি এসেছিল তার একমাত্র কারণ এই মন্তিনি। তাঁরই উদ্যোগে চার্চ সেদিন (১৯৪৮) ইতালির নির্বাচনে ক্রিশ্চিয়ান ডেম-ক্রাটদের পক্ষ নিয়েছিল এবং তাঁরই পরামর্শে জার্মান শ্রমিকরা রুর-এর শিল্পে নিজেদের অংশ দাবী করেছিল। মন্তিনি আধুনিক যাজক, তিনি রাজনীতিক।

* * *

চলতি অর্থে পুরোপুরি সত্য না হলেও কথাটা মিথ্যে নয়। ছ'ফুট উঁচু হাল্কা দেহটিকে নিয়ে মন্তিনি যখন যুদ্ধের দিনগুলোতে বোমাবিধ্বস্ত রোমের পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন তখন তিনি যেন কেবলই যাজক নন, বোধ হয় আরও কিছু। তাঁর বড় বড় চিন্তাশীল চোখগুলোর দিকে তাকালে মনে হয়—তিনি যেন ভ্যাটিকান-এর জন্যে নতুন কোন পথ খুঁজছেন!

যৌবনে রোমের প্রভাবশালী যুবসংস্থা ক্যাথলিক ইউনিভারসিটি ইউনিয়নের নেতা মন্তিনির সমস্যা ছিল মুসোলিনী এবং তার ফ্যাসিস্ত তরুণ দল। স্বরাষ্ট্রদপ্তরের প্রধান সহকারীর চিন্তা তখন ভ্যাটিকান-এর ভেতরে অন্তত শান্তিরক্ষা! পদমর্যাদায় বৃটেন এবং জার্মানী দুই-ই তখন সমান। পোপের রাষ্ট্রীয় আসরে তারা সমমর্যাদা সম্পন্ন। অথচ এই যুদ্ধদিনে সেটা অভিপ্রেত নয়। সুতরাং, মন্তিনি দু'দলের ব্যবধানের স্মারক হিসেবে

মাঝখানে আর একটি আসন পাতলেন, তারপর নিজেই বসে গেলেন সেখানে! প্রীত পিয়াস বললেন—তোমার জয় হোক!

দরবার থেকে মিলানে যেদিন প্রেরিত হয়েছিলেন মন্তিনি সেদিন ভ্যাটিক্যান-এর গোঁড়াদের চোখে নির্বাসিত যাজক। কিন্তু ফিরে আসার দিন দেখা গিয়েছিল—পিয়াস-এর ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যে হয়নি। মিলান থেকেও বিজয়ীর গৌরব নিয়ে ফিরে আসছেন মন্তিনি। 'কমিউনিস্টদের শহর' মিলান তাঁর নামে উন্মাদ, সেখানে শ্রমিকদের মুখে মুখে তিনি 'আমাদের যাজক!'

মন্তিনির এ সাফল্যের পেছনে অন্যতম কারণ তাঁর আদর্শ জীবন এবং দর্শন। কোনদিন কেউ চোখে জল দেখেনি তাঁর। ওরা বলত—'দি কার্ডিন্যাল হু নেভার উইপস!' হাস, ভালবাস, জীবনকে মোকাবেলা কর—এই ছিল তাঁর পরামর্শ। ভ্রাম্যমাণ চার্চ চালু করেছিলেন তিনি মিলানে। বলতেন—চার্চ শুধু ভজনাগার নয়, সেখানে আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা থাকা চাই, ছোটদের খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকা চাই, সিনেমা থাকা চাই।......চার্চ যদি আধুনিক না হতে পারে, তবে চার্চের কোন প্রয়োজন নেই!

ভ্যাটিক্যান-এ নিজের ঘরে টেলিভিসান বসিয়েছেন মন্তিনি। তিনি যখন দুপুরে খেতে বসেন (সিগারেট খান না) তখন টেলিভিসনে খবর হয়, রাত্তিরের খাওয়ার সময়ে গান (মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমোন)। মন্তিনি গান ভালবাসেন। এমন কি শিল্পে সামাজিক কর্তৃত্ব সম্পর্কেও নাকি রীতিমত সহানুভূতি আছে তাঁর!

তাই বলে কি সেণ্ট পিটার-এর ১২৬তম উত্তরাধিকারী 'লাল পোপ?'

যে কোন ইতালিয়ান পার্টিম্যান মাথা নাড়বেন। কেননা, এমন প্রবল শত্রু মিলানে তাঁর কালে আর কেউ ছিলেন না। ওঁরা তাই তাঁর নাম দিয়েছিলেন—আর্চ বিশপ অব দি ওয়ার্কারস এণ্ড কার্ডিন্যাল অব দি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস! মন্তিনির প্রগতিবাদ তাঁদের কাছে এক দুরূহ সমস্যা। কেননা, এ যাজক সত্যিই তাদের মোকাবেলা করতে জানেন।

সেবার (১৯৫৩) পোপের দপ্তরে শান্তি কংগ্রেস থেকে অনুরোধলিপি এল একটি। লিখেছেন জুলিও কুরী। তাঁদের আন্দোলনে ওঁরা

মহামান্য পোপের আশীর্বাদ চান। দিন যায় উত্তর আর আসে না। অধৈর্য শান্তি সৈনিকেরা মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে প্রচারে নামলেন। তাঁরা দিগ্বিদিকে রটিয়ে দিলেন পোপ তাঁদের স্বপক্ষে। প্রচারের ঢাকে যখন প্রায় কানে তালা লাগবার অবস্থা তখন ভ্যাটিক্যান থেকে ছোট্ট একটি বিবৃতি প্রচারিত হল। তাতে বলা হল: চারদিকে তাঁর নাম নিয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতি চলছে দেখে পোপ নিরতিশয় ব্যথিত। তিনি যে কোন শান্তি প্রচেষ্টার পক্ষে বটে, কিন্তু এটা জানাতে চান—একমাত্র ধর্মই মানুষের সেই বিবেকটিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে যা পরস্পরকে ভাই করে!

এ বিবৃতি মন্তিনিরই রচনা। লোকে বলে—সময়টাও তিনিই বেছে নিয়েছিলেন।

২৭. ৬. ৬৩

[১৯৬৪ সনের ডিসেম্বরে বিশ্ব ইউক্যারিস্টিক কংগ্রেস উপলক্ষে রোমের পোপ ভারতে আগমন করেন। ইতিহাসে এই প্রথম রোমের পোপের ভারত আগমন।]

প্রফুমো, জন ডেনিস

একটি প্রকৃত বিলিতি রোমাঞ্চ কাহিনীর জন্যে যা যা দরকার সবই আছে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, খেতাব মণ্ডিত মান্য রাজপুরুষ, ঝলমলে ব্যারন বর্গ, সুইমিং-পুল, প্রমোদোদ্যান, একুশ বছরের রূপসী, পিস্তলধারী কৃষ্ণাঙ্গ প্রণয়ী এবং একজন রহস্যময় রুশ কূটনীতিক। কিলারের হাতে বৃটিশ সমর-সচিব প্রোফুমোর সংহার কাহিনীটা ক্রমেই আরও ঘনীভূত হয়ে উঠছে। কেননা লণ্ডনের একজন খ্যাতনামা "সদাশিব" ছাড়াও সেখানে একজন পূর্বদেশীয় বাদশাকে ক্যামেরা হাতে পুকুরধারে দেখা গেছে! তদুপরি লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, আপাত হাতিয়ারহীন এই জেনানা-খুনীর হাতে শেষ পর্যন্ত একটা বলবান সরকারও খতম হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। কাহিনীর গতি নাকি সেই উপসংহারের দিকেই।

তার আগে আগের ক'টি পাতা।

লণ্ডনের উইনপোল মিউস-এ ছোট্ট একটি ফ্ল্যাটে মস্ত একজন ডাক্তার থাকেন। নাম তাঁর ডাঃ স্টীফেন ওয়ার্ড। বয়স—পঞ্চাশ। চেহারা—চমৎকার। বাবা তাঁর রচেস্টার গীর্জার যাজক ছিলেন।

নিজে তিনি আমেরিকা-ফেরত ডাক্তার। অস্থি-বিশেষজ্ঞ হিসেবে লণ্ডনে তাঁর প্রভূত নাম। রোগীদের মধ্যে চিত্রতারকারাজি ছাড়াও আছেন চার্চিল, অ্যামরি, ডানকান স্যাণ্ডস প্রভৃতি মান্যজনেরা। তদুপরি ওয়ার্ড চিত্রকর হিসেবেও বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ইজেলের সামনে বসে যাঁরা আনন্দ বোধ করেছেন প্রিন্স ফিলিপ, প্রিন্সেস মার্গারেট, লর্ড স্নো ডন, প্রিন্সেস আলেকজান্দ্রা, কেণ্টের ডিউক এবং ডাজেস,—তথা গোটা রাজপরিবার। ওয়ার্ড সাহেবের পরিচয় সেখানেই শেষ নয়। তিনি অতিশয় সামাজিক ব্যক্তি। সমাজের উঁচু নীচু সকল তলায় তিনি সমান স্বচ্ছন্দ। লর্ড অ্যাস্টর তাঁর কাছে "বিল", সোবিয়েত দূতাবাসের নে ভা ল-এটাচি ইউজিন আইভানফ —"বয়"। বিদেশীকে একবার তিনি প্রিন্সেস মার্গারেটের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। বদলী হিসেবে আইভানফ তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন—গাগারিন এবং মাদাম-ফুর্ৎসেবাকে। অ্যাস্টরের রূপসী পত্নী ভূতপূর্ব মডেল মোরিয়ান তাঁর আড্ডাখানা থেকেই সংগৃহীত। প্রতিদান হিসেবে অ্যাস্টর তাঁর বিখ্যাত প্রাসাদ ক্লিভেনডনের একটি কুটির ডাক্তারকে লিখে পড়ে দান করে দিয়েছেন। ডাক্তার লণ্ডনের ইস্ট এণ্ড এলাকার মেয়েদের কাছে —"পিটার প্যান"। যে কোন সময়ে যে কোন মেয়ের তাঁর ফ্ল্যাটে অবারিত দ্বার। তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত না করা অবধি তাঁর নিজের কাছে মুক্তি নেই। মোরিয়ান ছাড়াও তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের মধ্যে আছে কুচবিহার মহারাজার নজর-ধন্যা বিখ্যাত ভিকি মার্টিন। ভিকি বেঁচে নেই। কিন্তু ডাক্তারের করুণায় জীবনই নিয়ম।

সে লালসায়ই ভাসতে ভাসতে এসেছিল হেইস-এর শহরতলীর মেয়ে ক্রিশ্চিন কিলার। ইঞ্জিন-ফিটারের কন্যা সে। বস্তীর ভাঙ্গা ঘরে অনেক দুঃখ দেখেছে। পথে পথেও কম নয়। এই বয়সেই চাকরী করেছে, কাফে চালিয়েছে, সতের বছর বয়সে কুমারী জীবনে জননী হয়েছে। ওয়ার্ড সব শুনে তার কাঁধে হাত রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল উত্থান। মডেল-কন্যার সেই উত্থান মুহূর্তেই ১৯৬১ সনের ডিসেম্বরের এক সন্ধ্যায় অ্যাস্টরের প্রমোদোদ্যানে সামনে এসে দাঁড়ালেন সুদর্শন

প্রফুমো, জন ডেনিস

রাজপুরুষ জন ডেনিস প্রোফুমো পি সি, ও. বি. ই। কিলার তখন জলকেলি করছে।

বড় ঘরের ছেলে।

একদা ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন সাম্রাজ্য ইতালীর সার্দিনার পঞ্চম ব্যারণ। ঠাকুর্দা এসে সিংহাসনের কাছাকাছি আসন পেতেছিলেন। বাবা অ্যালবার্ট ছিলেন কিংস কাউন্সেল। পুত্রও আবাল্য সুলক্ষণ সম্পন্ন। বড়ঘরের নিয়ম অনুযায়ী তিনি হ্যারো এবং অক্সফোর্ডে পড়েছেন। নিয়ম ভঙ্গ করে প্রতিটি পরীক্ষায় অভাবনীয় ফল দেখিয়েছেন। তাছাড়া, জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও তিনি আদর্শ তরুণ। তিনি চমৎকার এরোপ্লেন চালাতে পারেন, রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে শুধু জ্ঞান নয়, অনেক "নোবলিজ অবলিজ" যা পারেন না—তিনি তাও পারেন,—ভাল অভিনয় করতে পারেন!

রাজনৈতিক জীবনেও প্রোফুমো এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বাইশ বছর বয়সে তিনি কনজারভেটিভদের একটি স্থানীয় শাখার সভাপতিত্ব করেছেন। তার চেয়েও বড় কৃতিত্ব ১৯৪০ সনে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি পার্লামেণ্টে আসন দখল করেন। সেদিন বৃটিশ পার্লামেণ্টে প্রোফুমোই সর্ব কনিষ্ঠ সদস্য। অথচ, বাবা দুই দুইবার সে চেষ্টা করে বিফল হয়েছিলেন।

যুদ্ধের বছরগুলোতে প্রোফুমো বৃটিশ বাহিনীর সর্ব কনিষ্ঠ মেজর। উত্তর আফ্রিকায় তাঁর বিচক্ষণতা দেখে ফিল্ড মার্শাল আলেকজাণ্ডার লেঃ কর্ণেল করে নিয়েছিলেন তাঁকে।

প্রোফুমো মৌখিক যুদ্ধেও সমান বিচক্ষণ। যুদ্ধ সময়েও পার্লামেণ্টের সদস্যপদ ত্যাগ করেননি তিনি। ১৯৪৪ সনে ইতালী রণাঙ্গন থেকে উড়িয়ে আনা হয়েছিল তাঁকে একটি বিতর্কের উদ্বোধন করার জন্য। বিষয় ছিল—সৈন্যবাহিনী এবং তাদের সম্পর্কে সরকারী কর্তব্য। পার্লামেণ্টে কনজারভেটিভদের পায়ের নীচে উপযুক্ত ভিত্তি রচনা করে আবার রণাঙ্গণে ফিরে গিয়েছিলেন প্রফুমো। পুরানো সদস্যরাও মাথা নেড়ে সেদিন স্বীকার গিয়েছিলেন—হ্যাঁ, ছেলেটি বলতে পারে বটে!

যুদ্ধের পর ১৯৪৫ সন থেকে প্রোফুমো পার্লামেণ্টে "শেক্সপীয়রের এলাকা" স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন-এর প্রতিনিধি। ১৯৬০ সনে ম্যাক-মিলানের সমরসচিব মনোনীত হওয়ার

আগে তিনি সগৌরবে আর যা যা দায়িত্ব পালন করেছেন তার মধ্যে আছে: জাপানে বৃটিশ মিলিটারী মিশনের অধিনায়কত্ব, একাধিক দপ্তরের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীর কাজ এবং ১৯৫৯ সনে লয়েডের সহকারী হিসাবে বৈদেশিক দপ্তরে রাষ্ট্রমন্ত্রিত্ব। প্রোফুমো কোথাও ব্যর্থ রাজপুরুষ নন। বরং সোবিয়েত চালের উল্টো চাল হিসেবে কাসেমকে অস্ত্র বিক্রির প্রস্তাব দিয়ে সেদিন তিনি রীতিমত সুখ্যাত রাজপুরুষ।

সুখ্যাত ব্যক্তিগত জীবনেও।

সমর সচিবের ব্যক্তিগত নেশার তালিকায় আছে শিকার, ক্যামেরা এবং চলচ্চিত্রবিজ্ঞান। শেষোক্তটির-বশেই ১৯৫৪ সনে তাঁর ঘরে এসেছেন খ্যাতনাম্নী মঞ্চ এবং চিত্রাভিনেত্রী ভেলেরি হবসন। আয়র্ল্যাণ্ডের জনৈক কমাণ্ডারের এই কন্যাটি ছোটবেলা থেকেই অভিনয় শিক্ষার্থিনী। পনর বছর বয়স থেকে তিনি অভিনয় করছেন। জীবনে প্রথম সিনেমা তাঁর "বেজারস গ্রীন", পরবর্তী জীবনের অসংখ্য ছবির তালিকায় আছে—"ওয়েব উলফ অব লণ্ডন", "রাইড অব ফ্রাঙ্কেনস্টাইন", "দি ম্যান ইন নিউস", "দি গ্রেট এক্সপেক্টেশন" "স্পাই ইন ব্ল্যাক" ইত্যাদি ইত্যাদি। হবসন '৩৯ সনে অ্যাণ্টানি জেমসকে নিয়ে ঘর পেতেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানে থাকা সম্ভব হয়নি। ১৯৫২ সনে দুই পুত্রের জননী বিবাহভঙ্গ করে দু'বছর পরে আবার নতুন করে সংসার পেতেছিলেন। '৫৫ সনে আবার জননী হয়েছেন তিনি। সে পুত্র ইতালীর ষষ্ঠ ব্যারণ। ডিসেম্বরের সেই স্মরণীয় সন্ধ্যায় সমরসচিবের সঙ্গে তাঁর এই সুখী পত্নীও ছিলেন! সাঁতার তাঁরও নেশা। তিনি তখনও জানেন না অ্যাস্টরের পুকুরে সাঁতার কাটছে যে মেয়েটি সে আরও গভীর জলের,—সত্যিই সে "কিলার"—সাক্ষাৎ সংহারিণী।

গেল মার্চে পার্লামেণ্টে যেদিন প্রোফুমো তর্জনী তুলে সমস্ত "গুজবের" মুখে যতি টানেন—সেদিন হবসনও ছিলেন গ্যালারীতে। সেই তুখড় ভাষণের পরে স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে সোজা ছুটেছিলেন স্যাণ্ড ডাউন পার্কে,—রেসের মাঠে। স্বয়ং রানী-মাতা এগিয়ে এসে নিজের গ্যালারিতে ডেকে নিয়ে পাশে বসিয়েছিলেন ওঁদের। সন্ধ্যায় কনজারভেটিভদের আয়োজিত একটি ভোজসভায় ওঁদের দু' জনকে একসঙ্গে নাচতে

দেখা গিয়েছিল। দেখে সোসাইটি নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলেন বটে, কিন্তু ফ্লিট স্ট্রীট ফিসফাস বন্ধ করতে পারেনি। কেননা, সমর-সচিবের সাম্প্রতিক জীবন-ইতিহাস একেবারে কলঙ্কহীন নয়। গত বছর ৩১শে অক্টোবর তারিখে হাউস অব কমন্স তাঁর মুখের সামনে সামরিক বাহিনীর একটি পোস্টার তুলে ধরে জানতে চেয়েছিল—এই মেয়েটি, যে আমাদের তরুণদের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্যে ডাকছে, সে কি মিস মেলিস ম্যাকেঞ্জি নামে একটি উনিশ বছরের "বিকিনিগাল" নয়?—এবং মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় একথা কি অস্বীকার করতে পারেন যে, তাঁরই ব্যক্তিগত নির্দেশে এই সুন্দরী এখানে ঠাঁই পেয়েছে?

প্রোফুমো উত্তর দিয়েছিলেন—কথাটা সত্য। তবে এই সুন্দরীর সঙ্গে সম্পর্ক আমার অতিশয় অল্প,—আমি তাকে চিনি মাত্র!'

শুনে মেয়েটি বলেছিল—দি জব ওয়াজ এ বিগ জোক!...প্রোফুমো একটা পার্টিতে আমাকে কাজটা গছিয়েছিলেন। তিনি নাকি বিকিনি-পরা আমার একটা ফটো দেখে বহু দিন আগেই মনে মনে আমাকে নির্বাচিত করে রেখেছেন!'

তারপরেও হয়ত তাঁর পক্ষে বৃটিশ সমর সচিবের পদে থাকা কষ্টকর হত না। এমন কি, ছয়-ছয়বার কিলারের সঙ্গে সখ্যতার পরেও না। কেননা, —সেটা ব্যারনের ব্যক্তিগত ব্যাপার। হয়ত, সোবিয়েত কূটনীতিক কিলা-রের কামনা, ডাঃ ওয়ার্ডের ব্যবসা,—কিছুই শেষ পর্যন্ত আটকাতে পারত না ওঁকে। কিন্তু কমন্স সভায় মিথ্যে বলার দায়? এ নাটকের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায় সেখানেই। কিলার নয়, প্রোফুমোর মত উজ্জ্বল নক্ষত্রও যে বুমেরাংয়ে আজ ধরাশায়ী হলেন—সে মিথ্যাচার—"লাই।" জনতার দরবারে তার ক্ষমা নেই।

১৩. ৬. ৬৩

ফ

ফানফেনি, আমিনতোর

চল্লিশখানা বই লিখেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি জগদ্বিখ্যাত। তবুও লোকে বলে—'লিট্‌ল প্রফেসর।'

সত্য বটে, তিনি খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং দেহটা ওঁর খুবই ছোটখাট। উচ্চতায় মোটে পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। সে কারণে নাম তাঁর—'টম থাম্ব',—'লিটল প্রফেসর' নয়। শেষের নামটি কি করে হল জানতে হলে মানুষটির গোটা জীবন কাহিনীটাই শুনতে হয়।

পুরো নাম—আমিনতোর ফানফেনি। আমিনতোর ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক সঙ্গীতজ্ঞ। শ্রমিকদের নামে গান লিখতেন তিনি। নামের গোড়াটুকু তাঁরই কাছ থেকে ধার করা। বাবা ছিলেন—গ্রামের ডাক্তার, চিকিৎসক। সুতরাং, একেবারে গরীব ঘরের ছেলে ছিলেন না তিনি।

কিন্তু গরীব হতে হল। কেননা, অল্প বয়সে, বাবা মারা গেলেন। নামের সঙ্গে দেশপ্রেমিকের যোগের কথা স্মরণ করে বেপরোয়া ছেলে ফ্যাসিস্তদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ফানফেনি আজও স্বীকার করেন—তাঁর জীবনে সে কয়টি মাস আজও দুঃস্বপ্ন।

সৌভাগ্য, সে স্বপ্ন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। দল ছেড়ে ফানফেনি অচিরেই চলে এলেন মিলান-এ। এবং এসেই ভর্তি হয়ে গেলেন ক্যাথলিকদের বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে ক্রমশ জানা গেল ছেলেটি সাধারণ নয়।

গণিত এবং পদার্থবিদ্যার ছাত্র, কিন্তু থিসিস লিখতে বসলেন—অর্থনীতি বিষয়ে। আশ্চর্য তা লিখলেনও। '৩২ সনে 'সেক্রেড হার্ট' কলেজ থেকে 'ডক্টরেট' হয়ে বের হলেন ফানফেনি। পর পর কয়েকটা বছর কেটে গেল আরও কয়টি বই লেখায়। '৩৬ সনে 'সেক্রেডহার্ট'ই অধ্যাপনার কাজ দিয়ে নিয়ে গেল ওঁকে। সেখানে তিনি কলেজের বিখ্যাত তাত্ত্বিকদের সঙ্গে সন্ন্যাসীর মত জীবনযাপন করেন, খালি পায়ে হাঁটেন। লোকে ওঁদের নাম দিয়েছে 'লিটল প্রফেসর'। পরবর্তীকালে ইতালীর রাজনীতিতে তাঁরাই উদার পন্থী গণতান্ত্রিক।

ফারা দিবা

লেখা এবং তত্ত্বকথা আলোচনাতেই দিন কাটছিল। এমন সময় এল যুদ্ধ। ফ্যাসিস্তরা পুরানো সূত্র ধরে তলব করলেন। বললেন—'যুদ্ধে যেতে হবে।' ফানফেনি পালিয়ে চলে গেলেন সুইজারল্যাণ্ডে। যুদ্ধের সময় সেখানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতালীয়ান পড়াতেন !

যুদ্ধের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন এবং রাজনৈতিক জীবন। ফানফেনি ইতালীর অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ক্রিশ্চিয়ান ডেমক্রেটিক পার্টির প্রগতিশীল অংশটুকুর নায়ক। যুদ্ধপর বহু মন্ত্রিসভায় তিনি কাজ করেছেন এবং '৫৮ সনে স্থায়িভাবে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসবার আগে '৫৪ সনে একবার কিছুদিনের জন্যে সেখানেও বসেছিলেন। আপাতত তাঁর স্থায়িত্ব থেকেই বোঝা যায় কেন তিনি 'টম থাম্ব'।

চলনে বলনে তুখড়, বুদ্ধি এবং বিদ্যায় প্রখর, ফানফেনি এখন তিপ্পান্ন বছরের প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ। একদিকে তিনি যেমন পশ্চিমের বিশ্বস্ত সুহৃৎ, অন্যদিকে নানা প্রগতিশীল আইনের জনক হিসেবে স্বদেশেও কমিউনিস্টদের প্রকৃত প্রতিরোধ।

তা সত্ত্বেও ফানফেনি কমিউনিস্টদের কাছে অপ্রিয় শাসক নন। কেননা, তিনি জনপ্রিয় শাসক। ইতালীর জনপ্রিয় শাসক ফানফেনি সম্প্রতি মস্কো ঘুরে এলেন। 'নাটো'র অন্যতম সদস্য রাষ্ট্রের নায়ক হিসেবে এটা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য সংবাদ।

১০. ৮. ৬১

ফারা দিবা

সেই মেয়েটির নাম ছিল—মারিয়া গ্যাব্রিয়েলা। সহপাঠিনীরা বলত—এলা। বনেদী ঘরের মেয়ে। ইতালীর রাজকুমারী। রাজকুমারী এলার বয়েস মোটে সতের। চেহারা: এক কথায় অপূর্ব। লম্বায় ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি, পাঁচটা ভাষা জানে, ঘোড়ায় চড়ে, গান গায়, গীটার বাজায়। হাঁটে সোজা হয়ে রাজকীয় ছন্দে, হাসে রানীর মতন। কাগজে কাগজে সচিত্র বিবরণ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন পারস্যরাজ। উত্তরাধিকারের অভাবটা সহসা ধাঁ করে মনে পড়ে গেল তাঁর। দাঁত সারাতে তিনি চলে এলেন জেনেভায়। শাহ জানেন এলা মায়ের সঙ্গে জেনেভায় থাকে, য়ুনিভারসিটিতে পড়ে।

যথাসময়ে ভোজসভা বসল ইতালীর ভূতপূর্বা রানী মেরী জেসে'র বাড়ীতে।

নিমন্ত্রিত শাহ'র সঙ্গে দেখা হল—রাজকন্যা এলার। কথাও হল মিনিট দশেক।

কিন্তু শাহ জেনেভা ছাড়তে না ছাড়তেই জানা গেল ইতালীর রাজ্য-হীনা রাজকন্যা বাতিল করে দিয়েছেন পৃথিবীর মুষ্টিমেয় সত্যকারের রাজার অন্যতম পারস্যরাজকে। হেসেই উড়িয়ে দিলে এলা: শাহ বয়সে আমার বাবার মত!—আর দেখতে?—ঠাকুর্দার মত!

কিন্তু একুশ বছরের আধুনিকা তরুণী ফারা ডিবার কাছে চল্লিশ বছরের শাহ এখনও তরুণ। আনন্দ উত্তেজনায় সে আংটি বদল করে ফেলেছে শাহ'র সঙ্গে। তৃতীয় বারের জন্যে তেহরাণের রাজপ্রাসাদে রাণী আনতে চলেছেন শাহ। ফারা ডিবা তাঁর ভাবী রানী,—'কুইন অব পার্শিয়া।

ফারা ইউরোপের মেয়ে নয়, রাজ-কুমারীও নয়। সে পারস্যকুমারী। সাতাশ পুরুষ আগে তার পূর্বপুরুষ ছিলেন স্বয়ং মোহাম্মদ। পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী মোসাদেক তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। বাবা ছিলেন সামরিক বিভাগের একজন অফিসার। মা তেহরাণের প্রগতিশীলাদের ক্লাবের একজন সদস্যা। ফারা ছিল প্যারিসে স্থাপত্য বিদ্যার ছাত্রী। ১৫৬ জনের ক্লাসে তার স্থান ছিল উনিশজন পরে। এবার সে উঠে এল ইরাণের লক্ষ লক্ষ মেয়ের ওপরে।

৫ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা এই মেয়েটিও অনেকটা অভ্যাসে এলার মত। পিয়ানো বাজায়, সাঁতার কাটে, ভাল বাসকেট বল খেলে। তদুপরি, সে চুল ছাটে এবং প্যাণ্ট সুয়েটার পরে। সুতরাং ফারাও অবশ্যই শাহর নজরে পড়বার মতই মেয়ে।

কিন্তু ফারা ডিবা জানে—তার এ পরিচয়গুলো উপলক্ষ্য হলেও লক্ষ্য অন্য। শাহ উত্তরাধিকারী চান! প্রথম স্ত্রী ফয়েজা (Fawiza) তাঁকে মেয়ে উপহার দিয়েছিলেন একটি। কিন্তু শাহ তবুও ঘরে রাখেননি তাকে। ফয়েজা আজ পুনর্বিবাহিতা। তাঁর মেয়ে শাহজাদী শাহনাওয়াজ ফারার বন্ধু। দ্বিতীয় স্ত্রী সুরাইয়ার জন্যে অনেক কেঁদেছেন শাহ। কিন্তু তালাক দিতে হয়েছে তাঁকেও। ফারা যখন আংটি বদল করেছেন তেহরাণে সুরাইয়া তখন একা একা মার্কেটিং করে বেড়াচ্ছেন রোমে।

২৭. ১১. ৫৯

[দ্রষ্টব্য: পহলেভী, রেজা মহম্মদ।]

কিসার, ডঃ জিওফ্রে

—এটম বম ? —'ও ইট পুটস টু আস নো নিউ এথিক্যাল প্রোব্লেম !'

—হিরোসিমা ? —'আই থিঙ্ক দি বম দেয়ার সেভড মোর লাইভস এণ্ড সাফারিং ··।

—যুদ্ধ ? —'যুদ্ধ অবশ্যই পাপ ! ···বাট ইন এ ওয়ার্ল্ড দেয়ার ইজ অফেন নো কোর্স এনটায়ারলি ফ্রি ফ্রম সিন।'

—(সুতরাং) সুয়েজ যুদ্ধ ? —'না, না, এভাবে যুদ্ধে নেমে পড়াটা আমাদের ঠিক হয়নি ! —'নট বিকজ ইট ইজ রং,···ইউ সুড বি ওয়াইজার !'···

—এইচ-বম ? '—এ মনস্ট্রাসলি ইভিল ওয়েপন !'

—বৃটেনও বানাচ্ছে ? '—ও বানাবেই ত ! উই মাস্ট হ্যাভ ওয়ান ! —অল ইট কুড ডু উড বি টু সুইপ এ ভাস্ট নাম্বার অব পারসনস ফ্রম দিস ওয়ার্ল্ড ইন টু দি আদার এণ্ড মোর ভাইটাল ওয়ার্ল্ড।··· ! (পরক্ষণেই) থ্যাঙ্ক গড, আই হ্যাভ নট গট টু ম্যানুফ্যাকচার ইট !

অতঃপর আরও কয়েকটি নমুনা :

—শ্রেণীহীন সমাজ ? —'অত্যন্ত বাজে কথা, সে জিনিষ হতেই পারে না !'

—ধর্মঘট ! —'ভাল বটে, কিন্তু আমি কোন অবস্থাতেই তা সমর্থন করতে পারি না। কেননা, এটাও তো এক রকমের যুদ্ধ !'

—শিল্পোন্নয়ন ? '—বলা বাহুল্য, এটা আসলে একটা মস্ত থিওলজিক্যাল প্রোব্লেম। কেননা, টু ফল ব্যাক অন ওয়ার্ল্ডলি ওয়েপনস ইজ অলওয়েজ এ স্পিরিচুয়াল ফেল্যুর !'

সাদা আর কালো ছাত্ররা দু' বাড়িতে থাকছে কেন ?—'কারণ ঈশ্বর এমন কোন আইন সৃষ্টি করেননি যার জন্যে যত পার্থক্যই থাক সব মানুষকে এক বাড়িতে থাকতে হবে !

—আফ্রিকার চার্চেও এমন বৈষম্য কেন ?—কারণ,—দো অল মেন আর ইকুয়েল উইদিন দি সাইট, অব গড !···

সংক্ষেপে এই হচ্ছেন ক্যাণ্টারবেরীর ৯৯তম আর্চবিশপ। আর্চবিশপ ডঃ ফিসার। মোস্ট রেভারেণ্ড আর্চবিশপ, কিন্তু বক্তব্যের পরিধি তাঁর আগাগোড়া গীর্জা ছাড়িয়ে। পৃথিবীতে এমন কোন বিষয় নেই,

যে বিষয়ে ক্যাণ্টারবেরীর এই মানুষটির কিছু-না-কিছু মন্তব্য নেই। তা টেলিভিসান হক, আর কৃত্রিম প্রজননই হক !

লোকে বলে উনি আসলে যাজক নন, রাজনীতিক। ফিসার আপত্তি করেন না। কেননা, তিনি জানেন, ক্যাণ্টারবেরীর এই সম্মানের আসনটিতে যে তাঁকে বসান হয়েছিল তার কারণ রাজনীতি। বসবার কথা হয়েছিল কি চেষ্টার-এর বিশপ রেঃ বেল-এর। কিন্তু বেল জার্মান শহরগুলোতে নির্বিচারে বোমা-বর্ষণের বিপক্ষে। ডঃ ফিসার তখন লণ্ডনের বিশপ। তিনি সরকারের সপক্ষে। '৪৫ সন। সহসা মারা গেলেন ক্যাণ্টারবেরীর সর্বজন শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ ডাঃ টেম্পল। চার্চিল ফিসারকে সুপারিশ করলেন। কে একজন বললেন—এই রফাটা কি ঠিক হল ? ফিসার পিছন ফিরলেন '—রফা ? রফা ঈশ্বরও করতেন।'

এক কথায় অদ্ভুত মানুষ।

বাবা মার্লবারোয় যাজক ছিলেন ! তাঁর বাবা,—তাঁর বাবাও। কয়েক পুরুষ ধরে যাজকের বংশ। সুতরাং ছেলেও সেই পথ ধরলেন। মার্লবারো থেকে অক্সফোর্ড। যেমন প্রথর ছাত্র, তেমনি তুখড় খেলোয়াড়। পরীক্ষায় একসঙ্গে তিনটে ফার্স্ট ক্লাস। ওদিকে বাইচ খেলায় অক্সফোর্ডের অধিনায়ক।…পড়াশুনা শেষ করে ছেলে যখন ঘরে ফিরছেন তখন তার বয়স মোটে চব্বিশ !

তা হক। সঙ্গে সঙ্গে চাকরি মিলে গেল। মার্লবারো কলেজেই সহকারী মাস্টারের কাজ। তিন বছর পরে বিখ্যাত রেপটন স্কুলের হেডমাস্টার !

'—সে কাজই কেন করলেন না উনি,—সমালোচকরা সেকথাও কখনও কখনও বলেন।

হেসে উত্তর দেন ক্যাণ্টারবেরীর বিশপ—তাই ত করছি। বিশ্ববাসীর উচিত আর অনুচিত নিয়ে সর্বদা তিনি মুখর।

স্কুলে থাকতে থাকতেই বিয়ে। শ্বশুরও যাজক। সন্তান—ছ'টি পুত্র। (ফিসার বলেন—ছেলেপুলে যাঁর তিনটির কম তাঁকে আমি গৃহস্থ বলি না) যা হক, কিছুদিনের মধ্যেই চেস্টারের বিশপ নিযুক্ত হলেন ডঃ জিওফ্রে ফিসার (১৯৩২) তারপর লণ্ডন ('৩৯) এবং অবশেষে ক্যাণ্টারবেরী। ১৯৪৫ থেকে ডঃ

ফিসার, লুই

ফিসার ক্যাণ্টারবেরীর আর্চবিশপ এবং বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রাইমেট।

অবশেষে সেই সম্মানের আসন থেকে আরও সম্মানসহ নেমে দাঁড়ালেন তিয়াত্তর বছরের প্রবীণ যাজক।

সমালোচকরা এখনও বাঙ্ময়। তাঁরা বলেন লোকটি রাজনীতিবিদ ছিলেন।

'—তা বটে, কারণ রোম আর লণ্ডনের চারশ বছরের পুরানো স্নায়ু-যুদ্ধটা তিনি বন্ধ করে দিয়ে গেলেন!'

কেউ বলেন '—লোকটি আসলে ব্যবসায়ী ছিলেন!'

'—তা বটে, কারণ চার্চের আয় তিনি বছরে দেড় মিলিয়ান বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন!'

কেউ বলেন—লোকটি উন্মাদ ছিলেন!'

কোটি কোটি সাধারণ অনুরাগী বলেন—'কারণ তিনি মানুষ ছিলেন!'

২৬. ১. ৬১

ফিসার, লুই

তিনি বসলেন। তারপর বেঞ্চিটায় একটা হাত রেখে বললেন—'বস'। এমন ভাবে তিনি বসলেন এবং এমন ভাবে তিনি হাতখানা বেঞ্চিতে রাখলেন যে মনে হল তিনি বলছেন—'এই আমার ঘর, এসো, ভেতরে এসো!'—'আই ফেল্ট অ্যাট্ হোম ইমিডিয়েটলি!"

স্থান — ভারতবর্ষ। বিখ্যাত সেবাগ্রাম আশ্রম। কাল ১৯৪২ সনের মে। সুতরাং, প্রথম দর্শনে 'ঘরের মানুষ' হয়ে যাওয়াটা কোন বিস্ময়কর ঘটনা নয়। কেননা গৃহকর্তা তখন স্বয়ং গান্ধীজী।—কিন্তু সেখানে গান্ধী ছিলেন না, আশ্চর্য এই লুই ফিসার নামক মানুষটি সেখানেও কোন-দিন বাড়ীর দরজা থেকে ফিরে যান না,—যান নি।

কত আর বয়স তখন? মাত্র একুশ বছর (জন্ম—১৮৯৬) ফিলা-ডেলফিয়ার একটা স্কুল থেকে সবেমাত্র স্নাতক হয়ে বেরিয়েছেন তিনি। কাজও পেয়েছেন একটা। স্কুলের কাজ। এমন সময় (১৯১৭) সহসা শুনলেন ইংরেজদের উদ্যোগে একটা সৈন্য বাহিনী তৈরী হচ্ছে। প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের নামে তারা লড়াই করবে। শোনামাত্র ফিসার স্কুলের কাজ ছেড়ে দিলেন। তিনি সেই বাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবক হলেন। ইউরোপের নানা দেশে ট্রেনিং নিয়ে কাটালেন কিছুদিন। মাস পনের

উত্তরে ফিসার সেদিন জানিয়ে ছিলেন, '—ইন লেনিন'স রাশিয়া অব নাইনটিন টুয়েন্টি টু আই লুকড নট ফর এ বেটার প্রেজেন্ট, বাট ফর এ ব্রাইটার ফিউচার!' সম্ভবত সে বিচারে তিনি সেদিন নির্ভুল ছিলেন।

মস্কো থেকে মাঝে মাঝে জার্মানী এবং পূর্ব ইউরোপ। এবং অবশেষে গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত স্পেন। ফিসার গিয়েছিলেন সাংবাদিক হিসেবেই। কিন্তু স্পেনে নেমেই তিনি কলম রেখে রাইফেল নিয়ে ইণ্টারন্যাশনাল বিগ্রেড-এ যোগ দিয়ে বসলেন। কেননা, এ ছাড়া মন মানে না। (…'মেসিনগান ওয়ার বিয়িং মাউণ্টেড অন দি অইভরি টাওয়ার ইট ওয়াজ নট এনাফ টু রাইট।') উল্লেখযোগ্য, সে বাহিনীতে তিনিই প্রথম আমেরিকান।

এ যুদ্ধ থামল। আয়োজন শুরু হল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের। দ্বিতীয় দেশ রাশিয়ার কাছে অনেক প্রত্যাশা ছিল বিদেশী বন্ধুর। এবার মুহূর্তে তা ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। চোখের সামনে রাশিয়া ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করল এবং রুশ-জার্মান শান্তি-চুক্তি সম্পন্ন হল। এ দৃশ্য অসহ্য। ফিসার তৎক্ষণাৎ সপরিবারে রুশ দেশ ত্যাগ করলেন।

কাটল প্যালেস্টাইনে। কিন্তু এক-দিনের জন্যেও ফিসারের মনে হয়নি তিনি বিদেশে আছেন।

'২১ সনে প্যালেস্টাইন ছাড়লেন। কিন্তু দেশে ফিরলেন না। উপস্থিত ঘর তাঁর গোটা ইউরোপ। ফিসার এখানে সাংবাদিকের কাজ করেন। তিনি নিউ ইয়র্ক ইভনিং পোস্ট-এর করেসপণ্ডেণ্ট।

পরের বছর চলে গেলেন রাশিয়ায়। এবারও তিনি সাংবাদিক বটে, কিন্তু ফ্রি-লান্স সাংবাদিক। এবার থেকে তাঁর প্রথম ডেসপাচ 'নেশান' কাগজের জন্যে। অর্থাৎ প্রায় গোটা দুনিয়ার জন্যে। কেননা, লুই ফিসারই বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় পশ্চিম থেকে প্রথম উল্লেখ-যোগ্য সাংবাদিক।

সাকুল্যে প্রায় চৌদ্দ বছর ফিসার কাটিয়েছেন রুশ দেশে। সেখানেই তিনি বিয়ে করেছেন (স্ত্রী বার্থা মার্ক সেকালের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখিকা) এবং তাঁর সন্তান দুটিও ভূমিষ্ঠ হয়েছে সেই দূর বিদেশেই। স্বভাবতই ফিসার তখন পশ্চিমের দৃষ্টিতে অন্যতম রুশ-বান্ধব। বিশেষ করে তাঁর তৎকালীন লেখা পড়ে অনেকেরই মনে হয়েছিল তা।

করলেন। চৌদ্দ বছরের ঘনিষ্ঠতার সেখানেই শেষ। তারপরও একবার গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে দর্শক হিসেবে মাত্র, বন্ধু হিসেবে নয়।

রাশিয়ার চেয়েও আজ বরং লুই ফিসারের অনেক বেশী ঘনিষ্ঠতা আমাদের সঙ্গে। ফিসার আজ খ্যাতনামা ভারত-বান্ধব। তিনি শুধু গান্ধীজীর জীবনীকার নন, গান্ধী-শিষ্যও (অবশ্য রাজনৈতিক ভাবাদর্শে)।

গান্ধী-শিষ্য ফিসার ফিলাডেল-ফিয়ার সেই বাড়ীটায় থাকেন, রাজ-নীতি বিষয়ে চিন্তাশীল বই লেখেন, আমেরিকায় বক্তৃতা করেন এবং সুযোগ পেলেই এদিকে এসে বেড়িয়ে যান। আপাতত নেশা তাঁর এশিয়া, আরও নির্যাস করে বললে—ভারত এবং আরও গভীরে গেলে ভারতের গ্রামের মানুষ। ৩. ৮. ৬১

ফুর্ৎসেবা, ইকাতেরিনা আলেক্সিভেনিয়া

অনেকেই নিশ্চয় দেখেছেন ওঁকে। কারণ, এই ফেব্রুয়ারীর আগের ফেব্রুয়ারীতে ভরোশিলফ আর কোজ-লফ যখন কলকাতায় আসেন উনিও তখন সঙ্গে ছিলেন।

কিন্তু আজ দেখলে আর চিনবেন না। এজন্যে নয় যে গতকাল সেই হৃদয়বিদারক সংবাদটা ঘোষিত হয়েছে, আসল কারণ—কিছুদিন ধরে মাদামের চেহারাটাই নাকি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে,—যাচ্ছিল।

গেল জুনে লণ্ডন গিয়েছিলেন মাদাম ফুর্ৎসেবা। বিমানঘাটিতে ইংরেজ ভদ্রমহিলারা ত দেখে অবাক। —এই কি সোবিয়েত সংস্কৃতি মন্ত্রী! ফটোর সঙ্গে একদম মিল নেই। কে বলবে উনি পঞ্চাশ বছরের যোদ্ধা, বয়স্কা জননী; মাদামকে দেখে মনে হয় যেন কোন কৃশ তরুণী। দেড়শ পাউণ্ডের সেই শরীরটা আর নেই। কমপক্ষে ওজন কমে গেছে পনের পাউণ্ড! ('—কি করে কমিয়েছি জান? খাওয়া কমিয়ে নয়, টেনিস খেলে!) চুল-গুলো সেই পুরানো কায়দাই আছে বটে, কিন্তু গায়ে সেই তারকাখচিত কোটটি নেই। তার জায়গায় ছিটের ফ্রক,—পায়ে বিলিতি মাপে অত্যুচ্চ না হলেও হাইহিল। নেমেই হাসিতে ভেঙ্গে পড়লেন মাদাম,—'আচ্ছা বলুন দিকি, কোন আর্লের বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে গেলে কি এ পোষাকে চলবে?'

উত্তরে ওঁরা হেসেছিলেন। শুধু জনাকয় মানুষ ভাবিত হয়ে উঠেছিলেন। কারণ তাঁরা জানতেন সোবিয়েত দেশের এই সংস্কৃতি মন্ত্রীটি মাত্র এক মাস আগে কান-এ চলচ্চিত্র উৎসব করে এসেছেন, সোফিয়া লরেন প্রভৃতির সঙ্গে প্রাণখোলা রসিকতা (অবশ্য সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের) করেছেন, ফেরার পথে পারীতে মালরোর সঙ্গে আড্ডা দিয়েছেন এবং এবারও লণ্ডনে আসবার পথে নানা জায়গায় বিস্তর অন্যবিধ সংস্কৃতি দেখে এসেছেন। সবটাই কি তাঁর ক্রেমলিনের প্রোগ্রাম অনুযায়ী?

তবুও আশা ছিল এই মাহিলাটি অক্ষত থাকবেন। কারণ, আর কেউ না জানেন, ক্রুশ্চফ নিশ্চয় জানেন ওঁকে। তিনি 'কেটিয়া'কে চেনেন।

কালিনিন এলাকার এক তাঁতীর ঘরের মেয়ে ছিলেন—ফুৎ´সেবা। মাদাম ইকাতেরিনা আলেক্সিভেনিয়া ফুৎ´সেবা। ক্রুশ্চফ আদর করে ডাকেন—'কেটিয়া'। নিজেও কাজ করতেন এক সময়ে কাপড়ের কলে। পরিচালকের কাজ। সেখান থেকে শুধু নিজ গুণে ফুৎ´সেবা আজ সোবিয়েত দেশের একজন বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার। তাছাড়া, পার্টির সঙ্গেও যোগ তাঁর অনেক দিনের। অন্তত '৪২ সন থেকে 'কেটিয়া'কে ব্যক্তিগতভাবে ক্রুশ্চফ নিশ্চয় চেনেন। কারণ, তিনি যখন পার্টির মস্কো 'জেলা'র কর্তা কেটিয়া তখন একটা বিরাট এলাকার কর্ত্রী!

ক্রুশ্চফ যে সেদিনের 'কেটিয়া'কে ভুলে যাননি তার প্রমাণ পাওয়া গেল স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে। '৫৬ সনের যে কংগ্রেসে স্ট্যালিনকে আবার মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন ক্রুশ্চফ, সেই ২০তম কংগ্রেসেই কেটিয়াকে পুরস্কৃত করেছিলেন তিনি প্রেসিডিয়ামের বিকল্প সদস্যা 'নির্বাচিত' করে। সেই সঙ্গে কেটিয়া মনোনীত হলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম একজন সম্পাদিকাও।

পরের বছর ঘোষিত হল মাদাম ফুৎ´সেবার আরও পদোন্নতির খবর। প্রবল করতালিধ্বনির মধ্যে ক্রুশ্চফ জানালেন—কেটিয়া প্রেসিডিয়ামের পুরো সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তিনিই প্রেসিডিয়ামের একমাত্র মহিলা সদস্য! মন্ত্রিসভায় তিনিই একমাত্র মহিলা মন্ত্রী।

(নিনা ক্রুশ্চেভ তখন পর্দানসীন ছিলেন) মাদাম ফুৎ´সেবাকে আরও নানাভাবে পুরস্কৃত করেছিলেন

ক্রুশ্চফ। কেটিয়াকে তিনি পিকিং, প্রাগ, ভিয়েনায় সরকারী ভ্রমণে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। অন্যত্র অন্যদের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। তার চেয়ে জরুরী যা—কেটিয়ার স্বামীকে তিনি আবার ফিরিয়ে এনেছিলেন। শোনা যায়, স্ট্যালিনের আমল থেকেই রাষ্ট্রদূত হিসেবে নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন ফুৎর্সেবার স্বামী। কখনও প্রাগে, কখনও বেলগ্রেডে। ক্রুশ্চফ তাঁকে বদলি করলেন মস্কোতে। কারণ, হাজার হক, ভদ্রলোক 'কেটিয়া'র স্বামী!

এহেন 'কেটিয়া' কেন হঠাৎ নিক্ষিপ্ত হলেন প্রেসিডিয়ামের বাইরে সে কথা নিশ্চয় করে বলা সত্যিই অসম্ভব। অসম্ভব আরও এ কারণে, যে, মাদাম ফুৎর্সেবা শুধু যে ক্রুশ্চফেরই ব্যক্তিগত বন্ধু তাই নয়, তিনি পার্টির প্রবল প্রতাপান্বিত সেক্রেটারী কোজলফ-এর নিকট আত্মীয়। কোজলফ-এর ছেলের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে তাঁর একমাত্র মেয়ের! ২. ১১. ৬১

ফ্রণ্ডিজি, আর্তুরো

স্থান—বুয়েনাস আয়ার্স। কাল—বিদ্রোহের মাত্র দু'দিন আগে। রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় বসেছেন—নবাগত অতিথি ইংল্যাণ্ডের ডিউক। পাশে তাঁর আর্জেন্টিনার সামরিক দপ্তরের মন্ত্রী ফ্রাগা।

ফিলিপ—আপনি কি অনেকদিন মন্ত্রী আছেন?

ফ্রাগা—(সামরিক ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়ে) আজ্ঞে, সে প্রায় এক বছর।

ফিলিপ—······কেমন লাগছে আপনার কাজটা?

ফ্রাগা—(মুখ কালো করে) হ্যাঁ, হ্যাঁ,—কেন নয়?

ফিলিপ—আর একটা কথা, আপনি কি কখনও লড়াইতে গিয়েছিলেন?

ফ্রাগা—আজ্ঞে না,—আমাদের আর্জেন্টিনায় হালে কোন যুদ্ধ হয়নি।

ফিলিপ—(অনুচ্চ স্বরে) বহুৎ আচ্ছা, তাহলে আজকেই যেন আবার একটা লাগিয়ে দেবেন না!

অতিথি ফিলিপকে সময় দিয়েছিল ওরা। কিন্তু ফ্রণ্ডিজি সময় পাননি। চার বছরে পঁয়ত্রিশটি বড় রকমের ফাঁড়া কাটিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এবার আর হল না। সৈন্যরা দেশছাড়া করেছে তাঁকে। ঠিক যেমনটি পেরনকে করেছিল ওরা।

কিন্তু ফ্রণ্ডিজি পেরন নন। এখনও চোখে ভাসছে মুখটা শান্ত, সমাহিত, বিচক্ষণ। কানে ভাসছে কথাগুলো। —গোয়ায় সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার ভারতের আছে বৈকি! ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় আমাদের নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিলেন তিনি। মাত্র ক'মাস আগে। ব্যাঙ্ককে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থায় দাঁড়িয়ে এমন কথা বলেছিলেন, যা চুক্তিভুক্ত কোন দেশের প্রধানের কথা নয়, নিরপেক্ষ ভারতের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

সম্ভবত পতনের সেও একটা কারণ। এই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী, লিবারেলইজম। ফ্রণ্ডিজি লিবারেল ছিলেন। তাই সৈন্যদের আপত্তি সত্ত্বেও পেরনপন্থীদের তিনি সম্প্রতি নির্বাচন লড়বার স্থযোগ দিয়েছিলেন। এমনকি, জেতবার পর জায়গায় জায়গায় শাসনের অধিকারও। তাছাড়া, তিনি ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির নামে দেশকে কষ্টে রেখেছেন; সপ্তাহে দু'দিন মাংস বন্ধ করে দিয়েছেন, তিনি কিউবার দিকে সহানুভূতি দেখাচ্ছেন এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্থতরাং আর্জেন্টিনায় এমতাবস্থায় যা হওয়ার কথা, তাই হল। ১৮৭০ সনে একবার পেরাগুয়ের সঙ্গে লড়েছিল সৈন্যরা। তারপর থেকে দেশে যুদ্ধ নেই। স্থতরাং, তারা যুদ্ধে নামল, বিদ্রোহী হল। ঠিক যেমন পেরনের সময় হয়েছিল।

কিন্তু ফ্রণ্ডিজি তবু পেরন নন। একই শাস্তি নির্দিষ্ট হয়েছে বটে তাঁর নামে—কিন্তু আর্জেন্টিনা জানে, পেরন আর ফ্রণ্ডিজি এক বস্তু নন।

জনৈক ইটালীয়ান ইঞ্জিনীয়ারের সন্তান। চৌদ্দটি ছেলেমেয়ের মধ্যে ত্রয়োদশ ফ্রণ্ডিজি আবাল্য লাজুক এবং সাদা-ধরনের মানুষ।

কিন্তু সেই মানুষটির মধ্যেই যে আগুন নিহিত আছে, তাও জানা গেল একদিন—'৩০ সনে, প্রথম যৌবনে। ছ' বছরের পড়া তিন বছরে সেরে ফ্রণ্ডিজি সেবার গোটা দেশের খবর। আরও চাঞ্চল্যকর ঘটনা, শুধু পাশ নয়, তিনি অনার্সও পেয়েছেন।

যথাদিনে যথাসময়ে কনভোকেশন উৎসবে এসে দাঁড়ালেন তরুণ ফ্রণ্ডিজি। কিন্তু সার্টিফিকেট দেওয়ার মুহূর্তে হাতখানা সরিয়ে নিলেন পেছনে, '—না, যে সরকার নিজে জবরদখল করে ক্ষমতায় এসেছে, নির্ভর যার একমাত্র সৈন্যরা—তার সার্টিফিকেট

আমি নেব না, নিতে চাই না।' আর্জেন্টিনায় তখন জোস্ উরিবুরুর শাসন।

পেরন-আমলেও স্বাধীনতার সাধনায় ফ্রণ্ডিজি এক দুর্ধর্ষ নায়ক। বুয়েনাস আয়ার্সের পথে পথে তিনি তখন একনায়কত্বের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন, আন্দোলন করেন। তিনি স্বাধীনতার যোদ্ধা।

পেরনের পতনের পরে—'৫৬ সনে নিজের দলকে ভেঙে দু' টুকরো করলেন ফ্রণ্ডিজি।—'এক টুকরো তাঁর নিজস্ব। অন্যটি কাছাকাছি মতের অন্যদের।

প্রথম নির্বাচনে তাঁর দলই জয়ী হয়েছিল। ছ' বছরের জন্যে দক্ষিণ আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ, সুখী সমৃদ্ধশালী আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন—আর্তুরো ফ্রণ্ডিজি। —'এ-দেশ নতুন করে গড়ব আমি। কোন ব্যক্তি নয়, কোন পরিবার নয়, কোন দল নয়, কেউ পথ থেকে ফেরাতে পারবে না আমাকে।'

সৈন্যরা ফেরাল। তিপান্ন বছরের এই পরীক্ষিত গণতন্ত্রীকে নির্বাসনে পাঠিয়ে আর্জেন্টিনা আজ যে পথ ধরল, সেটা আর যাই হোক, সুস্থিরতার পাকা সড়ক নিশ্চয়ই নয়

৫. ৪. ৬২

ফ্রাঙ্কো, ফ্রান্সিস্কো

গায়ে যদি ইউনিফর্মটা না থাকত তবে লোকেরা নিশ্চয়ই বলত—উনি কোন বুক-কীপার, বলেছিলেন একজন বিখ্যাত ফরাসী সাংবাদিক। অন্য একজন শুধরে দিয়েছিলেন তাঁকে, '—না, ঠিক বুক-কীপার নয়, লোকে ভাবত উনি কোন 'ড্যান্সিং মাস্টার', কিংবা কোন 'রিটায়ার্ড বিজনেস-ম্যান!'

'বিজনেসম্যান' অবশ্যই। কিন্তু আদৌ অবসর নেওয়া মানুষ নন। বয়স উনসত্তরে পৌঁছে গেছে। বড় বড় কালো চোখগুলোর নীচে কালিমা অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'খ্যাতি' তলানিতে এসে ঠেকেছে। কিন্তু এল পার্ডো-র সেই প্রকাণ্ড প্রাসাদটিতে আজও তিনি আছেন। গায়ে সেই ইউনিফর্ম, হাতে সেই দণ্ড, সামনে সেই ক্রমশ নিম্নগামী দেশ, সভ্যতা।

নাম—ফ্রাঙ্কো। জেনারেলিসিমো ফ্রান্সিসকো-ফ্রাঙ্কো। পরিচয়—স্পেনের প্রধান মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি, প্রধান শাসক, প্রধান ব্যক্তি। এক কথায়

স্পেনের একমাত্র অধীশ্বর। বলা বাহুল্য, উর্দী দেখেই জানা যায় যে, জন্ম (১৮৯২) প্রজাকুলে। বাবা ছিলেন জনৈক নৌবিভাগের কর্মচারী। ছেলেও তাই ভর্তি হয়েছিল নৌবিদ্যার স্কুলে। সেখান থেকে একই বিষয়ের কলেজে।

'১০ সনে বিদ্যার্থী-জীবন শেষ হল। তরুণ-ফ্রাঙ্কো সেকেণ্ড লেফ-টেনেণ্ট হিসেবে সৈন্যবাহিনীতে স্থান পেলেন। সেখান থেকেই ক্রমশ ক্রমওয়েল, নেপোলিয়ান, মুসোলিনী, হিটলারের পাশে,—ইতিহাসে।

'১২ থেকে '২৬ সন অবধি কেটেছে তাঁর প্রধানত আফ্রিকায়। ফ্রাঙ্কো সেখানে বহু যুদ্ধে প্রসিদ্ধ পুরুষ। পদোন্নতির সূত্রপাতও তাঁর সেখানেই। মেলিল্লাতে তিনি লেফটেনেণ্ট থেকে ক্যাপ্টেন হলেন (১৯২২) এবং আহত হয়ে স্পেনে ফিরে আসামাত্র বহুবিধ সামরিক পুরস্কারের সঙ্গে পেলেন মেজর পদবী।

'২৬-এর পরে আবার আফ্রিকায় পাঠান হল তাঁকে। এবার মরক্কোয়। ফ্রাঙ্কো সেখানে তখন ('২০) স্প্যানিশ সৈন্যবাহিনীর ডেপুটি কমাণ্ডার। তিন বছর ছিলেন সে পদে। তারপর—কমাণ্ডার। অবশ্য ইতিমধ্যে তাঁর সার্ভিস বুক-এও নতুন যোজনা ঘটেছে। তিনি লেঃ কর্ণেল থেকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল-এর সারিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

'২৭ সনে আফ্রিকার কাজ শেষ হল। দেশে ফিরে ফ্রাঙ্কো নতুন কাজ নিলেন। তিনি স্পেনের বিখ্যাত সামরিক একাডেমীর ডিরেক্টর নিযুক্ত হলেন। উল্লেখযোগ্য পদটি তখন শুধু সম্মানজনক নয়, গুরুতরও।

যোগ্যতার সঙ্গেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন নিষ্ঠাবান সৈনিক। এমন সময় সহসা দেশে আকস্মিক বিপর্যয়। '৩১ সন। সাম্রাজ্যের অন্যতম পীঠভূমি স্পেনে সেবার দুর্ধর্ষ প্রজাবিদ্রোহ। সম্রাট ত্রয়োদশ আলফনসো গদীচ্যুত হলেন। স্পেন প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষিত হল।

স্বভাবতই রাজকীয় সৈনিক হিসেবে ফ্রাঙ্কোর আনুগত্য তখন পরাজিত রাজতন্ত্রের দিকে। গণতন্ত্রীরা তার ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র তাঁকে নতুন কাজ দিলেন। তাঁরা পাঠালেন ওঁকে স্পেন থেকে বেলেয়ারি দ্বীপপুঞ্জে। ফ্রাঙ্কো জানেন, যদিও উপলক্ষ্য সরকারী কাজ, তবুও ঘটনাটা আসলে নির্বাসন দণ্ড। তবুও যেতে হল। কেননা, উপায় নেই।

ফ্রাঙ্কো, ফ্রান্সিস্‌কো

আশ্চর্য ভাগ্য! ফেরার সুযোগ এসে গেল দু'বছর পরেই। '৩৩ সনের নির্বাচনে দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় এলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরে এলেন ফ্রাঙ্কোও। পরের বছর দক্ষিণ-পন্থীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বন্ধুদের হয়ে ফ্রাঙ্কো কঠোর হাতে তা দমন করলেন। পরিবর্তে জনতা সেদিন তাঁর নাম দিয়েছিল 'কসাই', আর দক্ষিণপন্থী সরকার দিয়েছিল দেশের প্রধান সেনাপতির পদ।

'৩৬ সনে আবার টেবিল ঘুরল। দক্ষিণপন্থীরা বিদায় নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিতে হল ফ্রাঙ্কোকেও। নতুন সরকার তাঁকে আবার দেশত্যাগী করলেন। ফ্রাঙ্কোকে তাঁরা পাঠালেন কানারি দ্বীপে।

সহসা খবর এল দেশে গোলযোগ। একজন বিখ্যাত দক্ষিণপন্থী নায়ক আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। তাই নিয়ে প্রথমে দাঙ্গা, তারপর দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ। শোনামাত্র ফ্রাঙ্কো দেশে ফিরে এলেন। দেশে দুইদল। একদল গণতন্ত্রী, অন্য দল অন্য কিছু। ফ্রাঙ্কো দ্বিতীয় দলের নায়ক সাজলেন। তার পরবর্তী ইতিহাস সকলের জানা। এটুকুই শুধু এখানে উল্লেখযোগ্য যে আড়াই বছর পরে দশ লক্ষ মানুষের জীবনের বিনিময়ে গৃহযুদ্ধ যখন থামল তখন দেখা গেল—ফ্রাঙ্কো জেনারেলিসিমো হয়ে গেছেন। তিনি দেশের সর্বময় কর্তা। সেই থেকে আজও।

পেছনে অগৌরবের ইতিবৃত্ত অনেক। বর্তমানও বিবিধ কারণে অত্যন্ত কলঙ্কিত। কিন্তু তবুও হিটলার মুসোলিনীর বিশিষ্ট বান্ধব ফ্রাঙ্কো এক আশ্চর্য সুখী 'সম্রাট'। তিনি প্রাসাদে থাকেন, শিকার করেন, মাছ ধরেন। একমাত্র কন্যার বিয়ে হয়ে গেছে অনেকদিন। পুত্র সন্তান নেই। সুতরাং, শোনা যায়, মাঝে মধ্যে উত্তরাধিকারীর কথাও ভাবেন। এবং বলা বাহুল্য, সে ভাবনা অবশ্যই স্পেন রাজবংশের সন্তানদের নিয়ে, অথচ এলোমেলো ভাবে গুণলেও নাকি রাজত্বে তাঁর দশ লক্ষাধিক রাজবন্দী! ফ্রাঙ্কো কি সত্যিই নিশ্চিন্ত বাদশাহ?

কে জানে! কিন্তু স্পেন যে আজ আরও অস্থির দেশ সে খবর আরও স্পষ্টভাবে জানা গেল সম্প্রতি। সংবাদঃ ক'দিন আগে স্পেনে একটি ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে। এবং সেই ষড়যন্ত্রকারীদের লক্ষ্য ছিল নাকি ফ্রাঙ্কোকে হত্যা করা।

৮. ৬. ৬১

বন্দরনায়েক, ফেলিক্স ডায়াস

রাজনীতিতে দু'জনেই সমান অনভিজ্ঞ। তিনটি সন্তানের জননী পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্কা অভিজাততনয়া সিরিমাভো বন্দরনায়েক তখন ছিলেন প্রথমত এবং প্রধানত রাজনীতিকের স্ত্রী। তখন সবে আটাশ—ফেলিক্সও তাই। সুশিক্ষিত সুদর্শন প্রখর তরুণ ফেলিক্স ডায়াস বন্দরনায়েক তখন মাত্র প্রধানমন্ত্রীর ভ্রাতুষ্পুত্র।

তবুও ১৯৫৯ সনের ২৬শে সেপ্টেম্বরের সেই ভয়াবহ ক্ষণে প্রধানমন্ত্রী সোলমান ওয়েস্ট রিজওয়ে ডায়াস বন্দরনায়েকের শ্মশানে দাঁড়িয়ে তাঁর আনাড়ি-প্রায় বিধবা যখন অবলীলাক্রমে রাজনীতির মহাভার কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তখন সিংহলে অন্তত কেউ বিস্মিত হননি। এবং তা না হওয়ার কারণ শুধু বিগত প্রধানমন্ত্রীর হাতে-গড়া দল শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টির দ্ব্যর্থহীন সমর্থন নয়,—সিরিমাভোর পেছনে ছায়ার মত দণ্ডায়মান বিপুলদেহ ঐ দ্বিতীয় আনাড়িটিও,—ফেলিক্স যাঁর নাম।

সিরিমাভো আর ফেলিক্স—কাকীমা আর ভাসুরপো দু'জনে মিলে সে এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। একের যা নেই, অন্যের তা উদ্বৃত্ত, একজন যা ভাবতে পারেন না, অন্যজন তা আগে-ভাগেই ভেবে রাখেন। স্বভাবত-নম্র মিসেস বন্দরনায়েক কথা বলেন কম এবং কদাপি রূঢ় হতে জানেন না। প্রধানমন্ত্রীর পার্লামেণ্টারি সেক্রেটারী তথা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ফেলিক্স—কথা বলেন অনর্গল এবং কোন্ কথার কী জবাব সে তাঁর মুখস্থ। পর্যবেক্ষকেরা বলেন—বিপাকের মধ্যেও সিংহলী রাষ্ট্রতরণীর সাম্প্রতিক যে স্বচ্ছন্দগতি তার অনেকখানির কারণই ফেলিক্সের এই দৃঢ়তা।

ফেলিক্স নিজে ক্যাথলিক খ্রীস্টান। সিরিমাভো ক্যাথলিক স্কুলের মেয়ে হলেও বৌদ্ধ। কিন্তু তবুও দেশের ক্যাথলিক স্কুলগুলো জাতীয়করণের প্রশ্ন যেদিন উঠেছিল, আশ্চর্য এই—ক্যাথলিক ফেলিক্সই ছিলেন সেদিন সিরিমাভোর সবচেয়ে বড় সমর্থক।

ঠিক তেমনি ভাষা বিষয়ে। গেল বছর যখন দেশে ইংরেজীর বদলে সিংহলী ভাষা চালু করার কথা ওঠে—সেদিন সে কথাকে কার্যকর করার

দায়িত্ব নিয়েছিলেন—এই ফেলিক্সই। অথচ আশ্চর্য এই, আজন্ম ইংরেজী পরিবেশে লালিত ফেলিক্স নিজে একবর্ণ সিংহলী জানেন না!

শোনা যাচ্ছে, ফেলিক্স—১৯৬০ সনের জুলাই থেকে সিংহলের প্রধান-মন্ত্রী মিসেস বন্দরনায়কের নির্ভরতম সুহৃদ ফেলিক্স ডায়াস পদত্যাগ করেছেন। খবরটা সত্য হলে সম্ভবত ভাববার কারণ আছে। অবশ্য যদি কাকীমা নিজেই এখন একা চলতে অভ্যস্ত হয়ে থাকেন তবে অন্য কথা!

২৩. ৮. ৬২

বন্দোদকার, দয়ানন্দ

দু'বছর আগে ডিসেম্বরের ১৯ তারিখে পাঞ্জিমে পা দিলে দেখা যেত আধ-বয়সী একজন কৃষ্ণকায় মানুষ হাত পা নেড়ে পর্তুগীজ সৈন্যদের কি যেন বোঝাচ্ছেন। স্পষ্টতই তিনি তাদের এই পোড়ামাটির নীতি অনুসরণ না করতে অনুরোধ করছেন। —এত দিনের শহর, এমন সুন্দর পথ-ঘাট, চার্চ-মাঠ; তোমাদের মায়া হয় না পুড়িয়ে দিতে? ওরা শেষ পর্যন্ত হাতের আগুন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণের জন্যেই তৈরী হয়েছিল। কারণ মানুষটির কথায় প্রাণ ছিল। এমন প্রাণ যা বর্বরেরও চোখ এড়ায় না।...দু' দিন পরে আবার পাঞ্জিমে এলে দেখা যেত এই মানুষটিই এক লরী মিঠাই নিয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। বিজয়ী ভারতীয় বাহিনীর জওয়ানদের আপন হাতে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন। জওয়ানেরা তাঁর আনন্দ-উত্তেজনা দেখে বিস্মিত।—কে এই অপরিচিত? দু'বছর পরে আজ তার উত্তর মিলেছে। অবশ্য এবারও বিস্ময় সহ। পাঞ্জিমের সেই নাগরিক এখন সমগ্র ভারতে এক বিপুল বিস্ময়। প্রথম বিস্ময়: গোয়ার জীবনে প্রথম নির্বাচনে যে দলটি বিজয়ী গৌরব লাভ করেছে পথের ধারে দণ্ডায়মান দর্শক-প্রায় সেই মানুষটি তার প্রতিষ্ঠাতা এবং দলপতি! দ্বিতীয় বিস্ময়: গোয়া, দমন এবং দিউয়ের নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রীর এই উক্তিটি, —সরকারী খরচে গাড়ি চড়ব না, সরকারী বাংলোয় থাকব না, মাইনে যা পাব তার একটি নয়াপয়সা নিজের পকেটে তুলব না;—আমার মাইনে অতঃপর রেডক্রসের।

নাম—দয়ানন্দ বন্দোদকার। বয়স বাহান্ন (জন্ম—১২ই মার্চ, ১৯১১ সন)। জন্মস্থান—পাঞ্জিম, গোয়া। ব্যবসায়ীর ঘরের ছেলে শ্রীবন্দোদকার

শুধু রাজনীতিতে নয়, পাঞ্জিমের ব্যবসায়ী মহলেও অনেককাল ছিলেন 'আউটসাইডার'। সদাচারী, স্বল্পবাক এবং লাজুক স্বভাবের এই মানুষটি ব্যবসায়ী হিসেবে, সেখানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন মাত্র সেদিন—১৯৫০ সনের পরে। গোয়ায় তখন 'আয়রনওর বাস চলেছে, চারদিকের ব্যবসায়ীরা' উন্মত্তের মত ছুটে আসছেন সেখানে। তাঁদের ভীড়ে, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে স্থানীয় ছোট ব্যবসায়ীদের টিঁকে থাকা দায়। আপন সাহসিকতায় বন্দোদকার তাই ছিলেন। আপন মহলে তাঁর খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা সে কারণেই।

তবে সদা-হাস্য, মিষ্টভাষী, ব্যবসায়ী শ্রী বন্দোদকারকে সাধারণ মানুষ ভালবাসে তাঁর হৃদয়ের জন্যে। বিখ্যাত মারাঠী লেখক এবং দার্শনিক ভামন যোশীর মন্ত্রশিষ্য বন্দোদকার মারাঠী ভাষায় একজন জনপ্রিয় লেখক। গোয়া এবং বাইরে তাঁর ছোট গল্পের পাঠক অনেক। তাছাড়া, উদারতা এবং বদান্যতায় তিনি অতুলনীয়। গোয়ায় এমন কোন গ্রাম নেই, যেখানে তাঁর হাতের স্পর্শ নেই। অসংখ্য সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের তিনি জনক। গোয়ায় পনেরটি স্কুল চালান তিনি, এবং 'গোয়া এডুকেশন সোসাইটি নামে যে প্রতিষ্ঠানটি পাঞ্জিমে একটি কলেজ চালায় সেটি তাঁরই কীর্তি। শিক্ষাদান ব্যাপারে শ্রী বন্দোদকার চিরকাল পরম উৎসাহী। এখনও ছাত্র পড়ানো বাবদে প্রতি মাসে তাঁর ব্যক্তিগত খরচ হাজার টাকা। তাঁর খরচে অগণিত ছেলে-মেয়ে বোম্বাই এবং পুণায় লেখাপড়া করে।

তারপর খেলাধূলা। পাঁচটি কন্যা এবং একটি পুত্রের জনক প্রবীণ বন্দোদকার আন্তরিক ক্রীড়ারসিক। বড় মেয়ে মিসেস সাসি কাকোদকার খ্যাতনামা সমাজসেবী। তিনি লেঃ গভর্নরের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্যা। কিন্তু বাবার কাছে ক্রিকেট ম্যাচের ওপর কোন আকর্ষণই কিছু নয়। পাঞ্জিমের একমাত্র খেলার মাঠটি তাঁরই কীর্তি। সেদিনও মন্ত্রিসভা বিষয়ে পরামর্শ করতে এসে বোম্বাইয়ে তিনি দলীপ ট্রফির খেলা দেখে গিয়েছেন। ক্রিকেটের পরেই নেশা তাঁর দাবা খেলা এবং শিকার। বন্দোদকার দুটোতেই পাকা-হাত।

জনপ্রিয়তার পক্ষে এ কারণ-গুলোই হয়ত যথেষ্ট, কিন্তু শ্রী বন্দোদকার যে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী

নির্বাচিত হলেন সম্ভবত তার পেছনে অন্য কারণও আছে। প্রথম কারণ, শ্রী বন্দোদকারের আদর্শনিষ্ঠা। একদা গোয়ায় পর্তুগীজ শাসন দিনে তিনি বিশ্বাস করতেন—পর্তুগীজদের এখানে থাকার অধিকার নেই। ব্যবসায়ী হয়েও বন্দোদকার সেদিন বিপদের ঝুঁকি নিতে ইতস্তত করেননি। শুধু বিদ্রোহী প্রতিবেশী-দের গোপনে অর্থ সাহায্য নয়, শ্রীবন্দোদকার নিজেও সেদিন হাসি-মুখে কারাবাস করে এসেছেন। ১৯৫৬ সনে তিন মাস তিনি সালাজারের জেলে ছিলেন। এবার নির্বাচনের ছ মাস আগেও সমাজসেবী বন্দোদকার ছিলেন সুখী নাগরিক। নির্বাচন সম্পর্কে বিশেষ স্বতন্ত্র কোন পরিকল্পনা ছিল না তাঁর। তবুও যে শেষ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক পার্টির জন্ম দিতে হল সে শুধু মারাঠী ভাষার প্রতি ভালবাসার জন্যে। শ্রীবন্দোদকার মহারাষ্ট্রের সঙ্গে গোয়ার মিলনে বিশ্বাসী। সে সাধনা সফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 'বহিরাগত' আবার আপন 'রাজ্যে' ফিরে যাবেন ;—সেই রাজ্যে, যেখানে মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য পালন করতে ভোটা-ভুটি দরকার হয় না। ২৮. ১২. ৬৩

বসু, নন্দলাল

'—কিছু হল না লেখা-পড়ায় ?—স্কুল পালিয়ে তাই ছবি আঁকতে এসেছ ?' কালোপনা ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে তিরস্কারের ভঙ্গীতেই যেন জানতে চাইলেন সরকারী আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল।

সহসা যেন মুখ শুকিয়ে গেল ছেলেটির। সত্যিই ত কি উত্তর দেবে সে। প্রত্যক্ষত এটা সত্য, লেখাপড়া হল না বলেই ছবি আঁকা। এনট্রান্স পাশ করেছেন আজ ক'বছর। কবে সেই সেণ্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল! কিন্তু এফ, এ পাশ করতে পারলেন না আজও। প্রথমে জেনারেল এসেম্বলি, তারপর মেট্রোপলিটান কলেজ। দুই দুইবার পরীক্ষা হল, কিন্তু নম্বর উঠল না একবারও। অভিভাবকেরা চেয়েছিলেন বেলগাছিয়ায় ডাক্তারি পড়াতে। কিন্তু ওঁরা নেননি! উপস্থিত সময় কাটাচ্ছেন প্রেসিডেন্সির কমার্শিয়াল ক্লাসে। কিন্তু নিজে জানেন—তাও মিছেই।

এদিকে এগুলো যেমন ঘটনা, তেমনি সেগুলোও নিশ্চয় ঘটনা। মায়ের হাতের সেই মিষ্টান্নের ছাঁচ, খয়েরের পুতুল, খড়্গপুর আর দ্বার-

ভাঙ্গার কুমোরদের দেখা-দেখি নিজের হাতে মূর্তিগড়া, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা পড়তে গিয়ে মার্জিন-এ ছবি আঁকা, মাইনের টাকায় রং কেনা ইত্যাদি ইত্যাদি। সে কথা কি বলা যায় কাউকে? অবনীন্দ্রনাথের দিকে না তাকিয়ে নন্দলাল বললেন—আজ্ঞে, আমি এফ. এ অবধি পড়েছি! গুরু বললেন—তবে আর একদিন এস।

প্রিন্সিপাল হ্যাভেলের চোখ দেখে মনে হল—ছেলেটির কাজ তাঁর ভাল লেগেছে। পরীক্ষান্তে ঈশ্বরীপ্রসাদ বললেন—'হাত পোক্ত হ্যায়।' ব্যস, হয়ে গেল। শিষ্য গুরু পেলেন, ('…অবনীন্দ্রনাথ আমার পিতা') গুরু শিষ্য পেলেন ('…আমার ঝুলি ঝেড়ে সব বিদ্যে দিয়ে এসেছি নন্দলালকে')। আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে একটা ঘটনা ঘটল। সে ঘটনার কালসীমা সম্ভবত সেদিন থেকে আজ ছাড়িয়ে আগামীকাল অবধিও প্রসারিত। সেই লজ্জিত ছাত্রটি সম্ভবত আজ তিনকালের ঐশ্বর্য।

জন্ম—১৮৮৩ সনের ৩রা ডিসেম্বর, বাংলা ১২৯০ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ। জন্মস্থান—খড়্গপুর। যদিচ জন্মভূমি হাওড়ার রাজগঞ্জ গ্রাম। তারও আগে তারকেশ্বরের কাছাকাছি জেজুর গ্রাম। ঠাকুর্দা ইটের ব্যবসা করতেন। তাঁর দেওয়া ইটে কলকাতার ফোর্ট-উইলিয়াম। বাবা ছিলেন স্থপতি। ডায়মণ্ডহারবার এলাকায় খাল কাটার কাজের তদারকি করতেন। পরে—মুঙ্গের-খড়্গপুরে। এবং ক্রমে রাজ্যের স্থপতি হিসেবে দ্বারভাঙ্গা এস্টেটে।

ষোল বছরে কলকাতায় পাড়ি জমালেন নন্দলাল। কুড়িতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা, একুশে বিয়ে এবং তার বেশ কিছু পরে আর্ট স্কুলে। নন্দলালের পরবর্তী জীবন—এদেশের শিল্পভাণ্ডারে এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

'বিচিত্রা', ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটি, ছ'নম্বর জোড়াসাঁকো,—লেডি হেরিংহাম, পার্সি ব্রাউন, ওকাকুরা, হিদিশা, টাইকান,—রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা, এক মন্ত্রশিষ্যকে নিয়ে খুড়ো ভাইপো টানাটানি ('…এখানে আমি যে সৌধ গড়ে তুলতে চেয়েছি নন্দলালকে নিয়ে গিয়ে, অবন, তুমি তার চুড়ো ভেঙে দিলে') এবং অবশেষে (১৯২৩) শান্তিনিকেতনের কলাভবনে স্থিতি।

কলাভবনের নন্দলাল এক আশ্চর্য

স্রষ্টা। 'শিবজটাসম' তাঁর তুলি যেমন একদিকে 'চিররসনিস্যন্দী' অন্যদিকে আচার্য হিসেবেও তিনি এক সৃষ্টি-কর্তা! তাঁর কৃতী শিষ্যকুল আমাদের সম্পত্তি।

চীন জাপান ভ্রমণে সেবার কবির সহযাত্রী হয়েছিলেন তিনি। অন্য একজন যাত্রী ছিলেন—এলমহর্স্ট। তিনি বলেছিলেন—নন্দলালের সঙ্গ একটা এডুকেশন।

নন্দলালের জীবন, নন্দলালের ছবি, নন্দলালের রচনা ('শিল্পচর্চা' 'শিল্প কথা' ইত্যাদি) সবই তাই। নন্দলাল এডুকেশন, বিদ্যা, প্রজ্ঞা। তাঁর ৭৮তম জন্মদিবস উপলক্ষে সেই মূর্তিমান প্রজ্ঞাকে প্রণাম জানাই আমরা—'নন্দনের কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারায় জন্ম-আগে অবগাহন করে যিনি আমাদের মধ্যে এসেছিলেন।

৮. ১২. ৬০

বাক, পার্ল এস

"আমার বাবার নাম—অ্যাবসালম। অ্যাবসালম সিডেনস্ট্রিকার। মায়ের নাম—কার্ডিন। কার্ডিন স্টালটিং। তাঁরা দুজনেই ছিলেন আমেরিকান মিশনারী। ১৮৯২ সনের ২৬শে জুন ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার হিলসবরোতে আমার জন্ম। কিন্তু জীবন শুরু হয়েছিল আমার চীন দেশে। সেখানেই মা বাবা থাকতেন। সেখানেই মহাচীনের ভেতরে কোন এক জায়গায় জ্ঞান হওয়ার পর শুনেছিলাম—একজন বাদে আমার ভাই-বোনেরা কেউ বেঁচে নেই। চীনের জল হাওয়া তাদের কেড়ে নিয়েছে। ওঁরা নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন কিন্তু আমার জীবনে প্রথম যে জায়গাটির নাম শিখে ছিলাম সে ইয়াংসি নদীর তীরে সিনকিয়াং। সেখানেই তখন আমাদের ঘর। আমি মায়ের কাছে পড়তাম। আমার যা কিছু সব তাঁরই দান। শব্দে যে সৌন্দর্য আছে, থাকে,সেটা তিনিই আমাকে প্রথম শিখিয়েছিলেন। তিনিই আমাকে প্রথম শিখিয়েছিলেন—সেই সুন্দরকে ব্যবহার করতেও।..."

মায়ের প্রেরণাতেই সাংহাইয়ের বোর্ডিং স্কুল থেকে মিশনারীদের একটি মেয়ে নিয়মিতভাবে শব্দ সাজিয়ে লেখা পাঠাত 'সাংহাই মার্কারী'তে। কখনও কখনও ছাপা হত, কখনও কখনও পুরস্কারও মিলত। সে লেখা পড়ে কেউ ভাবতেও পারত না যে মেয়েটি চীনা নয়। এমনকি মেয়েটি নিজেও না। পনের বছরের তরুণী, কিন্তু সে মেয়ে তখনও চীনাদের থেকে

নিজেকে আলাদা করে ভাবতে শেখেনি।

দু'বছর পরে মেয়েকে ওঁরা ইউরোপে পাঠালেন। সেখান থেকে ইংল্যাণ্ড হয়ে স্বদেশে, আমেরিকায়। ভার্জিনিয়ায় কলেজের পড়া শেষ হল। '২৪ সনে এম. এ ডিগ্রী পাওয়া গেল কর্ণেল থেকে। কিন্তু কোন কিছু ভাববার আগেই চিঠি এসেছে চীন থেকে।—মায়ের অসুখ, মেয়েকে তিনি দেখতে চান।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসতে হল। তারপরও মা বেঁচে ছিলেন। দু'বছর ঠাঁয় শিয়রে বসেছিল তাঁর মেয়ে। অবশেষে একদিন ভাঙ্গা হৃদয়কে বাঁচিয়ে রাখার বাসনায় সম্মতি জানাতে হল বিয়েতে। পাত্র—জনৈক তরুণ মিশনারী। নাম—ডঃ জন লু সিং বাক। মুক্তার মত টলটলে, মিশনারীদের পার্ল নামে মেয়েটি সেদিন থেকেই—পার্ল বাক।

বিখ্যাত হওয়ার আগে এলোমেলো আরও কয়েকটি বছর। স্বামী কাজ করতেন উত্তর চীনে। সেখানেই সংসার পাতলেন পার্ল। পাঁচ বছরে দুটি কন্যা সন্তান—ভরা সংসার।

পাঁচ বছর পরে সে সংসার বয়েই ওঁরা চলে এলেন নানকিংয়ে। পার্লও এখানে কাজ করেন। তিনি নানকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী সাহিত্য পড়ান। কিছু দিন পড়িয়েছিলেন সাউথ-ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়েও।

'৩২ সনে ওঁরা আবার দেশে ফিরলেন। মিশনারী গিন্নি পার্ল বাক এখন আমেরিকায় এক বিখ্যাত রমণী। যেমন চেহারা, তেমনি তাঁর কলম। (তৎকালের আমেরিকান অভিমত অনুযায়ী পার্ল বাক 'সিভিয়ারলি হ্যাণ্ডসাম' কাগজে তাঁর বিশেষণ লেখা হত—'ডেমি-ব্লণ্ড') 'ইস্ট উইণ্ড, ওয়েস্ট উইণ্ড' অনেকেরই নজর এড়িয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু মাত্র আগের বছর বের হয়েছে—'গুড আর্থ'। সুতরাং তারপর সাধ্য কি লেখিকা নিজেকে গোপন রাখেন।

আরও প্রকাশ্য হয়ে গেলেন। পার্ল বাক স্বেচ্ছায়, নিজে নিজে। কাগজে বিদেশস্থ মিশনারীদের নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে বসলেন তিনি। মিশনারীর স্ত্রীর পক্ষে কাজটা নিঃসন্দেহে গর্হিত। ফলে তুমুল আন্দোলন। কিন্তু পার্ল অনড়। ফলে চার্চের মধ্যে মতভেদ এবং পদত্যাগ। পার্ল বাক সেই থেকেই ধর্মে স্বাধীনা।

পরের বছর স্বামীর সঙ্গে আবার

বাটলার, রিচার্ড, অস্টিন

চীনে ফিরলেন তিনি। কিন্তু সে যেন শুধু নিয়ম রক্ষা করতেই। '৩৪ সনে আবার ঘরে ফিরে এলেন তিনি এবং একাকী। এসে কাজ নিলেন তাঁর প্রকাশকের কোম্পানিতে। এবং পরের বছর সে কোম্পানির প্রেসিডেণ্ট রিচার্ড জে ওয়ালসকে বিয়ে করে আবার ঘর পাতলেন তিনি। নতুন সংসার। কিন্তু সেই পুরানো নামেই।

পাকার্সির একটা গোলাবাড়ীতে আজও সেই ঘরেই আছেন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়িনী (১৯৩৮) বিখ্যাত লেখিকা পার্ল বাক। ছয়টি ছেলে-মেয়ের বিরাট সংসার তাঁর। দুটি তাঁর নিজের। বাকী চারটি অন্যদের। তিনি দত্তক নিয়েছেন। কাছে আর দু'টি বাড়ীতে থাকে দেশ বিদেশের মাতৃ-পিতৃহীন বালক-বালিকাগণ। সে বাড়ীর নাম—'ওয়েলকাম হোম'। অনাথ বর্ণ-শঙ্করদের জন্যে স্থাপিত এই বাড়ী দু'টোই জননী পার্ল বাকের ইদানীং অন্যতম নেশা।

নেশা আরও আছে। একাডেমি, 'ইস্ট এণ্ড ওয়েস্ট এসোসিয়েশন'—মানবিকতা সম্পর্কিত আরও নানা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সত্তর বছর বয়সেও পার্ল বাকের প্রধান নেশা এখনও লেখা। চীনের পটভূমিতে আটটি উপন্যাস, একটি বিখ্যাত অনুবাদ, মা এবং বাবার দু'টি জীবনী, এবং আরও বিস্তর গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাসের লেখিকা পার্ল বাক আজও লিখছেন। এবং প্রতিবারই সাধনা তাঁর বিশাল এই জগতকে আরও একটু সঙ্কুচিত করার। সংবাদ—এবার তিনি লিখছেন তিব্বতী উদ্বাস্তুদের নিয়ে এবং তাদের সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনাতেই পার্ল বাক ভারতে আসছেন। কেননা, লিখতে তাঁকে হবেই। না লিখে কিছুতেই তিনি পারেন না।

'আই এম্ ওয়ান্ অব দোজ আনফরচুনেট ক্রিচারস হু ক্যানট ফাংসান কমপ্লিটলি আনলেস হি ইজ রাইটিং, হ্যাজ রিটেন, অর ইজ এবাউট টু রাইট!' ২৩. ৩. ৬২

বাটলার, রিচার্ড, অস্টিন

কেম্ব্রিজের পেমব্রুক কলেজে সেদিন বিতর্ক সভা। সভার সামনে প্রস্তাব: অরেটরি ইজ দি হারলট্ অব দি আর্টস। বক্তা ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী স্ট্যানলি বল্ড্উইন।

বক্তৃতা শেষ হল। কিন্তু ভোট নিতে গিয়ে দেখা গেল প্রস্তাবের

স্বপক্ষে যত জন বিপক্ষে ঠিক তত। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিতে গেলে সভাপতি মহোদয়কে এবার কোন এক পক্ষে যোগ দিতে হয়। স্মিতহাস্যে তরুণ সভাপতি একনজর সভার দিকে তাকালেন। তারপর ধীরে পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে ঘোষণা করলেন তাঁর মত: আমি মিঃ বল্ড্ইনের বিপক্ষে!

শোনা যায়, ছাত্রসভায় সেই পরাজয়টা অনেককাল মনে রেখেছিলেন বল্ড্ইন। এবং লোকে বলে সেই সভাতেই ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন—'রাব' নামে একটি অপ্রতিরোধ্য মানুষ। 'আর+এ+বি' তথা রিচার্ড অস্টিন বাটলারই সেদিন সেই সভার সভাপতি। কেননা, কেম্ব্রিজে তখন তাঁর তুল্য ছাত্র নেই,—না পড়াশুনায়, না আন্দোলনে, না সামাজিকতায়। পিতৃকুল এবং মাতৃকুল দু' দিক থেকেই সুপরিচিত শিক্ষাব্রতী পরিবারের সন্তান। কেম্ব্রিজের বিখ্যাত কলেজ-মাস্টার বাবা স্যার মণ্টেগু এস. ডি বাটলার অনেককাল ছিলেন ভারতে। দিল্লিতে এখনও একটি স্কুল আছে ওঁদের পরিবারের নামে, 'হারকোর্ট বাটলার' স্কুল। তবে বড় ছেলে রিচার্ড ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন দিল্লি নয়, ভারতেরই আটকসরাই নামে একটা জায়গায়। সে ১৯০২ সনে শীতের সময়কার কথা।

জন্ম যেমন ভারতে তেমনি পরবর্তী কালের 'টোরি সোসালিস্ট' বাটলার তাঁর রাজনৈতিক জীবনেও প্রথম খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ভারত উপলক্ষ্যেই। সর্বোচ্চ লভ্য সম্মানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে উচ্চাভিলাষী বাটলার কর্মজীবনই অবশ্য শুরু করেছিলেন রাজনীতি দিয়ে সুদূর '২৯ সনে সাফ্রন ওয়াল্ডেন-এর পার্লামেণ্টারী আসনটি চিরকালের মত দখলে এনে। কিন্তু 'রাব' সংবাদ হয়েছিলেন তিন বছর পরে, ১৯৩২ সনে। সেবারই কমন্স সভায় বিখ্যাত—ভারত বিল। এবং বাটলার সদ্যনিযুক্ত আণ্ডার সেক্রেটারী। সেক্রেটারী ছিলেন লর্ড হ্যালিফাক্স। তাঁর কমন্স সভায় ঢোকা বারণ। সুতরাং সেই সূত্রে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন নবীন যোদ্ধা বাটলার। তাঁর খ্যাতির দ্বিতীয় উপলক্ষ্য—মিউনিক। কেননা, সেই বিখ্যাত চুক্তিটির সময়ে (১৯৩৮-৪১) তিনি আণ্ডার

বার্নহাম, এল. এফ. এস

সেক্রেটারী অব স্টেট ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স। তবে বাটলার সবচেয়ে খ্যাত তাঁর যুগান্তকারী এডুকেশন বিল-এর ('৪৪) জন্যে। তখন তিনি ইংল্যাণ্ডের শিক্ষামন্ত্রী।

শিক্ষা, শ্রম, অর্থ, স্বরাষ্ট্র—এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর নেই বাটলার যা তাঁর হাতে না পেয়েছেন, দলের আদর্শপরিকল্পনা থেকে শুরু করে, চেয়ারম্যানশিপ, কমন্স সভায় নেতৃত্ব—টোরি দলের এমন কোন সম্মানের আসন নেই যেখানে তিনি না বসেছেন। একমাত্র বাকি প্রধান-মন্ত্রিত্ব। শোনা যায়, সেখানেও চার্চিলের পর তিনিই ছিলেন একমাত্র হক দাবীদার। তারপর ইডেনের পর আবার। এবার আবার শোনা যাচ্ছে। কেননা, সাত দিনের মধ্যে ছুই ছুই দফা ভাঙ্গা-গড়ার রকম দেখে মনে হচ্ছে—ম্যাকমিলানের 'নেভার হ্যাড ইট সো গুড' আর নেই, মন্দা অচিরেই মন্দভাগ্য সেজে আসছে। সুতরাং, সেই সঙ্গে আসছে অপেক্ষায় অপেক্ষায় ক্লান্ত বাটলারের দিনও। সেদিন 'ফার্স্ট সেক্রেটারী অব স্টেট'-বেনামীতে আর রাজী না থাকাটাই বোধ হয় তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক! বিশেষ, যাট পার হলেও বাটলার যেখানে বানপ্রস্থ নেওয়ার মত মানুষ নন! মনে আছে নিশ্চয়, বিপত্নীক টোরি নায়ক দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেছেন মাত্র সেদিন—তিন বছর আগে!

১৯. ৭. ৬২

বার্নহাম, এল. এফ. এস

'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না;'—উদ্ধত, অহমিকাপূর্ণ এই প্রবাদ-প্রায় বাক্যটিকে সত্য হিসেবে বাঁচিয়ে রেখেছিল যে উপনিবেশটি তার নাম—বৃটিশ গায়না। যেহেতু তিরিশ হাজার বর্গ মাইলের সেই মাটির প্রদীপটি দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে অবস্থিত, অতএব, ভৌগোলিক কারণেই ইংরাজ অধিকৃত পৃথিবীতে সূর্যাস্ত অসম্ভব! আজ সে গৌরবের দিন বিগত। সাম্রাজ্যের মানচিত্রে এখন দূর প্রাচ্যে সেই মহিমাময় সূর্যোদয় নেই, এশিয়া-আফ্রিকার উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন নেই; শিবরাত্রির সলতের মত এখানে ওখানে টিম টিম করে কয়টি বিন্দু জ্বলছে মাত্র। তার মধ্যে অন্যতম সেই গৌরবের লণ্ঠন—বৃটিশ গায়না। ঊনষাট লক্ষ ভারতীয়, আফ্রিকান, আমেরিকান-পর্তুগীজদের এই দেশেও

সূর্য বহুকাল ডুবু ডুবু। তবুও শেষ চেষ্টায় ত্রুটি নেই। বৃটিশ গায়নার আকাশে তাই, অতএব আবির্ভূত হয়েছেন—নতুন সূর্য। ডাঃ ছেদি জগন ইংলণ্ডেশ্বরীর হুকুম বলে অপসৃত হয়েছেন। উইলসন-সরকার টোরিদের কারিগরী দক্ষতার ফল রাঙতার সূর্য বার্ণহামকেই সাচ্চা বলে মেনে নিয়েছেন। বৃটিশ গায়না এখন অমাবস্থার সন্ধ্যায়।

খেদের কথা, বার্ণহামও আজ নিজেকে নকল-সূর্য বলে প্রমাণ করলেন। একচল্লিশ বছর বয়স্ক এই রাজনীতিক ক'বছর আগেও ছিলেন আপসহীন সংগ্রামী। পুরো নাম তাঁর—লিণ্ডেন ফরবেস স্যামপ্সন বার্ণহাম। জন্ম—জর্জ টাউনের এক মধ্যবিত্ত নিগ্রো পরিবারে। লেখা-পড়া—প্রথমে জর্জ টাউনের কুইনস কলেজে, তারপর লণ্ডনের মিডল টেম্পল-এ। সদা প্রফুল্ল, হাস্য-মুখর, বিপুলদেহী তরুণ নিগ্রো সেখান থেকে ফিরে এসেছিলেন শুধু ব্যারিস্টার হয়ে নয়, প্রখর জাতীয়তাবাদী হয়েও।

স্বভাবতই দেশে ফেরার পর তাঁর প্রথম প্রিয় আস্তানা হয়ে দাঁড়ায় ডাঃ ছেদি জগনের পিপলস প্রোগ্রেসিভ পার্টি। কেননা, বনেদী ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে বৃটিশ গায়নায় তখন এই একটিই রাজনৈতিক দল, এবং ডাঃ জগনই একমাত্র নায়ক। ফলে বার্ণহাম অচিরেই জগনের বন্ধু এবং সহযোদ্ধা হয়ে গেলেন। ১৯৫২ সনে দাঁতের ডাক্তারের পাশাপাশি ব্যারিস্টারও কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। বিচারে তাঁদের দু'জনেরই জেল হল। ছাড়া পাওয়ার পরে বৃটিশ গায়নার দুঃখ কাহিনী প্রচারের জন্যে দু' বন্ধু এক সঙ্গে বিশ্ব পরিক্রমায় বের হলেন। যতদূর মনে পড়ছে ওঁরা সেদিন ভারতের অন্যান্য শহরের মত কলকাতায়ও এসেছিলেন। ভারতীয় বংশোদ্ভব জগন নিজেই সেদিন তাঁর কৃষ্ণাঙ্গ বন্ধুকে ভারতীয় জনসাধারণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

দুই যোদ্ধার এই মিত্রতা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। '৫৩ সনের নির্বাচনে পিপলস প্রোগ্রেসিভ পার্টি বিজয়ী হল। জগন দেশের প্রধান-মন্ত্রী হলেন। বার্ণহাম শিক্ষামন্ত্রী। অবশ্য সীমাবদ্ধ ক্ষমতা। তবুও অচিরেই দুই বন্ধুতে মতভেদ দেখা দিল। সেই সঙ্গে দলেও। কৈফিয়ত হিসেবে বার্ণহাম বলেছিলেন—জগন মার্কসপন্থী, আমি সমাজতন্ত্রী।

জগন বলেন—আমি মার্কসবাদী নই, জাতীয়তাবাদী।—আই টেক্ নো অর্ডার ফ্রম অ্যানি ওয়ান! তবুও বার্ণহামকে নিরস্ত করা গেল না। হোয়াইট হলের ধুরন্ধরদের গোপন বাসনাকে চরিতার্থ করে তিনি পিপলস প্রোগ্রেসিভ পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল গড়লেন। সে দলের নাম—পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস। বলা অনাবশ্যক দলটি চরিত্রে সাম্প্রদায়িক; প্রধানত নিগ্রোরাই তার অনুগত।

বৃটিশ গায়নায় কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকানরা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৩ ভাগ, আর ভারতীয়দের অনুপাত শতকরা প্রায় ৪৮ ভাগ। স্বভাবতই কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও ১৯৫৭ সনের নির্বাচনে বার্ণহাম বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না। এবারও বিপুল ভোটাধিক্যে জয়ী হল জগনের দল। তারপর ১৯৬১ সনে আবার। নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী জগন সেবার নির্বাচিত হলেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তারপর থেকে তথাকথিত 'শাসনতান্ত্রিক বিপর্যয়', আফ্রিকান বনাম ভারতীয়দের দাঙ্গা—ইত্যাদি বহু কাঠখড় পুড়িয়ে বর্তমানের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা ঠিক যেন আমাদের সেই বৃটিশ আমলে কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড, তথা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ! বিগত দাঙ্গায় অন্যতম প্ররোচক ছিলেন নাকি বার্ণহাম স্বয়ং। মিসেস জগন অভিযোগ করেছিলেন—বার্ণহাম তাঁর স্বামীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ব্যর্থ বার্ণহাম অতঃপর নতুন নির্বাচন ব্যবস্থায় সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন। জগন এই ব্যবস্থায় কোনদিন সায় দেননি। তবুও ইংরাজের বহু পরীক্ষিত 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল' মাহাত্ম্য ঠেকান গেল না। আফ্রিকান, ভারতীয় এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতেই গত ৭ই ডিসেম্বর নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বৃটিশ গায়নায়। দাঙ্গার পটভূমিতে, জাতি বিদ্বেষের দুষ্ট আবহাওয়ায় নির্বাচন। অতএব ফলাফল এবার নানা দিক থেকেই বার্ণহাম তথা বৃটেনের পক্ষে। মোট ৫৩টি আসনের মধ্যে জগনের দল পেয়েছেন—২৪টি, বার্ণহামের পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক দলগুলো মিলিতভাবে হাতে পেয়েছেন—২৯টি। অতএব, বিলেত থেকে হুকুম এল—

জগনকে হঠাও; গদিতে বসবে—বার্ণহাম। শ্রমিক দল ক্ষমতায় আসার আগে এই নির্বাচন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ছিলেন। তবুও টোরিদের তৈরী আইন প্রয়োগ করে জগনকে সরিয়ে তাঁরা বার্ণহামকে বসালেন।—বৃটিশ গায়নার ভবিষ্যৎ কোন দিকে? জগন বলেছেন—দেশে ইতিমধ্যেই পার্টিশনের কথা শোনা যাচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের ক্ষমতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

সদ্য উপবিষ্ট বার্ণহাম সান্ত্বনা দিয়েছেন—জগনকে তিনি বিরোধী দলের নেতা হিসেবে মান্য করবেন, মাইনে দেবেন। প্রস্তাবটা শুধু হাস্যকর নয়, বার্ণহামের রাজনৈতিক মনোভঙ্গীরও পরিচায়ক। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তিনি দাসদের মধ্যেও জাতিভেদ ডেকে এনেছেন। এখন ধারণা তাঁর, একজনকে মাসোহারা দিয়ে দেশের শতকরা ৪৮ ভাগ মানুষের ওপর তিনি প্রভুত্ব করবেন। পর্যবেক্ষকেরা বলেন—বার্ণহাম ডাঃ জগনের মত পরিশ্রমী নন; এবং খুঁটিনাটিতেও তাঁর কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু উইলসন সরকারের জানা থাকা উচিত ছিল ডাঃ ছেদি জগনের মত ঝড়ের কেন্দ্রটি যতক্ষণ আছে এ ধরণের সূর্যগুলো ততক্ষণ নিতান্তই প্রদীপ মাত্র। জর্জ টাউনে এই পিদিম কতক্ষণ জ্বলে তাই এখন বিশ্বের দর্শনীয়।

১৭. ১২. ৬৪

বান্দা, ডঃ হেস্টিংস

যাদুকর এসে শিকড় দিল একখানা। বলল—এবার তোমার ছেলে হবে। তাই হল। ছেলের নান রাখা হল—কামুজু। অর্থাৎ 'ছোট শিকড়।' মিশনারী সাহেব আদর করে নাম দিলেন—হেস্টিংস। হেস্টিংস বান্দা। তের বছরও হবে না তখন তাঁর। সহসা একদিন বাড়ি থেকে হারিয়ে গেল বান্দা। খালি পা, খালি গা। হাঁটতে হাঁটতে হাজার মাইল অরণ্যপথ মাড়িয়ে নিয়াসাল্যাণ্ডের ছেলে এসে ঠেকল দক্ষিণ আফ্রিকায়। বান্দা সেখানে দিনে সোনার খনিতে কাজ করে, রাতে নিজে নিজে পড়ে। পড়তে পড়তে আরও পড়ার ক্ষুধা পেয়ে বসল তাঁকে। সামান্য যা টাকাকড়ি জমেছিল তাই নিয়ে সে এবার পাড়ি জমাল আমেরিকায়। মধ্যযুগের ভ্রাম্যমান পণ্ডিতদের মত

নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে বেড়াল বিদ্যার্থী বান্দা। অবশেষে লণ্ডনে এসে সম্পূর্ণ হল তার সেই সাধনা। আফ্রিকার কালো ছেলে বান্দা লণ্ডনে চিকিৎসাবিদ্যায় সার্টিফিকেট পেল। অতঃপর তাঁর নাম—ডাঃ হেস্টিংস বান্দা।

লণ্ডনের কিলবার্ন এলাকায় ডাঃ বান্দা নামকরা চিকিৎসক। জমজমাটি পসার তাঁর। বাঁধা রোগীই হবে হাজার চার। রোগীরা অধিকাংশই সাদা। কালোরাও আসে। কখনও এনক্রুমা, কখনও কেনিয়াট্টা। কখনও অন্যরা। তাঁরা রোগী নিয়ে আসেন না। আসেন —লক্ষণাদি বর্ণনা করতে। বান্দা মনোযোগ দিয়ে শোনেন, তারপর বসেন প্রেসক্রিপশান লিখতে। হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে তাঁর সেই আগুনে-বিধান এসে পৌছায় আফ্রিকার হাতে—নিয়াসাল্যাণ্ডের মাটিতে।

অবশেষে '৫৮ সনের জুলাইয়ে ডাক্তার স্বয়ং এসে অবতরণ করলেন সেখানে। চল্লিশ বছর পরে এই তাঁর ঘরে ফেরা। কিন্তু নিয়াসাল্যাণ্ড যেন যুগ যুগ ধরে চিনে তাঁকে। বিমান ঘাটিতে অগণিত নারী পুরুষ উন্মত্ত হৃদয়ে স্বাগত জানাল তাঁকে। আনন্দে বহুকালের ভুলে যাওয়া মাতৃভাষা ফিরে এল পঞ্চান্ন বছরের প্রবীণ দেশপ্রেমিকের মুখে। বান্দা চেঁচিয়ে উঠলেন—'কোয়াকা!' 'কোয়াকা!' —'ভোর হয়েছে।' 'ভোর হয়েছে।' তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে নিয়াসাল্যাণ্ডের তিরিশ লক্ষ মানুষ দাবি তুলল: আমাদের দেশ আমাদের হাতে ফিরিয়ে দাও। আমরা ফেডারেশন চাই না।

প্রথমে দাবি। তারপর ব্যাপক গণআন্দোলন এবং অবশেষে দাঙ্গা। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বললেন—সব কিছুর মূল সেই 'ছোট্ট শিকড়',—বান্দা। তাঁরা ডাক্তারকে জেলে পাঠালেন। কিন্তু ব্যাধি সারবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বরং তা বাড়তির দিকেই। সুতরাং, মুক্তি দেওয়া হয়েছে চিকিৎসককে। বান্দা বলেন —এ রোগের কোন চিকিৎসা নেই। '—আফ্রিকা এগিয়ে চলেছে। তোমরা কি করে থামাবে তাকে?' ৯. ৪. ৬০

বুথ, স্যার পল গোর

জাহাঙ্গীরের দরবারে যে প্রকৃতির দৌত্য নিয়ে এসেছিলেন সার টমাস

রো আজকের ভারতে ইংরেজ দূতের কর্তব্য সে তুলনায় নেহাৎ যেন রুটিন রক্ষা। এমন কি উনবিংশ শতকী উচ্চাভিলাষটুকুও আজ আর নেই। তবুও আজকের ভারতে আধুনিক ইংরেজ দূতের কাজ যেন বিগত যে কোন দিনের চেয়েই জটিল। কারণ, দুনিয়া আজ জটিলতর। স্বভাবতই পূর্ব দুনিয়ায় গতকালের সাম্রাজ্য ভারত পশ্চিম দুনিয়ার ইংল্যাণ্ডের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ দেশ। আমাদের পক্ষেও বটে। কেননা, কলম্বো পরিকল্পনা বা কমনওয়েলথ শুধু নয়, দীর্ঘ যোগাযোগে ইংল্যাণ্ড আজ আমাদের যেন আত্মীয় দেশ। তদুপরি আমাদের বহির্বাণিজ্য আজও প্রধানত ওদেশের তটেই বাঁধা।

ইত্যাদি কারণে ভারতে বৃটিশ হাই কমিশনার পদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একদিক থেকে অনেকটা প্রায় সেকালের কলোনিয়াল সেক্রেটারীর কাছাকাছি। বলা বাহুল্য, ইংরেজরা তা জানেন। জানেন বলেই ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ডের জায়গায় এবার যাঁকে তাঁরা মনোনীত করে পাঠাচ্ছেন—অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতায় তিনিও প্রতিষ্ঠিত ডিপ্লোম্যাট। বিশেষ করে স্যার গোর বুথ এশিয়া সম্পর্কে সবিশেষ ওয়াকিবহাল মানুষ। তিন বছর তিনি রাষ্ট্রদূতের কাজ করেছেন ইংরেজ বর্জিত ব্রহ্মদেশে এবং তারও আগে কর্মজীবনের দীর্ঘ ছ'বছর কেটেছে তাঁর জাপানে।

জন্ম ১৯০৯ সনে। লেখাপড়া ইটন এবং অক্সফোর্ডে। তারপর '৩৩ সনে শুরু হল কর্মজীবন। গোর বুথ গোড়া থেকেই ফরেন সার্ভিসের লোক। এশিয়া ছাড়া তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল প্রধানত অ্যাটলাণ্টিকের ওপারে, আমেরিকায়। বাদবাকী বছরগুলো কেটেছে তাঁর লণ্ডনেই, হেড-কোয়ার্টার্সে। এখানে কখনও তিনি য়ুনো শাখার প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন, কখনও ইউরোপীয় শাখায়। '৪৮ সনের শেষে একবার তিনি মনোনীত হয়েছিলেন বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের ডাইরেক্টার। উপস্থিত তিনি ফরেন অফিসে ডেপুটি আণ্ডার সেক্রেটারী।

স্যার গোর বুথ বিবাহিত। এবং বিবাহ সূত্রেও তিনি এশিয়ার সঙ্গে জড়িত। যদিও পেট্রিকা মেরী এলারটন ইংরেজ মেয়ে তবুও গোর বুথের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তাঁর কার্য কারণে সুদূর জাপানে। প্রসঙ্গত বলা দরকার,

ভাল জাপানি ভাষা জানেন স্যার বুথ।

সফল কূটনীতিক স্যার বুথ সুখী গৃহস্থ। তাঁর দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে। ছেলে দুটি অবশ্য সমবয়েসী, অর্থাৎ যমজ।

২১. ৫. ৬০

[স্যার পল গোর বুথ ১৯৬৫ সনের মার্চ মাসে বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে স্থায়ী আণ্ডার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। তাঁর জায়গায় ভারতে নতুন বৃটিশ হাইকমিশনার নিযুক্ত হন—জন ফ্রীম্যান।]

বুস্তামান্ত, স্যার উইলিয়ম আলেকজাণ্ডার

চার হাজার চারশ একচল্লিশ বর্গ মাইলের দ্বীপ বটে, কিন্তু ষোল লক্ষ মানুষের স্বাধীন দেশ। কিন্তু তবুও যদি কমনওয়েলথ-এর নবতম সদস্য, ক্যারিবিয়ান সাগরের সদ্যমুক্ত বৃটিশ উপনিবেশ জামাইকার প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন কেউ—আপনার সখ কি, তা'হলে একগাল হেসে তক্ষুণি উত্তর দেবেন তিনি—নাচ-গান-হল্লা, মোটরগাড়ী আর গরম গরম বক্তৃতা।

বয়স আটাত্তরে পড়েছে, ক্যারিবিয়নের ঢেউয়ের মত এলোমেলো চুলে অনেককাল পাক্ ধরেছে, নামের আগে যুক্ত হয়েছে গুরুগম্ভীর 'স্যার'; তবুও যে স্যার উইলিয়ম আলেকজাণ্ডার বুস্তামান্ত এখনও এই বয়সেও তাঁর মনের পছন্দ গোপন করা প্রয়োজন মনে করেন না তার কারণ, জীবনটাই তাঁর এমনি,—নাটকীয়।

ছেলেবেলায় মাত্র পনের বছর বয়সে অচেনা এক স্প্যানিশ নাবিককে স্বেচ্ছায় অভিভাবক মেনে তাঁর হাত ধরে জাহাজে উঠেছিলে। ভাসতে ভাসতে সে তরী এসে নোঙর করেছিল খাস স্পেনে। তরুণ বুস্তামান্ত তাঁর কর্মজীবনের উদ্বোধন করেছিলেন সেখানে স্পেনিশ বাহিনীতে নাম লিখিয়ে। জীবনে লড়াই শিখেছিলেন সেই সূত্রেই, মরক্কোয়,—খাস লড়াইয়ের মাঠে।

তারপর নানা বেশে, নানা দেশে একের পর এক সংগ্রাম—জীবনযুদ্ধ।

অনেককাল কিউবায় পুলিস ছিলেন, হাভানার পথে পথে সাধারণ পুলিসের কাজ করতেন। কিছুকাল নিউইয়র্কের পথে ট্রাম চালিয়েছেন। তারপর কিছুদিন ছিলেন পানামার একটা ইলেট্রিক কোম্পানীতে, এবং ১৯৩২ সনে দীর্ঘ তেত্রিশ বছর পরে দেশে ফেরার আগে আবার নিউ-

ইয়র্কে। বুস্তামান্ত তখন সেখানে একটা হাসপাতালে কাজ করতেন।

দেশে ফেরামাত্র বেপরোয়া ভবঘুরের চোখে পড়ল নতুন যুদ্ধক্ষেত্র। সেচের জল নিয়ে জামাইকার আখ ক্ষেতে ক্ষেতে তখন ব্যাপক অসন্তোষ ধূমায়িত। বুস্তামান্ত দেশলাই কাঠির মত নিজেকে ছুঁড়ে দিলেন তাতে। তার ফলে দেশব্যাপী কৃষক এবং শ্রমিক আন্দোলন এবং '৩৮ সনের জামাইকার বিখ্যাত ধর্মঘট।

বুস্তামান্ত ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা। বুস্তামান্তের আহ্বানে পরের বছর মহাযুদ্ধের বিপদ মুহূর্তে দেশে আবার ধর্মঘট, তিনশ' বছরের উপনিবেশ হাতছাড়া হওয়ার উপক্রম। ইংরেজ সরকার কয়েদ করলেন ও'কে।

দু' বছর বন্দী ছিলেন ('৪০-৪২)। তারপর থেকেই ইংরেজ তরফে সসম্মানে পশ্চাদপসরণ চেষ্টা, এবং যুগপৎ বুস্তামান্তের সরকারী মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা। '৪৩ সন থেকে আজ অবধি যে ক'টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে জামাইকায়, একটি বাদ দিলে ('৫৫) তার সব কটিতেই বিজয়ী হয়ে আসছে তাঁর দল। অথচ, বিস্ময়কর ঘটনা এই আজন্ম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করা মানুষ, জামাইকার জনপ্রিয় শ্রমিক নেতা তাঁর দলের নাম রেখেছেন—এণ্টি সোসালিস্ট লেবার পার্টি।

৯. ৮. ৬২

বেডেন পাওয়েল, লেডি

ওঁদের প্রথম দেখা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পথে। জাহাজে। এক মাথা কালো চুল, দীঘল চোখ, তরঙ্গায়িত দেহ। আজকের বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধা তখন তেইশ বছরের তরুণী। তার চাল চলন কথাবার্তায় ডগমগ তারুণ্য।

আলাপ মাত্র জানা গেল চেষ্টারফিল্ডএর এই মেয়েটির ঘরের চেয়েও বেশী ভাল লাগে—খেলাধুলা, দৌড় ঝাঁপ। সে সাঁতার কাটতে পারে, ঘোড়ায় চড়তে পারে, এবং—কি নয়!

বেডেন পাওয়েল যেন এই মেয়েটিকেই খুঁজছিলেন মনে মনে। বিধাতারও যেন তাই ইচ্ছে। নয়ত ওর জন্ম তারিখটিও ২২শে ফেব্রুয়ারী হবে কেন? ঐ তারিখটি যে তার নিজেরও জন্ম দিন!

সুতরাং আলাপ থেকে বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব থেকে ক্রমে আরও কাছাকাছি। জাহাজ নোঙর করার আগেই সবাই

জানলেন স্কাউট আন্দোলনের জনক এই মেয়েটিকে বিয়ে করছেন।

সে বছরই (১৯১২) শেষের দিকে বিয়ে হয়ে গেল ওঁদের। তারপর থেকেই ওলাভ ভুবন-বিখ্যাত লেডি বেডেন পাওয়েল। অবশ্য এ খ্যাতি শুধু পাওয়া নয়, অর্জিতও।

বিয়ের পর প্রথম ক'বছর ব্যস্ত সংসারী। চার বছরে তিনটি ছেলে-মেয়ে। চব্বিশ ঘণ্টার সংসার। ছোট মেয়ে বেটি তখনও ভূমিষ্ঠ হয়নি। তবুও ঘরে আটক থাকতে রাজী হলেন না ওলাভ। তিনি গাইড সাজলেন। বেডেন পাওয়েল-এর বোন এগনিস তখন (১৯১৬) গার্ল গাইড-এর নেত্রী। ভ্রাতৃবধূকে তিনি দলে টেনে নিলেন।

সাধারণ গাইড হিসাবেই এই নতুন দুনিয়ায় পা বাড়ালেন লেডি পাওয়েল। দেখতে দেখতে পদোন্নতি শুরু হয়ে গেল তাঁর। প্রথমে সাসেক্স-এর কমিশনার, তারপর চীফ কমিশনার এবং পরের বছর চীফ গাইড অব দি বৃটিশ এম্পায়ার।

'২৮ সনে নিজে উদ্যোগী হয়ে বিশ্ব গার্ল স্কাউট আন্দোলনের উদ্বোধন করলেন লেডি পাওয়েল। বয়েজ স্কাউট আন্দোলন এতদিনে যেন সম্পূর্ণতা পেল। দু'বছর পরে বিশ্বের মহিলা স্কাউটেরা লেডি পাওয়েলকে নির্বাচিত করলেন তাঁদের প্রধানা নেত্রী, চীফ কমিশনার। আরও দু'বছর পরে ('৩০ সনে) রাজকীয় সম্মানে ভূষিত হলেন তিনি। লেডি বেডেন পাওয়েল সেদিন থেকে বৃটিশ রাজত্বের একজন—'ডেম গ্রাণ্ড ক্রশ অব দি অর্ডার'ও। তদুপরি তিনি এখন বিশ্বে—চীফ গাইড। বিশ্বের আশীটি দেশের অগণিত গাইড-এর সর্বজনমান্য গাইড—পথপ্রদর্শিকা।

বিশ্বের গাইড-প্রধানা পাওয়েল ভারতে এসেছেন। এ তাঁর তৃতীয় বারের মত ভারত দর্শন। প্রথমবার এসেছিলেন ১৯২১ সনে—বড়লাট চেমসফোর্ড-এর আমন্ত্রণে; দ্বিতীয়বার ১৯৩৭ সনে। দু'বারই সঙ্গে ছিলেন তাঁর সেই অপ্রতিরোধ্য মানুষটি—লর্ড পাওয়েল। এবার তিনি আর নেই। কিন্তু আজকের লেডি পাওয়েলকে দেখলে মনে হয় লর্ড যেন আজও বেঁচে আছেন, এই চঞ্চলা বৃদ্ধাটির মধ্যে। তাঁরা দু'জনে মিলেই যেন আজকের এই একজন। একজনের অবয়বে আচরণে অন্যজনের স্মৃতি।

অন্তত দিনের শেষে ক্লান্ত গাইড যখন ডায়েরী খুলে বসেন তখন সে স্মৃতিই যেন ঘুরে ঘুরে আসে প্রতিদিন।

এগার বছরের মেয়ে ওলাভ ডায়েরী লিখত। কিন্তু সেই ডায়েরীর পাতায় কি ছিল কেউ জানেনা, কিন্তু সবাই জানে—তেইশ বছর বয়স থেকে যে নতুন খাতা নিয়েছেন তিনি, তার পাতায় আছে শুধু—স্কাউট আর গাইড—গাইড আর স্কাউট! অন্য কথায়,—পাওয়েল আর পাওয়েল!

১৬. ২. ৬১

বেন খেদা, ইউস্থফ

'আমাদের স্বাধীনতা দিবসের তারিখটি কি হবে জানেন? চল্লিশে জুলাই।—হ্যাঁ, চল্লিশে!'

কথাগুলো বলেছিলেন একজন আলজেরিয়ান ছাত্র। বছরের পর বছর শুধু আলাপ আর আলাপ দেখে ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে তিনি বলেছিলেন—'ফরাসীরা স্বাধীন হয়েছিলেন ১৪ই জুলাই, কিউবানরা ২৬শে জুলাই, —আমরা আলজিরিয়ান? স্বভাবতই আমরা স্বাধীন হব ১৪ই আর ২৬শে মিলিয়ে—৪০শে জুলাই!"

সম্ভবত ততদিন আর অপেক্ষা করতে হবে না হতভাগ্য আল-জিরিয়াকে। কেননা, 'আলাপী মানুষ' বিদায় নিয়েছেন। আব্বাস চলে গিয়েছেন। তাঁর জায়গায় 'স্বাধীন আলজিরিয়া' সরকারের প্রধান মন্ত্রীর আসনে এসেছেন নতুন মানুষ।—'কাজের মানুষ।'

নাম—ইউস্থফ বেন খেদা। বয়স মোটে একচল্লিশ। শক্ত মন, মিষ্টি মুখ। চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় খেদা 'কাজের মানুষ।'

যদিচ সৈন্যদের সমর্থন বশত আজ এই আসনে, খেদা তবুও যাকে বলে পদাতিক কি অশ্বারোহী সে ধরনের লড়িয়ে নন। জন্ম হয়েছিল তাঁর আলজিরিয়ার্স-এর কাছে প্লিভা নামে ছোট্ট একটা শহরে। আব্বাসের মতই সেখানে একটি ঔষধের দোকান ছিল তাঁর। খেদা তখন আব্বাসের মতই একজন কেমিস্ট।

কিন্তু দলে (এফ. এল. এন) যোগ দেওয়া মাত্র জানা গেল খেদা আসলে কেমিষ্ট নন—রাজনীতিবিদ। রাজনীতি এবং অর্থনীতি বিষয়ে বিস্তর পড়াশুনা তাঁর। ফলে—'এফ. এল. এন'-এর আদর্শগত ভিত রচনার দায়িত্ব নিতে হল তাঁকে। আলজিরিয়ার বিদ্রোহের পেছনে আজ যে কাগজপত্রের মজবুত ভিত, সেটা, লোকে বলে, এই ভূতপূর্ব কেমিষ্টেরই কীর্তি।

বইপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে

ভালবাসেন বটে, কিন্তু ফরাসীদের সম্পর্কে খেদা পছন্দ করেন শক্ত হাতে রাইফেল ধরতেই। এতকাল তার সুযোগ ছিল কম। কেননা, পাশে পাশে আব্বাস ছিলেন। আব্বাসের তখন দারুণ প্রভাব। তাঁর সঙ্গে খেদা একবার ভারতে এসেছিলেন। শোনা যায়, ফিরে গিয়ে তিনি সেবার আলজিরিয়ায় আমাদের ঢংয়ে একটা কংগ্রেস গড়ে তোলার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন।—কিন্তু এখন? উত্তরে আলজিরিয়ায় নতুন প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ বেন খেদা নিশ্চয় মিষ্টি হাসবেন। কেননা, ইতিমধ্যে তিনি চীন ঘুরে এসেছেন, এবং লাতিন আমেরিকাও দেখা হয়ে গেছে তাঁর। —'অহিংসা' কি আর খেদার মন ভোলায়?'

ঘরের খবর: বছর দুই হল খেদা বিয়ে করেছেন। পরের খবর: সম্প্রতি তিনি পিতা হয়েছেন। সন্তানটি পুত্র সন্তান।

১৪. ৯. ৬১

বেনবেলা, মহম্মদ

'কেউ কেউ আমাকে তুলনা করে থাকেন নাসেরের সঙ্গে, কেউ কাস্ত্রোর সঙ্গে, আবার কেউ বা অন্য কোন জননেতার সঙ্গে। সেটা ঠিক নয়।'—বলতেন বেন বেলা। মাত্র তিন সপ্তাহ আগে বিজয়ীর বেশে আলজিয়ার্স-এ ফিরে এসে তিনি ঘোষণা করেছিলেন—কী নাসের, কী কাস্ত্রো কারও সঙ্গে আমার তুলনা হয় না।

অন্তত ভাগ্যে। ওরান প্রদেশের মারনিয়া নিবাসী জনৈক মরক্কো-আগত দরিদ্র ব্যবসায়ীর এই সন্তানটি যে ভাবে দেখতে দেখতে আলজিরিয়ার ভাগ্যবিধাতার আসনে উঠে এসেছেন—সে সত্যিই এক বিস্ময়কর ঘটনা। দেশের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে বেনবেলা যোগ দিয়েছেন মাত্র ১৯৪৮ সনে। তার আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি ছিলেন—ফরাসীবাহিনীর একজন সার্জেন্ট। সে সেবার পুরস্কার হিসেবে রাজ-সরকারের তরফ থেকে একখানা মেডেলও দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু 'এফ. এল. এন' বাহিনী তাঁদের গোপন আস্তানায় আস্তানায় যে হারে ফটো টাঙাতে শুরু করেছিল ওঁর, লোকে বলে সে শুধু কানে কানে ওঁর নামে কতকগুলো গুজব ছড়িয়ে গিয়েছিল বলেই।

আদি নব-রত্নের একজন হিসেবে

বিপ্লবী বেনবেলার স্মরণীয় কীর্তি ওরান ডাকঘর লুঠ। একদিনেই প্রায় ত্রিশ লক্ষ ফ্রাঁ সেদিন তিনি তুলে দিয়েছিলেন দলের হাতে। তারপর থেকে যা তিনি করেছেন —সামরিক মূল্য তার কম হলেও যোদ্ধাদের মনে মনে নায়কের মূর্তি গড়ার মত উপাদান ছিল তাতে প্রচুর। যথা: ডাকঘর ডাকাতির অপরাধে কারাদণ্ড হওয়ার পাঁচদিন পরে জেলখানা থেকে পলায়ন, প্যারিস-কায়রো-মরক্কো তথা দেশে দেশে ছদ্মবেশে ভ্রমণ, এবং অবশেষে ১৯৫৬ সনের ২২শে অক্টোবর মরক্কো থেকে টিউনিসিয়ার পথে অত্যন্ত অভাবিতভাবে হঠাৎ ফরাসীদের হাতে আবার ধরা পড়া। অনেকে বলেন—বেনবেলা যে বিপ্লবীদের হৃদয়ে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন তার অন্যতম কারণ শেষোক্ত ঘটনাটি।

প্রবাদ আরও পল্লবিত করেছে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বছরের বন্দী জীবন। একদিকে 'এফ. এল. এন' অনুপস্থিতিতে নানাভাবে সম্মানিত করেছে তাঁকে, অন্য দিকে—বন্দী নানাভাবে তৈরী করেছেন নিজেকে। কারাগারেও তাঁর কাছে দেশের খবর অজ্ঞাত ছিলনা। কারণ মরক্কো থেকে হেকিমি শেরিফ নামে একজন এটর্নি দেওয়া হয়েছিল তাঁর আইনজীবী হিসেবে। বুদ্ধিমানের পক্ষে সেই ঘুলঘুলিটুকুই ছিল যথেষ্ট।

দেশকে জানা ছিল। তাই, যদিও ছাড়া পাওয়ার মাত্র ক' সপ্তাহ পরেই স্বাধীনতা—তবুও বেনবেলা বহু প্রত্যাশিত সেই আলোর উৎসব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পেরেছিলেন। রকম দেখে মনে হয়েছিল হয়ত আখেরে তিনিই জিতবেন। কিন্তু আলজিরিয়ার শেষ আবহ-বার্তা শুনে মনে হচ্ছে বোধ হয় তা আর হলো না। কেননা, আকাশে আবার মেঘ দেখা দিয়েছে এবং জানা গেছে খাকী রঙেও রকমফের আছে। ফলে, প্রবাদ-পুরুষ (আপাতত) আবার হটছেন।

—কেন, কী চেয়েছিলেন বেন বেলা?—'নির্ভেজাল সমাজতন্ত্র,'—কমিউনিস্ট শাসন? আবার আপত্তি করবেন পঁয়তাল্লিশ বছরের আলজিরিয়ান নায়ক,—না, আমাদের সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। "সমাজতন্ত্র" গাই মোলেও বলতেন, মাও সে তুংও বলছেন, কিন্তু আমি যা বলি······সে অন্য জিনিস।

বোরগীবা, হবিব বিন আলি

কী জিনিস, সম্ভবত রণক্লান্ত আলজিরিয়া সেটাই জানতে চেয়েছিল আগে।

৩০. ৮. ৬২

[ধীরে ধীরে সমস্ত প্রতিযোগী এবং প্রতিবাদী-পথিকদের সরিয়ে বেনবেলা ক্রমে নিজেকে আলজিরিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৬৩ সনের সেপ্টেম্বর থেকে তিনি সেখানকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রেসিডেন্ট।]

বোরগীবা, হবিব বিন আলি

এক কথায় জনতার নেতা।

খান কম, ঘুমান কম, ফাইল নিয়েও বসেন কম।

তিনি কাজ করতে ভালবাসেন, আর ভালবাসেন কথা বলতে। সপ্তাহে একবার বলেন রেডিও মারফতে, অনেকবার—সভা সম্মেলনে, পথে ঘাটে। সহজ আরবী, ছোট ছোট দেশজ প্রবাদ এবং নির্মল হাসিতে উজ্জ্বল সে সব কথা শোনার মত।

কথা আর কাজ বাদ দিলে আর যা ভালবাসেন তিনি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—অপেরা এবং ঘোড়ায় চড়া। প্রথমটির প্রেরণা অবশ্য প্যারিস তথা ফরাসী দেশ, কিন্তু দ্বিতীয় পছন্দটির কারণ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। কৈশোরে ক্ষয় রোগ প্রায় পঙ্গু করে ফেলেছিল ওঁকে। ঘোড়ায় চড়াটা সেই থেকে চিকিৎসকদের পরামর্শ।

বিশ্রাম যখন প্রয়োজন, অথচ ঘোড়া যখন অপছন্দ তিনি তখন চলে যান সমুদ্রের ধারে জেলেদের সেই গঞ্জটিতে যেখানে আটান্ন বছর আগে (১৯০৩) তিনি জন্মেছিলেন।

গাঁয়ের নাম মোনস্তির। বাবার নাম—আলি বোরগীবা। ছেলের নাম ধার্য হল—হবিব। হবিব বিন আলি বোরগীবা।

বড় ঘরের ছেলে। বাবা ছিলেন টিউনিসিয়ার 'বে'র অধীনে একজন বিখ্যাত সামরিক পুরুষ। সুতরাং ছেলেকে কাজে না দিয়ে পাঠান হল স্কুলে।

টিউনিসিয়া সেই ১৮৮১ সন থেকেই ফরাসীদের আয়ত্তাধীন। সুতরাং, দেশে ফরাসী স্কুল ছিল। সেখানকার বিদ্যা সম্পন্ন করে তরুণ বোরগীবা পাড়ি জমালেন খাস ফরাসী দেশে।

'২২ সনে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন তিনি। পাঠ্য বিষয়: রাজনীতি এবং আইন।

'২৮ সনে প্রাণচঞ্চল মুসলিম যুবক যখন ফিরে এলেন নিজের দেশে—তখন তিনি পরিপূর্ণ পশ্চিমী মানুষ। তিনি পশ্চিমী পোষাক পরেন, তিনি আদালতে গড় গড় করে ফরাসী বলেন, তাছাড়া তিনি বিয়েও করেছেন একটি ফরাসী মেয়েকে। মিসেস বোরগীবা ওরফে ম্যাথিলডা লোরাইন প্যারিসে ছিলেন বোরগীবার সহ-পাঠিনী। বোরগীবা সেদিন এমন ফরাসীভক্ত যে নিজের একমাত্র সন্তান কামালকে (ছেলেটি এখন ইতালীতে টিউনিসিয়ার রাষ্ট্রদূত) পর্যন্ত স্বদেশে না এনে ফরাসী দেশের নাগরিক বানিয়েছিলেন।

কিন্তু এ অনুরাগ বেশী দিন রাখা গেল না। অচিরেই দেখা গেল বোরগীবা আইন ব্যবসা ত্যাগ করেছেন এবং দস্তুর মত দস্তুর পার্টিতে লেগে গেছেন।

'৩৩ সনে উদীয়মান রাজনীতিক আরও এক পা এগিয়ে গেলেন। দস্তুর পার্টি ছেড়ে তিনি নিও-দস্তুর পার্টি গড়লেন। সে দলের সাধনা—স্বাধীনতা।

দেখতে দেখতে দল প্রকাণ্ড হয়ে উঠল। সাতশ' নগরে, গঞ্জে, গ্রামে পার্টির অফিস বসল এবং টিউনিসিয়ার আকাশ ফাটিয়ে জয়ধ্বনি উঠল বোরগীবার নামে।

স্বভাবতই ফরাসীরা প্রমাদ গুণলেন। বোরগীবাকে তাঁরা জেলে পুরলেন। বন্ধুত্বে সেই প্রথম প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট ছেদ।

এরপর তাঁর পঁচিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনের এগারটি বছর কেটেছে ফরাসীদের কারাগারে। কখনও কখনও দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে।

অবশেষে '৫৫ সনে যখন ঘরে ফিরলেন বিদ্রোহী দেশ-প্রেমিক তখন তাঁর সঙ্গে এল বহু অভিপ্রেত সেই স্বাধীনতাও। সিংহাসন থেকে নেমে এসে টিউনিসিয়ার 'বে' বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—'বোরগীবা, তুমি এ স্বাধীনতার জনক!' গলা ফাটিয়ে জনতা সায় দিল তাঁর সেই কথায়। পরের বছর বোরগীবা নির্বাচিত হলেন তাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী। তার দু'বছর পরে স্বাধীন টিউনিসিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি।

টিউনিসিয়ার লোকমান্য রাষ্ট্রপতি বোরগীবা আজও জনতার নেতা। খাওয়ার টেবিলে কমপক্ষে কুড়িজন লোক না থাকলে তিনি যে শুধু খেতে পারেন না তাই নয়, বিজার্তা বোধ হয় প্রমাণ করল, জনতা ছাড়া

এখনও তিনি অনেকক্ষণ ভাবতে পারেন না। ২৭. ৭. ৬১

বোলস, চেস্টার ব্লিস

নয়া-দিগন্ত নাগালে এসেছে। দিল্লির চাণক্যপুরীতে রুজভেল্ট ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন সম্পূর্ণ। আবার হার্ভার্ডের পুরানো কাজে ফিরে যাচ্ছেন গলব্রেথ। তাঁর জায়গায় এবার আসছেন পুরানো ফ্রন্টিয়ার্স ম্যান—বোলস। সুখ্যাত চেষ্টার ব্লিস বোলস। স্টেট ডিপার্টমেণ্টের দু' নম্বর আসন খালি করে, এক দশক পরে আবার তিনিই আসছেন নবযুগের চাণক্যপুরী আলো করতে।

* * *

কলারে ইস্ত্রী নেই, গলায় টাই নেই। গায়ে সাধারণ একটা জামা, পরনে মেডিসন এভিন্যুর গ্রে ফ্লানেল স্যুট; দিল্লির পথের ধুলোয় তা আরো ধূসর। তাই চাপিয়ে ক্রীং ক্রীং সাইকেল চালিয়ে রাজধানীর পথে পথে ঘুরছেন ভারতে মার্কিন দূত। পাশে আর একটি সাইকেলে স্ত্রী ডরোথি। আনুষ্ঠানিক পার্টিতে কেউ 'ইওর এক্সেলেন্সি' বলে কিছু বলতে চাইলে তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন—'নো, নো, এক্সকিউজ মী! ১৮৫৩ সনের পরে কোন মার্কিন দূতের এ সম্বোধনে সাড়া দেবার অধিকার নেই!' এণ্ড্রু জ্যাকসন নাকি তাই নিয়ম করে গেছেন।

এণ্ড্রু জ্যাকসন যা বলেননি তিনি তাও করেছিলেন। দিল্লিতে নেমেই সপরিবারে 'দেশস্থ' হতে সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। বাবার নির্দেশে মেয়ে সিন্থিয়া প্রেরিত হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। ছোট দুই ভাই সালি আর স্যামুয়েল ভর্তি হয়েছিল নয়া-দিল্লির দুই স্কুলে। শুধু তাই নয়, ডরোথি তখন ভৃত্যদের হাত থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে নিজেই ঘর ঝাঁট দিতেন, প্রধান রাষ্ট্রদূত হাতে 'হিন্দি ইন থার্টি ডেজ' নামে একখানা বই নিয়ে অবসর কাটাতেন।—চেস্টার বোলস সেদিনও সংবাদ।

পুরানো মুখ, পুরানো নাম।

'৫১ থেকে '৫৩—প্রায় তিন বছর ছিলেন ভারতে। বোলস ভারতে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। স্বদেশেও। ঠাকুর্দা ম্যাসাচুসেটের বিখ্যাত খবরের কাগজ 'রিপাব-লিকান'-এর সম্পাদক ছিলেন। বাবা ছিলেন কাগজের কলের মালিক। বালক 'চেট'-এর লেখা-

পড়াও তাই সেরা স্কুলে, কলেজে। প্রথমে কানেকটিকাট-এর কোর্ট-এ তারপর ইয়েলে। '২৪ সনে তেইশ বছর বয়সে বিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে তরুণ বোলস কর্মজীবন শুরু করেছিলেন পরিবারের কাগজে কাজ নিয়ে। কিন্তু এক বছরও থাকতে পারেননি সেখানে। কেননা, ঠাকুর্দার সঙ্গে তাঁর মত মিল ছিলনা। সম্পাদক হিসেবে তিনি ছিলেন লীগ অব নেশনস-এর বিপক্ষে,—রিপোর্টার বোলস পক্ষে।

বেকার তরুণ নিউ ইয়র্কে এসে একটা বিজ্ঞাপন প্রতিষ্ঠানে কাজ নিলেন। 'কপি রাইটারে'র কাজ। দেখতে দেখতে জীবনে নব-অধ্যায় সূচিত হল। বিজ্ঞাপনের কাজে বোলস-এর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। উৎসাহী এক বন্ধুকে নিয়ে তিনি এবার নিজেই একটি কোম্পানি খুলে বসলেন। মার্কিন দেশের বিজ্ঞাপন জগতে সেই কোম্পানি এবং তার সফল পরিচালক বোলস আজও প্রবাদ। তাঁর মাথা থেকে কত পরিকল্পনা যে বের হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

'৪১ সনে আমেরিকা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ামাত্র কোটিপতি বোলস কোম্পানি ছেড়ে নৌবাহিনীর দরজায় গিয়ে লাইন দিয়েছিলেন। কানে দোষ ছিল, ওঁরা তাই ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু ডেকে আপন সংসারে আসন দিয়েছিলেন রুজভেল্ট। বোলসকে তিনি 'প্রাইস অ্যাডমিনিস্ট্রেটার' নিযুক্ত করেছিলেন। যুদ্ধশেষে ট্রুম্যানের আমলে তিনি ছিলেন—'ডাইরেক্টার, অফিস অব দি ইকনমিক স্ট্যাবিলাইজেশন।' এ ছাড়াও ডেমক্র্যাট গভর্ণর হিসেবে তিনি দু' বছর ('৪৮-'৫০) কনাকটিকাট শাসন করেছেন, 'য়ুনো' থেকে শুরু করে নানা দরবারে আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করেছেন,—'টু মরো উইদাউট ফিয়ার' নামক বই লিখে স্বদেশে সংবাদ হয়েছেন। তবে যুদ্ধপর মার্কিন দেশে যে বোলস সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর সংবাদ তিনি 'অ্যাম্বাসাডার বোলস'!

সেদিনের বোলস সত্যিই এক বিস্ময়কর রাষ্ট্রদূত। তিনি যেমন আমাদের চোখে বিস্ময়,—তেমনি স্বদেশেও। কেননা, তিনি যে শুধু সাইকেল চড়েন তাই নয়,—নেহরু এবং ভারত নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন, মার্কিন ডলার নিয়ে 'ছিনিমিনি খেলেন',

এবং ভারতের জন্যে কী নয়! এমন কি একবার কাশ্মীর বিরোধে পর্যন্ত তিনি ভারতের পক্ষে কথা বলেছেন। কোন কোন রিপাবলিকান তাই গুঞ্জন তুললেন—বোলস আদৌ কূটনীতিক নন!—বোলস মিনস দি মোর এণ্ড মোর ইন দি বেগিং বাউলস।

তার জবাব দিয়েছিলেন বোলস পদত্যাগের এক বছর পরে (১৯৫৪) তাঁর বিখ্যাত জবানবন্দী 'অ্যাম্বাসাডার্স রিপোর্ট' ছাপিয়ে। নির্দ্বিধায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন—ভারত এবং এশিয়া-আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলো তাদের নিজেদের পথ ধরেই চলবে। আমেরিকার একমাত্র কর্তব্য, আমি মনে করি, সে পথে চলায় তাদের সাহায্য করা,—আর কিছু নয়।

পাঁচ মাস ধরে 'বেস্ট সেলার' হয়েছিল সেই বই। বিক্রি হয়েছিল ৩৫ হাজার। তারপর 'দি নিউ ডাইমেনশানস অব পিস' এবং অন্যান্য রচনা। কেনেডির স্বপ্ন-জগতের অন্যতম ভাষ্যকার চেস্টার বোলস স্বদেশে আজ আর প্রশ্নবোধক কোন চিহ্নবিশেষ নন, হোয়াইট হাউসে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। রাস্ক-এর পরেই সেখানে তাঁর আসন।

বোলস সেখান থেকেই আজ নেমে আসছেন ভারতের ধুলোয়। পাকা দশ বছর পরে একই আসনে তাঁর এই পুনরাগমন। একই মানুষকে কি ফিরে পাব আমরা?

সিন্থিয়া এখন 'ডব্লিউ এইচ ও'র স্বেচ্ছাসেবিকা। ক' মাস আগেও তিনি ভারতেরই কোন গ্রামে ছিলেন। হয়ত এখনও আছেন। ভাই স্যামুয়েল নাইজেরিয়ার এক স্কুলে পড়াচ্ছেন। বাবা বাষট্টিতে পড়লেন। কিন্তু আশ্চর্য এই, বোলস এখনও সেই একই মানুষ। '৬১ সনের আগস্টে ক' দিনের জন্যে এসেছিলেন দিল্লিতে। দর্শকেরা চমকে উঠেছিলেন তাঁকে দেখে। পরনে একটা হাফ প্যাণ্ট, গায়ে সাদা সার্ট, দুটো বোতাম নেই তাতে। হেসে আশ্বাস দিয়েছিলেন বোলস—ঘাবড়ে যেও না বন্ধু, 'আই উইল পুট মাইসেলফ অ্যাট ইওর মার্সি লাইক আই ইউজড টু ডু!'

৪. ৪. ৬৩

ব্রাণ্ডট, উইলি

ক'বছর আগেও শহরের করদাতাদের তালিকায় নাম ছিল না লোকটির। তিনি এখন মেয়র। আর কোন শহরে নয়,—বার্লিনের।

ক'বছর আগেও জার্মান নাগরিক হিসেবে কোন পরিচয়পত্র ছিল না তাঁর। অথচ ভবিষ্যতে তিনি হতে চান গোটা পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার। এবং আর কেউ নয়, স্বয়ং আড্‌নুরকে হারিয়ে। স্বভাবতই লোকটিকে ঘিরে নানা রোমাঞ্চ, নানা জিজ্ঞাসা।

—কি নাম আপনার হের ?

—উইলি ব্রাণ্ট !

—বরাবরই কি তাই ছিল ?

—আজ্ঞে না।

—আপনি কি 'ইললেজিটিমেট' ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ !...

উত্তরটা অবশ্যই সাহসিকতাপূর্ণ। কিন্তু তার চেয়েও দুঃসাহসিকতাপূর্ণ এই আটচল্লিশ বছর বয়স্ক মানুষটির জীবন কাহিনীটি।

ব্রাণ্ট তখন ব্রাণ্ট নন। নাম ছিল তাঁর ফ্রাম। হার্বার্ট ফ্রাম। (Herbert Frahm)

ফ্রামের মা ছিলেন এক দরিদ্র শ্রমজীবিনী। বাবা কে ছিলেন তিনি তা জানেন না।

তবুও যে তিনি আত্মহত্যা না করে বেঁচেছিলেন সে শুধু মায়ের জন্যে।— আর, 'ফাদারল্যাণ্ড' নামক জনকটিকে একবার মুখোমুখি দেখবার জন্যে।

ফলে 'জিমনাসিয়াম'-এর গ্র্যাজুয়েট ফ্রাম সতের বছর বয়সে (জন্ম—১৯১৩) সোশ্যালিস্ট হলেন এবং পিতৃভূমির নামে ষ্ট্রীট ফাইটিং-এ নেমে পড়লেন। প্রতিপক্ষ তাঁর নাৎসীগণ।

'৩৩ সন। যুদ্ধের ফলাফল ঘোষিত হল। দেখা গেল—শত্রুরা জিতেছেন। রাজতক্তে হিটলার এসেছেন। তাঁর হাতে পিতৃভূমির প্রগতিবাদী সন্তানেরা লাঞ্ছিত, অপমানিত, কিংবা মৃত। পরাজিত হয়েও ফ্রাম মরতে রাজী হলেন না। তিনি একটি জেলে ডিঙ্গিতে উঠে বসলেন। তারপর অজানা সাগরে ভেসে পড়লেন।

কুড়ি বছরের পলাতক যুবককে নিয়ে সে ডিঙ্গি ভিড়ল এসে নরওয়ের কূলে। আরোহী নৌকা থেকে নামলেন। তারপর বললেন—আমি উইলি ব্রাণ্ট। ব্রাণ্ট সেই থেকে ব্রাণ্ট। বিখ্যাত ব্রাণ্ট।

উইলি ব্রাণ্ট নরওয়ের নাগরিক হয়ে গেলেন। তিনি ওসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়েন, গোপনে নাৎসী-বিরোধী আন্দোলন করেন, খবরের কাগজে প্রবন্ধ লেখেন— আপতত তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি জার্নালিস্ট, সাংবাদিক।

ব্রাণ্ডট, উইলি

সাংবাদিক হিসেবেই নরওয়ে থেকে স্বদেশ যাত্রা করেছিলেন ব্রাণ্ড্ট, কিন্তু যুদ্ধের পিতৃভূমি দেখতে হল বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে জনৈক বিদেশী ছাত্র হিসেবে। গোয়েবলস-এর লোকেরা একদিনের জন্যেও জানতে পারেনি—এই ছেলেটি 'থার্ডরাইখ'-এর রাজধানীতে বসে নাৎসী-বিরোধী কাজ করছে, গোপনে সেই তাসের প্রাসাদের ভিত সরাচ্ছে।

ফিরে আসার বেশ কিছুদিন পরে '৪০ সনে জার্মান সৈন্যদের হাতে ধরা পড়লেন ব্রাণ্ড্ট। কিন্তু বেশীদিন তারা রাখতে পারলনা ওঁকে। কেননা, লোকটির গায়ে নরওয়ের ইউনিফর্ম, মুখে নরওয়ের ভাষা। নরওয়ের একজন সাধারণ সৈন্যকে এমন যত্ন করে আটকে রাখার দরকার কি ?

ছাড়া পেয়েই ব্রাণ্ড্ট পালিয়ে গেলেন সুইডেনে। সেখান থেকে যুদ্ধ শেষে নরওয়ে হয়ে—বার্লিনে। নুরেমবার্গে যখন আদালত বসল তখন খাতা পেন্সিল নিয়ে সেখানে। জার্মানীতে ব্রাণ্ডট তখনও একজন বিদেশী সাংবাদিক। পরে জানা গেল, —তিনি বার্লিনস্থ নরওয়ে দূতাবাসের 'প্রেস অ্যাটাচি'।

অবশ্য যাঁদের জানবার আসল পরিচয় তাঁরা জানলেন। জার্মানীর প্রধান সোস্যালিষ্টরা মুখ দেখেই ছেলেটিকে চিনলেন। সহকর্মী বন্ধুরা চিনলেন—কথার ভঙ্গী দেখে। তাঁদের পরামর্শে ব্রাণ্ড্ট দূতাবাসের কাজ ছেড়ে দিলেন। তিনি আবার পিতৃ-ভূমির সন্তান হলেন। সে মাত্র '৪৮ সনের কথা। উইলি ব্রাণ্ড্ট তারপর থেকেই পশ্চিম জার্মানীতে সংবাদ। '৪৯ সনে তিনি পার্লামেণ্টে এলেন। '৫৭ সনে বার্লিনের মেয়রের আসনে। জনতা তাঁর হাতে।

ওরা এসেছিল উত্তেজিত হয়ে। রুশ ঔদ্ধত্যের জবাবে বার্লিনবাসীদের একটা কিছু করা চাই,—চাই-ই চাই ! কিন্তু মেয়রের বক্তৃতা শুনে ফিরে গিয়েছিল ওরা গান গেয়ে। ব্রাণ্ড্ট জনতার যাদুকাঠি। চারিটি ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারেন তিনি।

মিসেস ব্রাণ্ড্ট বলতে পারেন না বটে, কিন্তু স্বামীর মত লিখতে পারেন। কেননা, '৪৮ সনে ব্রাণ্ড্টের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে এই নরওয়ে-বাসী তরুণীটি নিজেও ছিলেন সাংবাদিক। জনৈক সাংবাদিকের বিধবা স্ত্রী।

তবে নির্বাচন উপলক্ষে মিসেস কেনেডির ভূমিকা নিতে পারছেন না

তিনি। কারণ, আপাতত যা তিনি লিখেছেন সে ছাপা হচ্ছে একটি ফ্যাশান জার্নালে। লোকে বলে কোন সোস্যালিস্ট পত্নীর পক্ষে তা মোটেই আশাপ্রদ খবর নয়।

তার চেয়েও ব্রাণ্ডটের পক্ষে আশাপ্রদ খবর বরং সেইটেই, মিসেস ব্রাণ্ড্ট—মা হচ্ছেন। এবং কেনেডি-পত্নীর মত নির্বাচনের মুখেই। অবশ্য ইনি তৃতীয় বার। ২৪. ৮. ৬১

ব্ল্যাক, ইউজিন রবার্ট

যাকে বলে 'টাইকুন' ঠিক সে বস্তু নন। বরং বলা যেতে পারে—'টেকনোক্র্যাট'। তবে সমুদয় কারিগরী জারিজুরি তাঁর প্রধানত অর্থ বিষয়েই।

নাম—ইউজিন রবার্ট ব্ল্যাক। বয়স—চৌষট্টি। লম্বা দোহারা চেহারা, কেশহীন মসৃণ মাথা,—তীক্ষ্ণ চোখ। ব্ল্যাক এখনও বেদম গলফ খেলেন। ব্রীজ খেলার টেবিলে এখনও তাঁকে হারান দুঃসাধ্য। দুঃসাধ্য, কারণ, হার-জিতের খেলাগুলো সত্যিই তিনি জানেন,—মনোযোগ দিয়ে শিখে ছিলেন।

বাবা অ্যাটলান্টায় আইনজীবী ছিলেন। মা সেখানকারই এক বিখ্যাত সাংবাদিক এবং সামাজিক মানুষের কন্যা ছিলেন। সুতরাং তিন সন্তানের জনক-জননী জ্যেষ্ঠটিকে শ্রেষ্ঠ হিসাবেই গড়তে চেয়েছিলেন।

ব্ল্যাক কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের বদলে অধিকতর উৎসাহ অনুভব করলেন বৃহত্ত্বের সাধনায়। ১৯১৮ সনের কথা। জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাশ করেই তিনি বৃহৎ কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সন্ধানে লাগলেন। কিন্তু তখন মহাযুদ্ধ। ফলে কিছুদিন নৌ-বাহিনীতে অপব্যয় করতে হল। তবে যুদ্ধের পর আর একটি দিনও নয়।

সেই কোম্পানিটার নাম ছিল 'হ্যারিস-ফরবেস···'। সেখানেই এক-টানা আঠার বছর। শুরু করেছিলেন সামান্য একজন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে। কিন্তু, '৩৩ সনে কোম্পানিটি যখন উঠে যায় তখন তিনি তার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। পরিচিতরা বলেন—ব্ল্যাক এমন অবিশ্বাস্য উন্নতি করতে পেরেছিলেন কারণ, 'হি সোড রিয়াল ন্যাক ফর সেলিং!'

বিক্রির কৌশল জানতেন। সুতরাং নতুন খদ্দেরের অভাব হল না। পুরানো কোম্পানির ডাইরেক্টাররাই নতুন করে কোম্পানি গড়ে ফেললেন আর একটা। এ কোম্পানির নাম—

'স্টার্কওয়েদার'। তৎসহ নিউইয়র্কের 'চেস ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক'। ব্ল্যাক তাদের দু' নম্বর ভাইস প্রেসিডেণ্ট। কিন্তু ওয়াল স্ট্রীটে তিনি এক নম্বর। কারণ, জনশ্রুতি, বণ্ড মার্কেট ওঁর নখদর্পণে।

এই খ্যাতির কারণেই '৩৬ সনে হোয়াইট হাউসের আমন্ত্রণ এসেছিল একবার। ওঁরা ব্ল্যাককে অর্থ-দপ্তরে আণ্ডার সেক্রেটারীর পদে বসতে অনুরোধ জানালেন। ব্ল্যাক রাজীও হয়েছিলেন। কিন্তু বেশী দিন তিনি থাকতে পারেননি সেখানে। কারণ, হোয়াইট হাউস আর ওয়াল স্ট্রীটে মতভেদ। ওয়াল স্ট্রীটের আগন্তুক আবার নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়েছিলেন।

'৪৭ সনে সেখান থেকেই তাঁকে ডেকে এনেছিলেন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান। ব্ল্যাককে তিনি 'ইণ্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রি-কনস্ট্রাকশান অ্যাণ্ড ডেভলাপমেণ্ট'এর আমেরিকান অংশের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টার নিযুক্ত করলেন। ইউজিন ব্ল্যাক আজও সেখানেই আছেন। '৪৪ সনে ব্রিটনউডস সম্মেলনে জাত সেই ব্যাঙ্কটিই এখন বিখ্যাত ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এবং সেই ব্ল্যাক সাহেবই এখন তার বিখ্যাত প্রেসিডেণ্ট। উল্লেখযোগ্য, এ পদে তিনি তৃতীয় ব্যক্তি এবং ১৯৪৯ সন থেকে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি।

খবর: ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক-এর এই বিখ্যাত অধিপতিকে প্রেসিডেণ্ট কেনেডি সম্প্রতি স্মরণ করেছিলেন। উপলক্ষ—কাশ্মীর। ব্ল্যাককে তিনি কাশ্মীর সমস্যার একটা ফয়সলা করার জন্যে দু' পক্ষকে নিয়ে বসতে অনুরোধ করেছিলেন। ব্ল্যাক নাকি রাজীও হয়েছিলেন। কিন্তু ভাবতে অবাক লাগছে কি করে তিনি তা হলেন? কেননা, মার্কিন দেশে সম্ভবত ইউজিন ব্ল্যাক সেই মুষ্টিমেয় মানুষের অন্যতম যিনি জানেন পাকিস্তানের কোন নদীতে কত জল। কারণ খালের জলের মামলাটা তিনিই মিটিয়েছিলেন। অবশ্য, এগার বছরের চেষ্টায়। জলের মত সহজেই যখন অবস্থা এমন, তখন ডাঙায় কি হতে পারে ব্ল্যাক কি তা ভেবেছেন? না কি সব জেনেও সেলসম্যান রাজী ছিলেন সে কারণে যে কারণে চিরকাল ওঁরা রাজী হন,—নতুন কোন মতলব বিক্রির চেষ্টায়!

১. ২. ৬২

ব্যানার্জি, পূর্ণেন্দু কুমার

বয়স খুব বেশী নয়,—চুয়াল্লিশ। সুতরাং, ওঁর কাছে যাঁরা ক্লাস নিয়েছেন এমন ছাত্র যেমন কলকাতায় অনেক

আছেন, তেমনি ওঁকে যাঁরা পড়িয়েছেন তাঁদেরও কেউ কেউ এখনও জীবিত আছেন। দু' দলেই বলেন—কি ছাত্রের ডেস্কে, কি শিক্ষকের টেবিলে কিংবা সেনেটের সভাঘরে—লোকটি সত্যিই একটু অন্যরকম ছিলেন। চোখে পড়ার মত।

ভবানীপুরের ঐতিহাসিক মুখার্জী বাড়ির নিকট আত্মীয়। বিখ্যাত পি. এন ব্যানার্জির পুত্র। নাম—পূর্ণেন্দু। দিল্লির বৈদেশিক দপ্তরের লোকেরা বলেন—ডক্টর ব্যানার্জি।

লেখাপড়া—কলকাতায়, নিউ-ইয়র্কে এবং হার্ভার্ডে। শ্বশুরালয়—বাংলার বাইরে। কাজ করতেন—ল' কলেজে। আর করতেন শ্রমিক আন্দোলন। বি. এন. রেল, প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তাঁর।

স্বাধীনতার পরে ল' কলেজ তথা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে যোগ দিলেন—পররাষ্ট্র দপ্তরে। সুন্দর চেহারা, তরুণ বয়স, বর্ণাঢ্য ছাত্র এবং শিক্ষক-জীবন। তদুপরি প্রণীত পুস্তকাদি (যথা: 'ইতিহাসের পাতা,' 'নিরস্ত্রীকরণ…', 'আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা' ইত্যাদি) থেকে বোঝা যায় আন্তর্জাতিক বিষয়ে জ্ঞান এবং উৎসাহও অসাধারণ। সুতরাং, অচিরেই কানাডায় অস্থায়ী হাই-কমিশনার নিযুক্ত হলেন কলকাতার পূর্ণেন্দুকুমার। তার পর সেখান থেকে বদলী হয়ে 'য়ুনো'তে। স্বদেশের হয়ে জাতিসঙ্ঘের নানা কাউন্সিলে, কমিশনে বিবিধ পদে।

'৫৫ সনে দিল্লিতে ফিরে আসার পর দু' বছর সেখানেই ছিলেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের কনফারেন্স বিষয়ক বিভাগে। তারপর '৫৮ সনের জুলাইয়ে চলে গেলেন ঢাকায়। '৫৯ সনের জুন অবধি পূর্ণেন্দুবাবুই ছিলেন সেখানে আমাদের ডেপুটি হাই কমিশনার।

পাকিস্তান থেকে জাপান। সেখানে দূতাবাসে নানা পদে কাজ করার পর, অবশেষে পূর্ণেন্দুকুমার এবার এসেছেন চীন। উপস্থিত তিনি সেখানে 'চার্জ দ্য এফেয়ার্স অব ইণ্ডিয়া'। চীনে আপাতত আমাদের কোন রাষ্ট্রদূত নেই। খবরটা তাই শোনবার মত।

৫. ১০. ৬১

ব্রেজনেভ, লিওনার্দ

ঘটনাটা আকস্মিক নয়। অপ্রত্যাশিত নামটা। রাজকার্যে প্রমোশন এবং ডিমোশন স্বাভাবিক ঘটনা। বিশেষত, মার্শাল ভরোশিলফ যে অস্তায়মান রুশ-গৌরব বহিতুনিয়ার

সোবিয়েত-আবহাওয়া বিশারদরা পূর্বাহ্ণেই তার আভাস পেয়েছিলেন। এমন কি আমাদের দেশের প্রোটকল সাবধানী সাংবাদিকেরা পর্যন্ত। প্রেসিডেন্টের সঙ্গী হয়ে যাঁরা এসেছিলেন বলা-বাহুল্য, পদগৌরবে তাঁরা সকলেই তাঁর অধস্তন। কিন্তু পাবলিসিটি গৌরবে এদেশে সেই ব্যবধানটা ততখানি ছিল কি ?

সুতরাং ক'মাসের মধ্যেই দেখা গেল লেনিনের সহকর্মী, স্ট্যালিনের সহযোদ্ধা এবং বলশেভিক পার্টির প্রবীণতম সেবক মার্শাল ভরোশিলফ সুপ্রিম সোবিয়েতে তাঁর পদত্যাগ পত্র পেশ করছেন। কারণ, তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছে না। উনআশি বছর বয়সে কৈফিয়তটি খুবই সম্ভব। কিন্তু শুধুই কি শরীর ? পণ্ডিতেরা বলেন,—এর সঙ্গে মনও একটা কারণ। ভরোশিলফ মনে স্ট্যালিন যুগের মানুষ, মেজাজে সৈন্যবাহিনীর বন্ধু এবং কর্ম-জীবনে মোলটভ প্রভৃতির অন্তরঙ্গ সহচর। সুতরাং ক্রুশ্চফ-পরিবারের শীর্ষে অনেকদিন থাকলেও তাঁর পক্ষে চিরকাল থাকা শোভা পায় না। সম্ভবও হয় না।

সুতরাং ক্রুশ্চফ পদত্যাগ পত্রখানি হাত পেতে গ্রহণ করলেন। বৃদ্ধ মার্শালকে একবাক্যে সবাই প্রশংসা করলেন। নিকিতা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন সুপ্রিম সোভিয়েতের সভাপতির পদে আমি কমরেড শ্রীলিওনার্দ ব্রেজনেভ-এর নাম প্রস্তাব করছি। তিনি একজন 'আউটষ্ট্যাণ্ডিং লীডার'। সুতরাং আমি আশা করি—! প্রেসিডিয়ামের চৌদ্দজন সদস্য একযোগে হাত তুলে সমর্থন জানালেন তাঁকে। উনআশি বছরের বৃদ্ধের স্থানে বসলেন তিপ্পান্ন বছরের প্রৌঢ়। নাম তাঁর—লিওনার্দ ব্রেজনেভ।

ব্রেজনেভ এখনও বাইরের দুনিয়ায় প্রায় অপরিচিত সোবিয়েত নায়ক। যতদূর জানা যায় ভরোশিলফের মত তিনিও ইউক্রেনের লোক। '৪৭ থেকে '৪৯ অবধি সেখানেই ক্রুশ্চফের বিশ্বস্ত সহচর হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। তাঁর সরকারী কর্মক্ষেত্র অবশ্য কাজাকিস্থান। শোনা যায়, তাঁর সার্ভিস বুকে আর যাই থাক, ডি-স্ট্যালিনাইজেশন সম্বন্ধে কোন দ্বিধা ছিল না এবং ছিল না মলোটভ বা মেলেনকফ-এর মত ক্রুশ্চফ সম্পর্কে কোন সংশয়।

১৪. ৫. ৬০

[১৯৬৪ সনের অক্টোবরে ক্রুশ্চফের আকস্মিক পতনের পর ব্রেজনভ পার্টির প্রথম সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত হন।]

ব্রেজনেভ, লিওনার্দ

অস্তের পর উদয় নয়,—যুগপৎ উদয় এবং অস্ত। মনের আকাশ থেকে ক্রুশ্চফ মুছতে না মুছতে রুশ আকাশ জুড়ে উদিত হয়েছে নতুন মুখ—ব্রেজনভ। আনকোরা নতুন নয়, চেনা চেনা। দু'দণ্ড ভাবলে সব মনে পড়ে যাবে,—তখন মনে হবে চেনা চেনা নয়, ইদানীং রীতিমত সুপরিচিত। কেননা, ক্রুশ্চফকে চিনতে হলে তখন লিওনার্দ ব্রেজনভকেও চিনতে হত। জন্ম—রুমানিয়া সীমান্তের মলডাভিয়ায়। বলেন,—আমরা পাঁচ পুরুষ ধরে ইস্পাত শ্রমিক। জন্ম—১৯০৬ সনে। কর্মভূমি প্রধানত ইউক্রেন। ব্রেজনভ এঞ্জিনীয়ার। দল সূত্রে ক্রুশ্চফের সঙ্গে বন্ধুত্ব তাঁর ১৯৩৮ সন থেকে। ক্রুশ্চফ তখন ইউক্রেনের নেতা, ব্রেজনভ তাঁর অনুরাগী সহযোগী। যুদ্ধের সময় ক্রুশ্চফ যখন একজন লেঃ জেনারেল, ব্রেজনভ তখনও তাঁর পাশে পাশে। ক্রুশ্চফ মস্কোর পথিক হলেন। পেছনে পেছনে ব্রেজনভও। ১৯৫২ সনে তিনি প্রেসিডিয়ামে জায়গা পেয়ে গেলেন। '৫৪ সনে ক্রুশ্চফ তাঁকে পাঠালেন কাজাকিস্থান। নির্দেশ—সেখানকার কৃষি সংগঠন নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। সফল ব্রেজনভ বিজয়ীর গৌরব নিয়ে আবার ফিরে এলেন মস্কো। তারপর থেকে ক্রমেই তিনি উদীয়মান তারকা। '৬০ সনে প্রেসিডিয়ামের সভাপতি, '৬৩ সনের জুনে পার্টির অন্যতম সেক্রেটারী,—এবং অবশেষে '৬৪র অক্টোবরে পার্টির প্রধান। ব্রেজনভ এখন রুশ দেশের সর্বেসর্বা। অবশ্য এ রুশ রকেটটিও যদি 'টু-স্টেজ' বা 'ত্রিস্টেজ' হয় তবে অন্য কথা।

আজীবন ক্রুশ্চফ-বান্ধব ব্রেজনভ চেহারায় এবং আচরণে কোন দিক থেকেই দ্বিতীয় ক্রুশ্চফ নন। তিনি সুপুরুষ, মজবুত, ধীর, স্থির, হিসেবী। তবে সৌখীনতায় তিনি নাকি 'গ্রে ফ্লানেল কমিউনিস্ট',—রীতিমত বাবু। তিনি সিল্কের জামা পরেন, ইতালীয়ান নেকটাই পছন্দ করেন, পশ্চিমী পোষাকেই তাঁর অধিকতর মন। এমনকি তিনি নাকি মাঝে মাঝে মাথায় সুবাসিত তেল পর্যন্ত মাখেন। নেশা তাঁর পুরানো ঘড়ি এবং গানাদার পাখি সংগ্রহ, তারপর শিকার আর সাঁতার। ব্রেজনভ বহু দেশ ঘুরেছেন (১৯৫৬ সন থেকে ১৪ বার), একবার আমাদের দেশেও এসেছিলেন। আমাদের দেশে তখন গোয়া অভিযান। তবে তার চেয়েও দরকারী খবর, ব্রেজনভ ক্রুশ্চফ বিরোধী হলেও ক্রুশ্চফ-পন্থী। ২২. ১০. ৬৪

ভঞ্জ দেও, প্রবীরচন্দ্র

মহারাজাকে রাজধানীতে ডেকে পাঠান হল। সর্দার প্যাটেল বললেন, —'না, হায়দ্রাবাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া চলবে না আপনার।'

মহারাজা বললেন—'কেন' ?

'কারণ, রাজ্যটা আপনার নয়, আমাদের'—গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। '—বাস্তারে অনেক খনিজ সম্পদ, ভারতের স্বার্থে তা আমাদের হাতে থাকা প্রয়োজন।'

মহারাজা বললেন—'আজ্ঞে—'

সর্দার বললেন—'দেখবেন, যেন তার অন্যথা না হয়।'

অন্যথা হয়নি। মধ্যপ্রদেশের আর চৌদ্দটা ছত্রিশগড় রাজ্যের মতই যথা-সময়ে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়েছিল পঞ্চদশ রাজ্য—বাস্তার।

যোগ দিয়েছিল বটে কিন্তু সে শুধু খাতায় কলমে। মনে মনে বাস্তার চিরকালের সেই সমস্যার দেশ। ভি পি মেনন লিখেছেন—১৮৯১ থেকে ১৯০৮, ১৯২১ থেকে ১৯২৮ এবং ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৭—বাস্তার চিরকালের 'গোল-মেলে দেশ।' এবার গোলমাল নাকি প্রায় সংকটের পর্যায়ে। কেননা, মহা-রাজা যেন ক্রমেই আপসবিরোধী।

মহারাজা। বাস্তারের মহারাজা। আদিবাসীর দেশে সে এক আশ্চর্য রাজপুত রাজা। বাস্তারের অরণ্যচারী মানুষ কোনদিন দেখেনি তাঁকে। কিন্তু যেদিন দেখেছে, সেদিন থেকেই তারা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। শত্রুরাও স্বীকার করেন—মহারাজা জনপ্রিয়।

নাম—প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জ দেও। বয়স—তিরিশের কিছু উপরে। যোগীদের মত চুল, সন্ন্যাসীর মত সাদাসিধে বেশ। অথচ, মহারাজা আজীবন 'সাহেব-লোক।' ক'বছর আগেও আদিবাসী কেন, নিজের মাতৃভাষাটাও জানতেন না ভঞ্জ দেও। কারণ, বাল্য থেকেই তিনি বিলেতে মানুষ। দেশে এসেছেন স্বাধীন হওয়ার পরে পরেই। এসেই শুরু হয়েছে তাঁর নিজের স্বাধীনতা-যুদ্ধ।

প্রথমে হিন্দীটা শিখতে হল। তারপর রাজ্যটা ঘুরে বেড়ালেন এবং অবশেষে হায়দ্রাবাদের বৃটিশ পলিটি-ক্যাল অফিসারের সঙ্গে সলা করতে

বসলেন। সর্দার প্যাটেল তা বন্ধ করলেন। মহারাজা মধ্যপ্রদেশ সরকারের সঙ্গে পাঞ্জা কষতে শুরু করলেন। রবিশঙ্কর শুক্ল তখন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মহারাজার সম্পত্তিটা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে তুলে দিলেন। আদেশ রইল—মহারাজাকে মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। সেটা তাঁর মাসোহারা।

হেরে গিয়ে ভঞ্জ দেও শাস্তির নিশান ওড়ালেন। তিনি কংগ্রেসে নাম লেখালেন। ভোট পাওয়া গেল বিস্তর, কিন্তু ভেটস্বরূপ রাজ্যটা আর পাওয়া গেল না। সুতরাং কংগ্রেস টিকিটটা ছিঁড়ে ফেলাই ভাল। ভঞ্জ দেও পদ-ত্যাগ করলেন। আবার নির্বাচন। এবার তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তাঁর নতুন দল। নাম—আদিবাসী সেবাদল। সেবাদলের কাছে হেরে গেল কংগ্রেস। মহারাজা জয়ী হলেন। সেই থেকে নিত্য নতুন যুদ্ধ পরিকল্পনা তাঁর মাথায়। পিছনে অগুন্তি ধনুর্ধারী সৈন্য-সামন্ত। তারা বলে—মহারাজা আমাদের রাজা। কিন্তু প্রশ্ন: কি করে এমন জনপ্রিয় হলেন তরুণ রাজা।

উত্তরটা দ্বিবিধ। একদিকে এক দলের অযোগ্যতা, অন্যদিকে প্রবীর-চন্দ্রের আশ্চর্য যোগ্যতা। নানা জাতির আদিবাসীর সঙ্গে তাদের নিজ নিজ ভাষায় কথা বলেন—ভঞ্জ দেও। দ্বিতীয়ত—ধর্মপ্রাণ রাজা যাঁকে নিজের গৃহদেবতা করেছেন সেই দান্তেশ্বরী আসলে আদিবাসীদের দেবতা। তৃতীয়ত, দরকার হলে প্রবীরচন্দ্র নগদ ধরে দিতেও জানেন। তিন বছর আগের কথা। রাজবাড়ীতে সেদিন মস্ত জমায়েত। কি ব্যাপার? না, দান হবে।

প্রজাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে 'একশ টাকার' নোট বিলোলেন ভঞ্জ দেও। প্রত্যেকের ধারণা, সবাই নিশ্চয় একটা করে পেয়েছে। কিন্তু ভঞ্জ দেও জানেন,—বেশী হলে পেতে পারে মাত্র উনিশ হাজার! কেননা, তাঁর হাতে তাই ছিল সেদিন। কয়েক লক্ষ মানুষের মাথা কেনার পক্ষে দামটা নিশ্চয় বেশী নয়।

২২. ১২. ৬০

ভঞ্জ দেও, বিজয়চন্দ্র

'He nearly murdered his younger sister before her marriage because she refused to bow to his immoral cravings."

ভঞ্জ দেও, বিজয়চন্দ্র

অবিশ্বাস্য ঘটনা। তা হলেও বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কেননা, চিঠিটা যিনি লিখেছেন তিনি মেয়েটির বাবা। এবং যার সম্পর্কে লিখেছেন —সেও তাঁরই সন্তান! নাম তার—প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জদেও। পরিচয়—বাস্তারের রাজা!

'৫২ সনের অক্টোবরে রাজ-কাহিনী তথা পুত্রের গুণ-বিবরণী দিয়ে পণ্ডিতজীকে চিঠি লিখেছিলেন বৃদ্ধ বাবা,—পণ্ডিতজী, ও ছেলের হাত থেকে আপনি আমাকে বাঁচান! বাস্তারকে বাঁচান!—ও উন্মাদ!

অবশেষে প্রায় দশ বছর পরে পিতার সেই গোপন আর্তনাদ দেশের কানে পৌঁছাল। 'উন্মাদ' কারাগারে স্থান পেল। রাষ্ট্রপতির আদেশে প্রবীরচন্দ্র আজ বাতিল রাজা। তাঁর সাধের আসনটিতে আজ নতুন মহারাজ।

সুন্দর চেহারা। চোখে মুখে এখনও তারুণ্য। প্রবীরচন্দ্রেরই ছোট ভাই। নাম—বিজয়চন্দ্র ভঞ্জ দেও।

ভঞ্জ দেওরা আসলে রাজস্থানের লোক। অবশ্য দক্ষিণও আছে আজ তাঁদের মধ্যপ্রদেশে প্রবাসী সংসারে। ওঁদের পদবী—কাকতীয়।

বাবা প্রফুল্লচন্দ্র সন্তানদের অনুকূলে রাজ্য ছেড়েছেন অনেক দিন। তাঁর বড় ছেলে প্রবীরচন্দ্রই ছ' বছর বয়স থেকে দেশের রাজা। '৪৭ সনে ভারত সরকার যখন তাঁকে প্রথম দেখেন তখন তাঁর বয়স মোটে আঠার।

দাদার মত তেমন কম বয়সে বসতে পারলেন না বটে, তবে বিজয়চন্দ্রের বয়স এখনও রীতিমত কম। তিনি এখনও সাতাশের ঘরে।

তবে বয়সে কম হলেও বুদ্ধিতে নাকি ছেলেটি কাকতীয়দের মত। সাহসী এবং বিচক্ষণ।

সাহসিকতা মানে যে বেপরোয়া যদৃচ্ছতা নয় নতুন রাজা তা জানেন। কেননা, চোখের সামনে তিনি দাদাকে দেখেছেন।

আর দেখেছেন বাবাকে। রাজ্যহীন প্রফুল্লচন্দ্র এই সেদিন অবধিও ছিলেন বাস্তারের বিশিষ্ট 'প্রজাতন্ত্রী'। রাজ্যসভায় বিরোধী দলের আসনে নিয়মিত ভাবে দেখা যেত তাঁকে! এই ছেলেটি মনোগড়নে নাকি সেই পিতারই কাছাকাছি। অবশ্য, এখনও তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক মতামত নেই কোন।

সুতরাং আশা করা যায় ছাব্বিশ বছর আগে প্রবীরকে সিংহাসনে বসিয়ে যে বিভ্রাটের সূচনা হয়েছিল

এবার তা শেষ হবে। লোকে বলে—সে সম্ভাবনাই বেশী। কারণ প্রিভি-পার্সের বরাদ্দটা এবার কম। কদিন আগেও ছিল তা—দুই লক্ষ দশ হাজার, এখন মোটে—দেড় লক্ষ!

২. ৩: ৬১

ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র

"I promise to pay the bearer on demand the sum of……"

সাদা কাগজে লেখা হ্যাণ্ডনোট নয়, হুণ্ডি নয়,—চেকও নয়। চমৎকার কাগজ, চমৎকার ছাপা, অশোকস্তম্ভ খচিত চমৎকার ডিজাইন। উল্টো পিঠে নানা ভাষায় লেখা রয়েছে টাকার অঙ্কটা। আগরতলা থেকে শুরু করে আমেদাবাদ, যেখানে খুশী চালিয়ে যান, মুদিওয়ালা থেকে শুরু করে ইনকাম ট্যাক্সওয়ালা যাকে খুশী দিয়ে যান; দেখবেন, কাগজ বটে, কিন্তু কেউ তবুও কিছু বলছে না। কেন বলছে না জানেন? কারণ ঐ প্রতিশ্রুতিটির নীচে ওঁর নিজের হাতের সই রয়েছে বলে! নজর করবেন, ক'দিন বাদেই দেখতে পাবেন, এই সইটি যাঁর তিনি জনৈক—পি. সি. ভট্টাচার্য। যদি পারেন, এই নোট এক আধখানা রেখে দেবেন। কেননা, বড় নোটের গায়ে বাঙ্গালীর এই প্রথম স্বাক্ষর। 'পি সি' রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার প্রথম বাঙালী গবর্ণর।

পুরো নাম—পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। গাঁয়ের নাম—সুখহারি, মহকুমা—নেত্রকোণা, জেলা—ময়মনসিংহ। বাবা ওকালতি করতেন জেলা শহরে। ছেলে পড়তেন প্রথমে মৃত্যুঞ্জয় স্কুলে, তারপর জেলা স্কুলে।

সহপাঠীরা ভেবেছিলেন—পরেশ সোমেশ বসু হবে, নয়ত আনন্দমোহন। কেননা, অন্য ছেলেরা প্রশ্নটা পড়তে না পড়তেই তাঁর অঙ্ক শেষ!

তবুও এক বছর বসে থাকতে হল। অপরাধ—'আণ্ডার এজ'! কর্তৃপক্ষ সে বছর (১৯১৮) ওঁকে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দিলেন না। পরেশ এনট্রান্স পাশ করলেন পরের বছর। (জন্ম—১৯০৩)।

দু' বছর পরে আনন্দমোহন কলেজ থেকে পাশ করলেন এফ. এ। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে বি. এ এবং এম. এ। গণিত ক্রমেই যেন তাঁর আরও প্রিয় বিষয়।

১৯২৮ সন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান গণিতের ছাত্র পরেশচন্দ্র

ভরোশিলফ, মার্শাল ক্লিমেন্তি

ভারতীয় অডিট এবং অ্যাকাউন্টস সার্ভিস-এর পরীক্ষা দিলেন। ইতিমধ্যে কিছুদিন তিনি গণিতের অধ্যাপনাও করেছেন। সরকারী চাকুরিতে বাসনা নেই। বাসনা ছিল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাটাই! কিন্তু ফল বের হওয়ার পর মনের সে ইচ্ছার কথা আর প্রকাশ করা গেল না। অডিট সার্ভিস ওঁকে লুফে নিয়ে চলে গেল।

'২৮ থেকে '৩৯ সন অবধি ছিলেন রেলওয়ে একাউন্টস সার্ভিস-এ। '৩৯ থেকে '৫২ সন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের নানা পদে। '৫২ সনে রেলওয়ের ফিনান্স কমিশনার নিযুক্ত হলেন তিনি, '৫৫ সনে নিযুক্ত হলেন কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের সেক্রেটারী। '৫৭ সন অবধি শ্রীভট্টাচার্য ঐ পদে ছিলেন। তারপর থেকে এতদিন তিনি ছিলেন —স্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান। এবার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর।

'—কে, পরেশ?—পরেশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর হল?' সওদাগরী অপিসের একজন প্রবীণ কেরাণী খবরটা শুনে এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তাঁর পরিষ্কার চশমার কাচটা মুহূর্তে ঝাপসা হয়ে উঠেছিল।

'—আপনি বুঝি ওঁকে চিনতেন?'

'—ক্লাস ফ্রেণ্ড ছিলাম, সুতরাং সেটা বড় কথা নয়;—বিস্ময়কর ঘটনা পরেশ এখনও আমাকে চেনে! কিছুদিন আগে মেয়ের বিয়ে হল, শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, আমাকেও নেমন্তন্ন করে পাঠাল! ভাবছি এত বছর পরে আমাকে ও কি করে খুঁজে বের করল!' পরেশবাবুর আন্তরিকতা এবং বন্ধুত্ব বন্ধুদের কাছেও রহস্য।

৭. ৯. ৬১

ভরোশিলফ, মার্শাল ক্লিমেন্তি

দু' বছর আগে স্ত্রী মারা গেছেন। সেই থেকে আশী বছরের বৃদ্ধ মার্শাল একা একা নিজের বাড়ীতেই থাকেন। বাড়ীতে মানে, মস্কোর উপকণ্ঠে একটি সরকারী 'ডেকা'য়। শিকার করেন, মাছ ধরেন, কখনো বা লাল ফৌজের পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে বসে বসে আড্ডা দেন। ক্রুশ্চফ পরামর্শ দিয়েছিলেন—বরং একটা কাজ কর, —একটা স্মৃতিকথা লেখ।

হাত দিয়েছিলেন কিনা জানি না, দু'চার পাতা লেখা হয়ে থাকলে তাও বোধ হয় আর কোনদিন কারও পড়া হবে না। কেননা, মার্শাল ভরোশিলফ আজ নিজেই 'ইরেজারে'র মুখে। কখনও শোনা যাচ্ছে লাঞ্ছিত বলশেভিক নিজেই নিজেকে

সরিয়ে নিয়েছেন, কখনও বা শোনা যাচ্ছে নতুনতর অপমান এই পালিত-কেশ বৃদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করছে। —অন্ধকার বিজয়ীরা যে করে হক গতকল্যের এই বীরকে গণমন থেকে মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর!

—কিন্তু তা সম্ভব কি?

১৮৮১ সনে রাশিয়ায় ভূমিষ্ঠ হয়ে যে শ্রমিক নন্দন ১৮৯৯ সনে কারখানায় ধর্মঘটের হেতু হতে পারে, সুদূর ১৯০৩ সন থেকে যিনি রেল শ্রমিক হিসেবে পাকাপোক্ত বলশেভিক, যাঁকে বহুবার কারা এবং নির্বাসন দণ্ড দেওয়া সত্ত্বেও ১৯০৫, ১৯১৭ সন থেকে শুরু করে গেল মহাযুদ্ধ পর্যন্ত প্রতিবারই লড়াইয়ের পুরোভাগে দেখা গেছে লেলিন-স্ট্যালিনের অন্যতম সহকারী, একদা লালফৌজের প্রধান সেনাধ্যক্ষ এবং সোবিয়েত দেশের রাষ্ট্রপতি (১৯৫২ মে, ১৯৬০) 'ক্লিম'কে কি সত্যিই পরিচ্ছন্নভাবে মুছে ফেলা সম্ভব?

কোট, মেডেল এবং বেল্টগুলো হয়ত কেড়ে নেওয়া যেতে পারে, বার্ধক্যের সুযোগে সভায় ডেকে এনে হয়ত কাঁদানোও যেতে পারে, এমন কি রুশ বিপ্লবের অন্যতম সেনা-নায়ককে (উল্লেখ্য: ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে 'ইস্ত মাইলোভেস্কি রেজিমেণ্ট' নামে জারের যে বাহিনীটি শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিল—তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ছিল ভরোশিলফের) হয়ত মঞ্চ থেকেও নামিয়ে দেওয়া চলতে পারে, —কিন্তু মার্শাল ভরোশিলফকে মুছে ফেলা যায় না। এমন কি ওঁর প্রথম যৌবনের কর্মভূমি লুগানস্ক-এর সেই রেল কারখানাটির নাম ভরোশিলফগ্রাদ থেকে পাল্টে আবার লুগানস্ক রাখলেও না। কেননা, রুশ বিপ্লবের ইতিহাসটা যখন একবার দুনিয়ার কাছে পরিবেশিত হয়ে গেছে তখন ভরোশিলফের নামটাও থাকছে।

প্রসঙ্গত এত কাণ্ডের আদি-কাণ্ডটাও উল্লেখযোগ্য। লোকে বলে ভরোশিলফকে এমন হেনেস্তা করার একমাত্র কারণ তিনি স্ট্যালিনের শবাধারে কাঁধ রেখে-ছিলেন। তবুও যে বেরিয়া, ম্যালেনকফ এবং মলোটফের বেশ কিছু দিন পরে তাঁর সম্পর্কে রায়টা ঘোষিত হল—তার কারণ, ওঁদের সঙ্গে কাঁধ মিলালেও ভরোশিলফ গলা মেলাননি। স্ট্যালিনের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি কোন বক্তৃতা করেননি। ৩০. ১১. ৬১

ভাবা, ডঃ এইচ. জে.

ভারতবর্ষ ভেল্কির দেশ। আমরা বলি—বিজ্ঞানের দেশও। ওঁরা বলেন—সে 'ওকাল্‌ট সায়েন্স।' তর্ক না করে এটুকু স্বীকার করে নেওয়া ভাল যে আমাদের সনাতন দেশে আধুনিক বিজ্ঞান সেদিনের ঘটনা। তাতে আজ অন্তত আর লজ্জার কারণ নেই, কেননা, আমাদের শুধু টাটা নয়, ট্রম্বেও আছে। এবং এই সর্বশেষ বিজ্ঞানে আমাদের যা আছে এশিয়ার আর কারও নাকি তা নেই।

এতবড় একটা খবর আমরা আজ রটাতে পারছি যাঁদের কারণে—তাঁদের অন্যতম ব্যক্তিটি কিন্তু নিজের কথা একদম রটাতে ভাল বাসেন না।

গভীর আয়ত চোখ, প্রশস্ত মুখ। নাম—হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা। 'ইণ্ডিয়াস ভাবা' বিদেশে সুখ্যাত পুরুষ। তিনি 'ইণ্টার ন্যাশন্যাল কমিশান ফর পিসফুল ইউজ অব অ্যাটমিক এনার্জি' নামক একালের কর্তব্যপরায়ণ বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি এবং 'ইণ্টার ন্যাশন্যাল অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন'-এর একজন সদস্য। আর আর সদস্যরা বলেন—ভাবা যখন কথা বলেন তখন অনুমান করাও দুঃসাধ্য যে শান্তি ছাড়া আনবিক শক্তির অন্য কোন লক্ষ্য থাকতে পারে! গরীব দেশের বৈজ্ঞানিক ভাবা সব দেশের মানুষের বন্ধু।

ছাত্র জীবন কেটেছে বোম্বাই এবং কেম্বিজে। 'আইজাক নিউটন বৃত্তি' সহ ভারতীয় ছাত্র ভাবা অনেক বৃত্তি ভোগ করেছেন বিদেশে। পরবর্তী-কালে অন্যতর সম্মানও ভোগ করেছেন বহুবিধ। রয়েল সোসাইটি সহ তিনি বহু বিদেশী বিদ্বৎসভার সদস্য। এবার তাতে আবার নূতন সম্মান যুক্ত হল।

কর্মজীবন কেটেছে প্রধানত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স-এ, এবং টাটা ইনষ্টিটিউট অব ফাণ্ডা-মেণ্টাল সায়েন্স-এ। উপস্থিত তিনি ট্রম্বের ডিরেক্টর, আমাদের অ্যাটমিক এনার্জি ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী এবং অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান। একান্ন বছর বয়স্ক বৈজ্ঞানিক ভাবা—এই সব কারণে আজ আমাদের জাতীয় সম্পদ।

বিজ্ঞানের জগতে একালে আমাদের জিনিস পরিমাণে বড়

কম। তবুও ভারতবর্ষ অশোকের দেশ। সন্ন্যাসী অশোক ভিখারীকে আধখানা আমলকী দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—এই আমার সম্বল, এস দু'জনে ভাগ করে নিই। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রও আমলকীকে আদর্শ করেছিলেন। তাঁর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অলংকরণে আমলকী দেওয়া নেওয়ার প্রতীক!

আমাদের ভাবাও তা-ই। তাঁর মারফতে আমরা যেমন নিতে পারি, তেমনি দিতেও পারি।

৪. ৮. ৬০

ভাবে, আচার্য বিনোবা

শুরু সেই তেলেঙ্গনায়,—নলকুণ্ডা জেলার পচনপল্লী গাঁয়ে। ১৯৫১ সনের ১৮ই এপ্রিলের ভোরে। পদযাত্রী বিনোবা আজও হাঁটছেন। তাঁর পাকাঠির মত শীর্ণ পা দু'খানির কাছে শঙ্করাচার্য হেরে গিয়েছেন, রেলপথ লজ্জায় ছোট হয়ে গেছে এবং মানুষ মানুষের দিকে তাকিয়ে বলছে তাহলে সত্যিই আমরা এত বড়! বিনোবা যুগকে জিজ্ঞাসায় ফেলেছেন। ভিখারীর শূন্য ঝুলিতে আজ লক্ষ লক্ষ একর জমি, গোটা গোটা গাঁ। নিঃসঙ্গ পথিকের পেছনে আজ সহস্র মানুষের পদধ্বনি। বিনোবা যেন এযুগের 'ম্যাজিক পাইপার।'

হাঁটতে হাঁটতে যাদুকর এসে আজ যেখানে দাঁড়িয়েছেন সেখানে তাঁর পদযাত্রার কঠিনতম পরীক্ষা। উত্তর প্রদেশ আর মধ্যপ্রদেশের সীমানায় ঘন বন। বনে যোড়শ শতক ধরে আইনহীন অন্ধকার। রূপা, লক্ষ্মণ, মানসিং, পুতলী আর তাদের সুগঠিত দস্যুবাহিনীর রাজত্ব সেখানে। তারা আইন মানে না, জীবনের মূল্য জানে না। অন্তত, পুলিসের সুদীর্ঘ রেকর্ড তাই বলে। কিন্তু বিনোবা বলেন—সে কথা ভুল। তিনি বিশ্বাস করেন—এদের এখনও হৃদয় আছে, সমাজের লোভ আছে, শান্তির বাসনা আছে। নুড়ি কুড়ানোর মত তাই তিনি এদের পতিত হৃদয়কেও মমতার হাতে কুড়াতে চান। চম্বল নদীর ধারে, জনহীন গাঁয়ের প্রান্তে নিঃসঙ্গ অশ্বত্থের তলে তাই তিনি ছাউনি পেতেছেন। হৃদয় দিয়ে হৃদয় ধরা তাঁর সঙ্কল্প।

অদ্ভুত সঙ্কল্প। দশ বছরের ছেলে প্রতিজ্ঞা করেছিল—বিয়ে করব না, জুতো পরব না, চিনি খাব না। বাবা ছিলেন বরোদার রাজ-সরকারের

পদস্থ কর্মচারী। ছেলের মতিগতি দেখে বরোদা কলেজ থেকে তাঁকে পাঠালেন বোম্বাই, কিন্তু বিনোবা পালিয়ে এলেন বাংলায়। বাংলা থেকে কাশী। এবং ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে ১৯১৬ সনে গান্ধীজির আশ্রমে। বাবা খুঁজছিলেন। গান্ধীজি জানালেন: আপনার ছেলে আমার কাছে। বাবা নাম রেখেছিলেন বিনায়ক। বাপু নাম দিলেন—বিনোবা। বিনোবা সেই থেকে গান্ধীশিষ্য।

অদ্ভুত মানুষ। ষোলটা ভাষা জানেন। কিন্তু বই পড়েন মাত্র তিনটা। গীতা, ঈশপস-ফেবল, আর ইউক্লিডের জ্যামিতি। স্বাস্থ্যহীন রুগ্ন দেহ। উচ্চতা পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি, ওজন মাত্র পঁচাশি পাউণ্ড। তবুও ঔষধ খান না। খাদ্য—দু'বেলা দুই পেয়ালা দুধ। তাও চিনি ছাড়া।

ভারতবর্ষ নাকি ইতিহাসে রহস্যময় দেশ। চম্বল নদীর তীরে এই শীর্ণকায় মনুষ্য মূর্তিটিকে দেখে মনে হয়—তার চেয়েও রহস্যময় বোধহয় মানুষ নামক জাতিটি। তার কোলে এখনও বিনোবার মত মানুষও জন্মায়!

১৪. ৫. ৬০

ভুট্টো, জুলফিকার আলি

ওয়াশিংটন-লণ্ডন-দিল্লিতে এবং বিশ্বের সর্বত্র কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ মাত্রই যখন বিস্মিত, বিচলিত এবং চিন্তিত—তখন লোকলজ্জা তুচ্ছ করে অভিসারিকার ভঙ্গীতে এইমাত্র একজন পাকিস্তানী হাসতে হাসতে পিকিং-এ বাঁশের-চিকের আড়ালে গিয়ে বসলেন। বাইরে থেকে চিকের ফাঁকে যতটুকু চোখে পড়ছে, উপস্থিত তিনি পায়ে ঘুঙুর বাঁধছেন; অচিরেই পিকিং-অপেরার নয়াবাদ্যের তালে তালে তাঁর আসল নাচ শুরু হল বলে!

নাচতেই যখন নেমেছেন তখন ঘোমটাও নিশ্চয় এক সময় খসবে,—হুনজার কতখানি খয়রাতি হল, পানের ডিবেয় গিলগিটের কি কি ছিল তা নিশ্চয় জানা যাবে। কিন্তু তার আগে, কলকাতার প্রস্তাবিত চতুর্থ দরবারের পূর্বাহ্নে মেহমান জুলফিকার আলি সাহেবকে আর একদফা চিনে রাখা দরকার। কেননা, জনাব ভুট্টো সেই মেজাজের মানুষ যাঁর মন-মর্জি দু'চার বৈঠকে জানা যায় না।

জন্ম, অর্থাৎ এই নবপরিচয়ে আবির্ভাব,—মাত্র বছর চারেক আগে,

১৯৫৮ সনের আয়ুব-শাহের অক্টোবর-বিপ্লবের পরে। তার আগেও গেজেটে-কাগজে ভুট্টো ছিলেন একজন। কিন্তু তিনি জুলফিকার আলি নন, তাঁর পিতা লারকানার (সিন্ধু) বিখ্যাত জমিদার স্যার শাহনাওয়াজ ভুট্টো। বোম্বাইয়ের পুরনো বাসিন্দাদের অনেকেই এখনও হয়ত তাঁর কথা মনে রেখেছেন। প্রবীণ ভুট্টো তাঁর জায়গীরের পুরো টাকাটাই প্রায় সেখানে উড়াতেন। এক সময় বোম্বাই মন্ত্রিসভায় তিনি মন্ত্রীও হয়েছিলেন।

মন্ত্রী-তনয় হয়েও জুলফিকার কদাপি গদীর কথা ভাবেননি। কেননা, জীবনে তাঁর সত্যিই কোন প্রয়োজন ছিল না। ভাল ছাত্র ছিলেন। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েট হয়েছেন, অক্সফোর্ড থেকে এম. এ। তা ছাড়া লিঙ্কন ইন-এর ব্যারিস্টারের ছাড়পত্র। ভুট্টো তবুও অনেক দিন দেশে ফেরেননি। সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক আইন পড়াতেন তিনি। দেশে ফিরেছেন মাত্র '৫৩ সনে। তাও কোন রাজনৈতিক বাসনা হেতু নয়,—সম্পূর্ণ পেশাগত কারণে। সিন্ধুর মুসলিম ল' কলেজ তাঁকে টেনে এনেছিল, সেই সঙ্গে দ্বিতীয় আকর্ষণ ছিল—সিন্ধুর সর্বোচ্চ আদালতটি। আয়ুবের হাতে পড়ার আগে তরুণ ভুট্টো সেখানেই ছিলেন। কলেজে পরিচয় ছিল তাঁর অধ্যাপক, কোর্টে ব্যারিস্টার, বাইরে—পশ্চিম পাকিস্তানে অন্যতম বৃহৎ জমিদারীর মালিক,—জমিদার।

যেন, জমিদারী উচ্ছেদের ক্ষতি-পূরণ-স্বরূপই—আয়ুব ভুট্টোকে নিজের দরবারে তুলে নিলেন। চমৎকার চেহারা, প্রচুর লেখাপড়া,—তাছাড়া টাকা-কড়িও ঘেঁটেছেন বিস্তর; সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাঁর পদ হয়ে গেল—মিনিস্টার অব কমার্স। সেখান থেকে দেখতে দেখতে—জাতীয় পুনর্গঠন দপ্তর, তারপর—জ্বালানি ইত্যাদি, এবং অবশেষে এই ফেব্রুয়ারী থেকে—পররাষ্ট্র। মহম্মদ আলির আকস্মিক মৃত্যুর পর ভুট্টোই এখন রাওয়ালপিণ্ডিতে পহেলা উজীর,—আয়ুবের পরেই তাঁর ইমান।

বিদেশে-মানুষ ভুট্টো ইতিমধ্যে বহু দেশ দেখেছেন,—বহু বৈঠকে বসেছেন। সর্দার স্বর্ণ সিং, রুশ তেলের কারবারী দল, মার্কিণী রাষ্ট্র প্রতিনিধিগণ—যাঁদের সঙ্গেই বসেছেন তিনি, সবাই একবাক্যে

ভেরউর্ড, ডঃ হেনড্রিক ফ্রেন্সক

স্বীকার করেছেন—কথায়-বার্তায় মানুষটি সত্যিই চোস্ত আদমী। কিন্তু পিকিং থেকে ফিরে আসার পর যে ভুট্টোকে পাবে ওয়াশিংটন-লণ্ডন-দিল্লি—তিনি কি একই মানুষ ?

শুনেছি, অবসরে ইতিহাস-পড়া ভুট্টোর নেশা। তিনি নিশ্চয় জানেন,—ইতিহাসে এই খেলাগুলোর কি নাম এবং যাঁরা খেলে বা ক্রীড়নক হয়—ঐ পুঁথিগুলোর কোন্ অধ্যায়ে তাঁদের ধাম ! ২৮. ২. ৬৩

ভেরউর্ড, ডঃ হেনড্রিক ফ্রেন্সক

'তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল
অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধুলি তোমার রক্তে
অশ্রুতে মিশে,
দস্যু-পায়ের কাঁটা মারা জুতোর তলায়
বিভৎস কাদার পিণ্ড
চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত
ইতিহাসে।'

অন্তরঙ্গ আত্মীয়তায় আফ্রিকার ইতিহাস লিখেছিলেন বাংলাদেশের কবি। আফ্রিকা যে চিরকাল ঘুমিয়ে থাকবে না সে সংবাদও অগোচরে ছিল না তাঁর। তিনি জানতেন 'বনস্পতির নিবিড় পাহারা' এড়িয়ে আফ্রিকার অন্ধকার অন্তঃপুরেও একদিন সূর্যালোক এসে পৌছাবে। ম্যাকমিলান সাহেবের মত বনেদী সাম্রাজ্যশাসককুলের মানুষ যাঁরা তাঁরাও বলেন—আজ সেই দিন। আজ আফ্রিকার ঘুম ভাঙ্গার দিন। কিন্তু একজন মানুষ কিছুতেই বিশ্বাস করেননা সে কথা। তিনি ডাঃ হেনড্রিক ফ্রেন্সক ভেরউর্ড। আজকের দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী।

বিংশ শতকের এই ষষ্ঠদশকে কোন সমাজবিজ্ঞানী যদি চর্ম-মাহাত্ম্য নিয়ে গবেষণায় মত্ত হন, তবে অবশিষ্ট দুনিয়া তাঁকে নিয়ে হাসবে। কিন্তু বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের প্রখ্যাত ভূতপূর্ব-অধ্যাপক ভেরউর্ডকে নিয়ে হাসবার উপায় নেই। কেননা, তিনি নির্দোষ গবেষক নন, প্র্যাক্টিক্যাল শাসক। রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিটি ছত্র আজও তাঁর কারণেই ইতিহাস নয়।

বয়স উনষাট। উচ্চতা ছ'ফুট দু' ইঞ্চি। গাত্রবর্ণ সাদা। কালো পিগমী-দের দেশে ভেরউর্ড যে বহিরাগত সে কথা বলাই বাহুল্য। পিতা ছিলেন ডাচ। জন্ম—নেদারল্যাণ্ডে। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর পদার্পণ এই শতকের গোড়ার দিকে। মাঝখানে লেখাপড়ার জন্যে কিছু কাল ইউরোপবাসী হয়ে-ছিলেন ভেরউর্ড। কর্মজীবনও অংশত

ইউরোপে। তারপর থেকেই তিনি আবার দক্ষিণ আফ্রিকায়। ভেরউর্ড সেদিন দীর্ঘ এগার বছর একটি দৈনিক কাগজের সম্পাদক ছিলেন। যুদ্ধের সময়ে এই দুঃসাহসী কাগজটি ছিল নাৎসীদের সমর্থক। বাস্তহারা ইহুদী-দের দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থান দিতে যাঁরা অসম্মতি জানিয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সিনেটে তাঁর আগমন ঘটে ১৯৫০ সনে। সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশানে-লিস্ট পার্টির নেতারা তাঁকে নিযুক্ত করেন 'নেটিভ দপ্তরের' মন্ত্রী। গেল আট বছরে আইনের নানাবিধ যাঁতাকল উদ্ভাবন করার পর অবশেষে '৫৮ সনে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ভেরউর্ড আজ দক্ষিণ আফ্রিকায় যা করছেন—তাতে নিঃসন্দেহে জেনারেল স্মাটসও তাঁর কাছে পরাজিত। আজ তিনি সভ্যতার প্রকাশ্য লজ্জা, কমনওয়েলথ-এর শঙ্কা, এবং গোটা এশিয়া আফ্রিকার ঘৃণা। সিংহ আর হাতি কি সহাবস্থানে সক্ষম নয়? ভেরউর্ড দৃঢ় কণ্ঠে বলেন —'না।' যদি আফ্রিকানরাও তাই বলে? তিন লক্ষ সাদা বনাম একশ দশ লক্ষ কালোর সেই লড়াইয়ের পরিণতিটুকুর কথা ভেবেই 'নেকড়ের চেয়েও তীক্ষ্ণ নখওয়ালা' মানুষগুলোকে ক্ষমা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

১. ৪. ৬০

ভ্যালেরা, ডি.

'ইউ হ্যাভ বাট ওয়ান লাইফ টু লীভ, অ্যাণ্ড বাট ওয়ান ডেথ টু ডাই। সী দ্যাট ইউ ডু বোথ লাইক ম্যান!' —আবেগকম্পিত কণ্ঠে সহযোদ্ধাদের কর্তব্যে আহ্বান জানালেন তরুণ অধিনায়ক। ওঁরা প্রত্যেকে যেন অতঃপর এক একটি সিংহ। বৃটিশ বাহিনী ভাবতেও পারে নি মাত্র পঞ্চাশ জন 'সৌখিন' লড়িয়ে এতক্ষণ ধরে দু' মাইল রেলপথ আগলে রাখতে পারবে। প্রত্যেকটি বালক যেন এক একটি দুর্গ। সে আর এক থার্মো-পলিস। অথবা হলদিঘাট।

১৯১৬ সনের কথা। সেদিন 'ইস্টার মনডে'। সাম্রাজ্যের শান্তিকে বিঘ্নিত করে হঠাৎ গোটা আয়র্ল্যাণ্ডব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থান। আইরিশ ভলান্টি-য়াররা বিদ্রোহ করেছে। তারা আয়ার্ল্যাণ্ডকে রিপাবলিক বলে ঘোষণা করেছে। দেশের শিরা, অন্যতম জরুরী রেলপথটি এখন ডাবলিন ব্রিগেডের অধিকারে। একটি তরুণের নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন যোদ্ধা তা পাহারা

দিচ্ছে। বৃটিশবাহিনী সেদিকে এগিয়ে চলল। তখনই উচ্চারিত হয়েছিল এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ-বাণী : মানুষ এক জীবন-ই বাঁচে, মরলে একেবারেই মরে……!

পঞ্চাশজনের মধ্যে উনপঞ্চাশজনই বীরের মৃত্যু বরণ করেছিলেন সেদিন পিতৃভূমির স্বাধীনতার নামে। বেঁচে-ছিলেন শুধু সেই তরুণ সেনানায়কটি। চমকিত বিশ্ববাসী শুনেছিল, সে দুঃসাহসীর নাম—ইমন ডি ভ্যালেরা।

মাত্র ক'দিন আগে ডাবলিনে যিনি আমাদের রাষ্ট্রপতিকে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়েছেন, ভারত আর আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে নতুন করে বন্ধুত্বের সূচনা করেছেন, বিরাশী বছরের প্রবীণ আইরিশ প্রেসিডেণ্ট ১৯১৬ সনের সেই বিদ্রোহী নায়ক-ই। ডি ভ্যালেরা আজও বেঁচে আছেন, কেননা মাত্র এক জীবন কেমন করে মানুষের মত বাঁচা যায়, বাঁচা যেতে পারে—এ পৃথিবীকে যাঁরা তা সত্যিই দেখাতে পারেন তিনি তাঁদের মধ্যে একজন।

জন্ম ১৮৮২ সনের অক্টোবরে। জন্মস্থান—নিউইয়র্ক, আমেরিকা। বাবা ছিলেন এক স্প্যানিশ গায়ক, মা আইরিশ মেয়ে। ছেলে এডোয়ার্ডের বয়স যখন মাত্র দু'বছর তখন হঠাৎ বাবা বিদায় নিলেন। মা আবার বিয়ে করে নতুনভাবে সংসার পাতলেন। শিশু ডি ভ্যালেরাকে দেখাশোনার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হল আয়ার্ল্যাণ্ডে মামার বাড়িতে। এডোয়ার্ড সেখানেই মানুষ।

স্কুলে 'এডোয়ার্ড' নাম পাল্টে 'ইমন' হল। কলেজে গ্যালিক ভাষাকে ভাল-বাসলেন। এবং য়ুনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে পাক্কা আইরিশ জাতীয়তা-বাদী হয়ে গেলেন। সে ১৯০৪ সনের কথা। য়ুনিভার্সিটিতে অঙ্কের ছাত্র ছিলেন। ভাল ছাত্র। আগাগোড়া বৃত্তির টাকায় পড়েছেন। সুতরাং কাজের অভাব হল না। ক' বছর নানা স্কুলে কলেজে অধ্যাপনার কাজও করেছিলেন ইমন। কোথাও অঙ্ক পড়াতেন, কোথাও লাতিন, কোথাও ফিজিক্স, কোথাও ফ্রেঞ্চ। কিন্তু আসল নেশা তাঁর স্বদেশী।

১৯১৩ সনে ডি ভ্যালেরা পাকা-পাকিভাবে আইরিশ ভলানটিয়ারদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল তাঁর ঐতিহাসিক জীবন। ১৯১৬ সনের ইস্টার-অভ্যুত্থানের নায়ক হিসেবে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়ে-ছিল তাঁকে। পরের বছরই শান্তি-চুক্তি। সুতরাং ফাঁসিকাঠে জীবন

দেওয়ার বদলে বিদ্রোহী বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হয়ে গেলেন। ডি ভ্যালেরা তখন বিখ্যাত 'সিন ফেইন' আন্দোলনের নায়ক। 'সিন ফেইন' মানে—'উই আওয়ার-সেলভস্'—'আমরা নিজেরা।' ওঁরা আয়র্ল্যাণ্ডে বৃটিশ শাসনকে স্বীকার করেন না।

আইরিশ সদস্যরা বৃটিশ পার্লামেণ্ট ছেড়ে নিজেদের পার্লামেণ্ট গড়লেন। ডি ভ্যালেরা নির্বাচিত হলেন তার সভাপতি। আবার রাজরোষ। ইংরেজরা ওঁকে জেলে দিলেন। ১৯১৯ সনের কথা। দুঃসাহসী ডি ভ্যালেরা জেল থেকে পালালেন। তার পর সোজা আমেরিকা। আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার নামে যোদ্ধা সেখানে সভায় বক্তৃতা করেন, টাকা তোলেন। আঠার মাসে ষাট লক্ষ ডলার সংগ্রহ করেছিলেন তিনি সেদিন মার্কিন জনসাধারণের কাছ থেকে।

'২১ সনে আবার সন্ধি। ডি ভ্যালেরা দেশে ফিরে এসে পার্লামেণ্টের সভাপতি হলেন। দেশে তখন গৃহযুদ্ধ। একদল খণ্ডিত আয়র্ল্যাণ্ড মেনে নিয়ে চুক্তিতে রাজী, অন্যদল রাজী নয়। ইমন দ্বিতীয় দলের অধিনায়কত্ব বরণ করে নিলেন। তিনি রিপাবলিকান। ফ্রি ষ্টেটের পরিচালকেরা ওঁকে বন্দী করলেন। ডি-ভ্যালেরা তখন একটা জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন। কথা অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে জেলে যেতে হল। দশ মাস পরে ছাড়া পেয়ে একই সভায় জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করলেন তিনি। তাঁর সেদিনের বক্তৃতার প্রথম ছত্র—'এজ আই ওয়াজ সেয়িং হোয়েন আই ওয়াজ ইণ্টারাপটেড......।'

আবার অন্তর্বিরোধ। একদল বলেন রাজার প্রতি আনুষ্ঠানিক আনুগত্য কিছু নয়। ডি ভ্যালেরা বলেন—আমি তাতেও গররাজি। 'সিনফেইন'দের ছেড়ে নতুন দল গড়লেন তিনি। নাম—'ফিয়ানা ফাইল' —'সোলজারস অব ডেস্টিনি। যে কোন রকমের রাজ-চিহ্ন তাঁরা বরদাস্ত করতে নারাজ! ডি ভ্যালেরা পার্লামেণ্টে সংখ্যালঘিষ্ঠের নেতায় পরিণত হলেন। তবুও তিনি আপোসে রাজী নন।

'৩২ সনে সংখ্যালঘিষ্ঠ থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হল 'ফিয়ানা ফাইল।' ভ্যালেরা ক্ষমতায় এলেন। তারপর শুরু হল একের পর এক সংস্কার। '৩৭ সনে দেশ থেকে ইংরেজ গভর্নর জেনারেলকে বিদায় নিতে

হল। তৎসহ ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতি আনুগত্যের প্রতিজ্ঞাপত্রটিও গেল। '৩৮ সনে নতুন শাসনতন্ত্র। ডি ভ্যালেরা প্রধানমন্ত্রী হলেন। একালে তাঁর বিখ্যাত কীর্তি যুদ্ধে আয়র্ল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা। আইরিশ ছেলেরা বৃটেনে এসে ইংরেজদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে। কিন্তু আয়র্ল্যাণ্ড তবুও শেষপর্যন্ত নিরপেক্ষ। আমেরিকা প্রতিবাদ জানিয়েছিল—ডাবলিনে জার্মান দূতাবাস রাখা কি সঙ্গত হচ্ছে? ডি ভ্যালেরা উত্তর দিয়েছিলেন, আমি ওদের বেতার-প্রেরক যন্ত্রপাতি সব কেড়ে নিয়েছি। বিশ্ব নিশ্চিন্ত থাকতে পারে—আয়র্ল্যাণ্ডে বসে কেউ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে পারবে না।

'৪৪ সনে পঞ্চমবারের মত নির্বাচনে বিজয়ী হলেন ডি ভ্যালেরা। '৪৮ সনে ভারত-ভ্রমণ। ভারতের সে-ই প্রথম স্বপ্নের নায়ককে আপন চোখে দেখা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অন্যতম প্রেরণা ছিলেন তিনি। গান্ধিজী তাঁকে ভালবাসতেন। গদর পার্টির বিপ্লবীরা ব্যক্তিগতভাবেও যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন তাঁর সঙ্গে। স্বাধীন ভারত আপন চোখে দেখে দেশে ফিরে আপন ধ্যানের স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণ করলেন সংগ্রামী আইরিশ নায়ক। '৪৯ সনে আয়র্ল্যাণ্ডকে তিনি সার্বভৌম রিপাবলিক হিসাবে ঘোষণা করলেন। সেই সঙ্গে কমনওয়েলথ থেকেও বিদায় নিল আয়র্ল্যাণ্ড। ইস্টার অভ্যুত্থানের ৩৩শতম বার্ষিকীতে ডি ভ্যালেরার স্বপ্ন সফল হল। উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের বিচ্ছেদটুকু ছাড়া তাঁর স্বপ্নের স্বাধীনতায় অন্য কোন অপূর্ণ সাধ নেই। '৪৮ সনে একবার নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন ডি ভ্যালেরা। সাময়িক পরাজয়। তিন বছর পরেই আবার আপন আসনে ফিরে এসে-ছিলেন বিদ্রোহী নায়ক। '৫৪ সনে আবার পরাজয় এবং '৫৭ সনে আবার পুনরুত্থান। পাচ বছর আগে প্রধান-মন্ত্রীর দায়িত্ব অন্যের হাতে তুলে দেওয়ার পর থেকে এখনও তিনি তাঁর আপন হাতে গড়া দেশ আয়র্ল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট।

অদ্ভুত জীবন। আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। ডি ভ্যালেরা বোধহয় পৃথিবীতে এক-জনই হতে পারেন। তিনি সংগ্রামী, তিনি গৃহস্থ। সাতটি ছেলেমেয়ের পিতা। ডি ভ্যালেরা বিয়ে করেছেন ১৯১০ সনে। তিনি যোদ্ধা, তিনি দার্শনিক। এখনও পায়ে হেঁটে বেড়ান

ছাড়া তাঁর অন্যতম নেশা দর্শন-চর্চা। তিনি ভাষাবিদ, তিনি আগ্নেয় বক্তা। ডি ভ্যালেরা বক্তৃতা দেবেন শুনে কোন রসিক আইরিশ নাকি বলে-ছিলেন—ডি ভ্যালেরা ইজ মার্চিং অন ডাবলিন এট দি হেড অব টুয়েন্টি থাউজেণ্ড ওয়ার্ডস।

১. ১০. ৬৪

ম

মণ্টগোমারী, ফিল্ডমার্শাল

স্কুলের অন্য ছেলেরা ঠাট্টা করে বলত—'মঙ্কি!' বন্ধুরা বলেন—'মন্টি।' ইউরোপের সমসাময়িক ইতিহাসে তাঁর নাম—ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারী। 'ভাইকাউন্ট মণ্টগোমারী অব আলামিন।'

আমেরিকায়—আইক, রাশিয়ায় যেমন (ছিলেন) জুকভ,—ইংলণ্ডে তেমনি মন্টি। ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারী আজ অবসরপ্রাপ্ত। তাঁর বয়স এখন বাহাত্তরের ওপর। কিন্তু এখনও তিনি ছোট বড় নির্বিশেষে ইংরেজদের ভালবাসার মন্টি!

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীর ফিল্ড-মার্শাল মণ্টগোমারী আবাল্য লড়িয়ে। তাঁর আত্মজীবনী মতে তাঁর জীবনের প্রথম লড়াই মায়ের সঙ্গে।—from which my mother invariably emerged the victor.' জনৈক এ্যাংলিকান বিশপের নয়টি ছেলে-মেয়ের মধ্যে—মন্টিই ছিল সবচেয়ে দুর্ধর্ষ। মা বলতেন,—দেখত মন্টি কি করছে? ওকে তা করতে মানা কর। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন—মন্টি যা-ই করুক, তা নিশ্চয়ই নিষেধ করার মত কিছু হবে।

তবুও মা বাবার কাছ থেকে ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারী যে স্যাণ্ডহার্স্ট—এর চেয়ে কম শিক্ষা পাননি—একজন অন্তত তা জানেন। তিনি রাশিয়ার মার্শাল রকোসোভস্কি। জার্মান সৈন্যরা সেদিন আত্মসমর্পণ করেছে ফিল্ডমার্শাল মণ্টগোমারীর কাছে। (সেই ঐতিহাসিক দলিলটি আজও নিজের কাছে রেখেছেন মন্টি।) জনৈক লেবার সদস্য তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন পার্লামেণ্টে। চার্চিল তার জবাবে বলেছিলেন—

"Anybody who takes the surrender of 2,000,000

of the enemy in the battle is entitled to keep the receipt !"

রকোসোভস্কি ভোজের আয়োজন করেছেন সোবিয়েত শিবিরে। মণ্ট-গোমারীর কাছে তিনি জানতে চাইলেন—কি মদ ভালবাসেন তিনি! মণ্টি উত্তর দিলেন—জল ছাড়া অন্য কিছু পান করিনা আমি!—সিগার? উত্তর হল: আই ডু নট স্মোক।

ছোটবেলায় মণ্টি দেখেছেন—হপ্তায় হাতখরচ বাবদে বাবা মাত্র দশ শিলিং পেতেন মায়ের কাছ থেকে। বৃটেনের সবচেয়ে খ্যাতিমান জেনারেলটির ব্যক্তিগত খরচ কোন সপ্তাহেই তার বেশী হয় না।

সাদাসিধে জীবন। সাদাসিদে কথাবার্তা এবং লেখা দুই-ই। মণ্টগোমারী তিন দিনের জন্য ভারতে এসেছেন। চীনেও যাবেন। ভারত-চীনের বর্তমান সম্পর্কের কিছু কি উন্নতি হবে তার ফলে? '—অন্তত আরও অবনতি হবে না নিশ্চয়!' মণ্টি এই কৈফিয়তটিই দিয়েছিলেন গেল বছর প্রবল বিরোধিতার মধ্যে তিনি যখন মস্কো যাত্রা করেন তখন।

৯. ১. ৭০

মন্‌রো, স্যার লেস্‌লি নক্স

গোয়ার ব্যাপারে ভারতকে ইনি সমর্থন করেননি।

কিন্তু তবুও সামনে দাঁড়ালে মনে হয়—মানুষ কেন এমন হয়না,—ওঁর মত। বয়স একষট্টি পার হয়ে গেছে। মাথাটা তবুও সুউচ্চ, ছ'ফুট দু'ইঞ্চি। ঘন ভ্রূ যুগলে বয়সের ছাপ পড়েছে, কিন্তু দেহে এখনও দু'শ' দশ পাউণ্ড ওজন। কথা যখন বলেন তখন মনে হয় প্রতিটি শব্দের ওজনও বুঝি বা তাই।

সুবক্তা, সুরসিক, সুপণ্ডিত, অধ্যাপক, আইনজ্ঞ, রাষ্ট্রনীতিবিদ। তিন দফায় নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি হয়েছেন, একবার সাধারণ পরিষদের, তদুপরি—একবার ট্রাস্টি-শিপ কাউন্সিলের। এখন পরিচয়—সেক্রেটারী জেনারেল ইণ্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিষ্টস।

নাম—স্যর লেসলি নক্স মনরো। দেশ—নিউজিল্যাণ্ড। উদ্দিষ্ট তিব্বত, হাঙ্গেরী, ঘানা, অ্যাঙ্গোলা—সব;—দুনিয়া। যেখানেই আইনের শাসন বিপর্যস্ত সেখানেই চোখে চশমাটা লাগিয়ে স্যর মনরো গালে হাত দিয়ে ভাবিত।

বিরাট আইনজীবী ছিলেন একদিন নিজের দেশে। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে নিউজিল্যাণ্ডের ল' সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

কলেজেও সেই একই অবস্থা। অকল্যাণ্ডের জনৈক স্কুল শিক্ষকের এই ছেলেটি, সাহিত্য এবং আইনের সমুদয় পরীক্ষায় রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন।

রেকর্ড আয় হচ্ছিল ব্যবসায়ও। কলেজে পড়াতেন, কাগজে লিখতেন, রেডিওতে বক্তৃতা দিতেন,—তদুপরি ছিল স্বাধীন ব্যবসা। কিন্তু একদিন তাই ছেড়ে দিলেন। কেননা,—আইন শুধু পুঁথিতে রাখলে মন ভরে না।

মনরো তৎকালে পার্লামেণ্টের বিরোধী দল ন্যাশনালিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিউজিল্যাণ্ডের প্রাচীনতম দৈনিক 'নিউজিল্যাণ্ড হেরল্ডে'র সহযোগী-সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের জন্যেও একটা আমন্ত্রণ পেয়ে গেলেন। মনরো সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

পরের বছরই তিনি হেরল্ডের সম্পাদক। এবং ফলে এবারও রেকর্ড। শোনা যায়, সম্পাদক মনরো সেদিন শুধু যে এই কাগজটির প্রচার সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার থেকে দেড় লক্ষে তুলেছিলেন তাই নয়,—এই কাগজের বলেই বিরোধী পক্ষ থেকে নিজের দলকে তিনি সরকার পক্ষে পরিণত করেছিলেন।

তারই স্মারক হিসেবে '৫১ সনে প্রধানমন্ত্রী হল্যাণ্ড ওঁকে পাঠিয়েছিলেন মার্কিন দেশে রাষ্ট্রদূত করে। সেই সঙ্গে মনরো সেদিন নিযুক্ত হয়েছিলেন—য়ুনোয় নিউজিল্যাণ্ডের প্রধান প্রতিনিধি। কিন্তু কোথায় আজ নিউজিল্যাণ্ড? কথা বললে মনে হয় স্যর মনরো এখন সত্যিই বিশ্বনাগরিক, তিনি বিশ্বের আইনানুগত আত্মার প্রতিনিধি।

ব্যক্তিগত জীবনেও যেন বিশেষ কোন দেশের মানুষ নন। প্রথম স্ত্রী বিয়ের দু'বছর পরেই একটি কন্যাসন্তান রেখে চলে গেলেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানও একটি কন্যা। দুজনেই এখন মার্কিন দেশে সংসারী মেয়ে। বাবা তিন মাসের জন্যে সদর দপ্তর ছেড়ে বের হয়েছেন। পনেরটি দেশে যাবেন। আইনের শারীরিক অবস্থা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করবেন, আইনের কথা বলবেন।

সেই সূত্রেই স্যর মনরো সেদিন কলকাতা হয়ে গেলেন। ৮. ২. ৬২

মোলটভ, ভি.

মা বাবার পদবী ছিল—স্ক্রায়াবিন। কাজানে পড়তে গিয়ে স্কুলের ছেলে নতুন পদবী নিল। সে বলল—আমি —'মোলটভ'। অর্থাৎ—হাতুড়ি। মোলটভের বয়স তখন মোটে ষোল।

ষোল বছর থেকেই—'হাতুড়ি'। এখন তাঁর বয়স সত্তর বছর। '৫ সনে যে বিপ্লব হয়েছিল রাশিয়ায় মোলটভ সেকালের কমরেড। ইতিমধ্যে '৫৭ সন অবধি, গেল একান্ন বছরে রাশিয়ায় তিনি কি ছিলেন তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাবে যদি তাঁর পদগুলোর কথা শোনা যায়। মেডেল এবং স্টারগুলো না হয় উহ্যই রইল।

মোলটভ '৬ সনে গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর নির্বাসন হল। '১১ সনে ফিরে এলেন। সে বছরই সেণ্ট পোসবার্গে দেখা হল লেনিন এবং স্ট্যালিনের সঙ্গে। সেই বন্ধুত্ব ওঁদের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট ছিল। '১২ সনে জন্ম নিল বিশ্বখ্যাত 'প্রাভদা' এবং 'ভেজদা' (zvezda)। মোলটভ তাদের অন্যতম জনক। '১৭ সনে তিনিই ছিলেন 'প্রাভদা'র সম্পাদক।

'১৭ র আগে এবং পরেও দলে কমরেড মোলটভ বিশিষ্ট ব্যক্তি। '২১ সনে তিনি ছিলেন দলের দ্বিতীয় সেক্রেটারী। প্রথম—স্ট্যালিন। '৩০ থেকে '৪১ সন অবধি তিনি 'কাউন্সিল অব পিপলস কমিশারস'এর চেয়ারম্যান এর কাজ করেছেন। পদটা তৎকালে মর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর সমান। মোলটভ কখনও রুশ দেশের প্রধানমন্ত্রী হননি বটে, কিন্তু তিনি মন্ত্রিসভার সহ-সভাপতি হয়েছেন এবং বৈদেশিক দপ্তরে মন্ত্রিত্ব করেছেন দুই দফায় প্রায় তের বছর। এছাড়াও মোলটভ-এর কৃতিত্বের ফর্দে রয়েছে—পর পর দু'টি পাঁচসালা—পরিকল্পনা। রুশ দেশের প্রথম এবং দ্বিতীয় পাঁচ-সালা পরিকল্পনায় মোলটভের হাতেই ছিল—কৃষি এবং শিল্পের লক্ষ্যভেদের দায়িত্ব। মোলটভ সফল হলেন। ফলে মস্কোর একটা এলাকা তাঁর নামে নামাঙ্কিত হল। তাঁর নামে নতুন শহর গড়ে উঠল এবং রাস্তা পার্ক—অসংখ্য।

তবুও '৫৭ সনের ২২শে জুন সেণ্ট্রাল কমিটির সভায় ক্রুশ্চফ ঘোষণা করলেন মোলটভ বিশ্বাসঘাতক। দলের বিরুদ্ধে নিয়মিতভাবে কাজ করে চলেছেন তিনি। সভায় উপস্থিত ছিলেন—একশ' তিরিশজন সদস্য। সকলে হাত তুললেন। মোলটভ নির্বাক রইলেন। কমরেডরা অবাক

হয়ে দেখলেন—তিনি সত্যিই পার্টির বিরুদ্ধে। মোলটভ দলের প্রস্তাবকে সমর্থন জানালেন না। সভা থেকে বের হতে হতে লোকেরা কানাকানি করল—লোকটা সত্যিই হাতুড়ি।

ক্রুশ্চফ বললেন—হাতুড়ি নয়, ওঁরা ব্ল্যাক-সীপ। মোলটভ-এর নির্বাসন হল। রাশিয়ার ভূতপূর্ব পররাষ্ট্রসচিব মঙ্গোলিয়ায় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হলেন।

এবার শোনা গেল—মোলটভ ঘরে ফিরছেন। ক্রুশ্চফ তাঁকে আন্তর্জাতিক আণবিক কমিশনে দেশের প্রতিনিধি করে পাঠাচ্ছেন।—পাঠাচ্ছেন? অথবা—আসছেন? মহামান্য জার বাহাদুর দু'দুবার নির্বাসনে পাঠিয়ে যাঁকে মারতে পারেননি, মঙ্গোলিয়া থেকে জেনেভা পথ করে আসা তাঁর পক্ষে কি একেবারেই অসম্ভব? ২৫. ৮. ৬০

মহতাব, ডঃ হরেকৃষ্ণ

একটু বয়স্ক সাংবাদিক যাঁরা তাঁরা এখনও বলেন—হরেকৃষ্ণ আসলে সাংবাদিক।—ওঁর মত 'এডিটর' কম হয়।

সেকালে বাংলায় যেমন 'আনন্দ-বাজার', উড়িষ্যায় তেমনি 'দৈনিক প্রজাতন্ত্র'। সাত বছর একটানা তার সম্পাদক ছিলেন মহতাব। কিছুকাল—'রচনা' নামক ওড়িয়া সাহিত্য পত্রেরও।

সাহিত্যানুরাগীরা বলেন—মহতাব আসলে সাহিত্যিক।

তিনটি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস, একটি নাটক এবং একটি বিশিষ্ট ইতিহাসের ('History of Orissa') রচয়িতা ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের 'ডক্টরেট' পদবীটি আসলে সেই সূত্রেই অর্জিত। দিয়েছেন—অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় ('৫০)।

তবে নগদ দানে হরেকৃষ্ণ নিজে যেন তাদেরও ছাড়িয়ে। পঁচিশ হাজার টাকা দান করেছেন তিনি প্রাচীন ওড়িয়া কবিদের রচনাবলী প্রকাশার্থে। ছাব্বিশ হাজার টাকা দিয়েছেন—উড়িষ্যার আদিবাসীদের মধ্যে 'গান্ধীধর্ম' প্রচারার্থে। দানে মহতাব তাঁর নিজের দেশে রাজা না হয়েও রাজা।

দুটো দানে যেমন হাজার টাকার সূক্ষ্ম ব্যবধান জীবনেও তেমনি। বাসনা ছিল—লেখাপড়া, সাহিত্য, পাণ্ডিত্য। কিন্তু 'গান্ধীধর্ম' নতুন মন্ত্র শেখাল। '২১ সনের কথা। মহতাব তখন র‍্যাভেন শ কলেজের ছাত্র। একদিন গান্ধীজির ডাকাডাকি কানে

এল। বই ফেলে ছেলে স্বদেশী-ওয়ালাদের দলে মিশে গেল। সেই যে গেল, গেলই।

'২৪ সনে বালেশ্বর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান-এর আসনে দেখা গেল তাঁকে। যুগপৎ বিহার এবং উড়িষ্যার যুগ্ম-বিধানসভায়ও। কত আর বয়স হবে তখন তাঁর ?—পঁচিশ বছর !

'৩০ সন। আবার অসহযোগ আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ, কারাবাস। মহতাব তখন উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

'৩৭ সনে দ্বিতীয়বারের মত আবার সেখানে বসেছেন তিনি। এবার বয়স যেমন একটু বেড়েছে, জগতটাও যেন তেমনি বড় হতে চলেছে। '৩৮ সনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে এলেন তিনি। ক' বছর পরে, '৪৬ সনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আসনে। '৫০ সনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ডাক পড়ল। মহতাব শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী মনোনীত হলেন। দু' বছর পরে—স্থানটা দিল্লিই থাকল বটে, কিন্তু কাজটা পাল্টে গেল। মহতাব এবার কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ডের সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হলেন ('৫২—'৫৪)। পরের বছর আবার সরকারী কাজ। উড়িষ্যার মহতাব এবার বোম্বাইয়ের গভর্নর। দু' বছর কাটল না। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরলেন। ফেরাটা দরকার হয়ে পড়ল। নির্বাচনে দল কমজোরী হয়ে পড়েছে। মহতাবের উপর দায়িত্ব পড়েছে তাঁকেই মন্ত্রিসভা গড়তে হবে।

১৯৫৭ সনের এপ্রিল। মহতাব আবার উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। একটা বছর ভালয় ভালয় কাটল। মে, ১৯৫৮—মহতাব পদত্যাগ করলেন। উড়িষ্যায় কংগ্রেস বলবান হোক আর দুর্বলই হোক, মহতাব গেল চল্লিশ বছর ধরে সেখানকার মনের মানুষ। সুতরাং পদত্যাগপত্রটি গৃহীত হল না। এবং যথারীতি একটি বছর কোনমতে কেটে গেল। পরের বছর মে মাসেই বার্ষিক ঘটনার মত গোলমালটা আবার পাকিয়ে উঠল। বোঝা গেল, ব্যাধিটা গোপন করা হয়েছিল মাত্র, আসলে রোগটা সারেনি। মহতাব এবার আর গোজা-মিলে রাজী নন। তার চেয়ে প্রকাশ্য জোড়াতালিও ভাল। তিনি পদত্যাগ করলেন এবং বিরোধী দল প্রজা-পরিষদের সঙ্গে হাত মিলালেন।

সেই যৌথ পরিবার বেশ চলছিল। অন্তত বাইরে থেকে দেখে যেন তাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু মহতাব আভাস

দিয়েছেন—আবার সম্ভবত পদত্যাগ করতে হবে তাঁকে। কেননা,—এভাবে কাজ করা অসম্ভব।

২৯. ৯. ৬০

•

মহম্মদ, বক্সী গোলাম

ওরা এল।—লুঠেরা, খুনীরা। হাতে তাদের মশাল, ঘাড়ে রাইফেল, চোখে বর্বর ক্ষুধা।

মহারাজা গালে হাত দিলেন। প্রজারা কপালে। কিন্তু বুক ঠুকে সামনে এসে দাঁড়াল প্রজা পরিষদ—ন্যাশনাল কনফারেন্স। আগুন জ্বলে জ্বলুক, ভূস্বর্গকে তারা ছেড়ে দিতে পারবে না অসুরদের হাতে।

'৪৭ সনের সেই দুঃসহ দিনগুলোর ইতিহাসে অতঃপর ভারতীয় সৈন্যদের পাশাপাশি লিখিত হল তাঁদের নামও। নবযুগের 'রাজতরঙ্গিণী'তে সেই প্রথম স্থান পেল প্রজাদের বীরত্ব কাহিনী। জম্মু আর কাশ্মীরে অগুস্তি প্রজা সেদিন 'শের'। গোল টেবিলে সাজালে শৌর্যে তাঁরা সবাই সমান। কিন্তু ব্যক্তিগত কৃতিত্বে একজন নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে প্রথম। তিনি বক্সী গোলাম মহম্মদ। পদাধিকার বলে গোলাম মহম্মদ সেদিন দ্বিতীয়; কিন্তু প্রজারা বলেন, নিজের বলে তিনি পহেলা আদমী। কেননা, গাঁয়ের পর গাঁ ঘুরে বক্সীই সেদিন তাঁদের ডেকে এনে হাতে হাতিয়ার তুলে দিয়েছিলেন, সীমান্তে দাঁড়িয়ে উপত্যকার ফুল বাগিচাকে বাঁচাতে শিখিয়ে ছিলেন। কাশ্মীরের 'বর্ডার স্কাউট' তাঁরই কীর্তি। আভ্যন্তরীণ রক্ষীবাহিনী 'পিস ব্রিগেড'ও তাঁরই হাতে গড়া।

জীবন শুরু হয়েছিল স্কুল মাষ্টারি দিয়ে। তরুণ বক্সীর কাজ ছিল—মানুষ গড়া। তিনি বদলী নিলেন—জাত গড়ায়। গাঁয়ের মানুষকে নিয়ে সুতা কাটতে বসলেন। কাটুনী সঙ্ঘ গড়ে উঠল। সে সংঘ নব্য-বিদ্যালয়। স্বাদেশিকতার শিক্ষালয়। সুতরাং শিক্ষক কারাগারে প্রেরিত হলেন। চার চার বার জেল খেটেছেন বক্সী। '৩৪ সনে একবার। সেবার মেয়াদ ছিল—এক বছর চার মাস। '৩৮ সনে, যেবার কাশ্মীর জুড়ে দায়িত্বশীল সরকারের দাবী উঠল—সেবার আর বক্সীকে ধরা গেল না। তিনি যে কোথায় পালিয়ে গেলেন, মহারাজার পুলিস তা হদিস করতে পারল না। আন্দোলন যখন আরও তীব্র হল, তখন জানা গেল বক্সী বৃটিশ ভারতে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার আশ্রয়-

দাতা, ভারতীয় জনগণ তাঁর পৃষ্ঠপোষক।

অবশেষে আন্দোলন অন্তে এসে পৌঁছাল। মহারাজা বশ্যতা স্বীকার করলেন। পরাজিত হানাদাররা নিশান উড়িয়ে শান্তি চাইল এবং কাশ্মীরে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। বক্সী গোলাম মহম্মদ সেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি। তিনি সহকারী-প্রধানমন্ত্রী। তাঁর হাতে রাজ্যের পুলিস, রক্ষীবাহিনী, পরিবহন, সরবরাহ এবং পাবলিক ওয়ার্কস।

'৫৩ সনের আগস্টে আরও একটু এগিয়ে আসতে হল তাঁকে। কেননা, শেখ সাহেবের মুখে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাওয়া গেছে। বক্সী পুলিসের কর্তা। প্রজাদের অভিভাবক। সুতরাং প্রিয় উপত্যকার সোনালী বুকে ছুরিটা বসাবার আগেই তিনি হাত চেপে ধরলেন। আজন্ম সহ-কর্মীর হাত। আবদুল্লা কি চমকে উঠেছিলেনসেদিন?

গোটা দুনিয়া চমকে উঠেছিল। এবং কাশ্মীর চমকে উঠে জেনেছিল—'শের' মানে যদি বাঘ হয়,—বক্সী গোলাম মহম্মদ-ও তবে বাঘ।

বয়স তিপ্পান্ন। কিন্তু চলনে বলনে উৎসাহে আর আন্তরিকতায় গোলাম মহম্মদ যেন এখনও সেই দুর্ধর্ষ তরুণ। স্বদেশ এখন তাঁর স্বপ্ন, জনতা—নেশা। আবার ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সভাপতি নির্বাচিত হলেন তিনি। জাতি যাঁর পেছনে 'জাতীয় সম্মেলনের' তিনি অগ্রে আছেন এটা স্বতঃসিদ্ধ। তবুও বক্সী আনুষ্ঠানিক আসনে বসলেন। কারণ বক্সী গোলাম মহম্মদ শুধু আদর্শবাদী নায়ক নন, তিনি কাশ্মীরের শ্রেষ্ঠ সংগঠকও। ৮. ৯. ৬০

[দ্রষ্টব্য : সাদিক, গোলাম মহম্মদ]

মহলানবীশ, প্রশান্তচন্দ্র

'প্রশান্তকে এই সঙ্গে যে দুটো প্রস্তাব করেছিলুম সেটা এর অঙ্গীভূত নয়।…অক্সফোর্ডের বাংলা কাব্য চয়নিকা অনর্থক আমার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ তর্কে দ্বিগুণ আবিল করে দেবে। কী দরকার সেটাকে জাগিয়ে তোলবার?'

কিংবা

'…গেল বারে বরানগরে time সম্বন্ধে Donne-এর লিখিত একখানা বই সঙ্গে কিনে নিয়ে গিয়েছিলুম। প্রশান্তর যদি সেটা পড়া হয়ে থাকে সঙ্গে এনো—আমি এখনও পড়িনি।'

সেই—প্রশান্ত। বরাহনগরের বিখ্যাত মহলানবীশ, জোড়াসাঁকোর কবির আলাপে আলোচনার উপস্থিতি যাঁর প্রায় প্রাত্যহিক।

পাণ্ডিত্যের পরিচয় অবান্তর। কেননা, সংক্ষেপে বললেও তাতে জায়গা লাগবে অনেক এবং সম্ভবত তার পরেও বোঝা যাবে অতি অল্প। কারণ, বিদ্যাবত্তায় শ্রীমহলানবীশ সত্যিই জগতে প্রথম সারির ব্যক্তি।

বাবার নাম—প্রবোধচন্দ্র। মায়ের নাম—নীরদবাসিনী। শ্রীমহলানবীশের জন্ম ১৮৯৩ সনের ২৯ শে জুন। জন্মস্থান—কলকাতা। লেখাপড়া কলকাতা এবং বিলেত।

কেম্ব্রিজ এবং কলকাতার অন্যতম প্রতিভাবান ছাত্র শ্রীমহলানবীশ আজ বিশ্বখ্যাত সংখ্যাবৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক। পৃথিবীর এমন কোন উল্লেখ্য বিদ্বৎসভা নেই যার কোন না কোন শিরোপা তাঁর মাথায় নেই —ইউরোপ আমেরিকায় এবং এশিয়ায় এমন কোন বিজ্ঞান সংস্থা নেই যেখানে তিনি নিজ মুখে বিজ্ঞানের কথা না শুনিয়েছেন। সুতরাং রয়াল সোসাইটির ফেলো, ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স-এর প্রতিষ্ঠাতা ফেলো, প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শ্রীপ্রশান্ত মহলানবীশ যে কেমন বিরল জাতের পণ্ডিত সে পরিচয় যে দিক থেকেই দেওয়া যাক না কেন শুনতে মনে হবে পুনরুক্তির মত। সুতরাং, সেই পরিচয়গুলোই শোনাচ্ছি যা কোন বৈজ্ঞানিকের না থাকলেও চলত।

অনেকেই জানেন না অধ্যাপনা, গবেষণা, বিজ্ঞান-চর্চা এবং বক্তৃতাই শ্রীমহলানবীশের জীবন নয়। ১৯২১-৩১ সন পর্যন্ত তিনিই ছিলেন বিশ্ব-ভারতীর কর্মসচিব। এবং আজ যিনি 'সংখ্যা' নাম দিয়ে দুরূহ স্ট্যাটিস্টিকসের কাগজ চালান এককালে তিনিই, ছিলেন—'বিশ্ব-ভারতী কোয়ার্টারলি'র সম্পাদক।

বিশ্বময় বিবিধ কর্তব্যে সতত ব্যস্ত থেকেও শ্রীমহলানবীশ যে আজও সেদিনের সেই কবি-সম্পর্ক বিন্দুমাত্র বিস্মৃত হননি তাঁর প্রতিমুহূর্তে চাল-চলন কথাবার্তা তার সাক্ষ্য।

পদত্যাগ সংবাদের মাত্র দিনকয় আগের খবর। কলকাতার মাঠে ভারতীয় তরুণেরা আগের দিন ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করেছেন,—বরাহনগরের স্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট সেদিন সরগরম। কর্মীরা দরখাস্ত নিয়ে হাজির হলেন সেক্রেটারী তথা ডিরেক্টরের ঘরে। তাঁরা ছুটি চান। শ্রীমহলানবীশ দরখাস্তখানা

পড়লেন। তারপর নিঃশব্দে মন্তব্য লিখে গেলেন :

কর্মীরা যেখানে ছুটি চাইছেন সেখানে আমি অমত করতে পারি না। তবে তাঁদের একথা জানান আমি প্রয়োজন বোধকরি যে, গুরুদেব এমনি কোন জাতীয় আনন্দের দিনে আরও বেশী কাজ করতেন। এবং ব্যক্তিগতভাবে আমিও তাই করি।

তারপরও কি নিজের হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর পদত্যাগ সংবাদ কারও সহ্য হয়!

২৫. ১. ৬২

মহেন্দ্র, নেপাল রাজ

ছবিটা ছিল একটা গ্রুপ ফটো। মহারাজা বসে আছেন। তাঁর ডাইনে বাঁয়ে দু'জন রাণী। পেছনে ছেলে-মেয়েরা দাঁড়িয়ে। সবচেয়ে দক্ষিণে একটি তরুণ। রোগা পটকা চেহারা। শরীর আন্দাজে মাথাটা যেন একটু বড়। দেশলাইয়ের কাঠির মত। মুখটা লজ্জায় নীচু। নীচে, পরিচয়-লিপিতে লেখা ছিল—'ক্রাউন প্রিন্স...।'

সেদিনের যুবরাজ আজ লক্ষ লক্ষ মানুষের 'মহারাজাধিরাজ'। স্বভাবতই, আজকের ছবিটা সম্পূর্ণ অন্য রকম। অনেক পরিবর্তন ঘটেছে মহেন্দ্রের চেহারায়। চল্লিশে দাঁড়িয়ে নেপালা-ধীশ এতদিনে যেন এক উজ্জ্বল তরুণ।

পরিবর্তন ঘটেছে যেন স্বভাবেও। অন্তত, বাইরে থেকে তাই মনে হয়। বিশেষ, গেল সপ্তাহের পর থেকে। যেদিন থেকে জনতার প্রতিনিধিরা রাজার হাতে বন্দী।—কিন্তু সত্যিই কি তা রাজস্বভাবে পরিবর্তন?

বাবার মত যুবরাজও ছিলেন একদিন রাজপ্রাসাদে 'বন্দী'। সব-কিছুর মত লেখাপড়াও ছিল ওঁদের বরাদ্দ মত। বেছে বেছে চামচেয় তুলে যা দেওয়া হয়েছে তাই। তবুও যে পুরোপুরি ঠকান যায়নি মহারাজার এই রোগা ছেলেটিকে তা জানা গেল একদিন—'৪০ সনে। মহেন্দ্রের বয়স তখন মোটে কুড়ি। নিজের কন্যার সঙ্গে যুবরাজের বিয়ের আয়োজন করলেন রাজ্যের প্রধান-মন্ত্রী। রাজার পক্ষে একসঙ্গে দু'টি বিয়েই রীতি। চিরকালে নরম ছেলেটা গরম হয়ে উঠল : না, আমি একটিই করছি! বোঝা গেল, ছেলেটা বাড়ীর বাইরে পা না বাড়ালেও দক্ষিণের হাওয়া পেয়েছে।

দশ বছর পরে। সহসা বিদায়

নিলেন স্ত্রী। মহেন্দ্র তখন পাঁচটি ছেলেমেয়ের পিতা। আবার বিয়ে করতে হল। এবারও সেই প্রধান-মন্ত্রীর কন্যা। লক্ষ্মীর বোন রত্না। তবে, এবারও একজনই।

'৫০ সনের নভেম্বরে বিদ্রোহ। মহেন্দ্র বাবার হাত ধরে হাজির হলেন ভারতীয় দূতাবাসে। সেখান থেকে ভারতে। তারপর '৫৫ সনে সিংহাসনে।

সিংহাসনের মহেন্দ্র এক দুঃসাহসী রাজা। নেপালের কোন রাজা কোনদিন যা করেননি, মহেন্দ্র তাই করেন। প্রতি বছর গরমের সময় তিনি তাঁর রাজ্য দেখতে বের হন। যানবাহনহীন দেশে সে এক দুঃসাহসী উদ্যোগ। কখনও দোলায়, কখনও ঘোড়ায়, কখনও পায়ে হেঁটে। মহেন্দ্র সম্পূর্ণ নেপাল ঘুরে বেড়িয়েছেন।

শুধু ঘরে নয়, বাইরেও। '৫৫ সনে অসুস্থ ত্রিভুবনকে দেখতে একবার ইউরোপ গিয়েছিলেন মহেন্দ্র। ফিরে আসার পর নেপাল সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছিলেন একটা। তাতে নাকি লেখা ছিল:

'His Majesty's first hand knowledge of the west may be said to have been gained during his flying visit to Nice, Cannes and Monte Carlo.'

পড়ে নাকি সেদিন হেসেছিলেন অনেকে। বহু দেশে-দেখা নেপালা-ধীশ নিজেও বোধ হয় আজ হাসেন। কেননা, পশ্চিম সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সত্যিই এখন স্পষ্ট।

এবং বলা বাহুল্য স্পষ্ট নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে ধারণা। প্রগতিশীল তরুণ রাজা নিজের দেশে জনপ্রিয় কবি। তাঁর লেখা গান প্রজাদের মুখে মুখে। তাঁর লেখা কবিতার বই শিক্ষিতের ঘরে ঘরে। ভাল শাসক ভাল কবি, ভাল শিকারী এবং ভাল খেলোয়াড় (প্রধানত দাবা) মহেন্দ্রকে ভালবাসেন নেপালের জনসাধারণ। কিন্তু হায় রাজা বোধ হয় জানেন না, তারা ভালবাসে নিজেদেরও,—নিজে-দের হাতে গড়া এই সদ্য-মৃত শিশু গণতন্ত্রটিকেও।

'—শিশু? মহেন্দ্র বলেন—শিশু ঘুষ খায় কখনও?—শিশু দুর্নীতিতে ডুবে যায় কখনও?' '৫৫ সনে—সিংহাসনে বসার মাত্র দু' মাস আগে তাই বলেছিলেন সেদিনের যুবরাজ!

২২. ১২. ৬০

মহেন্দ্র প্রতাপ, রাজা

১৯১৫ সন।

সহসা রুশ সম্রাট চিঠি পেলেন একখানা। সোনার পাতে লেখা অচেনা হরফে লেখা দীর্ঘ চিঠি। দূর দেশের এক দূত বয়ে এনেছে তা রাজধানীতে। কোথা থেকে এসেছে এ চিঠি?

—কাবুল থেকে।

—কে লিখেছে?

—হিন্দুস্থানের সরকার।

—গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া?

—হ্যাঁ, 'হিন্দ সরকার'।

চিঠিতে শীল মোহর—'গভর্নমেণ্ট অব হিন্দ্।' নীচে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর। নামটাও পড়া হল: রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ!

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ। ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাসে অবিশ্বাস্য একটি মানুষের নাম। অনেক রোমাঞ্চকর ইতিহাস।

রাজবংশ। মস্ত বড়লোকের ছেলে। ঘর ছিল—উত্তর প্রদেশের আলিগড় জেলায়। লেখাপড়া করতেন —আলিগড় মুসলিম কলেজে। আই. এস এবং আই. ডি পরীক্ষা শেষ হল। হাতরাশ রাজের পুত্র তরুণ মহেন্দ্রপ্রতাপ চললেন বিদেশে। উদ্দেশ্য: মা বাবা সহ সবাই জানেন আরও লেখা পড়া। সে ১৯১৪ সনের কথা। মহেন্দ্র প্রতাপের বয়স তখন আটাশ বছর।

সেই যে গেলেন গেলেনই। পথ চেয়ে চেয়ে আত্মীয় বন্ধুরা অন্ধ হয়ে এলেন। কিন্তু মহেন্দ্র প্রতাপের আর ফেরবার নাম নেই। কেননা,—উপায় নেই। রাজা স্বাধীনতার স্বপ্নে বাঁধা পড়ে গেছেন।

প্রথমে—ইতালি, তারপর সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জেনেভা। এখানে এসে আলাপ হল গদর দলের প্রতিষ্ঠাতা হরদয়ালের সঙ্গে। দু'জনে মিলে জার্মান কনসালের সঙ্গে বৈঠক। জেনেভা থেকে বার্লিন। বার্লিন থেকে বাঁকা পথে আফগানিস্থান—কাবুল। ওবেদুল্লা, বরকতুল্লা, মহেন্দ্র প্রতাপ। প্রবাসী বিপ্লবীরা মিলে আফগানিস্থানে স্বাধীন ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠা। 'রাষ্ট্রপতি' রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ। রাজধানী—কাবুল। এসব '১৫ সনের কথা।

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে আবার দেখা গেল—১৯৪০ সনে। এবার জাপানে। তিনি এখানেও বিপ্লবীদের সভাপতি। (প্রেসিডেণ্ট অব দি

এক্সিকিউটিভ বোর্ড অফ ইণ্ডিয়া টু ফ্রি ইণ্ডিয়া) ঘরে তীব্র আন্দোলন, বাইরে যুদ্ধ, আই. এন. এ। অবশেষে স্বাধীন ভারত এবং মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন। যৌবনে ঘর ছাড়া মহেন্দ্র প্রতাপ যখন ফিরলেন তখন তিনি বৃদ্ধ। এখন আরও। আগামী ১লা ডিসেম্বরে তিনি পঁচাত্তরে পড়বেন।

বৃদ্ধ মহেন্দ্র প্রতাপ ভারতীয় যৌবনের কাছে অফুরন্ত প্রেরণা। ১৯১৪ থেকে ১৯৪৬ সনের মধ্যে বহু চোখকে ফাঁকি দিয়ে পাঁচবার বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন এই দুর্ধর্ষ ভারতীয় তরুণ। আমেরিকায় গিয়েছেন—ছয়বার, মস্কোয়—('৩০ সনের মধ্যে) —দশবার, জার্মানীতে—দশবার, আফগানিস্থানে—পাঁচবার। পনের বছর কেটেছে তাঁর জাপানে। কিছু কাল—চীনে, তিব্বতে, তুরস্কে, পারস্যে, মেক্সিকোতে এবং কোথায় নয়? এখন নিজের ঘরেই নীরবে পড়াশোনায় তাঁর দিন কাটে। ১৯০৬ থেকে '৫২ সন অবধি কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন তিনি। এখনও আছেন লোক-সভায়। তবে কোন দলের পরিচয়ে নয়, স্বতন্ত্র মানুষ হিসাবে। রাজনীতি এখন তাঁর নেশা নয়। লক্ষ্য : মানুষের সেবা। নেশা : পড়া এবং লেখা। নিজের জীবনী সহ মহেন্দ্র-প্রতাপ পঁয়ত্রিশটি বইয়ের লেখক।

সরকারী আদেশে একদিন রাজ-দ্রোহী মহেন্দ্র প্রতাপের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। সম্প্রতি আর এক সরকারী আদেশে 'দেশ প্রেমিক'কে তাঁর সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। খবরটা আমাদের পক্ষে আনন্দের। স্বয়ং মহেন্দ্র প্রতাপের পক্ষেও। কেননা, এমন একটা ঘটনাও আজ সম্ভব হল, কারণ দেশে একদিন মহেন্দ্র প্রতাপেরা ছিলেন।

২৪. ১১. ৬০

মাউণ্টব্যাটেন, লর্ড লুই

মাউণ্টব্যাটেন ভারত পরিদর্শনে আসছেন। লর্ড লুই ফ্রান্সিস অ্যালবার্ট ভিক্টর নিকোলাস মাউণ্টব্যাটেন আর্ল অব বার্মা···যিনি ইংল্যাণ্ডের মহামান্য রানীর পার্শ্বচর এবং যুক্তরাজ্যের ডিফেন্স স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে উপস্থিত যিনি বৃটিশ জল-স্থল-বিমান বাহিনীর সর্বেশ্বর। নানা দিক থেকে তাঁর এই আগমন তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, চীনা আক্রমণের পরে আজকের ভারতের মানসিক পরিবেশ। দ্বিতীয়ত, অস্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত অদ্যকার ভারতের বিশেষ সামরিক প্রয়োজন

ও পরিস্থিতি; তৃতীয়ত, মাউণ্ট-ব্যাটেনের প্রবাদতুল্য ব্যক্তিত্ব। বিশেষ করে এই তৃতীয়টি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা আছে যাঁদের তাঁরাই জানেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের আগমন-নির্গমন ঘটনা হিসেবে কত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষটি আবার যথাস্থানে ফিরে যাওয়ার আগে কারও সাধ্য নেই ফলাফল সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

মহামান্য ভাইসরয়ের আসনটির পিছনে দেওয়ালপঞ্জী ঝোলানো থাকত একটা। তাতে লেখা ছিল—'ডেজ লেফট টু প্রিপেয়ার ফর ট্রান্সফার অব পাওয়ার।' যাত্রার আগে অ্যাটলি সেই তারিখটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন ৩০শে জুন, ১৯৪৮। '৪৮ সনের জুন মাসেই নয়াদিল্লি থেকে স্বদেশের দিকে যাত্রা করেছিলেন বটে মাউণ্টব্যাটেন। কিন্তু সেদিন তিনি আর ভারতে শেষ বৃটিশ ভাইসরয় নন, পরিচয় তাঁর—স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল। ওয়াভেলের শূন্য আসনে মাউণ্টব্যাটেন যেদিন ভাইসরয় হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেদিন তাঁর দেওয়াল পঞ্জীতে তারিখ ছিল ২৪শে মার্চ, ১৯৪৭। হাতে সময় ছিল মন্দ নয়। কিন্তু তবুও তিনি সময় নিয়েছিলেন মাত্র ক'টি মাস। তারই মধ্যে বিদ্রোহী কংগ্রেস জয়, তারই মধ্যে দেশ বিভাগ,—স্বাধীনতা। সে যেন কোন দুর্ধর্ষ সেনাপতির যুদ্ধজয়, অথবা কোন পাকা ডাক্তারের হাতে বড় অপারেশন। যাওয়ার দিনে দিল্লির গান্ধী ময়দানে দু'লক্ষ মানুষ সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন তাঁকে। মন্ত্রমুগ্ধ নেহরু স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন বন্ধু, আপনি যাদুকর।

যাদুকর রণক্ষেত্রেও।

দেহে প্রকৃত নীলরক্ত। বাবা প্রিন্স লুই ছিলেন অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত ব্যাটেনবার্গ বংশের রাজকুমার এবং ইংলণ্ডেশ্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জের অন্যতম 'কাজিন'। মা রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ছিলেন হেস-এর গ্রাণ্ড ডিউক চতুর্থ লুইয়ের কন্যা। সম্পর্কে তিনি ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আপন নাতনী। সত্য বটে, ইদানীং অবসর পেলেই মাউণ্টব্যাটেন সেই উজ্জ্বল কুলপঞ্জীটি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেন,—কিন্তু সে গৃহপ্রত্যাগত সৈনিকের অবসর বিনোদন মাত্র,—মাউণ্টব্যাটেন আবাল্য দুর্ধর্ষ সৈনিক, বিখ্যাত যোদ্ধা।

জন্ম—এই শতাব্দীর জন্মদিনের ছ-মাস পরে, ১৯০০ সনের জুন মাসে, উইন্ডসর-এর ফ্রগমোর হাউসে। কিন্তু

রাজকুমার জলে জলে ঘুরছেন সেই তের বছর বয়স থেকে। লকার্স পার্ক, ওসবোর্ণ এবং ডার্থ মাউথ-এর পাঠ সাঙ্গ করে সেই যে তিনি রয়াল নেভিতে এলেন আর ফিরলেন না কোন দিন। প্রথম মহাযুদ্ধ দিনে বাবা ছিলেন—নৌ-বাহিনীর অধিনায়ক। জার্মান রক্তের জন্যে জনতার দাবী মেনে পদত্যাগ করতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু পুত্র নাম বদল করে ঠায় দাঁড়িয়েছিল 'কুইন এলিজাবেথ'-এর ডেকে (মাউন্টব্যাটেন মানে ব্যাটেন-বার্গ)। সেদিন যেমন হাতে দূরবীন নিয়ে অনেক সাব-লেফটেনাণ্টের বেশে জাহাজে জাহাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তরুণ নাবিক, তেমনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দিনেও। উর্দি বদল হয়েছে বটে, কিন্তু নেশা ঠিক তেমনি আছে। বরং প্রত্যক্ষ সময়ে আকর্ষণ আরও বেড়েছে। কখনও ইংলিশ চ্যানেল, কখনও ভূমধ্য সাগর, কখনও দূর প্রাচ্যের দরিয়া—বৃটিশ নৌ সেনাপতি মাউন্টব্যাটেন সেদিন দেশে দেশে বিস্ময়কর সংবাদ। কতবার যে জাহাজ ডুবির মুহূর্তে সাবমেরিন এসে শত্রুর এলাকা থেকে তুলে নিয়ে গেছে তাঁকে তার হিসেব নাই। মাউন্টব্যাটেন একবার বলেছিলেন—মজা সেখানেই, তুমি নিশ্চিত জান শেষ পর্যন্ত তুমি বাঁচবেই। ক্রীটের উপকূলে 'কেলি' ডুবে যাওয়ার পর তার সেনাপতি খেদ করে বলেছিলেন—মায়া হচ্ছে দুটো জিনিসের জন্যে; রাজা-রানীর যুগ্ম ফটো ছিল একটা,—সেটা গেল, আর গেল ডিউক অব উইন্সর-এর দেওয়া রূপোর সিগারেট কেসটা। তাতে লেখা ছিল—'টু ডিয়ার ডিকি, উইথ লাভ।'

আচরণে যাদুকর চিরকাল খানদানী।

বিয়ে করেছেন খানদানী বংশে। স্ত্রী সিন্থিয়া অ্যাসলি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত মন্ত্রী লর্ড অ্যাসলির কন্যা। নিজের মেয়ে প্যাট্রিসিয়ম এবং পামেলারও বিয়ে হয়েছে উপযুক্ত পাত্রে। নৌ-সেনাপতির এককালে বাস পার্ক লেনের বিখ্যাত 'ব্রুকহাউস'-এ। পরবর্তীকালে ঠিকানা বদল করে হাইড পার্কের যে বাড়ীটিকে তিনি আস্তানা করেন তাতে ঘর ছিল ৩০টি এবং ১৯৩২ সনেও তার বার্ষিক ভাড়া ছিল ৩,২০০ পাউণ্ড। বাড়িটির অন্যতম দ্রষ্টব্য ছিল নাকি তার বৈদ্যুতিক অঙ্গাভরণ। সেগুলো পর-বর্তীকালে কেম্ব্রিজের ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের পাকা ছাত্র মাউন্টব্যাটেনের আপন

মস্তিষ্ক-প্রসূত। তাঁর উদ্ভাবিত একটি বিশেষ বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া তত্ত্ব হিসেবে নৌ-বিজ্ঞানেও স্থান পেয়েছে।

যুদ্ধ, বিদ্যুৎ এবং জাহাজ ছাড়া মাউণ্টব্যাটেনের অন্যান্য নেশার মধ্যে ছিল নাকি নাইটক্লাব এবং পোলো। যুদ্ধের মধ্যে সবচেয়ে মাথা খেলে তাঁর গেরিলা যুদ্ধে, খেলার মধ্যে পোলোতে। একদা পোলো বিষয়ে একখানি প্রামাণ্য বইও লিখেছিলেন তিনি। অবশ্য ছদ্মনামে। লেখকের নাম ছিল তাতে—মার্কো। মাউণ্টব্যাটেন সৎ লর্ডের মত হাসতেও জানেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যখন জল-স্থল-বিমান বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয় তাঁকে তখন তিনি বলেছিলেন—আমি জেব্রা হলাম। দেখছ না অতঃপর আমার তিন ভাগের একভাগ জল, একভাগ স্থল, একভাগ আকাশ!

১১. ৪. ৬৩

মাধোক, বলরাজ

প্রেসটিজ ফাইট। সুতরাং এহেন সময়ে প্রায় দশহাজার ভোটে বিজয় ঘটনা বৈকি!

দিল্লির উপনির্বাচনে ভারতীয় জনসংঘ যে মানুষটির হাত দিয়ে এই সম্মানের পতাকাটি হাতে নিলেন, নাম তাঁর—অধ্যাপক বলরাজ মাধোক। আমাদের লোকসভায় তিনিই সেই সদ্যাগত সদস্য।

জন্ম একচল্লিশ বছর আগে, পশ্চিম পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলায়। কিন্তু ছোটবেলা কেটেছে কাশ্মীরে। কেননা, বাবা সেখানেই কাজ করতেন। তিনি ছিলেন রাজ-সরকারের রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী।

লেখা পড়া কিছু কাশ্মীরে, তবে বেশীর ভাগটুকু পাঞ্জাবে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শ্রীমাধোক ইতিহাসে প্রথম শ্রেণী পেয়েই আবার চলে এলেন কাশ্মীরে, শ্রীনগরের ডি এ ভি কলেজে।

ইতিহাস পড়াতে পড়াতেই 'সমাজ চিন্তা' মাথায় ঢুকল। তরুণ অধ্যাপক রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘে নাম লেখালেন। তারপর নিজেই এক আর এস এস বাহিনী গড়ে তুললেন। ভারত যখন ভাগ হচ্ছে, তখন তিনি কাশ্মীর রাজ্য আর এস এস বাহিনীর সংগঠক এবং ভাবছেন কি করে প্রজা পরিষদ নামক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা যায়।

শোনা যায়, হানাদারদের বিরুদ্ধে সৈন্যদের সেদিন যাঁরা সক্রিয় সাহায্য করেছিলেন, শ্রীমাধোক এবং তাঁর

সহকর্মীরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবুও রাজ্যে যখন শান্তি ফিরে এল, তখন দেখা গেল শ্রীমাধোক আর কাশ্মীরে নেই।

স্থান: ভারতীয় লোক সভা। কাল: ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৬১।

উত্তর দিতে উঠে দাঁড়ালেন পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না। '—আমার মাননীয় বন্ধু আজই প্রথম লোক সভায় এসেছেন। আই ক্যান অনলি সে দ্যাট আই হ্যাড দি মিস ফরচুন অব নট লীসনিং টু হিজ ইলেকশান স্পীচেস। আজ সে আশা পূর্ণ হল। একটু আগেই গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওঁর বক্তৃতা শুনলাম। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যেন ইলেকসান বক্তৃতাই শুনছি!'—খান্নার কণ্ঠে স্পষ্ট ব্যঙ্গের স্বর।

ইঙ্গিত বোঝা মাত্র তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন দ্বিতীয় পাঞ্জাবী। একচল্লিশ বছরের তরুণ, প্রবীণ আর এস এস-ম্যান। কিন্তু বেশীদূর এগোতে হল না। ডেপুটি স্পীকার মুখ খুললেন। খান্নার দিকে তাকিয়ে বললেন—'দি অনারএবল মিনিস্টার মাস্ট পে হিম সাম রেসপেক্ট!'

মুহূর্তে খান্না ভেঙে পড়লেন। মাইক্রোফোনএর সামনে দাঁড়িয়েই তিনি ক্ষমা চাইলেন। বিজয়ী বীরের মত নবাগত সদস্য নিজ আসনে বসলেন। আজও তিনি বিজয়ী।

পরপর দুইটি বিজয়। এটি হয়ত অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু ইন্দ্রপ্রস্থের খোলা মাঠে মাত্র দু'দিন আগে যে লড়াই লড়েছেন তিনি, সেটি নিশ্চয় অবহেলার নয়। একে রাজধানী, তদুপরি গুরুতর আসন। এক কথায় যাকে বলে তাঁকে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। তিনি এখন দিল্লিতে আছেন।

রাজধানীতে নতুন দিল্লি ডি এ ভি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীমাধোক-এর অনেক পরিচয়। তিনি দিল্লির বিদ্যার্থী পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা এবং ভারতীয় জনসংঘের অন্যতম উদ্যোক্তা। শ্রীমাধোক এখন দিল্লিরাজ্য জনসংঘের সভাপতি এবং পাঞ্জাব-দিল্লি, হিমাচল-কাশ্মীর তথা দলের উত্তর পশ্চিম আঞ্চলিক পরিষদের সম্পাদক। তবে উপস্থিত তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়—তিনিই সেই বিজয়ী, গেল ২রা এপ্রিল যাঁর কাছে 'রাজকুল' পরাজিত। ১৩. ৪. ৬১

মালিক, বিধুভূষণ

পটল ডাঙ্গার বসুমল্লিকদেরই একটি শাখা। ভদ্রাসন ছিল—বর্ধমানের

একচক্র গ্রাম। তবুও মল্লিক নয়, 'মালিক'। কেননা, একদা বেনারস স্টেটের বিখ্যাত দেওয়ান এবং পরবর্তীকালে স্টেটের প্রধান বিচারপতি বাবা চন্দ্রশেখর মালিক ছিলেন সন্ধানী পুরুষ। অনেক ঘেঁটে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন—'মল্লিক' নয়, নবাবী খেতাবটা আসলে ছিল—'মালিক'।

সুতরাং গড়গড় করে বাংলা বললেও ডালভাত-চচ্চড়িতে এখনও সমান মন থাকলেও দেওয়ান সাহেবের একমাত্র জীবিত পুত্র (আগে ছিলেন দুই ভাই তিন বোন, এখন শুধু তিনি আর দুই বোন) বিধুভূষণও তাই লেখেন। এবং বাবার মতই বিশ্বাস সহকারে।

শুধু পদবী বদলে নয়, চেহারার দিকে তাকালে জানা যাবে আত্মবিশ্বাস মানুষটির চোখে, মুখে, নাকে—সর্বত্র। বয়স সাতষট্টিতে পৌঁছেচে—কিন্তু বিধুভূষণ যেন এখনও সেই উনত্রিশেই আছেন। সেদিনের মতই এখনও তাঁর চকচকে মাথা, দৃঢ় পদক্ষেপ। পরিচিতরা তখন বলতেন—অল্প-বয়সেই চেহারা চালচলনে বুড়ো হয়ে গেল ছেলেটি, এখন বলেন—বার্ধক্যে কর্মশক্তিতে তরুণ রয়ে গেলেন মানুষটি।

লেখাপড়াও বাইরে বাইরেই। প্রথমে বেনারসে, তারপর এলাহাবাদে। এলাহাবাদ থেকে 'ল' পাশ করার পর বেনারস স্টেটের বৃত্তি নিয়ে বিলেত গিয়েছিলেন। ফিরে এসে অনেকদিন পর্যন্ত এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যারিস্টার ছিলেন। তারপর খ্যাতির পুরস্কার হিসেবে এক সময় মনোনীত হলেন পিউনি জজ এবং অবশেষে এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, সম্ভবত বিধুভূষণই প্রথম বাঙ্গালী প্রধান বিচারপতি।

উত্তর প্রদেশে বিখ্যাত বিচারপতি মালিক রাজধানী দিল্লিতেও সুখ্যাত ব্যক্তি। '৫৪ সনে হাইকোর্ট থেকে অবসর নেওয়ার পর থেকে নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজে ইতিমধ্যেই সেখানেও তিনি নিজের যোগ্যতাকে প্রমাণ করেছেন। ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি কেনিয়া এবং মালয়ে শাসনতন্ত্র রচনায় উপদেষ্টার কাজ করেছেন। উপস্থিত একই কাজে কঙ্গো আছেন। তাছাড়া শ্রীমালিকই ছিলেন '৫৮ সনে গঠিত বিখ্যাত সংখ্যালঘু ভাষা সম্পর্কিত কমিটির চেয়ারম্যান। অথচ আশ্চর্য এই, বাইরে এমন খ্যাতিমান পুরুষ হলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

নবনিযুক্ত উপাচার্যের এ শহরে সত্যিকারের আপনজন বলতে শোনা যায় মাত্র দু'জন কিংবা দু'টি পরিবার। এক গ্রে স্ট্রীটের বিখ্যাত মিত্র পরিবার। বিধুভূষণ সে বাড়ীরই জামাতা। জাস্টিস সারদাচরণ মিত্রের নাতনী লীলাবতী ছিলেন তাঁর গৃহিণী। কলকাতায় তাঁর দ্বিতীয় চেনা মানুষ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। কেননা, সরোজিনী নাইডুর মৃত্যুর পরে প্রায় ছ'মাস তিনিই ছিলেন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল ভবনে ! ১৪. ৯. ৬২

মাসানি, এম. আর.

সঙ্গে পাসপোর্ট ছিল। বৃটিশ পাসপোর্ট। কিন্তু মেয়াদ তার ফুরিয়ে যায় যায়। ভয় ছিল, ভারত সরকার হয়ত আর রিনিউ করবেন না। কোনদিনই যাওয়া হবে না। সুতরাং, নিঃশব্দে বোম্বাই থেকে কলম্বো সরে পড়লেন। সেখান থেকে সোজা লণ্ডন। কর্তৃপক্ষ পাসপোর্ট আটক করলেন। শত্রুপক্ষের দেশ হলেও বন্ধুর অভাব ছিল না। লেবার পার্টি হৈ চৈ শুরু করলেন, বেপরোয়া ভারতীয় তরুণ খবরের কাগজে সংবাদ হলেন। নিরুপায় সরকার হাতের কাগজ আবার হাতে ফিরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রী চললেন রাশিয়ায়। কেননা, নিজের চোখে 'বিশ্ব শ্রমিকের পিতৃ-ভূমি'টা একবার দেখে আসা দরকার। নয়ত, জীবন অসম্পূর্ণ।

এসব ১৯৩৪ সনের আগস্ট মাসের কথা। মাসানির বয়স তখন মাত্র ত্রিশ। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি বোম্বাইয়ের কলেজের পড়া শেষ করে ফেলেছেন। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস এবং লিন্‌কনস বার-এর ছাড়পত্র সংগ্রহও সারা। ব্যারিস্টারী করেন। কিন্তু সে নামে মাত্র। তার চেয়েও স্যার রুস্তম মাসানির এই পুত্রটির বেশী মন যেন বাউণ্ডুলেপনায়। আটাশ বছর বয়সে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন ; ইতিমধ্যেই একবার জেল খেটেছেন। উপস্থিত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি নিয়ে মেতে আছেন। সেই নয়া পার্টির তিনি একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সম্পাদক।

স্বভাবতই মাসানি তখন সম্পূর্ণ অন্য ধাতের মানুষ। ধরাধরি করে মায়ের কাছ থেকে গাড়ি আদায় করেছেন একখানা। তাই নিয়ে দিন রাত ভোঁ ভোঁ করে ঘুরে বেড়াতেন। যখন তেল থাকত না নিজের হাতে ঠেলতেন। ধার করে চা খেতেন। মাসানি তখন জওহরলালের কাছে 'কমরেড

মাসানি।' রাশিয়া দেখতে গিয়ে তিনি মনে মনে চেঁচিয়ে ওঠেন—'হাউ সুইট টু বি এ ক্রিমিন্যাল!'

আজ আর সেদিন নেই। মুখে মুখে চলতে চলতে মিনুচার রুস্তম এখন 'মিনু' বটে, কিন্তু তাঁর বয়স হয়েছে। '৪৬ সনে শকুন্তলা শ্রীবাস্তবকে নিয়ে তিনি সংসার পেতেছেন। মাসানি এখন প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। তাছাড়া, তাঁর নিজেরও একজন উত্তরাধিকারী আছে। তিনি পিতা। তার চেয়েও বড় কথা, শুধু জীবনে নয়, একদা প্রবল সোস্যালিস্ট মাসানির অভিজ্ঞতাও আজ বেড়েছে। শুধু রাশিয়া নয়, তারপরে তিনি আরও অনেক কিছু দেখেছেন, অনেক কিছু জেনেছেন। 'আওয়ার ইণ্ডিয়া' থেকে বোম্বাই পরিকল্পনা, স্বাধীনতা,—বোম্বাইয়ের মেয়রের আসন থেকে ব্রেজিলে রাষ্ট্রদূতের পদ, টাটা কোম্পানি থেকে ছাঁচে ঢালা পাঁচসলা, 'পারমিট রাজ', তিব্বত, চীন এবং কী নয়!

পুনঃ পুনঃ বিচার করে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিজীবী মাসানি বহুকাল আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন সোস্যালিজম অচল। চল্লিশের যুগের চীনের মত দেশে দ্রুত পোলারাইজেশন হচ্ছে। মাসানি বলেন—সেটা শঙ্কার কারণ। এর নিবৃত্তি আবশ্যক। এবং তার একমাত্র পথ-'স্বতন্ত্র'। স্বতন্ত্র মানে "স্বাধীনতা", শুধু মত প্রকাশের স্বাধীনতা নয়, জীবনের স্বাধীনতা, সম্পত্তির স্বাধীনতা। দলের জনক এবং সম্পাদক মাসানির মতে তাঁর আদর্শ—লিঙ্কনের একটি বাক্যঃ সরকার ততটুকুই শাসন করবে যতটুকু না করলে নয়। লক্ষ্যঃ ঘরে ঘরে স্বচ্ছলতা। পথঃ শিল্প ব্যাপারে পশ্চিম জার্মানী ('লেট দি মেন অ্যাণ্ড মানি লুজ অ্যাণ্ড দে উইল মেক দি কানট্রি স্ট্রং'—)—কৃষি ক্ষেত্রে জাপান!

শুনে প্রবীণ 'কমরেড' নেহরু বলেন—রিঅ্যাকশ্যনরি!

মাসানি জবাব দেন—স্যাডো-কমিউনিস্ট!

—ইয়েস আই এম! একবার উত্তর দিয়েছিলেন জওহরলাল,—পথের কথা বাদ দিলে আমি কমিউনিস্টদের সঙ্গে প্রায় একমত।

মাসানি হেসে ওঠেনঃ উনি বলেন, গায়ের দাগগুলো বাদ দিলে চিতা বাঘ অতিশয় উত্তম।

পার্লামেণ্ট ইতিপূর্বে দুই দুইবার দেখে চিনেছে শুধু কলমে 'কনসিভার'

আর 'রিকনসিডার' নয়, আটটি বইয়ের খ্যাতিমান লেখক মিনু মাসানি কথা বলতেও জানেন। ৩০. ৫. ৬৩.

মিকোয়ান, আনাস্তাস

অপেক্ষা করতে করতে রাত এগারটা হল। তবুও সোবিয়েত বাণিজ্যমন্ত্রীর দেখা নেই। মিকোয়ান এলেন বারটায়। বৃটিশ প্রতিনিধি হেরল্ড উইলসন রহস্য করে শুরু করলেন—'দি ট্রাবল উইথ ইউ রাশিয়ানস···', 'আই অ্যাম নট এ রাশিয়ান!'—সঙ্গে সঙ্গে উইলসনকে থামিয়ে দিলেন মিকোয়ান। 'প্রিমিয়ার স্ট্যালিন ইজ নট এ রাশিয়ান!' মিকোয়ান ঘরোয়া হয়ে উঠলেন। 'তোমার এখানে সাতটায় কোনদিন আসতে পারি না কেন জান?' 'কেন?'—কৌতুহলের সঙ্গেই জানতে চাইলেন উইলসন। '—কারণ, স্ট্যালিন আমাকে ছাড়ে না। ঐ সময়টায় ওঁর সঙ্গে আমাকে আড্ডা দিতে হয়,—একটু পানাহার করতে হয়।—এণ্ড ডু ইউ নো হোয়াট টোস্ট উই ড্রিঙ্ক?' মিকোয়ানের চোখে হাসি। উইলসন বিনীতভাবে বললেন—'তা আমি কি করে বলব।' টেবিল থেকে গ্লাসটা তুলে মিকোয়ান বললেন—'আমরা গ্লাস ঠোকা-ঠুকি করে বলি টু হেল উইথ দীজ ব্লাডি রাশিয়ানস!'

স্ট্যালিন জর্জিয়ার সন্তান, মিকোয়ান আরমেনিয়ার। বাবা ছিলেন ছুতার-মিস্ত্রী। চেয়েছিলেন ছেলে একটা বড় কিছু হোক। মিকোয়ানকে তিনি ধর্মীয় স্কুলে পাঠিয়েছিলেন পাদ্রী হতে। কিন্তু তরুণ মিকোয়ান বইয়ের পাতায় যতই ঈশ্বর খোঁজেন ঈশ্বর ততই দূরে চলে যান। সুতরাং, অনিবার্যভাবেই বলশেভিক হতে হল। এবার আর পুঁথিপত্রে নয়, হাতেকলমে। বাইশ বছরের নওজোয়ান আনাস্তাস ইভান-ভিচ্‌ মিকোয়ান '১৭ সনের বিপ্লবের সশস্ত্র লড়িয়ে।

বিপ্লবের আগুন নিভল, ধোঁয়া কাটল। স্ট্যালিনের চোখে পড়ল এই আরমেনিয়ান ছেলেটি। স্বভাবতই পায়ের সামনেই এবার উপরে ওঠার একখানা মই পেলেন মিকোয়ান। বন্ধুরা অনেকে স্ট্যালিনের হাতে মারা গেলেন, অনেকে হারিয়ে গেলেন, কিন্তু মিকোয়ান ধীর পায়ে উঠে চললেন। ক্রমে পলিট-ব্যুরোতে আসন মিলল এবং মন্ত্রিসভায়ও। মিকোয়ান মনোনীত হলেন রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী।

এই পদে মিকোয়ানের কৃতিত্ব আজ ইউরোপ আমেরিকায় এক বিস্ময়কর কাহিনী। মিকোয়ান বলেন, 'আমি রাশিয়ান নই এশিয়ান। তারপর আরমেনিয়ানদের ছেলে। সুতরাং ব্যবসা আমার রক্তে।'

লোকে বলে মিকোয়ান খোলাখুলি কথার মানুষ। এমন স্পষ্ট কথার মানুষ ক্রেমলিনে আর দ্বিতীয়টি নেই। স্ট্যালিন তখন জীবিত; এবং মিকোয়ান তখনও রোজ রাত্রে তাঁর সঙ্গে আড্ডা দেন। সেকালের কথা। বাড়িতে নন্-অফিসিয়াল ভোজসভা। তবে অনেক বাঘা বাঘা সরকারী ব্যক্তি উপস্থিত। মিসেস্ মিকোয়ান কথা প্রসঙ্গে খেদ করে বললেন—'সোবিয়েত দেশে নাইলন নেই। যা আছে, তার কোয়ালিটিও আমার মনে হয় যাচ্ছে-তাই', সঙ্গে সঙ্গে মিকোয়ান বলে উঠলেন —'ইয়েস মাই ডিয়ার ইয়ং লেডি, বাট উই হ্যাভ্ প্লেনটি অবপোর্টে্টস অব স্ট্যালিন!' প্রসঙ্গত বলা দরকার—এই ইয়ং 'লেডি'টি পাঁচটি সন্তানের জননী এবং এখনও নাচতে পারেন বটে, মিকোয়ানের বয়সও তিন কুড়ি পাঁচ!

যা হক, যথাসময়ে স্ট্যালিনের সেই বিখ্যাত ফর্দটিতে একদিন মিকোয়ানের নামও উঠল। কিন্তু, সেখানে পৌছাবার আগেই বিদায় নিতে হল বেচারাকে। এবার মিকোয়ানের প্রতিশোধ নেবার পালা। শোনা যায়, ক্রুশ্চফ স্ট্যালিনকে নিয়ে হট্টগোল শুরু করার আগে যিনি প্রকাশ্যে তাঁকে ডি-ভ্যালুয়েশন করিয়েছিলেন তাঁর নাম—আনাস্টাস মিকোয়ান। শুধু এ-কারণেই নয়, ক্রেমলিনের পরবর্তী নাটকগুলোতেও ক্রুশ্চফের পেছনে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন তিনিই। কিন্তু এবার বোধ হয় সত্যিই পট পরিবর্তন হয়ে গেল। শোনা যাচ্ছে, মিকোয়ানও নাকি এবার অস্তাচলের পথ ধরেছেন। সংবাদটা বিশ্বাস করতে হলে মিকোয়ানের দীর্ঘ কর্মময় জীবনটাকে অস্বীকার করতে হয়। কেননা, এ জীবনে উত্থান ছাড়া পতনের কোন সংবাদ নেই। ২৮. ৫. ৬০

মিকোয়ান আনাস্তাস আইভানোভিচ

পোলিশ দূতাবাসে সেদিন ভোজসভা। ক্রুশ্চফ বলে চলেছেন—'...পশ্চিমীরা আজ যা করছেন তা মূর্খের কাজ। মূর্খের মত তাঁরা...'

'...বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে!'

—শ্রোতাদের একজন আপত্তি তুললেন,—'বড্ড বাড়াবাড়ি।—ইট ইজ টু স্ট্রং!'

উক্তির সমর্থনে ক্রুশ্চফ শাস্ত্র থেকে ধার নিলেন—'লেনিন বলেছেন...লেনিন বলতেন!'

'—কিন্তু কে বললে আপনিই ঠিক বলছেন?' প্রতিবাদী সোজা হয়ে বসলেন। ক্রুশ্চফ এবার তাঁর চোখের দিকে তাকালেন। পরক্ষণেই দেখা গেল তিনি কথার ধরণ পাল্টে ফেলেছেন।

আর একবার!

নিকিতা সবে মুখ খুলেছেন,—'কমরেডস, ফ্রেণ্ডস, জেণ্টলম্যান!...'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন নির্ভয় মানুষটি। 'সামটাইমস্ ফ্রেণ্ডস আর অলসো জেণ্টেলম্যান!—ভুলে যাচ্ছ কেন বন্ধু, কখনও কখনও বন্ধুরাও ভদ্রলোক হয় বৈ কি!'

বন্ধু এবং ভদ্রলোক দুই-ই। যদিও কোন এক পশ্চিমী সাংবাদিক একবার ওঁর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছিলেন—'এ গ্যাংস্টার ইন টু সিল্ক সার্টস' তা হলেও একথা মনে করার কোন হেতু নেই যে ক্রেমলিনে ক্রুশ্চফের নিকটতম বন্ধু আনাস্তাস আইভানোভিচ মিকোয়ান 'ভদ্রলোক' নন। বরং সকলে (একমাত্র চু এন লাই ছাড়া। দ্রঃ—নিউ ইয়র্ক টাইমস; ২রা জানুয়ারী ১৯৫৪) একবাক্যে বলেন—'ভদ্রলোক বটে!' 'উইট্' বোঝেন, 'হিউমার' জানেন, ভাল পোশাক পরেন, নাচতে পারেন, ইংরেজী জানেন,—তার চেয়েও বড় কথা, ব্যবসা বোঝেন।

শেষোক্তিটির একটি কারণ যদি আরমেনিয়ান রক্ত হয়, তবে অন্য কারণটি নিশ্চয় মিকোয়ানের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। মলটভের পরে বলতে গেলে আজকের ক্রেমলিনে "পুরনো বলশেভিক (বয়স—সাতশট্টি) মিকোয়ান পার্টিতে আছেন সুদূর ১৯১৫ সন থেকে। এবং আছেন কোন বন্ধুবলে নয়, সম্পূর্ণ নিজের বুদ্ধিবলে। গৃহযুদ্ধের দিনে আজারবাইজানে তিন তিনবার ইংরেজরা আটক করেছিলেন ওঁকে। একবার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছিল পর্যন্ত। কিন্তু মিকোয়ান প্রতিবারই ফাঁকি দিয়েছিলেন শত্রুকে। ওঁরা তাঁর বড় ভাইকে গুলী করে হত্যা করেছিল, কিন্তু ছোট মিকোয়ানকে চতুর্থবার হাতে পাননি আর।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় মিকোয়ানের প্রধান পরিচয় ব্যবসায়ী। কমরেড

হিসাবেই অনেকদিন তিনি ছিলেন দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দপ্তরের পরিচালক। অনেকদিন বৈদেশিক-বাণিজ্যের। সেকালেই (১৯৩৬) আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা প্রথম পা দেন রুশ মাটিতে এবং রুশ বাণিজ্য-মন্ত্রী তিন মাসের জন্য বের হন আমেরিকা সফরে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই রাশিয়ানরা সরকারী দোকানে দোকানে ক'টি নতুন খাবার পেয়েছিলেন। যথা: কর্ন ফ্লেক, পাফড হুইট, টম্যাটো জুস, এবং আইসক্রীম! এখনও নিজের দেশে ক্রেমলিনের দ্বিতীয় মানুষ, প্রথম ডেপুটি প্রধান-মন্ত্রী মিকোয়ানের আর এক নাম—'আইসক্রীমের জনক।'

মিকোয়ান ভারত ঘুরে গেলেন। কে যেন বলেছিলেন, রুশ উপগ্রহগুলো ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিশ্বপরিক্রমা করে বটে, কিন্তু রুশ রাজপুরুষেরা বিদেশের মাটিতে পা দেন দৈবাৎ। কিন্তু মিকোয়ান তার ব্যতিক্রম। কেননা, মাত্র কদিনের ব্যবধানে তিনি দিল্লি দেখেছেন দু'বার। প্রথমবার ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার পথে, দ্বিতীয়বার—ফেরার পথে। বিশ্বের অনুমান হওয়া স্বাভাবিক আরমেনিয়ান শুধু 'আবহাওয়া নিয়ে আলাপ করতে' পথে নামেননি। বিশেষ, 'এম আই জি—২১' নামে যে বিমানটি নিয়ে আজ চতুর্দিক তোলপাড়, ওঁরা জানেন—সেই বিমানের মিকোয়ানেরই নামে নাম। অবশ্য মিগ-এর আবিষ্কর্তা মিকোয়ান আনাস্তাসের ছোট ভাই।

[মিকোয়ান ১৯৬৪ সনের···মাসে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির আসনে নির্বাচিত হন।] ২. ৮. ৬২

মিত্র, বীরেন

এক টাকার বিনিময়ে যাবতীয় সম্পত্তি!—মাত্র এক টাকা! শুধু আমার নয়, আমি এবং আমার স্ত্রী দু'জনের নামে যা কিছু আছে সব। অবশ্য, যাবতীয় দায় সহ।—এক টাকা!—মাত্র এক টাকা!

মনিঅর্ডারের ঢেউ থামতে না থামতেই আবার চাঞ্চল্যকর সংবাদ। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী এবার আরও মূল্যবান সম্পদ ছেড়ে দিচ্ছেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর আসনটিই বিলিয়ে দিতে চলেছেন। মূল্য—এবার আরও কম, একখানা বাসের টিকিট মাত্র।

—হ্যাঁ, বাসের টিকিট। প্রথমে টিকিট নিয়ে জনৈক ছাত্র বনাম সরকারী বাসের কর্মীদের ঝগড়া। হাতাহাতি, বচসা। তারপর—

পুরানো বিহার-উড়িষ্যা আইনসভার অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য বিখ্যাত নিমাই-চরণ মিত্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীবীরেন মিত্র রাজনীতিতে দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁর ছাত্র জীবনেই। তৎকালে র‍্যাভেনস' কলেজে তিনি একজন জনপ্রিয় ছাত্র নেতা।

বি. এ ডিগ্রী নিয়ে কলেজ থেকে বের হওয়ার পরও স্বদেশী আন্দোলনই তাঁর একমাত্র নেশা এবং পেশা। প্রথমে কটক মেডিক্যাল স্কুল ধর্মঘট। সে বে-আইনী ধর্মঘটের নেতৃত্ব করতে গিয়ে তরুণ নায়ক কারাগার চিনলেন। তারপর তিরিশের যুগে পরিচিত হলেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে। স্বভাবতই আর ঘরে ফেরার প্রশ্ন ওঠে না। শ্রীমিত্র বিয়াল্লিশের আন্দোলনে আরও সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। কারাবাস এবারও এড়ান গেল না।

জেল থেকে ফিরে এসে শ্রমিক আন্দোলন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সংগঠক শ্রীমিত্র উড়িষ্যার ইতিহাসে দীর্ঘতম শ্রমিক ধর্মঘটের নায়ক হিসেবে আজও শ্রমিক মহলে সুখ্যাত। বত্রিশ দিন স্থায়ী চৌদুয়ারের বিখ্যাত কাপড়ের কল ধর্মঘটের পেছনে তিনিই ছিলেন নায়ক। সুতরাং মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসলেও রাজ-বিধানসভা চলো। এবং অবশেষে তিনঘণ্টা ধরে বিধানসভা ভবনের ভেতরে ছাত্র-আন্দোলন! অপ্রত্যাশিত, অভূতপূর্ব, অনভিপ্রেত ঘটনা। সুতরাং, মুখ্যমন্ত্রী কবুল করলেন—তিনি আইনসভার মর্যাদা রাখতে পারেন নি। এরপর পদত্যাগ করাই তাঁর সঙ্কল্প। দিল্লির কর্তৃপক্ষ সায় দিয়েছেন। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী অচিরেই নেমে আসছেন।

বিরোধীপক্ষের দাবি মেনে নিতে নয়, দুনীর্তি প্রসঙ্গে যে সব অভিযোগ উঠেছিল তাতে সাড়া দিতে নয়,—একটি টিকিটকে কেন্দ্র করে যে অবাঞ্ছিত উন্মাদনার ঢেউ বয়ে গিয়েছিল গত ২রা রাজ্য বিধানসভায় তারই কলঙ্কের দায় মাথা পেতে নিয়ে এই রাজ্যত্যাগ। সুতরাং, ঘটনাটি স্মরণীয় সন্দেহ নেই!

সম্ভবত ভারতের কনিষ্ঠতম মুখ্যমন্ত্রী। শ্রীবীরেন মিত্র পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছেন অবশ্য মাত্র সেদিন। কিন্তু রাজনীতিতে তবুও তিনি পুরোপুরি নতুন মুখ নন। জন্ম তাঁর ১৯১৭ সনের ২৬শে নভেম্বর। কটকের বিখ্যাত অ্যাডভোকেট বিপিনবিহারী মিত্রের পুত্র এবং কটক জেলা বোর্ডের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান ও

নীতিতে যে তিনি যথার্থে নবাগত নন সে কথা উড়িষ্যার অন্তত অজানা নয়।

উড়িষ্যা বিধানসভায়ও শ্রীমিত্র রীতিমত পুরানো মুখ। ১৯৫২ সনের নির্বাচনের পর থেকেই তিনি সেখানে আছেন। প্রতিবারই তাঁর নির্বাচন কেন্দ্র কটক, এবং প্রতিবারই প্রতি-প্রতিযোগীদের সঙ্গে ভোটের ব্যবধান তাঁর বিস্তর। কটকে শ্রীমিত্র সাধারণেরই একজন। তাঁর ঘরের দরজা চব্বিশঘণ্টা খোলা, যে কেউ যখন তখন সেখানে আসতে পারে, তিনি—'জনতার মানুষ।'

এছাড়া আরও পরিচয় ছিল তাঁর। ১৯৪৭ সনের মে মাসে গণতন্ত্র পরিষদের আক্রমণে কংগ্রেস যেদিন বিপর্যস্ত সেদিন তরুণ কর্মী শ্রীমিত্রই এগিয়ে এসেছিলেন দলের পতাকার মর্যাদা রক্ষা করতে। শ্রীবিজু পট্টনায়কের ব্যক্তিগত বন্ধু এবং সহযোদ্ধা শ্রীমিত্র সেদিন উড়িষ্যায় কংগ্রেসের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের কাজে বিখ্যাত লড়িয়ে। ফলে ১৯৬১ সনের জুন মাসে পট্টনায়ক মন্ত্রীসভায় ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রীর আসনে তাঁকে উপবিষ্ট দেখে যেমন কেউ বিস্মিত হননি, তেমনি গত বছর সেপ্টেম্বরে কামরাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রীপট্টনায়কের পদত্যাগের পরে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নাম শুনেও উড়িষ্যায় অন্তত কেউ চমকে ওঠেননি। শ্রীমিত্র সেখানে শুধু সুপরিচিত নাম নন, দিল্লি প্রেরিত পর্যবেক্ষক হাফিজ মোহম্মদ ইব্রাহিম ঘুরে আসার পর জানা গিয়েছিল আইনসভায় কংগ্রেস দলে ওঁকে সমর্থন করেন না এমন সদস্য আছেন মাত্র তেরজন।

শপথ নিয়েছিলেন গত বছর ২রা অক্টোবর। পুরো এক বছরও ঘুরে এল না। উঠতে উঠতে এরই মধ্যে নেমে এলেন উড়িষ্যার নবীন নায়ক। কারণ,—হয়ত একটি বাসের টিকিট-ই, হয়ত তা নয়। কিন্তু ঘটনাটি তবুও তাৎপর্যপূর্ণ! অতঃপর কি করবেন শ্রীমিত্র? রাজনীতি অবশ্যই।

উল্লেখ্য: মন্ত্রীপরিচয় হালে পেলেও শ্রীমিত্র আজ বহুদিন ধরেই নাকি উড়িষ্যায়সর্বজন স্বীকৃত নেপথ্য নায়ক, তিনি সুখ্যাত 'কিং-মেকার।'

১১. ৯. ৬৪

মুখার্জি, অজয়

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২।

সঙ্কেতমাত্র 'বিদ্যুৎবাহিনী' কাজ শেষ করে ফেললেন। এদিকে পাঁশকুড়া, ওদিকে নরঘাট অন্যদিকে

মহিষাদল ; তমলুক ঘিরে যে এই ছোট্ট পৃথিবী সেখানে ইংরেজ-রাজের চিহ্ন মাত্র নেই। তিরিশটি সেতু উড়ে গেছে, সাতাশ মাইল পর্যন্ত টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের তার নেই, একশ' চুরানব্বইটি খুঁটি ইংরেজ-রাজত্বের ভগ্নশেষ হয়ে পথের দু'ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। এ অসাধ্য যাঁরা সাধন করেছেন তাঁরা তমলুকের দুর্জয় 'বিদ্যুৎবাহিনী' আর তাঁদের অবিশ্বাস্য অধিনায়ক ; নাম যাঁর—অজয় মুখার্জি, 'জাতীয় সরকারের' তিনিই ছিলেন—দ্বিতীয় 'সর্বাধিনায়ক।'

সৌম্য দর্শন, সদা হাসিমুখ। পায়ে চপ্পল, গায়ে গেরুয়া রঙের মোটা খাদির কামিজ। সে জামায় কোনদিন কেউ ইস্ত্রীর চিহ্ন দেখেননি। বোঝা যায়, হাঁটুর নীচে এসেই থেমে গেছে যে আট-হাতি কাপড়টি সেটিও হাতে কাচা। চেয়ার টেবিলের বালাই নেই। আসন বলতে একখানি 'ডিভান।' সেখানে বসে ধীরস্বরে কথা বলছেন যে মানুষটি, নিঃশব্দে ফাইলের পাহাড় পার হয়ে চলেছেন, তাঁকে দেখে ভাবাও যায় না—বিয়াল্লিশের তমলুক সেই আগুন, সেই বজ্রনির্ঘোষ এই মানুষটির কীর্তি।

চিরকাল এমনি স্বল্পবাক, এমনি গভীর, এমনি প্রশান্ত এবং এক আশ্চর্য ধাতুতে গড়া মানুষ। অজয় মুখার্জি সেই দুর্লভ জাতের মানুষ যাঁরা ঠিকানা পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্ব বদলান না—আসন বদলের সঙ্গে সঙ্গে যাঁদের নতুন পরিচয় লাভ হয় না। কি তমলুকের মহকুমা কংগ্রেস অফিসের ছেঁড়া মাদুরে, কি গোয়াবাগানের মন্ত্রিনিবাসে, কি রাইটার্স বিল্ডিংস-এর ওপরের তলার ঘরে, কি চৌরঙ্গীর কংগ্রেসভবনে অজয় মুখার্জি তিরিশ

২৯শে আহত সাম্রাজ্যবাদ প্রতিশোধে নামল। তমলুক শহরে সে যুদ্ধের ফল : ১০ জন নিহত, আহত—২২ জন। মহকুমার যোগফল আরও হৃদয়বিদারক, আরও গৌরবময়। নিহত—৪০, আহত—৩৪১, নারী নিগ্রহ—৭৩ ; বাড়ি পোড়ান হয়েছে—১১৭টি, লুট করা হয়েছে—১,০৪৪টি। তার ওপর ডিটেনশান, পাইকারী জরিমানা, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত,—বোমা বর্ষণ। তারই মধ্যে ডিসেম্বরের ১৭ই তারিখে প্রতিষ্ঠিত হল—তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার :—বিয়াল্লিশের আগষ্ট বিদ্রোহের অন্যতম কীর্তিসৌধ। এ গৌরবেরও অন্যতম অংশীদার সেই মানুষটি, নাম যাঁর—অজয় মুখার্জি।

বছর আগেও যে মানুষ, এখনও তেমনি : সেই—'অজয়দা', মেদিনীপুরের সেই অজয় মুখার্জি।

জন্ম—১৯০১ সনে, মেদিনীপুরের তমলুক শহরে। লেখাপড়া উত্তরপাড়ায় এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। কিশোর বয়স থেকে 'স্বদেশী' শ্রীমুখার্জি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এস-সি পড়ছেন ভারতে তখন জাতীয়তার উদ্দাম তরঙ্গ, প্রথম অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১)। মহাত্মার আহ্বানে কুড়ি বছরের তরুণ সেই যে লেবরেটারি ছেড়ে বেরিয়ে এলেন, আজও তিনি ঘরে ফেরেননি।

অজয় মুখার্জির এই ঘরে না ফেরা একটু স্বতন্ত্র ধরনের। আক্ষরিক অর্থেই তিনি রাজনৈতিক সন্ন্যাসী। জীবনের অনেকগুলো বছরই কেটেছে তাঁর জেলে জেলে। প্রথমে বারো বছরে চারবার, তারপর আরও কয়েকবার। অসহযোগের দিনে কংগ্রেস অফিসকে নিবাস করেছিলেন তিনি। এখনও সে-ই তাঁর স্থায়ী ঠিকানা। নিজের সংসার বলে কিছু নেই। অকৃতদার শ্রীমুখার্জি 'দেশে' গেলে সেখানেই বেশী সময় থাকেন। পৈত্রিক বাড়ী আছে। সেখানে ভাই থাকেন। রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি বিপরীতপন্থী। আদর্শনিষ্ঠ সংগ্রামী মুখার্জি সেখানে চরম ভ্রাতৃবিরোধী,—ভাইয়ের সঙ্গে নির্বাচন লড়তে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত নন। কিন্তু সে যুদ্ধের পরেই শত্রুপক্ষের ভাই তাঁর 'সহোদর।'

সন্ন্যাসীর এই দৃঢ়তা, মমতা এবং উদারতা নিয়েই বাংলার অন্যতম প্রবীণ রাজনীতিক শ্রীঅজয় মুখার্জির রাজনৈতিক জীবন। একটানা তিরিশ বছর ধরে তিনি তমলুক মহকুমা কংগ্রেসের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন, কিছুকাল জেলা কংগ্রেসেরও সম্পাদক ছিলেন। তাঁর আমলে কংগ্রেস শুধু 'সুখী পরিবার' নয়, যেন কোন ধর্মীয় ভ্রাতৃসঙ্ঘ। সেখানে কোন্দল-কলুষের গন্ধমাত্র নেই।

পশ্চিমবাংলার কংগ্রেস মন্ত্রিসভায়ও শ্রীমুখার্জি ছিলেন এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। ১৯৫২ সন থেকে সেদিনের কামরাজ পরিকল্পনা পর্যন্ত একটানা দীর্ঘদিন তিনি পশ্চিমবাংলার সেচমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। মেদিনীপুরের জাতীয় সরকারের 'সর্বাধিনায়ক' সেখানে কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্র ঔদাসীন্য না দেখিয়েই রাইটার্স বিল্ডিংস-এর বহু 'প্রবাদ' রেখে

গেছেন। কোনটি তাঁর পোষাক নিয়ে, কোনটি বাকভঙ্গী নিয়ে, কোনটি ফাইল ফুরোবার কায়দা নিয়ে। সেসব কথার সার : অজয় মুখার্জি এবাড়িতে এতদিন বাস করার পরও মেদিনীপুরের সেই 'অজয়দা'ই ছিলেন। সেটা আরও বোঝা গিয়েছিল কামরাজ আবির্ভূত হওয়ার পরে। অজয় মুখার্জি যেন সেদিন এক অধৈর্য খাঁচার পাখী, এতদিনে তিনি মুক্তির পথ পেয়েছেন। আবার ট্রাম, আবার মাদুর, আবার সেই অষ্টপ্রহর স্বদেশী—এতদিন মন্ত্রিত্বের পরেও যে কোন মানুষ তার জন্যে এমন উতলা হতে পারেন সেদিনের অজয় মুখার্জিকে না দেখলে হয়ত তা বিশ্বাসই হত না।

সংবাদ : শ্রীমুখার্জি এবার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি হতে চলেছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন, সেটা শুধু কংগ্রেসের পক্ষেই নয়, বাংলাদেশের পক্ষেও খবরের মত খবর।

২১. ৫. ৬৪

মুখার্জি, স্যার বীরেন

হাওড়ার ব্রীজ পার হতে হতে ওঁর কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে পলতার জলের কলের কথা ভাবতে, যেতে যেতে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে তাকাতে। ওঁর মানে বিশেষ কোন ইংরেজের কথা নয়, তাঁদের সামনে এগিয়ে গিয়ে, চেনা দিয়ে তৎকালীন হীনমন্যতা ভুলে রাজাপ্রজার ব্যবধান ঘুচিয়ে বসিরহাটের ভ্যাবলা গাঁয়ের মুখার্জি বাড়ীর যে ছেলেটি এই বৃহৎ কাণ্ডগুলোর সঙ্গে নিজের নাম চিরকালের মত জড়িয়ে নিয়েছে তাঁর কথা।—স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি, কে সি আই ই, কেসি ভি ও, ডি এস সি নামে একজন বাঙ্গালীর কথা। এক কথায় আজ পরিচয় যাঁর—'কর্মবীর রাজেন্দ্রনাথ।'

তাঁরই দ্বিতীয় পুত্র।

রাজেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'আমার ২য় পুত্রের সম্বন্ধে ইহা বলিতে পারি যে, যতদিন সে শিক্ষা সমাপন করিয়া আশাপ্রদ কর্মজীবনে প্রবেশ করে নাই, ততদিন তাহাকে সংসারধর্ম গ্রহণ করিতে কোন পীড়াপীড়িই করা হয় নাই।'

পিতার নিজের অবয়বে তৈরী স্যার বীরেন-এর জন্ম—১৮৯৯ সনে। লেখাপড়া প্রথমে কলকাতার হেষ্টিংস হাউস, তারপর শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, এবং অবশেষে ট্রিনিটি কলেজ, কেম্ব্রিজ।

সেখান থেকে পড়া শেষ করে

মেক্সিস, রবার্ট গর্ডন

দেশে ফিরে ১৯২৪ সনে বীরেন্দ্রনাথ যখন মার্টিন বার্ন কোম্পানীতে যোগ দেন তখন তিনি একজন অ্যাসিস্টেন্ট মাত্র। পার্টনার হন তার সাত বছর পরে। তার অনেক অনেক পরে—ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। তারপর সংসারধর্ম। স্ত্রী সুখ্যাত লেডি রাণু মুখার্জি। অথচ বার্ন এণ্ড কোং, স্টীল কর্পোরেশন অব বেঙ্গল—বলতে গেলে কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্য তাঁরই গড়া। সুতরাং, স্যার রাজেন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী হিসেবে এই বাঙ্গালী শিল্পপতির বিচক্ষণতা এবং কর্মক্ষমতার বিশদ ব্যাখ্যা অবান্তর। বিশেষ বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনা করে যে প্রতিনিধি দল ১৫ কোটি টাকা ঋণের ব্যবস্থা করেছেন তিনিই ছিলেন তাঁদের নায়ক।

শিল্পপতি স্যার বীরেনের যে পরিচয় অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞাত সেটি স্টীল ফার্নেসের চেয়েও কঠিন। জনতার হাটে তাঁর স্বচ্ছন্দে চলার ক্ষমতা। সেকালের ডিফেন্স কাউন্সিল বা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ছাড়াও বহুকাল শিবপুর কলেজের গভর্নিং বডিতে আছেন তিনি, এক সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেকাল্টি অব ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে ছিলেন, এবং '৪০-'৪১ সনে ছিলেন কলকাতার শেরিফ। সুতরাং সদ্য গঠিত ঔষধ অনুসন্ধান কমিটির প্রধানের আসনে দুই কন্যা এক পুত্রের জনককে দেখে ভেজালের আতঙ্কে পীড়িত বাংলা দেশের মনে নির্ভরতা আসা স্বাভাবিক। ২, ৮, ৬২

মেঞ্জিস, রবার্ট গর্ডন

চেহারায়—দ্বিতীয় চার্চিল। স্বভাবেও। ভাল-লাগার তালিকায় আছে—মদ, সিগার, মর্যাদাবোধ, ক্ষমতাগৌরব এবং চার্চিলিয়ান ইংরেজীতে বক্তৃতা। পার্লামেন্টের একজন সদস্য একদিন আপত্তির সুরেই বললেন—'প্রধানমন্ত্রীর আত্মগর্ব যেন একটু অত্যধিক।'—'কনসিডারিং দি কম্প্যানি আই কিপ ইন দিস প্লেস ইট ইজ হার্ডলি সারপ্রাইজিং!'—উত্তর দিলেন মেঞ্জিস।

কথাটার মধ্যে গর্ব যেমন আছে, তেমনি সত্যও আছে কিছু কিছু। অষ্ট্রেলিয়ান পার্লামেন্টে অন্তত দ্বিতীয় কোন মেঞ্জিস নেই। এবং তার চেয়েও বড় কথা রবার্ট গর্ডন মেঞ্জিস নামক ঐ বিরাটকায় লোকটির সেখানে বসবারও কথা নয়।

ঠাকুর্দা শ্রমিক নেতা ছিলেন। বাবা চেয়েছিলেন শিল্পী হতে

মেঞ্জিসের সাধনা হল জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে। ছাত্র ভাল ছিলেন। সুতরাং বাবার পয়সা না থাকলেও পড়াশুনা চলল। এবং একসঙ্গে অনেকগুলো মেডেল ও আইনে ফার্স্টক্লাস অনার্স নিয়ে যথাসময়ে মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হলেন। শুরু হল জমজমাটি আইন ব্যবসা। ১৯২০ সন। মেঞ্জিসের বয়স তখন মোটে ২৬। অস্ট্রেলিয়ায় তিনি সবচেয়ে খ্যাতিমান ব্যারিষ্টার।

উদীয়মান তরুণ। সুতরাং বড়-ঘরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হল। জনৈক বিখ্যাত সেনেটারের কন্যাকে বিয়ে করলেন মেঞ্জিস। '২৯ সনে ইত্যাদি যোগাযোগের ফলেই সরকারী মর্যাদাও জুটল একটা। মেঞ্জিস দরবারী আইনবিদ হলেন। তিনি—'কিংস কাউন্সেল।' অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসে এত কম বয়সে কেউ কোনদিন এই সম্মান পায়নি।

সুখী মানুষ। সুখী পরিবার। দুই ছেলে, এক মেয়ে। প্রভূত রোজগার। কিন্তু ভাগ্য অন্য রকম। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী যিনি ছিলেন তিনি বললেন—রাজনীতিতে এস, তোমার আরও উন্নতি হবে। সে ১৯৩৪ সনের কথা। মেঞ্জিস কিছুতেই রাজী হবেন না। শেষে স্ত্রী অনেক বলে কয়ে মত করালেন। মেঞ্জিস মন্ত্রী হলেন, এবং যুগপৎ অস্ট্রেলিয়ার এটর্ণি জেনারেল। পাঁচ বছর পরে সোজা—প্রধানমন্ত্রী।

প্রায় তের বছর ধরে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রিত্ব করেছেন মেঞ্জিস। মাঝখানে আট বছর ('৪১—) রাজত্ব করেছে বিরোধী দল। কিন্তু ঘুরে-ফিরে আবার সেই উদ্ধত মানুষটির হাতেই আত্মসমর্পণ করেছে অস্ট্রেলিয়া। কেননা—মেঞ্জিস কাজের লোক। তাঁর অধীনেই অস্ট্রেলিয়া গৌরবের পথে চলেছে।

অস্ট্রেলিয়ার গৌরব মেঞ্জিসের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর একটু বাকযুদ্ধ হয়ে গেছে নিউইয়র্কে। বন্ধু আর বন্ধুতে যুদ্ধ। সুতরাং কে জিতেছেন সে প্রশ্ন অবান্তর। আমরা শুধু এইটুকু বলব এখানে যে, মেঞ্জিসও বক্তা।

একবার লণ্ডনে গায়ে একশ তিন ডিগ্রী জ্বর নিয়ে বক্তৃতা করছেন মেঞ্জিস। পাশে ডিউক অব গ্লাস্টার বসে। বক্তৃতা শেষ হল! মেঞ্জিস জানতে চাইলেন—'সার হোয়াট ডিড আই সে?'—'মাই ডিয়ার বয়, আই ডোণ্ট নো, বাট ইট্ ওয়াজ ড্যাম গুড।'

১৩. ১০. ৬০.

মেটিওস, এডওয়ার্ড লোপেজ

মাথায় মিসমিসে কালো চুল। টল-টলে কালো চোখ। উচ্চতায় পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি, ওজনে একশ সত্তর পাউণ্ড। মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্ট এডওয়ার্ড লোপেজ মেটিওসকে দেখলে মনেও হবেনা বয়স তাঁর বাহান্ন।

হঠাৎ তাকালে মনে হবে যেন কোন তরুণ গবেষক, অথবা অভিজাত কোন বিদেশী ক্রিকেট টিমের অধি-নায়ক। কিন্তু মুখ খোলামাত্র ভুল ভেঙ্গে যায়। জানা যায় আগের অনুমানগুলো পুরোপুরি মিথ্যে না হলেও—মানুষটির আসল পরিচয় অন্য, —তিনি রাষ্ট্রনায়ক।

খণ্ডভাবে বললে অবশ্য সবই বলা যেতে পারে। খ্যাতনামা পরিবারের ছেলে। মায়ের দিক থেকে মন্ত্রী-বংশ। লেখাপড়ায় আবাল্য দুর্ধর্ষ। এক সময় পড়ার খরচ চালাবার জন্যে লাই-ব্রেরীতে কাজ নিয়েছিলেন। পাঠ্য-তালিকা বহির্ভূত পাঠ্য সেই সময় থেকে আজও তাঁর এক দুরারোগ্য ব্যাধি। এবং সেই রোগের ফলে লোপেজ আজ ইউরোপীয় ও আমেরিকান সাহিত্যে সুখ্যাত পণ্ডিত। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস এবং সাহিত্য পড়িয়েছেন; আইন ব্যবসা করেছেন; '৫৮ সনে প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে ছাত্র আন্দোলন থেকে মন্ত্রিত্ব এমন কিছু নেই যাতে তিনি অংশীদার না হয়েছেন। এবং সর্বত্র সমান যোগ্যতা সহ। লোপেজ যখন দেশের শ্রমমন্ত্রী তখন তাঁর আমলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ দেখা দেয়—১৩,৩৮২টি; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট হয়েছিল মাত্র তেরটি ক্ষেত্রে। কেননা, ছাত্রজীবন থেকেই পোক্ত সোস্যালিস্ট লোপেজ বিশ্বাস করতেন ধর্মঘট জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর এবং যথেষ্ট সদিচ্ছা থাকলে তা এড়ান সম্ভব।

প্রগতিপন্থী লোপেজ আজ সবচেয়ে জনপ্রিয় নায়ক। শুধু নিজের দল 'দি পার্টি অব রেভলিউশনারি ইনষ্টি-টিউশনক' নয়, গোটা দেশ তাঁর ভক্ত, —অনুগত।

দলনির্বিশেষে এই আনুগত্যের আর একটি কারণ লোপেজ-এর ব্যক্তিত্ব। খেলার মাঠে, গানের আসরে, বক্সিং-এর রিং-এর পাশে সর্বত্র তিনি লভ্য। ক্রিকেট মাঠে অধিনায়কত্ব করেননি বটে, কিন্তু এককালে নিজেও ভাল খেলতেন, বক্সিং লড়তেন। ছেলেবেলায় অভ্যেস ছিল চল্লিশ মাইল হেঁটে মাকে দেখতে যাওয়া, বড় হয়ে

মেক্সিকোর ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট একবার 'হিচ হাইক' করেছিলেন—৮৫০ মাইল। গুয়াতেমালা অবধি সে পথটুকু যেতে সময় লেগেছিল তাঁর —৪৫ দিন।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এসেছেন স্ত্রী ইভা আর ওঁদের একমাত্র কন্যা। উল্লেখযোগ্য এই, প্রেসিডেন্টের মতই মেক্সিকোর 'ফার্স্ট লেডি' ছিলেন শিক্ষিকা। বিয়ের আগে তিনি স্কুলে পড়াতেন। ১১. ১০. ৬২

মেধী, বিষ্ণুরাম

এক সময় এই কলকাতাতেই ছাত্র ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান পড়তেন। বি. এস-সি'তে অনার্স পেয়ে ভাল-ছেলে হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সুতরাং মুখটি এখনও কারও কারও ভাসাভাসা মনে থাকতে পারে।

তারপর, বেশ কিছুকাল পরে আবার এই কলকাতায়ই ফিরে এসেছিলেন। এবার অবশ্য অন্য পরিচয়ে। বি. এস-সি'র পর এম. এস-সিও হয়েছিলেন, কিন্তু বিজ্ঞানচর্চাকে জীবিকা করার অবসর পাননি। আইন পড়ে তাই নিজের রাজ্যে ওকালতি শুরু করেছিলেন। তারই সফল পরিণতি হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজের সেই সুদর্শন তরুণটি সেবার কলকাতা হাইকোর্টে। গায়ে তাঁর অ্যাডভোকেটের পোষাক। যদিও প্রায় তেত্রিশ বছর আগেকার কথা, তাহলেও সবাই সেই সপ্রতিভ নবীন আইনজীবিটিকে ভুলে গেছেন এমন মনে করার কোন কারণ নেই। কেননা, আইনের আঙ্গিনায় তিনি হারিয়ে যাওয়ার মত মানুষ ছিলেন না। তাছাড়া পরিচয়ে যে অসম্পূর্ণতাটুকু ছিল সেটুকুও অনতিবিলম্বেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্টে থাকতে থাকতেই জানা গিয়েছিল শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী একটি টেঁকসই নাম। কলকাতা হাইকোর্ট যদিই বা তাঁকে ভুলে যায়, আসাম কোনদিন তা পারবে না।

সম্পন্ন ঘরের ছেলে। জন্ম—কামরূপ জেলার হাজো গাঁয়ে। (জন্ম সন—১৮৯০)। লেখাপড়া গৌহাটি এবং কলকাতা। তৎকালে গৌহাটির বিখ্যাত উকিল (১৯১৪—) শ্রীমেধী সামাজিক পরিচয়েও আসামে বিখ্যাত মানুষ। তিনি উত্তর গৌহাটির অন্যতম সম্ভ্রান্ত এবং সম্পন্ন নাগরিক জে আর ডেকা'র কন্যা শ্রীমতী নির্মলাকে বিয়ে করেছেন। তাছাড়া

জাতীয় আন্দোলনেও তিনি ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন। একুশে আইন অমান্য উপলক্ষে তিনি এক বছর জেল খেটে এসেছেন, ইতিমধ্যেই গৌহাটি লোকাল বোর্ডের প্রথম কংগ্রেসী চেয়ারম্যানের সম্মান লাভ করেছেন এবং লাহোর কংগ্রেসের পর থেকেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির আসনে আরূঢ় আছেন। তাছাড়া '৩০ সনে গৌহাটিতে যে কংগ্রেস বসে সেখানেও এই মেধীই ছিলেন অন্যতম নায়ক। সুতরাং, '৩১ সনে কলকাতা হাইকোর্টে নবাগত অ্যাডভোকেট শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী আদালত প্রাঙ্গণের বাইরে ইতিমধ্যেই রীতিমত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

তারপর আবার আইন অমান্য আন্দোলন, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ এবং অবশেষে 'ভারত ছাড়!' বিষ্ণুরাম মেধী প্রতিপদক্ষেপেই কংগ্রেস আন্দোলনে নির্ভীক সহচর। দুই দফায় চার বছর জেলে কাটিয়েছেন তিনি। তারই মধ্যে এক ফাঁকে '৩৭ সনের নির্বাচনে আইন সভায় এসেছেন, '৩৯ সনে রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে বসছেন এবং স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে আসামের রাজনৈতিক জীবনে ক্রমেই তিনি অনিবার্য হয়ে উঠছেন। তারই মধ্যে এল দেশ বিভাগ এবং স্বাধীনতা। '৪৬ সনের ফেব্রুয়ারীতে বিষ্ণুরাম রাজ্যের অর্থ এবং ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত দপ্তরের মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। '৫০ সনের আগস্ট পর্যন্ত তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন। তারপর থেকে পরবর্তী আট বছর আসামের রাজনৈতিক জীবনে তিনি আরও সম্মানিত, আরও গুরুত্বপূর্ণ নায়ক। শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী তখন সীমান্ত-রাজ্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী।

১৯৫৮ সনের ২৪শে জানুয়ারী থেকে সুদূর আসামের নায়ক শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী মাদ্রাজের গভর্নর। মুখ্যমন্ত্রীর আসন ত্যাগ করে তিনি আপন রাজ্য থেকে প্রবাসে পাড়ি দিয়েছেন। অতঃপর মাদ্রাজের রাজভবনে রাজ্যপালের ছকবাঁধা জীবনেই তাঁর অপরাহ্ণের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। সংবাদ: এবার তিনি সেখান থেকে বিদায় নিচ্ছেন! খবরটা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। কারণ নিয়োগ-বদলীর যে পূর্বাভাস প্রকাশিত হয়েছে তাতে শ্রীমেধীর রাজভবন ত্যাগের কথাটাই আছে, রাজভবন বদলের কোন খবর

নেই। তবে কি আসামের গৃহত্যাগী নায়ক আবার আসামেই ফিরে আসছেন? আর তা আসলেই কি তিনি গৌহাটিতে তাঁর উজানবাজারের বাড়িতে বসে বিশুদ্ধ অবসর যাপনে রাজী হবেন? অথবা আজীবন রাজনৈতিক মানুষ শ্রীমেধী রাজধানী শিলংয়ে তাঁর দ্বিতীয় ঠিকানা 'রক সাইড' নামে বাড়িটিকেই আস্তানা হিসেবে অধিকতর পছন্দ করবেন? বয়সের কথা বিবেচনা করলে অবশ্য সে সম্ভাবনার কথা মনে হয় না। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী শুধু রাজনৈতিক পুরুষ নন, আপন রাজ্যে চিরকাল পরিচয় তাঁর 'লৌহমানব'।

মেনন, ভি. কে. কৃষ্ণ

"জানেন, আপনার আগে একমাত্র জর্জ বার্নার্ড শ'ই এই সম্মান পেয়েছেন!" লণ্ডনের সেন্টপানক্রাস থেকে সেবার যখন ওঁকে 'ফ্রীডাম অব দি বারো' দেওয়া হয় তখন জনৈক অনুরাগী গর্বচ্ছলেই কথাটা বলেছিলেন।

"ও, তাই নাকি?" মেনন হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন,—"আফটার অল, ইট ওয়াজ নট সামথিং বেস্টোওড ক্রম এবাভ!" বেচারা সুহৃদ নীরব হয়ে গেলেন।

আর একবার। সেবার ('৫৪) রাষ্ট্রপতি শ্রীকৃষ্ণ মেননকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বন্ধুরা এসেছেন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে।—কিন্তু, এ কি? গম্ভীরমুখে বেরিয়ে এলেন মেনন। বললেন—'যা বলতে চান এক্ষুনি। হাতে আমার এক মিনিটও সময় নেই।'

নিউইয়র্কে সেবার ঘটনা আরও মারাত্মক। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করছিলেন। উত্তরে রেগে মেনন হাতের বেতের ছড়িটা বার করে শুধু শূন্যে নাচিয়ে দিলেন। ব্যস, সেই থেকেই নাম হয়ে গেল—কৃষ্ণ মেনন রামগরুড়ের ছানা, তিনি হাসতে জানেন না!

মেনন হাসতে জানেন না। তিনি মাংস খান না, সিগারেট খান না এবং বলতে গেলে প্রায় রাতই নাকি তিনি ঘুমান না। খাদ্যের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় চা, চিকিৎসার মধ্যে শীর্ষাসন তথা যোগাভ্যাস।

যোগী বাল্যকাল থেকেই। সুতরাং, অনিবার্যভাবেই ছাত্রজীবনে একমাত্র তপস্যা ছিল—অধ্যয়নং।

মেনন, ভি. কে. কৃষ্ণ

চার বোনের মধ্যে এক ভাই। তাতে বড়ঘরের ছেলে। বাড়ী ছিল ওঁদের বটে কালিকটে, কিন্তু কোচিন রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল পরিবারটির। বাবা—কোমাথ কৃষ্ণ কুরুপ ছিলেন খ্যাতনামা আইনজীবী। মা বেনেগলিল লক্ষ্মী কুট্টি আম্মাও ছিলেন বড়ঘরের মেয়ে। সুতরাং বাবার 'কৃষ্ণ' আর মায়ের 'বেনগল' নিয়ে যিনি 'ভি. কে.' তিনিই বা ছোট থাকবেন কেন ?

বড় হয়েও ছিলেন অস্তত লেখা পড়ায়। কৃষ্ণ মেনন মাদ্রাজ এবং লণ্ডন দু' জায়গাই ছিলেন নামকরা ছাত্র। তাছাড়া লণ্ডনে মেননের অন্য একটা পরিচয়ও ছিল। '২১ সনে মেনন অ্যানি বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত হোমরুল লীগের (তখন নাম কমন-ওয়েলথ ইণ্ডিয়া লীগ) সম্পাদক হয়েছেন। পরের বছর তাঁর উদ্যোগে 'কমনওয়েলথ' বাদ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি শুধু ইণ্ডিয়া লীগে পরিণত হয়েছে। মেননের শ্রমে সে প্রতিষ্ঠানে তখন প্রায় একশ'জন বৃটিশ এম. পি। তাঁদের অধিকাংশই শ্রমিক দলের। ইণ্ডিয়া লীগের সম্পাদক তাঁদের সঙ্গে দল করেন (ডাণ্ডী থেকে তিনি শ্রমিক দলের টিকিট নিয়ে ইলেকশানও লড়েছেন), সেন্ট পানক্রাস-এর বরো কাউন্সিলে বসে লণ্ডনের উন্নতি বিষয়ে পরামর্শ দেন, বিকেলে হাইড পার্কে ভারতের স্বাধীনতার নামে একাকী বক্তৃতা করেন, রাতে 'নিউ স্টেটস-ম্যানে'র জন্যে প্রবন্ধ লেখেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে বিস্তর প্রবন্ধ এবং পুস্তিকা লিখেছেন মেনন। তবে খ্যাতি তাঁর সবচেয়ে বেশী সম্পাদক হিসেবেই। উল্লেখযোগ্য, মেনন বিলেতের বিখ্যাত টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী লাইব্রেরীর গ্রন্থ-মালার সম্পাদক। তার চেয়েও উল্লেখ-যোগ্য, তিনিই বিখ্যাত 'পেলিক্যান' গ্রন্থাবলীর উদ্ভাবক এবং প্রথম সম্পাদক। এছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত বন্ধু মেনন জওহরলালজীর একাধিক বইয়ের ভূমিকা-লেখক।

প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত দূত, লণ্ডনে প্রথম ভারতীয় হাই-কমিশনার, য়ুনোয় ভারতের অন্যতম অবদান,—এক-কালের দপ্তরহীন এবং বর্তমানের প্রতিরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননের এ জীবনী বোম্বাইয়ের আগামী লড়াইয়ে কতখানি কাজে লাগবে বলা যায় না। কেননা, লোকে বলে—মেনন দেশের মেজাজ বোঝেন না, তিনি নিজের মত ছাড়া আর কারও

যুক্তি শোনেন না। অথচ আশ্চর্য এই এম. এ পরীক্ষায় লণ্ডনে মেনন যে বিশেষ থিসিসটি পেশ করেছিলেন তার শিরোনামা ছিল—"এন এক্সপারিমেণ্টাল স্টাডি অব দি মেণ্টাল প্রসেসেস ইনভল্‌ভ্‌ড ইন রিজনীং!"

আরও আশ্চর্য মেনন হাসতে জানেননা বলেছেন। কিন্তু তাঁরই লেখা একখানা বইয়ের নাম কি জানেন? —'দি ফিলজফি অব লাভার!'

২১. ৯. ৬১

[১৯৬২ সনের অক্টোবরে চীনা হামলার পরে শ্রীভি. কে. কৃষ্ণমেনন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর আসন ত্যাগ করেন।]

মেহতা, অশোক

চওড়া কপাল, টিকলো নাক! চাপ চাপ দাড়ি, হাল্কা শরীর। তদুপরি ধূসর বর্ণের প্যাণ্টের ওপর হাই-কলার কোট এবং পুরু কাচের আড়ালে বড় বড় দু'টি চোখ। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বোধ হয় কোন ইম্প্রেশানিস্ট শিল্পী, অথবা রিটায়ার্ড 'বিটনীক'। কিন্তু দুটোর কোনটাই নন। যোজনা-ভবনে নতুন মানুষ এসেছেন। অবশ্য গৃহকর্তা হয়ে নয়—সেই পাঁচমিশেলী সংসারে অন্যতমের দায়িত্ব নিয়ে। শ্রীঅশোক মেহতা এখন থেকে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান।

ব্যাপারটা অসবর্ণ হল এমন বলা চলে না। কেননা, পোষাকে-আসাকে এবং চাল-চলনে কখনও কখনও তেমন মনে হলেও শ্রীঅশোক মেহতা আজ 'অ্যাংগ্রি'ও নন, 'ইয়াংম্যান'ও নন। দাড়ি রাখছেন অবশ্য '৪০ সালের পর থেকেই। এবং কিউবাওয়ালাদের মত কোন রাজনৈতিক মানত হিসেবে নয়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণে। অনেকে বলেন সে কারণটি হাঁপানি। কৃশতনু মেহতা এজমা রোগী। সে শ্মশ্রুতেও আজ পাক ধরেছে। '৩০ সনে বোম্বাই স্কুল অব ইকনমিকস থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা উনিশ বছরের যে তরুণটি ছিল কংগ্রেস দরবারে "অ্যাংগ্রি ইয়ংম্যান" সেই বালক আজ বাহান্নয় পড়েছেন। সত্য বটে, আদর্শে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅশোক মেহতা এখনও অন্য-পন্থী। আবাদী-জয়পুরের বহু আগে থেকে, গেল পঁচিশ বছর ধরে তিনি পাকা-সমাজতন্ত্রী। তাছাড়া প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান এখনও দলের খাতায় নাম রেখেছেন। তদুপরি নিজের লেখা

মেহতা, অশোক

বইগুলো যদি রাজনীতিকের দ্বিতীয় অস্তিত্ব বলে মেনে নেওয়া হয়,—তবে একথা বলা শক্ত—মেহতা মত বদল করেছেন। বরং সম্ভবত তুলনায় অন্যটাই সত্য,—পরিকল্পনা কমিশনের পরিকল্পনা যাঁদের তাঁরাই পছন্দ পাল্টেছেন। 'কমপালশানস অব ব্যাকওয়ার্ড ইকনমি'তে আস্থাবান কোন 'ডেমক্রাটিক সোসালিস্ট'কেই বোধহয় ওঁরা এই মুহূর্তে মনে মনে খুঁজছিলেন।

দ্বিতীয়, সদ্য-নিষ্পন্ন এই প্রীতি-বন্ধনে প্রধান সূত্রটি আদর্শগত হলেও, অনেকে বলেন যোজনা-ভবনে মেহতার এই নতুন করে সংসার পাতার পেছনে একটি ব্যক্তিগত সূত্রও আছে। সেটি চেয়ারম্যান এবং ডেপুটি চেয়ারম্যানের পারস্পরিক গুণ-গ্রাহিতা। নেহরু সমালোচনায় শ্রীমেহতা কদাচিৎ আচার্য কৃপালনী অথবা রামমনোহর লোহিয়া। নেহরু তাঁর চোখে চিরকাল অদ্বিতীয় জন-নেতা। ঠিক তেমনি তৎকালে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের অন্যতম প্রেরণা জওহরলালের কাছে মেহতা এখনও আকর্ষণীয় প্রতিভা। দু'জনের চরিত্রেও মিল আছে কিছু কিছু। নেহরুর মতই তাঁর নবীন ডেপুটি—'মুডি'। কখনও তিনি গম্ভীর, কখনও হেসে লুটোপুটি। তার চেয়েও বড় মিল, চিন্তারতন্ত্রীতে দু'জনই স্পর্শ-কাতর। একজন পুরানো বন্ধু বলছিলেন—মেহতা?—ও, হি ইজ অলওয়েজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই দি লাস্ট বুক হি রীডস! অনেক সময় নেহরুজীও তাই। লোকে বলে—সে বছর নেহরু চীন ঘুরে এসেছিলেন বলেই—আবাদীতে ঐ প্রস্তাবটি উঠেছিল!

তবে বলা বাহুল্য, দুজনের মধ্যে গরমিলও অনেক। নেহরু জনতার মানুষ। কিন্তু যদিও আদিতে শ্রমিক নেতা, তাহলেও মেহতা কোনদিনই তা নন। সীমাবদ্ধ এবং বিশেষ ধরনের বুদ্ধি-চক্রের বাইরের জগৎ চিরকাল অকৃতদার মেহতার কাছে—সমুদ্র। রাশি রাশি চা, সিগারেট আর বই—তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধব। অন্যরা কুড়ি বছর একসঙ্গে চলেও সঠিক বলতে পারেন না—ওঁর সঙ্গে কোনদিন বন্ধুত্ব ছিল, কি ছিল না। মেহতার রাজনৈতিক জীবন চিরকাল তাই অন্য ধরনের,—বুদ্ধিজীবীর নিঃসঙ্গতা দিয়ে ঘেরা।

'কংগ্রেস সোসালিস্ট' এবং 'জনতার' সম্পাদক শ্রীঅশোক মেহতা

সুলেখক। তবে মাতৃভাষায় বলতে গেলে তিনি প্রায় মূক। তাঁর একটা কারণ গুজরাতের সন্তান মেহতা মানুষ হয়েছিলেন—মারাঠী প্রধান শোলাপুরে, কাকার কাছে। ফলে ইংরেজী এবং হিন্দীর মত মারাঠীতে তিনি চমৎকার বক্তা। কিন্তু দলের গুজরাতি-দৈনিকের সম্পাদক দিনের পর দিন সম্পাদকীয় লিখতেন ইংরেজীতে! অনুবাদক ছাড়া সেখানে তাঁর গতি নেই।

যোজনা-ভবনে সদ্যাগত ডেপুটি চেয়ারম্যানের এ জাতীয় কোন অসুবিধায় পড়ার আশঙ্কা নেই। তার প্রথম কারণ, ভারতীয় রাজনীতিকদের মধ্যে শ্রীঅশোক মেহতাই নাকি প্রথম মানুষ যিনি সুদূর অতীতে প্ল্যানিং সম্পর্কে একটি মৌলিক পুঁথি লিখেছিলেন। পাণ্ডুলিপি বহুদিন হারিয়ে গিয়েছে। অবশ্য মেহতা বলেন হারিয়ে ভালই হয়েছে! আজ নতুন করে লিখতেই হত নিশ্চয়। দ্বিতীয়ত, শত্রুরাও স্বীকার করেন মেহতা কাজ করতে জানেন। অর্থাৎ কাজ করাতেও। অন্যদের যে কাজ করতে পাঁচদিন লাগবে তাঁর পক্ষে সেখানে পাঁচ ঘণ্টাই যথেষ্ট। দশ মিনিটে তিনি কমপক্ষে পঁচিশটি চিঠি লিখতে পারেন। সুতরাং আশা করব এবার আর কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে 'ইয়েস' অথবা 'নো' জানতে সাড়ে তিন বছর অপেক্ষা করে থাকতে হবে না। এবং শ্রীঅশোক মেহতার কাছে অন্তত কোন বিদেশী বলতে পারবেন না—'ইউ ইণ্ডিয়ানস্ আর বিউটিফুল অ্যাট অ্যানালাইসিস বাট ইওর পারফরমেন্স ডু নট ম্যাচ ইওর প্ল্যানিং।' ৫. ১২. ৬৩

ম্যাকডোনাল্ড, ম্যালকম

মেকলে আর ম্যাকডোনাল্ড। দু'জনেই রাজপুরুষ, দু'জনেই ইংরাজ। কিন্তু আশ্চর্য, ঘটনা দুটো তবুও কিছুতেই যেন এক হল না।

ভারতে দীর্ঘ প্রবাস কাটিয়ে কলকাতা থেকে মেকলে যেদিন জাহাজে চড়েন চাঁদপাল ঘাটে সেদিন কেউ ছিল না তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে। ইংরেজী কাগজগুলো পর্যন্ত হাঁফ ছেড়ে লিখেছিল,—যাক, লোকটা তবে গেল!

আর ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড? সাড়ে পাঁচ বছর ভারতে বৃটিশ হাইকমিশনারের কাজ করে তিনি যখন স্বদেশে চলেছেন তখন বাংলা কাগজের সাংবাদিকেরও কেন জানি ইচ্ছে হচ্ছে তাঁকে অভিনন্দন

জানাতে। কারণটা কি শুধু কালগত ব্যবধান,—না, মানুষ দু'জনের মধ্যে কিছু গুণগত পার্থক্যও?

এক কথায় অদ্ভুত মানুষ। বিলেতের বিখ্যাত ম্যাকডোনাল্ড পরিবারের সন্তান। রামসে ম্যাকডোনাল্ডের পুত্র। সুতরাং, বলা বাহুল্য, অক্সফোর্ডের বহু আগে রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয়েছে তাঁর। তবুও মানুষটি কেমন যেন কিছুতেই চলতি ধারার পলিটিসিয়ান নন।

শ্রমিকদলের সঙ্গে পারিবারিক গোলমাল ঘটল। ফলে, চার চার বার প্রার্থী হয়ে ভোট পাওয়া গেল মাত্র—দু'বার। একবার ১৯২৯ সনে, আর একবার ১৯৩৬ সনে।

তবে পার্লামেন্টের পাশাপাশি হাতে-কলমে রাজনীতিটা বহাল রইল আগাগোড়া। '৩১ সনে ডোমিনিয়ান বিভাগে আণ্ডার সেক্রেটারী হলেন ম্যাকডোনাল্ড, '৩৫ সনে সেক্রেটারী। দু' বছর পরে কলোনিয়াল বিভাগের সেক্রেটারী। স্বভাবতই ভারত ম্যাকডোনাল্ডের বহুকালের পরিচিত দেশ।

তবুও এখানে আসতে আসতে পথে দেরী হয়ে গেল। '৪০ সনে চার্চিলের মন্ত্রিসভায় বসতে হল। '৪১ থেকে '৪৬—কানাডা, '৪৮ থেকে '৫৫ মালয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। মালয়ের বিখ্যাত গভর্ণর জেনারেল ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশ কমিশনার তথা কমাণ্ডার জেনারেল। এই দীর্ঘ সময়ে তাঁর কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: মালয়ের স্বাধীনতা এবং গোটা তিনেক বই। একটি পাখী বিষয়ক, দ্বিতীয়টির নাম—'বোর্নিও পিপল' ('৫৬) এবং তৃতীয়টি বিখ্যাত 'আঙ্কোর' ('৫৮)। পাখী, ছবি এবং লেখা ম্যাকডোনাল্ডের নেশা। ভারতীয় চিত্রকলা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান এবং সংগ্রহ দুটোই অতুলনীয়।

তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় যা সে তাঁর ব্যক্তিত্ব। ম্যাকডোনাল্ড ভারতে এসেছেন '৫৫ সনে। এই কয় বছরে বৃটেন এবং ভারত আরও কতখানি কাছাকাছি হল সে হিসেব নেওয়ার দায় আইনত দুই দেশের ফরেন অফিসের। আমরা শুধু এটুকুই বলব—ম্যাকডোনাল্ডের মত মানুষের কাছাকাছি গেলে মানুষ চিরকাল মানুষের নিকটবর্তী হয়।

উপসংহারে: ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড এবার উনষাট-এ পড়লেন। এবং বিখ্যাত রামসে ম্যাকডোনাল্ডের

ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী যিনি তিনি আর ম্যাকডোনাল্ড হচ্ছেন না। ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড একটিমাত্র কন্যা সন্তানের পিতা। ২০. ১০. ৬০

ম্যাকমিলান, হ্যারল্ড

—ইট'স ম্যাক, দি বুকি ! চেঁচিয়ে উঠেছিলেন বাকিংহাম প্যালেসের সামনে জমায়েত জনতার একজন। 'বুকি' মানে সেই লোকটি, চ্যান্সেলার অব এক্সচেকার হয়ে যিনি লটারি বণ্ড বেচতেন। সঙ্গে সঙ্গে আশাভঙ্গের লক্ষণ ফুটে উঠেছিল মুখে মুখে। কেউ কেউ ঘরের পথেও পা বাড়িয়েছিলেন। কেননা, সকলেই প্রায় সুনিশ্চিত ছিলেন অ্যাণ্টনি ইডেনের শূন্য আসনটিতে যিনি বসবেন তিনি পার্টি চেয়ারম্যান বাটলার। অনেকে তাঁকে নিয়ে বাজী পর্যন্ত ধরে ফেলেছেন !

তবুও সুয়েজের পর, ১৯৫৭ সনের জানুয়ারীতে ম্যাকমিলানেরই ডাক পড়েছিল বাকিংহাম প্যালেসে মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বরীর দস্তানা ঢাকা হাতটিতে ওষ্ঠ স্পর্শ করতে। কেননা, তদানীন্তন চ্যান্সেলার অব এক্সচেকার সাধারণের চোখে যত সাধারণ মানুষ বলেই বিবেচিত হোন না কেন, বৃটেনের যাঁরা সত্যিকারের গৃহকর্তা তাঁদের দৃষ্টিতে ঠিক তা ছিলেন না। বাষট্টি বছরের (এখন উনসত্তর) প্রবীণ টোরি ম্যাকমিলান তাঁদের কাছে এক বর্ণাঢ্য পুরুষ। জনৈক স্কচ কৃষকের এই পৌত্রটি শুধু যে ইটন এবং অক্সফোর্ডে লেখাপড়া শিখেছেন তাই নয়, বিখ্যাত বই কোম্পানি ম্যাকমিলান এণ্ড কোং-এর ভূতপূর্ব ডিরেক্টার—কোটিপতি ম্যাকমিলান আচারে আচরণে খাঁটি খানদানী ব্যক্তি। তাঁর কোটের কাটিং থেকে গোঁফের ছাঁটে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের আমলেও তিনি পাকা এডোয়ার্ডিয়ান !

তাছাড়া বৃটেনের সমসাময়িক রাজনীতিতেও ম্যাকমিলান অজ্ঞাত-কুলশীল নন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে তিনি ইংলণ্ডের রাজনীতিতে হাজির আছেন। সাধারণ সৈনিকের কাজ থেকে শুরু করে (প্রথম মহাযুদ্ধে তিন তিনবার আহত হয়েছিলেন) কানাডায় গভর্নর জেনারেলের পার্শ্বচর, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় মিত্র-শক্তির দপ্তরে বৃটেনের প্রতিনিধিত্ব; পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী থেকে চার্চিল এবং ইডেনের সহচর হিসেবে প্রায় সব দপ্তরে মন্ত্রিত্ব—ম্যাকমিলানের কর্মজীবন নানা সাফল্যে উজ্জ্বল। '৩৬ সনে ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণ

মেনে নেওয়ার প্রতিবাদে দলত্যাগ করে সেকালেও রীতিমত খ্যাতিমান রাজনীতিক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে চার্চিলের গৃহ-মন্ত্রী এবং ইডেনের অর্থমন্ত্রী হিসেবেও ম্যাক-মিলান স্বনামধন্য পুরুষ। লেবার পার্টির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সত্যিই বছর ঘুরে আসার আগে তিন লক্ষ নতুন বাড়ি তৈরি করিয়েছিলেন তিনি। অর্থমন্ত্রী ম্যাকমিলান আরও খ্যাতি-মান। আসনে বসেই তিনি হুকুম দিয়েছিলেন—সরকারী খরচ অন্তত তিরিশ কোটি ডলার কমান চাই! সেই থেকেই নাম হয় তাঁর—ম্যাক দি নাইফ! চল্লিশের যুগে এই ছুরিই টোরি দলকে চেঁছে ছেঁটে নতুন চেহারা দিয়েছিল আবার। 'দি মিড্‌ল ওয়ে'র লেখক ম্যাকমিলান তখন নতুন আদর্শের তরুণ পথপ্রদর্শক,—'কনসারভেটিভ নিউ ডিলার!'

তার পরও আরও একটি যোগ্যতা ছিল হ্যারল্ডের। যদিও বৃটেনের প্রকৃত নীল-রক্তধারীদের কুলপঞ্জীতে নিজের নাম ছাপাতে দিতে রাজী হননি স্কচ চাষীর নাতি, আমেরিকান মায়ের সন্তান (কেননা, 'যাঁরা আমার পূর্বপুরুষকে শোষণ করে নীলবর্ণ আমি তাঁদের খাতায় নাম লেখাতে নারাজ!') তাহলেও হ্যারল্ড ওঁদের অতি নিকটজন! ক্যানাডায় থাকা কালে গভর্নর জেনারেল ডিউক অব ডেভনশায়ারের রূপসী কন্যা লেডি ডরোথি ক্যাভেনডিসকে ভালবেসে নিজের ঘরে তুলে এনেছিলেন তরুণ এ. ডি. সি. ম্যাকমিলান। সেই সূত্রে নতুন করে বর্ণ পরিচয় লেখা হয়েছিল তাঁর। ডরোথির ভাই লর্ড সল্‌সবেরি বিখ্যাত সিসিলদের ঘরের ছেলে। সল্‌সবেরি টোরি দলের আসল নায়ক। 'লর্ড' বলে নিজের পক্ষে মন্ত্রী হওয়ার উপায় নেই তাঁর। কিন্তু তাই বলে মন্ত্রী গড়ায় আপত্তি থাকবে কেন? সিসিলরা রাণী প্রথম এলিজাবেথের আমল থেকেই তা করে আসছেন। সুতরাং পরমাত্মীয় ম্যাকমিলানকেই বা বসাতে দোষ কি! বিশেষ এক পুত্র, তিন কন্যা এবং গোটা দশ পনের নাতিনাতনীর বলে প্রবীণ ম্যাকমিলান যেখানে সত্যি সত্যিই আজ ওপরতলায় সুপ্রতিষ্ঠিত! তখনই হিসেব করে দেখা গিয়েছিল—পার্লামেন্টের দুই বাড়ি এবং 'এস্টাব্লিসমেন্টের' গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলোতে অন্তত দুশ' মানুষ তাঁর নিকট-আত্মীয়।

সুতরাং, চল্লিশ মিনিট পরে বাকিংহাম প্যালেস যখন আবার

দরজা খুলল তখন প্রতীক্ষায় থেকে থেকে ক্লান্ত বৃটেন জানল—বাটলার নয়, হ্যারল্ড ম্যাকমিলানই 'হার ম্যাজেষ্টিস প্রাইম মিনিস্টার এণ্ড ফার্ষ্ট লর্ড অব ট্রেজারী!'

—'ইউ নেভার হ্যাড ইট সো গুড!' দু'বছর পরে এই আশ্চর্য বাক্য মুখে নিয়ে অপেক্ষাকৃত সুস্থ সবল ইংল্যাণ্ডের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ম্যাকমিলান যখন প্রবল লেবার পার্টিকে নির্বাচনে আহ্বান জানিয়েছিলেন তখন কারও মনে সুয়েজের গ্লানি ছিল না, কোন পুরানো সমর্থকের মুখে টোরি-দলের মৃত্যু কামনা ছিল না। ইংল্যাণ্ড জেনেছিল 'ম্যাক দি নাইফ' 'ম্যাক দি ম্যাজিসিয়ানে' রূপান্তরিত হয়েছেন। তিনি শুধু মিশরের খালে ডুবে মরা টোরি দলকেই টেনে তোলেন নি। বৃটেনকে আবার সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। যোগ্যতায় 'ম্যাক' চার্চিল নন বটে, কিন্তু তিনিও নায়ক বটেন!

আর আজ?

কমন্সসভায় দ্বিতীয় হ্যারল্ড বলছেন —তুমি জুয়াড়ি নায়ক। আপন দলের ক্রুদ্ধ তরুণ নেহাৎ করুণাপরবশ হয়েই ক্রমওয়েলের বদলে ব্রাউনিং 'কোট্' করছেন—'লেট হিম নেভার কাম ব্যাক টু আস!' ইংল্যাণ্ড,—লজ্জিত, অপমানিত, ইংল্যাণ্ড বলছে—'এম.এম. জি,'—ম্যাক মাস্ট গো।—কীলারের পর রাজনৈতিক মৃত্যুই তাঁর একমাত্র সঙ্গত, স্বাভাবিক এবং অভিপ্রেত শাস্তি।'

ম্যাকমিলান কি সত্যিই চলে যাবেন? হয়ত। কাছাকাছি আজ আর কোন দ্বিতীয় সুয়েজ নেই! বরং ছ' বছর আগের নায়ক আজ নিজেই এখানে-ওখানে প্রতিদিন পরাজিত। কমন-মার্কেট, স্যগল; স্কাই-বোল্ট নাস্থ;—ম্যাকমিলান আজ বেশ কিছুদিন ধরেই যেন ক্রমশ কৃশ। একদা টোরি দলে যিনি বক্তৃতায় প্রথম ছিলেন—আজ টেলিভিশনে তার মুখ দেখে দর্শক চেঁচিয়ে ওঠেন—এটা স্কুলের মেয়েদের আসর নয়; তাঁর কালে অক্সফোর্ডের সেরা তার্কিক ম্যাকমিলান ক'ছত্র এগোতে না এগোতেই ছেলেরা আজ চেঁচিয়ে ওঠে—এটা অক্সফোর্ড, আমরা আরও কিছু 'বক্তব্য' চাই! ক'বছর আগেও পার্লামেণ্টে ম্যাকমিলান ছিলেন তীক্ষ্ণ তার্কিক, মাথা বোঝাই ধারালো তীর নিয়ে তিনি আসনে বসতেন, আজ তাঁর হাসির কথা শুনেও কেউ হাসে

না,—শ্রমিক দল বলে—'বুড়ো পঞ্চম শ্রেণীর কমেডিয়ান !'

ম্যাকমিলান নিজেও তা জানতেন। '৬১ সনের অক্টোবরে ব্রাইটনে দলের বার্ষিক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন—সেক্সপিয়ারের সেই হিরোর মত (সম্ভবত 'অলস্ ওয়েল ছ্যাট এণ্ডস ওয়েল'-এর রাজা) আমি—তেল ফুরিয়ে যাওয়ার পরও জ্বলতে চাই না।

২০. ৬. ৬৩.

ম্যাকলিওড, আয়ান

বাপ ছিলেন—চিকিৎসক। শ্বশুর যাজক। সুতরাং নীল রক্ত কোথাও নেই। না দেহে, না কুটুম্ব তালিকায়। তবুও যে মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সে মানুষটি টোরি-কুল-তিলক হয়ে গেলেন সে অন্য কারণে।

প্রথম কারণ নিশ্চয়ই দলে বিশুদ্ধ নীল-রক্তাল্পতা। কিন্তু দ্বিতীয় এবং শেষ কারণ সম্ভবত—মানুষটির সাহসিকতা। লোকে বলে, টোরি-দলে 'ছোট-ম্যাক' সাহসে অর্জুন।

কথাটা সত্য। এককালে নিজের হাতে লড়াই করেছেন আয়ান ম্যাকলিওড। সে বেশীদিন আগের কথা নয়। কেম্ব্রিজের পর ইনার টেম্পল,—'৩৮ সনে সেখান থেকে বের হতে না হতেই '৩৯ সনের যুদ্ধ। ম্যাকলিওড তাতে যোগ দিলেন এবং সানন্দে।

'৪৫ সন অবধি তিনি সেখানেই ছিলেন। কখনও খালের ওপারে, ফ্রান্সে—হাসপাতালে; কখনও মেজররূপে নরওয়েতে, এবং কখনও বা 'ডি-ডে'তে, ঘাড়ে রাইফেল ঝুলিয়ে লড়িয়েদের আগে আগে। ইংলণ্ডের 'সদ্য-মুক্ত' কলোনিয়াল সেক্রেটারী ম্যাকলিওডের কাছে যুদ্ধটা তাই বইয়ে-পড়া ঘটনা নয়। নয় বলেই ম্যাকলিওড আফ্রিকার ফাইলটা হাতে নিয়ে নির্দ্বিধায় বলতে পারতেন—'আমাদের অস্তে-অনিচ্ছুক-সূর্যটার বোধ হয় এখন ডোববারই সময়। —নয় কি ?'

কনজারভেটিভ পার্টিতে এসেছিলেন যুদ্ধের পরেই,—'৪৬ সনে। এসেছিলেন বটে পার্লামেন্টে জনৈক পরাজিত প্রার্থী হিসেবে, কিন্তু নরম্যান ম্যাকলিওড তারপর থেকেই—একাদিক্রমে 'বিজয়ী নওজোয়ান'। '৪৬ সনে যে মানুষ ছিলেন পার্টির পার্লামেণ্টারী দপ্তরে কোন একজন, '৫২ সনেই শোনা গেল তিনি মন্ত্রী হয়েছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী। '৫৫ সনে—শ্রমমন্ত্রী, এবং '৫৯ সনে সেক্রেটারী

অব স্টেট ফর দি কলোনীজ। এবং অবশেষে এবার যুগপৎ হাউস অব কমন্সের লীডার ও কনজারভেটিভ পার্টির প্রধান। হয়ত—ভবিষ্যতে দল-প্রধান থেকে প্রধানমন্ত্রী। কেননা, বিজ্ঞরা বলেন—মৈ-টা নাকি সেভাবেই পাতা।

বলা নিষ্প্রয়োজন—ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা যাঁর, ইতিমধ্যে তিনি নিশ্চয়ই কিছু না কিছু অন্যবিধ কৌলিন্যও অর্জন করেছেন তিনি। ইংলণ্ডে আজ সবাই জানেন ম্যাকলিওড ভাল ক্রিকেট খেলতে পারেন।

এক ছেলে এক মেয়ের বাপ আজ তা খেলেন না বটে, কিন্তু সময় পেলে এখনও ব্রীজ খেলেন। হাউস অব কমন্সের সদ্য-নির্বাচিত লীডার কিছুদিন আগেও ছিলেন লণ্ডনের একটি বিখ্যাত কাগজের 'ব্রীজ এডিটার।'

১৯. ১০. ৬১.

ম্যাকাপাগল, ডিওসডাডো পি.

দিনে দুপুরে শহরের বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন এক বৃদ্ধা। হঠাৎ পেছন থেকে ছোঁ মেরে তাঁর হাত থেকে থলিটা কেড়ে নিল এক ছোকরা। তারপর—দে ছুট! বুড়ী কাঁদতে কাঁদতে পুলিশের কাছে গেলেন। পুলিশ বলল—সব শোনাতে হলে কিছু খরচ পড়বে তোমার।

—কত?

—একশ' পিসো!

অর্থাৎ, দু'শ টাকা! সংক্ষেপে ইদানীং এই হচ্ছে ম্যানিলার পুলিশ। সংক্ষেপে—ইহাই আজকের ফিলিপাইন নামক দেশ। (আয়তন—১,১৪,৮৩০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা—২ কোটি ২০ লক্ষ।)

'এল. পি'র প্রার্থী উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—বন্ধুগণ! আমাকে আপনারা ইচ্ছে হয় ভোট দেবেন, ইচ্ছে হয় দেবেন না···কিন্তু দোহাই আপনাদের, ওমুককে ভোট দেবেন না যেন!—কেন একথা বলছি জানেন? কারণ, যদিও বিবাহিত কিন্তু খবর নিলেই দেখতে পাবেন—'

চার বছর পরে ঠিক একই কেন্দ্রে উঠে দাঁড়ালেন 'এল. পি'র পরাজিত প্রার্থী। তিনি বললেন—'বন্ধুগণ গেল নির্বাচনে আপনারা যে কারণে আমাকে ভোট দেননি, খোঁজ নিয়ে দেখুন এবার একই কারণে 'এন. পি'র সেই মাননীয় প্রার্থীটি ভোট পাওয়ার অনুপযুক্ত।—যদিও বিবাহিত কিন্তু তিনি কি—!'

সংক্ষেপে এই হচ্ছে আজকের ফিলিপাইনের রাজনীতি, সংক্ষেপে ইহাই—নির্বাচন!

অনেককে তাক লাগিয়ে ফিলিপাইনের নির্বাচনে এবার জয়ী হয়েছেন—'এল. পি'। অর্থাৎ লিবারেল পার্টি। পুরানো শাসক 'এন. পি' অর্থাৎ ন্যাশানালিস্টরা এবার ফেলের ফর্দে। 'এন. পি' গার্সিকার জায়গায় প্রায় আট হাজার দ্বীপপুঞ্জের দেশে প্রেসিডেন্টের আসনে এসেছেন এবার 'এল. পি'র নতুন প্রেসিডেন্ট। নাম তাঁর—ডিওসডাডো পি ম্যাকাপাগল।

একদা প্রখর তরুণ এবং আজ একান্নর পরিণত নায়ক ম্যাকাপাগল ক'দিন আগেও ছিলেন রাজ্যের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। তারও আগে এক দরিদ্র চাষীর ঘরের বালক। ঠাকুর্দা নাটক লিখতেন। সুতরাং বাবা খেতে পেতেন না। বালক দাদংকেও (দাদং ওঁর ডাক নাম) অনেকদিন কাটাতে হত ফেন খেয়ে। তবুও যে লেখাপড়া শিখতে পেরেছিলেন, তার কারণ মন ছিল। সরকারী এবং বেসরকারী আনুকূল্যে সে মনই তাঁকে আইনের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল। পরীক্ষা শেষে কিছুদিন অধ্যাপনা করেছিলেন, তারপর বিচার বিভাগে সরকারী চাকরী। সেই সূত্রেই একদা আমেরিকা ভ্রমণ। ম্যাকাপাগল ছিলেন সেখানে লিগাল এটাচি। কাজ করতে করতেই রাজনীতিতে দীক্ষা হল তাঁর। এবং কংগ্রেসে এসেই জানালেন তিনি, একালের লিবারেল-শিরোমণি ম্যাগসেসে তখন তাঁর চোখে আদর্শভ্রষ্ট। কি করে তাঁকে পরাজিত করা যায় তাই ছিল যুবক ম্যাকাপাগলের স্বপ্ন।

'৫৭ সনের মার্চে বিমান দুর্ঘটনায় অকালে প্রাণ হারালেন প্রেসিডেন্ট ম্যাগসেসে। কিন্তু ম্যাকাপাগল প্রবেশাধিকার পেলেন না প্রেসিডেন্ট ভবনে। উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হলেন তৎকালীন ভাইস-প্রেসিডেন্ট গার্সিয়া। ম্যাকাপাগল নির্বাচিত হলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। তারপর দীর্ঘ চার বৎসর প্রতীক্ষা অন্তে অবশেষে এই বিজয়।

জনতার নেতা বিজয়ী বীর ম্যাকাপাগল জনতার নেতা হয়েও দৃষ্টিভঙ্গীতে অত্যাধুনিক নন। সংক্ষেপে তাঁর পরিচয়: (১) তিনি (এখন পর্যন্ত) আত্মীয় তোষণের নীতিতে বিশ্বাসী নন (২) তিনি দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষক নন (৩) তিনি 'হুক' বা কমিউনিস্টপন্থী নন (৪) তিনি

শিল্পবাণিজ্যে ফ্রি-এণ্টারপ্রাইজের সমর্থক এবং (৫) তিনি ফ্রি-ওয়ার্ল্ড-এর বান্ধব। ২৩. ১১. ৬১

ম্যাকারিওস, আর্চবিশপ

ক্যাণ্টরবেরীর আর্চ বিশপ ওঁকে একবার নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছিলেন '৫৮ সনের জুলাই মাসে।—ইউরোপীয় যাজকদের সম্মেলনে তোমার উপস্থিতি চাই! খবরটা শোনামাত্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ল গোটা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ! —খুনী ম্যাকারিওসকে এখানে নামতে দেব না আমরা!

বৃদ্ধ আর্চবিশপ হেসে বলেছিলেন সে আসছে না। নেমন্তন্নটা নেহাৎই লৌকিকতা রক্ষা।—আই নো এজ ওয়েল এজ এনিবডি হোয়াট এ ব্যাড ক্যারাকটার হি ইজ!

১৯৫৯ সনের ফেব্রুয়ারী। এথেন্সের একটা নামকরা হোটেল থেকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে লণ্ডন যাত্রা করলেন নির্বাসিত আর্চবিশপ ম্যাকারিওস। লণ্ডনের নাগরিকেরা বিপুল সম্বর্ধনা জানাল তাঁকে। তিন বছর আগে এথেন্সের পথে সাইপ্রাস নেতা ম্যাকারিওসকে সন্ত্রাসবাদের অজুহাতে আকস্মিকভাবে দ্বীপান্তরী করেছিলেন বৃটিশরাজ। এবার সেলুইন লয়েড ডেকে এনে ভোজসভায় আপ্যায়িত করলেন তাঁকে। কারণ, ক'বছর বেপরোয়া শাসনের পর ইংরেজেরা বুঝেছেন—ভূমধ্য সাগরের বুকে সাইপ্রাস নামক ছোট্ট দ্বীপটিকে হাতে রাখতে হলে—এই ছেচল্লিশ বছরের যাজক ম্যাকারিওসকেও হাতে রাখতে হবে। তিনি যতক্ষণ সিসিলিতে, শান্তি ততক্ষণ স্বপ্ন মাত্র!

ফেব্রুয়ারীতে শান্তি চুক্তি হল। '৬০ সনের ফেব্রুয়ারীতে সাইপ্রাস রিপাবলিক হবে। চার লক্ষ গ্রীক, এক লক্ষ তুর্কী—দুইয়েরই স্বার্থরক্ষা হবে। ইংরেজ বা 'নাটো'রও ক্ষতি হবে না। কেন না, সাইপ্রাসে এরপরও বৃটিশ ঘাটি থাকবে এবং প্রজাতন্ত্র হয়েও সাইপ্রাস—তুরস্ক বা গ্রীসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না।

সম্পর্ক ছেদ নয়, মাতৃভূমি গ্রীসের সঙ্গে সম্পর্কের পুনরুদ্ধার-ই ছিল—সাইপ্রাসের গ্রীকদের সংগ্রামের কারণ। তাঁদের অবিসম্বাদী নেতা ম্যাকারিওস বলতেন—'এনোসিস',—মাতৃভূমির সঙ্গে পুনর্মিলন! বছরের পর বছর এর নামেই লড়াই, মরণপণ লড়াই করেছে গ্রীভাস এবং তাঁর 'ইয়োকা' (EOKA) অনুচরেরা। তুর্কীরা অবশ্য বলত—পার্টিশান অর

ডেথ। হয় সাইপ্রাস ভাগ হবে—নয় তুর্কীরা জীবন দেবে। গৃহযুদ্ধে তারা মরেছেও কম নয়।

তুর্কীরা মরেছে, গ্রীকরা মরেছে। মৃত্যুবরণ করেছেন শত শত ইংরেজও। সুতরাং, ক্লান্ত বৃটেন ডেকে পাঠালেন বিদ্রোহী ম্যাকারিওসকে। ক্লান্ত ম্যাকারিওস সম্মতি দিলেন—তথাকথিত রিপাবলিক পরিকল্পনায়। শান্তি সম্পন্ন হল। ম্যাকারিওস অবশেষে নির্বাচিত হলেন—সাইপ্রাস গণতন্ত্রের সভাপতিও।

কিন্তু সাইপ্রাস সমস্যা কি শেষ হল? ক্ষমতাশালী গ্রীক অর্থডক্স চার্চের প্রতিনিধি রাজনৈতিক নায়ক ম্যাকারিওস আজও বোধ হয় তার সঠিক উত্তর জানেন না। তিনি সভাপতি হয়েছেন। সহ-সভাপতি নির্বাচিত হবেন জনৈক তুর্কী। তুর্কী সেনাবাহিনী আসছে স্ব-জাতির স্বার্থের প্রহরী হয়ে। সুতরাং ক্ষুব্ধ নায়ক গ্রীভাস বলছেন—ভুল স্বপ্ন দেখেছেন ম্যাকারিওস।—সভাপতির পদপ্রার্থী ম্যাকারিওস বলেছেন—গ্রীভাস আমাদের রাজনীতিতে নিজেই একটি ভুল।—একমাত্র আগামী কালই বলতে পারে এ দু'জনের কে নির্ভুল।

১৭. ১২. ৫৯

[আর্চবিশপ ম্যাকারিওস সম্পর্কে আরও কিছু জ্ঞাতব্য :]

১৯৫৫ সনের এপ্রিলে বান্দুং-এ সমবেত এশিয়া—আফ্রিকার নায়কদের দরবারে রবাহূত এক পর্যটক এসে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরিধানে টকটকে লাল আলখাল্লা, গলায় ক্রুশবিদ্ধ যিশু, হাতে ন্যায়দণ্ড, মাথায় উঁচু টুপি—ছ'ফুট দীর্ঘ সেই মানুষটিকে দেখে এশিয়া-আফ্রিকা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়েছিল। কেননা, ভুলের কোন কারণ ছিল না, একবার তাকিয়েই জানা গিয়েছিল আগন্তুক—ম্যাকারিওস। বিশ্বখ্যাত আর্চবিশপ ম্যাকারিওস। তাঁর দেশ সাইপ্রাস ভূগোলে এশিয়ায় থেকেও ইউরোপে ফিরে যেতে চাইছে—এ তথ্য মুলতুবী থাকল। আফ্রেশিয়া সমস্বরে ধ্বনি তুলল—আর্চবিশপ জিন্দাবাদ! লড়িয়ে যাজক সেদিন চু এন লাইয়ের কাছেও প্রগতিশীল সহযোদ্ধা।

আজ আর নিশ্চয় তা নন। কেননা, সীমান্ত যুদ্ধে ভারতের প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতি নিয়েই স্বাধীনতা যোদ্ধা ম্যাকারিওস ভারত-যাত্রায় বেরিয়েছেন। পথে পথে ভারতের স্বপক্ষে নৈতিক সমর্থন ছড়াতে ছড়াতেই স্বাধীন সাইপ্রাসের প্রথম প্রেসিডেন্ট

এদেশের মাটি স্পর্শ করেছেন। বান্দুং যে তাঁর তীক্ষ্ণ কালো চোখে মায়া-কাজল বুলাতে পারে নি—এ সময় এ খবরটা সত্যিই জানবার মত! আর্চ-বিশপ আবার প্রমাণ করলেন গণতন্ত্রী ইংরেজরাও তাঁকে সত্যিই ভুল বুঝেছিলেন!

'৫৬ সনে এই দেশপ্রেমিক যাজককে সিসিলিতে দেশান্তরী করার সময়ে ইংরেজরা কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন—যাজক হলেও ম্যাকারিওস রক্ত-পথের পথিক। 'ইনোসিস' তথা 'গ্রীসের সঙ্গে মিলন' তাঁর লক্ষ্য বটে, কিন্তু তিনি 'ইয়োকা' বা সন্ত্রাসবাদীদের সহচর। তাছাড়া কমিউনিস্টরাও তাঁর বান্ধব। ম্যাকরিওস উত্তর দিয়েছিলেন—'উই বিলিভ ওয়ান ইডিওলজি ক্যান বি ফট অনলি বাই এনাদার,—নট বাই ফোর্স!' আখেরে ১৯৬০ সনে সাইপ্রাসকে স্বাধীনতা দিয়ে ইংরেজকেও তাই মেনে নিতে হয়েছিল বটে, কিন্তু চীন কী সে পথে পা দেবে? ম্যাকারিওস জানেন—তা কথনই হবে না। এবং সে কারণেই, ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে তিনি আরও বাঙ্ময়।

চমৎকার কথা বলেন। বক্তৃতা করেন আরও চমৎকার। গরীবের ছেলে ছিলেন। চাষীর ঘরের সন্তান। কিন্তু নিকোসিয়া এথেন্স, বোস্টন—নানা দেশে লেখাপড়া করেছেন পরিণত যৌবন পর্যন্ত। '৪৬ সনেও তিনি ছাত্র ছিলেন। বয়স তখন তাঁর তেত্রিশ। এখন উনপঞ্চাশ। গ্রীক রক্ষণশীল চার্চের সঙ্গে আছেন '৪৮ সন থেকে। আর্চবিশপ নির্বাচিত হয়েছেন '৫০ সনে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সেদিন থেকেই তিনি নায়ক। তারই স্বীকৃতি হিসেবে '৫৯ সন থেকে তিনি স্বাধীন সাইপ্রাসের প্রেসিডেণ্ট।

প্রেসিডেণ্ট ম্যাকারিওস চমৎকার ইংরেজী বলেন। তবে ইংরেজী জানা অন্যান্য রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই, যে কোন কাগজে যে কোন উপলক্ষেই হোক, তিনি সই করেন সব সময় লাল কালিতে।

১. ১১. ৬২

ম্যানেকশ, সাম (লেঃ জেনারেল)

বন্ধুরা বলেন—'সাম'। জওয়ানেরা কেউ বলেন—'মানিকজী,' কেউ বলেন—'জেনারেল শ'। কিন্তু সব ধাঁধা মিটে যায় পুরো নামটি শুনলে; তৎক্ষণাৎ জানা যায় নেফায় যিনি নতুন সৈন্যাধ্যক্ষ হয়ে পতাকা হাতে তুলে নিয়েছেন তিনি ভারতীয় এবং

পার্শি। পুরো নাম তাঁর—লেঃ জেনারেল সাম হরমুজজী ফ্রামজী জামসেদজী ম্যানেকশ। বয়স—মাত্র আটচল্লিশ।

শোনা যায় কোরিয়া ফেরত জেনারেল কাউলকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন নেহরুজী—'তুমি নাকি লাল হয়ে গিয়েছ কাউল?'

'—ইয়েস স্যার, এজ রেড এজ ইউ আর!' উত্তর দিয়েছিলেন নাকি প্রগলভ সেনাপতি। জেনারেল ম্যানেকশ সম্পর্কে এমন কোন বর্ণাঢ্য কাহিনী নেই। পুঁথি-পত্র, ছাউনিতে মেসে তাঁর একমাত্র পরিচয়—তিনি লড়িয়ে।

লেখাপড়া শিখেছেন—নৈনি-তালের কলেজে। কমিশনড হয়েছেন স্যাণ্ডহার্স্ট নয়, দেরাদুন থেকে, এবং তাও মাত্র ১৯৩৪ সনে। কিন্তু এই পার্শী সৈনিকটির মত যুদ্ধের অগ্নিদহন দেখেছেন অতি কম জন। প্রথমে আমেদজাইয়ের লড়াই ('৩৯-'৪০), তারপর ব্রহ্ম, এবং অবশেষে ফরাসী ইন্দোচীন। ম্যানেকশ সেই দুর্লভ-ভাগ্য সেনানায়কদের অন্যতম—যাঁর সর্বাঙ্গে আজও জলজ্বলে যুদ্ধের সবচেয়ে মূল্যবান পদক—বুলেট চিহ্ন। ব্রহ্ম রণাঙ্গনে দুই দুইবার গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন দুঃসাহসী লড়িয়ে ম্যানেকশ। একবার সীতাং নদীর তীরে, পেগু আর রেঙ্গুণের পথে জাপানীদের গতিরোধ করতে গিয়ে, আর একবার জেনারেল স্লিম-এর নেতৃত্বে মান্দালয়ের পথ থেকে জাপানীদের হঠাতে গিয়ে। ইন্দোচীনে তিনি ছিলেন জেনারেল ডেইজীর অন্যতম সহচর। সেখানে তাঁর দায়িত্ব ছিল দশ হাজার যুদ্ধবন্দীর পুনর্বাসন।

স্বাধীনতার পরে ম্যানেকশ'র প্রথম পরিচয় তিনি—রণগুরু। কাজ ছিল তাঁর প্রধানত অস্ত্রদীক্ষা। ইতি-পূর্বে ('৪৪) কোয়েটা থেকে নিজের শেষ পাঠ সাঙ্গ করেছেন। সুতরাং স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে হেড-কোয়ার্টার্সে মিলিটারী অপারেশনের ডাইরেক্টার নিযুক্ত করা হল তাঁকে। সেকালেই স্মরণীয় কাশ্মীর যুদ্ধ। অবশ্য মেজর জেনারেল ম্যানেকশ পরবর্তীকালে আপন হাতে কাশ্মীরে একটি ডিভিশনের পরিচালনভারও পেয়েছিলেন কিন্তু সে যুদ্ধের অনেক পরে। কাশ্মীর যুদ্ধের সঙ্গে তার চেয়েও বেশী যোগ ছিল তাঁর হেড কোয়ার্টার্সে থাকা কালে।

'৫৫ সনে কোয়ার্টার্সে তৎকালীন ডিরেক্টার অব মিলিটারী ট্রেনিংএর

পক্ষ থেকে ম্যানেকশ নিযুক্ত হলেন মাউ-এর পদাতিক বাহিনীর স্কুলে কমাণ্ডার। সেখান থেকে কাশ্মীর হয়ে, উপস্থিত কর্মভূমি করেছিলেন তিনি নীলগিরির বিখ্যাত ওয়েলিংটন স্টাফ কলেজ। উল্লেখযোগ্য, ম্যানেকশ ইতিমধ্যে লণ্ডনের ডিফেন্স কলেজও ঘুরে এসেছেন।

কলেজ থেকে অস্ত্রগুরু কমাণ্ডেণ্ট এবার লেঃ জেনারেলের বেশে মাঠে নেমেছেন। দ্রোণাচার্যের পদসঞ্চারে পূর্ব সীমান্তে নতুন প্রাণস্পন্দন দেখা দিয়েছে; নেফার ধর্মক্ষেত্রে নব ইতিহাস এবার অবধারিত।

৫. ১২. ৭২

র

রমন, স্যার সি. ভি.

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেকে দেখা মানুষ মাত্রেরই বাসনা, নিজেকে জানা দার্শনিকদের সাধনা। বর্ষীয়ান বৈজ্ঞানিক রমণ যুগপৎ দার্শনিক এবং মানবিক। সুতরাং মানুষকে তিনি আরও একটি নতুন জিনিস দেখতে শেখালেন। তিনি বললেন, 'নিজের চোখ নিজে দেখ।' সেই কাজলটানা সুরমা মাখা চোখ জোড়াটা নয়, বসন-ভূষণহীন সত্যিকারের দর্শন-ইন্দ্রিয়টা। সে জিনিস তুমি আয়নায় পাবেনা। দেখতে হয়ত এই নাও আতস কাচ।

নোবেল পুরস্কার পাওয়া বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধ পদার্থ বিজ্ঞানীর পক্ষে আবিষ্কারটা একটু অদ্ভুত ঠেকে বটে কিন্তু স্যার চন্দ্র শেখর ভেঙ্কাট রমণ বরাবরই একটি অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। 'অফ দি ট্রাক' আনাগোনা, তাঁর চিরকালের স্বভাব। সবাই জানেন তিনি কলকাতা থেকে শুরু করে ইউরোপ আমেরিকায় বহু বিদ্যাকেন্দ্রে অধ্যাপনা এবং গবেষণা করেছেন, কিন্তু অনেকেই জানেন না মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েই তরুণ রমণ যেখানে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন সে ভারতের ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট। পুরো দশবছর (১৯০৭-'১৭) কাজ করেছেন সেখানে রমণ।

রহমান, টুঙ্কু আবদুল

'ভারত-রত্ন' রামণ আজ 'জাতীয় অধ্যাপক'। তাঁর বাঙ্গালোরস্থ গবেষণাগার আজ ভারতের অন্যতম জাতীয় বিজ্ঞান-পীঠ। স্বদেশে এবং বিদেশে তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত খ্যাতি। তিনি নোবেল পুরস্কার ছাড়াও 'লেনিন পুরস্কার' পেয়েছেন। চীন থেকে শুরু করে ইউরোপ আমেরিকার নানা বিদ্বৎসভার শ্রেষ্ঠতম সম্মানপত্র তাঁর হাতে। তবুও রমণ এক অদ্ভুত উদাসী মানুষ। যেন, 'বিজ্ঞানী' নয়, ষোল আনা মানুষ হওয়াই তাঁর সাধনা। তিনি দিশি পোষাক পরেন, মাতৃভাষায় কথা বলেন এবং নিরামিষ ভোজন করেন। রমণ পদার্থ বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব লেখেন, কিন্তু ভাবেন সহস্রতর জিনিস। তাঁর লেখা অন্যতম বইটির নাম—'মিউজিক্যাল ইনষ্ট্রুমেণ্ট!' ১১. ৬. ৬০

রহমান, টুঙ্কু আবদুল

হ্যারি মিলার-এর লেখা ওঁর একটি জীবনী আছে। বইটির নাম—প্রিন্স অ্যাণ্ড প্রিমিয়ার। 'অ্যাণ্ড' না লিখে 'টু' লিখলেও অবশ্য মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান সম্পর্কে সত্য বলা হত, কিন্তু সবটুকু বলা হত না। কেননা, টুঙ্কু সত্যিই প্রিন্স,—রাজপুত্র। শুধু জন্মে নয়,—আচারে-আচরণে, এমন কি রাজনৈতিক জীবনেও।

পুরো নাম—টুঙ্কু আবদুল রহমান ইবনি-আল-মারহুম সুলতান আবদুল হামিদ হালিম শা। সংক্ষেপে—টুঙ্কু আবদুল রহমান, অথবা আবদুল রহমান পুত্র। জন্ম—খেদার সুলতানের ঘরে, সুলতানের ষষ্ঠ পত্নীর সপ্তম তনয় হয়ে। তবুও রুপোর চামচ নিয়ে টানাটানি ছিল না; কেননা উত্তর মালয়ের ছোট্ট রাজ্য খেদা সেই বিখ্যাত রাজ্য যেখানে হেলায়-ফেলায় পর পর রাজত্ব করে গেছেন নয় জন হিন্দু রাজা এবং কুড়িজন মুসলিম সুলতান। তাঁদের একজন আহমদ হালিম শা পেনাঙকে তুলে দিয়েছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন লাইট-এর হাতে! সুতরাং অর্থ ছাড়াও ইংরেজের আনুকুল্যের অভাব ছিল না,—ভাড়াটে বাহকের কাঁধ থেকে নেমে সরকারী বৃত্তি পকেটে পুরে আবদুল রহমান রওনা হয়েছিলেন বিলেতে। সে ১৯১৯ সনের কথা। টুঙ্কুর বয়স তখন মাত্র ষোল বছর।

রাজকুমার বলেই টুঙ্কু কেম্ব্রিজে সাধারণ ছাত্র ছিলেন। তাঁকে সেণ্ট

ক্যাথারিন কলেজে ভর্তি করতে যেমন খোদ কলোনিয়াল অফিসকে আসরে নামতে হয়েছিল, তেমনি সেখান থেকে বের হতেও টুঙ্কুর যার-পরনাই একটু বেশী সময় লেগে গেল। কারণ, পড়ার চেয়েও, রাজ-কুমারের মনে হত বিলেতে মনোযোগ দেওয়ার মত অন্য জিনিস অনেক।

'৩১ সনে দেশে ফিরে রাজকুমার টুঙ্কু রাজকর্মচারী হলেন। তিনি খেদার সিভিল সার্ভিসে যোগ দিলেন। ক'বছর পরে (১৯৩৮) আবার পড়ার নেশা মাথায় চাপল। কিন্তু যুদ্ধ এবারও ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে দিল। (টুঙ্কু ইনার টেম্পল-এ ছাড়-পত্র পেয়েছেন ১৯৪৯ সনে, ছেচল্লিশ বছর বয়সে)। আবার সিভিল সার্ভিস। টুঙ্কু এখন কুলিন-এর জেলাশাসক।

যুদ্ধ এবং জাপ অধিকারের দিন-গুলোতেও টুঙ্কু আবদুল রহমানের তাই ছিল পরিচয়। তিনি রাজ-কর্মচারী এবং রাজপুত্র। কিন্তু ১৯৫২ সনে দেখা গেল সে-সব পরিচয় অতীত কাহিনী, রাজকুমার এখন সম্পূর্ণত রাজনীতিক। তিনি মালয়ের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড মালয় ন্যাশনাল অর্গা-নাইজেশনের সভাপতি। টুঙ্কু বলেন—ভাই আবদুল রেজাক বিন হুসেন পীড়াপীড়ি করেছিল বলেই আমি নির্বাচনে দাঁড়াতে রাজী হয়েছিলাম। লোকে বলে টুঙ্কু রাজী হয়েছিলেন জনৈক ফকিরের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে। তিনি নাকি বলেছিলেন—তুমি একদিন মালয়ের প্রধানমন্ত্রী হবে!

রাজকুমারের রাজকীয় হৃদয়,—অনেক শখ। তিনি বাগান করতে ভালবাসেন, ফটো তুলতে ভালবাসেন, উড়োজাহাজ ভালবাসেন,—ফুটবলের তিনি একজন বিখ্যাত পৃষ্ঠপোষক। টুঙ্কু তিনবার বিয়ে করেছেন (বর্তমান স্ত্রী রোজিয়া খানদানী আরবীয় মুসলিমের ঘরের কন্যা), একটি পুত্র এবং একটি কন্যার সুখী জনক দুইটি চীনা শিশুকে পিতৃস্নেহে লালন করেন, —তিনি গল্‌ফ খেলেন, নাটক লেখেন। তাঁর বিখ্যাত নাটক 'মাশুরী' '৫৯ সনে চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। টুঙ্কু সব দিকে থেকেই রাজকুমার। সাধুসন্ন্যাসী পীর-ফকিরেও তাঁর অখণ্ড বিশ্বাস। '৫৯ সনের নির্বাচনের সময় একজন ফকির বলেছিলেন—জিতলে খাজা মইনুদ্দীন চিশ্‌তীর দরগায় প্রণাম জানাতে। গত বছর অক্টোবরে টুঙ্কু সে সত্য পালন করে

গেছেন। সুতরাং এ-হেন মানুষ যদি ফকিরের পরামর্শে রাজনীতিতে এসে থাকেন তবে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু বিস্ময়কর রাজনৈতিক টুঙ্কু।

১৯৫৫ সন থেকে নানা জাতি অধ্যুষিত বহু সমস্যায় পীড়িত মালয়ে টুঙ্কু এক বিস্ময়কর নায়ক। দীর্ঘ বারো বছর এমার্জেন্সি দেখেছে তাঁর দেশ,—কিন্তু পতন-লক্ষণ দেখা যায়নি একদিনও। বরং সমগ্র এশিয়ায় টুঙ্কুই একমাত্র শাসক যাঁর দেশে কমিউনিস্ট বলে আজ কোন সমস্যা নেই। বিখ্যাত 'ব্রিগস প্ল্যান' কার্যকর করে টুঙ্কু আজ শুধু স্বদেশে নয়, সমগ্র এশিয়ায় যাদুকর। অথচ, কমিউনিস্টদের নির্মূল করেছেন তিনি চিরকালের সেই রাজকুমারের চালেই। প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসেই শান্তির সন্ধানে তিনি গেরিলা নায়ক চিন পেং-এর আস্তানায় হাজির হয়েছিলেন। পেং দাবী তুলেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিকে স্বীকার করতে হবে। প্রিন্স উত্তর দিয়েছিলেন—আমি যতদিন আছি ততদিন মালয়ে বিশ্বাসঘাতকদের কোন স্বীকৃতির প্রশ্ন ওঠে না! চিরকাল নম্র স্বভাবের, উদার মনের মানুষ টুঙ্কু সেই থেকেই কমিউনিজমের বিরুদ্ধে এক আপস-হীন যোদ্ধা। কোন ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, সাম্রাজ্য-বাসনাও নয়, টুঙ্কুর শ্রেষ্ঠতম রাজনৈতিক কীর্তি সদ্যজাত মালয়েশিয়া সেই যুদ্ধেরই একটি অধ্যায় মাত্র। সুতরাং ইন্দোনেশিয়া বা ফিলিপাইন যা খুশি বলুক, টুঙ্কুকে স্বপ্নচ্যুত করা অতঃপর অসম্ভব। বিপদ কোথায় এবং কেন—এ বিষয়ে টুঙ্কুর সঙ্গে অন্তত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন গণতন্ত্রী দেশের তর্ক করার অধিকার নেই। টুঙ্কু আগুনে-পোড়া।

তাই গত বছর অক্টোবরে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যখন কম-বেশী মৌন এবং দ্বিধাগ্রস্ত তখন মালয়ের প্রধানমন্ত্রী আমাদের সপক্ষে একমাত্র বাঙ্ময় বান্ধব। ভারতের মনে তাঁর সেদিনের ভূমিকা আজও স্মরণীয়। অবশ্য, এদেশের সঙ্গে টুঙ্কুর ব্যক্তিগত সম্পর্কও অনেক দিনের। তিরিশের যুগে অখ্যাত রাজকুমার টুঙ্কু 'ওপর-ওয়ালাদের ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে কুয়ালা-লামপুরে ছুটে এসেছিলেন—ভারতের বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নায়ক জওহর-লাল নেহরুকে দেখতে। ওঁদের প্রথম আলাপ হয়েছিল রেল স্টেশনে। দ্বিতীয় আলাপ '৪৬ সনে। নেহরু তখন ছয় লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়ের প্রতিনিধি হয়ে মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে

আলোচনা করছেন। দিল্লিতে টুস্কু সগর্বে সেই দিনটিকে স্মরণ করেছিলেন। আবেগে নেহরু উত্তর দিয়েছিলেন—আজ সত্যি-সত্যিই আমরা বান্ধব। স্ত্রী রোজিয়া ভারতীয় জওয়ানদের জন্যে আপন রক্ত দান করে জানিয়েছিলেন—সে বন্ধুত্ব অচ্ছেদ্য।

১৯. ৯. ৬৩

রাজগোপালাচারী, চক্রবর্তী

'—আপনি চাণক্য, কংগ্রেস রাজত্বের কৌটিল্য!' —উত্তেজিত হরিবিষ্ণু কামাথ ক্রোধে ফেটে পড়লেন। '—আপনি চিরকালের মত খবরের কাগজের সত্য ভাষণের অধিকারকে অপহরণ করতে চান!'

রাজাজী উঠে দাঁড়ালেন। '—মাননীয় সদস্য আমাকে গালি দিয়েছেন। তিনি আমাকে চাণক্য বলেছেন।' 'আমি গালি দেইনি। চাণক্য পদবীটা গালি নয়!' হরিবিষ্ণু কামাথ যেন সহসা যুক্তিবাদী হয়ে উঠলেন। রাজাজী বলে চললেন—'চাণক্য, কেউ কেউ যাঁকে বলেন বিষ্ণুগুপ্ত, ঐতিহাসিকেরা যাঁকে বলেন কৌটিল্য তিনি একজন স্মরণীয় ব্যক্তি!'

'—এবং সম্মানিত ব্যক্তিও!'—কামাথ সংশোধন করে দিলেন তাঁকে।

রাজাজী এবার হাসলেন। কিন্তু থামলেন না। তিনি বললেন—'আমার মনে হয় না চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সেই সর্বজনবন্দিত মন্ত্রিবরের মহান নামটির যোগ্য আমি!'

'—সে আপনার বিনয়!' হরিবিষ্ণু কামাথ যেন এবার ক্ষমাপ্রার্থী। সাম, দান, ভেদ এবং দণ্ড। চাণক্যের চার নীতি। সুতরাং ক্ষমায় রাজাজীর আপত্তি নেই। তিনি এবার বিতর্কে দাঁড়ি টানলেন।

'—আমাকে সম্মানিত করা মাননীয় সদস্যের অভিপ্রায় ছিল না। আমার নিতান্ত সৌভাগ্যবশতই পুণ্যশ্লোক চাণক্যের নামটা আকস্মিকভাবে তাঁর মুখে এসে গেছে। আমার প্রতি এই আনুকূল্য প্রদর্শনের জন্য অঘটনের দেবীকে আন্তরিক ধন্যবাদ!'

গোটা লোকসভা একসঙ্গে হেসে উঠল। সেই হাসি যখন থামল তখন দেখা গেল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজাজী বহু নিন্দিত 'প্রেস বিল'টিকে আইনে পরিণত করে ফেলেছেন।

ইচ্ছে ছিল রাজকর্মে এখানেই ইতি। তালিকাটি যদি ওয়ারেন হেস্টিংসকে দিয়ে শুরু হয়, তবে শেষ চক্রবর্তী শ্রীরাজগোপালাচারীকে দিয়ে। তদুপরি সর্দার বল্লভভাইয়ের

রাধাকৃষ্ণন, ডঃ সর্বপল্লী

এই শূন্য আসনটি পূর্ণ করার সাফল্য। রাজাজী স্থির করলেন—এবার সালেমে নিজ বাড়ির বারান্দায় বেতের চেয়ারটায় 'ভাগবত' নিয়ে বসবেন। সুবিধে পেলে শ্রীভগবানের ভুল ধরবেন। কিন্তু এবারও অঘটনের দেবী বিপথে টেনে নিয়ে গেলেন তাঁকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পথে মাদ্রাজে নামতে হল। '৫২ সনের কথা। হাতে পেতে পেতেও মাদ্রাজ প্রদেশটা হাত ছাড়া হয়ে গেল কম্যুনিস্টদের। তারা অবাক হয়ে দেখল—তাদের সামনে দিয়ে রিক্সা চড়ে দিব্যি সেক্রেটারিয়েটে যাতায়াত শুরু করে দিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গভর্নর, ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল, ভূতপূর্ব প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চক্রবর্তী শ্রীরাজগোপালচারী। এবং তাঁর সহাস্য ঘোষণা—'আমার এক নম্বর শত্রু হচ্ছেন কম্যুনিস্টরা!'

এবার শত্রুর তালিকায় দ্বিতীয় নামও যোগ হল। একাশি বছরের বৃদ্ধ রাজাজী যুগপৎ কমিউনিজম এবং কংগ্রেসইজম-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলেন।

ইংরেজী ভাষার সপক্ষে তিনি যখন এমনি লড়াইয়ে মেতেছিলেন শ্রীনেহরু তখন তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন—'ডন কুইকসোট্!' স্বতন্ত্র পার্টির সদস্যসংখ্যা ইতিমধ্যেই তিন লক্ষ। সুতরাং চক্রবর্তী শ্রীরাজগোপালচারী জীবনে এই প্রথমবার হলেও যে, 'জনপ্রিয়' জননেতা সেকথা নিশ্চয় আর গোপন নেই।

১৮. ৩. ৬০

রাধাকৃষ্ণন, ডঃ সর্বপল্লী

অদ্ভুত মানুষ।

রাশিয়ানরা যেদিন চাঁদে রকেট পৌঁছাল সারা বিশ্ব সেদিন চমকিত, বিস্মিত। কিন্তু কোয়েম্বাটোর-এর দর্শকেরা বিস্ময়ের কোন আভাস খুঁজে পেল না, ডঃ রাধাকৃষ্ণন-এর চোখে-মুখে। তাদের চমকে দিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন—ঘটনাটা আসলে এক ধরনের 'টেকনলজিক্যাল এ্যাক্রোবেটিকস!'

অদ্ভুত মানুষ।

'৪৯ সনে তিনি যখন রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছেন রাশিয়া তখন লৌহ-যবনিকার দেশ এবং স্তালিন তখনও জীবিত। লোকে বললে এবং দুনিয়া ভাবল দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন-এর পক্ষে স্থানটা উপযুক্ত হল না, পরিবেশটা ত নয়ই। কিন্তু যথাসময়ে দেখা গেল—কদাচ তিনি যা করেন না স্তালিন তাই

করছেন। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতকে তিনি ক্রেমলিনে আপ্যায়ন করছেন। এবং '৫২ সনে ফেরার পর রাধাকৃষ্ণনও এমন সমাচার জানালেন—যা সমসাময়িক কোন রাজদূত কাউকে বলেন নি। ডিপ্লোম্যাট রাধাকৃষ্ণন নির্দ্বিধায় ঘোষণা করলেন—রাশিয়ায় এখনও ঈশ্বর জীবিত। লোকেরা চার্চে যায় না বটে, কিন্তু ঘর থেকে বেরুতে বুকে ক্রস আঁকে!

রাধাকৃষ্ণন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। আজীবন জ্ঞানের সাধক সেদিক থেকে আজও এই বাহাত্তর বছরের পরিণত জীবনেও তত্ত্বসাধক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন রাজধানীর লোক হয়েছেন। প্রথমে—গণ-পরিষদ, তারপর দৌত্য এবং অবশেষে '৫২ সনে ভারতের সহ-রাষ্ট্রপতিত্ব। দীর্ঘ রুটিন, অনেক দায়িত্ব। কিন্তু তবুও দার্শনিক যে প্রায় এক দশকের সংসর্গেও রাজনৈতিক হননি তারও প্রমাণ পাওয়া গেল। ৫৬-র নির্বাচন শেষে রাধাকৃষ্ণন জানালেন—আর নয়, এবার তিনি দিল্লি ছাড়তে চান!

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের দিল্লি ছাড়া হয়নি। '৫৭ সনে আবার ভারতের সহ-রাষ্ট্রপতির আসনে বসতে হল তাঁকে। এবং এবার আপাতত বসতে হল রাষ্ট্রপতির আসনেও।

রাধাকৃষ্ণন জীবনে অনেক অনেক সম্মান পেয়েছেন, অনেক আসনে বসেছেন। তিনি মাদ্রাজ এবং অক্সফোর্ড দুই খণ্ডের দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ। যেসব স্থান থেকে তিনি সম্মান পদবী পেয়েছেন তার মধ্যে আছে—এলাহাবাদ, পাটনা, লক্ষ্নৌ, বেনারস, লণ্ডন, সিংহল, জার্মানী, মঙ্গোলিয়া এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। যেসব বিদ্যাকেন্দ্রে তিনি অধ্যাপনা বা বক্তৃতা করেছেন সে তালিকায় আছে মাদ্রাজ, মহীশূর, কলকাতা (১৯২১-৩১ এবং '৩৭—৪১ সন), অন্ধ্র, বেনারস, অক্সফোর্ড, শিকাগো, হাবার্ট, প্রিন্সটন, কলাম্বিয়া এবং ইত্যাদি।

রাধাকৃষ্ণন '৩১ সন থেকে '৩৯ সন অবধি ইণ্টারন্যাশনাল কমিটি অব ইনটেলেকচ্যুয়াল কো-অপারেশন-এর সদস্য ছিলেন। '৫২ সনে তিনি ইউনেস্কোর সভাপতি হয়েছিলেন। এখনও তিনি ভারতীয় 'পি ই এন'-এর চেয়ারম্যান।

রাধাকৃষ্ণন-এর কলম বিশ্বখ্যাত। তাঁর বাচনভঙ্গীও। পূর্ব ইউরোপ, পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—বিশ্বের এই স্বল্প-পরিচিত তিন

রাম, জগজীবন

খণ্ড সাম্প্রতিক কালে ভারতকে তিনিই পরিচিত করেছেন। রাধাকৃষ্ণন অবশ্য বলেন—এই ভ্রমণে তিনি নিজেকেই জেনেছেন।

মানবতাবাদী ভারতীয় হিন্দু, রাধাকৃষ্ণন বিশ্বের নাগরিক। কিছুদিন আগে নেহরু বলেছিলেন—তিনি হচ্ছেন 'এ ক্যুয়ার মিকসচার অব ইস্ট এণ্ড ওয়েস্ট, আউট অব প্লেস এভরি-হোয়ার এণ্ড এ্যাট হোম নো হোয়ার'। রাধাকৃষ্ণন উত্তরে বলে-ছিলেন—'উই মাস্ট লার্ন টু বি আউট অব প্লেস নো হোয়ার এণ্ড এ্যাট হোম এভরিহোয়ার।' ২৫. ৭. ৬০

রাম, জগজীবন

কলকাতার রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে একটি নৈশ বিদ্যালয় আছে। স্কুলটি অবৈতনিক এবং সেখানে যারা পড়তে আসে তারা সবাই গরীব ঘরের ছেলে। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগের কথা। একটি গোলগাল কাল ছেলে প্রতিদিন বই শ্লেট বগলে পড়তে আসত এখানে। ছেলেটির দেশ বিহারের আরা জেলা। তার পরে এবং আগে আরও অনেক দরিদ্র সন্তান লেখাপড়া করেছে এখানে। কিন্তু এই ছেলেটি যে সেদিনের সেই অপারক সহপাঠীদের কথা ভুলতে পারেনি তার প্রমাণ এবারের রেল বাজেট। এবারকার রেল বাজেটের অন্যতম প্রতিশ্রুতি,—রেলকর্মীদের ছেলেমেয়েরা বিনে পয়সায় স্কুলে পড়তে পাবে। কেননা, রেলমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম নিজেই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনিই রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের সেই অখ্যাত পড়ুয়া।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জগজীবন রাম আজ সবচেয়ে পুরানো মন্ত্রী। মন্ত্রি-সভায় তিনিই একমাত্র শ্রীনেহরুর আদি সহচর। '৪৬ সনের সেপ্টেম্বর থেকে আজ অবধি একটানা মন্ত্রিত্বে প্রধান মন্ত্রীর পরে তিনি একক। শুরুতে ছিলেন শ্রমমন্ত্রী, '৫২ সনে যোগাযোগ ও পরিবহন মন্ত্রী এবং অবশেষে '৫৬ সন থেকে রেলমন্ত্রী। শ্রমমন্ত্রী হিসাবে শ্রীজগজীবন রামের নামের সঙ্গে একাধিক শ্রমকল্যাণমূলক আইন জড়িত। যোগাযোগ দপ্তরে তাঁর কালে অন্যতম ঘটনা—আকাশ পথের জাতীয়করণ।

মন্ত্রিত্ব-পূর্ব জীবনে জগজীবন রাম অনুন্নত সম্প্রদায়ের নায়ক হিসাবে খ্যাত হলেও আসলে তিনি বিহারের একজন বিশিষ্ট কৃষক কর্মী। ছাত্র ভাল ছিলেন। তাই অবৈতনিক

বিদ্যালয় থেকে বেনারস এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি তাঁর। '৩০ সনে কলকাতা থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক হওয়ার পরই তরুণ জগজীবন-রাম নিজের এলাকায় খ্যাতিমান কর্মী। '৩৬ সনে তাঁকে বিহার আইনসভায় মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু পরের বছর নির্বাচিত সদস্য হিসাবেই তিনি আসন গ্রহণ করে-ছিলেন সেখানে।

নিখিল ভারত অনুন্নত সম্প্রদায় লীগ-এর সভাপতি কিংবা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আসনটিও তেমনি বহুদিনের নিষ্ঠায় অর্জিত। শ্রীজগজীবন রাম এখন রেলমন্ত্রী। ওয়েলফেয়ার স্টেটের টানাটানির সংসারে রেল বলতে গেলে প্রায় একমাত্র রোজগারী দপ্তর। দায়িত্বশীল দপ্তরও বটে। জগজীবন রাম সে দায়িত্ব পালনে কখনও পেছনে পড়েননি বলেই ক্রমবর্ধমান রেলপথের সাক্ষ্য। ২০, ২. ৬০

রামসে, আর্থার মাইকেল

বয়স মোটে ছাপ্পান্ন। কিন্তু সে হিসেব অনুযায়ী 'দেখলে মনে হয়, কমসে কম হাজার বছর।' অন্তত অনুরাগী জনদের তাই অভিমত।

প্রকাণ্ড চেহারা, বিস্তীর্ণ মুখমণ্ডল, নীল চোখে সমুদ্রের গভীরতা, গলায় দোদুল্যমান ছোট্ট একখানা সোনার ক্রশ। হঠাৎ তাকালে মনে হয়, তামাম খ্রীস্টান জগৎ যেন একটি মানবেই পঞ্জীভূত।

নাম—আর্থার মাইকেল রামসে। পরিচয় বিশ্ববিখ্যাত ক্যাণ্টারবেরীর শততম আর্চবিশপ। কেবলমাত্র 'প্রভুর ইচ্ছা' নয়, জীবন-কাহিনী শুনলেও মনে হয় এই ঐতিহাসিক আসনটিতে 'হিজ লর্ডসিপ'-এর উত্থান বোধ হয় অনিবার্য। কেননা, যথার্থই ঈশ্বরের অবয়বে সৃষ্ট এমন মানুষ সত্যিই এ-জগতে বিরল।

বাবা ছিলেন—কেম্ব্রিজ-এ খ্যাতি-মান গাণিতিক। অঙ্কের জগত ছাড়া চার্চের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল বটে তাঁর, কিন্তু সে চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে নয়। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মাত্র একবছর আগে, বশ্যতা মানতে হল তাঁকেও। কেননা, পুত্র তখনই সেই পতাকার নীচে বিখ্যাত যাজক। ফাদার রামসের জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা সেই দিনটি; যেদিন ব্যাপটাইজ হওয়ার জন্যে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর নিজের পিতা।

যাজক হিসেবে যেমন তুলনাহীন,

তেমনি ছাত্র হিসেবেও। রামসে বিখ্যাত রেপটন স্কুলের ছাত্র। সেদিক থেকে তিনি বিদায়ী আর্চবিশপ ফিসার সাহেবের সাক্ষাৎ শিষ্য। এখনও দেখা হলে ডঃ ফিশার তাঁকে সর্বসমক্ষেই সস্নেহে সম্বোধন করেন—'মাই বয়।'

আনুষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষা দীক্ষার শেষ '২৮ সনে। তারপর দীর্ঘ বার বছর শিক্ষানবীসি অন্তে অবশেষে ডারহাম চার্চে মোটামুটি একটি পদ। তৎসঙ্গে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা। (উল্লেখযোগ্য 'দি গাস্‌পেল এণ্ড দি ক্যাথলিক চার্চ', 'দি রেসারেক শান অব ক্রাইস্ট', 'দি গ্লোরি অব গড'··· ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক রেঃ মাইকেল রামসে যতখানি তাঁর কথা এবং কাজের জন্যে খ্যাত, তার চেয়ে অনেক বেশী বিখ্যাত তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্যে) সেখানেও আবার দ্বাদশ বর্ষ। তের বছরের মাথায় ডারহাম-এর যাজক হলেন রামসে। তার পাঁচ বছর পরে ইয়র্ক-এর আর্চবিশপ। এবার সেখান থেকেই এখানে, রাজ্যের দ্বিতীয় থেকে প্রথমের আসনে।

ক্যাণ্টারবেরীর আর্চবিশপ। কিন্তু এখনও যেন তাঁর সামনে ডারহাম-এর সেই উঠোনটিই। রামসে ডঃ ফিশারের মত কথায় কথায় বিবৃতি দেওয়ার বিষয় খুঁজে পান না, মতামত জ্ঞাপনের মত গভীর সমস্যা খুঁজে পান না, এবং কমিটি গড়ে ভারার্পণ করা যায় এমন কোন আধ্যাত্মিক বিষয় তাঁর নজরে পড়ে না। নিঃসন্তান সাধক আপন মনে তাঁর ঈশ্বরের সঙ্গে দরবার করেন। এজন্যে প্রেস কনফারেন্স ডাকা কখনই তিনি পছন্দ করেন না।

তাই বলে কি জগতের সমস্যা সম্পর্কে কোন মতামত নেই তাঁর ?—অবশ্যই আছে। তবে তা শুনতে হলে কাগজ না খুলে সামনে গিয়ে বসতে হয়, যেমন গেল বছর শুনেছিলেন অক্সফোর্ডের ছেলেমেয়ে এবং অধ্যাপকরা। ইয়র্ক-এর আর্চবিশপ সেদিন তাঁদের চমকিত করে ঘোষণা করেছিলেন: "ইফ দি চয়েস কেম বিটুইন ব্লোয়িং আপ দি ওয়ার্ল্ড এণ্ড বিয়িং ওভার-রান বাই কম্যুনিজম্, আই স্টিল ডোণ্ট থিঙ্ক উই হ্যাভ দি রাইট টু ব্লো আপ দি ওয়ার্ল্ড।"

এর চেয়েও বেশী চমক আছে ক্যাণ্টারবেরীর আর্চবিশপের ভাণ্ডারে। নিজে তিনি ধূমপান করেন না, কিন্তু অতিথি এলেই পকেট থেকে সিগারেট বের করে সামনে ধরেন। বলেন—'ও কিছু নয়, জাস্ট এন এ্যাক্ট অব মার্সি !'

১৫. ৬. ৬১

রাসেল, বার্ট্রাণ্ড

'খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের গ্রীক বিজ্ঞানী এনাক্সিমেণ্ডার বলেছেন মানুষ জৈবিক দিক থেকে মাছের আত্মীয়। সুতরাং মানুষের উচিত মাছ না খাওয়া।'—খবরটা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পরিবেশন করলেন রাসেল। কেননা, পশ্চিমের জ্ঞানের ভাণ্ডারে গ্রীক বিজ্ঞানীর এই অনুমানটি একটি স্মরণীয় সম্পদ। কিন্তু এনাক্সিমেণ্ডারের সিদ্ধান্তটি শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন পশ্চিমী জ্ঞানের সংগ্রাহক। কেননা, যুক্তিটা হাস্যকর। অথচ যুক্তিপূর্ণ মানুষ হওয়ার সাধনাই বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর ছিয়াশি বছরের জীবন।

বাবা ছিলেন অভিজাত পুরুষ কিন্তু সেই পৌরুষকে চাক্ষুস দেখতে পাননি রাসেল। তিন বছর বয়সে অনাথ হয়েছিলেন তিনি। রাণী ভিক্টোরিয়ার দরবারে স্থান হল তাঁর। কিন্তু রাসেলকে দরবারী করা গেল না কিছুতেই। ১৮৯৪ সনে গণিত এবং দর্শনের সর্বোচ্চ সম্মান নিয়ে তিনি যখন কেম্ব্রিজ থেকে বের হলেন, রাসেল তখন সাধারণ মানুষ। শুধুই 'মানুষ'। আজও তিনি তাই। পক্ককেশ বর্ষীয়ান প্রাজ্ঞ রাসেল—আজও 'মনুষ্য জাতির একটি প্রজাতি মাত্র।' তবে এমন প্রজাতি যাঁর দ্বিতীয় পাওয়া ভার।

ঊনবিংশ শতকে জাত ইংরেজ সন্তান হয়েও বার্ট্রাণ্ড রাসেল চার্চে যান না, যুক্তি ছাড়া ধর্ম মানেন না। তিনি 'ফ্রি থিংকার'। ইচ্ছে হল তিনি দেশ ছেড়ে আমেরিকায় কাটিয়ে ছিলেন বছরের পর বছর। ইচ্ছে হল, বিরাশী বছর বয়সে দারপরিগ্রহ করলেন তিনি। চিন্তায় এবং কর্মে রাসেল সত্যিই অসাধারণ মানুষ। 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা' থেকে সর্বশেষ 'উইসডম অব দি ওয়েস্ট' চল্লিশটিরও বেশী মস্তিষ্ক-আলোড়নকারী গ্রন্থের লেখক রাসেলের চিন্তার বিষয় এখন: সভ্যতার ভবিষ্যৎ। ফলে সাহারায় আণবিক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে তাই পথে নামতে ইতস্ততঃ করেননি 'এ বি সি অব এ্যাটম'-এর লেখক।

গেল সপ্তাহে ডেনমার্কের সোনিং পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে বার্ট্রাণ্ড রাসেলকে। সম্মানের কারণ: পশ্চিমী সভ্যতায় তাঁর অপরিমেয় দান। '৫০ সনে যখন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় তাঁকে তখন কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল—'recognition of his many sided

and significant authorship in which he has constantly figured as defender of humanity and freedom of thought.' পশ্চিমী সভ্যতাকে পুষ্টতর করে, গোটা মানব সভ্যতাকেই নিশ্চয় উজ্জ্বলতর করেছেন রাসেল।

২০. ২. ৬০

রাস্ক, ডীন

বলতে গেলে বাবা গরীবই ছিলেন।

জর্জিয়ায় সাধারণ যাজকের কাজ করতেন। তাও গলাটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। ফলে, গীর্জা ছাড়তে হল। এদিকে ঘরে পাঁচটি ছেলেমেয়ে। এ ছেলেটি চতুর্থ,—তার পরেও আছে একটি। সুতরাং, বাধ্য হয়েই ঘর ছাড়তে হল। স্কুল মাস্টারের কাজ নিয়ে জর্জিয়ার মানুষ চলে এলেন আটলাণ্টায়। পাশেই নিগ্রো এলাকা। পাদ্রী সাহেবের ছেলেরা ওদের মতই চলে, বলে, খেলে। কখনও কখনও রেল লাইনে বসে কয়লা কুড়ায়।

তবুও যে ছেলেগুলোর ভবিষ্যৎ আছে তা জানা গেল চার নম্বর ছেলেটিকে দেখে। কত আর বয়স হবে তখন ডেভিড-এর? বড় জোর বার। স্কুলের ছেলে ডীন সে বয়সেই নিবন্ধ লিখে ছিলেন একটা। শিরোনামা: আমার জীবনের আগামী বার বছর। সেই সংকল্প তালিকায় ছিল—যথাসময়ে স্কুলের পড়া শেষ করব। তারপর দু'বছর চাকরী করে ডেভিডসন কলেজে যাব, তারপর বৃত্তি নিয়ে যাব অক্সফোর্ড।

এই স্বপ্নের একটি টুকরোও মিথ্যে হতে দেননি—ডীন। সেই গরীব স্কুল-শিক্ষকের চতুর্থ ছেলে ডীন রাস্ক সত্যিই এলেন একদিন অক্সফোর্ডে! তিনি 'রোডস স্কলার'। সেণ্ট জন কলেজে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং দর্শন পড়েন। ছুটির সময়ে পড়তে হয় তাঁকে বার্লিনে। এসব '৩২ সনের কথা। ছ'ফুট এক ইঞ্চি উঁচু আমেরিকান তরুণটির বয়স তখন মোটে একুশ!

পড়া শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় হঠাৎ দেশ থেকে—টেলিগ্রাম। চাকুরী তৈরী। অধ্যাপনার কাজ। মাইনে বছরে দু'হাজার ডলার। সময়টা '৩৪ সন,—মন্দার বছর। রাস্ক রাজী হয়ে গেলেন। পরে জানা গেল নামটা মিলস কলেজ হলেও যেখানটায় তিনি কাজ নিয়েছেন সেটা আসলে স্কুল এবং মেয়েদের স্কুল!

তবুও কাজটা ভালই লাগে। বিশেষ মনের মত বান্ধবীও পাওয়া গেছে একটি। মেয়েটির নাম—ভার্জিনিয়া ফোসি। রাস্ক-এর ভূতপূর্বা ছাত্রী। এখন তিনি রাস্ক-এর স্ত্রী।

সংসার গোছাতে না গোছাতে সুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। রাস্ক সৈন্যদলে নাম লেখাবার জন্যে তৈরী হলেন। কিন্তু তার আগেই স্টেট ডিপার্টমেণ্টের তলব এসে হাজির। তুমি কি অক্সফোর্ডে ছিলে? —হ্যাঁ। তবে তুমি এখানটায় বস। আজ থেকে তুমি আমাদের সামরিক গোয়েন্দা দপ্তরে 'বৃটিশ সাম্রাজ্য' বিভাগের কর্তা।

সামরিক কাজেই কর্নেল রাস্ক '৪৩ সনে ভারতে এসেছিলেন একবার। দিল্লি থেকে তখন নিয়মিতভাবে পূর্ব রণাঙ্গনে ঘুরে বেড়াতে হত তাঁকে। রাস্ক তখন ইঙ্গ-মার্কিন যোগাযোগ স্থাপনে দায়িত্বশীল কর্মী।

যুদ্ধ থামল। কিন্তু রাস্ক-এর দায়িত্ব একটুও কমল না। কখনও স্টেট ডিপার্টমেণ্ট কখনও ওয়ার ডিপার্টমেণ্ট—একের পর এক কাজ চাপছে তাঁর ঘাড়ে। '৪৭ সনে মার্শাল-এর নজর পড়ল তাঁর উপর। রাস্ককে তিনি স্পেশাল পালিটিক্যাল এফেয়ার্স-এর অফিসার করে নিলেন। দু'বছর পরে ডীন এচিসন নিযুক্ত করলেন তাঁকে নিজের অধীনে ডেপুটি আণ্ডার সেক্রেটারী। ডীন রাস্ক সেই থেকে স্টেট ডিপার্টমেণ্টে চেনা মুখ। '৫১ সন অবধি ও-বাড়িতে যা কিছু হয়েছে বা না হয়েছে রাস্ক তার অন্যতম সাক্ষী। এবং সক্রিয় সাক্ষী। দুই চীন নিয়ে তর্কে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন, কোরিয়ার যুদ্ধে তিনি ফৌজ পাঠাতে পরামর্শ দিয়েছেন, জাপানের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করার ব্যাপারে তিনি ডালেসকে সাহায্য করেছেন এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

'৫২ সনের মাঝামাঝি থেকে ডীন রাস্ক আবার বেসরকারী লোক। তিনি রকফেলার ফাউণ্ডেশানের কর্তা। আট বছরের কাজ। শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার স্টেট ডিপার্টমেণ্টে ফিরে আসছেন—পুরানো কর্মী রাস্ক। আগামী ২০শে জানুয়ারী থেকে তিনি তাঁর সেই পরিচিত পুরানো বিভাগের নতুন কর্তা। ডীন রাস্ক (৫১) নতুন সেক্রেটারী অব স্টেট। আমেরিকার নতুন পররাষ্ট্র-সচিব আণ্ডার সেক্রেটারী রাস্ক-এর ড্রয়ারে নাকি সব সময় একটা লাইন-

টানা প্যাড থাকত। হলুদ কাগজের প্যাড। কি কি সমস্যা তাঁর সামনে রয়েছে তাই লেখা থাকত তাতে। কখনও কখনও সেখানে সমস্যার সংখ্যা দাঁড়াত সত্তর থেকে আশী। রাস্ক হেসে বলতেন—আমি একশ' চাই। এতদিনে সেই আশা বুঝি সফল হল!

২৯. ১২. ৬০

রায়, যামিনী

এখন কি নাম হয়েছে জানি না। তখন রাস্তাটার নাম ছিল ডিহি শ্রীরামপুর লেন। অথবা—রোড।

যতবার ও পথে যাই ততবার চোখে পড়ে বাড়িটা। অন্য পাশের কোন বাড়ির সঙ্গে মিল নেই। এমন কি, কিছুদিন পর নিজের সঙ্গেও না। প্রতিবারই তার নতুন চেহারা। দেখলে অবাক না হয়ে পারা যায় না।—এমন ক্ষ্যাপা বাড়িওয়ালাও হয় কখনও?—না জানি লোকটি কে?

ক্রমে জানা গেল। জানা গেল এ বাড়িতে সত্যিই একজন 'ক্ষ্যাপা' বাস করেন। তাঁর মাথাময় অবিন্যস্ত সাদা চুল, চোখে পুরু চশমার নীচে কেমন যেন দুটি চোখ, গায়ে বোতাম হীন এক হাফ পাঞ্জাবী। মাঝে মাঝে দামী মোটর এসে দাঁড়ায়, দামী পোশাকে মণ্ডিত বিদেশীরা নামেন, কড়া নাড়েন, কিন্তু তিনি কিছুতেই পাঞ্জাবী ছাড়েন না।

শোনা মাত্র চেনা হয়ে গেল। সুতরাং একদিন বেপরোয়াভাবেই কড়া নেড়ে বসলাম। কেননা, যে মানুষ বাড়িটাকে নিয়েই এমন খেলা খেলছেন, তাঁর খেলাঘরের ভেতরটা যেমন করে হক দেখা চাই।

দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালেন সেই বৃদ্ধ ক্ষ্যাপা। চোখে তাঁর জিজ্ঞাসা। বলা মাত্র মৃদু স্বরে বললেন, আসুন।

তারপর অনেকবার গিয়েছি। অনেক দেখেছি, কাছাকাছি বসে অনেক আলাপ করেছি। কখনও ওঁর নিজের সঙ্গে কখনও ছেলেদের সঙ্গে। কিন্তু স্বীকার করব যামিনী রায় এখনও আমার কাছে শ্রী অস্পষ্ট, আজও সেই প্রথম দিনের মতই মানুষটি আমার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সম্ভবত, সব কালের সব শিল্পীরাই তাই। ওঁরা চিরকালের রহস্যাবৃত। ব্যক্তিগত টুকিটাকিতে চিরকালই কেমন যেন ওঁদের অনিচ্ছা। অন্তত শিল্পী যামিনী রায় সে সব প্রসঙ্গে মৌন থাকতেই ভালবাসেন। কেননা, সংগতভাবেই তাঁর ধারণা তাঁর বক্তব্য ঘরময় বিবৃত।

ডিহি শ্রীরামপুর লেনের সেই বাড়িটা ভর্তি ছবি, আর ছবি। শিল্পী মৌন কথক!

সে কথা থেকে জানা যায়, যামিনী রায় বাংলা দেশের শিল্পী। আদি বাড়ী তাঁর বাঁকুড়া জেলার কোন এক গ্রামে এ খবরও যদি অতঃপর পেতে হয় তবে অনিবার্যভাবেই অন্য কারও দ্বারস্থ হতে হয়। হয় ছেলেদের কিংবা অন্য কোন অনুরাগীর।

তাঁদের মুখেই শোনা। গাঁ থেকে শিল্পী কলকাতায় এলেন। সেকালের কলকাতায়। অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেলের হাতে গড়া শহরে। যথারীতি ভর্তিও হলেন গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজে। কিন্তু বের হওয়ার পর দেখা গেল—এই একটি মানুষের ছবিতে অন্ততঃ কলেজের ছাপ নেই। যা আছে সে মাটির। বাঁকুড়া জেলার, কালীঘাটের, বাংলাদেশের।

দীর্ঘ সাধনায় শ্রী রায় অনেককাল কাটিয়ে উঠেছেন সেই অস্পষ্ট স্বাক্ষর। এখন তিনি আর 'পটো' ত ননই, বোধ হয় সেই ধারার শিল্পীও নন। তিনি শুধু শিল্পী। এমন শিল্পী যিনি সম্পূর্ণত নিজের ভাষায় কথা বলেন। এবং সে কথা দাঁড়িয়ে দেশ দেশান্তরের লোকেরা শোনে।

চুয়াত্তর বছরের বৃদ্ধ, বাংলাদেশের ঘরের মানুষ যামিনী রায় আজ বিশ্ব-খ্যাত শিল্পী। তাঁর প্রতিষ্ঠা আজ প্রশ্নাতীত। সুতরাং, এমন সময়ে ভারতের ললিতকলা একাডেমি কর্তৃক তাঁকে 'ফেলো' নিবাচন কোন চমকপ্রদ সংবাদ নয়। সেই সংবাদের আড়ালে তার চেয়েও বড় সংবাদ, খেলাঘরের ক্ষ্যাপা এখনও তাঁর প্রতিষ্ঠা তাঁর পরশপাথর খুঁজে চলেছেন। ভক্তজনের আসরে নয়, সরকারী মর্যাদায় নয়—ক্যানভাসে। ২০. ৪. ৬১

রায়, সত্যজিৎ

ম্যানহাটন-এ ছত্রিশটি সিনেমা-বাড়ি। কিন্তু একজন মালিকও রাজী হলেন না 'পথের পাঁচালী' দেখাতে। কেননা, তাঁদের মতে—'পথের পাঁচালী' এমন অপেরা যা সমালোচকরা ভাল-বাসেন কিন্তু খদ্দেররা স্বচক্ষে দেখতে পারে না।' তবুও ফিফ্থ এভিন্যুতে যখন দেখান শুরু হল সুদূর বাংলা দেশের কোন এক অখ্যাত গাঁয়ের জীবন পাঁচালী, তখন দর্শকেরা ভেঙে পড়ল সেখানে। কাগজ-ওয়ালারা স্বীকার করলেন—জনপ্রিয়তায় 'গার্ভেইস'-এর (Gervaise) রেকর্ডও ভেঙ্গে ফেলেছে ইণ্ডিয়ার এই প্লে-টি।

রামকিষণ

সম্মান অবশ্য এই প্রথম নয়। কলকাতা দোনামনা করলেও কেনেস থেকে সানফ্রান্সিসকো—তিন বছরে পাঁচটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছিল একত্রিশ বছরের তরুণ পরিচালক সত্যজিৎ রায়। তারপর ক্রমে আরও অনেক সম্মান যোগ হয়েছে তাতে। গেল সপ্তাহে 'অপরাজিত' তার সঙ্গে জুড়ে দিল আরও দুটি। দুটি পুরস্কারই জাতিতে আমেরিকান, প্রকৃতিতে আন্তর্জাতিক এবং ভারতের ভাগ্যে এই তার প্রথম প্রাপ্তি গৌরব।

শ্রীসত্যজিৎ রায়কে আরও অনেকের মতই আমরাও প্রথম দেখি বইয়ের মলাটে। সুকুমার রায়ের একটি সর্বজনপাঠ্য ছোটদের বই পড়তে পড়তে একদিন জেনেছিলাম তার পাতায় পাতায় আশ্চর্য সুন্দর ছবিগুলো তাঁর পুত্র সত্যজিৎ রায়ের আঁকা। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়। ক্রমে সিনেমা সংক্রান্ত একটি বইয়ের সম্পাদকের তালিকায়ও একদিন সাক্ষাৎ পেলাম তাঁর। এবং অবশেষে সে পরিচয় সম্পূর্ণ হল পর্দায়; —'পথের পাঁচালীতে।'

'পথের পাঁচালী'র নির্মাণ কাহিনীও একটি অসাধারণ শিল্পীর জীবন পাঁচালী। স্বপ্নটা জন্মেছিল বিভূতিভূষণের বইয়ের পাতা আঁকতে আঁকতে। সিনেমার দৃশ্যগুলোও এসেছিল ক্যামেরার আগে কলমে। বাংলা দেশের মাটি থেকে বহুদূরে। বিলেত থেকে স্বদেশমুখী একটি জাহাজের কামরায়। তারপর স্ত্রীর অলঙ্কার বাঁধা দিয়ে ক্যামেরা কেনা... অপু সংগ্রহ। এবং অবশেষে এক ছুটির দিনে বন্ধুদের নিয়ে নিশ্চিন্তপুরের দিকে বেরিয়ে পড়া।...

বিজ্ঞাপন থেকে সমাপ্তি—অনেক নতুন কথা বলেছেন সত্যজিৎ রায়। অনেক নতুন পথে পা বাড়িয়েছেন তিনি! সত্যজিৎ রায় নিঃসন্দেহে দুর্লভ জাতের শিল্পী। ছবি আঁকিয়ে কানে কালা হলে তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলবার নেই। যিনি গান জানেন চিত্রপ্রদর্শনীতে তিনি যদি ছটফট করেন তাহলেও নির্বাক থাকা ছাড়া উপায় নেই আমাদের। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের মত সম্পূর্ণ জাতের শিল্পী যাঁরা—তাঁদের নিয়ে গর্ববোধ করা যে কোন দেশের গৌরব। ১৩. ২. ৬০

রামকিষণ

'জ্যোতিষীরা' সম্পূর্ণ পরাস্ত। 'হাওয়া বিশারদ'রা জব্দ। চণ্ডীগড়ের

বাইরে বসে এখানে-ওখানে যাঁরা ঘরোয়া ভাবে বাজি ধরেছিলেন তাঁদের দু'দলই খুশী,—কোন পক্ষকেই হার মানতে হল না। এমন কদাচ হয়। বিশেষত যেখানে নতুন-পুরোনা পরিচিত নাম যথেষ্ট। কামরাজ-শাস্ত্রী-স্বর্ণ সিং, তথা হালের দিল্লি মাসান্তেই এ চমকের জন্যে অবশ্যই দ্বিতীয়বার গৌরবের দাবি করতে পারেন বৈ কি!

খবরের কাগজের ফটো-দপ্তর ঘেঁটে ঘেঁটে হয়রান, জীবনী-লেখকরা বিচলিত। সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোঁর উত্তরাধিকারী হয়ে পঞ্চনদীর তীরে অবশেষে যিনি আবির্ভূত হলেন, নিঃসন্দেহে তিনি চেনাজানা নাম নন। চেহারায়ও অবশ্যই তাঁকে ক্যামেরা গৌরব বলে অভিহিত করা চলে না। নিতান্তই সাধারণ চোখ-মুখ, যেন আর পাঁচজন গৃহস্থেরই একজন। কিন্তু তাই বলে শ্রীরামকিষণ 'কালো ঘোড়া' নন। যতটুকু জানা গেছে তিনি শুধু পুরানো লড়িয়ে নন, একটু অন্য ধরনের জনসেবক। বন্ধু এবং আপন রাজ্যের কাছে পরিচয় নাকি তাঁর 'কমরেড রামকিষণ!' ব্যঙ্গার্থে হলে বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু শব্দটা যখন যথার্থে ব্যবহৃত, তখন খবরটা অবশ্যই শুনবার মত। প্রজারা 'কমরেড' বলে ডাকতে পারেন এমন মুখ্য-মন্ত্রী বোধ হয় সত্যিই খুব সুলভ নয়।

জন্ম—১৯১৩ সন। জন্মস্থান পশ্চিম পাঞ্জাবের ঝান্ জেলার কোট-ইসা-শা গাঁয়ে। সাধারণ এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। সে গ্রাম এখন পাকিস্তান। গাঁয়ের ছেলে রামকিষণ রাজনীতিতে দীক্ষা নিয়েছিলেন শহরে, কলেজে পড়তে পড়তে। পাঞ্জাবে তখন লালা লাজপৎ রায়ের ঝড়। তাঁরই আহ্বানে বই ফেলে বাইরে ছুটে এসেছিলেন রামকিষণ। জীবনে তাঁর প্রথম আন্দোলন গভর্নর মণ্টমরেন্সির বিরুদ্ধে আয়োজিত বিখ্যাত ছাত্র-ধর্মঘট। সে ১৯২৯ সনের কথা। সে বছরই তরুণ রামকিষণের জীবনে প্রথম কারাবাসের অভিজ্ঞতা।

তারপর ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩২ ১৯৪১ এবং '৪২। ক্রমে জেলখানা রামকিষণের জীবনে দ্বিতীয় ঠিকানায় পরিণত হয়েছে। সাকুল্যে ছ'বছর জেলে কাটিয়েছেন রামকিষণ। বিয়াল্লিশ উপলক্ষে একটানা তিন বছর কেটেছে তাঁর সেখানে। কখনও কখনও সঙ্গী হয়েছেন স্ত্রী। কখনও ছোট ছেলেরা পর্যন্ত। রামকিষণের পত্নী দু দু'বার জেল খেটেছেন যুগল

পুত্রসহ। এমন কি পরিবারকে সম্পূর্ণ করে রামকিষণের বৃদ্ধ পিতা রামচাঁদও দু'বার যোগ দিয়েছিলেন ওঁদের সঙ্গে। তিন পুরুষ একসঙ্গে তখন কারাবাসী। এসব তৎকালের কাহিনী, পাঞ্জাবে যখন অনেক দেশ-বরেণ্য নায়ক, এবং রামকিষণ যখন তাঁদের ভীড়ে জনৈক 'স্বদেশী' মাত্র। তাহলেও কংগ্রেসমহলে অজ্ঞাতকুলশীল ছিলেন না তিনি। দেশ-বিভাগের আগে তিনি ছিলেন লাহোর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্যতম সদস্য। তাছাড়া রামকিষণ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে আছেন আজ পনের বছর, এবং সেকালেই একটানা ক'বছর ছিলেন তিনি প্রাদেশিক অফিসের অফিস-সেক্রেটারী।

দেশ বিভাগের পর থেকে ঝান্ জেলার মানুষ রামকিষণ জলন্ধরের নায়ক। সীমান্তের এপারে আসার পরও প্রাদেশিক কংগ্রেসের পূর্বতন আসনটি অনড় ছিল তাঁর। তবে রামকিষণের সে পরিচয়ই তখন এক-মাত্র পরিচয় নয়। রাতারাতি জলন্ধরে 'কমরেড সাহেব' খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে হৃদয় এবং মাথার প্রমাণ দিয়ে। ফলে রামকিষণ যে অচিরে জেলা কংগ্রেসের সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত হলেন তাই নয়—জলন্ধর শহর এই উদ্বাস্তু নায়ককেই ক্রমে একদিন পাঠাল রাজ্য বিধানসভায় নিজেদের প্রতিনিধি করে। সে ১৯৫২ সনের কথা। প্রদেশ কংগ্রেসের অফিস-সম্পাদক তখন রাজ্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক।

সে বিধানসভার মেয়াদ ফুরোতে ফুরোতে '৫৬ সনে কায়রোঁ মন্ত্রিসভায় রাজ্যের অন্যতম ডেপুটি মন্ত্রী মনোনীত হয়েছিলেন রামকিষণ। কিন্তু '৫৭ সনের নির্বাচনে জনসংঘের কাছে আসন খোয়াতে হল তাঁর। অপরাধ নাকি—রামকিষণ হিন্দু হয়েও যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দুভাবাপন্ন নন; সর্বাবস্থায়ই তিনি সেক্যুলারপন্থী রাজনীতিক। '৬২ সনে জলন্ধরের সেই লোভনীয় আসনটি আবার দখলে এল রামকিষণের, এবার তিনি মনোনীত হলেন কায়রোঁ মন্ত্রিসভায় অন্যতম রাষ্ট্রমন্ত্রী। দপ্তর—টাউন প্ল্যানিং এবং বস্তী উচ্ছেদ। গত বছর কায়রোঁ যখন এমার্জেন্সি উপলক্ষে তাঁর একত্রিশ সদস্যের মন্ত্রিসভাকে ছেঁটে ন'জনের 'রাজসভায়' পরিণত করেছেন রামকিষণ তখন 'মৃত'দের তালিকায় অন্যতম।

তাহলেও যে শেষ পর্যন্ত তিনি সকল কাঁটা তুচ্ছ করে এভাবে ফুটে বের হলেন, তার সবটুকু কারণ বোধ হয় 'চান্স' বা হস্তরেখা নয়। কি মন্ত্রিসভায়, কি বাইরে—জনতার মানুষ রামকিষণ পাঞ্জাবে নাকি অন্যতম জীবন্ত রাজনীতিক। তিনি চব্বিশ ঘণ্টা 'পলিটিক্যাল।' তার চেয়েও বড় কথা দীর্ঘদিন কায়রোঁ সাহচর্যের পরেও তিনি সাদা থানের মত পরিচ্ছন্ন। আদর্শ ছাড়া অন্য কোন কিছুর প্রতি বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বা আনুগত্য নেই তাঁর। রামকিষণ চমৎকার বক্তা। কিন্তু তবুও নাকি চলতি অর্থে 'মেঠো বক্তা' নন। তথ্য এবং আবেগে মিলে সে বক্তৃতা নাকি সব জাতীয় জমায়েতেই রীতিমত আকর্ষণীয়। গত বাজেট অধিবেশনে কায়রোঁর বাজেটকে সমালোচনা করে যেসব বক্তৃতা করেছিলেন তিনি, তাতে প্রমাণ হয়েছিল আদর্শ প্রশ্নে রামকিষণ আপোস-বিরোধী। সেদিন রেডিক্যাল রামকিষণের অভিযোগ—কায়রোঁ ভুবনেশ্বর প্রস্তাবের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারছেন না।

এবার নতুন মুখ্যমন্ত্রী রামকিষণ কি তা পারবেন ?

কে জানে, সময়ে প্রতিশ্রুত সহযোগিতার অভাব না হলে একান্ন বছরের এই 'কমরেড'-মুখ্যমন্ত্রীই হয়ত পাঞ্জাবকে স্বাস্থ্যে এবং চরিত্রে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করবেন। তবে অতঃপর শ্রীরামকিষণকে অবশ্যই গার্হস্থ্য ব্যাপারে অধিকতর সতর্ক এবং সজাগ থাকতে হবে। কেননা, কায়রোঁ ছিলেন দুই পুত্রের জনক,—আর পাঞ্জাবের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর ছেলেমেয়ে এগারটি। ১৮. ৭. ৬৪.

রেড্ডি, কে. সি.

জনৈক চীনা দার্শনিক মানুষকে ভাগ করেছেন দুই দলে। এক দলে থাকেন মহত্তর জগতের পথিক আদর্শবাদীরা, অন্য দলে অর্থলিপ্সু ভোগীরা,—লিখছেন পাঞ্জাবের বিদায়ী রাজ্যপাল শ্রীএন, ভি, গ্যাডগিল। সদ্যপ্রকাশিত এক জবানবন্দীতে আদর্শবাদী গ্যাডগিল পঁয়ষট্টিতে তাঁর 'মতিভ্রমের' হেতু বর্ণনের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন—'দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি আজও প্রথম দলে।'

তাঁর জায়গায় পাঞ্জাবের রাজ্যপালের আসনে নতুন যিনি এলেন, বলা নিষ্প্রয়োজন, বিখ্যাত দক্ষিণী নায়ক শ্রীকে. সি. রেড্ডিও তার ব্যতিক্রম নন। সন্দেহ করার

রেড্ডি, কে. সি.

যথেষ্ট হেতু আছে, তিনিও প্রথম দলেরই।

গাঁয়ের নামে নাম। শ্রীগ্যাডগিলের তিন বছর পরে (১৯০২ সনে) কে. সি. ওরফে শ্রীকায়াসম্বলী চেঙ্গলারায়া রেড্ডি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন মহীশূরের যে গ্রামটিতে তারও নাম কায়াসম্বলী। শব্দটির সঠিক অর্থ কি জানিনা, কিন্তু কে. সি. রেড্ডি মানে যে মহীশূর সেকথা প্রজা আন্দোলনের যে কোন ইতিহাস পাঠক জানেন।

কায়াসম্বলীর বালক লেখাপড়া শিখেছিলেন—তথাকথিত দেশীয় রাজ্যে নয়, খাস ইংরেজ প্রেসিডেন্সিতে,—মাদ্রাজে। সেখান থেকেই তিনি বি. এ. পাশ করেছিলেন এবং সেখান থেকেই বি. এল্.। কিন্তু কর্মজীবন শুরু করেছিলেন তিনি মহীশূরেই, তাঁর মাতৃভূমিতে।

শুরু হয়েছিল সোনার খনির জেলা কোলারের মাটি অঙ্গে মেখে। '৩৩ সন থেকে সেখানকার জেলা বোর্ডের সভাপতি সেদিন সত্যিই মাটিতে নেমেছিলেন বলেই দু'বছর পরে '৩৫ সনে মহীশূরের মাটিতে দেখা দিয়েছিল প্রজা আন্দোলন,—বিখ্যাত পিপলস ফেডারেশন। '৩৭ সনে কংগ্রেসে অন্তর্লীন হওয়ার দিন পর্যন্ত শ্রীরেড্ডিই ছিলেন তার সভাপতি। এবং তাঁরই উদ্যোগে সেদিন সম্পন্ন হয়েছিল দুই সমান্তরাল আন্দোলনের মিলনে মহীশূরের যথার্থ জাতীয় জাগরণ।

প্রজাপরিষদ এবং কংগ্রেস এক হওয়ার পরে শ্রীরেড্ডিই সেদিন নির্বাচিত হয়েছিলেন পুনর্গঠিত মহীশূর কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি। তারপর আরও একবার ('৪৬-৪৭) এই পদ অলঙ্কৃত করেছেন তিনি এবং স্বাধীনতার পরে তিন তিনবার নির্বাচিত হয়েছেন আইনসভায় কংগ্রেস দলের নেতা। '৪৭ থেকে '৫০ সন পর্যন্ত তিনিই ছিলেন মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রী। তারপর রাজ্যসভা, লোকসভা এবং ১৯৫৭ সন থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্ব।

তবে শ্রীরেড্ডির জীবনে তার চেয়েও রোমাঞ্চকর স্মৃতি নিশ্চয় মহীশূরের সেই দিনগুলো। চার চারবার রাজ সরকার অন্তরীণ রেখেছিলেন ওঁকে। তারই ফাঁকে রেড্ডি তখন কাগজ চালান, বিদ্রোহী 'জনবাণী'; তিনি সত্যাগ্রহ করেন, তাঁর প্রজা আন্দোলনের সমর্থন খুঁজতে ইংল্যাণ্ডে ইউরোপে ঘুরে বেড়ান। প্রজা আন্দোলনে রেড্ডি তখন সত্যিই একটি নাম।

আশা করা যায় নানা দায়িত্বপূর্ণ দপ্তর পরিচালনায় (যথা : উৎপাদন, পূর্ত, গৃহনির্মাণ, সরবরাহ) অভিজ্ঞ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁর নতুন পদেও পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হবেন। বিশেষ, যেখানে নতুন করে কিছু করার প্রশ্ন, কেন্দ্রীয় পূর্তমন্ত্রী সেখানে বরাবরই অগ্রণী। মনে রাখতে হবে, শ্রীরেড্ডি দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্স নামক বিখ্যাত বিদ্যাকেন্দ্রটির একজন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। তা ছাড়া, তাঁর পূর্বসূরী শ্রীগ্যাডগিলের পদত্যাগের কারণটা যাঁরা জানেন, তাঁরা নিশ্চিত থাকতে পারেন শ্রীরেড্ডির ক্ষেত্রে সে আশঙ্কা অমূলক। কেননা, শোনা যায় যেখানে বিরুদ্ধতা রেড্ডি সেখানেই অধিকতর কর্মঠ। শুনে অবাক হয়ে যাবেন, দক্ষিণী হলেও ১৯৫২ সন থেকে তিনিই ছিলেন দিল্লির রাষ্ট্রভাষা প্রসার কমিটির সভাপতি ! ১৪. ৮. ৬২

রেড্ডি, এন. সঞ্জিব

মিথ্যে বলব না। শ্রীইউ এন ডেবর যখন কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন—তখন তিনি আমার কাছে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন না। যেমন, প্রায়-অপরিচিত ছিল—স্ট্যালিনের পর ক্রুশ্চফ-এর নামটি। এখন এঁদের দুজনকেই আমি চিনি। সুতরাং, শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে একটু কম জানি বলেই—কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের সুপারিশকে আর অগ্রাহ্য করতে সাহস পাচ্ছি না। কেননা, শ্রীরেড্ডিও শ্রীডেবরের মত নিজ রাজ্যের বাইরে স্বল্পপরিচিত বটে, কিন্তু ঘরে মোটেই তা নন। 'রামালু. টি প্রকাশম, রাজাজীদের দেশে তিনি চল্লিশ বছর বয়সেই অন্ধ্রের সহকারী মুখ্যমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করেছেন। সাধারণ মন্ত্রী তারও আগে থেকে। '৫৬ সালের নবেম্বর থেকে তিনি প্রতিবেশি-সমস্যাপীড়িত-বিরোধসংকুল অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী। তার দশ বছর আগে থেকেই তিনি বিধানসভার সদস্য এবং আরও দশ বছর আগে থেকে রাজ্য কংগ্রেসের সম্পাদক। শ্রীরেড্ডির বয়স এখন ছেচল্লিশ। এই বয়সে জেলখাটা, মন্ত্রিত্ব, কংগ্রেস-সভাপতিত্ব ছাড়াও নিজ রাজ্যের বাইরে কংগ্রেসকর্মীদের আপন পরিচয় দিয়েছেন তিনি অন্তত দু'বার। একবার গণ-পরিষদে, আর একবার কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডে।

সুতরাং, শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি কংগ্রেসের সেই পুরানো যুগের দৈত্যদের সমান মাপের মানুষ না হলেও, নব্যযুগে

একেবারে বেমানান মনোনয়ন নয়। বিশেষ করে আমাদের মনে রাখতে হবে, কংগ্রেস এখন পার্টি এবং ইদানীংকার কংগ্রেস সভাপতিদের দায়িত্ব লেবার পার্টির ম্যানেজারের চেয়ে অনেক বেশি কিছু নয়।

২১. ১১. ৫৯

ল

লউ, এরিক হেনড্রিক

লণ্ডন এখন জমজমাট। ইংরেজদের ভাগ্য দেখে পুরানো বন্ধুদের মনেও হিংসা উঁকি দেয়। লোকে বলে—সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত গেছে। কিন্তু আহা! কি সুন্দর সন্ধ্যা! ঘরে রাজকুমারীর বিয়ে, অতিথিশালায় গোটা কমনওয়েলথ, সামনে আসন্ন 'সামিট'। ঝানু জ্যোতিষীরাও বলেন—এমন দিন শতবর্ষেও একবার হয় না। কিন্তু তবুও বুকে পোস্টার ঝুলিয়ে হাতে ফেস্টুন নিয়ে ভোর রাত্তিরে রাস্তায় নামল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীরা, তরুণ লণ্ডনাররা। হাঁটতে হাঁটতে থামল এসে হোটেলটার সামনে। তারপর একসঙ্গে ধ্বনি তুলল—'লউ তুমি খুনি। ইংরেজদের কাছে তোমার ক্ষমা নেই।'

জানালা দিয়ে উঁকি মেরে ছেলে-মেয়েগুলোকে একনজরে দেখলেন লউ। তারপর গিয়ে বসলেন—সাংবাদিকদের আসরে। দেশবিদেশের একশ' লোক তখন কলম হাতে কান পেতে আছে সেখানে। এদের দুচক্ষে দেখতে পারেন না লউ। তাঁর ধারণা, কালোদের বর্তমান মেজাজের অনেকখানি কারণ এরাই। যা হক লউ বললেন 'আমি স্পষ্ট কথার লোক। তোমরা শুনে নিশ্চিন্ত হতে পার, দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা মানুষগুলোকে আমরা কিছুতেই বান্টু ডিক্টেটারদের হাতে তুলে দেব না। কিছুতেই না।'

স্পষ্ট কথা আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের কালিমাখা মুখে শোনা গেছে অনেকবার। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রী এরিক হেনড্রিক লউ তাঁদের সকলের পুরোভাগে। বস্তুত '৫৫ সনে পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার নেওয়ার পর থেকে বাইরের দুনিয়ার বেপরোয়া-

ভাবে শ্বেত-মাহাত্ম্য প্রচার করার কৃতিত্বেই তিনি আজ বিশ্ববিখ্যাত। রাজনীতিতে নামবার আগে আইন-বিদ লউ ছিলেন সরকারী কর্মচারী। দক্ষিণ আফ্রিকার বৈদেশিক দপ্তরে তিনি পুরানো কর্মী। '২৫ সনে আমেরিকায় ট্রেড কমিশনারের কাজ থেকে শুরু করে দেশের হয়ে নানা দেশে নানা কাজ করেছেন তিনি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, বার কয় য়ুনোতে প্রতিনিধিত্ব। ইউ এন ওতে দক্ষিণ আফ্রিকা তথা হেনরি লউকে না চেনে এমন দেশ আজ অন্তত একটিও নেই। সবাই জানে, লউ উঠে দাঁড়িয়েছেন, মনে হয় তিনি তাঁর দেশকে নিয়ে এক্ষুনি হেঁটে বেরিয়ে যাবেন, নয়ত এমন কিছু কথা বলবেন, যা এই বাড়িটার ছাদের নীচে দাঁড়িয়ে না বললেই ভাল হত। যথা: সেবার জাতিপুঞ্জের দশম জন্মদিনে লউ শুভেচ্ছা জানালেন: যদি (এই প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম জনক) জেনারেল স্মাটস জানতেন একদিন এই জাতিপুঞ্জ অন্য দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে হাত দেবে, তা হ'লে আমি নিশ্চিত বলতে পারি, দক্ষিণ আফ্রিকাকে কিছুতেই তিনি এখানে আসতে দিতেন না।'

লণ্ডনে এসে উনসত্তর বছরের পুরানো স্মাটস শিষ্য বলছেন: আমি এখানে আসামী হয়ে আসিনি।—'—নয় এজ এ পেনিটেণ্ট, নয় সাপ্লিয়েণ্ট!'

কিন্তু তবুও লণ্ডন তাঁকে মনে প্রাণে অভ্যর্থনা জানাতে পারছে না। কারণ, হেনড্রিক লউ শুধুমাত্র যে কমনওয়েলথ শান্তির সংসারে 'দুষ্টু ছেলে' তাই নয়, সার্পভিল-এ রক্তের দাগ যে এখনও তাজা। তাছাড়া লিবারেল ইংরেজরা জানে, '৩০ সনে যে লোকটি ছিল নাৎসীদের অন্তরঙ্গ বন্ধু '৬০ সনে তাঁর পক্ষে আর যাই হক, ইংলণ্ডের আন্তরিক বন্ধুত্ব অর্জন সম্ভব নয়।

৭. ৫. ৬০

লাল, পি. সি.

[এয়ার ভাইস-মার্শাল]

কাহিনীটা শুনেছিলাম এমনি আর এক বিষাদাচ্ছন্ন মুহূর্তে। একজন দুর্ধর্ষ অসামরিক পাইলট আকাশে নিখোঁজ হয়েছেন। তাঁর খবর করতে গিয়ে শুনলাম শেষ খবর এখনও পাওয়া যায়নি। তবে আশা করা যায়—এবার পাওয়া যাবে, কেননা জি এম নিজেই প্লেন নিয়ে উড়ে গেছেন নেফার দিকে!

—জি এম মানে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারা যাঁকে জানেন এয়ার-কমোডোর পি সি লাল। আই এ সিতে তিনিই প্রথম আই এ এফ অফিসার !

এয়ার ইণ্ডিয়ার সেই বিখ্যাত জেনারেল ম্যানেজার এখন আর তাঁর আগের পদে নেই। এয়ার-কমোডোর এখন ভাইস মার্শাল। আই এ সি'র পর নতুন পদ পেয়েছিলেন তিনি বিমান বহরের সংরক্ষণ বিভাগে। মেনটেনেন্স এর কর্তা এবার সেখান থেকে উঠে এলেন আরও গুরুতর কাজে। চিরকালের মত অকালে হারিয়ে-যাওয়া এয়ার-ভাইস মার্শাল পিণ্টোর শূন্য স্থানে তিনিই এখন ওয়েস্টার্ন কমাণ্ডের বিমানবাহিনীর অধিনায়ক। এয়ার ভাইস-মার্শাল পি সি লাল এখন উত্তর-পশ্চিম আকাশের রক্ষক।

বড় ঘরের ছেলে। লণ্ডনের বিখ্যাত কিংস কলেজের গ্র্যাজুয়েট। ইচ্ছে ছিল ব্যারিস্টার হবেন। সেই বাসনাতেই নামও লিখিয়েছিলেন মিডল টেম্পল-এর খাতায়। কিন্তু পড়া শেষ হতে না হতেই সুরু হল যুদ্ধ। পরিকল্পনা সব তছনছ হয়ে গেল। লাল বিমানবাহিনীতে যোগ দিলেন। তরুণ ভারতীয় যখন কমিশনড হয়ে প্লেনে বসেছেন যুদ্ধ তখন তাঁর চারদিক ঘিরে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে, ভারতীয় বিমান বহরের শৈশবের দিনগুলোতে যে সব তরুণ বৈমানিক দুঃসাহসিতায় ইতিহাস রচনা করেছেন পি সি লাল তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন ৭নং স্কোয়াড্রনের অধিনায়ক। তাঁর অধিনায়কত্ব এবং সাহসিকতা সেদিন যে সামরিক ডেসপ্যাচগুলোতেই অন্যতম উল্লেখ্য ছিল তাই নয়,—১৯৪৫ সনে যে মুষ্টিমেয় বৈমানিক 'ফ্লাইং ক্রস'-এ সম্মানিত হয়েছেন 'পি সি' তাঁদেরও একজন।

দেশ বিভাগের পরে এয়ার-কমোডোর লালের বেশ কিছুদিন কেটেছে দেশের বাইরে, তিনি তখন প্রতিরক্ষা দপ্তরের সামরিক প্রতিনিধি-মণ্ডলের অন্যতম সদস্য। তারপর কিছুদিনের জন্য আবার শিক্ষার্থীর জীবন। ১৯৫০ সনে পি সি লাল রয়াল এয়ার ফোর্সের অ্যানডোভারস্থ বিখ্যাত স্টাফ কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন। দেশে ফেরার পর কিছুদিন কেটেছে তাঁর পালাম বন্দরে, লাল

সেখানে ছিলেন অপারেশন্যাল কম্যাণ্ডে অন্যতম সিনিয়র অফিসার। সেখান থেকে ১৯৫৩ সনের জানুয়ারী নয়াদিল্লির প্রতিরক্ষা দপ্তরে। পি সি লাল ভারতীয় বিমান বহরের প্রথম অফিসার যিনি সেক্রেটারিয়েটে ডেপুটি ডিরেক্টারের আসন অলঙ্কৃত করেছেন। সেখান থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে পদ হয়েছিল তাঁর—এয়ার অফিসার কমাণ্ডিং, ট্রেনিং কমাণ্ড। বাঙ্গালোরের সেই আসন থেকেই লাল এসেছিলেন অসামরিক বিমান বহর আই এ সি'র জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করতে। সে দায়িত্ব যে তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছিলেন তার প্রমাণ আজকের—আই এ সি। বন্ধুরা জানেন—তিনি সেদিন ততোধিক ;—নয়ত 'জি এম' কখনও হারানো বৈমানিকের সন্ধানে টেবিল ছেড়ে ককপিট-এ গিয়ে বসেন ?

হারানোর সেই বেদনাময় পালা এখনও চলেছে। কে কে গাঙ্গুলী (অসামরিক) অতুলনীয় এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জি, ভাইস-মার্শাল পিন্টো —প্রায়শ অপঘাত যেন ভারতীয় বিমান বহরে জন্ম-লিখন। সেই হৃদয়বিদারক ইতিবৃত্তের মধ্যেও একমাত্র সান্ত্বনা আমাদের আকাশে এখন লাল-এর মত সন্তানেরা আছেন ও হারানো বন্ধুদের খোঁজ করতে নেমেও যাঁরা ইতিহাস তৈরী করতে জানেন।

লি, শাউ চি

কমিউনের বাগানে আলু তুলছিল ছেলেটি। বাচ্চা ছেলে। শিশু কমরেড। হঠাৎ হাতটা কেটে গেল। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন আধবুড়ো একজন মানুষ। বললেন—কাঁদছ কেন ? —রক্ত দেখে কখনও কাঁদতে নেই !

আর একদিন। মস্ত সভা বসেছে কমিউনের কর্মীদের। সেই মানুষটিই বসে আছেন সভাপতির আসনে। একজন কমরেড বললেন—আমাদের মধ্যে এমন অনেক কমরেডও আছেন এখনও বয়লার ঘরকে যাঁরা মনে করেন—নরক।

ফস করে উঠে দাঁড়িয়ে সভাপতি বললেন—এখানে এই নরক-ই আমি আরও থান কয় চাই !

অদ্ভুত মানুষ। অদ্ভুত মেজাজ। চেহারাটা দেখতে অনেকটা কম-ওঠা ফটোর মত। কেমন জানি আবছা আবছা, অস্পষ্ট। লম্বায় যথেষ্ট লম্বা (৫ ফু. ১০ ই.), চওড়ায় সে-তুলনায়

যথেষ্ট কম! মাথায় কিছু খাড়া খাড়া, কিছু শায়িত, কিছু পাকা, কিছু কাঁচা চুল। বয়স কত হবে কেউ সঠিক জানে না। কেউ বলে—পঞ্চান্ন, কেউ কেউ বাষট্টি। তবে এবিষয়ে মোটামুটি সবাই একমত যে, চেয়ারম্যান লি শাউ চি ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান মাও সে তুং-এর চেয়ে বছর কয়েকের ছোটই হবেন। কেউ বলেন—চার বছরের, কেউ বলেন—ছ'বছরের।

বয়সে যেমন কাছাকাছি, তেমনি জীবনেও। পাশাপাশি গাঁয়ের ছেলে। দু'জনেরই দেশ হুনান। দু'জনেরই বাবা সম্পন্ন জোতদার। পড়তেনও শহরের একই ইস্কুলে, চ্যাংশা'র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। মাও আর লি শাউ চি তখনও গলাগলি বন্ধু। দু'জন একসঙ্গে ছাত্র-আন্দোলন করেন, একসঙ্গে কাগজ বের করেন। সহসা ছাড়াছাড়ি।

সাংহাই থেকে রাশিয়ানরা সহসা একদিন শাউ চি' কে তুলে নিয়ে গেল। তাদের দূরপ্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র চাই। লি শাউ চি সেই প্রথম সপ্ত 'বিদ্যার্থী'র একজন।

এদিকে ওঁরা যখন মস্কোয় পাঠ নিচ্ছেন খাস চীনে তখন মাও আর তাঁর একাদশ সহচর কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ফেলেছেন। ফিরে এসেই শাউ চি ত্রয়োদশ আসনটি টেনে নিয়ে বসে গেলেন। দেখতে দেখতে তাঁর নাম প্রথম দিকে এগুতে লাগল। লি শাউ চি দলের শ্রমিক বিভাগের কর্তা।

কুড়ি বছর একটানা শ্রমিক সংগঠন। মাঝে মাঝে কারাবাস এবং আন্দোলন। '৩৪ সনে মাও যখন ছ' হাজার মাইলের সেই ঐতিহাসিক অভিযানে বের হলেন লি শাউ চি তখন চিয়াং-এর রাজ্যেই থেকে গেলেন। অবশ্য গোপনে।

চার বছর পরে ইয়েনান-এর সেই গুহাদপ্তরে তাঁদের মিলন এবং অবশেষে ১৯৪৯ সনে যুগপৎ পিকিং-এ অবতরণ। নতুন চীনে পুরানো কমিশার লি গোড়া থেকেই সম্মানিত নায়ক। অবশ্য দলের ভেতরে।

বাইরে জনতার করতালিমুখর অঙ্গনে এসেছেন তিনি সম্প্রতি,—১৯৫৯ সনের অক্টোবরে। কিন্তু ইতিমধ্যেই গণতান্ত্রিক চীনের রাষ্ট্রীয় প্রধান লি শাউ চি আন্তর্জাতিক আলোচ্য। কেননা, 'সাচ্চা কমিউনিস্ট' (শাউ চি'র সবচেয়ে জনপ্রিয় বই —'How to be a Good Communist') হয়েও তিনি রাশিয়ার মতের বাইরে চলাফেরা করেন, এমন

কি ক্রুশ্চফের সঙ্গে প্রকাশ্যে তর্ক করারও সাহস রাখেন।

খ্যাতিমান তাত্ত্বিক লি শাউ চি'র পক্ষে সেটা অসম্ভব ঘটনা কিছু নয়। কেননা, একই বই পড়ে অন্যরা যা দেখেন শাউ চি বরাবরই তার চেয়ে বেশী কিছু দেখতে পান। ফলে তাঁর কাছে কমিউনিজম ছাড়াও দলের ভেতরে আরও আরও কিছু 'ইজম' থাকা সম্ভব। যথা: ফর্মালিজম, কম্যাণ্ডইজম, এ্যাডভ্যাঞ্চারিজম, ওয়ারলড্ইজম, সাবজেক্টিভিজম, সেক্টেরিয়ানইজম, হিরোইজম। এগুলো হয়ত অন্য কমিউনিস্টরাও শুনেছেন। কিন্তু 'টেইলইজম, 'মাউন্টেনটপ-ইজম', 'ক্লোজড-ডোর-ইজম'? মস্কোয় সমবেত বিশ্ব-কমিউনিস্ট নায়কদের অনেকেই হয়ত জানেন না—এগুলোও এক এক ধরনের 'ইজম', এবং তার আবিষ্কর্তা আর কেউ নয়, এবার চীনা প্রতিনিধি দলের যিনি নায়কত্ব করছেন—সেই লি শাউ চি নিজে।

শাউ চি বরাবরের দুঃসাহসী। শুধু পার্টিতে নন, ব্যক্তিগত জীবনেও। আজীবন ক্ষয়রোগের রোগী শাউ চি—চেইন স্মোকার। এবং আগাগোড়া ভাঙ্গা সংসার বয়ে বয়েও এখনও তিনি নিষ্ঠাবান সংসারী। চারটে বিয়ে করেছেন চেয়ারম্যান শাউ চি। সর্বশেষটি সম্প্রতি এবং শোনা যায়—কনেটি তাঁর বছর পঁচিশেক-এর ছোট।

১০. ১১. ৬০

লী, কুয়ান ইউ

তিন বছর আগেও নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে পারত না ছেলেটি। এখন সে শুধু অনর্গল বলতে পারে তাই নয়, পনের লক্ষ লোকের হয়ে বলে। একটি দেশের হয়ে।

নাম—লী কুয়ান ইউ। বন্ধুরা বলেন—হ্যারি লী। বয়স—মোটে তেত্রিশ (জন্ম ১৯২৮) অথচ পরিচয় একটি রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। সিঙ্গাপুরের লী—পরাধীন সিঙ্গাপুরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী।

অথচ, কি আশ্চর্য, ক'বছর আগেও তিনি নিজেও ভাবতে পারেন নি সেকথা। ভাবতে পারেন নি এমন ভাবে তাঁকেও জড়িয়ে পড়তে হবে রাজনীতির সঙ্গে। কেননা বাণিজ্য ওদের চিরকালের পারিবারিক ব্যবসা!

বিত্তবান ঘরের ছেলে। সিঙ্গাপুরের অধিকাংশ মানুষের মত (শতকরা ৮০ ভাগ) পূর্ব পুরুষেরা

কোন পুরুষে চলে এসেছিলেন চীন থেকে। কিন্তু সেই থেকে বাড়ছেই বাড়ছে।

সুতরাং লী গেলেন স্কুলে। ওখান-কার সবচেয়ে ভাল বিদ্যালয়ে। অর্থাৎ র‍্যাফল ইনস্টিটিউশনে। সেখান থেকে র‍্যাফল কলেজে এবং সেখান থেকে এণ্ডারসন বৃত্তি নিয়ে কেম্ব্রিজে। দেশে কেম্ব্রিজের স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় গোটা মালয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করে ছিলেন লী। খাস কেম্ব্রিজে এসেও আইনের পরীক্ষায় দখল করলেন প্রথম স্থান। তা ছাড়া অন্যান্য বিষয়েও ছেলেটি আদর্শ ছাত্র। সে ভাল বলতে পারে, ভাল খেলতে (গল্‌ফ) পারে।

'৫০ সনে বিলেতেই আইনজীবীর পোশাক গায়ে চড়ালেন লী। কিন্তু কেন জানি মন বসে না। দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছা হয়।

অর্থচিন্তা নেই। সুতরাং বেকার-ভাবে ফিরতেও কোন বাধা নেই। লী ফিরে এলেন সিঙ্গাপুরে। সেই সঙ্গে তাঁর মাথায় চেপে এল আরও একটি অদ্ভুত বস্তু, ইংরেজরা যাকে বলে—'সোশ্যালইজম'।

লী আদর্শে সোশ্যালিষ্ট। সুতরাং, একশ বিয়াল্লিশ বছরের পুরানো ঘুনে ধরা ইংরেজ কলোনীতে তাঁর বেশীদিন বসে থাকতে হল না। প্রথমেই ডাক বিভাগীয় কর্মচারীদের অবৈতনিক আইন উপদেষ্টার পদটি মিলল। সেই বেতন বৃদ্ধির লড়াইয়ে লী'র দল বিজয়ী হল। সেই থেকে শুরু হল লী'র জয়-জয়কার। অবশ্য, এ যাবৎ প্রধানত আইনের আঙ্গিনায়।

ক' বছরের মধ্যেই জনতার প্রসারিত আঙ্গিনায় নেমে এলেন লী। '৫৪ সন। সে বছর সিঙ্গাপুরে নতুন শাসনতন্ত্র। পরের বছর তদনুযায়ী নতুন নির্বাচন। তারই প্রস্তুতি হিসেবে তৈরী হল সরকারী দলের (প্রগেসিভ পার্টি) বিরুদ্ধে নতুন দল। তাতে তিন রকমের তিনজন নেতা। তাঁদের একজন লী।

দেখতে দেখতে সে দল ত্রিধা হয়ে গেল। কেননা, ওঁরা কেউ লী'র মত র‍্যাডিকেল নন। সুতরাং নতুন দল গড়েছেন। সে দলের নাম 'পিপলস একশান পার্টি'। '৫৫ সনের নির্বাচনে তারা আসন পেয়েছিল পঁচিশের মধ্যে মাত্র তিনটি।

পরের নির্বাচনে ('৫৯) ওলট পালট হয়ে গেল সব। এবার মোট আসন ছিল একান্নটা। তার মধ্যে লী একাই কেড়ে নিলেন তেতাল্লিশটা।

রাতারাতি এ অঘটন ঘটাতে পেরেছিলেন, কারণ যে নতুন শাসনতন্ত্র বলে ('৫৭) স্বাধীনভাবে সিঙ্গাপুরের জীবনে এই প্রথম নির্বাচন, লী নিজেই প্রথম সেই স্বাধীনতার দাবী তুলেছিলেন। ভোটাররা তা ভোলেনি।

এরই মধ্যে তারা তা ভুলে গেছে এমন কথা মনে করারও বোধ হয় কোন কারণ ঘটেনি। কেননা, লী'র সতর্ক প্রহরায় সিঙ্গাপুর আজ স্পষ্টতই অধিকতর স্বাধীন। সেখানে (মুসলমান ছাড়া) অন্য কারও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের উপায় নেই, মেয়েদের মর্যাদা হানি করার আইনসম্মত পথ নেই, (চীনাদের ক্ষেত্রে প্রায় তা-ই নাকি ছিল) এবং ইচ্ছে করলেই কারও পক্ষে সিঙ্গাপুরকে আজ আর 'পিনবল মেসিন', 'জুক-বক্স সেলুন' কিংবা সচিত্র নীল পুস্তকাদি দিয়ে ঠেকিয়ে নেওয়ার উপায় নেই। (বৃটিশ হাই-কমিশনার আজ সেখানে শুধু দেশরক্ষা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বৈদেশিক-সম্পর্ক রক্ষা ব্যাপারে ক্ষমতাবান) তাছাড়া, সিঙ্গাপুরের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিয়ে গঠিত লী'র 'ক্যাবিনেট অব ডনস' যে সাত-সালা পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত, তা সফল হলে এই জনপ্রিয় নায়কের অধিকতর জনপ্রিয়তা অবধারিত।

কিন্তু আশ্চর্য তবুও নাকি ওঁকে হত্যার জন্যে ষড়যন্ত্র চলেছে সেই বন্দরে। দেশে দেশে দেশপ্রেমিক কাণ্ডারীরা সাবধান! ২২. ৬. ৬১

লী, কং

৯ই আগস্ট, ১৯৬০।

রাজধানী লুয়াংপ্রাবাং-এ সেদিন স্বর্গত লাওস-রাজের অন্ত্যেষ্টি উৎসব। পাঁচ মাস আগে বৃদ্ধ রাজা সিসোভং বিগত হয়েছেন। বর্তমান রাজা ভাথান্না নিষ্ঠা সহকারে পিতৃকৃত্যের আয়োজন করেছেন। তখন দুপুর। রাজপুত্র ভাথান্না উপাসনায় বসেছেন। তাঁর পেছনে নত মস্তকে রাজ্যের মন্ত্রী এবং অমাত্যেরা স্বর্গত রাজাধিরাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে দণ্ডায়মান। এমন সময় সহসা আকাশবাণী হল: লাওস আমাদের। যে করে হক আমরা এদেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনব।

রাজা ভাথান্না চমকে উঠলেন। মন্ত্রীরা চমকে উঠলেন। অদূরে ব্যাঙ্ককে 'সিয়াটো'র হেডকোয়ার্টার। সেখানে বিদেশীরা চমকে উঠলেন।

কি হয়েছে, কি কর্তব্য কারও জানা নেই। দুজন মন্ত্রী পালিয়ে গেলেন। একজন তাঁদের রাজ্যের দেশরক্ষা মন্ত্রী।

ব্যাপারটা স্পষ্ট হল সন্ধ্যায়। সন্ধ্যায় লাওসের রাজা প্রজা (প্রজা সংখ্যা মাত্র কুড়ি লক্ষ) সকলে জানলেন অঘটন ঘটে গেছে। লাওসে 'ক্যু' তথা বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। এবং এতদ্দেশের (লাওসের আয়তন মাত্র নব্বুই হাজার বর্গমাইল) ক্ষমতা এখন যাঁর করতলগত ক'ঘণ্টা আগেও তিনি ছিলেন লাওস বাহিনীর জনৈক প্যারাট্রুপ্যর।

চেহারা—অন্যান্য লাওসীয়ানদের মত। নাম কংলী (Conglea)। পদবী—ক্যাপ্টেন। তরুণ ক্যাপ্টেন কংলী এবং তাঁর অনুচরেরা ভিয়েনটাইন দখল করে ফেললেন। বৌদ্ধ ধর্মের দেশ লাওসএ দুটো রাজধানী। ভিয়েনটাইন রাজনৈতিক রাজধানী, লুয়াংপ্রাবাং ধর্মীয়। রাজা যখন ধর্মীয় রাজধানীতে পিতৃকৃত্য সারছেন উদ্ধত প্রজারা তখন রাজনৈতিক রাজধানীতে রাজকৃত্য সেরে ফেলেছেন। কংলী বলেন—তা ছাড়া উপায় ছিল না। কেননা, গেল দু' বছরে দু'হাজার লাওস সন্তান প্রাণ হারিয়েছে, একশ পঁচানব্বুইটি গ্রাম ধ্বংস হয়েছে এবং এগার হাজার লোক কারাবাসী হয়েছে! এর জন্যে দায়ী যাঁরা—সেই বিদেশীদের আমরা হটাতে চাই। আমরা লাওসের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে চাই! কংলী আরও জানালেন—ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স সৌভান্না ফোয়ুমা তাঁর দলে যোগ দিয়েছেন এবং 'পাথেটলাও' নেতা প্রিন্স সৌফানৌতং নৌভং তাঁকে সমর্থন করেছেন।

দু'বছর আগে সৌভান্না বিদেশীদের চক্রান্তে ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। সুতরাং সত্যিই তাঁকে স্বপক্ষে পাওয়া গেল। 'পাথেটলাও' নেতা নৌভং ক'বছর ধরেই দেশত্যাগী। তিনি সৌভান্নার সহোদর। ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই-এর শেষ ঘটাতে এগিয়ে এলেন তিনিও। কংলী বললেন—এবার আমরা রাজার সঙ্গে আপোষ করব। এবং দাসখত ছিঁড়ব।

'সিয়াটো'কে আর বিশুদ্ধ পর্যবেক্ষণ চালালে চলে না। কেননা, এই জেনারেলটা শুধু দেশ-ই চেনে। কমিউনিস্ট এবং অ-কমিউনিস্ট-এর ফারাক বোঝে না। 'পাথেটলাও'

আর লাওস-এর পার্থক্য জানে না। সুতরাং, সকলে সক্রিয় হলেন। ফলে রাজা বললেন—আপোষে আমি অমত। ভূতপূর্ব দেশরক্ষা মন্ত্রী বললেন—আমিও। এবং দেখতে দেখতে রেভলিউসনারি কমিটির মত 'অ্যান্টি কুঁ্য কমিটি'ও গঠিত হয়ে গেল। এবং গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত লাওস আবার নতুন করে গৃহযুদ্ধের মুখোমুখী এসে দাঁড়াল।

চূড়ান্ত ফল যখন ঘোষিত হবে তখন কংলী নামক জেনারেলটিকে সেখানে কি অবস্থায় দেখা যাবে আমরা জানি না, কিন্তু লাওসের প্রজাবর্গ জানে তাঁরা না চাইলেও রাজাকে সেখানে আবার পাওয়া যাবে। কেননা, ওদের প্রবাদ মতে 'একজন রাজা যখন জন্মগ্রহণ করেন তার শত শত বৎসর আগে তাঁর সেই প্রকাণ্ড কাণ্ড মাটি ফুঁড়ে আঙ্গুলের মত জন্ম নেয়।' এবং লাওসের অরণ্যে সেই অঙ্গুলিপ্রতিম শিশু বৃক্ষটি খুঁজে পাওয়া গেছে জেনেই লাওসরাজ তাঁর পিতৃকৃত্যে বসেছিলেন।

১. ৯. ৬০

লুথুলি, এলবার্ট জন

ওঁকে যদি যেতে দেওয়া হয় তাহলে মুস্কিল। মুস্কিল—যেতে না দিলেও। কেননা, গেলে ইনি যেমন মুখ বন্ধ করে থাকবেন না, না গেলেও তেমনি বোধ হয় চুপ করে থাকবেন না। সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কিছু লিখে পাঠাবেন তিনি। এবং সে লেখা নিশ্চয়ই ভাইকিংদের বিষয়ে হবে না! লিখেছিলেন অ্যালান পাটন। দক্ষিণ আফ্রিকার সেই বিখ্যাত শ্বেতাঙ্গ লেখক, নিজে শ্বেতবর্ণ হয়েও যিনি লাল কলমে কৃষ্ণাঙ্গদের হৃদয়ের কথা লেখেন।

ভেরউডকে সাধুবাদ, অবশেষে লুথুলিকে তিনি ওসলো যেতে দিয়েছেন। না দিলে বোধহয় তিনি আরও ঠকতেন। পাটনের ভাষায় —নিজের গালে আরও একটা চড় খেতেন। কেননা,—পুরস্কারটা নোবেল পুরস্কার,—অর্থাৎ দাতা—পশ্চিম। তদুপরি,—বিষয় শান্তি, এবং প্রাপক —আর কেউ নন, লুথুলি। মোটর যোগে খবরটা যখন ডারবান থেকে ষাট মাইল দূরে স্টেঙ্গারের কাছে নিজের হাতে গড়া সেই টিন আর কংক্রিটে গড়া বাড়িটায় পৌঁছেছিল নোবেল পুরস্কার বিজয়ী তেষট্টি বছরের

লুথুলি, এলবার্ট জন

প্রবীণ জুলু সর্দার লুথুলি তখন বাড়ি ছিলেন না। তিনি ক্ষেতে আখ কাটছিলেন !

বরাবরই এমনি। কোট-প্যাণ্ট-টাইয়ের আড়ালে চিরকাল তিনি গান্ধী ! গান্ধীজী চলে আসার পরে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় গান্ধী !

বাপ ঠাকুর্দা চার পুরুষ ধরে জুলুদের স্বীকৃত দলপতি। বাবা থাকতেন দক্ষিণ রোডেশিয়ার একটা মিশনে। তিনি খ্রীষ্টান যাজক ছিলেন। লুথুলির ছোটবেলা সেখানেই কেটেছে। ছাত্রজীবন কেটেছে প্রথমে নাটালে, তারপর ডারবানে। '২১ সনে সেখানকার আডমস কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পর সেখানেই কাজ করতেন। কলেজে জুলুভাষা এবং গান শেখাতেন। কিন্তু ভবিষ্যতে যিনি গান্ধী হবেন, চিরকাল তিনি সেখানে থাকবেন কেন ? '৩৫ সনে এলবার্ট জন লুথুলি কলেজ ছেড়ে গাঁয়ে ফিরলেন। তিনি দরিদ্র জুলুদের নায়ক হলেন, ব্যস, সেই পুরুষানুক্রমিক দায়িত্ব থেকেই শুরু হল স্বদেশের নায়কত্ব !

গান্ধীবাদী রাজনীতিক এলবার্ট লুথুলির রাজনৈতিক জীবন অতঃপর গোটা আফ্রিকার অন্যতম জাতীয় সম্পদ। প্রথমে তথাকথিত নেটিভ রিপ্রেজেনটেটিভ কাউন্সিল। অন্যান্য আফ্রিকানদের চোখে অতি সম্মানসূচক সেই আসন থেকে দু'দিন বাদেই লুথুলি নেমে এলেন। স্বদেশকে জানালেন—আমাকে ওখানে কেন বসিয়ে ছিলেন ওঁরা জান ?—তোমাদের ধোকা দেবার জন্যে ! এমন অকুতোভয়। এবং অকপট রাজনীতিক দৈবাৎ মেলে।

'৫২ সনে আফ্রিকায় ন্যাশনাল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে তিনিই সেদিন দক্ষিণ আফ্রিকাকে ডাক দিয়েছিলেন খালি হাতে রুখে দাঁড়াতে। সেই ঐতিহাসিক আইন-অমান্য আন্দোলনের ফলস্বরূপ একদিকে যেমন সরকার 'দলপতি' হিসেবে তাঁর অধিকার কেড়ে নিল, অন্যদিকে কংগ্রেস তাঁকে বরণ করল সভাপতি পদে।

তারপর কখনও মৌন থাকার আদেশ, কখনও বাড়িতে নাতিদের নিয়ে বসে থাকার নির্দেশ, কখনও বা আদালতের কাঠগড়া, লুথুলির ওপর অত্যাচার আজও অব্যাহতই আছে। '৫৯ সন থেকে তাঁর উপর কড়া আদেশ—পাঁচ বছর তিনি ঘর ছাড়তে পারবেন না, তিনি মুখ খুলবে

পারবেন না, তিনি জেলার বাইরে পা বাড়াতে পারবেন না।

কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন এত শিকল দিয়েও লুথুলিকে আটকে রাখা যায়নি। গেল বছর সার্পভিল-এর পরে ঘৃণায় যাঁরা পকেটের পাশগুলো আগুনে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন লুথুলি তাঁদের অন্যতম। সরকার সাজা দিয়েছিল তাঁকে দু'শ আশী ডলার জরিমানা করে।

—আর, —আর নোবেল কমিটি কত দিল সেই কৃষ্ণাঙ্গ জুলুকে? ভেরউড শুনে দেখলে দেখতে পাবেন, ডলারে তার হিসাব হয় না। বিশেষ করে পুরস্কারটা ১৯৬০ সনের, অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকায় যে-বছর—সার্পভিল।

১৪. ১২. ৬১

লুমুম্বা, প্যাট্রিক

চমৎকার মোটরের পথ। চমৎকার আমেরিকান গাড়ি। তবুও ড্রাইভার ব্রেক কষল।—কি ব্যাপার? না, সামনে আবার একটা গাছ পড়ে আছে!

হেসে গাড়ি থেকে নামলেন লুমুম্বা। পথে আরও ক'বার নামতে হয়েছে। গাছ গাড়ি থামিয়েছে। কেননা, গাঁয়ের লোকেরা খবর পেয়েছে। তারা তাদের লুমুম্বাকে দেখতে চায়, তাঁর মুখে দুটো কথা শুনতে চায়! লুমুম্বার কথা তাদের কাছে—নেশা।

দু' বছর আগেও দেশের লোক নাম জানত না তাঁর। আজ বিশ্ব জানে। কেননা, প্যাট্রিক লুমুম্বা আজ বেলজিয়ান কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী, এবং আফ্রিকার এই কঙ্গো নামক দেশটি শুধু অন্যতম সম্পদশালী দেশ নয় (বিশ্বের শতকরা সত্তর ভাগ হীরা, পঁচাত্তর ভাগ কোবাল্ট এবং অ-কমিউনিস্ট দুনিয়ার পঞ্চাশ ভাগ ইউরেনিয়াম তার মাটির নীচে), আকার-আয়তনেও সে বেলজিয়ামের চেয়ে আটগুণ বড় দেশ। তদুপরি সেই দেশে আজ দশ লক্ষ বেলজিয়ান তথা ইউরোপীয়ান বিপন্ন। তাঁদের এবং সেই সঙ্গে এক কোটি বিশ লক্ষ আফ্রিকানের ভাগ্য আজ একটি মানুষের হাতে। তাঁর নাম—প্যাট্রিক লুমুম্বা। বয়স—মোটে পঁয়ত্রিশ।

বেলজিয়ান কঙ্গোয় দেড়শ উপজাতি, কুড়িটি ভাষা। লুমুম্বা জন্মেছিলেন স্ট্যানলিভিল-এ। বাতে-তেলাদের ঘরে। আদিবাসী হলেও ওঁরা ক্যাথলিক খৃষ্টান। সুতরাং, ক্যাথলিক স্কুলে স্থান পাওয়া গেল।

খৃস্টান,—সুতরাং প্রটেস্ট্যান্টরাও আপত্তি করলেন না। দু'তরফে স্কুলের পড়া শেষ করে লুমুম্বা ভর্তি হলেন সরকারী ট্রেনিং স্কুলে।

পোস্ট্যাল ডিপার্টমেন্টের স্কুল। সুতরাং প্যাট্রিক লুমুম্বা পোস্ট আপিসে কেরানী হলেন। একটা বছর কোনমতে কাটল। হঠাৎ স্ট্যানলিভিল-এর নতুন কেরানীবাবুর হাতে হাতকড়া পড়ল। সরকার বললেন—লুমুম্বা আড়াই হাজার ডলার এদিক ওদিক করে ফেলেছে। বন্ধুরা বললেন—ওসব বাজে কথা। সরকার আসলে ওর কেরানী ইউনিয়ন দেখে ভয় খেয়েছে!

'৫৭ সনে ওরা ওঁকে ছেড়ে দিলেন। লুমুম্বা কিছুদিন সেলস-ম্যানের কাজ করলেন। কি বেচে-ছিলেন তিনি সেদিন সেটা জানা গেল কিছুদিন পরে। ব্রাসেলস-এ বসে কর্তারা যখন তা জানলেন তখন—সাদায় কালোয় গোলটেবিলে না বসলে আর চলে না এবং কঙ্গোর প্রতিনিধিরা বিনীতভাবে জানালেন—লুমুম্বাকে বাদ দিলে কিছুতেই এই টেবিল ভরে না।

আলোচনা হল। স্বাধীনতা এল। এক মাসও হয়নি কঙ্গো স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু একশ' বছর দাসত্বের পরেও এ স্বাধীনতা অকালে এল কি? লিওপোল্ডভিল-এর খবর অস্বাস্থ্যকর।

গর্বিত লুমুম্বা বলেন—না, আলবৎ না। —এ সেই শতবর্ষের জের।

কথাটা হয়ত সত্য। কিন্তু বেলজিয়াম কঙ্গো যে আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন সেটাও ত মিথ্যে নয়। এবং লুমুম্বা নিশ্চয় জানেন, দাস দেশের মুখে যে কৈফিয়ত চলে তিরিশে জুনের পর বেলজিয়ান কঙ্গোর মুখে সে কথা সম্পূর্ণ অচল!

তিরিশে জুন লিওপোল্ডভিলে দেড়শ জাতের মানুষ এক সঙ্গে শ্লোগান তুলেছিল—'যুরু!' —'যুরু!' —স্বাধীনতা! —স্বাধীনতা! শুনেছি কঙ্গোয় এই শব্দটারই অন্য মানে আছে একটা। —'যুরু' মানে সেখানে শান্তিও। এই দ্বিতীয় অর্থটাই আজ সত্য হোক। ২৮. ৭. ৬০

লেমনিৎসার, এ্যাডমিরাল লিন্যান

সেদিন ২২শে অক্টোবর, ১৯৪২। নিঃশব্দে আফ্রিকার নির্জন উপকূলে এসে মাথা ভাসাল একটি সাবমেরিন। নিঃশব্দে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন একজন সেনানায়ক। সঙ্গে

দুজন পার্শ্বচর। অনুচ্চ কণ্ঠে তাদের বিদায় জানিয়ে আবার জলের তলায় ডুব দিল সাবমেরিন।

নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত একটি ঘরে সভা হয়ে গেল। আগন্তুক সেনানায়ক আবার সাবমেরিনে ফেরার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। এমন সময় হঠাৎ দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন তাঁর পার্শ্বচরদ্বয়। এক ছটকায় তাঁর কাপড়চোপড় কাগজপত্র নিয়ে তাঁরা দে ছুট। যাওয়ার সময় শুধু বলে গেল—'ভিকি' অর্থাৎ ভিকি সরকারের পুলিস গন্ধ পেয়েছে! প্যাণ্ট নেই, কোট নেই,—অসম্পূর্ণ পোশাক তবুও আর ভাববার সময় কোথায়! জেনারেল জানালা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে পড়লেন। সেখানে গহন বন, অন্ধকার রাত।

ভোরের আলো ফুটছে। সাবমেরিনে দাঁড়িয়ে চিন্তিত সহচর জেনারেল মার্ক ক্লার্ক দেখলেন, সর্বাঙ্গে পোশাক বলতে একটা সাদা সোয়েটার চাপিয়ে পাচ ফুট এগার ইঞ্চি উঁচু একশ নব্বই পাউণ্ড ওজনের মানুষটি ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছেন। ক্লার্ক আনন্দে হাত নাড়লেন। "—ও কে"! সাবমেরিনে পা দিতে দিতে জবাব দিলেন—'লেম',—বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন সেনানায়ক লেমনিৎসার, জেনারেল নরস্টাডের জায়গায় মার্কিন সেনানায়ক হয়ে যিনি 'নাটো'য় চললেন। তখন তিনি সর্বাধিনায়ক আইসেনহাওয়ারের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট চীফ অব স্টাফ! তার চেয়েও বড় তথ্য: মিত্রপক্ষের উত্তর আফ্রিকায় অবতরণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাসে নাম যার "অপারেশন টর্চ" সে তাঁরই ভাবা।

তাঁর দীর্ঘ বত্রিশ বছরের সামরিক জীবনে আরও অনেক ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন পেনসিলভানিয়ার এক অখ্যাত জার্মান-লুথেরান পরিবারের এই মার্কিন সন্তান। বাবা জুতার কারিগর ছিলেন। তিন ভাইয়ের মেজো লেমনিৎসারও নিজের হাত খরচ চালাতেন অবসরে টুকিটাকি নানা কাজ করে। ফলে বাল্য থেকেই অভ্যাস তাঁর কথা নয়,—কাজ। একুশ বছর বয়স থেকে (জন্ম ১৮৯৯) সৈন্য বাহিনীতে আছেন, এক পুত্র এক কন্যার জনক এখন যুগপৎ প্রতিষ্ঠিত দাদামশাই এবং ঠাকুর্দা। গায়ে ইউনিফর্ম থাকলেও বয়স তাঁর ভেষট্টিতে পৌছেছে। সুতরাং বন্ধুদের কাছে "রকো" নামে পরিচিত দৃঢ়তার পাহাড়—সেই সৈনিকটির দীর্ঘ সার্ভিসবুক এখানে পড়ে শোনার

অসম্ভব। শুধু এইটুকু উল্লেখ্য যে, এবার ইউরোপে মার্কিন বাহিনীর অধিনায়ক হয়ে যাচ্ছেন যিনি, একদা সেই ইউরোপেই তিনি ছিলেন আইসেনহাওয়ারের দোসর। মহাযুদ্ধের পরে লেমনিৎসার সুপরিচিত সেনানায়ক। কেননা ইউরোপে রকমারী সামরিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে কোরিয়ার যুদ্ধ, দূর প্রাচ্যের অধিনায়কত্ব, এমন কোন সামরিক দায়িত্ব নেই যা এই স্বল্পবাক সৈনিকটি প্রতিপালন করেন নি। বিশেষ ১৯৫৯ সনের ১লা জুলাই থেকে তিনিই ছিলেন মার্কিন সৈন্যবাহিনীর চীফ অব স্টাফ! এবং তারপর "চেয়ারম্যান, ইউ এস জয়েণ্ট চীফস অব স্টাফ।" বারোটি দেশের মেডেল তাঁর বুকে।

আরও একটি সম্মান পদক আছে তাঁর। অবশ্য সেটি ইউনিফর্মে থাকে না। কেননা সেটি অর্জিত হয়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, জাপানের একটি ছোট্ট নদীর জলে। আমেরিকার মৎস্য শিকারী মাত্রই জানেন এশিয়ার জলে সবচেয়ে বড় ট্রাউট মাছ ধরার কৃতিত্ব যাঁর তিনি জেনারেল লেমনিৎসার। মাছটি দৈর্ঘ্যে ছিল নাকি সাতাশ ইঞ্চি। এবং সেটি ধরা পড়েছিল ১৯৫৫ সনের ৪ঠা জুলাই। লেমনিৎসার তখন দূরপ্রাচ্যে প্রধান মার্কিন সেনাপতি।

২৬. ৭. ৬২

লোহিয়া, ডঃ রামমনোহর

আবার অপ্রতিরোধ্য ডঃ লোহিয়া। কে একজন খেদ করে লিখেছিলেন—ভারতে কোন ফেনার ব্রকওয়ে নেই। স্বদেশের এবং বিদেশের তাবৎ মানুষের ছোটখাট মামলাগুলো তাই সওয়াল করার লোকের অভাবে মনে মনেই রয়ে গেল। সম্ভবত তিনি ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। সত্য বটে, অভিজ্ঞতায়, কার্যক্রমে, এবং কর্মভঙ্গীতে বৃটেনের ব্রকওয়ে আর ভারতের লোহিয়া এক নন;—কিন্তু তবুও একথা মানতেই হবে—ডঃ লোহিয়াও রীতিমত এক বর্ণাঢ্য অস্তিত্ব। স্বরাজের পরে 'স্বদেশীওয়ালার' সতের বছরে আঠারো বার কারাবরণ—সেও কি গতানুগতিক রাজনীতি? উপলক্ষ্যগুলোও তেমনই। কখনও খাজনা মুকুব, কখনও নেফা প্রবেশ, "কখনও অংরেজি হটাও"। কখনও বা খবরের কাগজের হেডলাইন থেকে বহুদূরে আরও 'তুচ্ছ' কিছু। এমন কী সুদূর আমেরিকায় 'কলার-বার'-এর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহেও তাঁর

আপত্তি নেই। ফলে কয়েকমাস আগে, গত বছর (১৯৬৩) মে মাসে ফারাক্কাবাদ কেন্দ্র থেকে বিজয়ী লোহিয়া যখন লোকসভায় আসন গ্রহণ করেন, তখনই সবাই জেনেছিলেন ঝড় এবার খাস পার্লামেণ্টকেই ঘর করল; দমকা হাওয়ায় কখন কে কোনদিকে ছিটকে পড়বেন তার ঠিক ঠিকানা নেই। লোহিয়া প্রত্যাশা পূর্ণ করেছেন। 'নেহরুজীর দৈনিক খরচ ২৫ হাজার টাকা' থেকে শুরু করে এদেশের মানুষের মাথাপিছু গড় আয় কত নয়া পয়সা,—ইত্যাদি বহুতর বিষয়ে বারবার তাঁর স-তথ্য, বিদ্রূপাত্মক, এবং আবেগ মথিত কণ্ঠ শোনা গেছে। লোকসভায় ইদানিং তিনি ছিলেন—অরিজিনাল বলে অবশ্য শোনার মত। কিন্তু এবার যা ঘটল সেটা বোধহয় সকলের কাছেই অভাবিত। লোহিয়ার মামলা ছিল এবার—কমিউনিটি ডেভলাপমেণ্ট প্রোজেক্ট থেকে 'জীপ হটাও।' তাঁর অভিযোগ প্রধানমন্ত্রী এবিষয়ে কথা দিয়েও কথা রাখছেন না। লোহিয়া সে সম্পর্কে ইতিপূর্বেই একটি প্রস্তাব পেশ করে রেখেছেন। এখন তিনি তার আলোচনার সুযোগ চান। তাই নিয়েই কথা কাটাকাটি, ভোটাভুটি, এবং অবশেষে স্পীকারের আদেশ: ডঃ লোহিয়াকে চলতি অধিবেশনের মত সসপেণ্ড করা হল। চাঞ্চল্যকর ঘটনা। হয়ত আরও নাটকীয় হত যদি লোহিয়া তাঁর শেষ প্রতিজ্ঞাটি ভুলে না যেতেন। তিনি নাকি বলেছিলেন—'আই শ্যাল নট লীভ দিস চেম্বার অন মাই টু ফিট!' দেশবাসীর সৌভাগ্য, ডঃ লোহিয়াকে মার্শালদের কাঁধে চড়ে লোকসভা থেকে বেরিয়ে আসার দৃশ্য দেখতে হয়নি।

চিরকাল অন্য ধরণের রাজনৈতিক মানুষ। বাবা হীরালাল লোহিয়া ছিলেন গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্য। ছেলের রাজনৈতিক দীক্ষা সেদিক থেকে কৈশোর থেকেই। জন্ম—১৯১০ সনে। '২৪ সনে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে গয়া কংগ্রেসে হাজির ছিলেন রামমনোহর। কিন্তু রাজনীতি তখনও তাঁকে সম্পূর্ণত গ্রাস করতে পারেনি। রামমনোহর তখন প্রথমত এবং প্রধানত ছাত্র। তিনি বোম্বাইয়ে স্কুলে পড়েন। সেখান থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে রামমনোহর চলে এলেন কলকাতায়। কলকাতা থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এ, পাশ করে, কিছুদিন কাশীতে,—

তারপর আরও পড়ার বাসনা নিয়ে ইউরোপে। '৩৩ সনে বার্লিন বিশ্ব-বিভালয় থেকে অর্থনীতিতে ডক্টরেট নিয়ে যখন তেইশ বছরের কৃতী তরুণ দেশে ফিরেছেন তখন দেশময় অসহযোগের জের চলেছে। ইচ্ছে করলে লোহিয়া সেদিন সহজেই দুষ্প্রাপ্য সুখের জীবন হাতে তুলে নিতে পারতেন, কিন্তু পরিবর্তে তিনি কংগ্রেসকেই বেছে নিলেন। কংগ্রেসে তখন নব্য হাওয়া, সমাজতন্ত্রের কথা-বার্তা। লোহিয়া সে আড্ডাতেই ভিড়লেন। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল অবয়ব লাভ করামাত্র দেখা গেল লোহিয়া সে তরুণগোষ্ঠীর অন্যতম, নব্যতন্ত্রীদের 'ব্রেনট্রাস্ট।' তিনি ওঁদের মুখপত্র 'কংগ্রেস সোস্যালিস্ট'-এরও সম্পাদক। 'অংরেজি হটাও' আন্দো-লনের বিশিষ্ট নায়ক ডঃ লোহিয়া ইংরাজীতে চমৎকার লেখক। তাঁর অগণিত বইয়ের মধ্যে কয়েকটির নাম—'ফ্রাগমেন্টস অব এ ওয়ার্ল্ড মাইণ্ড' 'হুইল অব হিস্ট্রি', 'হিমালয়ান পলিসি ফর ইণ্ডিয়া' ইত্যাদি।

'৩৬ সনে কংগ্রেস সভাপতির আসনে এলেন আর এক তরুণ,—জওহরলাল। লোহিয়াকে তিনি কাছে ডাকলেন। রামমনোহর এ-আই সি সি-তে এলেন, তারপর সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে। সেখানে কাজ তাঁর সভ্য প্রতিষ্ঠিত 'বৈদেশিক দপ্তর' পরিচালনা। কোথায় তখন স্বাধীনতা, কোথায় পররাষ্ট্র নীতি, পররাষ্ট্র দপ্তর। নেহরুজীর হয়ে তরুণ রামমনোহর তখন দেশে দেশে প্রগতিশীলদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, বিদেশস্থ ভারতীয় বংশোদ্ভবরাও তাঁর দায়িত্ব!

'৩৮ সনে রাজদ্রোহের অপরাধে কলকাতায় গ্রেপ্তার হলেন লোহিয়া। আদালতে নিজের হয়ে নিজেই এমন সওয়াল করলেন যে ম্যাজিস্ট্রেট শেষ পর্যন্ত তাঁকে ছেড়ে না দিয়ে পারলেন না। '৪২ সনে এই পুঁথির রাজ-নীতিকই আবার লক্ষ তরুণের স্বপ্ন। '৪৪ সনের মে মাসে ধরা পড়ে লাহোর ফোর্টে নিক্ষিপ্ত হওয়ার আগে প্রায় দু'বছর ধরে তিনি ইংরেজের কাছে এক দুঃস্বপ্ন। লোহিয়া সেদিন শৃগালের মত ধূর্ত, সিংহের মত সাহসী। বিয়াল্লিশে অসংখ্য অবিশ্বাস্য কীর্তির মধ্যে অন্যতম একটি—গোপন রেডিও স্টেশন পরিচালনা। বোম্বাইয়ে বসে এই লোহিয়াই তখন দেশবাসীকে আগস্ট আন্দোলনের বে-আইনী খবর শোনাতেন!

একই আপসহীন লড়াইয়ের কাহিনী পরবর্তী বছরগুলোও। সমাজতন্ত্রীরা কংগ্রেস ত্যাগ করলেন। সেই সঙ্গে ডঃ লোহিয়াও। তারপর প্রজাসমাজতন্ত্রী দল। মতভেদ লোহিয়াকে এবারও বিদ্রোহীতে পরিণত করল। '৫৬ সনে তিনি নতুন দল গড়লেন—সোস্যালিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া। অবশেষে হালে এল নতুন ধ্যান—সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি। সঙ্গীদের অন্যরা কেউ কেউ কংগ্রেসে ফিরে গেছেন, কেউ কেউ অন্যত্র,—লোহিয়া এখনও সমাজতন্ত্রী। মানবতাবাদী সমাজতন্ত্রী ডঃ লোহিয়া 'ম্যানকাইণ্ড' নামকও একটি কাগজ সম্পাদনা করেন। তাঁর স্বপ্নের পৃথিবী একটি একটি মানুষ নিয়ে গড়া এক অভূতপূর্ব মানব সমাজের বাসস্থান। সেখানে একনায়কত্ব নেই, ইলেকশন নেই, অথচ স্বাধীনতা আছে, এবং তৎসহ সাম্য। তাই বলে কী ডঃ লোহিয়া ফিকে রংয়ের সাম্যবাদী? অবশ্য নয়। কেননা, লোহিয়া বলেন: কমিউনিজম = সোস্যালইজম – ডেমো-ক্র্যাসি + কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা + গৃহযুদ্ধ + রাশিয়া!

২৪. ১২. ৬৪

শ

শঙ্কর, আর.

'কমিউনিস্টরা যদি এই নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করে তবে তা হবে অতিপ্রাকৃত ঘটনা।—'মিরাকেল!'—মাত্র ক'দিন আগে বোম্বাইতে সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন কেরালার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ। ক'দিন পরে কুইলনে একটা বিরাট জনসভায় তাঁর উত্তর দিয়েছিলেন রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি আর. শঙ্কর। তিনি বলেছিলেন: 'এটুকুই আমি বলতে পারি যে কমিউনিস্টরা আজ কেরালায় একটি আসন সম্পর্কেও নিশ্চিত নয়।' সমালোচকেরা শুনে মৌন ছিলেন। তাঁদের মতে—নাম্বুদ্রিপাদ এবং শঙ্কর দুজনেই 'অত্যধিক আশাবাদী!'

তাঁদের মনে এই অনিশ্চয়তার কারণ ছিল না এমন নয়। কেননা, '৪৮ সনের পর এই এলাকায় এটা চতুর্থ নির্বাচন এবং আগামী মন্ত্রিসভাটি

দশম মন্ত্রিসভা। তাহলেও সমস্ত দ্বিধা, শঙ্কা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কেরালার ছিয়ানব্বই লক্ষ ভোটদাতা স্পষ্ট সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন আজ। তারা জানিয়ে দিয়েছেন—ছ' মাস আগে রাষ্ট্রপতি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা তাদেরই সিদ্ধান্ত। কেরালায় কমিউনিস্টই শাসন সেদিন শুধু অচল ছিল না, দক্ষিণে সাম্যবাদের এই উর্বর ক্ষেত্রটি অন্ধ্রের মতই মনে মনে মরুভূমি হয়ে গিয়েছিল।

অন্ধ্রে নির্বাচনী ওলট-পালটের কৃতিত্ব যদি এস. কে. পাতিলকে কেউ দিয়ে থাকেন, তবে তিনি কতখানি সঙ্গত কাজ করেছেন বলা কঠিন। কিন্তু কেরালায় যুক্তফ্রণ্টের সংগঠনী কৃতিত্ব যদি কারও প্রাপ্য হয়, তবে তিনি কেরালারই একটি তরুণ কর্মী। নিঃসন্দেহে তিনি আশাবাদী তরুণ শঙ্কর।

কেরালার রাজনীতিতে শঙ্করের অভ্যুত্থান পথটি নাম্বুদ্রিপাদের চেয়েও জটিল পথ। স্তরে স্তরে স্বভূমিকে জানার সুযোগ শ্রীশঙ্কর যতখানি পেয়েছেন তেমন বোধহয় অতিকম জনই পেয়ে থাকেন। ছাত্রজীবনে রসায়নশাস্ত্রের কৃতী ছাত্র ছিলেন শঙ্কর। জীবনে তাঁর প্রথম পেশা শিক্ষকতা। প্রধানশিক্ষক হিসাবে শঙ্করের নাম ভারতের সবচেয়ে শিক্ষিতরাজ্য কেরলে সকলের মুখে মুখে। আইনজীবী হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত। বরং রাজনীতিক হিসাবেই তাঁর পরিচয় স্বল্প। যদিও দলের অভ্যন্তরে তাঁর গতিবিধি গোড়া থেকেই সকলের কৌতুহলোদ্দীপক। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্য কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর সম্পাদকের পদে উন্নীত হতে শঙ্করের বেশী দিন লাগেনি। কংগ্রেস তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছিল একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানে (এস. এন. ডি. পি.) দলের স্বার্থের প্রহরী। সেখানেও ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিফল হননি শঙ্কর। তবে সি. পি. রামস্বামী আয়ারকে সমর্থনের অভিযোগ উঠে তাঁর নামে। শঙ্কর দল ছেড়ে সত্য বলে প্রমাণ করেন সেই অভিযোগ। কিন্তু '৪৯ সনে রামস্বামীর রাজ্য ত্যাগের পর আবার ফিরে আসেন নিজের দলে। সঙ্গে সঙ্গে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি '৫২ সনে এবং '৫৭ সনেও রাজ্য বিধানসভায় প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু দেশে তখন উল্টো হাওয়া। শঙ্করকে নির্বাচনে জিতবার জন্যে তাই অপেক্ষা করতে হল '৬০ সন অবধি।

কেমিষ্ট্রীর ছাত্র শঙ্কর বরাবরই রাজনৈতিক মেলামেশায় পটু। এবারের যুক্ত ফ্রন্টের পেছনে তাঁর জ্ঞান এবং চেষ্টা অনেক খানি। ইতিপূর্বে মন্দির-পরিচালন বোর্ডে কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীমন্নাথ পদ্মনাভনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন তিনি। আর প্রজা সোস্যালিস্টরাও চিরপরিচিত। বাকি ছিল মুসলিম লীগ। শঙ্কর বলেন—মুসলিম লীগকে তিনি সাক্ষাৎ সম্পর্কে না জানলেও, কেরালার মানুষকে তিনি জানেন। একথা যে মিথ্যে নয়, কেরালার রায় তার প্রমাণ। সাত সাতটি মন্ত্রীর পরাজয়কে নিশ্চয় অতঃপর আর 'মিরাকেল' বলে চালাতে পারেন না, ই. এম. এস। ৬. ২. ৬০

শাস্ত্রী, লালবাহাদুর

অবশেষে কোটি মানুষের আন্তরিক প্রত্যাশাই সত্য হল। ইন্দ্রপ্রস্থের আকাশ থেকে বিভ্রান্তির মেঘ কেটে গেল, সেই সঙ্গে ভারতের মনোরাজ্য থেকে দুশ্চিন্তার ছায়াও। কেননা, জানা গেল, বিগত নায়কের 'ম্যানটল' অতঃপর স্থায়িভাবে শাস্ত্রীজীর অঙ্গেই অর্পিত হল। ...'হু',—কে? তর্ক মীমাংসিত। নেহরুহীন দিল্লি সীজার-পর রোম হয়নি, কাড়াকাড়ি, মারামারি শেষ পর্যন্ত 'গুজব' হয়েই রইল; নেহরুর ভারত জগতের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করে স্বচ্ছন্দে জানাল: উত্তরাধিকারী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী।

বস্তুত এ সিদ্ধান্ত অভাবিত কিছু নয়। গত জানুয়ারীতে কাশ্মীর-ফেরত লালবাহাদুরকে দেখার পর থেকেই ভারত মনে মনে জানত লালবাহাদুর নেহরুর কে, উত্তরাধিকারীর নাতিদীর্ঘ তালিকায় তিনি কোন্‌খানে। অন্তত, স্বয়ং নায়ক কোথায় তাঁকে দেখতে চান।

গত জানুয়ারীর কথা। ভুবনেশ্বরের আকস্মিক দুর্ভাবনায় জাতি তখনও আচ্ছন্ন। তারই মধ্যে চোখে পড়েছিল দৃশ্যটা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল গায়ের ওভারকোটটা ওঁর নিজের নয়। ঝুলে অন্তত ইঞ্চি ছয়েক বেশী লম্বা, চওড়ায়ও বেশ ক' ইঞ্চি অতিরিক্ত উদার। আশ্চর্য এই, তবুও কিন্তু চোখে মোটেই বেমানান ঠেকছে না।

এ রহস্যের সমাধান করেছিলেন শাস্ত্রীজী নিজে। হজরত-বালের ঘটনা উপলক্ষ্যে শ্রীনগরের তথাকথিত উত্তাপকে মন্ত্রবলে বরফে পরিণত করে দিল্লি ফেরত বিজয়ী লালবাহাদুর

স্মিতহাস্যে জানিয়েছিলেন—কোটটা সত্যিই তাঁর নিজের নয়, নেহরুজীর। যাওয়ার পথে অত্যধিক ঠাণ্ডার ভয়ে তিনিই গায়ে তুলে দিয়েছিলেন।…

তারপরও 'আফটার নেহরু হু', 'নেহরুর পরে কে'—এই জিজ্ঞাসা হয়ত কোন সাবালক গণতন্ত্রের পক্ষে অবাস্তর চিন্তা ছিল না, কিন্তু বিশ্ব অতঃপর নিঃসন্দেহে 'লীডারস-ম্যান্‌টল' নিয়ে বহুলাংশে ভাবনামুক্ত হয়েছিল। সেদিনই সকলে মনে মনে জেনেছিলেন নেহরুহীন ভারতে অতঃপর নেহরুজীর যা অবশিষ্ট থাকবে, সে তাঁর জুতোজোড়া; এগিয়ে এসে সেখানে যে কেউই পা ঢোকাবার চেষ্টা করুন না কেন,—'ম্যান্‌টল'—নেহরুর নিজের গায়ের কোট থাকবে শাস্ত্রীজীরই গায়ে!

অবশ্য অন্য মাপের, অন্য ধাতের। কিন্তু তা হলেও নেহরুর উত্তরাধিকারী নেহরুজীর মতই এক রহস্যময় পুরুষ, বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। লোকে বলে লালবাহাদুর একজন নন, নেহরুর মত তিনিও দ্বৈত। একজন তাঁদের শিশুর মত সরল, উদার, স্পর্শকাতর, প্রাণচঞ্চল। এখনও তিনি এই ষাট বছর বয়সেও যমুনার জলে হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটেন, কাছে গঙ্গা পেলে আপিস পালিয়ে ডুব দিয়ে আসেন, ব্যাডমিণ্টন খেলেন, ক্রিকেটের মাঠে বয়স ভুলে বালকের মত হল্লা করেন—সময় পেলে গোপনে লুকিয়ে 'স্ট্রোক' রপ্ত করেন। আর এক লালবাহাদুর ভারতের ভূতপূর্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পরবর্তীকালের ভারতীয় ত্রয়ীর কেন্দ্রমূর্তি দপ্তরবিহীন লালবাহাদুর। বিশাল ভারতের সহস্র সমস্যা তাঁর নখদর্পণে। বোলস-গোরবুথ-বেনেডিক্টভরাও এক্তিয়ারের বাইরে নন। চারদিকে ফাইলের পাহাড়। তারই মধ্যে একটি সিগারেটও না পুড়িয়ে, কলিং-বেলে মুহুর্মুহু সংকট-আর্তনাদ না তুলে নিঃশব্দে কাজ করে চলেছেন ভারতের দপ্তরবিহীন মন্ত্রী। আজ হজরতের পবিত্র কেশ, কাল পেট্রিক ভীন, পরের দিন—ব্যাঙ্ক ন্যাশনেলাইজেশন। শাস্ত্রীজী সম্ভবত রাজধানীতে তখন সবচেয়ে ব্যস্ত মন্ত্রী। দিনে তিনি আঠার ঘণ্টা কাজ করেন। কিন্তু তবুও টেলিফোন অপারেটারকে 'প্লীজ' বা সহকারী কেরানীটিকে 'থ্যাঙ্কয়ু' বলতে ভুলেন না। শাস্ত্রীজী সবচেয়ে নির্ভরযোগ্যও। তিনি অত্যন্ত শান্ত-ভাবে উত্তেজনার খবর শুনতে পারেন, ধীরভাবে—ঠোঁটে হাসি রেখেই

রূঢ়তম আদেশ দিতে পারেন, এবং তার চেয়েও বড় ক্ষমতা—যে কোন আদেশ প্রতিপালন করাতে পারেন। এই বিপরীত দুই লালবাহাদুর মিলেই অনাড়ম্বর নায়ক—লালবাহাদুর শাস্ত্রী। দৃশ্যত যাঁকে মনে হয় 'ম্যাকবেথ'-এর ডানকান, কার্যত তিনি কখনও সর্দার প্যাটেলের স্মৃতি, কখনও বা পন্থজী; এবং আদর্শে ও আন্তরিকতায় প্রায়শ নেহরুজী।

দক্ষিণ ভারতের একটি ব্যবসায়ী সংস্থার দূরদৃষ্টিকে ধন্যবাদ। ভুবনেশ্বরের পরে অসুস্থ নেহরুজীর শয্যা ঘিরে যখন নানা জনের ভীড়—তখন একান্তে আপন-মনে বসা এই ছোটখাট (উচ্চতা—৫'—২", ওজন—১০৫ পাউণ্ড) মানুষটিকেই শ্রদ্ধাভরে সম্মানের আসনে ডেকেছিলেন ওঁরা। বিনয়ী লালবাহাদুর সেদিন সকৌতুকে বলেছিলেন—আমাকে কেন? আমি যে অস্তগামী সূর্য! ওঁরা হেসেছিলেন। হেসেছিলেন লালবাহাদুর নিজেও। কেননা, কামরাজী-কৌপীন ধারণের পরেও সবিনয়ে তিনি স্বীকার করেছেন—আমি সন্ন্যাসী নই।

তাই বলে চারি পুত্র, দুই কন্যার 'গৃহস্থ'জনক কোন গলিপথে মন্ত্রিসভায় প্রত্যাবর্তন করেছেন এমন মনে করার কোন হেতু নেই। কেননা, লালবাহাদুরের উত্থান যে সিঁড়িযোগে তার প্রতিটি ধাপই কষ্টি-পাথরে বাঁধাই। উত্তরপ্রদেশ কংগ্রেস, উত্তরপ্রদেশ মন্ত্রিসভা—লালবাহাদুর যেখানে বসেছেন সেখানেই তিনি সংবাদ। উত্তরপ্রদেশের পুলিশমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘকে যেভাবে তিনি শাসনে এনেছিলেন আজ তা ইতিহাস। নিখিল ভারত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাঁর সংগঠন-প্রতিভা, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী হিসেবে দুর্ঘটনার দায়িত্ব নিয়ে তাঁর পদত্যাগ, কিংবা '৫৭ সনের নির্বাচনে কংগ্রেসের সারথি হিসেবে যা তিনি দেখিয়েছেন সেও তাই। গত বছর (১৯৬৩) আগস্টে শেরপার ভঙ্গীতে অক্লেশে নেপাল বিজয়ের পর —এবার লালবাহাদুরের কৃতিত্বের তালিকার পরবর্তী বিখ্যাত সংযোজন হজরতবালের বিশেষ দীদার। সেবার বিয়াল্লিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনে প্রথম বিদেশযাত্রায় কাঠমাণ্ডুর পথে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গী ছিলেন—স্ত্রী শ্রীমতী ললিতা দেবী। এবার তিনিও নন—শুধু নেহরুজীর কোট। তাই বলে কি লালবাহাদুর সেদিন দিল্লির 'রাজ-

নৈতিক ক্যারাম বোর্ডে' নেহরুজীর হাতে 'স্টাইকার' মাত্র ?

জনৈক সাংবাদিকের এই বিশেষণ ধরে ব্যঙ্গচিত্রী চিত্রসিদ্ধান্তে এসেছিলেন : শাস্ত্রীজী আহত ব্যাটসম্যান নেহরুর রানার। কথাটা আপাত-সত্য হলেও সম্ভবত সেটাই লালবাহাদুর শাস্ত্রীর একমাত্র পরিচয় নয়। কেননা, লালবাহাদুরের আপন পরিচয় কেবলই সাত বছর জেল খাটার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জন্ম—১৯০৪ সনের ২রা অক্টোবর তারিখে। শুধু জন্মতারিখে গান্ধীজীর সঙ্গে কাকতালীয় ঐক্য-বশত নয়, সার্ভেন্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির অন্যতম প্রবীণ কর্মী শাস্ত্রীজী তাঁর তরুণ বয়স থেকেই স্বদেশের জন্যে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। বাবা সারদাপ্রসাদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। বেনারসের হরিশ্চন্দ্র স্কুলের ছাত্র কিশোর লালবাহাদুর পারাণির কড়ির অভাবে স্কুল করতেন প্রতিদিন সাঁতার কেটে গঙ্গা পার হয়ে। এভাবেই তিনি পরবর্তীকালে বিখ্যাত কাশী বিদ্যাপীঠের 'শাস্ত্রী' হয়েছিলেন ; 'শাস্ত্রী' বিদ্যাপীঠের 'ডিগ্রী', পারিবারিক উপাধি ওঁদের (শ্রীবাস্তব)। কিন্তু তবুও নিজের ভালবাসা—ভারতীয় দর্শন কিংবা হিন্দি সাহিত্য কিছুই তাঁকে ঘরে ধরে রাখতে পারেনি। হিন্দি সাহিত্য-জগতে 'মাদাম কুরী'র বিখ্যাত জীবনী লেখক শাস্ত্রীজী এখনও লেখেন। কামরাজী-হামলার পরেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরিত্যক্ত ড্রয়ারে গোটা দুই পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি তাঁর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ক, অন্যটির বিষয়বস্তু—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-দর্শন। কিন্তু ১৯২১ সন থেকে সক্রিয় রাজনীতিক শাস্ত্রী সার্ভেণ্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির পুরানো সেবক এখনও সেই সীমান্তহীন দেশপ্রেমেরই পথিক। তাঁর পথে থেকে থেকে ডান বাঁক নেই, বাঁয়ে মোড় নেই, সকলের প্রিয়, এই নিঃস্বার্থ নিঃশব্দ ভারতীয় যাঁর কোটই গায়ে চাপান, তিনি আপন বলেই ভারত-পথিক।

মহাবীর ত্যাগী সেদিন সহাস্যে পরামর্শ দিয়েছিলেন কোটটা 'মেরে দেওয়ার' জন্য। শাস্ত্রীজী উত্তরে হেসেছিলেন। কেননা, তিনি জানতেন 'ম্যানটল' যাঁর সেই নায়কও জনতাকেই 'সম্রাট' বলে মেনে নিয়েছিলেন। তারা যখন এই হস্তান্তরের খবরে আনন্দিত তখন আর রোমক ধারায় কাড়াকাড়ি কেন ?

আমাদের সৌভাগ্য, জাতির

জীবনে এই গুরুতর ক্ষণে, তদপেক্ষা গুরুতর এই প্রশ্নটিতে আমরা সাবালকের মত আচরণে সক্ষম হলাম। লালবাহাদুরকে নেহরুর স্থলাভিষিক্ত করে বিশ্বকে জানাতে সক্ষম হলাম—কর্তব্য কী নেহরুর ভারতের তাও অবিদিত নয়। ৩. ৬. ৬৪

শাহ, মোহম্মদ জহির

১৯৩৩ সনের ৮ই নভেম্বর। দিনটা ছিল বিশ্বাসঘাতক গোলাম নবীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী দিন। সৈন্য বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করছিলেন আনন্দিত আফগান রাজ, রাজা নাদির শাহ। গেল বছর তাঁর আদেশে হত্যা করা হয়েছে আমানুল্লার অনুচর নবীকে।

সহসা গর্জন করে উঠল যেন কার হাতের রাইফেল। চকিতে দেহরক্ষীরা ঘিরে ফেলল তরুণ আততায়ীকে। নিজেই স্বীকার করল ছেলেটি, সে গোলাম নবীর পুত্র। নাদির শাহকে হত্যা করে সে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিল মাত্র!

দুপুরে মারা গেলেন নাদির শাহ। সন্ধ্যায় কাবুল মথিত করে ঘোষিত হল জাহির শা'র রাজত্ব। নাদির শা'র পুত্র মোহম্মদ জাহির শা। জাহির শা সেই থেকেই আফগানিস্থানের রাজা,—শাসক।

কি করে যে আফগানিস্থানের সিংহাসনে এলেন তরুণ জাহির তা নিজেও বুঝি তিনি জানেন না। কেননা, এই রাজত্বটি ঘিরে সত্যিই সেদিন রকমারি ষড়যন্ত্র।

ঠাকুর্দা ইয়সুফ খাঁন ভারতে নির্বাসিত হয়েছিলেন। বাবা নাদির শা সেখানেই জাত।

১৯০১ সনে যখন স্বদেশে ফিরে এলেন ওঁরা, সিংহাসন তখনও শত্রুপক্ষের করতলগত। সেই ঐতিহাসিক শত্রুতা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হল সেদিন যেদিন 'রাজা' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসলেন শত্রুবংশেরই আমানুল্লা। বন্ধুদের চমকিত করে নাদিরকে রাজ্যের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করলেন তিনি।

'২৪ সনে সেই ক্ষমতাবানের পদ থেকে নাদির নির্বাসিত হলেন প্যারিস-এ। সেখানে তিনি আমানুল্লার প্রতিনিধি, আফগানমন্ত্রী।

বাবার সঙ্গে ছেলে জাহিরও এলেন প্যারিস-এ। ইতিপূর্বে কাবুলের হাবিবিয়া হাইস্কুলে তিন বছর পড়েছেন তিনি। কিছুকাল পড়েছেন ইস্তিকুইয়াল কলেজেও।

এবার ভর্তি হলেন ফরাসী রাজধানীর বিখ্যাত 'জন সন্ দ্য সালে'তে। সেখান থেকে 'পাস্তর ইনষ্টিটিউটে', এবং অবশেষে মস্তেপেলি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ইতিমধ্যে '২৮ সনে আমনুল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়ে গেছে এবং পরের বছর শত্রু মুক্ত আফগানিস্থান নাদিরকে রাজা নির্বাচিত করে ফেলেছে।

'৩০ সনে প্যারিস থেকে পুত্রও এসে যোগ দিলেন বাবার সঙ্গে। এক বছর আবার পড়াশুনায় কাটাতে হল। কিন্তু মাত্র একটি বছর! পরের বছরই রাজ্যের সহকারী দেশরক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হলেন জাহির। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠার বছর (জন্ম—১৯১৪)। পরের বছর আবার পদোন্নতি। উনিশ বছরের রাজপুত্র জাহির এবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী। বলাবাহুল্য, পরের বছর থেকে রাজ্যের সমুদয় মন্ত্রীরাই তৎকর্তৃক মনোনীত। কেননা, সেদিন থেকে তিনিই দেশের 'রাজা'।

রাজা জাহির শা যেমন জনপ্রিয় রাজা, তেমনি সুখী গৃহস্থ। সিংহাসনে বসার আগের বছর রাজকুমারী অমিরাকে বিয়ে করেছেন তিনি। সর্দার আহম্মদ শাহের কন্যা অমিরা সম্পর্কে তাঁর খুড়তুত বোন। কাবুলের রাজপ্রাসাদে রাজপুত্র রাজকন্যা পাঁচটি। রাজারানী আরও সুখী,—তাঁদের ঘরে আজ একাধিক নাতি নাতনী!

সুখী রাজা, সুখী দেশ। কিন্তু গেল ক' বছর ধরেই যেন আফগানিস্তানে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ। বিশেষ, দক্ষিণ পশ্চিমে আজও যেন কীপলিং-এর সেই সাম্রাজ্যবাদী সমরসঙ্গীতের রেশ। উল্লেখযোগ্য, মানচিত্র অনুযায়ী এদিকে পাকিস্তানের অবস্থান। এবং তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমান্ত বরাবর যে সত্তর লক্ষ পুস্তভাষী উপজাতির বাস, তারা কিছুতেই মানতে চায় না তা। ফলে '৪৭ সন থেকেই খাইবার পাশ-এ এবং তার আশেপাশে চলেছে দিশি রাইফেল-এর প্রতিবাদ। আজ তা আরও উচ্চকিত। কারণ, পাকিস্তান বলে, এ বিদ্রোহ নিরপেক্ষ রাজা জাহির শা সমর্থিত।

যদি তা-ই হয় তবে অধিকতর বলবান বলেই বোধ হয় ঘটনাটা আয়ুব খাঁর স্বপক্ষে নয়। অন্তত ইতিহাস যেন তাই বলে। ১৮৪৯ থেকে ১৯৪৭,

ইতিহাস বলে এই আটানব্বুই বছরে এ এলাকায় ইংরেজেরা অভিযান চালিয়েছিলেন পঞ্চাশটি। তার মধ্যে শেষটিতে ছিল বিস্তর ট্যাঙ্ক, আধুনিক বিমান এবং সাঁইত্রিশ হাজার পদাতিক। তবুও বিজয় সম্ভব হয়নি। কেননা, ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন—'এলোন এমাং দি রেসেস হুইচ ইনহেবিট দি এম্পায়ার অনলি দিজ পিপল হ্যাজ এ হ্যাবিট অব স্টেয়ারিং দি ইংলিশম্যান স্ট্রেইট ইন দি আই!'

২৭. ৬. ৬১

শাহ্‌ হৃষিকেশ

চোখে কালো চশমা, মুখে বাঁকা কালো গোঁফ, গায়ে ছাপা সিল্কের চকচকে হাওয়াইন সার্ট, পায়ে স্যামসন প্যাটার্নের জুতো, মাথায় কাউ-বয় ঢঙে বাঁকা টুপি ওঁর পছন্দের পোষাকে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বোধহয় কোন পশ্চিমী প্লে-বয় অথবা কোন ফিলম্‌ স্টার।

কিন্তু কাছে আসা মাত্র ভুল ভেঙ্গে যায়। তৎক্ষণাৎ জানা যায় 'খেলোয়াড়' বটেন, কিন্তু পশ্চিমী নয়, ঠিকানা তাঁর কুকরীর দেশ—নেপাল।

এক সন্তানের পিতা। বয়স মাত্র আটত্রিশ। চেহারায় আরও কম। চালচলনে আরও। চমৎকার বক্তৃতা করেন, ভাল লেখেন (নেপাল সম্পর্কে বই আছে), প্রবল খাটেন। সম-বয়সীদের মধ্যে হৃষিকেশ সত্যই এক দুর্ধর্ষ মানুষ, বিচিত্র 'খেলোয়াড়'।

নেপালের ভাগ্যবন্তদের অনেকেরই যা থাকে, ত্রিভুবনের ভুবনের সঙ্গে পরিবারের কোন রক্তসম্বন্ধ নেই। বাবা ধুরকোট রাজ জাতিতে ছিলেন ঠাকুরি; পেশায় 'বড়া হাকিম',—অর্থাৎ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। সুতরাং আর সব বড় ঘরের নিয়মেই ছেলে পড়তে এসেছিল ভারতে।

তুখোড় ছাত্র হৃষিকেশ স্বদেশে ফিরেছিলেন পাটনা এবং এলাহাবাদ দুই জায়গা থেকে দুই দুইটি এম.এ উপাধি নিয়ে। তৎসহ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে একটি ডিপ্লোমা। কিন্তু তবুও দরবারে খাতির পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে হল ১৯৫৬ সন অবধি। কেননা, ছাত্রজীবনে রেগমীর ভক্ত হৃষিকেশ ছিলেন পুরোপুরি অহিংস। ফলে '৫০-'৫১ সনের বিপ্লবে তাঁর কোন কৃত্য ছিল না। এবং তারই ফলে রাজকর্তব্য পাওয়াও তৎকালে সম্ভব ছিল না।

অবশেষে বি.পি কৈরালা একদিন ছেলেটিকে কাছে টানলেন। হৃষিকেশ

সেদিনও জীবনে প্রথম যেন মাঠ দেখলেন। কিছুদিন পরেই দেখা গেল একদা নেপালী কংগ্রেসের সম্পাদক হৃষিকেশ শাহ কংগ্রেসহীন দেশে রাজা মহেন্দ্রের অন্যতম বান্ধব। সে ১৯৫৬ সনের কথা।

'৫৭ সনে হৃষিকেশ ছিলেন আমেরিকায় নেপালী দূত। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘে নেপালী দলের নায়ক। খেলোয়াড় সেখানে যে খেলায় যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার প্রমাণ—তিনিই সেদিন মনোনীত হয়েছিলেন হ্যামারশিল্ডের মৃত্যু তদন্ত কমিটির সভাপতি! সুতরাং, দেশে ফেরামাত্র হৃষিকেশ মনোনীত হলেন রাজার অর্থমন্ত্রী। তারপর—পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

সংবাদ: হৃষিকেশ রাজকোপে পড়েছেন। তিনি মন্ত্রীপদ থেকে অপসারিত হয়েছেন। অপরাধ: ভারত-প্রীতি। খবরটা আর কারও সম্পর্কে হলে শঙ্কার কারণ ছিল। কিন্তু হৃষিকেশ বাস্তবিকই—'খেলোয়াড়'। সুতরাং এ পরাজয় তাঁর পক্ষে চরম নাও হতে পারে।

৪. ১০. ৬২.

শীতলবাদ, এম. সি.

মামলাটা যেমনি গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। ফরিয়াদি আর আসামী দুই ব্যক্তি নন, দুইটি দেশ। একটি সালাজারের পর্তুগাল, অন্যটি আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ। '৫৫ সনের ডিসেম্বরে পর্তুগাল যখন দাদরা আর নগরহাভেলির একচল্লিশ হাজার নরনারীর ওপর অষ্টাদশ শতকী সাম্রাজ্যিক অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্তর্জাতিক আদালতের মঞ্জরীয়ানা প্রার্থনা করল, তখন ভারতের পক্ষে বে-আইনি মনোভাব দেখান ঠিক নয়। বিশ্বের সেরা আন্তর্জাতিক আইনবিদেরা পর্তুগালের পক্ষে দাঁড়ালেন। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ মথিত করে ভারতও ডেকে আনলেন অনেককে। কিন্তু আমরা গর্ববোধ করতে পারি, তাঁরা কেউ ভারতের হয়ে জবাব দিতে আসেন নি। এসেছিলেন—সওয়াল করতে। ভারতের বক্তব্য সেদিন অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে যিনি উপস্থিত করেছিলেন হেগ-এ, তিনি ভারতেরই এক প্রবীণ সন্তান। তাঁর নাম—শ্রী মতিলাল চিমনলাল শীতলবাদ।

ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল

শ্রী শীতলবাদ আজ বিশ্বের দরবারে ভারতের গর্ব। শুধু হেগের মোকদ্দমা নয়, স্বদেশে এবং দেশের বাইরেও ইতিমধ্যে এমন অনেক মামলা তিনি লড়েছেন যা আইনজগতে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত না করলে বে-আইনি হয়। যথা: কৃষ্ণমাচারি ঘটিত মোকদ্দমাটি কিংবা রাষ্ট্রসংঘে কাশ্মীর নিয়ে সেই বিখ্যাত ('৫২) তর্কের লড়াইটি।

বোম্বাই হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শ্রী শীতলবাদ ১৯৩৭ সন থেকে বোম্বাই রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল। ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল '৫০ সন থেকে। তবে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের হয়ে তাঁর সওয়াল শুরু হয়েছে সেই '৪৭ সন থেকে। '৪৯ সনে তিনি সেখানে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেছেন।

এছাড়াও শ্রী শীতলবাদ ভারতীয় আইন কমিশনের সভাপতি, আন্তর্জাতিক আইন কমিশনের ভারতীয় শাখার সহ-সভাপতি। সিডনীতে ভারতীয় আইনবিদদের নিয়ে তিনিই গিয়েছিলেন কমনওয়েলথ আইনবিদ সম্মেলনে যোগ দিতে। আফ্রো-এশিয়ান আইনবিদ সম্মেলন এবং দিল্লিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আইনবিদ সম্মেলনেও তিনি ছিলেন ভারতীয় দলের নেতা।

আইনের শাসন যেদেশে শ্রী শীতলবাদের মত ছিয়াত্তর বছরের প্রবীণ আইনবিদ সে দেশে সম্পদ। তাছাড়া 'সিভিল লিবারটিজ ইন ইণ্ডিয়া' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা সরকারী কর্মচারী শ্রীশীতলবাদ বে-সরকারী মানুষেরও মস্ত বান্ধব।

১৬. ৪. ৬০.

শোম্বে, মোসে

সুখী মানুষ।

বিরাট প্রাসাদ, কালো রংয়ের ঝকঝকে ক্যাডিলাক। দামী মার্কিনী পোষাক, হামবার্গ! তদুপরি তেতাল্লিশ বছরের যুবকের ঘরে দশটি ছেলেমেয়ের কলকাকলিমুখরিত সংসার। (বাইরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বে-আইনিও নাকি প্রায় সমান সংখ্যক!)

সুখের জীবন।

ডাইনে বেলজিয়ান পরামর্শদাতা, বাঁয়ে লুণ্ডা দেহরক্ষী, পেছনে একটা আস্ত উপজাতি এবং হাতে একটা মস্ত এলাকা। এমন এলাকা যা প্রকারান্তরে গোটা বেলজিয়াম কঙ্গোর হৃদ্‌পিণ্ড-স্বরূপ। সুতরাং, স্বভাবতই অনেক উপসর্গ।

শোম্বে, মোসে

রাজনৈতিক উপসর্গগুলো অবশ্যই আধুনিক। কিন্তু অন্যান্য সুখসমাচার-গুলো শোম্বের জীবনে বলতে গেলে পৌরাণিক। কেননা, ওদেশে সচরাচর যা দেখা যায় না এই একটি মানুষের ক্ষেত্রে অন্তত তাই ঘটেছিল। কালো ঘরের ছেলে হলেও শোম্বে জন্মেছিলেন রুপোর চামচ মুখে নিয়ে।

বাবা ইউরোপীয়ানদের মাপেও ধনী ব্যক্তি। মোসাম্বায় বিরাট বিরাট বাগিচা ছিল। আর ছিল এলিজাবেথ-ভিল-এ ইউরোপীয়ানদের জন্যে একটা বিরাট হালফ্যাসেনের হোটেল। শ্বশুরও মস্ত বড়লোক। তিনি জনৈক প্রতিষ্ঠিত উপজাতি-প্রধান। সুতরাং কাজের সন্ধানে খনির দিকে পা না বাড়িয়ে বালক শোম্বে রওনা হল শহরের দিকে—স্কুলে।

লেখাপড়া বলতে মেথোডিস্ট মিশনারীদের স্কুলে যতদিন পড়া চলে ততদিনই। অর্থাৎ, জুনিয়ার সেকে-ণ্ডারি পর্যন্ত। তারপরেও অবশ্য কিছুদিন বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন শোম্বে। কিন্তু সে ডাকযোগে।

চিঠিপত্রে অ্যাকাউন্টেন্সি শেখা চলছে এমন সময় হঠাৎ বাবা মারা গেলেন। ফলে চিঠি বন্ধ হয়ে গেল। পরিবর্তে সাক্ষাৎ খাতা নিয়েই বসতে হল। অ্যাকাউন্টস-এর খাতা। সে প্রায় দশ বছর আগের কথা। শোম্বে সেই থেকে ব্যবসায়ী।

ব্যবসায়ী হিসেবে মোসে শোম্বে শুরু থেকেই এলিজাবেথভিল-এ বিখ্যাত মানুষ। বাদাম থেকে বীয়ার এমন কিছু নেই যা নিয়ে তিনি কারবার না করেছেন! বাকি ছিল রাজনীতি। দেখতে দেখতে বেল-জিয়ানদের আনুকূল্যে তাতেও উৎসাহ জেগে উঠল।

এলিজাবেথভিল-এর আফ্রিকান বণিকসভার সভাপতি শোম্বে যখন ১৯৫৬ সনে লুণ্ডা এসোসিয়েশনের সভাপতি হতে চাইলেন—বেলজিয়ানরা তখন তাঁকে সানন্দে উৎসাহিত করলেন। কেননা, প্রতিষ্ঠানটি স্পষ্ট-তই সাম্প্রদায়িক। তারপর স্বাধীনতার সম্ভাবনা দেখে তিনি যখন তাঁর 'কোনাকাত পার্টি' গড়তে উদ্যোগী হলেন বেলজিয়ান ব্যবসায়ীরা তখন প্রকাশ্যেই তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। কারণ, রং কালো হলেও ব্যবসায়ীরা জানেন, শোম্বে তাঁদেরই দলের। কেননা, গোটা বেলজিয়ান কঙ্গো যখন জাতীয়তার জিগীর তোলে, তখন কাতাঙ্গার এই একটি মানুষের ঘরেই সগর্বে দ্বিতীয় লিওপোল্ড-এর

ছবি ঝোলে। সুতরাং, অবশেষে শোম্বে যখন স্বাধীন হলেন তখন আফ্রিকা আশঙ্কিত হলেও, ওঁরা আশ্বস্ত হলেন। কারণ, 'লোকটি সত্যিই ডলার এবং সেণ্ট-এর মর্ম জানে।'

সংবাদ: চৌকস ব্যবসায়ী কাতাঙ্গরাজ শোম্বে লুমুম্বার রাজ-ধানীতে বন্দী। তাঁর বিচার হবে। স্বভাবতই এমতাবস্থায় আজ মনে পড়ছে লুমুম্বা হত্যার পর শোম্বের সহাস্য উক্তিটির কথা। শোম্বে বলে-ছিলেন—'লুমুম্বা? ভাববে না,—এ-সব হট্টগোল দু'দিনেই মিটে যাবে। লুমুম্বাকে লোকে দু'দিনেই ভুলে যাবে।—পিপল হ্যাভ নো মেমোরিস হিয়ার!'

ব্যবসায়ী আজ নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, হিসেবটা ভুল হয়ে গেছে! বোধ হয়, এমনই হয়। বিশেষ, তাঁদের ক্ষেত্রে, রাজনীতি নামক বিদ্যেটা যাঁদের ডাকযোগে প্রাপ্ত। ৪. ৫. ৬১

তিন বছর পরে আবার:

আবার মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত শোম্বে। এবং যেহেতু 'খুড়ো শোম্বে', সুতরাং আবার নাটক। নেমন্তন্ন পাঠান হলেও চিঠির তলায় লেখা ছিল, প্রেসিডেণ্ট কাসাভুবু স্বয়ং না আসতে পারেন,—যে কেহ; কিন্তু 'খুড়ো' যেন না আসেন। কে জানে, হয়ত সে কারণেই রোখ চেপে গিয়েছিল। সুললিত অঙ্গে প্রিয় গ্রে ফ্লানেল স্যুটখানা চাপিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ উড়োজাহাজ তলব করেছি-লেন। সকলের নিষেধ অমান্য করে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে শেষ পর্যন্ত কায়রোর ভূমিও স্পর্শ করেছিলেন। কিন্তু তবুও কঙ্কে পাওয়া গেল না। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে, যেখানে, পৃথিবীর নানা দেশের রাষ্ট্রনেতারা সমবেত তার দরজায় সুস্পষ্ট ঘোষণা—'প্রবেশ নিষেধ!' 'কঙ্গো-গৌরব' অতঃপর আবার কায়রো ত্যাগ করেছেন। খুশী মনে নয় নিশ্চয়,—বিশেষত এবার আর 'কাতাঙ্গা-রাজ' হিসেবে নয়; (হোক না শেষ রাত্তিরে) কায়রোয় নেমেছিলেন 'তিনি স্বাধীন কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই!

অপ্রতিরোধ্য মানুষ। চিরকাল সমান একরোখা, চিরদিন সমান নাটকীয়। জন্মেছিলেন রুপোর চামচ মুখে নিয়ে। জন্মস্থান কাতাঙ্গার মুসাম্বা। জন্ম সন—১৯১৯। বাবা জোসেফ কঙ্গোর প্রথম দেশজ-লাখপতি। রোলখানা নানা ধরনের

দোকান ছিল তাঁর। নিজের চেষ্টাতেই তিনি সেগুলোকে ক্রমে পরিণত করেছিলেন—হোটেল, করাতকল, বাগিচা এবং ট্রান্সপোর্ট বিজনেসে। সুতরাং খনির বদলে ছেলে প্রেরিত হয়েছিল আমেরিকান মিশনারীদের স্কুলে। সেখান থেকে কানে'র কলেজে। কিন্তু তরুণ শোম্বে ততদিনে বাবার সিন্দুকের সন্ধান পেয়ে গেছেন। ফলে বই টেবিলেই পড়ে রইল—শৌখিন তরুণ মস্ত গাড়ি নিয়ে বান্ধবীর সন্ধানে পাড়ায় পাড়ায় হর্ন বাজিয়ে বেড়াতে লাগল। হাতে যে সময়টুকু অবশিষ্ট থাকল সেটুকু রইল বাবার ইচ্ছে পূরণের জন্যে। শোম্বে সে সময়টুকুতে ডাকযোগে অ্যাকাউন্টেন্সি শেখেন।

কিছুকাল নিজে ব্যবসাও করেছিলেন। কিন্তু তিন তিনবারই দেউলের খাতায় নাম লেখাতে হল। সুতরাং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ধনিকতনয় এবার রাজনীতির দিকে ঘুরলেন। পকেটে যদৃচ্ছ পয়সা ছাড়াও সে পথে তাঁর অন্যতম বল শ্বশুরকুল। শ্রীশোম্বে যে পরিবারে বিয়ে করেছেন সে পরিবার কাতাঙ্গার লুণ্ডা উপজাতির নায়ক। সুতরাং প্রথমাবির্ভাবেই তিনি কঙ্গোর প্রথম রাজনৈতিক দল 'কোনাকাত'-এর সভাপতি হয়ে গেলেন (১৯৫৯)। অবশ্য তার অগেই প্রাদেশিক আইনসভায় বেলজিয়ানরা এই খেলার পুতুলটিকে একটি আসন ছেড়ে দিয়েছিল (১৯৫১-'৫৩)। ডাইনে বাঁয়ে বেলজিয়ান পারমর্শদাতা বেষ্টিত 'গ্রে ফ্লানেল স্যুটে' শোম্বে সেদিন থেকেই আপন দেশে একজন রীতিমত হোমরাচোমরা।

পুরানো রাজনীতিক। কিন্তু শোম্বে তবুও কোনদিনই কারও চোখে প্রকৃত জনতার প্রতিনিধির মর্যাদা লাভ করতে পারেন নি। '৬০ সনে বেলজিয়ানরা পর্যন্ত ওঁকে স্বাধীনতা সম্পর্কিত আলোচনায় বিশেষ আমল দিতে রাজী হননি। কেননা, শোম্বে তখন দেশ-বিদেশে সর্বত্র বেলজিয়ান খনি মালিকদের হাতের পুতুল হিসেবে চিহ্নিত। শোম্বে তা অস্বীকার করেননি। স্বাধীনতার দু'সপ্তাহের মধ্যেই ১৯৬০ সনের জুলাইয়ে তিনি তাঁর সচ্ছল কাতাঙ্গাকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর কথা ছিল—লুমুম্বার সাপ কাতাঙ্গার দুধ দুইবে এ আমি হতে দিচ্ছি না!

তার পরের কাহিনী সুবিদিত। পঁচাত্তর বছর পরাধীনতার পর স্বাধীন কঙ্গো একালের ইতিহাসে এক নিষ্ঠুর

ট্র্যাজেডি। অনেক রক্ত ঝরেছে আফ্রিকার এই সম্ভাবনাময় দেশটির মাটিতে। অনেক কলঙ্ক, অনেক কান্না। লুমুম্বা, হ্যামারশিল্ড।... অনেকেই বলেন,—চার বছর ধরে সেখানে যত বিভীষিকা সকলের পেছনে হেতু একজন; তিনি এই কাতাঙ্গা-সম্রাট শোম্বে। '৬১ সনের জানুয়ারীতে লুমুম্বা হত্যার পরে রাষ্ট্রসংঘ একটি অনুসন্ধান কমিটি বসিয়েছিলেন। ছ'মাস পরে ওঁরা রায় দিয়েছিলেন—হত্যাকারী শোম্বের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুননগো, কিংবা তাঁর বেলজিয়ান অনুচর রুয়ে, অথবা হিউগ যে-ই হোক না কেন, এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অনেকখানি দায়িত্বই 'খুড়ো' শোম্বের!

ক'মাস আগে, এ বছর জানুয়ারীতে বেলজিয়ামে একটি সাপ্তাহিক কাগজে শোম্বে এক বিবৃতি মাধ্যমে জানিয়ে ছিলেন—আমি নই, লুমুম্বাকে হত্যা করেছেন প্রেসিডেন্ট কাসাভুবু, প্রধানমন্ত্রী আদুলা আর এই বেলজিয়ানরা! স্বভাবতই বিবৃতিটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তার চেয়েও চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল গত জুলাইয়ে। বিমূঢ় জগৎ বিস্মিত হয়ে শুনেছিল—প্রেসিডেন্ট কাসাভুবুর আহ্বানে শোম্বে আবার দেশে ফিরে আসছেন। কেননা, রাষ্ট্রসংঘ জোর করে ওঁকে দেশত্যাগী করলেও দেশে শান্তি ফিরছে না। চৈনিক মন্ত্রণায় তিনটে প্রদেশ বিদ্রোহী হয়ে গেছে, প্রধানমন্ত্রী আদুলা পদত্যাগ করেছেন,—'খুড়ো' ছাড়া এ সময়ে দেশকে বাঁচায় কে! কাতাঙ্গা হারিয়ে শোম্বে আজ অনেকদিন নিজের দেশ ছাড়া। তিনি কখনও অ্যাঙ্গোলায়, কখনও রোডেশিয়ায়, কখনও প্যারীতে, কখনও বেলজিয়ামে। আমন্ত্রণ পেয়ে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন তিনি—চব্বিশ ঘণ্টায়ই আমি সব ঠিক করে দিতে পারি।

এই একটি মানুষের জন্যে এত কাণ্ড। রাষ্ট্রসংঘের তহবিল থেকে খরচ হয়েছে ৪০৩,০৫০,০১৫ ডলার নগদ এবং ২৩৫টি প্রাণ। তদুপরি হ্যামারশীল্ড, লুমুম্বা এবং আরও অনেকে। তা হোক, 'মুনো'র ফৌজ কঙ্গো ছাড়তে না ছাড়তেই আবার লিওপোল্ডভিলে জয়ধ্বনি উঠল—'শোম্বে জিন্দাবাদ।' শোনা যায়, সে অর্কেস্ট্রায় এবার যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাদের মধ্যে দক্ষিণ-বাম, পুবের এবং উত্তরের সব দলই আছে! স্বভাবতই শোম্বে সেদিন

শোলখফ, মিখাইল

মুষ্টিযোদ্ধার ভঙ্গীতে জনতাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তৎসহ—কিছুক্ষণ নাকি নেচেওছিলেন। অতঃপর তিনি কাতাঙ্গা নয়,—কঙ্গোর চার নম্বর প্রধানমন্ত্রী।

খবর শুনে উ থাণ্ট নাকি মন্তব্য করেছিলেন: এ কান্ট্রি গেটস এ গবর্নমেণ্ট ইট ডিজার্ভস! কায়রো সম্মেলনের সিদ্ধান্ত জানাল: নিরপেক্ষরাও লোক বিশেষে পক্ষ নিতে জানেন! ৯. ১০. ৬৪

শোলখফ, মিখাইল

বিপ্লবে ছিলেন—গোর্কি, বিপ্লবের পরে শোলখফ। গোর্কির রাশিয়ায় তাঁর ডাইনে বাঁয়ে সাহিত্যিক অনেক ছিলেন, শোলখফ-এর রাশিয়ায়ও অনেকে আছেন। তাঁদের মধ্যে প্রতিভার অভাব নেই। কিন্তু রুশরা বলেন—গোর্কি যেমন অতুলনীয়, শোলখফও তেমনি। কেননা, 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ' নামক সাহিত্যাদর্শটি এঁদের রচনায় যেমন মূর্ত তেমন আর কারও হাতে নয়। বাইরের রসিকেরাও তা স্বীকার করেন। তবে, একটু সংশোধনী সহ। তাঁরা বলেন—শোলখফ মহান লেখক। এবং তাঁর এই সাফল্যের কারণ তিনি সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ নামক তত্ত্বটি সামনে রেখে লিখেননি, বরং সেই অস্পষ্ট ধারণাটি তাঁর লেখায় স্পষ্টতর হয়েছে।

সম্ভবত দ্বিতীয় দল মিথ্যে বলেননি। কেননা, শোনা যায় বিপ্লবের সক্রিয় সৈনিক শোলখফ কলম ধরামাত্র নব বশ্যতায় ভেঙে পড়েননি। তিনি ঝানভ (Zhaanov) সূত্রের একজন অন্যতম বিরোধী। তবুও যে দফায় দফায় চালুনিষস্থে বাছাইয়ের পরও শোলখফ টিঁকে রইলেন তা শুধু প্রতিভার প্রকৃতিতে তিনি 'বৃহৎ' বলেই নয়, লোকে বলে তাঁর একটি কারণ. অন্তত নিকিতার সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব। সুতরাং, ক্রুশ্চফ যখন বাঁচলেন ইউক্রেনের বন্ধু শোলখফ-এর তখন অমর্যাদা হওয়ার কথা নয়।

শোলখফ ইউক্রেনের মাটির সন্তান। গৃহযুদ্ধে তিনি লড়েছেন, মহাযুদ্ধে সাংবাদিকের কাজ করেছেন। কিন্তু মাটি থেকে দূরে সরে যাননি কোনদিন। ক্রুশ্চফের মতই তাঁর মুখে অনর্গল দেশজ প্রবাদ, লেখায় মাটির সঙ্গে নিত্য-সাহচর্যের সহজ আন্তরিকতা। তাঁর 'এণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন' বা 'ভার্জিন সয়েল

আপটর্নড' এই আন্তরিকতাতেই দেশে দেশে অভিনন্দিত বই এবং মিখাইল শোলখফ আন্তর্জাতিক নাম।

পঞ্চান্ন বছরের প্রৌঢ় রুশ ঔপন্যাসিক পশ্চিমেও আকাঙ্ক্ষিত অভিপ্রেত আগন্তুক। শোলখফ দেশভ্রমণ ভালবাসেন। বিদেশের বুদ্ধিজীবীরা শোলখফকে ভালবাসেন। তিনি রাশিয়ায় 'রাইটার্স ইউনিয়ন'-এর একজন বটে, কিন্তু সরকারী বিচারকদের কেউ নন। শোনা যায়, যাঁর অদৃশ্য হাত পাস্তেরনাককে সেদিন দেশে ধরে রেখেছিল তিনি শোলখফ। শোলখফ 'ডাঃ জিভাগো'র ভক্ত নন, কিন্তু পাঠক হতে আপত্তি ছিল না তাঁর। তবে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর ধারণা বইটি আবার লেখা উচিত ছিল।

আবার লেখ। আবার লেখ। 'রিরাইটিং' শোলখফ-এর নেশা। ছাপতে দিয়েই আবার নিয়ে এলেন। অধ্যায়টা নতুন করে লেখা হল। দরকার হয় আবার লিখবেন। 'ভার্জিন সয়েল আপটার্নড' আজ তিরিশ বছর ধরে লিখেছেন তিনি। প্রথম অংশ বের হয়েছিল পঁচিশ বছর আগে,—শেষটুকু এই-সম্প্রতি। তাও দু'বছর কাটালেন তিনি এটা ওটা কাটাকুটি করতে। শেষ হয়েছিল '৫৮ সনেই, পাঠকের হাতে এল '৬০-এ।

রুশ সরকার শোলখফকে লেনিন পুরস্কারে সম্মানিত করলেন। পাঠকের কাছে তার চেয়েও বড় খবর বোধহয় শোলখফ তাহলে সত্যিই বইটা শেষ করলেন।

২১. ৭. ৬০

সাতো, ইসাকু

প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আরও দু'জন। একজন তাঁদের 'ওলিম্পিক খ্যাত' কোনো। বয়স ছেষট্টি। এই বয়সেও রীতিমত বেপরোয়া এবং মেজাজী। সাধারণ মানুষ নাম দিয়েছে তাঁর—'ওইয়াবান',—মরদের মত মরদ। তিনিই ছিলেন সভ্যসমাপ্ত সফল টোকিও ওলিম্পিকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। অন্যজন কিসি-আমলের বিখ্যাত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফুজিয়ামা। বয়স

সাতো, ইসাকু

সাতষট্টি। বিরাট ব্যবসায়ী এবং প্রসিদ্ধ ভূ-পর্যটক। ক্রুশ্চফের পতনের দশদিন আগে তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলে এসেছেন। কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন তেষট্টি বছরের গম্ভীর মানুষ সাতো। ইকেদার পরে তিনিই জাপানের ৩১তম প্রধানমন্ত্রী।

স্বদল লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির আরও অনেকের মতই ইসাকু সাতো বড় ঘরের ছেলে। বাবা ছিলেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত মদ্য-ব্যবসায়ী। পুত্র পেশা আগাগোড়া রাজকর্মচারী। সেই থেকেই ক্রমে একদিন দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন সাতো। কেননা, যুদ্ধের পর ভাঙ্গা-গড়ার দিনগুলোতে উচ্চাকাঙ্ক্ষীর সামনে অন্য কোন পথ ছিল না। তাছাড়া বলতে গেলে গোটা পরিবারই তখন রাজনীতিতে মগ্ন। সাতোর পক্ষে অন্যথা আচরণের কোন অর্থ হয় না। তিনি রক্ষণশীল যোশিদার সঙ্গে ভিড়ে গেলেন। তারপর '৫৬ সনে বড় ভাই কিসি প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসে তাঁকে কাছে ডাকলেন। কিসির পর মধ্যে ক'বছরের যতি,—তারপর এবার দাদার আসনে বসলেন ছোট ভাই নিজেই। জাপানের ইতিহাসে এই প্রথম এক পরিবার থেকে দুই দু'জন প্রধানমন্ত্রী হলেন। অবশ্য দু'জনেই স্ব স্ব যোগ্যতায়।

ইসাকু সাতো সেদিক থেকে শুধু অভিজ্ঞ রাজকর্মচারীই নন, পুরানো মন্ত্রীও। যোশিদা এবং কিসি দু'জনের মন্ত্রিসভায়ই তিনি সাফল্যের সঙ্গে আপন দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে ১৯৬০ সনে কিসির জায়গায় যখন ইকেদা এলেন সাতোর আসন তখনও অনড়ই রইল। শোনা যায় ইকেদা তাঁকে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন কারণ লিবারেল ডেমোক্র্যাট পার্টিতে এই সাতোই ছিলেন তাঁর প্রধান প্রতিযোগী। গত জুলাইয়ে মাত্র কয়েক ভোটে তিনি ইকেদার কাছে হেরে গিয়েছিলেন। বাধ্য হয়েই ইকেদাকে পরাজিত সাতোর হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর তুলে দিতে হল। ইকেদা মন্ত্রিসভায় সাতো ছিলেন বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী।

নতুন জাপানী প্রধানমন্ত্রী সাতো তাঁর পূর্বসূরী ইকেদার মতই ধীর, স্থির, ঠাণ্ডামাথার মানুষ। আদর্শে দলের আর সকলের মতই তিনিও পশ্চিম ঘেঁষা, রক্ষণশীল। স্বভাবতই তাঁর নেতৃত্বে জাপানের রাতারাতি মতিগতি পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই। তবে এখানে ওখানে নতুন

ভঙ্গীর সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। মন্ত্রিসভা গঠনের পর তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে সাতো নিজেই ইঙ্গিত দিয়েছেন তার। ইকেদার প্রধান চিন্তা ছিল—ঘর; সুখী ও সমৃদ্ধ জাপান। তাঁর কর্মসূচীর অন্যতম একটি লক্ষ্য ছিল—'ইনকাম ডাবলিং' বা দ্বিগুণ রোজগারের বন্দোবস্ত। সে লক্ষ্যে উপনীত না হলেও জাপান আজ যেখানে পৌঁছেছে তা ঘটনা হিসেবে রীতিমত চমকপ্রদ। ইতি-পূর্বে দেশের জীবনমান আর কখনও এত উঁচুতে ওঠেনি—জাপানের বৈষয়িক উন্নয়ন হার আজ বিশ্বে সর্বাধিক। ইকেদা বলতেন—স্বাধীন বিশ্ব তিনটি স্তম্ভের ওপর ভর করে আছে। একটি তার পশ্চিম ইউরোপ, দ্বিতীয়—আমেরিকা, তৃতীয়—জাপান। তাঁর শ্লোগান ছিল—'ইকেদা ডাজ নট লাই',—ইকেদা বাজে কথা বলেন না।

সাতোও তাই। দেশের ওপর-তলার সবাই জানে—সাতোও আবোল তাবোল বকেন না। সুতরাং তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনের অন্তত একটি কথার ফলাফল কি দাঁড়ায় তা দেখার জন্যে বিশ্ব অবশ্যই আগ্রহান্বিত বোধ করবে। সাতো বলেছেন—ইকেদার 'লো পসচার' বা পররাষ্ট্র ব্যাপারে ঠাণ্ডানীতির বদলে তিনি এবার 'হাই পসচার' বা সক্রিয় নীতি ব্যবহার করবেন।—জাপানকে ঘর থেকে বারমুখী করবেন।

১২. ১১. ৬৪

সাদিক, গোলাম মহম্মদ

হাতের বেতটা নাচিয়ে মাস্টার-মশাই জিজ্ঞেস করেছিলেন—বল কোনটা চাই,—বুকের ঐ লকেটটা না এটা? একটুও না কেঁপে বারো বছরের ছেলেটি বুকে আঙুল ঠেকিয়েছিল। বেতের বিনিময়েই সে মহাত্মা গান্ধী এবং মৌলানা মোহম্মদ আলিকে বুকে রেখেছিল।

আঠার বছর বয়সে ভগতসিং-কীর্তি-কথা মাথায় চাপল। তরুণ রাত জেগে জেগে পোস্টার লেখেন, অতি সংগোপনে দেওয়ালে সেঁটে আসেন,—দেশের মানুষকে ভগতসিং হতে বলেন। কি করে তা হওয়া যায় সে নির্দেশও দেওয়ালেই পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, তারও লেখক সেই ছেলেটি।

কলেজে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে বেধে গেল। উনি বললেন—হোক না ছাত্রদের ডিবেটিং সোসাইটি,

প্রেসিডেন্ট কোন অধ্যাপককে করাই সঙ্গত। 'বেয়াড়া' ছাত্র উত্তর দিলেন —না, তা হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষের সমস্ত চেষ্টা তছনছ করে তিনি নিজেই প্রেসিডেন্টের আসনে বসে গেলেন।

তারপর ক্রমে আরও ঔদ্ধত্য। ১৯৩০ সনের এপ্রিল মাসের কথা। শ্রীনগরে সেবার হঠাৎ প্রচণ্ড ছাত্র-বিক্ষোভ। ডোগরা মহারাজের রাজধানীতে এমন ঘটনা কেউ কল্পনাও করতে পারেন না। তাও উপলক্ষ্য কি? না, গান্ধীজীর গ্রেপ্তার! বিস্মিত কর্তৃপক্ষ খবর নিয়ে জানলেন এই অঘটনের পেছনেও নায়ক সেই ছেলেটি—নাম যাঁর সাদিক।

পুরো নাম—গোলাম মোহম্মদ সাদিক। মাথায় মসৃণ টাক অথবা কাশ্মিরী টুপি, চোখে কালো চশমা, ফিটফাট পোষাকে নিখুঁত বাবুয়ানা। চুয়ান্ন বছরের প্রবীণ নায়ক গোলাম মোহম্মদ সাদিককে হঠাৎ দেখলে আজ আর সেদিনের সেই তরুণটির কাহিনী যেন মন বিশ্বাস করতে চায় না। চেহারায় কোথাও তাঁর কাশ্মিরীসুলভ দৃঢ়তা নেই,—অভিজাত গোলগাল মানুষটি স্বভাবেও যেন অন্য কেউ,—স্পষ্টতই তিনি লাজুক। তৎসত্ত্বেও যে তরুণ সাদিকের বিদ্রোহী পরিচয়টি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না তার কারণ সাদিকের পরবর্তী জীবন। জি. এম. সাদিক সুদূর ১৯৩১ সন থেকেই কাশ্মীরের উত্থানপতনে জনতার নিত্যসঙ্গী।

শুধু অভিজাত নয়, 'স্বদেশী' পরিবারের সন্তান। শ্রীনগরের যে পরিবারে সাদিকের জন্ম কাশ্মীরে জাতীয়তার উন্মেষের পেছনে তাঁরা সূচনা থেকেই অন্যতম প্রেরণা। তবে এতকাল তাঁদের অবদান ছিল প্রধানত মুসলিম কনফারেন্সে। আর্থিক তহবিলে সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে গিয়ে সাদিক চাঁদার খাতায় নিজেকেই লিখে দিয়ে দিলেন। তখন তিনি লাহোরে কলেজের ছাত্র। তা সত্ত্বেও কাশ্মীরে যে তখন এই ছাত্রনেতাটিকে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় ছিলনা তা বোঝা যায় ১৯৩২ সনে তাঁকে দাঙ্গা অনুসন্ধান কমিটির সদস্য মনোনয়ন থেকে। তারপর আলিগড়। '৩৪ সনে আলিগড় থেকে সাদিক শুধু আইনের ডিগ্রী নিয়েই ঘরে ফিরলেন না, রাজনীতিতেও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীটি গড়ে নিয়ে এলেন। সে বছরই মুসলিম কনফারেন্স প্রথম রাজ্যের আইনসভায় যোগ দেন। সেই প্রথম দলে শ্রীনগরের নবীন আইনব্যবসায়ী সাদিকও এম

এল এ হয়ে প্রজাসভায় বসলেন। সেই থেকে জি. এম. সাদিক নানা পদে বরাবর আইন সভায় আছেন। অবশ্য দু'টি ছেদ বাদ দিলে। প্রথম ছেদ ১৯৩৮ সনে। প্রতিনিধিমূলক শাসনের দাবিতে সাদিক সেবার ছ'মাসের জন্য জেলে ছিলেন। দ্বিতীয়—১৯৪৬ সনে। মহারাজার বিরুদ্ধে "কাশ্মীর ছাড়" আন্দোলন নির্বিঘ্নে পরিচালনার বাসনায় সাদিক সেবার ফেরারী হয়েছিলেন। সাদিকের কর্মকেন্দ্র ছিল তখন—ভারত।

ভারত বিভাগের পরে শেখ আবদুল্লা যখন কাশ্মীরে মন্ত্রিসভা গঠন করেন জি. এম. সাদিক তখন তাঁর অন্যতম সহযোগী। ১৯৫২ সন পর্যন্ত তিনি তাঁর মন্ত্রিসভায় উন্নয়নমন্ত্রী ছিলেন। আবদুল্লার সঙ্গে মতভেদের ফলে সে বছর তিনি পদত্যাগ করেন। '৫২ সনের নির্বাচনের পর সাদিক আইনসভার স্পীকার হলেন। কাশ্মীরের সংবিধান প্রণয়নের জন্য তখন যে গণপরিষদ গঠিত হয় তিনি তারও সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সনে শেখ আবদুল্লার গ্রেপ্তারের পরে আবার মন্ত্রিসভায় ফিরে এলেন বিদ্রোহী সদস্য সাদিক। বক্সী গোলাম মোহম্মদের মন্ত্রিসভায় তিনি মন্ত্রী মনোনীত হলেন। এবারও অচিরেই মতভেদ। '৫৭ সনে ন্যাশনাল কনফারেন্স থেকে বেরিয়ে এসে নিজেই এক নতুন দলের পত্তন করলেন তিনি। সে দলের নাম ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল ফ্রন্ট। চার বছর পরে ১৯৬১ সনে সদলবলে আবার পুরানো দলে ফিরে এলেন সাদিক। শোনা যায় তাঁর এই সিদ্ধান্তের পেছনে কারণ ছিলেন যিনি তিনি নেহরু। তাঁরই পরামর্শে সাদিক সেদিন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন। ফিরে আসার পর ১৯৬৩ সনের সেপ্টেম্বর অবধি তিনি বক্সী মন্ত্রিসভায় অন্যতম সদস্য। কাশ্মীরে কামরাজ প্রস্তাব কার্যকর করতে গিয়ে বক্সীর সঙ্গে তিনিও পদত্যাগ করেন। তারপর গত ক'মাসের রকমারী বিশৃঙ্খলা এবং অবশেষে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সাদিকের নির্বাচন। দশ বছর আগে আবদুল্লার গ্রেপ্তারের পর বক্সীর দায়িত্ব গ্রহণের মতই সাদিকের এই কর্মভার গ্রহণও, বলা নিষ্প্রয়োজন, কাশ্মীরের পক্ষে কার্যকারণে এক ঐতিহাসিক ব্যাপার।—সাদিক কি সমর্থ হবেন ?

সন্দেহ নেই, তাঁর সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করবে দলের ওপর। সাদিক সেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ। সে অসুবিধাটুকু

প্রতিবন্ধকতায় পরিণত না হলে আশা করা যায়—কাশ্মীরের নতুন প্রধানমন্ত্রী গোলাম মোহম্মদ সাদিক কাশ্মীরের ভাগ্য পরিবর্তনের অন্যতম নিয়ামক হিসেবে তাঁর কর্তব্য পালন করতে পারবেন। মনে রাখতে হবে সাদিক শুধু মনেপ্রাণে আধুনিক রাজনীতিক নন,—১৯৩৯ সনের জুন মাসে মুসলিম কনফারেন্স যে সভায় ধর্মনির্বিশেষে সকলের জন্য দরজা খুলে দিয়ে ন্যাশনাল কনফারেন্সে পরিণত হয়েছিল সেই সভাটিতে গোলাম মোহম্মদ সাদিকই ছিলেন সভাপতি। আজীবন সেক্যুলার রাজনীতিতে আস্থাবান সাদিক এখন আরও এগিয়ে এসেছেন, তিনি কাশ্মীরের কোন স্বাতন্ত্র্যেই বিশ্বাস করেন না। তাছাড়া, জীবনে ও আচারে যদিও জনতা থেকে কিঞ্চিৎ দূরে দূরে থাকেন, সাদিক তবুও জনতারই মানুষ,—১৯৫৪ সনে রচিত বিখ্যাত "নিউ কাশ্মীর" পরিকল্পনার তিনিই জনক।

সাবরী, আলী

কথা ছিল যা দরকার মনে কর তাই করবে। অবরোধ, আগুন, গোলাবর্ষণ, খুন—যা তোমার অভিরুচি। কিন্তু তবুও অভাবিত একটি দ্বিতীয় পথই বেছে নিয়েছিলেন তরুণ উইং-কমাণ্ডার। রাত তিনটেয় তিনি বৃটিশ দূতাবাসের কড়া নেড়েছিলেন। দরজা খোলা মাত্র শুধু ধীর স্বরে খবরগুলো বলেছিলেন। প্রথম খবর: ফারুক আর মিশরের সম্রাট নেই। দ্বিতীয়—সৈন্যবাহিনী এখন দেশের সর্বময় অধীশ্বর। তৃতীয়—ডাক-তার, খবরের-কাগজ, বেতার সবই এখন আমাদের হাতে।—ইওর এক্সেলেন্সি, আপনিই বলুন ইজ্জত রক্ষার্থে ইংরেজের এখন কী কর্তব্য।

মধ্যপ্রাচ্যে ওঁরা আপন হাতে অনেক চিনির-পুতুল গড়েছেন, ভেঙ্গেছেন। অনেক সুলতান, অনেক আমীর। তবুও কায়রোর বৃটিশ রাজদূত সেদিন তরুণ সৈনিকটির মুখের দিকে তাকিয়ে হো হো ক'রে হেসে উঠতে পারেন নি। তিনি ওঁকে বসতে বলেছিলেন। ক'দিন পরে চুক্তিনামায় সই করে ইংরেজরা ঘরে ফিরেছিলেন।

এসব ১৯৬২ সনের ঐতিহাসিক ২২শে জুলাইয়ের শেষ রাত্রির খবর। উইং-কমাণ্ডার আলী সাবরীর বয়স তখন মাত্র বত্রিশ। এখন তেতাল্লিশ। পুরানো লড়িয়ে গেল এগার বছর উর্দি পরেছেন কদাচিৎ,—ইদানীং লড়াইয়ের

—তিনি অত্যধিক স্পর্শকাতর,—'টাচি।' কিন্তু ছোটখাট মজবুত গড়নের মানুষ সাবরী তা নন। তিনি ধীর-স্থির মানুষ, পাকা গৃহস্থ। সম্মেলনে একমাত্র তাঁর কণ্ঠেই আবেগ ছিল কম।

দু'টি ছেলেমেয়ের জনক সাবরী আবাল্য সৈনিক। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি সামরিক কলেজে যোগ দিয়েছিলেন। '৩৯ সনে সেখান থেকে বের হয়ে নাম লিখিয়েছিলেন রয়াল এয়ারফোর্সে। উইং-কমাণ্ডার সাবরী সেই সূত্রেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দিনে তাঁর কর্মজীবনের কয়েকটি স্মরণীয় মাস কাটিয়েছিলেন ভারতে। প্রত্যক্ষ রণে তাঁর দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা '৪৮ সনের প্যালেস্টাইন যুদ্ধে। তারপর থেকে সাবরী নাসেরের অন্যতম সহযোদ্ধা, সহচর। বিপ্লবের আগে মণ্ডলীর ন'জনের একজন ছিলেন তিনি। বিপ্লবের পর—তিনজনের একজন। গেল সেপ্টেম্বরে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রধান, ওরফে দেশের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হওয়ার আগে পদ ছিল তাঁর—প্রেসিডেন্সিয়াল এফেয়ার্স দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। কিন্তু সবাই জানত—আলী সাবরী সর্বমন্ত্রণালয় সার। যিনি তাঁকে এড়িয়ে নাসেরের অভিজ্ঞতা তাঁর টেবিলেই বেশী। শুরু হয়েছিল বিপ্লবের সেই আগ্নেয় দিনটিতে ঝানু কূটনীতিক বৃটিশ রাজদূতের সঙ্গে। তারপর বান্দুং, ক্যাসাব্ল্যাঙ্কা, বেলগ্রেড, কলম্বো; সুয়েজের পর লণ্ডন-সম্মেলন, লণ্ডনের পর নিউইয়র্ক,—য়ুনো। আলী সাবরী অনেক কূটনৈতিক অভিযানে স্বদেশের অধিনায়কত্ব করেছেন। কিন্তু একবারও বিফল হননি। আমেরিকা থেকে অস্ত্র সংগ্রহ, রাশিয়া থেকে অস্ত্র-কেনা—কোন টেবিলেই না। সম্ভবত তাঁর কূটনৈতিক জীবনে প্রথম ব্যর্থতা পিকিং। পিকিং থেকে ভগ্নদূত সাবরী দিল্লি হয়ে স্বদেশে ফিরে গেলেন। যাওয়ার আগে অবশ্য বলে গেছেন কলম্বো সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের হাতে আমিই শেষ তাস নই। কিন্তু সাবরীও যখন ফিরে গেলেন তখন আশা করার সত্যিই কী কিছু আছে,—থাকে?

থাকে না। কেননা, পরিচিতরা বলেন, কূটনীতিতে যদি শেষ কথা বলে কিছু থাকে তবে তিনি আলী সাবরী। নাসের নিজে স্বীকার করেন—'আমি অত্যধিক 'সেন্টিমেণ্টাল'। ফিল্ড মার্শাল আমীর একাধিকবার তাঁর আচরণে নাকি প্রমাণ করেছেন

সামসুদ্দীন, খাজা

সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন তাঁকে আবার ফিরতে হয়েছে এই মন্ত্রীটির দুয়ারে। নাসের যখন বাইরে যান তখনও তাঁর সঙ্গে থাকেন—আলী সাবরী। কেননা, দেশ এবং প্রেসিডেণ্ট দুইয়েরই মনের আয়না তিনি।

অদ্ভুত তাড়াতাড়ি ভাবতে পারেন, আশ্চর্য সংক্ষেপে কাজের কথা বলতে পারেন, এবং অবিশ্বাস্য খাটতে পারেন। আলী সাবরীর অনেকগুণ। দিনে তিনি গড়ে আঠার ঘণ্টা আপিস করেন। তবে, সবচেয়ে বড় গুণ তাঁর সব কথা তিনি হুবহু মনে রাখতে পারেন। স্কুলে ইতিহাস ঝাড়া মুখস্ত বলতে পারতেন, বক্তৃতায় স্ট্যাটিস্টিকস এবং আইনের উপধারা সমানভাবে অনর্গল বলে যেতে পারেন। কবে কার সঙ্গে কী কথা হয়েছিল তাও। মায় তার বলার ভঙ্গীটি পর্যন্ত। কলম্বো-নায়কদের হাতে সম্ভবত সেইটুকুই শেষ দলিল। কায়রোর আলী সাবরী যখন একবার কান পেতে এসেছেন—তখন 'ইয়েস' অথবা 'নো'গুলো নির্ভুল বলে ধরে নেওয়াই বোধ হয় সঙ্গত।

২. ৫. ৬৩

সামসুদ্দীন, খাজা

পকেটে পয়সা ছিল না। বন্ধুদের একজন হাতে একটা সিকি তুলে দিলেন। বক্সী গোলাম মোহম্মদ—কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের সভাপতি তথা সীমান্ত রাজ্য কাশ্মীরে ইদানীং একমেব অদ্বিতীয় ব্যক্তি বক্সী চোখের নিমেষে কংগ্রেসের সদস্য হয়ে গেলেন। তিনিও কামরাজপন্থী! সেদিন ১০ই আগস্ট।

চেনারের বনে অচিরেই ঝড়ের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। ৬ই অক্টোবর দলের সভা বসল। উদ্দেশ্য: নতুন নেতা নির্বাচন। সভা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ব্যর্থ হল। ৭ই আবার সভা। ৮ই আবার। ৯ই আবার ডাকতে হল বটে কিন্তু সভা সেদিন জমল না। ১০ই সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে বক্সী ঘোষণা করলেন—অতঃপর কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন খাজা সামসুদ্দীন। তিনি আরও জানালেন এ নির্বাচনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। ন্যাশনাল কনফারেন্সের জাতীয় পরিষদে সাকুল্যে সদস্য আছেন ১০১ জন। বৈঠকে ৮৬ জন হাজির ছিলেন। সামসুদ্দীন

তাঁদের সকলের সমর্থন লাভ করেছেন। —আর সাদিক? বক্সী জানালেন—ন্যাশনাল কনফারেন্সের সহ-সভাপতি এবং রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী সাদিক তাঁর দ্বাদশ অনুচর সহ সভায় আসেননি। তাছাড়া তিনিও কামরাজপন্থী। নতুন নেতা তাঁর প্রথম ভাষণে জানালেন তিনি বক্সীপন্থী। সেটা বলার প্রয়োজন ছিল না। সভার বিবরণটুকুই যথেষ্ট।

অবশ্য সব মানুষের মত কাশ্মীরের নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা সামসুদ্দীনের অন্য পরিচয়ও আছে। বিশেষ, মনে রাখতে হবে কাশ্মীর বিধানসভায় ন্যাশনাল কনফারেন্সের দখলে আছে মোট ৭০টি আসন। তার মধ্যে ৮টি সাদিক এবং তাঁর বন্ধুদের। বাকী সব কটি আসনের মালিকেরাই বক্সী-পন্থী। (রাজ্য বিধানসভার মোট আসন সংখ্যা ১০০। তার মধ্যে পাক কবলিত কাশ্মীরের জন্যে শূন্য রাখা হয়েছে ২৫টি। বাকি ৭৫টিতে দল পরিস্থিতি; ন্যাশান্যাল কনফারেন্স—৭০, প্রজাপরিষদ—৩, নির্দলীয়—২) সুতরাং এত অনুরাগী থাকা সত্ত্বেও সামসুদ্দীন যে নির্বাচিত হলেন সেটা সম্ভবত বিনা কারণে নয়।

প্রথম কারণ ভারতীয় রাজনীতিক-দের তুলনায় বয়সে নবীন হলেও সামসুদ্দীন ন্যাশনাল কনফারেন্সে পুরানো কর্মী। তাঁর জন্ম—১৯২৬ সনে। জন্মস্থান কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায়। গরীব চাষীর ঘরের সন্তান সামসুদ্দীন ষোল বছর বয়স থেকেই রাজনীতিক। তিনি যখন কন-ফারেন্সের অনন্তনাগ জেলায় জেলা কমিটির সম্পাদক হয়েছেন তখন তাঁর বয়স মাত্র সতের। তবে সক্রিয় রাজনীতি বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে পরিচয় তাঁর আরও একটু পরে, ১৯৪৫ সনে। সে বছর মহারাজ-বিরোধী আন্দোলনে কারাবরণ করেছিলেন এই তরুণ কর্মীটি।

রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে সেই থেকে লেখাপড়াও চলেছে। ১৯৪৮ সনে অর্থাৎ ভারত স্বাধীন হওয়ার এক বছর পরে সামসুদ্দীন আই. এস. সি. পাশ করেছেন। তারপর আদালতের দুয়ারে বসে দরখাস্ত মুসাবিদা করতে করতে ১৯৫৩ সনে আইনে স্নাতক হয়েছেন। তার চার বছর পরে ১৯৫৭ সনে সামসুদ্দীন রাজ্য বিধান-সভায় এলেন। সে বছরই সাদিক এবং তাঁর বন্ধুরা সরকার থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল গড়ার সিদ্ধান্ত

ঘোষণা করেন। সেই উপদলীয় কোন্দলে নবাগত সামসুদ্দীন অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। সামসুদ্দীন সেই থেকে নিষ্ঠাবান বক্সী-পন্থী। কৃষিমন্ত্রী হিসেবে তাঁর একমাত্র এবং উল্লেখ্য কীর্তি—কাশ্মীরের পঞ্চায়েৎ আইন।

দলের অধিকাংশ সদস্য স্বপক্ষে। কিন্তু তবুও কাশ্মীরের নতুন প্রধান-মন্ত্রীর কর্মজীবনের সূচনার দিনগুলো মনোমত হল না। জম্মুতে বিরাগীরা কালো পতাকায় নতুন প্রধানমন্ত্রীকে 'সম্বর্ধনা' জানিয়েছেন। ইষ্টকবৃষ্টিতে তাঁর গাড়ি জখম হয়েছে—প্রধান মন্ত্রীকে গৃহ প্রবেশের জন্যে পুলিশের সাহায্য নিতে হয়েছে। বিদ্রোহী প্রজাপরিষদ কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতির শাসন চান, তাঁরা সংবিধানের ৩৭০ ধারার উচ্ছেদ চান। বাইরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পাকিস্তান এবং চীন, ভেতরে এই আন্দোলন। তদুপরি সাদিক। তিনিও ৩৭০ ধারার বিরোধী। তাছাড়া সামসুদ্দীন যে এগারজনের মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন তাতে তাঁর দলের কারও নাম নেই। সামসুদ্দীন সম্ভবত এই মুহূর্তে ভারতে সবচেয়ে বিব্রত রাজ্যশাসক। তবে কি নয়াদিল্লি থেকে সিকির বিনিময়ে বক্সী যা কিনে এনেছিলেন এই রাজ্যে তা চালান সম্ভব নয়?

১৫. ১০. ৬৩

সালাজার

সূচনায় ঠিক আর পাঁচজন ডিক্টেটার-এর মত ছিলেন না। লোকেরা তাই বলত—সালাজার নরম ডিক্টেটার। কেননা, রাজতক্তে এসে-ছিলেন তিনি হাতে রক্তমাখা তলোয়ার নিয়ে নয়, পকেটে নেমন্তন্নের চিঠি নিয়ে। সালাজার সেদিক থেকে একটু অন্য ধরণের ডিক্টেটার। অর্থাৎ, ভাগ্যবান। নতুবা পর্তুগালের ইতিহাস সেদিন কেন তাঁর হাতে একতাল মোম?

অত্যন্ত সাধারণ ঘরে জন্ম (১৮৮৯)। ঠাকুর্দা ছিলেন দরিদ্র কৃষক। বাবা আরও দরিদ্র। পর্তু-গালের বেইরা প্রদেশে 'সান্টা কোম্বা দাও' নামক গাঁয়ে সামান্য জোতজমা ছিল তাঁর। তাতেই পাঁচটি সন্তান আর উচ্চাভিলাষী স্ত্রীকে নিয়ে কোন-মতে দিন চলে যেত।

পরিবারের একমাত্র মূলধন মায়ের ঐ উচ্চাভিলাষটুকু। তারই প্ররোচনায় বাড়ীর একমাত্র ছেলে বই বগলে

লেখা-পড়া জানা পড়শীদের বাড়ী যাতায়াত করত। গাঁয়ে স্কুল ছিল না।

স্কুল যখন বসল সালাজারের বয়স তখন এগার। তা হোক, তবুও মায়ের বাসনা—পড়তেই হবে। সালাজার স্কুলে ভর্তি হলেন। মাতৃ-ভক্ত ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে মা তার নাম দিলেন—'লিটল প্রিস্ট'। তাঁর ধারণা এ ছেলে একদিন যাজক হবে! (—হায় এঙ্গোলা! হায় গোয়া!)

কিন্তু '৮ সনে দু'বছরের জন্যে পারমার্থিক বিদ্যার স্কুলে সাধুসঙ্গ নিতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে ফিরে এলেন মাতৃ-ভক্ত তরুণ। তাঁর নিজের বিশ্বাস লেখাপড়া ছাড়া তাঁকে দিয়ে আর কিছু হবে না (—হায়! গণতন্ত্র, হায় হায় পর্তুগাল!)

মিথ্যে ভাবেনি ছেলেটি। লেখা-পড়া সত্যিই ওঁর হল। ১৯১৪ সনে কোয়েম্বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সসম্মানে স্নাতক হয়ে বের হলেন সালাজার। এবং পরীক্ষার ফলের বলে সে বছরই সেখানে নিযুক্ত হলেন অর্থনীতির সহকারী লেকচারার। মাত্র দু'বছর। এরই মধ্যে দুটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে অর্জিত হল 'ডক্টরেট' পদবী এবং অধ্যাপকের পদ। তাছাড়া সেই সঙ্গে মিলল দেশজোড়া খ্যাতি। সালাজার সেই বয়সেই পর্তুগালের অন্যতম খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ।

ইতিমধ্যে শুধু অর্থনৈতিক নয়, দেশের রাজনৈতিক জীবনেও পরিবর্তন হয়ে গেছে বিস্তর। সালাজার যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন (১৯১১) তখন রাজা দ্বিতীয় ম্যানুয়েল সিংহাসন হারাচ্ছেন। সালাজার যখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কাজ করছেন, সৈনিকদের পরিচালনাধীনে পর্তুগালের শিশু গণতন্ত্র তখন হাঁটব কি বসব—ভাবছে।

ভাবছিলেন সালাজারও। তবে তখনও বুদ্ধিজীবি হিসেবে। তিনি বললেন—এই ইংরেজী ধরনের গণতন্ত্রে আমাদের চলবে না। পর্তুগালের অন্য কিছু চাই।

সুতরাং, তৈরী হল খ্রীষ্টীয় আদর্শে নতুন পার্টি। অধ্যাপক সালাজার তাঁর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক,—পথ-প্রদর্শক। বলা বাহুল্য, তার ফলও মিলল। তিনজন ক্যাথলিক ডেপুটির একজন হিসেবে সালাজার কেন্দ্রীয় সভায় স্থান পেলেন।

কিন্তু মাত্র একদিনের জন্যে। একটি মাত্র বৈঠকে হাজিরা দিয়ে-

ছিলেন তিনি। তারপর নিঃশব্দে আবার ফিরে এসেছিলেন নিজের কাজে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ারে। কেননা, সরকারী মতি-গতির সঙ্গে তাঁর চিন্তার কোন মিল নেই!

আবার পাঁচ বছর একটানা পুঁথির জগতে। '২৬-এর সামরিক বিদ্রোহ সেই ধ্যানের জগৎ ভেঙ্গে দিল। নতুন সমর নায়ক কারমোনা এবং ডাঃ কোষ্টা অধ্যাপককে স্মরণ করলেন। রাজকোষ দখল করার পর সহসা তাঁরা আবিষ্কার করেছেন সিন্দুক ফাঁকা! এমতাবস্থায় সালাজারের মত অর্থনীতিবিদ ছাড়া কার সাধ্য তা পূর্ণ করে!

সালাজার তাঁদের আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন। ওঁরা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিসাবে অধ্যাপককে বরণ করে নিলেন।

আটচল্লিশ ঘণ্টা একটানা ফাইল ঘেঁটে ডাঃ কোষ্টার মুখের দিকে তাকালেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী। '—ব্যাধি আমি ধরেছি। যদি সারাই করতে চাও তবে চিকিৎসার ভারও দিতে হবে আমাকেই!—রাজি?'

'—সে কি করে সম্ভব?' উত্তর দিলেন বিজয়ী সেনাপতি।

'—তবে এই রইল তোমার ফাইল!'—তৎক্ষণাৎ শিবির ত্যাগ করলেন সালাজার। আঙুলে গুণে দেখলেন—মন্ত্রী ছিলেন তিনি মাত্র পাঁচদিন!

আবার বিশ্ববিদ্যালয়। আবার বই। কিন্তু এবার মাত্র কয়েক মাস-এর জন্যে। যে মাসে সভা ত্যাগ করেছিলেন তিনি। নভেম্বরেই শোনা গেল পরিত্যক্ত হয়েছেন ডাঃ কোষ্টা। কারমোনা একাই এখন একমাত্র অধীশ্বর। তিনিই রাষ্ট্রপতি, তিনিই প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রীই নেমতন্নটা পাঠালেন। বললেন—তোমার যা ইচ্ছে তুমি তাই করতে পার সালাজার। তবে এক-মাত্র সর্ত অর্থমন্ত্রী হিসেবে আমি তোমাকে পাশে চাই!—চাই-ই চাই।

এবার আর আপত্তি করা যায় না। সালাজার অর্থমন্ত্রী হলেন। লোকেদের মাইনে কমল, ট্যাক্স বাড়ল,—রাজকোষে টাকা এল। ফলে অর্থমন্ত্রীরও পদোন্নতি হল। তিনি প্রধানমন্ত্রী হলেন। (সে ১৯৩২ সনের ঘটনা। সালাজার আজও পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী।)

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সালাজারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব একখানা শাসন-তন্ত্র। সে বস্তুটি অনুযায়ী পর্তুগাল একটি 'ইউনিটারি অ্যাণ্ড কর্পোরেট

স্টেট', অর্থাৎ একটি মাত্র দল শাসিত কোন দেশ নয়, এমন দেশ যেখানে কোন দল নেই!'

দল নেই, কিন্তু রাষ্ট্রপতি থাকবে, সৈন্যবাহিনী থাকবে জেলখানা থাকবে, এবং থাকবেন সালাজার। বলতে গেলে সেও লেখা আছে শাসনতন্ত্রেই। সেখানে সাত বছরে একবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। তারপর তিনি মনোনীত করবেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী। সে প্রধান মন্ত্রী কথনও কারও কাছে কোন ব্যাপারে দায়ী নন। আজ ত নন-ই। কেননা, '৫১ সনে বন্ধু কারমানার দেহত্যাগের পরে প্রধানমন্ত্রী সালাজার নিজেই রাষ্ট্রপতি। অবশ্য তিনি বলেন —'অ্যাক্টিং'।

অতঃপর প্রশ্ন : সালজার কি ডিক্টেটার নন? যদি চ মাথায় (অক্স-ফোর্ড সহ) কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিরোপা, হাতে দেশদেশান্তরের নানা-বিধ প্রশংসাপত্র এবং গায়ে সিবিলি-য়ানের পোষাক, বলা বাহুল্য, উত্তরটি যেভাবেই দেওয়া যাক অনিবার্যভাবেই হ্যাঁ-বাচক। কেননা, সালাজারের দেশে নির্বাচন নেই ('৪৫ সনে একবার তার প্রহসন হয়েছিল বটে!) মানুষের কথা বলার অধিকার নেই, এবং যা থাকলে গণতন্ত্র বলে সে ধরণের কোন আইনও আজ আর অবশিষ্ট নেই। তবুও সালাজার আছেন। কারণ তাঁর সৈন্যবাহিনী আছে, গোপন পুলিশবাহিনী আছে এবং আছে হিটলারের সেই মানস সন্তানেরা নাম যার 'ইয়ুথ মুভমেণ্ট!'

শেষ সেই অমীমাংসিত প্রশ্নটি : সালাজার কি 'নরম ডিক্টেটার'? বলা-বাহুল্য, তার উত্তর দিতে গিয়েই ইতিহাসের উচ্ছিষ্ট থেকে ডিক্টেটার-শিপ-এর এই অবশেষটুকু কুড়িয়ে আনতে হল আজ 'নামভূমিকায়'। কেননা, এতকাল ছিল গোয়া, গ্যালভাও, ম্যাকাও। আজ মেদিনী কাঁপিয়ে রক্ত-কর্দম তুচ্ছ করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অ্যাঙ্গোলাও। সালাজার ইতিমধ্যেই পঁচিশ হাজার মানুষকে নির্দয় হাতে খুন করেছেন সেখানে।—'তিনি কি তবুও মোমের পুতুল?'

উত্তরে কে একজন একবার সেই খবরটা শুনিয়েছিলেন। 'সালাজার বিয়ে করেন নি। কিন্তু তবুও তিনি মমতাময় পিতা। কেননা, দুটি অনাথা মেয়েকে তিনি পিতৃস্নেহে পালন করেন!'

আর যিনি একহাতে পঁচিশ

সিহানুক, প্রিন্স নরোদম

হাজার মানুষের জীবন ছিনিয়ে নিলেন তিনি ? ভক্ত ক্যাথলিক (?) হলেও তিনি নিশ্চয় 'মাটির মানুষ' নন। তবে আশ্বাসের কথা 'লৌহ মানব' নামে কথিতরাও সেই আগুনে টেঁকে না।

২২. ৬. ৬১

সিহানুক, প্রিন্স নরোদম

রাজার ছেলে। কিন্তু তিনি রাজা নন, প্রজা-নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। রাজতন্ত্রে তাঁর বিশ্বাস অটল। কিন্তু তা হলেও তিনি সমাজতন্ত্রী। দেশের একমাত্র সমাজবাদী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা।

অদ্ভুত, আশ্চর্য মানুষ কম্বোডিয়ার রাজকুমার নরোদম সিহানুক। রাজ-পুত্রদের জীবন সচরাচর যা হয় তিনি তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। পিতামহ শিশওয়াথ মনিভং তাঁকে মনোনীত করেছিলেন কম্বোডিয়ার সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। ১৯৪১ সনে মাত্র উনিশ বছর বয়সে সিংহাসনে বসলেন সিহানোক। ক' বছর পরেই, '৪৯ সনে ফরাসীদের সঙ্গে চুক্তি হল তাঁর। স্থির হল অতঃপর কম্বোডিয়া ফরাসী ইউনিয়নের অন্তর্গত একটা স্বাধীন দেশ বলে গণ্য হবে। দু' বছরও কাটল না। ফরাসীরা অবাক হয়েই দেখল—গোটা কম্বোডিয়া বিক্ষোভ-চঞ্চল। কম্বোডিয়ানরা পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। আরও অবাক কাণ্ড এই—তাদের এই স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব করছেন স্বয়ং কম্বোডিয়ারাজ—তরুণ সিহানুক। সিহানুকের ডাক পড়ল প্যারিসে। আলোচনা ব্যর্থ হল। আবার বিক্ষোভে ফেটে পড়ল কম্বোডিয়া। চরম ব্যবস্থার জন্যে তৈরী হল ফ্রান্স। কিন্তু সিহানুককে আর হাতে পেল না তারা। নাটকীয়ভাবে দেশত্যাগী হলেন সিহানুক। তাঁর একত্রিশ জন মন্ত্রীকে নিয়ে তিনি আশ্রয় নিলেন থাইল্যাণ্ডে।

তার পরের ঘটনাটিও কম নাটকীয় নয়। ১৯৫৩ সনে কম্বোডিয়া স্বাধীন হল। দেশত্যাগী কম্বোডিয়া-রাজ ফিরে এলেন নিজের দেশে। কিন্তু দু'বছর পরেই স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করলেন তিনি। বললেন: এ সিংহাসন আসলে আমার পিতার-ই প্রাপ্য। রাজা আবার রাজকুমার হলেন। প্রিন্স নরোদম সিহানুক এবার প্রকাশ্যে নেমে এলেন জনতার রাজনীতিতে। দেশে প্রতিষ্ঠিত হল কম্বোডিয়ার বিখ্যাত রাজনৈতিক দল 'সঙ্কুম রিয়াস্ত নিয়ুম' বা পিপলস্

সোস্যালিস্ট কমিউনিটি। রাজকুমার সিহানুক এর প্রতিষ্ঠাতা এবং অবিসম্বাদী নেতা। তিনি এবং তাঁর দল বিপুল ভোটাধিক্যে আজ কম্বোডিয়ার শাসকশ্রেণী। প্রিন্স সিহানুক তাদের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী।

যুগোশ্লাভিয়া এবং সংযুক্ত আরব রিপাবলিক ভ্রমণান্তে কম্বোডিয়ার প্রধান মন্ত্রী দেশের পথে মাত্র একদিন ভারতে কাটিয়ে গেলেন। কম্বোডিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র ঐতিহাসিক। সিহানুক-এর ভারত পদার্পণ সেই প্রাচীন ঘটনার একটি অভিপ্রেত পরিণতি। মনে রাখতে হবে, শুধু সামাজিক নয়, রাজনৈতিক চালচলনে কম্বোডিয়া আজও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। সাঁইত্রিশ বছরের তরুণ প্রিন্স সিহানুক ধর্মে যেমন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ, পররাষ্ট্রনীতিতেও তেমনি বেপরোয়া নিরপেক্ষ। ১. ১. ৬০

সিং, এয়ার মার্শাল অর্জন

এত উড়োজাহাজ বোধ হয় খুব কম মানুষই ঘেঁটেছেন। ১৯৩৯ সন থেকে এ পর্যন্ত কমপক্ষে ষাট ধরনের এরোপ্লেন চালিয়েছেন তিনি। তার মধ্যে যুদ্ধ-পূর্ব দিনের 'বাট' থেকে শুরু করে আধুনিক সুপার কনস্টে-লেশান সব আছে।

ওড়ার উপলক্ষগুলোও মনে রাখবার মত। ১৯৪৪ সনে ব্রহ্ম রণাঙ্গনে তথা আরাকানের আকাশে ডানা মেলেছিলেন খোলে বোমা বোঝাই করে। পরের বছর বুকে 'ডিস্টিঙ্গুইসড ফ্লায়িং ক্রস' ঝুলিয়ে ভারতময় উড়ে বেড়িয়েছিলেন বিজয় মহড়া দেখিয়ে। তবে তার চেয়েও স্মরণীয় দিন ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৭। লালকেল্লার শীর্ষে দাঁড়িয়ে জওহরলাল যখন ভারতের আকাশে তেরঙ্গা পতাকা ওড়াচ্ছেন তখন তাঁর মাথার ওপর দিয়ে অভিবাদনের ভঙ্গীতে যাঁরা উড়ে গিয়েছিলেন তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন তিনিই। প্রজাতন্ত্র দিবসে একই দুর্লভ সম্মান পেয়েছেন তিনি সাত বার। একবার তাঁর সঙ্গে ছিল একশ' দশটি 'পিস্টন' এবং 'জেট'। ২৬শে জানুয়ারীর দিল্লি আকাশে তার চেয়ে জমাটি খেলা আর কেউ দেখেনি। কিন্তু তিনি দেখেছেন। এবং দেখিয়েছেনও। '৫৬ সনে এক ঝাঁক 'তুফানি' জেট নিয়ে তিনিই গিয়ে-ছিলেন ব্রহ্মে ক্রীড়াচ্ছলে ভারতীয় বিমানবহরের যৌবন দিনের বার্তা

সিং, এয়ার মার্শাল অর্জন

জানাতে। গত বছর নবেম্বরে বিখ্যাত 'শিক্ষা' মহড়ায়ও তিনিই ছিলেন আমাদের তরফের প্রধান শিক্ষক ও দর্শক। দু'বছর আগে চীনা আক্রমণের দিনগুলোতে তার চেয়েও দর্শনীয় খেলা দেখিয়েছিলেন তিনি সীমান্তে। পরিদর্শক হয়ে রণাঙ্গনে গিয়ে স্বেচ্ছায় সেদিন নাকি হঠাৎ প্রদর্শক হয়ে গিয়েছিলেন জাতির তহবিলে অন্যতম মূল্যবান অধিনায়ক। রসদ নিয়ে নিজেই তিনি ঝড়ের আকাশে ডানা মেলেছিলেন !

নাম—অর্জন সিং। বয়স মাত্র পঁয়তাল্লিশ। জন্মস্থান—লায়ালপুর, পশ্চিম পাঞ্জাব। লেখাপড়া—মণ্টগোমারী, লাহোর গবর্নমেণ্ট কলেজ এবং ক্রনওয়েল-এর বিখ্যাত বৈমানিক শিক্ষা কেন্দ্র। শিক্ষা শেষে সেখান থেকে বের হওয়ার পর থেকেই অর্জন সিং ভারতীয় বিমানবহরে জড়িয়ে বৈমানিক। কমিশনড হয়েছেন তিনি ১৯৩৯ সনের ডিসেম্বরে।

প্রথমে ছিলেন ১নং স্কোয়াড্রনের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। তারপর ব্রহ্ম রণাঙ্গনে। তরুণ বৈমানিক অর্জন সিং তখন স্কোয়াড্রন লীডার। সামরিক ডেসপ্যাচে সেদিন তাঁর প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল—'এ ফিয়ারলেস অ্যাণ্ড এক্সেপশনাল পাইলট···অ্যান ইনস্পায়ারিং স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার।' দেশবিভাগের আগে তাঁর জন্য কর্মস্থল নির্দিষ্ট হয়েছিল প্রথমে কোহাত, তারপর রাইসলপুর। দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বিমানবহরের গর্ব এই তরুণ শিখ নিযুক্ত হলেন আম্বালার অ্যাডভান্স ফ্লাইং স্টেশনের পরিচালক। পরবর্তীকালে বিদ্যালয়টি যখন বেগমপেট-এ স্থানান্তরিত হয় অর্জন সিং তখনও তার অধিনায়ক।

তারপর থেকে ক্রমেই আরও ওপরের দিকে। '৪৮ সনে পদ ছিল তাঁর—ডাইরেক্টার অব ট্রেনিং। '৪৯ সনে বৃটেন থেকে বিশেষ ট্রেনিং নিয়ে ফিরে আসার পর এয়ার-কমোডোর অর্জন সিং নিযুক্ত হয়েছিলেন—অপারেশন্যাল কমাণ্ডের এয়ার অফিসার কমাণ্ডিং। চার বছর পরে হেডকোয়ার্টার্স-এ এয়ার অফিসার ইনচার্জ, পার্সোনেল অ্যাণ্ড অর্গেনাইজেশন। সম্ভবত অর্জন সিং-ই একমাত্র সেনানায়ক যিনি একটানা সাত বছর অপারেশন্যাল কমাণ্ড-এর অধিনায়কত্ব করেছেন। তিনি এয়ার ভাইস-মার্শাল হয়েছেন—১৯৬০ সনের

জুনে। সে বছরই পুরানো বৈমানিক ব্রিটেনের ইম্পিরিয়াল ডিফেন্স কলেজ থেকে সগৌরবে স্নাতক হয়েছিলেন। তারপর আরও এক ধাপ। গত বছর আগস্টে এয়ার ভাইস মার্শাল অর্জন সিং মনোনীত হয়েছিলেন আমাদের বিমান-বহরে দ্বিতীয় প্রধান। পদ ছিল তাঁর—ভাইস-চীফ, এয়ার স্টাফ। এয়ার মার্শাল অর্জন সিং এখন আমাদের বিমানবাহিনীর সর্বেসর্বা। গত ১লা আগস্ট থেকে এয়ার মার্শাল এঞ্জিনীয়ারের জায়গায় তিনি আমাদের নতুন চীফ অব দি এয়ার স্টাফ।

যেমন আকাশে, তেমনি জলে এবং মাঠেও। এয়ার মার্শাল অর্জন সিং একজন খ্যাতনামা স্পোর্টসম্যানও বটেন। ছাত্রজীবনে মাছের মত সাঁতারু ছিলেন। লাহোর কলেজের ছাত্র অর্জন সিংয়ের হাতে তখন গোটা নয় রেকর্ড। চারটে তার—পাঞ্জাবের মধ্যে ফার্স্ট, চারটে—য়ুনিভারসিটির মধ্যে, এবং একটা-সমগ্র ভারতের মধ্যে। ১৯৩৪ সনে সারা ভারত এক মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম হয়েছিলেন তিনি এই অর্জন সিং। ক্রনওয়েল-এ তিনি ছিলেন সাঁতার এবং খেলার টিমের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। সে নেশা এখনও কাটেনি। খেলার মাঠ এই দুর্ধর্ষ বৈমানিকের কাছে এখনও দ্বিতীয় আকাশ। ১৯৫৬ সনে মেলবোর্ন অলিম্পিকে তিনিই নির্বাচিত হয়েছিলেন—ভারতীয় দলের 'চীফ দ্য-মিশন।'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ক'মাস আগে প্রতিরক্ষা দপ্তরের যে প্রতিনিধি দল ওয়াশিংটনে গিয়েছিলেন সামরিক জিনিসপত্তরের খোঁজে তাঁদের মধ্যেও অর্জন সিং ছিলেন অন্যতম।

৬. ৮. ৬৪

সিং, মাস্টার তারা

দুইটি প্রাচীরপত্রের বক্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীত। একটিতে দেখা যাচ্ছে হু হু বেগে চলেছে একখানা রেল। এঞ্জিন চালাচ্ছেন সর্দার মোহন সিং। যাত্রীদের আসনে বসে আছেন—সর্দার কাইরো, রারেওয়ালা, জ্ঞানী কর্তার সিং এবং যুক্তফ্রণ্টের অন্যান্য নেতারা। রেলপথের দুই ধারে প্রগতির নানা চিহ্ন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, হিন্দু-শিখ ঐক্য এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্য এই, একটি লোক কিছুতেই তবু ট্রেনে চড়বে না। একাকী তিনি কোমরে একখানা

তলোয়ার ঝুলিয়ে গাধায় চড়ে চলেছেন প্রগতির উল্টো পথে। গাধাটির গলায় ঝুলছে একটি শূন্য বালতি। পথের বাঁকে গন্তব্যের নিশানা : বিরোধ, রক্তপাত, ধ্বংস!

দ্বিতীয় প্রাচীরপত্রটির বক্তব্য আরও সহজ। শিখদের পবিত্র ধর্মমন্দিরকে চারদিক থেকে আক্রমণের উদ্যোগ করছে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরা। তারা সিং এবং তাঁর খালসা অনুচরেরা তাই শক্তিভিক্ষা করতে এসেছেন যুগে যুগে যাঁরা শিখধর্মকে রক্ষা করেছেন সেই প্রাতঃস্মরণীয় গুরুদের কাছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে তাঁরা আশীর্বাদ জানাচ্ছেন রণবেশে সজ্জিত খালসা নায়ককে।

কোন্ প্রাচীরপত্রটি বেশী আকর্ষণীয় পাঞ্জাবীদের কাছে? প্রথমটি, অথবা দ্বিতীয়টি? অনেকে অনেক রকম ভেবেছিলেন। কিন্তু অন্তে দেখা গেল গুরুদ্বারের নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন সেই গর্দভারোহী নিঃসঙ্গ পথিকটিই। প্রগতির এঞ্জিন বিগড়ে গেছে। মাস্টার তারা সিংয়ের শূন্য বালতিতে উপচে পড়ছে পাঞ্জাবের আনুগত্য। বোঝা গেল, পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ খালসা নায়ক তারা সিং পাঞ্জাবে যে এখনও একটি উল্লেখযোগ্য নাম তাই নয়, অবহেলা না করার মত একটি শক্তিও বটে।

শিখ নায়ক তারা সিংহের নাম জানেন না ভারতে এমন মানুষ কম। কিন্তু এ কথা খুব কম লোকই জানেন যে, মাস্টার তারা সিং সত্যিই ছিলেন একদিন মাস্টার,—শিক্ষক। তাছাড়া এটাও অনেকে জানেন না যে, সর্বজন-শ্রদ্ধেয় এই শিখ ধর্মনায়কটি জন্মে শিখ নন। তাঁর মা বাবা ছিলেন হিন্দু। সতের বছর বয়সে স্বেচ্ছায় খালসাদের ধর্ম বরণ করেন হিন্দুর ছেলে তারা সিং। অতঃপর অমৃতসরের খালসা কলেজের সদ্য-গ্রাজুয়েট তারা সিংয়ের প্রথম কাজ হল শিখদের জন্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। ১৯০৮ সনে লায়ালপুরে প্রতিষ্ঠিত হল সেই বিদ্যালয়। এবং প্রধান শিক্ষকের আসনে বসলেন তার প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং। সেই থেকেই লায়ালপুরের শিক্ষক তারা সিং গোটা ভারতে মাস্টার তারা সিং।

জীবনের মত নেতৃত্বেও মাস্টার তারা সিং অদ্ভুত মানুষ। পাঞ্জাবে তাঁর প্রথম প্রতিষ্ঠা গুরুদ্বার সংস্কার আন্দোলনে। পুরোহিতদের হাত

থেকে গুরুদ্বার পরিচালনার ভার সাধারণের হাতে আনতে গিয়ে সেদিন তিন তিনবার কারাবরণ করেছিলেন তিনি। তারপর এক সময়ে সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসীর মত হিমালয়বাসীও হয়েছিলেন কিছুদিনের জন্যে। '৩০ সনে আইন অমান্য আন্দোলন যখন শুরু হল— সন্ন্যাসী তারা সিং তখন আবার জননায়করূপে দেখা দিলেন। '৪২-এর আন্দোলনে তিনি ছিলেন সরকার পক্ষে। খালসাদের দলে দলে সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। কেননা, নয়ত সেনাবাহিনীতে মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের সম্ভাবনা।

মাস্টার তারা সিং মুসলিম বিরোধী নন। কিন্তু ভারত বিভাগের বিরোধী। ক্রীপস প্রস্তাব তিনি খারিজ করেছিলেন—কারণ তাঁর মতে ওতে ভারত বিভাগের ষড়যন্ত্র ছিল।

রাজনৈতিক ব্যাপারে মাস্টার তারা সিং বরাবরই আপস বিরোধী। তিনি অনেকবার কংগ্রেসে এসেছেন, অনেকবার তা ছেড়েছেন। তারা-সিং আলোচনায় বসেন, কথা বলেন কিন্তু নিজের সংকল্পের কথা ভুলেন না। শিরোমণি আকালি দল '৫৬ সন থেকে আর রাজনৈতিক দল নয়। তার সদস্যরা ইচ্ছে করলে কংগ্রেসে যোগ দিতে পারে। মাস্টার তারা-সিং সম্মতি দিয়েছেন তাতে। কিন্তু নিজে তিনি এখনও যতখানি ধর্মীয় মানুষ, ঠিক ততখানি রাজনৈতিক। আপাতত গুরুদ্বার পরিচালনায় সরকারী হস্তক্ষেপ রোধ করার মত একখানা নির্ভেজাল পাঞ্জাবী সুবা গঠনও তাঁর লক্ষ্য। গুরুদ্বারের নির্বাচনে মাস্টার তারা সিংয়ের এবারকার বিজয় তাই পাঞ্জাবের আগামী রাজনীতিতে একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। ভাববার ঘটনাও বটে। ২৩. ১. ৬০

সিং, যুবরাজ করণ

খবরটা শুনে চমকে উঠেছিলেন সবাই। কেননা, ব্যাপারটা ছিল যুবরাজকে নিয়ে।

রাজতরঙ্গিনীর দেশ। কোন কোন রাজা সেখানে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু যুবরাজ বসে বসে 'থিসিস' লিখছেন,—সে কথনও হয়? অথচ খবরে তাই ছিল। খবর ছিল: যুবরাজ করণ

সিং, যুবরাজ করণ

সিং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'থিসিস' দাখিল করেছেন। বিষয়: শ্রীঅরবিন্দের দর্শন।

রাজপুত্রের পক্ষে চমকপ্রদ সংবাদ সন্দেহ নেই, কিন্তু করণসিংকে যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে এই যুবরাজটি সম্পর্কে অন্য যে কোন সংবাদ অভাবনীয়। কেননা, পড়াশুনা মহারাজা হরি সিং-এর এই ছেলেটির বরাবরের নেশা।

বিলাসী পিতার পুত্র। সুতরাং ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন ঘরের ভূস্বর্গ ছেড়ে অনেক দূরে, নকল স্বর্গে। ফ্রান্সের কান শহরে। কিন্তু তারপর থেকেই করণ সিং স্বদেশী যুবরাজ।

লেখাপড়ার সূচনা দেরাদুনের ডুন স্কুলে। '৪৫ সনে সেখান থেকে যখন সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করে বের হন তিনি যুবরাজের বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বছর (জন্ম—১৯৩১ সন)।

ইচ্ছে ছিল কলেজ যাওয়ার। কিন্তু স্বশরীরে তা আর সম্ভব হল না। কেননা, রাজবাড়ী তখন অস্থির, রাজ্যে আগুনের ইঙ্গিত। আশ্চর্য, যুবরাজ তবু পড়া ছাড়লেন না। ফলে, '৪৭ সনে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ পরীক্ষার ফল যখন বের হল তখন দেখা গেল কাশ্মীরের যুবরাজের নামও আছে কৃতীদের তালিকায়। যুবরাজ 'প্রাইভেট' পরিক্ষার্থী ছিলেন।

বি. এ পরীক্ষাও দিতে হল 'প্রাইভেট' হিসাবেই। তবে এবার অবশ্য স্ব-রাজ্যে। কেননা, কাশ্মীরের স্থিতি এসেছে। রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ও চালু হয়েছে। যাঁরা উদ্যোগী হয়ে সেদিন তা করেছিলেন বি. এ পরীক্ষার্থী এই রাজ্যপ্রধানটি তাঁদের অন্যতম। মনে রাখতে হবে যুবরাজ করণ সিং ১৯৪৯ সনের ২০শে জুন থেকেই রাজ্যের 'রিজেন্ট' তথা আইন সম্মত অধিরাজ। অথচ বি.এ পাশ করেছেন তিনি '৫১ সনে।

এম.এ দিতে আরও ক'বছর দেরী হয়ে গেল। কেননা, সদর-ই-রিয়াসৎ-এর রাজ্যে অনেক কাজ। '৫২ সনের নভেম্বরে রাজ্যপ্রধানের এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। '৫৭ সনে আবার,—পুনর্নির্বাচন। অথচ, সে বছরই তাঁর পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছে! দিলেনও। কিন্তু এবার তিনি কাশ্মীরে নয়,—দিল্লিতে। দিল্লিতে যেতে হল আরও এজন্যে কাশ্মীরে যে তিনি নিজেই চ্যান্সেলার! উল্লেখযোগ্য, করণ সিং সে পরীক্ষায়ও সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ

হয়েছিলেন। সেবার তাঁর বিষয় ছিল: রাজনীতি। এবার 'থিসিস' পড়ল ফিলজফির।

বলা বাহুল্য, এমন সম্মান, এত কর্তব্যভার থাকা সত্ত্বেও 'ডক্টরেট' পাওয়া যাঁর সাধনা, তিনি 'রাজা' উপাধি নিয়ে খুশী হওয়ার মানুষ নন।

অথচ, গেল এপ্রিলে (২৬শে) পরলোক গমন করেছেন কাশ্মীরের মহারাজা স্যার হরি সিং। আইনগত উত্তরাধিকারের কথা ভাবতে হয়।

অনেক ভেবেই প্রস্তাবটা তুলেছিলেন ভারত সরকার। কিন্তু যুবরাজ জানিয়েছেন তিনি 'মহরাজা' হতে রাজী নন। অন্তত যতদিন 'সদর-ই-রিয়াসৎ' আছেন তিনি ততদিন কিছুতেই নয়।

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই খবরটিও যুবরাজোচিত নয়। 'রাজতরঙ্গিণী'তে করণ সিং নিঃসন্দেহে এক নতুন ধরণের যুবরাজ! ১৩. ৭. ৬১

সিং, সন্ত ফতে

গলায় একটা হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াত সেই জোয়ান ছেলেটি। নয়া পত্তনী গাঁয়ে। ধর্মের গান গাইত। শিখরা চারপাশে ঘিরে দাঁড়াত তাকে। ওরা তার নাম দিয়েছিল—'উপদেশক' অর্থাৎ প্রচারক।

নবীন প্রচারক আজ প্রবীণ নায়ক। বয়স পঞ্চাশে পৌঁছেচে, যুবকের বলিষ্ঠ দেহ বল হারিয়ে ২৬০ পাউণ্ড মাংসে ঠেকেছে, কালো দাড়ি সাদা-কালোর ঘোর কাটিয়ে পুরোপুরি সাদা হতে চলেছে, কিন্তু গলা থেকে আজও তাঁর হারমোনিয়ামটি নামাননি। কেননা, আজ তিনি আরও বড় 'উপদেশক', আরও বড় প্রচারক। সন্ত ফতে সিং আজ শুধু শিখ সন্ন্যাসী নন, তিনি পাঞ্জাবী সুবা মোরচারও অন্যতম নায়ক। তাঁর আজ অনেক শ্রোতা। 'মানজি সাহেব'-এর (অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দির) মাথায় নিঃসঙ্গ লাল আলোটির দিকে আজ অনেকের নজর।

এই আলো যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ফতে সিংও আছেন। এটি যখন থাকবে না, পাঞ্জাবে তখন অন্ধকার। ভক্তরা জানবে সন্ত আর নেই…।

১৮ই ডিসেম্বর থেকে শুরু হল—'ব্রত'। মানে—আমরণ অনশন। উপলক্ষ—পাঞ্জাবী সুবা। যাট লক্ষ শিখের জন্যে একটা স্বতন্ত্র দেশ চান তিনি। শিখদের জন্যে আরও স্বাধীনতা চান। তাঁর মতে কংগ্রেসরাজ

শিখদের পক্ষে 'মোগল-রাজ', জওহর-লাল—'আউরঙ্গজেব'।

সুখের বিষয়, 'আউরঙ্গজেব'-এর পরামর্শ মত অনশন ভঙ্গ করেছেন ফতে সিং। অবশ্য তেইশ দিন পরে। স্বভাবতই দৈহিক ক্ষতি অনেক। প্রায় পঁচিশ পাউণ্ড। কিন্তু সে তুলনায় লাভ বোধ হয় অপরিমিত। কেননা, শোনা যাচ্ছে পাঞ্জাব সমস্যার এবার কিনারা হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য: শিখদের জন্য এমন করে যিনি লড়লেন সেই সন্ত কিন্তু শিখের ঘরের ছেলে নন। ফতে সিং-এর মা বাবা ছিলেন গুজর মুসলমান। ১২. ১. ৬১.

সিং, সর্দার স্বর্ণ

Many bad generals have won battles, but no debating society has ever done so;—বলেছিলেন মেকলে। অর্থটা স্পষ্ট।—বাজে সেনাপতিরাও যুদ্ধজয়ের গৌরব ভোগ করেছেন, কিন্তু কোন ডিবেটিং সোসাইটি কদাপি নয়। কথাটা সত্য। কিন্তু ডিবেটিং সোসাইটি যা পারে তাও বোধহয় কম নয়। ইতিহাসেই পাওয়া যায় তারা যুদ্ধ এড়াতে পারে, কখনও কখনও যুদ্ধকে মহাযুদ্ধের অনিবার্য পরিণতি থেকে সরিয়ে দেশ-বন্দী করতে পারে এবং দেশের যুদ্ধকে অঞ্চল-বন্দী। বিশেষ স্নায়ু-যুদ্ধ প্রশমনে তাদের দান অনস্বীকার্য। সেখানে তর্কসভার সে অবদানটুকু মেনে নিলে, বলা অনাবশ্যক, সর্দার স্বর্ণ সিং প্রায় কেশরী রণজিৎ সিংয়ের কাছাকাছি মাপের নায়ক। কেননা, চতুর্থ চক্করেও তিনি তেমনি আছেন, তেমনি তর্ক চালিয়ে যাচ্ছেন,—তেমনি হাসছেন!

মুখে স্থায়ী হাসি, চোখে চশমা, মাথায় পাগড়ি।—একনজর তাকালেই জানা যায় তাঁর আকর্ষণীয় দীর্ঘ দেহে যে কোন ডিবেটিং সোসাইটির মধ্য-মণির সামর্থ্য ধারণ করেন। আর এক সেরা তার্কিক চার্চিল বলতেন—যে কোন তর্কসভায় শ্রোতারা তিনটি জিনিস চান। প্রথমত কে বলছেন, দ্বিতীয়ত—কী ভাবে বলছেন, তৃতীয়—কী বলছেন। রাজভবনের সভা-কক্ষ জানে,—সর্দারজী একাধারে এই তিন প্রশ্নেরই যোগ্য উত্তর।

টেবিলের উল্টো দিকে বসা মানুষগুলোর প্রত্যেকে হয়ত মুখটা চেনেন না, কিন্তু প্রবীণদের অনেকেই শুধু হাস্যোজ্জ্বল মুখখানা নয়, পাগড়ির নীচে মাথাটিকেও জানেন। এই শতকের দ্বিতীয় দশকে লাহোর

কলেজে—তাবৎ ভাল-ছেলের আতঙ্ক ছিল একটি শিখ বালক। তার দাপটে কারও প্রথম হবার উপায় ছিল না সেদিন। আই এস-সি, অনার্স-সহ বি এস-সি ;—এম এস-সি'র ফিজিক্স ক্লাস—সর্দার স্বর্ণ সিং সেদিনের পাঞ্জাবে রীতিমত এক সংবাদ। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্যে গোটা লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মহল তখন চঞ্চল। তাঁদেরই কেউ কেউ আজ টেবিলের উল্টোদিকে।

জেনারেল শেখ-এর মত রাওয়াল-পিণ্ডির শাসক মহলে যাঁরা ওঁর ক্লাস ফ্রেণ্ড ছিলেন না—তাঁরাও সর্দারজীকে জানেন। কেননা, বিজ্ঞানের ছাত্র এম এস-সি পাশ করে এক দুর্জ্ঞেয় কারণে যেমন সহসা এল এল-বি নিয়ে আইন ব্যবসা শুরু করেছিলেন,—তেমনি '৪৬ সনে তাও ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ স্ব-রাজ্যের রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ফলে, সুদূর সেই '৪৬ সন থেকে পাঞ্জাবে তিনি সুখ্যাত ব্যক্তি। অবিভক্ত পাঞ্জাবে মালিক খিজির হায়ত খাঁর মন্ত্রিসভায় তাঁকে অনেকে দেখেছেন, কেউ কেউ দেখেছেন দাঙ্গার পাঞ্জাবে, সিকিউরিটি কাউন্সিলে উপদেষ্টার আসনে—কেউ কেউ দেশ বিভাগের সময়কার 'পার্টিশান কমিটি'তে। পশ্চিম পাঞ্জাব, তথা অদ্যকার পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে সেদিনের সর্দারজীকে ভোলা সম্ভব নয়। অবশ্য দেশবিভাগের পাঁচ বছরের মধ্যেই পাঞ্জাব মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নিয়ে 'কেন্দ্রস্থ' হয়েছেন সর্দার স্বর্ণ সিং। ১৯৫২ সন থেকেই অন্যতম কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে (প্রথমে—গৃহ-পূর্ত...তারপর ইস্পাত-খনি ইত্যাদি এবং '৬২ সনের এপ্রিল থেকে রেল-মন্ত্রী।) তিনি দিল্লিবাসী কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর বন্ধুকুলে বিস্মৃতি দেখা দেয়নি তার হেতু—পাকিস্তানী রাজনীতি। তিন বছর আগে দুই দেশের সীমান্ত বিরোধ ফয়সলা করতে আবার পুরোনোদের ভিড়ে ফিরতে হয়েছিল তাঁকে। সেদিন আবিষ্কৃত হয়েছিলেন—জেনারেল শেখ। তারপর গেল তিন মাসে বেরিয়েছেন—আরও অনেকে। সর্দার এখন আবার সুপরিচিত। তাঁকে চেনেননা, রাজভবনের সভাকক্ষে বোধ হয় এমন মানুষ আজ একজনও নেই।

বয়স—ছাপ্পান্ন। কিন্তু মুখের দিকে তাকালে পনের তৎক্ষণাৎ কমে যাবে, শুধু গলাটা কানে বাজবে। কীভাবে কথা বলেন ছাপ্পান্ন বছরের এই তরুণ

সিং, শচীন্দ্রলাল

নায়ক তাও আজ অনেকের মুখস্থ। ৫৪' সনে জেনেভায় সমবেত 'য়ুনো'র অর্থনৈতিক পরিষদ তা দেখেছে, দেখেছে—তিন বছর আগে জেনারেল শেখের সঙ্গীরা, ত্ব'বছর আগে ম্যাপ নিয়ে তর্কসভা করতে এসেছিল যে চীনারা তারা, এবং জাপানীরা,—রাশিয়ানরা। '৫৯ সনে মস্কোয় বসে রাশিয়ার কাছ থেকে ১৫০০ মিলিয়ন রুবল আদায় করেছিলেন যে প্রতিনিধি দল সর্দার স্বর্ণ সিং ছিলেন সেই দলেরও পুরোভাগে। সকলে একবাক্যে স্বীকার করেছেন—সর্দার শুধু তর্ক করতে জানেন না, ত্বটো দিকই দেখে কথা বলতে জানেন!

কিন্তু তবুও অনুমান সব সময় নির্ভুল হয় না। গেল তিনটি বৈঠকে হেসেছেন বলে, এখনও হাসছেন বলে সর্দারজী কেবলই হাসবেন একথা কেউ বলতে পারে না। সেইখানেই চার্চিল চিহ্নিত তার্কিকের তৃতীয় লক্ষণ। চারিটি কন্যার জনক সর্দারজী সংসারীও বটেন, বড় মেয়ে তাঁর এবছরই ডাক্তারি পাশ করেছে। তিনি জানেন কেন নতুন কথাগুলো বলা দরকার, কখন পুরানো ঘ্যান ঘ্যানগুলো থামাবার সময়।

১৪. ৩. ৬৩

সিংহ, শচীন্দ্রলাল

১৯৩৭ সনের কথা।

কুমিল্লা এবং তার চারপাশের এলাকায় একটি বাঙ্গালী যুবক তখন 'আনন্দবাজার' এবং 'হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড' ফিরি করে বেড়াতেন। বিশাল শরীর, একমাথা কালো চুল. মুখভরা হাসি; বয়স বছর তিরিশেক হবে। পরিচিতরা জানতেন—যুবকটি কুমিল্লার ছেলে নন, এবং আনন্দবাজার বিক্রি তাঁর পেশা হলেও নেশা তাঁর অন্য। হাতের এই মুদ্রিত আইডিয়া-গুলোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর মাথার আরও কিছু স্বপ্ন বেচতে চান,—তিনি অন্য ধরনের সেলস্‌ম্যান।

'কেনা'র সে বাণিজ্য শেষ হয়েছে। ছাব্বিশ বছর পরে সেই যুবকটিই আজ গণতন্ত্রী ত্রিপুরার প্রথম মুখমন্ত্রী। চওড়া কপালটাকে আরও চওড়া করে দিয়ে চুলের ঢেউ পেছনে সরে গেছে, গভীর চোখ ত্বটিতে চশমার ডাক পড়েছে, বয়স ছাপ্পান্নয় ঠেকেছে,—শচীন্দ্রলাল এখন বাংলার প্রবীণ নায়কদের একজন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসে তবুও প্রথমেই তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল সেই দিন-গুলোর কথা আগরতলায় ছেলে

'কেনা' যখন কুমিল্লায় খবরের কাগজ বেচেন!

মহারাজার খাস দপ্তরের কর্মচারী দীনদয়াল সিংহের এই ছেলেটির নাম 'কেনা' হয়েছিল কারণ জন্ম তাঁর ত্রিপুরা রাজাদের বিখ্যাত 'কের' পুজোর দিনে। রাজবাড়ির অন্যতম অনুষ্ঠান 'কের' পুজো। নিয়ম আছে এ পুজোর সময়ে প্রাসাদের আশেপাশে —কোন রোগী বা আসন্নপ্রসবা নারী থাকতে পারবেনা। কারণ তাতে সিংহাসনের পক্ষে কল্যাণসূচক এই উৎসবের অপবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা। ঢেরা পিটিয়ে তাই প্রজাবর্গকে আগে থেকেই সাবধান করে দেওয়া হত।

সেবারও (১৯০৭) তার অন্যথা হয়নি। কিন্তু তবুও অঘটন ঘটে গেল। 'কের' উৎসবের মধ্যেই দীনদয়ালের ঘরে এল নবজাতক। রাজকোপ এড়াবার জন্যে সে খবর গোপন রাখা হল। অলুক্ষণে ছেলের নাম রাখা হল—'কেনা'।

সেই বালকই আজ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিজয়ী নায়ক—ত্রিপুরার বিখ্যাত 'শচীনদা', ভারতের নবজাত রাজ্যগুলোর অন্যতম ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ।

আগরতলার উমাকান্ত ইনষ্টিটিউ-সনে পড়া শেষ করে শচীন্দ্রলাল কুমিল্লায় গিয়েছিলেন কলেজে পড়তে। কিন্তু সে পড়া বেশিদুর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলনা। 'কেনা' নাম যাঁর—তাঁর আর কেনা-গোলাম হওয়ার জন্যে এত সাধনার কোন অর্থ হয় না! 'যুগান্তর' দলের বিদ্রোহের মন্ত্র কানে নিয়ে শচীন্দ্রলাল আবার আগরতলায় ফিরে এলেন। তারপর থেকে তিনি বরাবর ত্রিপুরার প্রজা সাধারণের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। অবশ্য জেলের সময়-টুকু বাদ দিলে।

সাকুল্যে চৌদ্দ বছর কারাগারে কাটিয়েছেন শচীন্দ্রলাল। প্রথম দফা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন উপলক্ষে। আগরতলা 'ভ্রাতৃসংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা এই যুবকটি যে আখড়ায় আখড়ায় কেন লাঠি খেলা আর ছোরা খেলা শিখিয়ে বেড়াচ্ছে মহারাজার তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। চট্টগ্রামের পরেই শচীন্দ্রলালকে তাই তিনি রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছিলেন। বিদ্রোহীর দায়িত্ব নিয়েছিল ইংরেজ সরকার।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে শচীন্দ্রলাল আবার বিদ্রোহী হলেন। তিনি 'ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদ' গড়লেন। এই পরিষদই পরবর্তীকালে (১৯৩৬) 'ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস'। দশ বছর

তার প্রধানের দায়িত্ব বহন করেছেন প্রতিষ্ঠাতা শচীন্দ্রলাল সিংহ। বলা-নিষ্প্রয়োজন সেটা সহজ কাজ ছিল না। বিশেষত, ত্রিপুরা ইংরাজাধীন ভারতের অংশ নয়, সেখানে মহারাজার ব্যক্তিগত ইচ্ছার শাসন। তিনি শচীন্দ্রলালকে আবার দেশান্তরী করলেন। এবার অপরাধ ছিল তাঁর ভূমি সংস্কারের আব্দার!

কারাগারও যে শচীন্দ্রলালের পক্ষে অসম্ভব স্থান নয় তা জানা গেল ১৯৪২ সনের আগস্ট আন্দোলনের উপলক্ষে। ত্রিপুরা রাজ্য পুলিশ বাহিনীতে সেবার বিদ্রোহ। তারা কিছুতেই ইংরেজের হয়ে লড়বেনা। মহারাজা ভেবে পাননা এ ঔদ্ধত্য তারা কোথায় পেল। অনেককে শাস্তি দেওয়া হল। কিন্তু বিদ্রোহীরা তবুও কিছুতেই বশ মানবে না। উদ্বিগ্ন মহারাজা কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হলেন। হাতড়াতে হাতড়াতে গুপ্তচরেরা এসে পৌঁছাল আগরতলা সেণ্ট্রল জেলের একটি নির্জন সেলে। সেখানে শচীন্দ্রলাল। জানা গেল,—জেলের পুলিশদের মারফত তিনিই এ আগুন ছড়িয়েছেন।

গড়ার কাজেও সমান নিষ্ঠাবান নায়ক শচীন্দ্রলাল। ১৯৫৩ সন থেকে তিনি চীফ কমিশনারের অন্যতম উপদেষ্টা হিসাবে ত্রিপুরাকে গড়ে তুলেছেন, '৫৭ সন থেকে প্রতিনিধি পরিষদে দলের চেয়ারম্যানের কাজ করে আসছেন। 'গ' থেকে ত্রিপুরা যে 'ক'-এ পরিণত হল তার পেছনে অন্যতম কারণ এই শচীন্দ্রলাল। স্বভাবতই দেশবাসীর প্রত্যাশা 'রাজমালা'র দেশ ত্রিপুরা এবার পুরো-পুরি প্রজার রাজ্য হবে। শচীন্দ্রলালের পক্ষে, যতদূর জানা যায়, সে বোধহয় দুরূহ কৃত্য নয়। কেননা, ১৯৪৭ সনে যাঁদের প্রাণপণ চেষ্টায় ত্রিপুরা আজ আয়ুবশাহী সাম্রাজ্যভুক্ত নয় তাঁদের অন্যতম এই শচীনদা। ৫. ৭. ৬৩

স্নকর্ণ, ডঃ

"আমি মার্কসবাদী। কিন্তু আমি ধর্ম ভালবাসী! আমি বৈজ্ঞানিক। কিন্তু শিল্পকলা আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমি শিল্পী। কখনও কখনও আমি অত্যন্ত সিয়েরিয়াস। কিন্তু আবার সময় সময় তেমনি পরিহাস তরল। আমি কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট—মুসলমান, খৃষ্টান সকলের সঙ্গে সমান-ভাবে মিশি। আমার কাছে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীরা যা, আপোস-পন্থী জাতীয়তাবাদীরাও তা। আমি সকলের।"

জওহরলালের কথা নয়। নিজের ছাপ্পান্নতম জন্মদিনে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুকর্ণের বাণী। ভারতে জওহরলাল যা, ইন্দোনেশিয়ার তিন হাজার দ্বীপে একশ চৌদ্দটি ভাষাভাষী সাড়ে আট কোটি মানুষের কাছে আটান্ন বছরের সুকর্ণও তা-ই হয়ত, তারও বেশি।

সুকর্ণের এই জনপ্রিয়তা আজকের নয়, অনেকদিনের। ছাব্বিশ বছর বয়স থেকে তিনি ইন্দোনেশিয়ায় সবচেয়ে জনপ্রিয়। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আরও অনেকেই তাঁর সামনে এসেছেন, এখনও কেউ কেউ সামনে আছেন, কিন্তু সুকর্ণ চিরকালের বিজয়ী।

তিনি বলেন: আমি ইন্দোনেশিয়া। আমার মুখ দিয়ে যে কথা বের হয়, জানবে তা ইন্দোনেশিয়ার জনগণের হৃদয়ের কথা (I am an extention of the people's tongue) আমি যদি বলি তবে ইন্দোনেশিয়ার মানুষ পাথর খাবে!

আশ্চর্য আত্মবিশ্বাস! সুকর্ণের বাবা ছিলেন জাভার স্কুল শিক্ষক। মা, বালির এক সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা। ফলে মুসলমান হয়েও সুকর্ণ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সম্পূর্ণ ওপরে। বান্দুং-এর ডাচ টেকনিক্যাল কলেজের বিদেশী শিক্ষকেরা জানতেন—তাঁদের প্রিয় ছাত্র সুকর্ণ হবে ইন্দোনেশিয়ার সেরা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু ডিগ্রীখানা হাতে পাওয়ার পর-ই দেখা গেল সুকর্ণ ডাচদের বিরুদ্ধে সেরা লড়িয়ে।

সুকর্ণের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। তিনি একটির পর একটি করে তিনটি বিয়ে করেছেন। সুকর্ণ বলেন সে আমার ইচ্ছা। আমার ব্যক্তিগত জীবন নিশ্চয়ই ইন্দোনেশিয়ার ভাবনা নয়।

কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার ভাবনায় সুকর্ণ আছেন। সাড়ে তিনশ বছর শাসনের পর ডাচরা বিদায় নেওয়ার দিন থেকে তিনিই যেন ইন্দোনেশিয়ার সহস্র সমস্যার একমাত্র নিরাময়। ইন্দোনেশিয়াকে পৃথিবীর বৃহত্তম মুশলিম রাষ্ট্রের গৌরব (!) থেকে রক্ষা করেছেন সুকর্ণ। কিছুকাল আগে 'গাইডেড ডেমোক্রেসির' প্রবর্তন করে সুকর্ণ গণতন্ত্রের কাছে ভর্ৎসনার কারণ হয়েছিলেন—এবার তিনি নেমেছেন স্বয়ং গাইডের ভূমিকায়।

২৪. ১২. ৫৯

সুকর্ণ সম্পর্কে আরও কিছু খবর :—

সুকর্ণ, প্রেসিডেন্ট

"I belong to that group of people who are bound in spiritual longing by the romanticism of revolution. I am inspired by it. I am fascinated by it, I am completely absorbed by it. I am crazed. I am obsessed…!"

ছাব্বিশ বছরের সেই দুর্দম জাতীয়তাবাদী নেতার মুখে উক্ত নয়, নিজের উনষাটতম জন্মদিনে প্রবীণ রাষ্ট্রনায়কের বাণী।

বয়স এবছর আরও একটু বেড়েছে। আমেদ ষাট-এ পড়েছেন। কিন্তু গেল ক'দিনে তিনি প্রমাণ করেছেন, করে চলেছেন যে ইন্দোনেশিয়ার 'বাং কার্নো' আজও তেমনি আছেন। তেমনি খরধার তাঁর জিহ্বা, তেমনি দুঃসাহসী তাঁর সাহস এবং তেমনি প্রসন্ন তাঁর 'ভাগ্য'।

বান্দুং ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের 'বেস্ট বয়' হয়েও সুকর্ণ ভাগ্য মানেন। তিনি বলেন—'আমি জন্মগ্রহণ করেছি মিথুন রাশিতে। সুতরাং, জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী আমার আয়ু সাধারণ মানুষের চেয়ে দ্বিগুণ হতে বাধ্য!' বস্তুত 'ভাই কর্ণ' যেন বেঁচেও আছেন কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে। কারাগার, দ্বীপান্তর দ্বীপে দ্বীপে বিদ্রোহ, প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ লক্ষ্য করে আকাশ থেকে মেশিনগানের গর্জন এবং যখন তখন যত্রতত্র বোমা বিস্ফোরণ। গেল সোমবার মাকাসার-এ যেটি ফেটেছিল সেটি নিয়ে উল্লেখযোগ্য এই তিনবার হল। সুকর্ণ তবুও মরেননি। না দেহে, না মনে। তাঁর প্রিয় জ্যোতিষী মাদাম সুপ্রাপতো বলেছিলেন—'এভাবে তাঁকে মারা যাবেনা, না দেহে, না মনে!'

ষাট বছরে চারটি বিয়ে করেছেন। অবশ্য দুবারই তালাক দেওয়ার পর। প্রথম স্ত্রী ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার জনৈক বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নায়কের কন্যা, দ্বিতীয়া জনৈকা বিধবা, তৃতীয়া কুমারী, চতুর্থ—স্বামীত্যক্তা। সাতটি সন্তানের পিতা সুকর্ণের তবুও হলিউডে গিয়ে আভা গার্ডনারের দেখা না পেলে প্রকাশ্যেই মন খারাপ হয়ে যায়, 'লেনিন প্রাইজ' পাওয়ার পরও রাশিয়া থেকে ফেরার পর সোবিয়েত বিমান পরিচারিকাটিকে ফেরত দিতে ভুলে যান এবং এমন পরিস্থিতিও নাকি হয় যখন নিনা ক্রুশ্চফ হাতে পায়ে ধরে কোন সোবিয়েত তরুণীকে ওঁর 'সৌহার্দ্য' গ্রহণে রাজী করত বাধ্য হন!

স্বদেশে এসব অভিযোগ যদি কখনও ওঠে সুকর্ণ সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব দেন—'সে আমার ব্যক্তিগত জীবন!'

রাজনৈতিক জীবনেও তিনি 'রিচার্ড দি লায়ন হার্টেড।' মুসলমানের ঘরের সন্তান। বাবা সুকেমি ছিলেন জাভার স্কুল শিক্ষক। কিন্তু মা বালীর মেয়ে, রামায়ণ মহাভারত তাঁর মুখস্থ। ফলে —বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের কর্ণধার হলেও সুকর্ণের রাজনৈতিক জীবনে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র নেই। ভারতের কংগ্রেসের আদর্শে দল করে-ছিলেন, আমেরিকার মত স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করেছেন, কমিউনিস্টদের সঙ্গে একসঙ্গে কারাজীবন যাপন করেছিলেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রাশিয়া দেখেছেন, রুশ টাকা নিয়েছেন। কিন্তু সুকর্ণের হৃদয়ে তবুও কোন মতের দিকেই কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। তিনি বলেন'—জনতাই আমার মত। যে পথে জনসাধারণ সে পথই আমার পথ। —আমি জনতার মুখ।' আর জনতা?

রকমারী দল আছে, বিস্তর সমস্যা আছে কিন্তু ডাচরা এখনও না জানলেও বহু বিপর্যয়ের পরেও ঐ চিরস্থায়ী অটল মুখটি দেখে বিশ্ব আজ নিশ্চিত জানে, ইন্দোনেশিয়ার তিন হাজার দ্বীপে ন' কোটি মানুষের হৃদয়ে ভাই কর্ণই এখনও ঈশ্বর!—তিনি যদি দশ দিনের সময় দিয়ে থাকেন ডাচদের, তবে ইন্দোনেশিয়ার তাই শেষ কথা! ১১. ১. ৬২

সুরাইয়া, রাণী

মাত্র এগার বছর আগের কথা। ১৯৫১ সনের ১১ই ফেব্রুয়ারী।

সেবারও তেত্রিশ পাউণ্ড ওজনের গহনা ছিল কনের গায়ে। একুশ তোপের সেলাম ছিল। কিন্তু বিবাহ বাসরে একমাত্র প্রার্থনা ছিল—"হে আল্লা, শাহকে তুমি উত্তরাধিকারী দিও!"

ময়ূর সিংহাসনে ময়ূরের মত কলাপ ছড়িয়ে আঠার বছরের মেয়েটি তবু হাসিমুখে বসেছিল। কেউ বলবে না একবার সে কেঁপেছিল।

খানদানী ঘরের কন্যা। ইরানের বিখ্যাত বখতিয়ারী বংশের মেয়ে। বাবা ইসফানদিয়ারী উচ্চ রাজকর্মচারী, জার্মানীতে ইরানী রাজদূত। তদুপরি রূপসী সুরাইয়া সুশিক্ষিতা আধুনিকা। জীবনের প্রথম ছ বছর কেটেছে তাঁর জার্মানীতে। তারপর ইরানের নানা অভিজাত বিদ্যালয়ে এবং শেষে

লণ্ডনের হাইড পার্কে। ফলে, তিনি ভিনদেশী বুলি বোঝেন, নাচতে জানেন, বাত্য জানেন, সমুদ্রে স্নান করতে জানেন, এমন কি ঘোড়ায় চড়া পর্যন্ত। তাছাড়া—এ বিবাহ দৈবক্রমে নয়, তার পাশেবসা বত্রিশ বছরের এই মানুষটিকে তিনি উপস্থিত অন্য যে কোন মানুষের চেয়ে ভাল জানেন!

স্বতরাং, মাত্র সাত বছর পরে ১৯৫৮ সনে শাহ যেদিন "সখেদে" তেহরানের প্রাসাদ থেকে স্বরাইয়াকে বিদায় জানান চোখে জল দেখা গেলেও স্বরাইয়ার মুখে সেদিন কোন খেদ শোনা যায়নি। কেননা, স্বেচ্ছায় রানীর মুকুট মাথায় তুলে নেওয়ার আগে তিনি জানতেন—তার মাত্র তিন বছর আগে (১৯৪৮) এমনি রিক্ত বেশে আরও একটি মেয়ে এই প্রাসাদ থেকেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। ফারুক ভগ্নী ফৈজিয়া তবুও একটি কন্যা সন্তান উপহার দিতে পেরেছিলেন!

স্বতরাং ১৯৫৯ সনের ডিসেম্বরে তেহরানে আবার যখন বিয়ের বাত্য বাজছে—ভবঘুরের বেশে ইরানের ভূতপূর্ব সম্রাজ্ঞী তখন ইউরোপের বালির চরে চরে গড়াগড়ি যাচ্ছেন! তাঁর মত রিক্ত সেদিন বোধ হয় ছুনিয়ার আর কেউ নেই! —হয় না।

কিন্তু তাই কি? দেখতে দেখতে বিশ্বময় সেদিন কতকগুলো টুকরো টুকরো ছবি আর কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। তার মর্ম: স্বরাইয়া অচিরেই নতুন করে ঘর বাঁধছেন। নতুন গৃহপতি হচ্ছেন হয় প্রথম চিত্রের তরুণটি, ইতালীর রাজপুত্র ওরসিনি; না হয়—জর্মান শিল্পপতি হ্যারল্ড হলবেক। ইরানের ভূতপূর্ব রানীকে নাকি স্বইজারল্যাণ্ডের হোটেলে কাফেতে ঘন ঘন তাঁরই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

এবার নতুন খবর। স্বরাইয়াকে ইদানীং দেখা যাচ্ছে বিখ্যাত জর্মান শিল্পপতি গান্থার শ্যাখস সাহেবের সঙ্গে। গুজব—প্রজাপতি নিবন্ধ এবার অখণ্ডনীয়।

হলবেক সেবার বলেছিলেন—"বাজে কথা। বিয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ পনের বছর রুশ কারাগারে বন্দী ছিলাম আমি। স্বতরাং বন্দীজীবন কাকে বলে আমি জানি।"

কে জানে হয়ত এবার স্বরাইয়াও তাই বলবেন। বন্দিজীবন তিনিও তো কিছু কিছু জানেন।

[দ্রষ্টব্য: পহলেভি মহম্মদ রেজা]

৬. ৯. ৬২

সুরাবর্দী, হাসান সহীদ

"So you have got detained in Calcutta and that to in a quarters which is a veritable shambles and notorious den of gangstars and hooligans. And what a choise company too! It is a terrible risk!"

ছোট্ট একটা চিঠি। তারিখ—১৩ই আগস্ট, ১৯৪৭। লেখক সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। যাকে লিখছেন তাঁর নাম—মহাত্মা গান্ধী। কলকাতার যে অঞ্চলটা সম্পর্কে সর্দারজীর কলমে এতগুলো বিশেষণ সেটি বেলেঘাটা। এবং যে ব্যক্তিটির সাহচর্য সম্পর্কে তিনি এমন খোলাখুলি—তিনি অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসহীদ সুরাবর্দী।

'৪৬-এর ১৬ই আগস্টের কলকাতা সুরাবর্দীকে নাম দিয়াছিল খুনী। সর্দার প্যাটেল-এর সন্দেহ এবং বিরক্তি সত্ত্বেও '৪৭-এর কলকাতায় এক ঘরে বাস করেছেন মহাত্মা গান্ধী এবং জনাব সুরাবর্দী। স্বভাবতই প্রত্যাশা ছিল অটোনোমাস স্বতন্ত্র বাংলা হাতে না পেলেও পশ্চিমবঙ্গের (মেদিনীপুর) সন্তান সুরাবর্দী সাহেব থিয়েটার রোডের চল্লিশ নম্বর বাড়ীটি ছাড়বেন না। কলকাতায় তাঁর বিস্তর পৈতৃক সম্পত্তি। দাদার নামে আস্ত একখানা রাস্তা এবং প্রভূত সুনাম। তদুপরি নানা মহলে পলিটিসিয়ান হিসাবে নিজের প্রতিষ্ঠিত খ্যাতি। তবুও '৪৯ সনে যে তিনি এদেশের মায়া কাটিয়ে ঢাকায় এডভোকেটগিরি শুরু করলেন—তার কারণ ইনকামট্যাক্স ডিপার্টমেণ্টের চাপ।

সুরাবর্দীকে ঢাকা কোলে তুলে নেয়নি সেদিন। করাচী প্রকাশ্যে তাঁকে আখ্যা দিয়েছে 'হিন্দুস্তানী চর'। সহীদ উত্তর দেননি। তিনি কাল গুনে চললেন। দেখতে দেখতে মুসলিম লীগ বুড়ো হয়ে গেল। চোখের সামনে খাড়া হয়ে উঠল আওয়ামী লীগ এবং সঙ্গে সঙ্গে করাচীর ফ্যাশানেবল এলাকা ক্লিফটন রোডে গড়ে উঠল সুরাবর্দী সাহেবের প্রাসাদোপম অট্টালিকা। বোঝা গেল রাজতন্ত্রের আশেপাশে স্থায়ীভাবে বাস করাই তাঁর ইচ্ছে। প্রেসিডেণ্ট ইস্কান্দর মীর্জা হলপ করলেন: আমি বেঁচে থাকতে সুরাবর্দীর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাহলেও দেখতে দেখতে '৫৬ সনে গদীতে বসলেন জনাব সুরাবর্দী। এবং পাকিস্তান একবাক্যে স্বীকার করল—এমন

প্রধানমন্ত্রী আর হয় না। ঠিক যেন নেহরুর দোসর।

অবশেষে আয়ুব খাঁ। ক্লিফটন স্ট্রীটের সেই বাড়ীটায় বসে রেকর্ড বাজাচ্ছিলেন আর কাল গুনছিলেন পদচ্যুত পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী। নিজে বলেছেন : 'ইস্কান্দর যদি জেনারেল হয় তবে আমি জেনারেলের বাবা।' মনে মনে তাঁর ধারণা ছিল ফিরোজশাহী রাজত্ব গেল বলে। কিন্তু তার বদলে আয়ুব শাহী রাজত্ব শুরু হয়ে যাবে এটা ছিল তাঁর ধারণারও অতীত। সুতরাং, ফৌজ দেখে প্রথমে তিনি পালাতে চাইলেন। ধরা পড়ে আবার বাড়ী। আবার সেই রেকর্ড বাজে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন—সুরাবর্দীর রেকর্ড সংগ্রহ অনবদ্য। অধিকাংশই বিদেশী নাচের রেকর্ড। বারশ' আমেরিকান। অক্সফোর্ডের ছাত্র সুরাবর্দী নাচ ভালবাসেন। তাঁর বাড়ীর ছাদটি একটি প্রথম শ্রেণীর নাচের ফ্লোর। বিপত্নীক সুরাবর্দী মদ খান না, সিগারেট ছোন না—কিন্তু মেয়েদের নিয়ে নাচতে ভালবাসেন। কখনও কখনও গোটা রাত কাবার হয়ে যায় তাতে। ফলে, দিবানিদ্রা তাঁর স্বভাব। একা মানুষ হলেও সুরাবর্দীর শোবার ঘরে ডবল খাট। একটায় থাকেন তিনি নিজে, অন্যটায় তাঁর গ্রামাফোন, টাইপরায়টার, টেলিফোন, খবরের কাগজ ইত্যাদি।

শোনা গিয়েছিল এশয্যায় শুয়ে ফিলিম ডাইরেক্টার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। এবার বোধহয় সত্যিই কাজে নামতে হয় তাঁকে। কেননা—আয়ুব খাঁর আদেশ হয় ছ' বছরের জন্য রাজনীতি ছাড় নয় কাঠগড়ায় এস। পাবলিকের কাঠগড়াটিও সযত্নে সারাজীবন এড়িয়ে চলেছেন সুরাবর্দী। এটা মিলিটারী কাঠগড়া। সুতরাং এবার চিত্র-পরিচালক ছাড়া গতি কি! ৫. ৩. ৬০

অন্য একটা ঘটনা উপলক্ষে আবার :

ভদ্রলোকের একটি গাড়ী ছিল। চমৎকার মার্সিডিস। উনসত্তর বছর বয়সেও টাইয়ের ফাঁস আলগা করে, জামার আস্তিন গুটিয়ে নিজের হাতে তিনি সেটা চালাতেন। পাড়ায় পাড়ায় হর্ণ বাজিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। হর্ণটার আওয়াজ ছিল ঠিক পটকার মত।

ভদ্রলোকের একটি বাড়ী ছিল। করাচীর অভিজাত পল্লীতে মস্ত বাড়ী। তার মোজাইক-করা ছাদে রাতে-বেরাতে বিলিতি বাদ্য বাজত, নাচ হত।

শোবার ঘরে হত আড্ডা। জোড়া খাটের একটিতে তিনি তাকিয়া হেলান দিয়ে বসতেন, অন্যটিকে টেবিল করতেন। চেয়ার টেনে বন্ধুরা সেখানে বসেই আড্ডা দিতেন, গান শুনতেন। দেশী-বিদেশী কয়েক হাজার গানের রেকর্ড ছিল তাঁর ঘরে।

সাইন বোর্ড দেখে পাড়ার লোকেরা জানেন—এ বাড়ীর মালিক যিনি নাম তাঁর জনাব এইচ. এস. সুরাবর্দী। কেউ কেউ এটাও জানেন একদা তিনি পাকিস্তান-এর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।—কিন্তু সেত কত জনই ছিলেন।

হয়ত কথাটা সত্য। কেননা, গেল চৌদ্দ বছরে কমপক্ষে সাতজন প্রধানমন্ত্রী দেখেছে পাকিস্তান। তদুপরি রকমারী গভর্নর জেনারেল, মেজর জেনারেল, ফিল্ড মার্শাল ইত্যাদি। কিন্তু আমরা জানি না, পাকিস্তানের তহবিলে এমন দ্বিতীয় কোন জীবনী আছে কিনা যেখানে নিম্নলিখিত ঘটনা ও তথ্যসমূহ পাওয়া যেতে পারে।

কলকাতা মাদ্রাসা এবং সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজের পড়া শেষ করে মেদিনীপুরের জনৈক মুসলিম শিল্প-পতির তনয় বিলেতে চলে গিয়েছিল। পাঁচ বছরে সে সেখানে যে ডিগ্রী-গুলো অর্জন করেছিল তার মধ্যে আছে অক্সফোর্ডের এম. এ. বি.এস.সি এবং বি. সি. এল। শেষোক্তটি গ্রে'স. ইন থেকে পরিশোধিত।

ফিরে আসার পরেই জনৈক তরুণ মুসলিম আইনজীবী হাসান শহীদ সুরাবর্দী সেদিন কলকাতায় যে আসনটিতে বিনা বাধায় বসেছিলেন সেটি কলকাতার ডেপুটি মেয়রের আসন। খবরটা উল্লেখ্য, কারণ কলকাতার মেয়র তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

'২১ সনে মুসলিম লীগে যোগ দেওয়ার পর এই হাসান সহীদ সুরাবর্দীই একমাত্র লীগসেবক যিনি ১৯৪৭ সন পর্যন্ত একাধিকক্রমে বাংলার আইনসভায় অনড় ছিলেন।

তিনিই আইনসভার একমাত্র সদস্য যিনি ১৯৩০ সন থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত একাধিকক্রমে বাংলা দেশে মন্ত্রীত্ব করে গেছেন। সেদিন যেসব দপ্তর তিনি চালিয়েছেন তার মধ্যে আছে—শ্রম, অর্থ, জনস্বাস্থ্য, স্বায়ত্ব-শাসন, খাদ্য এবং অবশেষে প্রধান-মন্ত্রীত্ব।

উল্লেখ্য, ১৩৫০ সনে বাংলা দেশে যখন মন্বন্তর—সুরাবর্দী তখন বাংলার

সুসলভ মিখাইল আন্দ্রেভিচ্

খাদ্যমন্ত্রী এবং ১৯৪৬ সনে ১৬ আগস্ট কলকাতা যখন নাদির শাহের দিল্লিতে পরিণত, অধুনা করাচীবাসী এই মানুষটিই তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী।

স্বাধীনতার পরে সুরাবর্দী আরও রহস্যঘন ব্যক্তিত্ব। সত্যিই তিনি বিচিত্র প্রকৃতির। এখানে তাঁর কৃতিত্বের তালিকায় আছে: কলকাতায় চার হাজার মানুষের মৃত্যুর পর গান্ধীজীর পার্শ্বচর হিসেবে শান্তি অভিযান, তিরিশ বছর ভারত বিভাগের জন্য অবিচ্ছিন্ন সাধনার পর অখণ্ড-বঙ্গ আন্দোলন, কোট-প্যাণ্ট ত্যাগ করে ধুতি-চাদরে পূর্ব বাংলার গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে আওয়ামী লীগ গঠন, পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতা দখল, পশ্চিমে পাঞ্জাবী-পাঠানের সঙ্গে টাগ অব ওয়ার,—মন্ত্রীত্ব, প্রধানমন্ত্রীত্ব, কারাবাস—এক কথায় এক জীবনে সম্ভব-অসম্ভব সব।

আয়ুব যখন এসেছিলেন ওঁরা তখন বলেছিলেন—সুরাবর্দী এবার অন্য কিছু করবেন। রটে গিয়েছিল—তিনি ফিল্ম তুলবেন।

শুনে অনেকে বিশ্বাসও করেছিলেন। কেননা, স্ত্রী নেই। একমাত্র ছেলে বিদেশে। সে অক্সফোর্ডে পড়ে। মেয়ে আক্তার সুলেমানের বিয়ে হয়ে গেছে অনেক দিন। তার মেয়ে আছে একটি। শাহিদা। গাড়ির মালিক তাকে নিয়েই পাড়ায় ঘোরেন। মদ নয়, সিগারেটটা পর্যন্ত নয়,—নাতনী ছাড়া কোন আকর্ষণ নেই তাঁর। লোকেরা তাই ভেবেছিল—হয়ত তাই সত্য, হয়ত সিনেমাকেই নতুন আকর্ষণ করলেন তিনি।

কিন্তু তাও কি কখনও হয়? সুরাবর্দী প্রমাণ করলেন জীবন যাঁর অঙ্কে অঙ্কে নতুন নাটক, সিনেমা বায়স্কোপ তাঁর জন্যে নয়।

১৫. ২. ৬২

সুসলভ, মিখাইল আন্দ্রেভিচ্

যখনই মুখ খোলেন তখনই খবর। যখনই কলম ধরেন তখনই চাঞ্চল্য।

১৯৪৮: সঙ্গে সেবার বাঘা বাঘা আরও দু'জন ছিলেন। ঝানফ এবং মেসেনকফ। কিন্তু কমিনফর্মের সেই সত্য শেষে রটে গিয়েছিল টিটোকে তিনিই তাড়ালেন। কারণ, শোনা যায় আসল খসড়াটা তিনিই লিখেছিলেন।

১৯৫০: একবছরের জন্যে 'প্রাভদা'য় প্রধান সম্পাদক করা হয়েছিল ওঁকে। সেবার নাম হয়ে গেল তাঁর—সম্পাদক-আতঙ্ক। কেননা, কালচার অ্যাণ্ড লাইফ' পত্রে রাশিয়ার সমুদয়

সম্পাদককুলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন তিনি। প্রশ্ন তুলেছিলেন —সম্পাদক সমীপেষু প্রেরিত চিঠি-গুলো মনোযোগ দিয়ে পড়া হয়না কেন—কেন ?—কেন ?

১৯৫২ : সেবার ওঁর যে রচনাটিকে কেন্দ্র করে বিশ্বে চাঞ্চল্য সেটি ছাপা হয়েছিল 'প্রাভদা'য়। তাতে বিখ্যাত রুশ অর্থনীতিবিদ ফেদসেফকে তাঁর ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন তিনি। উপলক্ষ্য ছিল একটি বইয়ের ভুল সমালোচনা। বইটির বিষয়বস্তু ছিল যুদ্ধোত্তর রুশ অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা। বাইরের জগতের পণ্ডিতেরা সেদিন সেই প্রবন্ধটি থেকেই জেনেছিলেন—ক্রেমলিনের হাল সুবিধের নয়।

১৯৫৬ : রুশ বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে সমবেত যুযুৎসবদের উদ্দেশে রাশিয়ার হয়ে তিনিই সেদিন বলেছিলেন—হাঙ্গেরীতে আমরা যা করেছি, তা ঠিকই করেছি। লোকে বলে বুদাপেস্টের পথে সেদিন রুশ সৈন্যরা যা করেছিল তা প্রকারান্তরে তারই রচনা। অনেকে তাই নাম দিয়েছে ওঁকে 'বুচার অব বুদাপেস্ট !'

১৯৫৯ : সেদিন তিনিই একমাত্র রাশিয়ান, ক্রুশ্চফের আমেরিকা সফরকে যিনি সেদিন প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলেন। বলেছিলেন—চতুরেরা জিতে গেল।

১৯৬২ : অবশেষে তাঁরই মুখে শোনা গেল কমিউনিজম এবং ক্যাপিট্যালইজমের সহাবস্থান অসম্ভব। ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, আদর্শ তথ্য মনোজগতে। কেননা, রুশ ছেলেমেয়েরা প্রভাবিত হচ্ছে—ওরা বখে যাচ্ছে।

নাম মিখাইল আন্দ্রেভিচ্ সুসলভ। বয়স—একষট্টি (জন্ম : ১৯০২)। হাল্কা অথচ বিরাট চেহারা, চোখে চশমা। কথায় বার্তায় রীতিমত লাজুক সুসলভই এখন মস্কোর সেরা তাত্ত্বিক।

পার্টিতে এসেছিলেন '২১ সনে উনিশ বছর বয়সে। কিন্তু এসেই সেই তরুণটি জানিয়েছিলেন তিনি থাকতে এসেছেন। অনেককাল সগৌরবে দল-বাস করতে।

সাত বছর ছিলেন স্টাভরপোল আঞ্চলিক কমিটির সেক্রেটারীর আসনে। তারপর '৪১ সনে—ধীরে ধীরে উদিত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় গগনে। কেননা যুদ্ধকালে ককেশাশের পর্বত-কন্দরে তিনি যে প্রতিরোধ রচনা করেছিলেন সেটা অবহেলা করার মত ছিল না। ওঁরা ওঁকে

লিথুয়ানিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। লোকে বলে, হাজার হাজার মানুষকে নির্বাসনে পাঠিয়ে সুসলভ সেখানেও পার্টিকে গৌরবমণ্ডিত করেছিলেন।

সুতরাং মস্কোয় ডাক পড়ল। তরুণ সুসলভ কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হলেন এবং তাঁরই উপর অর্পিত হল পার্টির প্রচার দপ্তরের ভার। সুসলভ সেই থেকেই ক্রেমলিনে সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব।

'৫২ সনে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়ামে স্থান হল তাঁর। সদস্য হিসেবে সুসলভ তখন সেখানে সর্ব কনিষ্ঠ। তৎসত্ত্বেও সুসলভ তখন—রুশ সরকারের প্রেসিডিয়ামেও সদস্য। সেখানে তিনি তখন মস্কো রাজ্যস্থ 'প্রাভদা'র ছাপাখানা কর্মীদের প্রতিনিধি।

স্তালিনের মৃত্যুর পরে হঠাৎ খাতির কমে গেল। কিন্তু সে কিছু দিনের জন্যেই। সুসলভ এখন আবার রুশ দেশে অন্যতম ক্ষমতাবান পুরুষ। আমেরিকার সেই পদগুলো ছাড়াও তিনি রাশিয়ার ফরেন এফেয়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান. পার্টির বৈদেশিক দপ্তরের কর্তা এবং তদুপরি সেই—সহকারী সম্পাদকগিরি।

তবে—এহো বাহ্য। আসল কথা যেখানেই পুঁথি পুস্তক, কাগজ কলমের ব্যাপার সেখানেই আজ সুসলভ। তা লি শাউ চি'র উত্তর দেওয়াই হোক, বেজওয়াদার খসড়া পড়াই হোক, স্তালিনের বইয়ের ভূমিকাই হোক, আর পলিসি ব্যাপারে স্বয়ং ক্রুশ্চফের রিপোর্টই হোক। উল্লেখযোগ্য, গেল বছরে মস্কো কংগ্রেসে যে ঐতিহাসিক কার্যসূচীটি গৃহীত হয় সুসলভই ছিলেন তাঁর প্রধান সম্পাদক। ৮. ২. ৬২

সেন, অশোক কুমার

'৫৬ সনের শীতকাল। তখন সন্ধ্যা। উত্তর কলকাতায় একটা পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিছিল দেখছিলাম। স্কুলের ছেলেতে তৈরী অগোছাল শোভাযাত্রা। মুখে—ভোট ফর···! ভোট ফর···!'

কে একজন হাতে একখানা কাগজ গুঁজে দিয়ে গেল। ল্যাম্প-পোস্ট-এর নীচে দাঁড়িয়ে খুললাম। তার শেষ দুটি লাইন—"সমাজ সেবার ইচ্ছা, শক্তি এবং পরিকল্পনা আর ক'জনের আছে? লোকসভায় তাঁকে নির্বাচিত করে আমরা নিজেদেরই শক্তিশালী করব, সর্বদা কাছে যাওয়া যায় এমন একজন বন্ধুকেই নির্বাচিত করব।"

সুতরাং—'ভোট কর…!' '—ভোট কর…।' এবার আর একটা লরী গেল।

ভারতের বর্তমান আইনমন্ত্রী তৎকালে দ্বিতীয়বারের মত লোক-সভায় কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীঅশোক সেনের সেই অষ্টপৃষ্ঠাব্যাপী (ডবল ডিমাই, পাইকা) সচিত্র জীবনীটি এখনও আমার কাছে আছে। কিন্তু সে কথাও পরে। তার আগে এবারও কিঞ্চিৎ পূর্বকথা।

অশোক সেন বাঙ্গালী। তাঁর জন্ম—বাংলাদেশে। তবে বঙ্গীয় কলিঙ্গে। অর্থাৎ—পূর্ববঙ্গে। শিক্ষা —ঢাকা, কলকাতা এবং লণ্ডনে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকনমিক্স্-এর এম-এ ('৩৫) অশোকবাবু লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্এর এম-এসসি ('৩৯) এবং গ্রেস ইন্-এর ব্যারিস্টার।

কর্মজীবন স্বরু হয়েছিল তাঁর অধ্যাপনা দিয়ে। সিটি কলেজে কমার্শিয়াল ল' পড়ানোর কাজ দিয়ে। ('৪৩) মাসে মাইনে ছিল একশ'। শেষ হল,—হাইকোর্টে ('৫৬)। বছরে এক লক্ষ টাকা আয়কর দিয়ে। হাইকোর্টে যোগ দেন তিনি '৪১ সনে, ত্যাগ করেন—'৫৬ সনে। স্বাধীন ব্যবসা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'জুনিয়ার স্ট্যাণ্ডিং কৌন্সিল' এবং 'ক্যালকাটা ল' জার্নাল-এর সম্পাদক হিসেবেও যথেষ্ট স্থনাম অর্জন করেন তিনি।

উত্তর কলিকাতায় যখন ওরা হ্যাণ্ডবিল বিলি করছে অশোক সেন তখন সুখ্যাত পুরুষ। মাস্টাররা বলেন—ওর মত ছাত্র হয়না। ছাত্ররা বলে—ওঁর মত মাস্টার হয়না, (সেন কৃত 'হ্যাণ্ড বুক অব কমার্সিয়াল ল' এখনও কলেজে কলেজে জনপ্রিয় বই) হাইকোর্ট বলে—ওঁর মত চৌকশ ব্যারিস্টার হয়না। এবং বোধ হয় দিল্লী বলে—বঙ্গদেশে ওঁর মত মন্ত্রী পাওয়া যায় না।

শ্রী সেনের বয়স পঞ্চাশের নীচে, (অর্থাৎ সেদিনের শ্যামাপ্রসাদের অনেক নীচে) স্বাস্থ্য বাল্যের মুগুর ভাঁজার ফলে (তিনি নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করতেন) মজবুত ভিতে এবং মতামত প্রগতির দিকে।

ঐ জীবনীটিতেই পড়েছি—অশোক সেন চৌদ্দ বছর বয়স থেকে—রাজনৈতিক। সেকালের অনেক বিপ্লবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁর।

লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্-এর সোস্যালিস্ট দল একদিন তরুণ ভারতীয় সেনকে তাঁদের সভাপতির আসনে বসিয়েছিলেন। ল্যাস্কি,

রেজিন্যাণ্ড সোরেন সেন এবং কৃষ্ণ-মেনন—তাঁকে আদর করে কাছে ডেকেছিলেন রাজনীতি ক্ষেত্রে আজ তাঁর নূতন ভূমিকা। কে জানে তা তাঁকে বাংলা দেশের হৃদয়ের আরও কাছে টেনে নিচ্ছে, না দূরে ঠেলে দিচ্ছে? ১১. ৮. ৬০

সেন, প্রফুল্লচন্দ্র

আরামবাগে আমি কখনও যাই-নি। খুলনার সেনহাটিতে যাওয়ার সৌভাগ্যও আমার হয়নি। কিন্তু রাজধানীর খবর জানি নির্দ্বিধায় তাই বলতে পারি এখানে, এই কলকাতা শহরে প্রতি পল্লীতে কম পক্ষে দশজন করে নানা বয়সের মানুষ আছেন, যাঁরা ওঁকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন, এবং সৌজন্য নয়, আন্তরিকভাবেই নিজেদের 'দাদা' বলে ডাকেন, বিশ্বাস করেন। জানিনা, অন্য কোন রাজ্যে, অন্য কোন 'মুখ্যমন্ত্রী' এত মুখে এ ডাক কখনও শুনেছেন কিনা, শোনেন কিনা। শুধু এইটুকুই জানি, রাজ-ধানীতে তিনি সূচনা থেকেই—'প্রফুল্লদা'!

আরামবাগে নাম ছিল তাঁর—'আরামবাগের গান্ধী'। অথচ আশ্চর্য এই, জন্ম তাঁর হুগলীর আরামবাগে নয়, সুদূর বিহারে শাহাবাদ জেলার একটি গাঁয়ে, ঘুরতে ঘুরতে সেখানেই এসে ১৮৯৭ সনের একদিন, এ বালকের জন্মদিনে ছাউনি ফেলেছিলেন খুলনার সেনহাটি গ্রামের বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার স্বর্গত নেপালচন্দ্র সেন। লেখাপড়াও ওঁর প্রধানত সেইদিকেই, বাংলার বাইরে। শাসারাম, বক্সার এবং অবশেষে দেওঘরের আর. কে. মিত্র ইনস্টিটিউসনে। প্রফুল্লচন্দ্র সেখান থেকেই এনট্রান্স পাশ করেছিলেন। ১৯১৮ সনে ফিজিক্সে অনার্স সহ বি. এস. সি ডিগ্রী নিয়েছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে।

ছাত্র ভাল ছিলেন,—সুতরাং কর্ম-জীবনে অনেক 'প্রত্যাশা' ছিল। সেই আশাতেই ইনকর্পোরেটেড একাউ-ণ্টেন্সির একটি ফার্মে শিক্ষানবীশ হয়ে ঢুকেছিলেন। মনে মনে আশা, অচিরেই বিলাত যাব। কেননা, বিধিব্যবস্থা সব সম্পূর্ণ। এমন কি পকেটে পাশপোর্টটি পর্যন্ত তৈরী। কিন্তু আশ্চর্য, তবুও যাওয়া হল না। কেননা, সেটা ১৯২১ সন, এবং দেশে আবির্ভূত হয়েছেন গান্ধী, তিনি তরুণদের ডাকছেন।

সুতরাং, পাশপোর্ট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভবিষ্যতের চার্টার্ড একাউন্টেণ্ট

'আরামবাগের গান্ধী' হলেন। তারকেশ্বরের বন্যায় সেবাকার্য করতে এসে সেই যে তিনি হুগলীতে এলেন আর ঘরে ফেরা হলনা তাঁর। তিনি আরামবাগেই রয়ে গেলেন।

দফায় দফায় জেলে যেতে হয়েছে, সাকুল্যে প্রায় সাড়ে এগার বছরই কাটাতে হয়েছে সেখানে, কিন্তু যখনই তিনি মুক্ত তখনই তিনি হুগলীতে। কখনও তিনি ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে স্বনামধন্য সমাজসেবী এবং চিকিৎসক ডাঃ আশুতোষ দাসের পার্শ্বচর, কখনও জাতীয় বিদ্যালয় 'হুগলী বিদ্যামন্দিরের' গুরুমশাই, শিক্ষক; কখনও তিনি বিখ্যাত 'সাগর কুঠি'র প্রতিষ্ঠাতা (এই বাড়ীটি ইংরেজরা থানায় রূপান্তরিত করে একদা ওঁকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন!) কখনও বা সেটেলমেণ্ট আন্দোলনের নায়ক। বাংলায় পুরানো নায়ক প্রফুল্লচন্দ্র। জেলা বা প্রাদেশিক কংগ্রেসের কথা অবান্তর। '৩০ সনে তিনিই ছিলেন বাংলার 'আইন পরিষদের' সভাপতি। সেনগুপ্ত, সতীশ দাশগুপ্ত এবং ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্তের পর চতুর্থ সভাপতি। গণপরিষদেও সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। তবে 'গান্ধী' হয়েছেন তিনি, বলা নিষ্প্রয়োজন, অন্য কারণে—চরিত্র বলে। শোনা যায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেদিনের মশার দেশ আরামবাগে রাত কাটাতেন গায়ে কেরোসিন তেল মেখে। কেননা, গরীবের গাঁ,—'গান্ধী' মশারি খাটাবেন কোন্ যুক্তিতে!

রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ১৯৪৮ সনের গোড়া থেকে গড়ে চৌদ্দ ঘণ্টার দিন কাটাচ্ছেন যে মানুষটি তাঁরও সে-ই একই রূপ। রাজধানীতে তিনি 'মন্ত্রী' নন,—'দাদা'। ঠিকানা তাঁর—রাজ ভবন। কিন্তু দুপুরে সেখানে ভোজের আসরে রাজ্যের যত 'প্রজা'! উনি অনেককে নিয়ে বসে খেতে ভালবাসেন।

বহুকাল 'খাদ্যমন্ত্রী' বলেই বলছি। পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন সত্যিই ভাত খান কম, প্রিয় খাদ্য তাঁর ক' টুকরো রুটি। তারপর মাংস হলে উত্তম, না হলেও ক্ষতি নেই। ফলের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় তাঁর আম।

এক কথায় অনেকের সঙ্গেই জীবনাচারে মিল নেই তাঁর। প্রফুল্লচন্দ্র সত্যিই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, ভিন্ন ধরণের পুরুষ। অনেকেই জানেনা খাদির আস্তরণের নীচে তাঁর বাঁ হাতটা ভাঙ্গা। কারণ জিজ্ঞেস করলে—

হেসে উত্তর দেবেন তিনি—'হকি'। যদি জিজ্ঞেস করেন—সবচেয়ে কোন্ বই পড়তে বেশী ভালবাসেন আপনি? বিজ্ঞানের ছাত্র অমনি উত্তর দেবেন—'দর্শন! —তারপরই স্ট্যাটিষ্টিকস্!' যদি জানতে চান বাংলার পর কোন্ ভাষা সবচেয়ে ভাল বলতে পারেন আপনি? উত্তর পাবেন—'হিন্দি!'

৫. ৭. ৬২

সেন, বিনয়রঞ্জন

সভাস্থল ছিল—রোম। শ্রোতার আসনে ছিল পৃথিবীর সাতাত্তরটি দেশ। প্রধান অতিথি হিসাবে সেদিন উপস্থিত ছিলেন দু'জন। একজন তাঁদের অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত যাজক স্বর্গত ম্যালথাস, অন্যজন এই শতকের অন্যতম জ্ঞানী আর্নল্ড টয়েনবি। ম্যালথাসের কথাটাকেই ঘুরিয়ে বললেন টয়েনবি: 'আজ হোক, কাল হোক আমাদের খাদ্য উৎপাদন প্রচেষ্টা একদিন চরম সীমায় পৌঁছাবে। এবং মানুষ যদি আজকের হারে বেড়েই চলে, তবে দুর্ভিক্ষ মহামারী এবং যুদ্ধ একযোগে যা একদিন করেছে, সেদিন একা মন্বন্তরকে তাই করতে হবে।' সাতাত্তরটা দেশ একসঙ্গে হাততালি দিয়ে সমর্থন জানালেন তাঁকে।

সে শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতে শোনা গেল কে একজন বলছেন—'আমি বিশ্বাস করি না একথা। আমি বিশ্বাস করি না মন্বন্তর পৃথিবীর মানুষের অনিবার্য ভবিষ্যৎ। আমাদের সামনে বোধ হয় এখনও অনেক পথ রয়েছে।'

যিনি সাতাত্তরটি দেশকে চমকিত করে নিশ্চিত গলায় এমন একটি আশাবাদী বাক্য উচ্চারণ করলেন তিনি মেদিনীপুরের একজন ভূতপূর্ব জেলাশাসক। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সেই বিরাট বাড়ীটায় সেদিন তিনি যে আসনটি থেকে কথাগুলো বলছিলেন সেটি সকলের ওপরে। তিনি '৫৬ সনের পর দ্বিতীয় দফায় নির্বাচিত এফ. এ. ও-র ডাইরেক্টার জেনারেল। নাম—শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন। ডাইরেক্টার জেনারেল ঘোষণা করলেন—'আজ থেকে ক্ষুধার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম। কতদিন লাগবে বলতে পারি না, কিন্তু একদিন যে আমরা বিজয়ী হব এবিষয়ে আমি নিশ্চিত। আসুন, আর কালক্ষেপ না করে আমরা যুদ্ধে নেমে পড়ি।'

পৃথিবীকে নিয়ে যুদ্ধে নেমেছেন ভারতের সন্তান শ্রীবিনয়রঞ্জন। ডাঃ কে. এম. সেনের পুত্র বিনয়রঞ্জনের

জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না। কলিকাতা এবং অক্সফোর্ডে পড়া তিনি সেকেলে আই. সি. এস। স্বভাবতই চাকুরী জীবনেও প্রথম থেকেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে। তবুও ক্ষুধা এবং তার কারণ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যত প্রত্যক্ষ তেমন বোধ হয় 'ফাও'-এর ঐ বাড়ীটায় আর কারও নয়। কেননা, বিনয়রঞ্জন বাংলাদেশের মানুষ। এবং তাঁর কর্মজীবনের পনের আনাই কেটেছে ভারতে। তাও প্রধানত ভারতের সমস্যাবহুল খাদ্যদপ্তরে। '৩১ সনে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল বাংলা সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারীর পদে। এবিভাগ সে বিভাগ ছাড়াও কিছুদিন ('৩৭—'৪০) তিনি মেদিনীপুরে জেলা শাসকের কাজ করেছেন। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় বাংলার রিলিফ কমিশনারও করা হয়েছিল তাঁকে। অবশেষে '৪৩ সনে কেন্দ্রীয় দপ্তরে ডাক পড়ল তাঁর। শ্রীযুক্ত সেন ভারতের খাদ্য বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল নিযুক্ত হলেন। '৪৬ সনে তাঁকে করা হয়—কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তরের সেক্রেটারী। এর পর ভারত স্বাধীন হল এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীসেনের দায়িত্ব দপ্তরান্তরিত হল। '৫০ সন অবধি তাঁকে কাটাতে হল ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাসের মন্ত্রী হিসেবে, পরের বছর ইটালী এবং যুগোশ্লাভিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত, তার পরের বছর কিছুদিনের ('৫১—৫২) জন্যে আবার আমেরিকায় রাষ্ট্রদূত। ক'বছর পরে ('৫৫—'৫৬) জাপানে। এ-ছাড়াও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে(নিরাপত্তা পরিষদ সহ) ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে—শ্রীসেন বাইরের পৃথিবীতে 'ডিপ্লোম্যাট' হিসাবেই খ্যাত। কিন্তু '৫৬ সন থেকে 'ফাও'-এর ডাইরেক্টর জেনারেলের অন্য পরিচয়গুলো যে মামুলী নয় তাঁর পুনর্নির্বাচনে তাই প্রমাণিত হল। ৩০. ৪. ৬০

সেনানায়ক, ডাডলে সেলটন

রাজার ছেলে রাজা হয়। তাই বলে, মন্ত্রীর ছেলে মন্ত্রী? সেকালে হয়ত তাও হত। কিন্তু একালে এমন পিতৃভাগ্য পুত্র সত্যিই দুর্লভ। সিংহলের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শ্রী ডাডলে সেনানায়ক সেদিক থেকে দুর্লভতম। কেননা, তিনি প্রধানমন্ত্রীর পুত্র প্রধানমন্ত্রী।

সিংহলের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী স্যর ডন ষ্টিফেন সেনানায়ক ছিলেন বনেদী রাজনীতিক। সম্পন্নও। পুত্র

ডাডলেকে তাই রাজনীতিতে নামাবার আগে তিনি 'কোয়ালিফায়েড' করিয়ে এনেছিলেন বিলেত পাঠিয়ে। ডাডলে কেম্ব্রিজের ছাত্র এবং মিডল টেম্পল-এর ব্যারিস্টার। স্বদেশে ব্যারিস্টার হিসাবেই তাঁর আদি খ্যাতি। অতঃপর স্বায়ত্তশাসন অধিকারের সুযোগে প্রথমে '৩৬ সনে রাজ্য কাউন্সিল এবং '৪৭ সনে কেন্দ্রীয় পরিষদ তথা মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রী তখন—পিতা। পুত্র কৃষি এবং ভূমিমন্ত্রী। ডাডলে নিজেও প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন আর একবার। সে '৫২ সনের কথা। একটা বছর নিরাপদেই কাটল। '৫৪ সনের নির্বাচনে লঙ্কাকাণ্ড হয়ে গেল সিংহলে। ইউ-নাইটেড ন্যাশনাল পার্টি তলিয়ে গেল। আসরে দেখা দিলেন নতুন নায়ক। সলোমন বন্দেরনায়ক।

বন্দেরনায়কহীন লঙ্কাদ্বীপে এবার আবার ফিরে এসেছে ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি এবং তৎসহ শ্রী ডাডলে সেলটন সেনানায়ক এবং দক্ষিণপন্থা। মধ্যপন্থার পথিক ভারতের পক্ষে সংবাদটা উদ্বেগজনক না হলেও বোধ হয় উৎফুল্লকর নয়। কেননা, সিংহলে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ ভারতীয় এবং তাদের মত তাদের মাতৃভাষা তামিল সম্পর্কে শ্রী ডাডলে স্পষ্টতই তত উদার নন।

উপসংহারে সিংহলের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী। ডন সেনানায়কের পুত্র প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। জেনে রাখুন, ডাডলের উত্তর-পুরুষদের ভাগ্যে এ সম্মান এখানেই শেষ।—কেন? কারণ, উনপঞ্চাশ বছর বয়স্ক শ্রী ডাডলে সেনানায়ক এখনও অকৃতদার। এবং তাঁর বন্ধুরা বলেন, ভবিষ্যতেও তিনি তাই থাকতে বদ্ধপরিকর! ২৬. ৩. ৬০

[১৯৬৫ সনের···মার্চের নির্বাচনে সিংহলে শ্রীমতী বন্দরনায়েকের দল পরাজিত হন এবং সেনানায়ক আবার ক্ষমতায় ফিরে আসেন।]

সোমান, বি. এস.
(ভাইস-এডমিরাল)

সে প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। সিন্ধিয়ারের একটি জাহাজ নোঙর করেছে রেঙ্গুনে। খোলে মাল উঠছে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে একটি তরুণ নাবিক তারই তদারকী করছে। হঠাৎ শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে ষণ্ডামার্কা যেটি সে আব্দার ধরে বসল—"সাহেব আমি বিড়ি খাব।—সাহেব!"

'সাহেব' ওরফে ভারতীয় নাবিক বেচারা মহা বিপদে পড়ে গেলেন। বিদেশ বিভূঁয়ে তিনি এই প্রথম কিনা! তদুপরি মনে মনে তুলনা করে দেখা গেল—দানবের মত ঐ বার্মিজ শ্রমিকের সামনে হ্যাটে-কোটে তাঁর এই পাঁচ ফুট শরীরটা একটা কাঠের বাক্সের মতও হবেনা। অথচ এটাও ঠিক লোকটা যা গোঁ ধরেছে সে আইনভঙ্গ না করে ছাড়বে না! সুতরাং উপায়?

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলেন নাবিকটি। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে সেই শ্রমিকটিকেই কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কাছে দেশলাই আছে কি? যেন থাকলে দু'জনে এক সঙ্গেই জাহাজের খোলে ধূমপান করবেন। সরল বিশ্বাসে বেচারা দেশলাইটি বের করে দিল, সঙ্গে সঙ্গে 'সাহেব' উধাও। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে তিনি আবার ডেকের ওপরে। নীচে ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝে ওরা হেসেই অস্থির, এবার আর কারও গোঁ নেই!

সেই তরুণ নাবিকটিই আজ ভারতের প্রধান নৌ-সেনাপতি।

পদোন্নতি সম্প্রতি হয়েছে বটে, কিন্তু বিশেষ করে, ভাস্কর সদাশিব সোমান নামে মানুষটি চিরকালই তীক্ষ্ণধী, চিরকালই—হাস্যরসিক।

বিখ্যাত হয়েছেন ডিসেম্বরের সেই রোববারে রাতে যেদিন মালাবার উপকূলের দায়িত্ব ছিল 'আই-এন-এস-মহীশূর' নামে জাহাজটির ডেকে দণ্ডায়মান এই অকুতোভয় নাবিকটির হাতে। পরদিন সকালে অঞ্জদ্বীপে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে গোটা ভারত জেনেছিল—যে 'মহীশূর' 'আলবু-কার্ক'কে ঘায়েল করেছে, যে 'মহীশূর' অঞ্জদ্বীপে ভারতের পতাকা উত্তোলন করেছে তার পরিচালক ছিলেন যিনি নাম তাঁর রিয়াল-অ্যাডমিরাল সোমান।

দক্ষিণের সন্তান। নৌ-বাহিনীতে আছেন ১৯৩২ সন থেকে, তখন তিনি বিখ্যাত 'ডাফরিনের' ডেকে ডেকে হাত পাকিয়েছেন বিলেতে। তবে 'ক্যাপ্টেন' হয়েছেন অনেক পরে, স্বাধীনতার বছরে। তারপর নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে অনেকদিন নৌ-বাহিনীর সদর দপ্তরে কাটিয়ে '৪৯ সনে সোমান আবার ফিরে এসেছিলেন জলে। তিনি তখন 'আই এন এস-যমুনা'র কমাণ্ডিং অফিসার। গোয়ার সময়ে কমাডোর-ইন-চার্জ কোচিন এবং বোম্বাই।

সৌভন্না ফুমা, প্রিন্স

১৯৫৮ সন থেকে রিয়ার-অ্যাড-মিরাল, গোয়ার বীর সেনানী সোমান এবার সৈনিকের জীবনের শ্রেষ্ঠতম পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন, তিনি এখন—'ভারতের চীফ অব নেভেল স্টাফ।'

কিন্তু জিজ্ঞেস করলে এখনও তিনি হেসে উত্তর দেন,—জীবনে তাঁর সবচেয়ে বড় কামনার ধন—দরিয়া, জল।—তবে সেই জলের নামটি কিন্তু 'মাতৃভূমি' হওয়া চাই!

৭. ৬. ৬২

সৌভন্না ফুমা, প্রিন্স

. লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার কথা। দেবরাজ এক দূত পাঠিয়েছিলেন সেই দেশে। হাতে ছিল তাঁর অদ্ভুত গড়নের একটি কুমড়ো। টকটকে লাল একটি গরম শলা দিয়ে সেই কুমড়ো ভাঙা হল। তাতেই এই জাতিটি জন্মাল।

অদ্ভুত জাতি। অদ্ভুত দেশ। নাম—লাওস। ইদানীংকার পরিচয়—'ল্যাণ্ড অব কেওস!'

ছোট দেশ। আয়তন ইংলণ্ডের মত (৯০ হাজার বর্গমাইল)। আকৃতি—ম্যাপের ওপর দেখতে অনেকটা সাবেকি ধরনের পিস্তলের মত। আর লোকসংখ্যা? সঠিক কত কেউ জানে না (অনুমান ২০ লক্ষ)। কেননা, যদিও ফরাসীরা ওদেশে রাজত্ব করে গেছে একষট্টি বছর, তবুও মাথাগুনতির জন্যে সময় পায়নি একটি দিন! স্বভাবতই স্কুল কলেজ খোলার প্রশ্নই ওঠে না। শোনা যায়, প্রথম পঞ্চাশ বছরের রাজত্বে ওঁরা গ্রাজুয়েট বানিয়েছিলেন মাত্র একষট্টি জন। সুতরাং যদিও দু'পা চলতে না চলতে পাহাড় এসে সামনে দাঁড়ায়, তবুও এখনও নাকি শতকরা নব্বুই জন লাওসবাসীর বিশ্বাস পৃথিবীটা গোল নয়, সমান;—এবং গোটা দুনিয়াটাই লাওসীয়ানে ভর্তি!

শুধু অশিক্ষা আর অসুখের দেশ নয়, গরীবের দেশ। সম্পদের মধ্যে কিছু টিন, বেঞ্জিন আর আফিম। বলতে গেলে লাওস-এর বহির্বাণিজ্যে শেষেরটিই সব। তবে গেল বছর সবচেয়ে বেশি আয় করেছে যা সে—লাওস-এর খবর, নিউজ। শোনা যায়, গেল বছর এ বাবদে প্রায় তিন লক্ষ ডলার উপার্জন করেছে লাওস-এর তার-ঘর!

গরীবের দেশ। খবর বেচে খায়। ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করে খবর

বানায়। কিন্তু আশ্চর্য এই, সে খবরের শীর্ষে শীর্ষে যুবরাজ—প্রিন্স। কেননা, লাওস শত শত বছরের পুরানো রাজতন্ত্রের দেশ। এবং এই সেদিন অবধিও ওদেশের রাজারা ছিলেন বিশ্বখ্যাত বহুচারী! স্বভাবতই লাওসের ঘরে ঘরে আজ অগণিত যুবরাজ, প্রিন্স। কেউ তাদের আজ দৌবারিক, কেউ গবর্ণর, কেউ কেরানী, কেউ বা আবার সত্যিই প্রিন্স।

অন্ততঃ, 'কেওস'-এর লাওস-এ অন্যতম শীর্ষ সংবাদ প্রিন্স সৌভন্না ফুমা একদিন তাই ছিলেন।

ঠিক রাজপ্রাসাদে না হলেও জন্ম রাজ পরিবারে। রাজার নিকট-আত্মীয়। বাবাও এক ধরনের রাজা, সামন্ত।

সুতরাং, টাকার অভাব হল না। এবং সৌভাগ্যবশতঃ উদ্যোগীও পাওয়া গেল। ফরাসীদের পরামর্শে সৌভন্না (Souvanna) আর সৌফানুভং (Souphanouvong) দুই ভাইকে একসঙ্গে প্যারিসে পাঠিয়ে দিলেন বাবা। উদ্দেশ্য: আধুনিকতা অর্জন।

যথাসময়ে দুই তরুণ প্যারিসে এলেন। দুই বৈমাত্রেয় ভাই। বয়সেও দু' জনের মধ্যে অনেক তফাৎ। (একজন এখন উনষাট, অন্যজন আটচল্লিশ), কিন্তু দু' জনের মধ্যে ভীষণ মিল। সুতরাং ভর্তিও হলেন দু'জন একই ক্লাসে, সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ।

ফিরে আসার পর দেখা গেল ভাল নম্বর পেয়ে ওঁরা পাকা ইঞ্জিনীয়ার হয়ে এসেছেন বটে, কিন্তু কারও মতিই যেন সেদিকে নয়। দু'জনেরই নেশা যেন অন্য কিছু,—রাজনীতি।

বড় ভাই সৌভন্না রাজধানীবাসী হলেন। তিনি রাজকর্মচারী। তবে কাজের চেয়ে তাঁর বেশি সময় যায় চিন্তায়। ফরাসী দেশ থেকে শিখে আসা স্বাধীনতার ভাবনায়।

এই ভাবনাতেই একদিন (১৯৪০) যুবরাজ সৌভন্না ফুমা স্বদেশে গড়ে তুললেন বিখ্যাত 'লাওইসারাক আন্দোলন'। তিনি দেশকে ফরাসী কবল থেকে মুক্ত করতে চান। ভাই সৌফানুভং তাঁর অন্যতম সমর্থক,—সহচর।

যুদ্ধে জাপানীদের হাতে চলে গেল ফরাসীদের লাওস। নতুন 'জাতীয় মন্ত্রিসভা' গড়ে উঠল সৌভন্নার নেতৃত্বে। কিন্তু সে মাত্র কিছু দিনের জন্য।

'৪৬ সনে আবার ফিরে এল

স্বট, রেঃ মাইকেল

ফরাসীরা। সৌভন্না দেশত্যাগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাইও। এবার তাঁদের কর্মক্ষেত্র—কম্বোডিয়া।

'৪৯ সনে স্বাধীনতা ঘোষণার পর স্বদেশে ফিরে এলেন বড় ভাই সৌভন্না। কিন্তু অনুচরদের নিয়ে পেছনে রয়ে গেলেন কনিষ্ঠ সৌফানুভং। তিনি আজও অন্য পথের পথিক।

পথিক সেজেছেন সৌভন্নাও। ঘটনা বিপর্যয়ে লাওস-এর প্রধানমন্ত্রী আজ আবার দেশত্যাগী। আবার তিনি কম্বোডিয়ার অতিথি। কেননা, তাঁর দেশ আজ ফরাসী মুক্ত হয়েও নানা ষড়যন্ত্র কবলিত। যন্ত্রণা ক্রমেই আরও তীব্র, কারণ রাজ্যহারা হলেও সৌভন্না এখনও মধ্যপথের পথিক। তিনি এখনও—নিরপেক্ষ!

নিরপেক্ষ দেশের রাষ্ট্রনায়ক সৌভন্না নিরপেক্ষ দেশ ভারতে এসেছেন। বলা বাহুল্য, শুধু '৫৪ সনের সেই জেনেভা সম্মেলনে অংশীদার হিসেবেই নয়, সহযোগী এবং প্রতিবেশী হিসেবেও তাঁর প্রতি ভারতের কর্তব্য অনেক। ২৩. ৩. ৬১

স্কট, রেঃ মাইকেল

পাশপোর্ট আর ভিসা নিয়ে এত ঝামেলা বোধহয় আর কেউ কোনদিন পোহান নি। সুদূর ১৯৪৭ সনের কথা। সেবার দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকার কিছুতেই ওঁকে দেশের বাইরে যেতে দেবেন না। ডঃ মালান রাজি হলেন তো আমেরিকা নারাজ। ওঁরা এহেন মানুষকে সজ্ঞানে নিজেদের দেশে ঢুকতে দিতে পারেন না। শেষে আসরে নামলেন ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় দূতাবাস। তাঁরা ধরে পড়লেন। সগর্বে জানালেন—বিদেশী এবং বাস দক্ষিণ-আফ্রিকায় বটে, কিন্তু—উনি আমাদেরই লোক! সুতরাং আর উপায় কি? ভিসা মঞ্জুর হল—তিনি 'য়ুনো'য় অবতীর্ণ হলেন।

পরের বছর আবার ঝামেলা। মালান সরকার সেবার আরও কড়া। সুতরাং সেবার আর পাশপোর্ট হল-না। তিনি গোপনে রোডেসিয়ায় পালিয়ে গেলেন। সেখান থেকে নিউ-ইয়র্ক, লেক সাকসেস, হেগ,—'য়ুনো', ইণ্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস। দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকার ঘোষণা করলেন—তিনি 'প্রহিবিটেড ইনহেবি-ট্যান্ট'—দেশে ফেরার আর কোন অধিকার নেই তাঁর। সুতরাং, এবার তিনি এসে অবতরণ করলেন নিয়াসা-ল্যাণ্ড। তখন সেণ্ট্রাল আফ্রিকা ফেডারেশন গড়ার তোড়জোড় চলছে

সেখানে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাতে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন। কেননা, তাঁর মনে হচ্ছে ফেডারেশন অশুভ, অন্যায়। সুতরাং বাধ্য হয়ে বৃটিশ সরকারকেও আপন দেশওয়ালার ভিসায় হাত দিতে হল। তাঁরা ওঁকে পাকড়াও করে তৎক্ষণাৎ দেশে পাঠিয়ে দিলেন। চতুর্দিকে বিস্তর হট্টগোল হল, কিন্তু কলোনিয়াল কর্তৃপক্ষ তা কানে তুললেন না। কিছুতেই তাঁরা রক্ত আর রাজত্ব এক বস্তু বলে মানতে রাজী হলেন না।

এসব ১৯৫৩ সনের মে মাসের কথা। রেভারেণ্ড মাইকেল স্কট সেই থেকে স্বদেশেই আছেন। তাঁর স্থায়ী ঠিকানা: আফ্রিকান ব্যুরো, লণ্ডন। কিন্তু আশ্চর্য এই, পাদ্রী সাহেবের পাশপোর্ট আর ভিসার ঝামেলা তবুও কিন্তু কিছুতেই কমছে না। তার পেছনে একমাত্র কারণ শুধু নিজের নয়, ইদানীং তিনি অন্যদের পাশপোর্ট নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছেন!

প্রথম ছিল—পলাতক ফিজো। তারপর তস্য অনুচরবর্গ। তাদের হিল্লে হয়ে যাওয়ার পর রেঃ স্কট এবার আবার নিজেই এসেছেন ভারতে। ক'মাস আগেও এসেছিলেন একবার দয়াল-পিতার বেশে ফিজোর জন্যে 'সসম্মান অনুকম্পা' ভিক্ষা করতে। সঙ্গে ছিল তাঁর ফিজোর পত্র। এবার শুধু চিঠি নয়, সেইসঙ্গে মান্য যাজক মাথায় নিয়ে এসেছেন আরও বহুতর মতলব। তার মধ্যে ১নং,—তিনি ভারত আর চীনের বিবাদটা মিটিয়ে ফেলতে চান। রঙবেরঙের আরও দ্বাদশ সঙ্গী নিয়ে তিনি পিকিং যেতে চান! তবে চার হাজার মাইলের সেই পায়ে হাঁটার পথটা নাগা-ভূমির ভেতর দিয়ে যাওয়া চাই!

স্বভাবতই এবার অনেক ছাড়-পত্রের প্রশ্ন। প্রথমত, নাগাভূমি তথা ভারত সরকারের অনুমতিপত্র, দ্বিতীয়ত ব্রহ্ম সরকার, তৃতীয়ত,—পিকিংয়ের বর্তমান 'সম্রাটগণ'। তাঁরা যে সুং-মিং আমলের সম্রাটদের মত তীর্থযাত্রীদের সম্পর্কে আর তত উৎসাহী নন সেকথা ইতিমধ্যেই খোলাখুলিভাবে রটিয়ে দিয়েছেন। এখন ভারত আর ব্রহ্ম কী করে তাই দেখবার বিষয়। কেননা, রেভারেণ্ড স্কটকে চেনেন না—এমন কোন সরকার আজ কোথাও থাকবার কথা নয়। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ—যেখানেই তিনি, সেখানেই নতুন কোন সমস্যা।

ছ'ফুট দু'ইঞ্চি উঁচু বিশাল দেহ।

স্টিভেনসন, এডলাই

একমাথা বাদামী চুল, ধূসর চোখ। স্কট আজ ছাপ্পান্নয় পড়েছেন। কিন্তু যৌবন থেকেই তিনি জটিল মানুষ। ঠাকুর্দা যাজক ছিলেন, বাবা যাজক, ভাইয়েরাও তা-ই। কিন্তু যাজকের ঘরের ছেলে রেঃ স্কট একটু অন্য ধরনের ধর্মীয় পুরুষ। কলকাতার সেণ্ট পলস-এ চ্যাপলিন হয়ে এসে (১৯৩৭) তিনি গান্ধী ভক্ত হয়েছিলেন, আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে তৎকালে তিনি স্বদেশের সঙ্গে বাক্-যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধের সময়ে তিনি যাজক হয়েও বিমানবাহিনীতে নাম লিখিয়েছিলেন। আফ্রিকায় তিনি জেল খেটেছেন, দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে 'য়ুনো'য় চমকপ্রদ লড়াই করেছেন, লেখা ছড়িয়েছেন এবং কী নয়! হালে চীন আক্রমণ শুরু হওয়ার আগে তাঁর জেহাদ চলছিল বিশ্বের দুইপ্রান্তের দুই সরকারের বিরুদ্ধে। প্রথম শত্রু তাঁর ম্যাকমিলান সরকার। কেননা ওঁরা কিছুতেই বোমাগুলো নিষিদ্ধ করছিলেন না। ফলে স্কট রাসেলের সঙ্গে হাত মিলিয় 'ব্যান দি বম্' আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দ্বিতীয় শত্রু ভারত সরকার। কারণ, তাঁরাও কিছুতেই বেচারা ফিজোকে 'স্বাধীনতা' দিচ্ছিলেন না!

ম্যাকমিলান সরকার ওকে সেদিন চিহ্নিত করেছিলেন। লর্ড রাসেলের সঙ্গে মান্য পাত্রী রেঃ স্কটকে সেদিন তাঁরা কারাগারে পাঠিয়ে ছিলেন।—আমরা পুরানো ভারত-প্রেমিককে দেশে ফিরে যেতে অনুরোধ করতে পারি বোধহয়! অবশ্য তা হলেই যে তিনি নাগাভূমি বা পিকি গমনের বাসনা ত্যাগ করবেন এমন কথা জোর করে বলা যায় না। হয়ত অন্য কোন পথে আবার তিনি উদিত হবেন। কেননা, আত্মজীবনীতে দেখছি তাঁর সেরা নেশা—পায়ে হাঁটা আর সাঁতার কাটা। এবং কে না জানে কোন কোন সাঁতারু শুধু উল্টো দিকে থেকে সাঁতার কাটতে পারবেন বলেই অশান্ত জল খুঁজে বেড়ান!

৭. ৩. ৬৩

স্টিভেনসন, এডলাই

"QUIET, attractive, books, chess, kitchen, conginial Stevensonian atmosphere. $50 monthly. Write—Box…'

আফ্রিকা বা এশিয়ার কোন কাগজের বিজ্ঞাপন নয়, 'স্টিভেন-সোনিয়ান বাড়ি' ভাড়ার এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর নিজের

দেশেই। এবং খুব বেশী দিন আগে নয়, কেনেডির নির্বাচন সময়ে।

ডেমোক্র্যাটরা যথেষ্ট ভোট পেলেও মানহ্যাটনের সেই বাড়িটির শেষ পর্যন্ত ভাড়াটিয়া পাওয়া গিয়েছিল কি না জানা যায় নি। তবে এটা ঠিক মানুষটি বাইরে থেকে অন্তত, সেই ঘরটির মতই ;—চওড়া মসৃণ কপাল, খড়্গের মত নাক, গভীর আয়ত দুটি চোখ,—ষ্টিভেনসন ব্যক্তিত্ব হিসেবে সত্যিই আকর্ষণীয় এবং এই বাষট্টি বছর বয়সে তিনটি পুত্র-সন্তানের পিতা, স্ত্রী-ত্যাগী গৃহস্থ হয়ত 'শান্ত'ও। 'য়ুনো'য় যখন থাকতে হয় না তখন শিকাগোর শহরতলীতে বাহাত্তর একর জমি জুড়ে বিস্তীর্ণ নিজের খামার-বাড়িটিতে সত্যিই তিনি শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করেন। বই পড়েন, বই লেখেন, গলফ কিংবা দাবা খেলেন, সাঁতার কাটেন, নয়ত রান্না-বান্নার তত্ত্বাবধান করেন। কিন্তু বাইরে ?

গোয়া এবং সদ্য-সমাপ্ত কাশ্মীর বিতর্কের পর বলা অনাবশ্যক অন্যান্য অনেক শ্রোতার মত এডলাই সম্পর্কে ভারতও আজ ভিন্নমত।

নানা উপলক্ষে 'য়ুনোর' ঐ ডেস্ক থেকে গেল দেড় বছরে অনেকবার মুখ খুলেছেন এডলাই। কঙ্গো, লাওস, নিরস্ত্রীকরণ, গোয়া···। যত-বারই তিনি মুখ খুলেছেন ততবারই উন্মুখ হয়ে কান পেতেছে বিশ্ব। প্রথম কারণ, নিঃসন্দেহে মুখটি চেনা। '৫২ এবং '৫৬ সন—দুই দুইবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের পদপ্রার্থী ছিলেন ষ্টিভেনসন। দেশের লোক খারিজ করে দিলেও তাঁকে ঘিরে, ডেমোক্র্যাট এই মুখটির দিকে তাকিয়ে সেদিন বাইরের জগতে অনেক আশা! দ্বিতীয়ত, ষ্টিভেনসন কথা বলতে জানেন। চৌখশ আইনজীবী এবং প্রখর লেখক (বই : 'হোয়াট আই থিঙ্ক', 'ফ্রেণ্ডস এণ্ড এনিমিজ', 'কল টু গ্রেটনেস', 'পুটিং ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট', 'হোয়াট আই লারনড্ ইন রাশিয়া' ইত্যাদি), বলেনও চমৎকার। এবং এমন করে বলেন—মনে হয় না, সেটা নির্বাচনী বক্তৃতার জের মাত্র। যথা : গোয়া সম্পর্কে। স্টিভেনসন সেদিন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ একপাশে সরিয়ে দিয়ে কাঁদ-কাঁদ মুখে যখন বলেছিলেন —'উই আর উইটনেসিং দি ফার্স্ট অ্যাক্ট অব এ ড্রামা হুইচ কুড এণ্ড উইথ ডেথ,' তখন অন্ততপক্ষে একজন লোক যে সত্যিই 'য়ুনো'র ভবিষ্যৎ

সম্পর্কে আশঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন তার প্রমাণ অ্যাটলান্টিকের এপারে লর্ড হিউমের তদানীন্তন আচরণ। তাই বলছিলাম—এডলাই সত্যিই কথা বলতে জানেন!

কিন্তু কার কথা বলেন এই প্রবীণ-মার্কিন রাজনীতিবিদ? বলা বাহুল্য, সরু সেই মাইক্রোফোনটির পেছনে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী একটি দেশের অস্তিত্ব স্বাভাবিকভাবেই মানশ্চক্ষে ভাসে বটে, কিন্তু সবটাই তার আমেরিকার মনের কথা নয়। অনেকখানিই তার বিফল রাষ্ট্রনীতিবিদ ষ্টিভেনসনের নিজস্ব ধারণার কথা। অন্তত কঙ্গো প্রসঙ্গে তাঁর কাহিনীটি শুনলে তাই মনে হবে।

গত বছর ফেব্রুয়ারীর কথা। 'য়ুনো'য় জরিনের সঙ্গে প্রবল তর্কশেষে স্টিভেনসন সবে ঘরে ফিরেছেন। হঠাৎ দেখা গেল তিনি টেলিফোনটি কানে তুলে নিয়ে বলছেন: মিস্টার প্রেসিডেণ্ট, ইট ইজ টাইম ফর ইউ টু গেট টাফ! আই রিকমাণ্ড ছাট। এট ইওর নিউজ কনফারেন্স দিস ইভনিং ইউ টেল পিপল এণ্ড দি ওয়ার্ল্ড'......'

কেনেডি কথা রেখেছিলেন! কিন্তু শোনা যায় সভাশেষে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—'মাই গড, ইন দিস জব হি হ্যাজ গট দি নার্ভ অব এ বার্গলার।"

সে কারণেই কি এডলাই 'য়ুনো'য় আছেন?

২৮. ৬. ৬২

স্যাণ্ডস, ডানকান

'—আমাদের কি যথেষ্ট বিমান আছে? আমাদের হাতে কি যথেষ্ট হাতিয়ার আছে—? নেই!—নেই!' চব্বিশ বছর আগে ১৯৩৮ সনে এক-সঙ্গে এই চাঞ্চল্যকর প্রশ্ন কটি এবং ততোধিক চাঞ্চল্যকর উত্তরটি ছুঁড়তে ছুঁড়তে কমন্স-সভার পেছনের সারি থেকে ঠেলে সামনে এগিয়ে এসেছিলেন একজন তরুণ কনজারভেটিভ সদস্য। আপাত মৌন এবং লাজুক, পাকা ছ'ফুট উচু সেই বিশালদেহ যুবকটির নাম ছিল ডানকান স্যাণ্ডস। চব্বিশ বছর পরে আজকের ইংল্যাণ্ডের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিক এবং সুখ্যাত কূটনীতিক স্যাণ্ডস পরশু দিন কী বলতে বলতে রাওয়ালপিণ্ডিতে নেমেছিলেন তা বলা কষ্টকর, কিন্তু ইতিহাসের একটা তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তে তিনি যে জগতের চোখে নিজেদের বিচক্ষণতাকে আবার প্রমাণ করতে

সক্ষম হয়েছেন, তার প্রমাণ পাক-ভারত যুক্ত ইস্তাহার। বৃটিশ কমনওয়েলথ সচিব ডানকান স্যাণ্ডস-এর রাজনৈতিক জীবনেও এই ইস্তাহারটি স্মরণীয়। কেননা মাত্র ক' মাস আগে, গেল জুন মাসে, ভারত থেকে যেভাবে রিক্ত হস্তে ফিরতে হয়েছিল তাঁকে সে নৈরাশ্যের তুলনায় এ দলিল সত্যিই সম্পদ। স্যাণ্ডস সেদিন ছুটে এসেছিলেন ভারতের মিগ-মোহ কাটাতে; এবার আর তার দরকার হয়নি; বৃটিশ কমনওয়েলথ সচিব এবার চিড় ধরিয়ে দিয়ে গেলেন রাওয়ালপিণ্ডির চীন-প্রেমে! —কে জানে, অস্ত্রচুক্তির পর জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাটি এবার নয়াদিল্লিই তাঁর হাতে তুলে দিয়েছে কী না।

বয়স মাত্র চুয়ান্ন। সুতরাং বিলিতি মাপে বৃটিশ কমনওয়েলথ সচিব ডানকান স্যাণ্ডস 'প্রবীণ' রাজনীতিক নন। কিন্তু তিনি একালের ইংল্যাণ্ডে অন্যতম নিষ্ঠাবান রাজনীতি-সাধক। বাবা কিংস রাইফেলস-এর জনৈক ক্যাপ্টেন জর্জ জন স্যাণ্ডস আট বছর পার্লামেণ্টে ছিলেন। সুতরাং অক্সফোর্ড থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে ফরেন অফিসে উপযুক্ত চেয়ার পেয়েও ডানকান স্যাণ্ডস বেশীদিন চাকরি করতে পারেননি। তিন বছর বার্লিন এবং মস্কোর দূতাবাসে কাটনোর পর '৩৩ সনে তিনি কাজে ইস্তফা দিয়েছিলেন। সংকল্প—রাজনীতি করেন।

ইনার টেম্পল-এ প্রস্তুতির বছরগুলো বাদ দিলে ডানকান স্যাণ্ডস-এর সেই রাজনীতি শুরু হয়েছে ১৯৩৫ সন থেকে। স্যাণ্ডস সে বছরই প্রথম পার্লামেণ্টে আসেন। তারপর থেকে নিয়মিতভাবে প্রায় প্রতিবারই আসছেন এবং প্রতিবারই কোন না কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হাতে পেয়েছেন। কখনও তিনি ওয়ার-অফিসের ফিনান্সিয়াল সেক্রেটারী, কখনও ওয়ার-কমিটির চেয়ারম্যান, কখনও মিনিস্টার অব ওয়ার্কস, কখনও মিনিস্টার অব হাউসিং। আজকের পদে এসেছেন তিনি মাত্র দু' বছর আগে, ১৯৬০ সনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে স্বেচ্ছাসৈনিক রয়াল-আর্টিলারীর ভূতপূর্ব লেফটনেণ্ট কর্ণেল স্যাণ্ডস তার আগের বছর দু'টিতে ছিলেন ইংল্যাণ্ডের প্রতিরক্ষা-সচিব।

ব্যক্তিগত জীবনে রোমান্টিক স্যাণ্ডস, রাজনৈতিক জীবনে দুঃসাহসী কনজারভেটিভ। এক সময় পার্লা-

হক, এ. কে. ফজলুল

মেণ্টে নাম ছিল তাঁর 'চার্চিলস ভয়েস' এবং 'দি ব্যাকবেঞ্চার'। তাঁর এ খ্যাতির প্রথম কারণ অবশ্যই চার্চিলের প্রতি তাঁর অনুরাগ। কিন্তু দ্বিতীয় কারণ—চার্চিল পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। '৩৫-এর নির্বাচনে অন্যতম প্রার্থী ফিনলেকেই তিনি শুধু পরাজিত করেননি—তাঁর অন্যতম সমর্থক চার্চিল-তনয়া ডায়নাকেও বিজয় করে ঘরে তুলেছিলেন।

স্যাণ্ডস আজ আর চার্চিল জামাতা নন। দু' বছর আগে একটি পুত্র ও দু'টি কন্যার জননী ডায়নার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেছে তাঁর, এবং ক' মাস আগে আবার নতুন করে সংসারও পেতেছেন তিনি। কিন্তু আজও তিনি তেমনই চার্চিলভক্ত আছেন। তেমনই প্রখর, তেমনই বিচক্ষণ, এবং দলের প্রতি তেমনই বিশ্বস্ত। কমন-মার্কেট, কমনওয়েলথ, কমিউনিজম—তিন প্রশ্নেই ডানকান স্যাণ্ডস বেপরোয়া, যেন আর এক চার্চিল। ১. ১২. ৬২

হক, এ. কে. ফজলুল

গামার কাছে বিস্কো যখন হেরে যান তারও কুড়ি বছর আগের কথা।

১৮৯০ সন। বরিশালের আগরপুর রোডে এক জোয়ান কাবুলিওয়ালা সেদিন এক অদ্ভুত খেলায় মেতেছে। ডেকে ডেকে সে বাঙ্গালী তরুণদের কব্জির জোর পরখ করছে। আশ্চর্য, যে-ই আসছে সে-ই লোকটির কাছে হেরে যাচ্ছে।

ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল একটি তরুণ। জেলা স্কুলের ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র। দৃশ্যটা দেখে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না সে। মিশমিশে কালো হাতখানা বাড়িয়ে এগিয়ে গেল। তারপর মুচকি হেসে কাবুলিওয়ালার হাতে হাত রাখল। কিন্তু সে মাত্র মুহূর্তের জন্যে! পরক্ষণেই দেখা গেল লোকটি প্রাণপণে হাতখানা ছাড়িয়ে নিতে চাইছে। ছেড়ে দেওয়ার পর জানা গেল,—তার দুটো আঙুল ভেঙে গেছে। বিজয়ী বাঙ্গালীরা আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। পরাজিত কাবুলিওয়ালা—নাম দিল 'শের-ই

বঙাল!" জনাব ফজলুল হক সেই থেকে বাংলা দেশে 'শের', ভারতে— 'শের-ই বঙাল!'

শুধু দৈহিক বলে নয়, 'শের' ছিলেন পড়াশুনায়ও। গণিত, রসায়ন-শাস্ত্র এবং পদার্থ বিদ্যা—এক সঙ্গে তিনটে বিষয়ে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স সহ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ পাশ করেছেন। ইচ্ছে এম. এ দেবেন ইংরেজীতে। পরীক্ষার তখন আর মাস ছয় মাত্র বাকি। বন্ধু ঠাট্টা করে বললেন—'কি অঙ্কের কথা ভাবতেও ঘাবড়ে যাচ্ছ বুঝি?'

রক্ত মাথায় চড়ে গেল। বললেন 'নাঃ, অঙ্কই দেব।'

দিয়েছিলেন এবং যথোচিত ভাবে পাশও করেছিলেন (১৮৯৫)। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে তিনিই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গণিতে এম. এ।

এম এ'র পর ল'। তারপর কিছু-দিন বরিশালের রাজেন্দ্র কলেজে অধ্যাপনা এবং সাংবাদিকতা। ১৯০১ সনে বাবা মারা গেলেন। বাবা ওয়াজেদ আলি ছিলেন বরিশালের খ্যাতনামা উকিল। স্বনামধন্য ছেলে বাবার আসনে বসে ওকালতি শুরু করলেন। হক সাহেব তাঁর জীবনের প্রথম মোকদ্দমাটির কোন ফি নেন নি। কেন না, তিনি জেনে ফেলেছেন যে, লোকটি তাঁর বাবারও মক্কেল ছিল।

হঠাৎ কোর্ট ছেড়ে সরকারী চাকুরি (১৯০৬)। প্রথমেই ডেপুটিগিরি। তারপর পদ আরও বড়, বাংলা, বিহার এবং আসামের সহকারী কো-আপারেটিভ রেজিস্ট্রার! কিন্তু তাহলেও চাকরি ভাল লাগল-না। কেন না, 'কেঁদো বাঘ' হলে ও মানুষটির মনটি ছিল কাদা মাটির তৈরি।

জন্ম অবশ্য মামার বাড়িতে, সাতুরিয়া গাঁয়ে। কিন্তু নিজের গাঁ আরও দূরে ফিরোজপুর মহকুমার চাখার-এ। ১৯০২ সনের কথা। শহর থেকে নিজের গাঁয়ের দিকে হাঁট-ছিলেন তরুণ আবুল কাসেম। পথে একটা খেয়া পার হতে গিয়ে শুনলেন কে যেন কাঁদছে। উঁকি দিয়ে দেখ-লেন গরীব চাষীর বাড়িতে কান্নার রোল। জমিদারের পেয়াদা এসেছে ক্রোক করতে। কিন্তু গেরস্থের বাচ্চা ছেলে কিছুতেই তার ভাত খাবার থালাটি দেবে না। ফজলুলের পকেটে ছিল পঁয়ত্রিশ টাকা। সে টাকা দিয়ে তিনি পেয়াদা বিদায় করলেন।

তারপর নিজের পথ ধরলেন। কিন্তু কেন যেন থেকে থেকেই তাঁর কানে আসে সেই কান্না। লক্ষ লক্ষ চাষী সন্তান কাঁদছে।

১৯১২ সন। সরকারী চাকরি ইস্তফা দিয়ে ফজলুল হক কলকাতা হাইকোর্টে যোগ দিলেন। আশুতোষ বললেন—'ভাবনা নেই, আমার কাছে থাক, মাসে পাঁচশ টাকা আমি তোমায় দেব।'

একদিকে আশুতোষ, অন্যদিকে দেশবন্ধু। ফজলুল হক রাতারাতি অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। রাজনৈতিক মানুষ। '১৩ সনে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় ঢুকলেন। '২৪ সনে মন্ত্রিসভায় এলেন (শিক্ষামন্ত্রী)। ইতিমধ্যে '১৮ সনে প্রজাপার্টি পত্তন করেছেন, মতিলাল নেহরুকে হারিয়ে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন এবং দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতিত্ব করেছেন। (তখন অন্তত একশ' জওহরলাল তিনি পকেটে রাখতে পারেন বৈকি!)।

'৩৫ সনে জনাব ফজলুল হক কলকাতার মেয়র হলেন, '৩৭ সনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। '৪১ সনে আবার নতুন করে মন্ত্রীসভা গঠিত হল। কেননা, যদিও '৪০ সনে লাহোরে জনাব ফজলুল হকই প্রথম পাকিস্তানের দাবি উত্থাপন করেছিলেন, তবুও ইতিমধ্যে তিনি মুসলিম লীগ ত্যাগ করেছেন। এবার কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় প্রধান হিসাবে তাঁর লড়াই লীগের বিরুদ্ধে! সেই লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত নাজিমুদ্দীন জয়ী হলেন। '৪৩ সন। ফজলুল হক পদত্যাগ করলেন। উপলক্ষ্য: ধান সংগ্রহ নীতি সম্পর্কে মতবিরোধ। ঋণ সালিশী বোর্ডের প্রবর্তক, কৃষক-বন্ধু হক সাহেব চাষীর প্রশ্নে আপোষ জানতেন না।...

আপোষ জানতেন না তিনি বাংলা দেশ সম্পর্কেও। প্রমাণ:—পূর্ব পাকিস্তানে ফজলুল হকের কর্মজীবন। অ্যাডভোকেট জেনারেল করে তাঁকে ভুলিয়ে রাখা যায়নি। '৫৩ সনে অশীতিপর বৃদ্ধ (জন্ম—১৮৭৩) মুসলীম লীগ ছেড়ে আবার কৃষকদল নিয়ে আসরে নামলেন। '৫৪ সনে লীগের তাসের ঘর ভেঙ্গে গেল সে জোয়ারের সামনে। এপ্রিলে ইউনাইটেড ফ্রন্টের নেতা হিসেবে দেশের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন ফজলুল হক। কিন্তু পরের মাসেই জনগণের দেওয়া সে ক্ষমতা

কেড়ে নেওয়া হল তাঁর হাত থেকে! কেননা, ইস্কান্দার মীর্জা বললেন—হক দেশের পক্ষে বিপজ্জনক!

কথাটা যে পাকিস্তানের মুখে শোভা পায়নি, সে প্রমাণ পাওয়া গেল পরের বছর। সে বছর ('৫৫) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন ফজলুল হক। পরের বছর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর।

বাংলা দেশের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, এ কালের অন্যতম স্মরণীয় বাঙ্গালী, পূর্ব পাকিস্তানের ভূতপূর্ব গভর্নর জনাব ফজলুল হক এখন হাসপাতালে আছেন। শোনা যায়, পূর্ববঙ্গের বহু প্রজার বিশ্বাস তিনি এখনও মুখ্যমন্ত্রীর আসনেই আছেন। তাদের যখনই কোন কষ্ট হয় তখনই তারা দরখাস্ত পাঠায় হক সাহেবের নামে।—বলা বাহুল্য, এ ভুল বাংলার চাষীর একজনের নামেই হয়,—তিনি ফজলুল হক। ৩১. ৮. ৬১

[১৯৬২ সনের ২৭শে এপ্রিল তারিখে জনাব ফজলুল হক দেহত্যাগ করেন।]

হলডেন, জে. বি. এস

সিভিল ডিফেন্স কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে নেওয়া হয়েছিল ওঁকে। দু'দিনেই জানা গেল লোকটি একটু নতুন ধরণের উপদেষ্টা।

বোমা পড়লে কোথায় আশ্রয় নেওয়া হবে তাই ছিল আলোচ্য। উপদেষ্টা পকেট থেকে তাঁর নিজস্ব ডিজাইন বের করলেন। উপস্থিত গণ্যমান্য আর পাঁচজন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। সন্দেহ, এ বস্তু কি ধোপে টি কবে?

—টি'কবে না মানে? সম্ভাব্য স্থানে নমুনা তৈরি হল। তারপর শুরু হল সাগ্রহ প্রতীক্ষা,—কখন বোমা পড়ে। নিয়মিত ঘটনা। সুতরাং বেশীক্ষণ ধৈর্য ধরতে হল না। সাইরেন বেজে উঠল। তারপর যথা-রীতি অঝোরে বর্ষণ।

নাৎসী প্লেনগুলো যখন বিদায় নিল তখন সকলে ছুটলেন সেইদিকে, যেখানে সেই পরীক্ষামূলক নতুন আশ্রয়টি।—কিন্তু একি? চোখকেও বিশ্বাস করা যায় না যেন। প্রবল বর্ষণান্তেও সেই আস্তানাটি অটল। তার চেয়েও অবিশ্বাস্য, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছেন একজন জীবন্ত মানুষ। চিনতে অসুবিধে হয় না। তিনি সেই বৈজ্ঞানিক।

তবুও বিলিতি শুচিবাই। ওঁকে নিয়ে চারদিকে তুমুল তর্ক। ওঁরা

চেঁচাতে লাগলেন—ওঁকে হঠাও।—হি ইজ রেড!—হি ইজ রেড!

উত্তরে চার্চিল বললেন—'হি মে বি এজ রেড এজ দি ডেভিল হিমসেলফ।—বাট, স্টীল আই ক্যানট এভয়েড হিম।—বিকজ হি ইজ হলডেন!'

বিশ্বখ্যাত প্রতিভা। নাম—জে. বি. এস. হলডেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জে, এস হলডেন-এর পুত্র জন বার্ডন স্যাণ্ডারসন হলডেন শুধু প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক নন, একালের অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তিত্বও।

জন্ম—১৮৯২ সনের ৫ই নভেম্বর। লেখাপড়া—স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সবই এক ঘেরের মধ্যে,—অক্সফোর্ডে।

অক্সফোর্ডের শেষ পরীক্ষায় অশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে হলডেন চললেন বিদেশে। ক্যাপ্টেন সেজে 'ব্ল্যাক-ওয়াচ'-এ। কিছুদিন ছিলেন ফ্রান্সে, কিছুদিন ইরাকে। সাকুল্যে সে পাঁচ বছরের (১৯১৪-১৯) অভিজ্ঞতা।

তারপর দেশে ফিরে নিউ-কলেজের ফেলোশিপ। সে কাজে ছিলেন তিন বছর ('১৯—'২২)। তারপর শুরু হল অধ্যাপনার কাজ। প্রথমে কেম্ব্রিজে বায়ো-কেমেস্ট্রির রীডার ('২২—'৩২) এবং প্রায় যুগপৎ রয়াল ইনস্টিটিউটে ফিজিওলজি ('৩০—'৩২) এবং তারপর 'থেকেই স্থায়ীভাবে লণ্ডন ইউনিভারসিটি। প্রথম ক' বছর ('৩৩—'৩৭) লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে জেনেটিকস পড়াতেন তিনি, তারপর (কলকাতার বিখ্যাত স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে আসার আগে অবধি '৫৭) সেখানে তাঁর বিষয় ছিল—বায়োমেট্রি।

তবে বলা বাহুল্য, অধ্যাপক জে. বি. এস হলডেন-এর কাছে এমন কোন বিষয় নেই যা সম্পূর্ণত অবান্তর। কি একাডেমিক, কি লৌকিক—সর্বত্র তাঁর অবাধ গতায়াত। মনে রাখতে হবে, দেশ-বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্বৎ-সভা কর্তৃক বিবিধ সম্মানে ভূষিত হলডেন এই সেদিন অবধিও ছিলেন বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে অন্যতম সক্রিয়, বর্ণাঢ্য নাগরিক। তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিক, লেখক এবং সাংবাদিক। উল্লেখযোগ্য, খবরের কাগজে নিয়মিতভাবে লেখা ছাড়াও পাকা নয় বছর ('৪০—'৪৯) 'ডেলি ওয়ার্কার'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভা-পতি ছিলেন তিনি।—আর সমাজ-সচেতনতা? এ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ অনুমানের পক্ষে বোধহয় হলডেন-এর লেখা কয়টি বইয়ের নাম-ই যথেষ্ট। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি: 'সায়েন্স এণ্ড ইথিকস', 'দি ইনইকুয়ালিটি অব

ম্যান', 'ফ্যাক্ট এণ্ড ফেইথ,' 'সায়েন্স এণ্ড এভরি ডে লাইফ', 'এ-আর-পি', 'কিপিং কুল' এবং ইত্যাদি ইত্যাদি।

জ্ঞানের জগতে এই ব্যাপ্তি জ্ঞানী-দের কাছেও বিস্ময়।

সেও এক বিস্ময়কর ঘটনা। যুদ্ধের সময়ে সেই উপদেষ্টা পরিষদেরই বৈঠক। স্থির হয়েছে ইংরেজরা সশরীরে নর্মাণ্ডিতে নামবেন। কিন্তু সমস্যা, সেখানে কি ট্যাঙ্ক সহ নামা যাবে? কেউ সঠিক বলতে পারছেন না। নর্মাণ্ডির উপকূলভাগের জমির কি প্রকৃতি। হলডেন বললেন কয়েক বছর আগে আমি একবার ওদিকে গিয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ছে জমিটা বোধহয়—এমন এমন…। বলেই একটা কাগজে সব লিখে ফেললেন। সে কাগজের ওপর ভর করে বিদেশে যুদ্ধ করতে যাওয়া যায় না। সুতরাং সে রাত্রিতেই, ভলান্টিয়ার প্রেরিত হল। রাতের অন্ধকারে তাঁরা নর্মাণ্ডি থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে এলেন। আশ্চর্য! দেখা গেল, হলডেন যা বলেছেন ঠিক তাই। লেবরেটারী রিপোর্ট আর ওঁর লেখা কাগজটা প্রায় হুবহু এক।

হলডেন সব পারেন। শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, অন্যত্রও। বিয়ের কুড়ি বছর পর তিনি চার্লোটিকে ছাড়তে পেরেছেন, জন্মের পঁয়ষট্টি বছর পর তিনি নিজের জন্মভূমিকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে পেরেছেন। সুতরাং, মতবিরোধের প্রশ্নে তাঁর কাছে বরাহ-নগর ত্যাগ কোন বিশেষ ঘটনা নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি আমরা তাঁকে কোথাও না রাখতে পারি তবে সে ঘটনা নিশ্চয় হবে ভারতের পক্ষে লজ্জাকর। ৪. ৫. ৬১

[হলডেন ১৯৬৪ সনের ১লা ডিসেম্বর ভুবনেশ্বরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৬২ সন থেকে তিনি সেখানেই জেনেটিকস অ্যাণ্ড বায়োমেট্রি ইনস্টিটিউটে প্রধানের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।]

হাইলে সেলাসি, সম্রাট

বিদেশী ওঁকে একখানা দূরবীণ উপহার দিলেন। সম্রাট সেটি চোখে লাগিয়ে বললেন—বাঃ, এবার আর 'হারুণ আল রসীদ' হতে হবে না আমাকে। প্রাসাদের ছাদে দাঁড়ালেই প্রজাদের খবর পাব। আর এক বিদেশী ওঁকে ক্যামেরা দিলেন একটা। সম্রাট বললেন—বাঃ, সুন্দর জিনিস। আমার রাজ্যে এ জিনিসের একটি এজেন্সী চাই। ওঁরা ওঁকে সিনেমা

দেখালেন একটা। সম্রাট বললেন—বাঃ, মজার জিনিস। বইয়ের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি কাজ করে। আমার রাজ্যে আমি সিনেমা চাই। বিনেপয়সার সিনেমা।

প্রচীন দেশে সে এক অদ্ভুত নবীন সম্রাট। নতুন যা-ই দেখেন তাই তাঁর চাই। আজ তাঁর বয়স উনসত্তর। চুল পেকে গেছে। সিংহের মত চেহারাটা বাইজেনটাইন ছবির সন্ন্যাসীদের মত উদাসী হয়ে এসেছে। তবুও ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসির নতুনের নেশা এখনও কাটেনি। কেননা, প্রবল উৎসাহ সত্ত্বেও দেশটা তাঁর এখনও পুরানো। মহাদেশটা প্রগতির মাপে এখনও ঘুমন্ত যেন।

'হিজ হাইনেস এমপারার হাইলে সেলাসি দি ফার্ষ্ট'; কিং অব কিংস, লায়ন অব জুডা,' রাজা সুলমন আর রাণী সেবা'র বংশধর। স্বভাবতই আফ্রিকার যখন মধ্যরাত আবিসিনিয়া রাজ সেলাসি তখন জাগ্রত পুরুষ। '৩০ সনে মা মারা যাওয়ার পর তিনি সিংহাসনে বসলেন। ক'বছর কাটতে না কাটতেই '৩৬ সনে এল ফ্যাসিস্ত লুঠেরা। ইথিওপিয়ার তরুণ সম্রাট পালালেন, কিন্তু পশ্চিমী ইতালীর বশ মানলেন না। '৪০ সনে সুদান থেকে আবার মাতৃভূমিতে লাফিয়ে পড়ল রাজকীয় বাহিনী। সেই সিংহ-বাহিনীর পুরোভাগে 'লায়ন অব জুডা' —সম্রাট হাইলে সেলাসি।

সেদিনের বীর লড়িয়ে আজ বিশ্ব-খ্যাত নরপতি। হাইলে সেলাসি ইতিমধ্যে অনেক দেশ (ভারত সহ) ঘুরেছেন, নিজের চোখে আরও অনেক কিছু দেখেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মনে লেগেছে তাঁর যে বস্তুটি তার নাম—প্রগতি।

প্রায় চার লক্ষ বর্গমাইলের মস্ত দেশ ইথিওপিয়া আজও দরিদ্র কৃষি-জীবী। তবে সম্রাটের মত প্রজাদের মনেও আজ প্রগতির নেশা। তারা দু' ফোঁটা নেইল-পলিশ পেলে দু' পাউণ্ড কফি দিতেও নাকি রাজি। বলা বাহুল্য, সেলসি তাতে রাজি নন। তিনি আফ্রিকার অর্থনীতিটা যেমন জানেন, তেমনি জানেন আর তিন-খণ্ডের রাজনীতিটাও। তাই নাকের বদলে নরুণ নিতে তিনি গররাজি। তাঁর দেশ ইথিওপিয়া ভারতের মত নিরপেক্ষ দেশ। সে দেশে তিনি আর্থিক মুক্তি চান কিন্তু সে কিছুতেই বিবেকের দামে নয়।

সম্রাট হাইলে সেলাসির বিবেক

এখন আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের বর্বরতা দেখে পীড়িত। আবিসিনিয়া-সম্রাট সে কথা গোপন করেন নি। আদিস আবাবায় আবার তাঁর মুখে শোনা গেছে আফ্রিকার হৃদয়ের কথা। তিনি বলেছেন: আমরা যেন না ভুলি, স্বাধীনতার কামনা ছাড়া আমাদের আর কোন পাপ নেই।

অনেকদিন আগের কথা। আদিস-আবাবার লোকেরা দেখেছিল তাদের সম্রাট হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে রাজপথ দিয়ে চলেছেন। তারা জানত, সম্রাটের একটি মেয়ে মারা গেছে। গোটা রাজধানী সেদিন কেঁদেছিল তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে। আজ দক্ষিণ আফ্রিকার সন্তানদের জন্যে সেলাসি যখন কাঁদছেন তখন গোটা আফ্রিকা বোধ হয় সঙ্কল্পে দৃঢ়তর হল।

১৮. ৬. ৬০

হিউম, অ্যালেক ডগলাস

'I am a victim of my father's virtue !'

কিছুদিন আগে হাউস অফ লর্ডস-এ দাঁড়িয়ে সখেদে ঘোষণা করেছিলেন তেত্রিশ বছর বয়স্ক লেবার এম. পি এণ্টনি ওয়েজউডবেন।—কেননা, বাবা তাঁর 'লর্ড'। এবং তাঁর একমাত্র উত্তাধিকারী হিসাবে—বেচারা ওয়েজউডবেন হয়ত কোনকালেই 'কমনার'-এর মর্যাদা পাবেন না!

সদ্যনিযুক্ত বৃটিশ ফরেন সেক্রেটারি লর্ড হিউম-এর বয়স সাতান্ন। এবং তিনি স্কটল্যাণ্ডের সবচেয়ে বনেদী পরিবারের সন্তান। তাঁর চতুর্দশ পুরুষ লর্ড। সুতরাং এণ্টনি ওয়েজ-উডবেন-এর মত তাঁকে যদি আক্ষেপ জানাতেই হয় তবে কমপক্ষে ১৬০৪ সনে ফিরে যেতে হয়!

সুখের বিষয় লর্ড হিউম-এর (আলেকজাণ্ডার ফ্রেডারিক ডগলাস হিউম) মনে কোনদিন সে বাসনা জাগ্রত হয়নি। তিনি পড়েছেন ইটন এবং অক্সফোর্ডে, বিয়ে করেছেন স্ব-মেলে, রাজনীতিতে এসেছেন রাজকীয় পথে। জেনে রাখা ভাল—এখনও তিনি একজন রাজকীয় তীরন্দাজ। আর্ল অব হিউম 'রয়াল কোম্পানি অব আর্চারস'-এর একজন বিগ্রেডিয়ার এবং তিনি একাই 'কুইনস বডিগার্ড ফর স্কটল্যাণ্ড!'

'৩১ সন থেকে লর্ড হিউম লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত রাজনীতিক। '৩১—'৪৫ সন অবধি তিনি হাউস অব লর্ডস-এ সাউথ লাগার্ক-এর প্রতিনিধি। সে সময়ে কিছুকাল তিনি প্রধানমন্ত্রী নেভিল

চেম্বারলেন-এর একান্ত-সচিব হিসাবে কাজ করেছেন (১৯৩৭—'৩৯)। মাস কয় করছেন ফরেন অফিস-এ জয়েন্ট পার্লামেন্টারি আণ্ডার সেক্রেটারির কাজ। অতঃপর '৫১ সনের নির্বাচনের পর আরও অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদে দেখা গেছে তাঁকে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: মিনিস্টার অব ষ্টেট্, স্কটিশ অফিস ('৫১—'৫৫); সেক্রেটারি অব স্টেট, কমনওয়েলথ রিলেশানস ('৫৫); ডেপুটি লীডার, হাউস অব লর্ডস ('৫৬-'৫৭) এবং ঐ বছরেই লীডার, হাউস অব লর্ডস।

বৃটেনের লর্ড সভার নেতা, কমনওয়েলথ রিলেশানস দপ্তরের সচিব লর্ড হিউম হার ম্যাজেস্টি এলিজাবেথ দি সেকেণ্ড-এর পররাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত হয়েছেন। ঘটনাটা ইংলণ্ডের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। কেননা লর্ড সভার সদস্য পররাষ্ট্র সচিব 'কমনার'দের সভায় আসতে পারবেন না। তাঁর সেখানে সশরীরে আগমন এবং ভাষণ দুই-ই নিষিদ্ধ। অথচ পররাষ্ট্র ব্যাপারে কমনসসভা আসলে—রাজ্যেশ্বর।

সুতরাং, টেবিল চাপড়ে, বিরোধীপক্ষ বললেন,—এটা অন্যায়!

ম্যাকমিলান জবাব দিলেন—আমি তা মনে করি না।

লর্ড হিউম রসিক ব্যক্তি। তিনি হেসে বললেন—তর্কটা চলুক না।

লোকে ভাবল—সে কেমন কথা!

হিউম বললেন—মনে রাখবে আমি জাতে স্কচ এবং পাবলিসিটিটা বিনে পয়সায় পাচ্ছি! ৪. ৮. ৬০

[পরবর্তীকালে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী লর্ড হিউম সম্পর্কে আরও কিছু খবর। ১৯৬৪ সনের নির্বাচনে কনজারভেটিভরা গদীচ্যুত হন এবং হিউমের স্থানে নতুন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মনোনীত হন হ্যারল্ড উইলসন।]

আদেশ হয়েছিল—গো টু হোম! সৈন্যরা সেনাপতি আর্ল মহোদয়ের কাছে না গিয়ে যে যার বাড়ি চলে গিয়েছিল। সেই থেকেই বানানের স্বাভাবিক ফলকে বাতিল করে স্কটল্যাণ্ডের পরিবারটি 'হোম'কে উচ্চারণে 'হিউম' করেছিলেন। কিন্তু তবুও শেষরক্ষা হলনা। ১০ নম্বর ডাউনিং ষ্ট্রীটের মায়া কাটিয়ে লর্ড হিউমকে বাড়িই ফিরতে হল।

নিজের মা পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। গত বছর প্রফুমো-প্রমাদের পরে ম্যাকমিলন যখন ওঁর হাতে দুয়ারের চাবিটি তুলে দেন, কাউন্টেস অব হিউম তখন নাকি বলে-

ছিলেন—আই উড নেভার হ্যাভ থট অ্যালেক উড ওয়ান ডে বি পি-এম। তবুও স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউম নিঃশব্দে দায়িত্বটি হাতে তুলে নিয়েছিলেন। এবং সকলেই মানেন, তিনি তা পালনও করেছিলেন।

সেবার ম্যাকমিলানের মুখে ছিল 'ইউ হ্যাভ নেভার হ্যাড ইট সো গুড!' স্যার অ্যালেক তাকেই সম্প্রসারিত করে টোরি দলের 'নিউব্রিটেন'-এর ব্যাখ্যা-ছত্র জুড়েছিলেন—'প্রসপারিটি উইথ এ পারপাস।' বক্তব্যের অভাব ছিল না। নীল স্যুট, নীল সার্ট, নীল টাই,—এখানে ওখানে অনেক কথা বলেছেন স্যার অ্যালেক। হেসেছেন, দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, রসিকতা করেছেন। কিন্তু তবুও টোরি-জমানার চতুর্দশ বর্ষে আর থাকা গেলনা।

যদিচ কথা বলেন কম, চারিটি পুত্রকন্যার জনক একষট্টি বছর বয়স্ক টোরি নায়ক ডগলাস-হিউম সুরসিক হিসেবে প্রসিদ্ধ। একবার তিনি নিজেই নাকি বলেছিলেন—দি ডক্টরস ডিড ইমপসিবল্ উইথ মি বাই পুটিং সাম ব্যাকবোন ইন টু এ পলিটিসিয়ান। কুড়ি বছর আগে টি. বি হয়েছিল ওঁর, সেই প্রসঙ্গেই এই রসিকতা। কিন্তু অনেকে বলেন, নির্বাচনে এই পরাজয়ের পেছনে একটা কারণ মানুষটির চাকচিক্যহীনতা। ব্যাক-বোন অবশ্যই আছে, তবুও উইলসনের পাশে মানুষটি যেন 'নিতান্তই অ্যামেচার!'

২২. ১০. ৬৪

হিলারী, স্যার এডমণ্ড

১৯৫৩ সনের ২৯শে মে।

আজই শেষ দিন, শেষ পরীক্ষা। নয় নম্বর ক্যাম্প থমথমে, গম্ভীর। এমন কি হাজার হাজার ফুট উঁচুতে, এই তাঁবুর ঘরে অক্সিজেনও যেন আজ ভারি। কেননা, গতকাল প্রথম দলটি ফিরে এসেছে।

বেলা—সাড়ে ছ'টা। দ্বিতীয় দল তাঁবু ছেড়ে বের হলেন। ন'টায়—সাউথ পিক। সামনেই মাথার ওপরে অভীষ্ট এভারেস্ট,—স্বর্ণ মুকুট।

বেলা এগারটা বেজে ত্রিশ মিনিট। পৃথিবীর সবচয়ে উঁচু, সবচেয়ে উদ্ধত শৃঙ্গের শীর্ষে এসে দাঁড়ালেন ওঁরা।

চমৎকার সূর্যালোক। মৃদুমন্দ বাতাস। 'আনন্দে সঙ্গী জড়িয়ে ধরলেন আমাকে।'

শীর্ষে সে এক আশ্চর্য আনন্দের অনুভূতি, সমতলে চাঞ্চল্যকর সংবাদের প্রস্তুতি। স্বরিতে পশ্চিমী তারে রটে

গেল—এভারেস্ট যাদের কাছে হার মানল তাঁদের একজন—শেরপা, অন্যজন 'বী-কীপার'—মৌমাছিপালক।

উদ্দেশ্য, উত্তেজনা সঞ্চার বটে, কিন্তু সংবাদটা তৎকালে অন্তত, অবশ্যই নির্ভরযোগ্যসূত্রে প্রাপ্ত। কেননা, ছ'ফুট কয়েক ইঞ্চি উঁচু ঐ নিউজিল্যাণ্ড-বাসী যুবকটি সত্যিই তখন পেশায় 'বী-কীপার'। সতের বছর বয়স থেকেই বছরে নয় মাস তাঁর কাজ—মৌমাছি পোষা। তবে বাকি তিন মাস অবশ্যই—পাহাড়ে চড়া।

হিলারী প্রথম যেবার পাহাড় দেখেন তখন তাঁর বয়স চৌদ্দ বছর। (জন্ম—১৯১৯)। সেবার স্কুলের ছুটিতে সেই রোগা টিঙ টিঙে লাজুক ছেলেটিও বেড়াতে গিয়েছিল রুপে পর্বতে। মা বলেন সেই যে ছেলেকে পর্বতের নেশায় পেল, কিছুতেই আর তা ছাড়ান গেল না।

সুতরাং, লেখাপড়া বিশেষ হল-না। ছেলে মৌমাছির চাষ করে এবং সময় পেলেই পাহাড়ে চড়ে। পর্বতে। নিউজিল্যাণ্ডেও আল্পস আছে। দক্ষিণ আল্পস। বছরে দু'বার অন্তত হিলারীর সেখানে যাওয়া চাই—চাই-ই চাই।

অভ্যেসটা রপ্ত হয়ে গেছে। আল্পস সহজ সহজ ঠেকছে। এবার ইচ্ছে হয় অন্য কোথাও যান। কিন্তু তার আগেই শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। তরুণ হিলারী এয়ার-ফোর্সে নাম লেখালেন। তিনি এখন বৈমানিক। নিউজিল্যাণ্ড আর সাউথ প্যাসিফিক ঘিরে ঘুরে ফিরে বেড়ান। মনে এখনও তাঁর সেই নেশা। সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে সেই পর্বতের স্বপ্ন।

যুদ্ধ যখন থামল ওরা তখন ফিরিয়ে দিয়ে গেল তাঁকে সেই মৌমাছির সংসারে। কিন্তু এ যেন অন্য কোন হিলারী। দেখে তাঁকে চেনাই যায় না। তাঁর সর্বাঙ্গে ক্ষত।

তবুও '৫১ সনে যখন গাড়ওয়াল অভিযানের কথা উঠল—হিলারীকে তখন আটকান গেল না। সে বছরই এরিক শিপটনের বিখ্যাত অভিযান নিউজিল্যাণ্ডের অ্যালপাইন ক্লাব ওঁকে সঙ্গী করে পাঠালেন। কেননা ছেলেটি সত্যিই বরফ ভাঙতে জানে হিলারীর 'আইস-টেকনিক' তখনই প্রবাদ।

তার পরের বছর আরও অভিজ্ঞতা। এবার ইংরেজদের সঙ্গে। তবে এবারও হিমালয়,—চো-য়ু শৃঙ্গ। চো-য়ু থেকে পরের বছর—এভারেস্ট!—

ইতিহাস। উল্লেখযোগ্য, হিলারী কিন্তু দলপতি ছিলেন না!

…তবুও। লণ্ডনের সেই অবিস্মরণীয় জুন মাস। ক' ঘণ্টা বাদেই সিংহাসনে বসবেন এলিজাবেথ। এমন সময় সহসা এল সেই উত্তেজনাকর সংবাদ—অমূল্য উপহার। এলিজাবেথ আনন্দে হাসলেন।

পরের মাসেই সেই রাজকীয় হাসি গণগোচর হল। নিউজিল্যাণ্ডের নাগরিক এডমণ্ড পার্সিভ্যাল হিলারী 'স্যার' পদবীতে ভূষিত হলেন।

দু' মাস পরে, সেপ্টেম্বরে আরও একটি বিজয়মাল্য। গোলাপের মালা। এবার যিনি তা দিলেন তিনি—লুসি রোজ। নিউজিল্যাণ্ড অ্যালপাইন ক্লাবের বিখ্যাত সভাপতি মহোদয়ের কন্যা। এভারেস্ট বিজয়ী সেই গুণগ্রাহীতার কাছে পরাজয় মানলেন। তিনি মালাটি গ্রহণ করলেন। মিস রোজ সেই থেকে লেডি হিলারী।

গৌরব, সম্মান, শান্তি। বিজয়ের পর বিজয়। কিন্তু স্যর এডমণ্ড এখনও সেই পাহাড়ী মানুষ। তিনি মেরু-বিজয়ীও। দু'দিন চড়াইয়ের পর সপ্তাহব্যাপী উতরাই, দু'দণ্ড বিশ্রাম, তারপর আবার সেই চড়াই উতরাই। পথিক যেন মেনে নিয়েছেন পথ বন্ধুর। এবং সেই বন্ধুরতা একমাত্র পর্বতের পথেই কাম্য! ঘুরে ঘুরে তাই হিলারী হিমালয়ের পথিক। সুতরাং, কিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড কিম্বা দেশাচারের ভ্রূকুটি যে এ মানুষকে সমতলে বাঁধতে পারবে না সে কথা বলাই বাহুল্য। ৬. ৪. ৭১

হুসেন, (জর্ডন-রাজ)

চার্চিলের হাতে গড়া দেশ। মরু যুদ্ধে লরেন্স অব অ্যারাবিয়ার অন্যতম সহচর ছিলেন হাসেমাইট বংশের উনচল্লিশতম পুরুষ আবদুল্লা। স্বভাবতই তাঁকে পুরস্কৃত করতে হয়। সুতরাং মহাযুদ্ধের পরে, '২৩ সনের এক শনিবারের বিকেলে তৎকালীন বৃটিশ কলোনিয়াল সেক্রেটারি উইনস্টন চার্চিল আবদুল্লাকে ডাকলেন। তারপর ভাঙ্গা অটোমান সাম্রাজ্যের একটা টুকরো গুঁজে দিলেন তাঁর হাতে। বললেন—এই তোমার রাজ্য! নাম দিচ্ছি আমি তার—ট্যান্স জর্ডন।

সেই জর্ডনের সিংহাসন, সেই আবদুল্লার সাক্ষাৎ পৌত্র। নাম হুসেন। বয়স—পচিশ। রাজত্বের বয়স—সাত বছর।

জন্মের ('৩৫) পর থেকেই ঠাকুর্দার স্নেহচ্ছায়ায় মানুষ। চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর সঙ্গেই কাটাতেন। কখনও

ঘোড়ায় চড়া শিখতেন, কখনও শিখতেন তলোয়ার হাতে লড়াই করা। মরুভূমির বাদশাদের এর চেয়ে বেশি কিছু শেখা দরকার নেই বলেই ছিল আবদুল্লার ধারণা।

তবে হ্যাঁ, এ কারণে নয়, আবদুল্লা জনপ্রিয় ছিলেন না অন্য কারণে। তিনি যে শুধু লরেন্স-এর পার্শ্বচর ছিলেন তাই নয়, বলতে গেলে গ্লাব-পাশাই তাঁর অধীশ্বর। আরবীরা সেই হীনমন্যতা ভাল চোখে দেখত না। তাছাড়া, আবদুল্লা ইসরাইল সম্পর্কে উদাসীন। তাঁর নীতির ফলে জর্ডনের চেহারা পুষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এসেছে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এবং আরও নানা উপসর্গ।

সুতরাং—

সুতরাং, অনেকে যা ভেবেছিলেন তাই হল। ১৯৫১ সনের জুলাই। নাতির হাত ধরে জেরুসালেম-এর এক মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন বৃদ্ধ বাদশা। সহসা তাঁকে লক্ষ্য করে গর্জন করে উঠল দুশমণের রাইফেল। মুহূর্তে আততায়ীর বুলেট কেড়ে নিয়ে গেল আবদুল্লাকে। সেই সঙ্গে কেড়ে নিয়ে গেল, দাদুর যাত্রাসঙ্গী পনের বছরের ছেলে হুসেনের বুক থেকে একটা মেডেল!

ভবিষ্যতের বাদশার সঙ্গে প্রজাবর্গের সেই প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়। তারপর থেকে হুসেন যতবার তাদের সামনা-সামনি পড়েছেন ততবার মনে পড়েছে তাঁর সেই মেডেলটির কথা। বিশেষ—নিশ্চয় '৫৭ সনের সেই বিদ্রোহের দিনে এবং তার কিছুদিন পরে নিকট আত্মীয় এবং বন্ধু ইরাকের ফয়জলের পতন ক্ষণে!

অবশ্য সেই থেকেই বাদশা নন মাঝখানে এক বছরের জন্য সিংহাসনে বসেছিলেন বাবা তালাল। কিন্তু তিনি অক্ষম শাসক এবং বিকৃত মস্তিষ্কও সুতরাং, বছর ঘুরে না আসতেই তালাল নির্বাসিত হলেন (তিনি এখনও জীবিত) এবং তাঁর আসনে বসলেন পুত্র হুসেন। তখন তাঁর বয়স মোটে ষোল।

সিংহাসনে বসেই হুসেন চললেন বিলেতে। উদ্দেশ্য: শিক্ষা এবং দীক্ষা এক বছর কাটল হ্যারোতে, ছ-মাস স্যাণ্ড-হার্স্ট-এ, তারপর আবার ঘর বিবাহ, বিদ্রোহ এবং বিদ্বেষপূর্ণ রাজত্ব।

বাদশা হুসেন এবার সম্পূর্ণ অন্য ধরণের শাসক। তিনি গ্লাব পাশাকে বাতিল করে দিয়েছেন, তিনি দেশে নির্বাচন করাচ্ছেন, তিনি নিজে

বোমারু বিমান নিয়ে তেল অলিভ-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজি আছেন!

কিন্তু সে প্রগতিশীল জাতীয়তা মাত্র ক'দিনের জন্যে। ক'দিন যেতে না যেতেই দেখা গেল হুসেন এক গাঁটছাড়া কেটেছেন বটে, কিন্তু অন্য একটিতে বাঁধা পড়েছেন। সিরিয়া তাঁর কাছে অসহ্য, অসহ্য নাসের এবং মিশরের প্রগতিবাদীরা। এমন কি স্বদেশের জনপ্রিয় নায়কেরা পর্যন্ত!

তবুও জর্ডনে জনতার বিদ্রোহ সফল হয়নি। হুসেন এখনও আছেন এবং ক্রমেই আরও যেন অধিকতর বলশালী হিসেবে। তাঁর সাহসিকতা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

বাস্তবিকই সাহসী শাসক। নেশা, স্পোর্টস-কার। জর্ডনের তরুণ রাজা গাড়ি নিয়ে দেশময় ঘুরে বেড়ান; রাজত্ব যার পরামর্শেই হক, নিজের হাতে তিনি এরোপ্লেন চালান, শিকার করেন, নিজের পায়ে জাজ সঙ্গীতের সঙ্গে তাল রেখে নাচেন। নাইট ক্লাব তাঁর অতিশয় প্রিয়।

বিবাদ সেই আরব্য রজনী যাপন নিয়েই। রানী ডিনা ইজিপ্ট-সুন্দরী। তার উপর কেম্ব্রিজে-পড়া সুশিক্ষিতা। আধুনিকা। তিন বছর ধৈর্য সহকারে তিনি বাদশাকে দেখলেন। তারপর, নিঃশব্দে উঠে গেলেন পাশের সিংহাসনটি খালি করে।

চার বছর পরে এবার সেখানে নতুন রানী আসছেন। তিনি শ্বেতদ্বীপ-বাসিনী। বাবা তাঁর জনৈক বৃটিশ লেঃ কর্ণেল। কুড়ি বছরের এই মেয়েটিই তাঁর একমাত্র কন্যা। হুসেন ভালবেসে তাঁর নাম রেখেছেন মুনা-এল-হুসেন।

মধ্যপ্রাচ্যে এবং রাজকীয় বাসনা! সুতরাং, সংবাদটা চাঞ্চল্যকর কিছু নয়। তেমনি অতঃপর এতদুপলক্ষে ফরেন অফিস যদি হঠাৎ তৎপর হয় কিংবা হঠাৎ যদি বিচলিত বোধ করে স্টেট ডিপার্টমেন্ট, তবে তাও বিচিত্র কিছু নয়। হাজার হক, মেয়েটি ইংরেজ তো! ১৮. ৫. ৬১

হো-চি-মিন

নাটকীয় জীবন। উত্তর-ভিয়েৎনাম-এর পুনর্নির্বাচিত সভাপতি হো-চি-মিনকে দেখে একবারের জন্যেও মনে হবে না তাঁর এই আটষট্টি বছরের জীবন—একখানা রীতিমত নাটক। যেমনি জটিল, তেমনি অবিশ্বাস্য।

হো-চি-মিন আজ বিশ্ববিখ্যাত নাম। এ নামে উত্তর ভিয়েৎনামের

সভাপতি সরকারী কাগজে সই করেন, বাইরের জগতের কাছে পরিচয় দেন, জনতার অভিনন্দন নেন। কিন্তু ফরাসী পুলিস জানে, 'ভিয়েৎমিন' দলের বিপ্লবীরা জানেন, এটি তাঁর নাম নয়,—ছদ্মনাম।

সাদাসিধে মানুষ হো-চি-মিন-এর প্রাসাদে জাঁকজমক হয়ত নেই, কিন্তু সরকারী ভোজের পরে বাসনমাজার লোক নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আছে। অথচ এমন দিনও গেছে উত্তর ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রপতির জীবনে যেদিন লণ্ডনের কার্লটন হোটেলে দিনের পর দিন তিনি নীরবে বাসন মেজেছেন। ম্যানেজার বলত: দেখিস, তোকে আমি হেড সিলভার-ক্লীনার বানাব।

বাবা গরীব ছিলেন না। তিনি ফরাসীদের অধীনে কাজ করতেন। দেশদ্রোহের অপরাধে বাবারও কাজ গেল, ছেলেও ভবঘুরে সাজল। কাপ্তেনকে বলে কয়ে—কেবিন-বয়-এর কাজ জুটল। সমুদ্রে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে লণ্ডন হয়ে প্যারিস আসা গেল। ছেলেটা দেশ ছাড়ার সময় রাজদ্রোহী ছিল, এবার রাজনৈতিক হল।

প্যারিস থেকে মস্কো। মস্কো থেকে প্যারিসে,—প্যারিস থেকে আবার ভিয়েৎনাম। ছায়ার মত সকলের অগোচরে বিপ্লবী ঘুরে বেড়ালেন। অরণ্যে অরণ্যে কানাকানি হল। চাষী গেরিলা সাজল। এবং অবশেষে অসম্ভবকে সম্ভব করে উত্তর ভিয়েৎনাম জন্ম নিল। তার জন্মকাল আন্ত-র্জাতিক ঠিকুজী অনুযায়ী—১৯৫০, আর ফরাসী জাহাজের খোলে বসে হো-চি-মিন-এর সেই নিরুদ্দেশযাত্রার কাল—১৯১১।

এমনভাবে আর কি কেউ কখনও রাষ্ট্রপতির আসনে এসেছেন?

২১. ৭. ৬০

হোজা, আনোয়ার

সভাটা আরম্ভ হয়েছিল, গেল গ্রীষ্মে, বুখারেস্টে। একাশিটি দেশের শত শত কমরেড হাজির ছিলেন সে সভায়। এমন কি স্বয়ং কমরেড ক্রুশ্চফও।

ছোট্ট দেশ (আয়তন—সাড়ে দশহাজার বর্গমাইল), ছোট পার্টি, (লোক সংখ্যা—পনের লক্ষের কাছাকাছি), সুতরাং আলবেনিয়ার জন্যে সময়ও বরাদ্দ হয়েছিল কম,—মাত্র কয়েক মিনিট। তারই মধ্যে অঘটন। ছ'ফুট লম্বা মানুষটি সামরিক কায়দায় লাফ দিয়ে উঠে

দাঁড়ালেন। তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে বাহান্ন বছরের অভ্যস্ত গলায় বললেন 'কমরেডস, আই থিঙ্ক দি কাল্ট অব পারসনালিটি ডাজ নট এপ্লাই অনলি টু স্ট্যালিন,…আই থিঙ্ক কম-রেড ক্রুশ্চফ হ্যাজ ডিসটরটেড দি থিসিস অব লেলিনইজম ফর হিজ ওন পারপাসেস !'…কমরেডস, তোমরা জাননা এই মানুষটি কি ভাবে জব্দ করেতে চেয়েছে আলবেনিয়ার জনতার পার্টিকে, আলবেনিয়ার জনতাকে।…আমার দেশে যখন দুর্ভিক্ষ এই মানুষটি তখন রাশিয়ার গম আমাকে না দিয়ে ইঁদুর দিয়ে খাইয়েছে।……এই মানুষটি আমাকে শাসানি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে, আমার পার্টিতে গোপনে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা করেছে…।' ইত্যাদি।

বক্তৃতা থামল। একাশিটি দেশ আতঙ্কিত চোখে একসঙ্গে সেই দুঃসাহসীর মুখের দিকে তাকাল। সম্ভবত তাকিয়েছিলেন কমরেড ক্রুশ্চফও। কেননা, তাঁর মুখের ওপর সেই প্রথম প্রতিরোধ।

এ প্রতিরোধ আজ আরও কঠিন। আলবেনিয়া আজ আরও দুঃসাহসী। কারণ,—নায়ক তাঁর চিরকালের দুঃসাহসী সেই মানুষটি, নাম যার—হোজা।

পুরো নাম—আনোয়ার হোজা। জন্ম—১৯০৮ সন। বাবা ছিলেন—এক দরিদ্র মুসলমান কাপড় বিক্রেতা। ছেলের লেখা পড়া তাই বাবার টাকায় নয়,—বৃত্তির পয়সায়।

ফরাসীরা একটা বৃত্তি দিয়েছিল, তার বলেই তরুণ হোজা ভর্তি হয়েছিলেন করিৎজার একটা নাম করা ফরাসী স্কুলে। সেখান থেকে তিরানার আমেরিকান মিশনে।

'২২ সনে আরও একটা বৃত্তি পেলেন তরুণ হোজা। ঠিক করলেন সে টাকায় বিদেশে পড়বেন,—ফ্রান্সে। ফরাসী দেশে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিও হলেন তিনি প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্লাসে। কিন্তু এক বছর পরেই সরকারী বৃত্তি বাতিল হয়ে গেল। কেননা, সরকার জানতে পেরেছেন বিদেশে গিয়ে হোজা প্রগতিশীল হয়ে উঠেছেন !

ইতিমধ্যে যতখানি না হয়েছিলেন এবার তাই হতে হল। সহসা বিপাকে পড়ে হোজা প্যারিসের বিখ্যাত কমিউনিস্ট কাগজ 'এল হিউম্যানাইট'-এর সম্পাদকের শরণাপন্ন হলেন। তিনি তরুণ হোজাকে

হোজা, আনোয়ার

আলবেনিয়া সম্পর্কে তাঁর কাগজে লিখতে বললেন। সেই লেখাই দীক্ষা!

'৩৪ সনে ভাগ্যবলে হঠাৎ একটা সরকারী কাজ পেয়ে গেলেন হোজা। তিনি ব্রাসেলসে আলবেনিয়ান দূতাবাসে সেক্রেটারি নিযুক্ত হলেন। চাকরি করতে করতেই হোজা ব্রাসেলস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রী নিয়ে এলেন। লেখা তাঁর তখনও চলছে।

রাজা জোগ-এর গুপ্তচরেরা সে খবর পেলেন দু'বছর পরে,—'৩৬ সনে। সঙ্গে সঙ্গে হোজা চাকরি থেকে বিতাড়িত হলেন।

কিন্তু দুঃসাহসী হোজা সুশিক্ষিত তরুণ। সুতরাং, সরকারী চাকরি চলে গেলেও দেশে তাঁর কাজের অভাব হল না। তিনি তাঁর ছোট-বেলার সেই স্কুলেই ফরাসী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন।

একদিন পুলিস সেখান থেকেও ধরে নিয়ে গেল তাঁকে। অভিযোগ গুরুতর,—রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র! কিছুদিন জেলে কাটাতে হল। কিন্তু প্রমাণাভাবে শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেলেন হোজা। এবার সত্যিই তিনি রাজদ্রোহী। কারণ, রাজা দেশত্যাগী, দেশে পুতুলের সরকার,—দুয়ারে শত্রু, ইতালীয় ফ্যাসিস্ত ফৌজ।

ইতালীয়ানরা গুছিয়ে বসা মাত্র অধ্যাপক হোজার কলেজের চাকরি গেল। তিনি ভবঘুরে সাজলেন। তবে উদ্দেশ্যহীন ভবঘুরে নয়,—আনোয়ার হোজার সঙ্কল্প যে করে হক, তিনি পিতৃভূমি শত্রু কবলমুক্ত করবেন।

তিরানার পথের বাঁকে একটা তামাকের দোকান ছিল তখন। ইতালীয়ান সৈন্যরা সেখান থেকে সিগারেট কিনত। দোকানির সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প গুজব করত,—হোজা লোকটি বড় ভাল।

ওরা জানতনা এই তামাকের দোকানের মালিকটির ঘরেই রাতের অন্ধকারে বসে ষড়যন্ত্র সভা। এবং এই হোজাই সে গুপ্ত সভার সভাপতি। তিনিই সদ্য গঠিত ('৪১) কমিউনিস্ট পার্টির নায়ক, তিনিই সদ্য প্রকাশিত 'দি ভয়েস অব দি পিপল' নামক কাগজটির সম্পাদক!

সে খবর যখন জানা গেল হোজা তখন নিরুদ্দিষ্ট। তিনি পর্বতবাসী মুক্তিযোদ্ধা। ওঁর অনুপস্থিতিতেই ইতালীয়ানরা সেদিন ফাঁসি দিয়েছিল ওঁকে, মোটা মূল্য ধার্য হয়েছিল তাঁর

মাথার নামে। কিন্তু হোজা তবুও ধরা পড়েননি। বরং, উল্টে দেশ ছাড়তে হয়েছিল—ফ্যাসিস্তদের; তারপর নাৎসীদের—এবং কে জানে, শেষ পর্যন্ত হয় পিছু হটতে হবে কমরেড ক্রুশ্চফকেও। কেননা, বহু উপলক্ষে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে হোজা সত্যিই দুর্ধর্ষ।

এমন কি দুর্ধর্ষ তাঁর স্ত্রীও। যুদ্ধের মধ্যে দেখা। মেয়েটি ছিলেন স্কুল শিক্ষিকা, সেনাপতি হোজার পাশে তখন গেরিলা যোদ্ধা। এখনও তিনি স্বামীর পাশেই আছেন। হোজার নিজের হাতে গড়া পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনি অন্যতমা। ১৬.১১.৬১

হোসেন, ডঃ জাকির

আটচল্লিশের সেই অবিশ্বাস্য ভারত। রাজধানী ষড়যন্ত্র কেন্দ্র। দিল্লি অন্ধকার। সেদিন যেন আরও বেশি।

তখন প্রায় মাঝরাত্রি। ঝড়ের বেগে রাজপথ দিয়ে ছুটে চলেছে একটা গাড়ি। গাড়িতে একজন মাত্র সোয়ারী। শহর যতই পেছনে পড়ছে ততই যেন চঞ্চল হয়ে উঠছেন তিনি। —দেরি হয়ে যায়নি ত? —এখনও সময় আছে ত?

গাড়িটা থামল এসে একটা বিরাট পুরানো বাড়ির সামনে। বিরাট গেটটার মাথার ওপরে উর্দুতে লেখা 'জামিয়া মিলিয়া', দিল্লি। এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন আগন্তুক। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে দেখে একপাশে সরে দাঁড়াল প্রহরীরা। নেহরু জানতে চাইলেন—ডাক্তার কোথা?—ডাক্তার?

ছুটে এসে পুরানো বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলেন জাকির হোসেন।—আমার জন্যে তোমার এ ভাবে ছুটে আসা ঠিক হয়নি। নেহরু বললেন—ভাই, তুমি যে আমাদের ইজ্জত।

কাছাকাছি থেকে যাঁরা চেনেন তাঁদের কাছেই শুধু নয়, ডঃ জাকির হোসেনের মত মানুষ গোটা দেশেরই ইজ্জত।

জন্ম—১৮৯৭ সনে, উত্তর প্রদেশের ফরাক্কাবাদ জেলায়। লেখাপড়া, আলিগড় এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। জাকির হোসেন বার্লিনের পি. এইচ. ডি। স্বদেশের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান শিরোপা তাঁর মাথায়।

আজীবন পড়াশুনার মানুষ ডঃ জাকির হোসেনের জীবনে অনেক কীর্তি। তার মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় বোধ হয় দিল্লির 'জামিয়া মিলিয়া'।

জ্যামারশিল্ড, দাগ

'২৬ থেকে '৪৮ সন অবধি এই বিখ্যাত বুনিয়াদি বিদ্যালয়টি ছিল তাঁরই পরিচালনাধীনে। সে বছর থেকে '৫৬ সন কেটেছে তাঁর আলিগড়ে। ভাইস চ্যান্সেলারের চেয়ারে। তারপর কিছুকাল রাজ্য-সভায় এবং অবশেষে '৫৭ সনের জুলাই থেকে বিহারের রাজ্যপালের আসনে।

যদিচ আজীবন গান্ধীজীর অনুরাগী, কংগ্রেসের সহযোগী, জাকির হোসেন তবুও কোনদিনই পুরো রাজনৈতিক মানুষ নন। তিনি প্রথমত— শিক্ষাবিদ। এই শতকের তৃতীয় দশক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ভারতে যত উল্লেখযোগ্য শিক্ষা সংস্কার হয়েছে তার প্রায় সব কিছুতেই ডঃ জাকির হোসেনের কিছু না কিছু হাতের ছাপ আছে। গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্তানী তালিমী সঙ্ঘ ত বলতে গেলে আগাগোড়া তাঁরই নেতৃত্বে পরিচালিত। এছাড়াও বুনিয়াদি শিক্ষা কমিটি, বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষা সংস্কার কমিটি, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন, ইউনেস্কো—ইত্যাদি অনেক গুরুতর কমিটি এবং কমিশনে ডঃ জাকির হোসেন বরাবরই একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এবং সেই নামটির সঙ্গে যে একটি অভিজ্ঞ এবং চিন্তাশীল মানুষ জড়িত, এবারকার বিশ্বভারতীর সমাবর্তন বক্তৃতাটিই তার একটা প্রমাণ।

ডঃ হোসেন ভাল বক্তা, ভাল শ্রোতা এবং ভাল লেখকও। ধনতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর একটি বই আজও বিখ্যাত। তাছাড়া জাকির হোসেন উর্দু ভাষায় ভাল অনুবাদকও। অনেক বিদেশী বই তর্জমা করেছেন তিনি। রাজকার্য এবং বাগানের কাজে অবসর পেলে এখনও করেন। ইতিমধ্যে যেগুলো করেছেন তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য 'প্লেটোর রিপাবলিক'। ২৯. ১২. ৬০

[১৯৬২ সনের ১১ই মে থেকে ডঃ জাকির হোসেন ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি।]

জ্যামারশিল্ড, দাগ

'—কৃষ্ণ উবাচ!—অ্যাণ্ড দাস সে'ড কৃষ্ণ—'

ফুল স্যুট-এ পুরো সাহেব।— অর্থাৎ পশ্চিমী। ইয়া উঁচু, ইয়া চওড়া। দুধের রং, কটা চুল, নীল চোখ। কথা বলেন কখনও ইংরেজীতে, কখনও ফ্রেঞ্চ-এ, কখনও জর্মানে। আবার কখনও বা স্কেণ্ডানেভিয়ার কোন ভাষায়।

লোকটা জাতে কি ধরা মুশকিল। কথায় কথায় তাঁর 'ভাগবত-গীতার' উদ্ধৃতি, পকেটে তাঁর মনিব্যাগের জায়গায় জয়েস কিংবা এলিয়ট; মুখে পাইপ, সিগারেট, অথবা সিগার। তবে যা-ই থাক, ঠোঁটের কোণে হাসিটি লেগেই আছে।

'যুনো'র মস্ত বাড়ীটায় নানা দেশের অসংখ্য কর্মী। কিন্তু এ হাসিটা তারা প্রত্যেকে চেনে। ফটো দেখে নয়,—চেনা হয়েছে এক গজ কিংবা এক ফুট দূর থেকে। সেবার যা হল।

কমন ক্যান্টিনে খেতে বসেছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ছোট বড় কর্মীরা। সহসা পাশের মেয়েটা নড়ে চড়ে বসল। বন্ধু বন্ধুর কানে কানে বলল—এস্. জি! গোটা হলটা এক সঙ্গে দরজার দিকে তাকাল। সবাই এক সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। সেক্রেটারি জেনারেল তাঁদের ইঙ্গিত করলেন বসতে। ওঁরা বসলেন। হ্যামারশিল্ড নীরবে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে নিজেও বসে পড়লেন। সকলের শেষে, হলের এক প্রান্তে।

পরদিন জানা গেল—সেক্রেটারি জেনারেল তাঁর খাওয়ার ঘরে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। এখন থেকে তিনি ক্যান্টিনেই খাবেন।

ক'দিন পরে আরও একটা খবর পাওয়া গেল। 'যুনো'র বাড়িতে সেক্রেটারি জেনারেল সবচেয়ে পদস্থ এক্সিকিউটিভ। তাঁর ঘরের মত যাতায়াতের সিঁড়িও আলাদা। হ্যামারশিল্ড জানালেন—তিনি ওটি ব্যবহারে অক্ষম! আজ থেকে তিনি আর পাঁচ জনের পথেই উঠা-নামা করবেন।

অদ্ভুত লোক! মাইনে পান বছরে পঞ্চাশ হাজার ডলার। তাও ট্যাক্স লাগে না। অথচ ঘরখানা দেখলে মনে হবে—ঝি চাকরের পয়সাও যেন নেই তাঁর! দেওয়ালময় প্রাচীন এবং আধুনিক ছবি, ঘরময় বই। তার মধ্যে খুঁজলে তেনজিং-এর দেওয়া সেই বরফ কাটবার কুড়ালটিও পাওয়া যাবে নিশ্চয়। ফটো তোলার মত পাহাড় চড়া-ও হ্যামারশিল্ড-এর নেশা। তবে তাঁর এক নম্বর নেশাটির নাম—কাজ। শ্রীকৃষ্ণ যাকে বলেছেন—কর্ম। পঞ্চাশ বছর বয়সেও রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি-জেনারেল অকৃতদার। তবে তিনি বলেন—সেটা মিথ্যা কথা। আসলে তাঁর গৃহিণী আছেন এবং তাঁর নাম—কর্ম;—অর, অ্যাজ যে বি সেড—কর্মদেবী।

হ্যামারশিল্ড, দাগ

কাজ! কাজ! কাজ! হ্যামারশিল্ড আবাল্য কর্মী। জন্ম দক্ষিণ সুইডেনের জনকোপিং-এ (jonkoping) এক অভিজাত পরিবারে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে বাবা ছিলেন—সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী। মধ্যযুগে পূর্বপুরুষেরা ছিলেন—অভিযাত্রী,—নাইট। তরুণ হ্যামারশিল্ড যখন স্টকহলম য়ুনিভারসিটি থেকে অর্থনীতিতে 'ডক্টরেট' হয়ে ঘরে এলেন তখন সুইডেন জানত না—এই ছেলেটিও ভবিষ্যতে পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য রক্ষা করবে,—'নাইট' হবে। কর্মজীবন শুরু হল অধ্যাপনায়। সেখান থেকে ব্যাঙ্ক অব সুইডেন-এ। প্রথমে সেক্রেটারি, তারপর চেয়ারম্যান, মাঝখানে কিছুকাল ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টে আণ্ডার সেক্রেটারির কাজও করেছেন তিনি। যা হক, শেষ পর্যন্ত ডিপার্টমেণ্ট বদল করতে হল। সুইডেনের 'অর্থনীতির যাদুকর' হ্যামারশিল্ড এবার এলেন বৈদেশিক দপ্তরে। তবে এবারও তিনি অর্থনীতিক। বৈদেশিক দপ্তরে তাঁর পদটির নাম—ফিনান্সিয়াল অ্যাডভ্যাইসার। '৫১ সনে মন্ত্রীর উপদেষ্টা মন্ত্রী হয়ে গেলেন। তিনি সুইডেনের সহকারী পররাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত হলেন। জাতিপুঞ্জের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। লোকটির কথাবার্তা, চালচলন ইউনাইটেড নেশানস-এর মনে ধরে গেল। তিনি সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হলেন।

কোরিয়া থেকে কাতাঙ্গা, '৫৩ সন থেকে '৬০—হ্যামারশিল্ড জাতিপুঞ্জের খ্যাতি যত বাড়িয়েছেন, তেমন বোধ হয় আর কেউ নয়। কাশ্মীর, হাঙ্গেরী, সুয়েজ—কর্তব্যে তাঁর সার্ভিস বুক আজ বোঝাই। তাতে মনে মনে অনেকে হয়ত অনেক কথা লিখেছেন,—কিন্তু দাগ হ্যামারশিল্ড নিজে জানেন তিনি তাঁর নামের মর্যাদা রেখেছেন!

হ্যামারশিল্ড—নামটির অর্থ 'হ্যামার' এবং 'শিল্ড'। অর্থাৎ, হাতুড়ী এবং ঢাল। শান্তিযোদ্ধাদের লোকে ঢালতলোয়ারহীন দেখতেই নাকি ভালবাসে। কিন্তু হ্যামারশিল্ড-এর মতে—নিধিরাম সর্দারকে কেউ মানতে চায় না!

১১. ১০. ৬০

[১৯৬১ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর উত্তর রোডেশিয়ার নাডোলার কাছে এক বিমান দুর্ঘটনায় (?) হ্যামারশিল্ড নিহত হন।]